দশটি উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দশটি উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনীল ঘোষ

করুণা প্রকাশনীর পক্ষে ১৮এ টেমার লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
বামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণ সংস্থাপনে লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
এবং দে'জ অফসেট, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৩০০·০০

এই পুস্তকটি মাকে উৎসর্গ করলাম

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকে বাবাকে লিখতে দেখেছি যেমন সুন্দর হাতের লেখা, লেখার গঠন—ও তেমনই ছিল তাঁর সচ্ছল লেখার গতি। আমি নিজেও অবাক হয়ে ভাবতাম ও চিন্তা করতাম যে, বাবা কি করে পাতার পর পাতা এত সুন্দর করে গুছিয়ে লেখেন? বাবা তাঁর গল্পগুলো এমন গুছিয়ে লিখতেন যাতে মনে হয় এটা লেখা নয় যেন কারোর সঙ্গে কথা বলছেন। বাবার লেখা যখন পড়ি তখন চরিত্রগুলো যেন চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে। এই কথাগুলো খালি আমার নয় এগুলো বাবারই অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠক পাঠিকার মুখ থেকে শোনা, যাঁরা এখনও বাবার বই পড়তে ভালবাসেন।

বাবা বহু বই উপন্যাস ও গল্পের আকারে লিখে গেছেন, তার মধ্যে অনেক বই আগে প্রকাশ হয়েছিল এবং নানা কারণে আজ আর সেগুলো প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

বাবা আজ আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর লেখা বইয়ের গল্পগুলো মনে হয় পাঠক/পাঠিকার মন থেকে মুছে যায়নি। তাইত তাঁদের কাছে থেকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ আসে নূতন করে প্রকাশ করতে। করুণা প্রকাশনীর বামাচরণ বাবু (মুখোপাধ্যায়) যখন একদিন এসে তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন যে, তিনি বাবার লেখা দশটি উপন্যাস একত্রিত করে বই ছাপতে চান তখন সানন্দে তাঁকে অনুমতি দিয়ে দেওয়া হল। বাবার লেখা বইয়ের ভক্ত অসংখ্য পাঠক/পাঠিকার কাছে তাঁর লেখা নূতন করে পৌঁছে দেওয়ার এই তো সুযোগ।

বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসে বাবার কিছু কথা বারবার মনে পড়ছে। বাবার লেখায় কোন ক্লান্তি ছিল না। শুনেছি ১৯ বছর থেকে বাবা প্রথম লেখা আরম্ভ করেন এবং দেখেছি জীবনের শেষ দিন (৭৬ বছর বয়স) পর্যন্ত উনি লিখে গেছেন একদিনের জন্যও বাবাকে কখনও লেখা বন্ধ করতে দেখিনি।

হাজার কাজের মধ্যেও ভোরবেলা ও দুপুরবেলা বাবা নিয়ম করে লেখার টেবিলে অবশ্যই বসতেন। বাবার মধ্যে কখনও একনিষ্ঠতার অভাব দেখিনি, উনি যেটা করবেন মনে করতেন সেটা না করা পর্য্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

বাবা সবরকমের লেখাই অতি সুন্দর করে লিখে গেছেন, বাচ্চারা ও বড়রা কেউই এই রস থেকে বঞ্চিত হয়নি। এখনকার পাঠক/পাঠিকারা যাতে এটা থেকে বঞ্চিত না হয় তাই এই প্রচেষ্টা এবং আশা করি এটা সফল হবে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক উপন্যাস এইভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

সর্বশেষে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী বামাচরণ বাবুকে যাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হল

কেয়া সেন গুপ্ত (কেয়া গুপ্ত)

পিয়া মুখ চন্দা

ভয়াবহ অগ্নির করাল গ্রাস থেকে সমস্ত আশ্রমটার মধ্যে একটি মাত্র ঘরই কোন মতে বেঁচেছিল। এবং ঐটিই একমাত্র পাকা ইটের গাঁথুনির ঘর।

চারিদিকে সমস্ত আশ্রমটার দগ্ধাবশেষ তখনও পড়ে আছে। বাতাসে তখনও একটা পোড়া গন্ধ। নাক জ্বালা করে।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সরূপানন্দ স্বামী। সেই পাকা ঘরটিরই দাওয়ায় বসে সামনের অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিলেন।

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে তিনি এই আশ্রমটিকে গড়ে তুলেছিলেন, একটি রাত্রের মধ্যেই কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, সহসা কেমন করে যে আগুন লাগলো আশ্রমের রন্ধনশালায়, এখনো যেন একটা বিস্ময় সরূপানন্দর কাছে!

চার ঘন্টার মধ্যে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

একমাত্র সান্ত্বনা যে আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে কেউ প্রাণে মারা যায় নি। কিন্তু প্রাণে না মারা গেলেও দুটি ছেলের কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না এখনো পর্যন্ত।

নানা বয়েসী শিশু ও কিশোর মিলে একত্রিশটি ছেলে ছিল আশ্রমে। তাদের সকলেব বড় যে দুটি ছেলে অনিমেষ আর মনোহর, সেই দুজনারই কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না এখনো।

মনোহর ছেলেটির পরেই সরূপানন্দর সন্দেহ হয়। খুব সম্ভবত সেই হয়তো ওদের দুজনারই আকস্মিক নিরুদ্দেশের মূলে রয়েছে।

ইদানীং মনোহরের জন্য সরূপানন্দর চিন্তার অবধি ছিল না।

মনোহরে যখন দেড় বৎসর বয়স সেই সময় একটা খুনের মামলায় মনোহরের বাপ মা ভোলা ও সৌরভীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সেই সময়ই ভোলার এক প্রতিবেশী অসহায় শিশু মনোহরকে এনে আশ্রমে সরূপানন্দর হাতে তুলে দিয়েছিল।

খুনী মা বাপের রক্ত ছিল মনোহরের শরীরে তাই বোধহয় সরূপানন্দর দীর্ঘদিনের চেষ্টাতেও তিনি, মনোহরের চরিত্রকে তার পৈতৃক চরিত্রগত দুষ্কৃতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হননি।

মনোহরের মা বাপের রক্ত হতে পাপের যে বিষ তারও রক্তে সংক্রামিত হয়েছিল, সেই বিষয়েরই ক্রিয়া ক্রমশঃ মনোহরের বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছিল তার চরিত্রের মধ্যে। সরূপানন্দের চিন্তা ও আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল সেটাই। সর্বদা চোখে চোখে রেখে এবং শাসন করেও যেন কিছুতেই মনোহরকে আয়ত্বের মধ্যে আনতে পারছিলেন না সরূপানন্দ ইদানীং।

মাত্র গত পরশুই আশ্রমের ফুলের বাগানের চারা ফুলগাছগুলো সমস্ত নষ্ট করে ফেলবার জন্য মনোহর ও অনিমেষকে সরূপানন্দ অনাহারে একটা ঘরের মধ্যে একাকী বন্ধ করে রেখেছিলেন। সেই আক্রোশেই কি ওরা পালাল!

সরূপানন্দের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল, আশ্রমের একজন শিক্ষক এসে বললেন, একটি ভদ্রলোক ও সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা গাড়িতে চেপে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সরূপানন্দ তাঁদের ঐখানেই নিয়ে আসতে বললেন।

একটু পরেই স্যুট পরিহিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি ও সঙ্গে সর্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত অবগুণ্ঠনবতী এক নারী এসে সেখানে দাঁড়ালেন।

মহারাজ!

কে!

আমি! হঠাৎ আপনার আশ্রমে আগুন লেগে পুড়ে যাবার সংবাদ কাগজে পড়ে ছুটে আসছি—আগন্তুক মৃদুকণ্ঠে বললেন।

সরূপানন্দ কোন জবাব দেন না।

কোন প্রাণহানী হয়নি তো মহারাজ?

না।

সবাই সুস্থ আছে?

হ্যাঁ।

একটিবার অনিমেষকে দেখতে পারি মহারাজ?

অনিমেষ।

হ্যাঁ, ডাকুন না একটিবার।

কিন্তু—

না না—পরিচয় তাকে দেব না। সে জানবে না আমরা কে। শুধু আমার এই আত্মীয়টি দূর থেকে তাকে একটিবার দেখতে চান।

বসুন আপনারা।

সরূপানন্দের কণ্ঠস্বর যেন কেমন গম্ভীর বিষণ্ণ।

আগন্তুক ভদ্রলোক ও সঙ্গের ভদ্রমহিলাটি কিন্তু তথাপি বসেন না।

মহারাজ।

আমি শুধু দুঃখিতই নয় লজ্জিতও, গত রাত্রে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে অনিমেষ ও আশ্রমের অন্য একটি ছেলের কোন সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি।

হ্যাঁ, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।— আশে পাশে দু-চার মাইলের মধ্যে সর্বত্র খোঁজ করেছি কিন্তু—

ভদ্রমহিলাটি বোধহয় কাঁপছিলেন, তাই কেবল ভদ্রলোক তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরে দাওয়ায় বসিয়ে দিলেন।

আরো আধঘন্টা পরে সেই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসে নিজেদের গাড়ির সামনে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছিলেন।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভদ্রমহিলা যে তখনো কাঁদছেন বুঝতে কষ্ট হয় না।

আঃ, কাঁদছো কেন, চুপ করো, চুপ করো, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যেখানেই থাক না সে আমি তাকে খুঁজে বের করবই।

আমি যাব না, এখানেই তুমি আমাকে রেখে যাও।

কি পাগলের মত যা তা বলছো।

না, আমি যাব না। ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে এইখানেই রেখে যাও।

কিন্তু এখানে থাকলেই কি তুমি তার সন্ধান পাবে?

পাব, নিশ্চয়ই পাব। নিশ্চয়ই সে বেশীদূর যেতে পারেনি।

তা যেন হলো। আজ আঠার বছর বলতে গেলে বয়স তার, তাকে তুমি দেখলেই কি চিনতে পারবে?

পারব, আমি তার মা। নিশ্চয়ই তাকে আমি চিনতে পারব।

অবুঝ হয়ো না। চল এখন বাড়িতে। আমি বলছি তাকে আমি যেমন করে হোক খুঁজে বের করবোই।

না, না—আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছ।

বিশ্বাস করো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার ছেলেকে নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে এনে দেব। চল—

ভদ্রলোক হাত ধরে ভদ্রমহিলাকে অতঃপর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

খানিকটা ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বর্তমান কাহিনীর শুরু ঐ ঘটনারই দীর্ঘ নয় বৎসর পরে।

॥ এক ॥

টেলিফোন রিসিভারটা ধীরে ধীরে সুব্রত নামিয়ে রেখে দিল।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, বেলা প্রায় পৌনে চারটা। গ্রীষ্মকাল হলেও কিছুক্ষণ পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব বাতাসে।

টালীগঞ্জ থানা ইনচার্জ সুশীল সোম যে রকম জরুরী তাগাদা দিয়েছে এখুনি না বের হয়ে উপায় নেই।

সুব্রত পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো জামা কাপড়টা বদলে নেবার জন্য।

ঘটনাটা সত্যই আকস্মিক!

বিখ্যাত লক্ষপতি লৌহ ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। আর সুশীল সোমের ধারণা, সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, হত্যা অর্থাৎ সাদা কথায় খুন হয়েছেন তিনি।

ফোন করেছে সুশীল নরেন্দ্রনাথের টালীগঞ্জের বাড়ী থেকেই। ঘন্টাখানেক পূর্বে মাত্র নাকি নরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তারই বাড়ীর উদ্যানে, সামার হাউসের মধ্যে। লক্ষপতি লৌহ ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ ঘোষের নামটা যে সুব্রতর একেবারে অপরিচিত তা নয়।

দু'পুরুষ ধরে ঘোষেদের প্রকাণ্ড লোহার ব্যবসা। শুধু লোহাই নয়, কিছু কোল মাইনসও ধানবাদ ঝরিয়া অঞ্চলে আছে।

ব্যবসা ও বিষয় সম্পত্তি অবিশ্যি বছর দুয়েক হলো তিন ভাগে ভাগ হয়ে ফার্মের পূর্ব নামটাও পাল্টে গিয়ে বর্তমানে দুটো নাম হয়েছে।

নরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র দুই ভাই-ই বেঁচে ছিলেন। ওঁদের সবার জ্যেষ্ঠ অমরেন্দ্রর মৃত্যু বাপ মনোরঞ্জন ঘোষের জীবিত কালেই হয়েছিল। তাঁর ওয়ারিশন ছিল তাঁর একমাত্র মেয়ে বেবী অর্থাৎ নমিতা ঘোষ।

মনোরঞ্জন ঘোষ যতদিন বেচে ছিলেন ফার্মের নাম ছিল ঘোষ এণ্ড সনস্। কিন্তু বছর দুই পূর্বে মনোরঞ্জন ঘোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষ এণ্ড সনস্ তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এবং পূর্ব ঘোষ এণ্ড সনস্ নামটাও উঠে গিয়ে তার জায়গায় দুটি ফার্ম দেখা দিল। একটি ফার্মের নাম হলো এন. এন. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী, অন্যটির নাম হলো বি. এন. ও. এন. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী। বি. এন হচ্ছে বিনয়েন্দ্র ও এন্ হচ্ছে বেবীর ভাল নাম নমিতা। কারণ পৃথক হয়ে যাবার পর বেবী তার ছোট কাকাকেই অভিভাবক বলে মেনে নিয়েছিল, নিজে তখনো সাবালিকা হয়নি বলে। মনোরঞ্জন ঘোষের কলকাতা শহরে দুখানা বাড়ি ছিল। একটি ভাগে পড়েছিল নরেন্দ্রনাথ ও বিনয়েন্দ্রের অন্যটি ভাগে পড়েছিল নমিতার। শেষ পর্যন্ত টালীগঞ্জের বড় বাড়ীটায় বিনয়েন্দ্রের যে অংশ ছিল সেটা নরেন্দ্রনাথকে বিক্রি করে দিয়ে বিনয়েন্দ্র বালীগঞ্জের বাড়ীতে নমিতাকে নিয়ে উঠে গিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছিল একটি মাত্র ছেলে রেখে। বিনয়েন্দ্র বিবাহই করেননি।

ফার্ম ও বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আদালতে যখন মনোরঞ্জন ঘোষের মৃত্যুর মাস দুই পর থেকেই মামলা চলছিল সেই সময়ই সুব্রত সংবাদপত্র মারফং সব জেনেছিল। শুধু তাই নয় মনোরঞ্জন ঘোষ বেঁচে ছিলেন যখন ঐ সময় ফার্মের একটা মোটা অংকের একাউন্টের গোলমালের ব্যাপারে সুব্রতর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কিছুটা আলাপ পরিচয়ও হয়েছিল। এবং সেই সময়ই বার দুই সুব্রত মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে টালীগঞ্জ ভবনে যাতায়াতও করেছিল।

নরেন্দ্রনাথের বয়েস পঞ্চান্ন পার হয়ে গিয়েছে। তাহলেও স্বাস্থ্য তাঁর অটুটই ছিল। দেহে কোন প্রকার রোগের বালাই ছিল না।

বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা। গায়ের বর্ণ শ্যাম। মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে। একমাত্র ছেলে রণেন্দ্রনাথ কিছুদিন হলো জার্মানীতে লোহা সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে গিয়েছে।

বাড়ীতে দাসদাসী, বাজার সরকার, সোফার, দারোয়ান ও প্রাইভেট সেক্রেটারী নির্মল চৌধুরী। ফোনে সুশীল সোমের সঙ্গে ক্ষণপূর্বে সুব্রতর যা কথাবার্তা হয়েছে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কে. ব্যাপারটা যেন একটু রহস্যজনকই।

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া ভদ্রলোকের নেশা বা 'হবি' বলতে ছিল দুটি। একটি ফুলের

বাগান করা, দ্বিতীয় হচ্ছে ফটোগ্রাফীর।

নরেন্দ্রনাথের টালীগঞ্জের বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে প্রায় সাত কাঠা জায়গা নিয়ে একটি ফুলের বাগান।

বহুদিন ধরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ও সময় দিয়ে নরেন্দ্রনাথ বাগানটিকে তাঁর মনের মত করে সাজিয়ে তুলেছিলেন।

বহু দেশী ও দুর্মুল্য দুষ্প্রাপ্য নানা প্রকাবের নানা জাতীয় বিদেশী ফুলের গাছ ও বীজ এনে বাগানে রোপণ করেছিলেন অনেক দিন ধরে।

সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে এগাবোটা পর্যন্ত ফার্মের কাজকর্ম ছাড়া বাকী সময়টা নরেন্দ্রনাথের বেশীর ভাগই বাগানের পরিচর্যায় ও ফটোগ্রাফীর নেশা নিয়েই কেটে যেতো।

নিজে তো বাগানের পরিচর্যা করতেনই, চারজন মালীও ছিল বাগানের বক্ষণাবেক্ষণের জন্য। মালীরা বাগানের পুব কোণে একটা ঘরের মধ্যেই থাকতো।

ফটোগ্রাফী ও বাগানের নেশা ছাড়াও আর একটি নেশা ছিল নরেন্দ্রনাথের। অতিরিক্ত চা পান করতেন তিনি। দিনে ও রাত্রে কুড়ি পঁচিশ কাপ চা পান করতেন।

ঘটনার দিনটা ছিল রবিবার।

রবিবার দিনটা নরেন্দ্রনাথের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগানেই কেটে যেতো। সেদিনও সকাল আটটা থেকে নাকি তিনি বাগানেই ছিলেন।

শরীরটা তত ভাল না থাকায় সেদিন আহার করেননি। বেলা আড়াইটার সময় ভৃত্য নরেশ যখন প্রভুর জন্য চা নিয়ে যায় বাগানে তখন সে জানতো নরেন্দ্রনাথ বাগানের এক কোণে নির্জন সামার হাউসেই আছেন।

বেলা বারটা নাগাদও একবার নরেশ যখন চা নিয়ে যায় তখনও তার প্রভু ঐ সামার হাউসেই ছিলেন।

সে সময় বসে বসে নরেন্দ্রনাথ সামার হাউসের মধ্যে একটা চওড়া পাথরের বেঞ্চের ওপরে কি একটা মোটা ফটোগ্রাফীর বই পড়ছিলেন।

শেষবার চা নিয়ে সামার হাউসে গিয়ে দেখে, নরেন্দ্রনাথ সেই পাথরের বেঞ্চটার ঠিক সামনেই মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন।

প্রথমটায় ব্যাপারটা সে সঠিক বুঝতে পারেনি। তারপর ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে, তার প্রভুকে মেঝে থেকে তুলতে গিয়ে সভয়ে অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার করে দু'পা পিছিয়ে আসে। বরফের মত ঠাণ্ডা শরীর। প্রাণের কোন সাড়া নেই। তারপরই সে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ছুটে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে অন্যান্য সকলকে সংবাদটা দেয়। চাকর বাকররাই ছিল তখন একমাত্র বাড়ীতে। আর ছিল বাজার সরকার, ঘোষেদের বাড়ীর বহুকালের পুরাতন কর্মচারী হরিধন বসু। হবিধনই শেষ পর্যন্ত থানায় সংবাদটা পাঠায়।

সুব্রত যখন নরেন্দ্রনাথের পূর্ব পরিচিত বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো বেলা তখন প্রায় পৌনে পাঁচটা।

গেটের ডানদিকে কালো পাথরের উপর সোনালি জলে খোদাই করে বাংলায লেখা 'ঘোষ নিবাস'। আর ঠিক তার নিচেই পিতলের প্লেটে লেখা ঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ। নামটি ইংরেজীতে।

গেটের সামনেই একজন লাল পাগড়ী মোতায়েন ছিল। অবিশ্যি গেট রক্ষী শিখ দারোয়ানও রাইফেল কাঁধে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল।

লাল পাগড়ীকে পরিচয় দিতেই সে দারোয়ানকে গেট খুলে দিতে বললো। সুব্রত সোজা তার গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। লাল ছোট ছোট পাথর বিছানো রাস্তা গেট থেকে রবাবর গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সে রাস্তার দুপাশে কেয়ারী করা মেহেদীগাছ। তার গায়ে গায়ে জড়িয়ে উঠেছে সযত্নবর্ধিত, মাধবীর লতা। মধ্যে মধ্যে তার সবুজের গায়ে লাল রক্তের ছিটের মত মাধবী ফুলগুলো ফুটে রযেছে। তারপর ও পাশে সযত্নবর্ধিত নানা প্রকারের পাতাবাহার ও পুষ্পের সমারোহ।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি এসে থামতেই সামনের ঘর থেকে সেই শব্দে বের হয়ে এলেন ঘোষ বাড়ীর সরকার হরিধনবাবু ও থানা ইনচার্জ সুশীল সোম।

এই যে সুব্রতবাবু আসুন—আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

সকলে নরেন্দ্রনাথের অতি আধুনিক কেতায় বহু মূল্যবান আসবাব পত্রে সুসজ্জিত পারলারে গিয়ে প্রবেশ করলো অতঃপর।

ঘরের মধ্যে স্যুট পরিহিত আর একজন সুশ্রী দর্শন প্রৌঢ়ও উপস্থিত ছিলেন।

সুশীল সোমই তার সঙ্গে সুব্রতর আলাপ করিয়ে দিলেন।

ডাঃ গণপতি সান্ন্যাল। নরেন্দ্রনাথের বহুদিনকার পারিবারিক চিকিৎসক।

সুব্রত গণপতি সান্ন্যালকে নমস্কার জানিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করলো, মিঃ ঘোষের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী নির্মল চৌধুরীকে দেখছি না। তিনি কোথায়?

জবাব দিলেন এবারে সরকারমশাই হরিধনবাবু, আজ্ঞে, কি যে বলে তিনি তো আজ্ঞে নেই—

নেই মানে? আমি তো জানতাম নির্মলবাবুই ছিলেন মিঃ ঘোষের যাকে বলে সর্বব্যাপারে—বিশেষ করে তাঁর সামাজিক, লৌকিক ও কৃষ্টির ব্যাপারে দক্ষিণ হস্ত।

সুব্রত কথাটা মিথ্যে বলেনি। কারণ নির্মল চৌধুরী সংক্রান্ত ব্যাপারটা সেবারে যখন এবাড়িতে যাতায়াত করেছিল তখনই বুঝতে পেরেছিল।

ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ, গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতি জনসমাজে প্রতিপত্তি থাকলেই ধন সম্পদের সৌভাগ্যের ফাউ হিসাবে দেখা দেয় সর্বকালে যে বিশেষ একটা লৌকিক বা সামাজিক প্রতিপত্তি তারই পরিচিতি হিসাবে ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক মধ্যে মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয় সভাসমিতির প্লাটফরমে, যেখানে ফুলের মালা গলায় নিয়ে জনগণের হাততালির মধ্যে দিতে হয় কৃষ্টি সম্পন্ন গভীর জ্ঞানোদ্দীপক বক্তৃতা বা ভাষণ! শুধু কি ভাষণ, করতে হয় কত প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন। দিতে হয় কত মঙ্গলাচারণ ও বাণী! নরেন্দ্রনাথের বেলাতেও স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলো বাদ যেতো না তার অর্থের ও প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে। অথচ নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা বা বিদ্যা এতটা ছিল না যাতে করে ঐসব ক্ষেত্রে নিজেকে তিনি সগৌরবে মানিয়ে নিতে পারেন। সেই কারণেই প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর নির্মল চৌধুরীর মত একজন যুবকের। অল্প বয়েসে ইংরাজীতে এম. এ পাশ করবার পর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুদর্শন যুবক নির্মল চৌধুরী যখন চাকরির প্রত্যাশায় কলকাতার অফিসে অফিসে ঢু মেরে বেড়াচ্ছে একদিন সেই সময়ই প্রার্থী হিসাবে গিয়ে দেখা করেছিল নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অফিসে।

পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথের মুখেই ব্যাপারটা আদ্যপান্ত শুনেছিল সুব্রত।

নরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গুণ ছিল মানুষ চিনবার।

নির্মল চৌধুরীব চেহারা ও কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি দেখে ছিলেন প্রথম দর্শনেই যেটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু সুচতুর ব্যবসায়ী নবেন্দ্রনাথ সেটা তাকে জানতে দেননি ছয়মাস পর্যন্ত।

প্রথম দর্শনের দিন কেবল বলেছিলেন, চাকরি চান?

হ্যাঁ!

কতদূর পড়াশুনা করেছেন?

ইংলিশে এম এ!

পড়াশুনাটা আপনার দেখছি একটু বেশীই করা হয়ে গেছে।

নির্মল চৌধুরী চুপ করেই ছিল। কোন প্রত্যুত্তর দেয়নি।

ত্রিশ টাকা মাইনে দেবো, ঢুকবেন চাকরিতে?

ঢুকবো। কি কাজ করতে হবে?

রেকর্ড কিপিং।

বেশ।

পরের দিন থেকেই নির্মল চৌধুরী এন. এন. ঘোষ এণ্ড কোম্পানীতে চাকরিতে বহাল হলো, এবং নিয়মিত অফিসে হাজিরা দিয়ে যেতে লাগলো। কাজ করে মনোযোগ দিয়ে। মাস তিনেক বাদে হঠাৎ অফিসে বসে কাজ করছে নিঃশব্দে নিজের টেবিলে, ম্যানেজিং ডিরেকটার ঘোষ সাহেবের এক স্লিপ এলো : দেখা করো।

ম্যানেজিং ডিরেকটারের ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'আজকাল' পত্রিকায় বর্তমান অর্থ সমস্যার উপরে আপনিই প্রবন্ধটা লিখেছেন এমাসে?

হ্যাঁ।

আপনার ভাষার বেশ জোর আছে নির্মলবাবু!

এবারেও চুপ করেই রইলো নির্মল চৌধুরী।

কাল থেকে আপনি অন্য কাজ করবেন।

নির্মল চৌধুরী তাকায় ম্যানেজিং ডিরেকটারের মুখের দিকে!

আমার পার্সোন্যাল সেক্রেটারীর কাজ করবেন। কত মাইনা পেলে আপনি খুশি হন?

যা আপনি বিবেচনা করেন!

চারশ টাকা করে পাবেন মাসে। কাল সকাল আটটায় আমার বাড়ীতে আসবেন।

ত্রিশ টাকা থেকে একেবারে একলাফে চারশ টাকায় লিফট্!

তথাপি কোন উচ্ছ্বাস বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়নি সেদিন নির্মল চৌধুরীর ব্যবহারে বা কথাবার্তায়।

যাহোক পরদিন থেকে গত তিন বৎসর যাবৎ নির্মল চৌধুরী নরেন্দ্রনাথের পার্সোন্যাল সেক্রেটারী হিসাবেই কাজ করে আসছিলেন।

পিতার মৃত্যুর কিছুদিন আগেই চৌধুরী নরেন্দ্রনাথের কাছে বহাল হয়েছিল তারপর মনোরঞ্জন ঘোষের মৃত্যুর পর ফার্মের অদল বদল হলেও তার চাকরির কোন অদল বদল হয়নি। পূর্ববৎ সে নরেন্দ্রনাথের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী হিসাবেই কাজ করে যাচ্ছিল।

সেই কারণেই বিশেষ করে নির্মল চৌধুরী সম্পর্কে সুব্রত খোঁজ নিয়েছিল।

হরিধনবাবু বললেন, আজ্ঞে কি যে বলে তিনি দিন দুই হলো ছুটিতে আছেন।

ও!

অতঃপর সুশীল সোমের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলে, চলুন মিঃ সোম, মৃতদেহ তো এখনো সামার হাউসেই আছে, একবার জায়গাটা দেখে আসা যাক।

চলুন।

সকলে গাত্রোত্থান করে।

॥ দুই ॥

সুব্রত, ডাঃ গণপতি সান্যাল, হরিধনবাবু ও ভৃত্য নরেশ সকলে এসে গৃহের পশ্চাতে অকুস্থান উদ্যানে প্রবেশ করলো।

সত্যিই মনোরম উদ্যানটি।

ছোট বড় নানা জাতীয় দেশী বিলাতী ফুল, পাতাবাহার ও নানাজাতীয় ফার্ণ ও অর্কিডের গাছে যেন ছবির মত সাজানো।

আসন্ন সন্ধ্যার ম্রিয়মাণ আলোয় কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

উদ্যানের ভিতর দিয়ে পায়ে চলার সরু কাঁচা মাটির পথ। দুপাশে বাঁশের বেড়া, সেই বেড়ার গায়ে গায়ে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা ও কি একপ্রকার বিদেশী লতার প্রাচুর্য্য। তারমধ্যে লাল ও সাদা ফুলের বর্ণ বৈচিত্র্য।

উদ্যানের মধ্যে কোথায়ও এক ঝাঁক রজনীগন্ধা মাথা তুলেছে, কোথায়ও রক্ত গোলাপের রক্তাভা, কোথায়ও শ্বেত গোলাপের শুভ্রতা, কোথায়ও পাপড়ী মেলা সূর্যমুখীর হরিদ্রাভা, কোথায়ও ক্রিসামথিমাম বা মরণিং গ্লোরির বর্ণ বৈচিত্র্য। কোথায়ও রঙিন পাতাবাহারের চোখ জুড়ানো শোভা, কোথায়ও নবীন দুর্বাদলের সবুজ আস্তরণ।

মাঝে মাঝে কৃত্রিম ফোয়ারা ঝির ঝির করে জলবিন্দু ছিটুচ্ছে!

সুব্রত যেন মুগ্ধ হয়ে যায় চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে!

এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও শান্তির মধ্যে নেমে এসেছে মৃত্যুর ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা।

বিদায়মান সূর্যরশ্মিস্নাত সায়াহ্ন বেলার নীলাকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালো সুব্রত।

জীবন ও মৃত্যুর এই যে মর্মান্তিক খেলা এর কি শেষ হবে না কোনদিন!

এমনি করেই কি বার বার পৃথিবীর এই শান্ত সমাহিত রূপ বিকৃত হবে মানুষের দ্বেষ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতার মর্মান্তিক আঘাতে আঘাতে!

সহসা সুশীল সোমের কথায় সুব্রতর যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

এই সেই সামার হাউস সুব্রতবাবু!

চোখ তুলে সামনের দিকে তাকালো সুব্রত।

উপরে খড়ের ছাউনী, পাকা মেঝে ও চারিদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া ছোট একখানি ঘর।

ঘরটির সর্বাঙ্গ জড়িয়ে রেখেছে সবুজ লতা ও লাল ফুলের বর্ণসুষমা।

শিল্পী মনের সবটুকু নিংড়ানো যেন একটুক্‌রো স্বপ্ন!

মধ্যে মধ্যে দেওয়ালে কাচের জানালা, দরজাও কাচের তৈরী!

ভিতরে প্রবেশের কাচের দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করাই ছিল! দামী বর্মাটিক উডের চমৎকার কাজ করা বিচিত্র ফ্রেমের মধ্যে বসানো ফিকে সবুজ রংয়ের ঘষা কাচ।

দরজার গায়ে ইয়েল লক সিষ্টেম।

খোলাই ছিল দরজা, দরজার পাল্লা ঠেলে সর্বাগ্রে প্রবেশ করলেন ভিতরে সুশীল সোম এবং সুব্রতকে আহ্বান জানালেন, আসুন সুব্রতবাবু!

মুগ্ধ বিস্ময় সুব্রত সোমের পিছু পিছু সামার হাউসের মধ্যে প্রবেশ করলো। সামার হাউসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্য একবার দাঁড়ালো সুব্রত। চারিদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর সামনের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি চওড়া শ্বেত পাথরের বেঞ্চ ওর নজরে পড়লো। তার চার পাশে নানা জাতীয় দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ ভিড় করে আছে।

বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্রালোকে সমগ্র ঘরখানির মধ্যে একটা অপূর্ব আলোছায়ার লুকোচুরী যেন। আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সুব্রতর নজরে পড়লো সেই শোচনীয় মৃত্যুর দৃশ্য। শ্বেত পাথরের বেঞ্চটার ঠিক সামনেই নিচে মেঝের উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা নিষ্প্রাণ দেহ! গায়ে একটা দামী জাপানী সিল্কের কিমানো ও পরিধেয় ঢোলা সিল্কের পায়জামা। একটা হাত দেহের নিচে চাপা পড়েছে অন্য হাতটা পাশে ছড়ানো। ছড়ানো হাতের মুষ্ঠিটি দৃঢ়বদ্ধ।

ভূপতিত নিশ্চল দেহটার চার পাশে নানা বর্ণের পুষ্প সম্ভার যেন ঝুঁকে রয়েছে বিস্ময়ে সেই নৃশংস ঘটনার সাক্ষী হয়ে।

পায়ে যে ঘাসের চটি ছিল, এখনো তা এক পায়ে আছে অন্য পা থেকে সম্ভবত স্খলিত হয়ে দ্বিতীয় পাটি চটি পাশেই পড়ে আছে।

মৃতদেহের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে এবারে তাকালো সুব্রত পাশের শ্বেত পাথরের বেঞ্চটার দিকে।

বেঞ্চের উপর এক পাশে পড়ে আছে কালো মলাটের একখানা বই।

তার পাশেই একটা দামী ছোট ক্যামেরা। একটা মুখ খোলা সেফিল্ডের দামী ছুরি। আশে পাশে কাটা পেনসিলের কিছু কাঠের চিলতে তার পাশে কতকগুলো চিঠির খাম। ও একটা সাদা পুরু মুখ ছেঁড়া খাম।

এদিক ওদিক ভাল করে তাকাতে গিয়ে সুব্রতর আরো নজরে পড়লো মৃতদেহের ঠিক পাশেই পড়ে আছে রোল ফিল্মের একটা মুখ খোলা কাগজের কেস্ ও একটা এ্যালুমুনিয়ামের কেস্। একটা ফিল্ম স্পুল তার পাশে রোল করা। এবং আরো নজরে পড়লো সুব্রতর বেঞ্চটার উপরে, খান কয়েক ইংরাজীতে 'এন' এমবস্ করা দামী সাদা লেটার পেপার। তার পাশে একটা তীক্ষ্ণ সূচালু করে কাটা লেড্ পেনসিল বেঞ্চের উপর পড়ে রয়েছে। এবং বেঞ্চের উপরে পড়ে আছে ছোট একটি কার্ডবোর্ড তৈরী বাক্স। বাক্সটি শূন্য। সুব্রত প্রথমেই নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের দিকে নিচু হয়ে ফিল্ম স্পুলটা তুলে নিল। দেখলো সেটা একস্‌পোজড্ হয়ে গেছে। পকেটে রেখে দিল সেটা। তারপর হাত বাড়িয়ে বেঞ্চের উপর থেকে তুলে নিল চিঠিগুলো। প্রথমেই নজর করে দেখলো ছেঁড়া সাদা খামটা। খামটার উপরে ইংরাজীতে টাইপ করা নরেন্দ্রনাথের নাম!

খামের গায়ে আঁটা রয়েছে ছয় পেনীর একটা ইউ. কে'র ডাকটিকিট।

একটু ভাল করে খামটা পরীক্ষা করতেই সুব্রতর মনে হলো ছয় পেনীর ষ্ট্যাম্পটার উপরে যে ডাকঘরের সীল পড়েছে সেটা এত ছোট যে, ষ্ট্যাম্পটার বাহিরে খামের গায়ে এতটুকু ছাপও পড়েনি। ব্যাপারটা সুব্রতর চোখে কেমন যেন একটু আশ্চর্যই লাগে।

খামটার ভিতরে একটা চিঠি ছিল সেটা টেনে বের করে চোখের সামনে মেলে ধরলো সুব্রত।

ইংরাজীতে টাইপ করা একটা চিঠি।

চিঠিটার বঙ্গানুবাদ করলে এই দাঁড়ায়।

Jhonson Smith & Co.
ABERDEEN

প্রিয় মহাশয়,

ফটো ফিল্ম ও ক্যামেরা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি একজন অত্যন্ত উৎসাহী জানিয়া, আমরা নতুন প্রথায় যে ফিল্ম তৈয়ারী করিয়াছি, সেই ফিল্ম একখানি পরীক্ষার জন্য পাঠাইলাম। দয়া করিয়া ফিল্মখানি ব্যবহার করিয়া তাহার ফলাফল জানাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব। পৃথক রেজিষ্টার্ড পার্শেলে ফিল্ময়ের একটি রোল পাঠানো হইল।

ভবদীয়—

ও. এন. স্মিথ

ম্যানেজার জনসন স্মিথ্ এণ্ড কোং

চিঠিখানা পড়ে আবার ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরে সুব্রত খাম এ অন্যান্য চিঠিগুলো পকেটে রেখে দিল।

ইতিমধ্যে অত্যাসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া সামার হাউসের অভ্যন্তরে চারিদিক অস্পষ্ট করে তুলেছিল।

সুব্রত হরিধনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, এ ঘরে আলোর কোন ব্যবস্থা আছে?

আজ্ঞে না। কি যে বলে, এ ঘরে তো ইলেকট্রিকের কোন কনেকশন নেই!

ও, তা একটা আলোর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না?

কি যে বলে, আজ্ঞে, একটা হ্যারিকেন বাতি আনিয়ে দিতে পারি। যদি বলেন, বাগানের মালীদের ঘরে আছে।

তাই ব্যবস্থা করুন তাহলে।

যে আজ্ঞে। ....

হরিধনবাবু আলোর ব্যবস্থা করবার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

খানিক পরেই হরিধনবাবু একটা প্রজ্জলিতা হ্যারিকেন বাতি হাতে সামার হাউসে এসে ঢুকলেন।

অতঃপর সেই হ্যারিকেনের আলোর সাহায্যে সুব্রত প্রথম অকুস্থানটা ভাল করে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখলো, তারপর মৃতদেহকে চিৎ করে দেখতে লাগলো। .....

মৃতের মৃত্যু শীতল শক্ত মুখখানার পেশীতে পেশীতে ও শেষ চিরস্থায়ী কুঞ্চনের মধ্যে যেন নিদারুণ একটা যাতনা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। ওষ্ঠ ঈষৎ দ্বিধাবিভক্ত। এবং সেই দ্বিধাবিভক্ত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে রক্ত মিশ্রিত খানিকটা গাঁজলা বের হয়ে এসেছে। মুখ ও ওষ্ঠ নীলাভ।

কপালে ও গালের একজায়গায় সামান্য একটু এব্রেশনের চিহ্ন ব্যতীত আর অন্য কোন আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেহের কোথায়ও দেখা গেল না।

প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় তীব্র কোন বিষের ক্রিয়া যেন মৃতদেহের মধ্যে চিহ্ন রেখে গিয়েছে। অর্থাৎ তীব্র কোন বিষেই ঘটেছে আকস্মিক মৃত্যু! সুব্রত এবার ধীরে ধীরে সুশীল সোমের মুখের দিকে তাকালো।

আপাততঃ আজ রাত্রের মত এখানে আর দেখবার কিছু নেই সুশীলবাবু! মৃতদেহ আপনি মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে ঘরটা যেন আণ্ডার লক এণ্ড কি থাকে।

তাই থাকবে।

চলুন।

বাড়ীর মধ্যে যেতে যেতে এক সময় সুব্রত ডাঃ সান্যালকেই প্রশ্ন করে, মৃত্যুর কারণ কি বলে আপনার মনে হয় ডাঃ সান্যাল?

আমার তো মনে হয় কোন পয়েজন।

তাই! মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় সুব্রত।

সকলে এসে আলোকিত পারলারে প্রবেশ করে সোফায় উপবেশন করল।

হরিধনবাবু, আপনাকেই সর্বাগ্রে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই! সুব্রত বলে।

হরিধন তাকালেন নিঃশব্দে সুব্রতর মুখের দিকে।

আচ্ছা, সর্বশেষ মিঃ ঘোষকে জীবিত দেখেছিল কে!

চাকর নরেশই!

হুঁ! আচ্ছা, মিঃ ঘোষের ছোট ভাই বিনয়েন্দ্রবাবুকে দেখছি না, তিনি কি সংবাদটা পাননি?

না এখনো দিইনি।

একটা সংবাদ পাঠানো উচিৎ ছিল। আচ্ছা একটা কথা, বাড়ীতে কি কোন মেয়েছেলে নেই?

আছেন, বাবুর এক বিধবা মাসতুতো বোন। তিনিই তো গত এক বছর ধরে ভিতর বাড়ীর সব কিছু দেখাশুনা করছেন। জবাব দিলেন হরিধন।

তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?

খবর দিচ্ছি।

হরিধন একজন ভৃত্যকে ডেকে নরেন্দ্রনাথের বিধবা মাসতুতো বোন বিমলাদেবীকে সংবাদ দিতে পাঠালেন।

মিনিট চার পাঁচের মধ্যেই বিমলাদেবী এসে পারলারে প্রবেশ করলেন। দেখলেই বোঝা যায়, বয়স খুব বেশী নয় ভদ্রমহিলার, ত্রিশের কোঠাও উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা সন্দেহ।

গাত্রবর্ণ ভদ্রমহিলার কালোই বলা উচিৎ। তবে চমৎকার দেহ-সৌষ্ঠবে দেহের ঐ কালো রঙটির যেন অপূর্ব এক সমন্বয় ঘটেছে! মাথায় যে পর্যাপ্ত কেশ আছে সল্প ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। একহারা ছিপছিপে দেহের গঠন। পরিধানে সাদা মিলের সরু কালো পাড় ধুতি। হাতে এক গাছি সোনার চুড়ি ছাড়া দেহে অন্য কোন আভরণ নেই।

বসুন, নমস্কার।

সুব্রতর আহ্বানে বিমলাদেবী চোখ তুলে বারেকের জন্য তাকালেন এবং সেই মুহূর্তের দৃষ্টিপাতেই বিমলাদেবীর দিকে তাকিয়ে মনে হয় সুব্রতর, চোখের পাতা দুটো ফুলোফুলো। বোধ হয় কাঁদছিলেন।

বসুন!

এবার বিমলাদেবী একটা খালি সোফার পরে বসলেন।

দেখুন, বুঝতে পারছি এখন আপনাকে আমাদের বিরক্ত করা উচিত নয়, কিন্তু অনোন্যপায় হয়েই আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে সে জন্য সত্যিই আমরা দুঃখিত বিমলাদেবী!

সুব্রতর কথায় বিমলা তার দিকে মুখ তুলে তাকালেন নিঃশব্দে।

কয়েকটা কথা জানবার জন্যই আপনাকে ডেকে আনিয়েছি! সুব্রত আবার বলে।

এবারে আর তাকালেন না বিমলাদেবী। মাথা নিচু করে পূর্ববৎ বসে রইলেন নিঃশব্দে।

বলছিলাম, সুব্রত এবারে সোজাসুজিই তার প্রশ্ন শুরু করে, আজ শেষ কখন আপনার সঙ্গে নরেনবাবুর দেখা হয়েছিল যদি বলেন!

সকাল সাড়ে সাতটায়! সকালবেলা স্নান সেরে ঘরে বসে চা খাচ্ছিলেন যখন।

একটা কথা, আপনার সঙ্গে সে সময় কি কথা হয়েছিল?

মাথা তুললেন আবার বিমলাদেবী। চোখের কোণে স্পষ্ট চিক্ চিক্ করছে অশ্রুর আভাষ, আলোয় দেখা গেল।

কথা হয়েছিল আপনাদের সে সময়? নিশ্চয়ই কোন।

হাঁ!

ঘরে সে সময় আর কেউ ছিল?

হাঁ, নির্মল ছিল!

নির্মল! চকিতে এবারে সুব্রত বিমলাদেবীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই ফিরে তাকালো অদূরে দণ্ডায়মান হরিধনবাবুর দিকে। এবং এবারে হরিধনবাবুকেই সম্বোধন করে সুব্রত বললে, তবে যে হরিধনবাবু আপনি একটু আগে বলেছিলেন দুদিন হবে ছুটিতে আছেন নির্মলবাবু?

আজ্ঞে, কি যে বলে আমি মানে কি যে বলে, তাইতো জানতাম স্যার। থতমত খেয়ে কোনমতে জবাব দেয় হরিধনবাবু।

সুব্রত আর হরিধনবাবুকে দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে পুনরায় ফিরে তাকালো বিমলাদেবীর মুখের দিকে। বললে, নির্মলবাবু দুদিনের ছুটিতে ছিলেন আপনি জানতেন বিমলাদেবী?

না। তবে গতকাল তাকে দেখিনি।

কিন্তু আজ সকালে নরেনবাবুর ঘরে তাকে দেখেছেন?

হাঁ।

আপনি যখন আজ সকালে নরেনবাবুর ঘরে যান তখন নির্মলবাবু কি করছিলেন?

কি সব ফটো ও ক্যামেরা সম্পর্কে নির্মল নরেনদাকে বোঝাচ্ছিল।

ফটো ক্যামেরা সম্পর্কে!

হাঁ! হাতে সে সময় একটা ছোট পার্শ্বেল ও একটা চিঠি ছিল। বলছিল বিলেত থেকে কি একটা নতুন ফিল্ম না কি এনেছে সেটা দিয়ে আজই ফটো তুলে দেখবার জন্য!

ও! তা নরেনবাবু কি জবাব দিলেন?

বললেন আজই ফটো তুলবেন।

নির্মলবাবুকে আপনার দাদা খুব ভালবাসতেন না?

হাঁ। নির্মলের কথা ছিল নরেনদার কাছে যেন বেদবাক্য।

আজ সকালে নির্মলবাবু কখন যান জানেন কিছু?

না, তা ঠিক বলতে পারি না। সংসার খরচের কিছু টাকার প্রয়োজন সেই কথাই বলতে গিয়েছিলাম। কথা বলেই আমি ঘর ছেড়ে চলে যাই। তবে—কি যেন বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ইতস্ততঃ করে থেমে গেলেন বিমলাদেবী।

কি যেন আপনি বলতে বলতে থেমে গেলেন? সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

না, মানে—নির্মলকে আমি—

বলুন? থামলেন কেন?

বেলা তখন দেড়টা কি পৌনে দুটো হবে, আমার ঘরের দোতলার জানালার সামনে আমি সে সময় দাঁড়িয়েছিলাম, দেখেছিলাম তাকে বাগানের সেই ঘরটা থেকে বের হয়ে যেতে—

নির্মলবাবুকে! ঠিক চিনতে পেরেছিলেন তাকে বিমলাদেবী? সুব্রত তীক্ষ্ণ স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

এই কয় বছর থেকে তাকে দেখছি এবাড়ীতে বলতে গেলে প্রায় সর্বক্ষণই। চিনতে পারবো না কেন? তাছাড়া দোতলার আমার ঘর থেকে নিজের বাগানের সেই ঘরটা তো খুব স্পষ্টই দেখা যায়।

হুঁ! নির্মলবাবুকে তাহলে দেড়টা কি পৌনে দুটোর সময় আন্দাজ আপনি বাগানের সামার হাউস থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছেন?

হাঁ, যেন একটু বেশ জোর পায়েই সে সেই ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল দেখলাম।

এবারে সুব্রত হরিধনবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, আপনারা তাহলে নির্মলবাবুকে আজ এ বাড়ীতে আসতে দেখেননি?

আজ্ঞে না। কি যে বলে, দেখলে বলবো না কেন বলুন?

চাকর-বাকররাও কেউ দেখেনি?

তা বলতে পারি না।

সুশীলবাবু, আপনি এবাড়ীর সকলের জবানবন্দী নিয়েছেন?

হাঁ—নিয়েছি!

দারোয়ানের?

হাঁ!

তাকে একবার আর চাকর-বাকরদের প্রত্যেককে আবার একবার জিজ্ঞাসা যদি করেন তারা আজ কেউ নির্মলবাবুকে দেখেছেন কিনা?

নিশ্চয়ই।

সুশীল সোম ঘর থেকে তখুনি বের হয়ে গেলেন।

বিমলাদেবী, আপনি এখনো শুনেছেন কিনা জানি-না, খুব সম্ভবত নরেনবাবুর মৃত্যু হয়েছে তীব্র কোন বিষের ক্রিয়ায়।

এ্যাঁ—একটা তীক্ষ্ণ আর্তস্বর যেন অস্ফুটে বের হয়ে এলো বিমলাদেবীর কণ্ঠ হতে।

হাঁ! তাঁকে তীব্র কোন বিষ প্রয়োগেই হত্যা করা হয়েছে!

বিষ! কি বলছেন এসব?

ময়না তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্যি সঠিক জানা যাবে না, তবে আমাদের ধারণা এই! সুব্রত জবাব দেয়।

বিষ! নরেনদাকে বিষ দিয়ে খুন করেছে। না, না—তা কি করে হবে। তাঁর মত লোককে কেউ বিষ দিতে পারে না। তাঁর তো কেউ শত্রু ছিল না। বিনুদা, যার সঙ্গে তাঁর পৃথগন্ন হয়ে গেল সেও যে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসত নরেনদাকে। ঝি চাকর-বাকর পর্যন্ত তাঁকে ভালবাসত যে তাঁর মিষ্টি ব্যবহারের জন্য। একটানা কথাগুলো বলে গেলেন যেন ঝোকের মাথায় উত্তেজনার মুখে বিমলাদেবী।

ঠিক ঐ সময় সুশীল সোম এসে আবার ঘরে ঢুকলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন সুশীলবাবু? সুব্রত প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ! কেউ দেখেনি আজ তাকে এবাড়ীতে আসতে।

দারোয়ানও না?

না।

সুব্রত এবার বিমলাদেবীর দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন বিমলাদেবী।

বিমলাদেবী ঘর থেকে চলে গেলেন।

সুব্রত অতঃপর বললে, নরেশ চাকরকে ডাকুন তো একবার এঘরে সুশীলবাবু।

চাকর-বাকরের দল সব যেন জুজুর ভয়ে জড়সড়ো হয়ে এবাড়ীতে পুলিশের পদার্পণ অবধি পারল্লারের বাইরে বারান্দার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল।

ডাকতেই নরেশ এসে ঘরে ঢুকলো।

বয়স চল্লিশের বেশী হবে না। হাড়গিল্লে প্যাটার্ণের চেহারা। তবে বড়লোকের বাড়ীর বিশেষ করে কর্তার খাস চাকর ছিল বলেই বোধহয় বেশভূষার একটা ছিমছাম ও ভব্যতা।

তোমার নাম নরেশ?

আজ্ঞে হুজুর। সভয়ে প্রশ্নকারী সুব্রতর দিকে মুখ তুলে তাকালো নরেশ।

কতদিন এবাড়ীতে চাকরি করছো?

তা হুজুর আট বছর হবে।

পুরোনো লোক তো তুমি তাহলে!

আজ্ঞে!

আচ্ছা নরেশ, বেলা আড়াইটা নাগাদ যখন তুমি চা নিয়ে যাও তখন তো দেখো যে তোমার বাবু জীবিত নেই তাই না?

আজ্ঞে!

তার আগে কখন গিয়েছিলে?

বারটায় একবার চা দিয়ে এসেছিলাম।

সে সময় মনে আছে তোমার বাবু কি করছিলেন?

বই পড়ছিলেন!

আজ তো রবিবার, ডাক মানে ডাকের চিঠি, আজ কখন এসেছিল আর কে সেগুলো বাবুকে পৌঁছে দেয়। তুমিই কি?

আজ্ঞে না তো! চিঠি তো এসেছে বিকেল চারটায়, সে সব চিঠিপত্র তো বাবুকে দেওয়াই হয়নি। তাছাড়া চিঠিপত্র সব বাবু সাধারণতঃ রাত্রে শোবার আগে দেখতেন, সেই সময়ই দেওয়ার অর্ডার ছিল।

ও! আচ্ছা তুমি যখন বারটার সময় চা দিতে যাও বাবুর সামনে বেঞ্চে কোন চিঠিপত্র দেখেছিলে?

আজ্ঞে না তো।

ঠিক মনে আছে তোমার?

আজ্ঞে, কোন চিঠিপত্র বাবুর সামনে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

নির্মলবাবুকে আজ কোন সময় এবাড়ীতে দেখেছো?

না।

আচ্ছা যাও!

এবার সুব্রত সুশীল সোমের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য নেই

আপাততঃ এবাড়ীর কাউকেই। আপনার যদি কিছু কাজ বাকী থাকে তো সেরে নিতে পারেন মিঃ সোম।

কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন সুব্রতবাবু? সুশীল সোম প্রশ্ন করে।

মিঃ ঘোষ বিষ প্রয়োগে নিহত হয়েছেন আপাততঃ এইটুকুই যা বুঝতে পারছি সুশীলবাবু, তার বেশী কিছু নয়। আচ্ছা আজকের মত এবারে আমি বিদায় নেবো। কাল সন্ধ্যার দিকে যাবোখন আপনার ওখানে।

সুব্রত অতঃপর বিদায় নিয়ে এসে তার অপেক্ষামান গাড়িতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিল।

॥ তিন ॥

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে সুব্রত কিরীটির বাড়ীতে গিয়ে দেখে কিরীটি তার দোতলার ষ্টাডিতে সোফার পরে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি একখানা বই পড়ছে ক্রিমিনোলজি সম্পর্কে। বৈকালের দিকে আজও এক পশলা বৃষ্টি ও ঝড় হয়ে গিয়েছে। বাতাসে একটা ঠাণ্ডার মৃদু আমেজ।

পদশব্দে মুখ না তুলেই কিরীটি মৃদু কণ্ঠে বললে, আয় সুব্রত, বোস।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে একটা সোফার পরে বসে পড়লো।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনাই চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে কিরীটিই হাতের বইটা মুড়ে কোলের উপর রেখে, সম্মুখে সোফার পরে উপবিষ্ট সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তারপর! মুখটা অমন গোমড়া করে রেখেছিস কেন?

আজকের সংবাদপত্রে ঘোষ নিবাসের মার্ডারের সংবাদটা পড়েছিস?

হ্যাঁ, দেখছিলাম বটে।.....আজ সকালে সুশীল সোমও এসেছিলেন।

সুশীল সোম!

হ্যাঁ! তাঁর মুখেই শুনলাম তোকে নাকি সে গতকাল ডেকেছিল!

হ্যাঁ। ব্যাপারটা বেশ একটু জটিল বলেই মনে হচ্ছে। পোষ্টমর্টম রিপোর্টেও পটাশিয়াম সায়ানাইড পাওয়া গেছে।

সুশীলও তাই বলে গেল। তা তোর কি মনে হচ্ছে?

সুব্রত কিরীটির সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললে, এই দেখ্ এগুলো কাল মৃতদেহের সামনে অকুস্থানে পাওয়া গেছে। বলতে বলতে সুব্রত একে একে তার পকেট থেকে এ্যালুমিনিয়াম কেসটা, কাগজের কভার কেসটা, ছোট কার্ড বোর্ডের পার্শ্বেল বাক্সটা, ফিল্ম স্পুলটা, পেনসিলটা ও ছুরিটা বের করে কিরীটির সামনে নামিয়ে রাখল। এবং অন্য পকেট থেকে সর্বশেষে দামী ছোট ক্যামেরাটাও বের করে রাখলো টেবিলের পরে।

কিরীটি প্রথমেই ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে হাতে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো, অত্যন্ত শক্তিশালী লেন্সযুক্ত দামী লাইকা ক্যামেরা। কিছুক্ষণ ধরে ক্যামেরাটা দেখে একপাশে সেটা নামিয়ে রেখে ফিল্ম স্পুলটা হাতে তুলে নিল।

ফিল্মটা দেখছি ডেভেলপ করেছিস? প্রিন্ট্ করেছিস?

হ্যাঁ! এই যে—সুব্রত পাঁচটা প্রিন্ট্ একটা খামের মধ্যে থেকে এগিয়ে দিল। প্রিন্ট্গুলোর পশ্চাতে ক্রমিক নং পেনসিলে লেখা। সাতটা ফিল্ম একেবারে এক্সপোজই করা হয়নি দেখা গেল। এক এক করে কিরীটি প্রিন্ট্গুলো দেখতে লাগলো।

প্রথম ছবিটা একটা গাছের প্রস্ফুটিত একটি ফুল সমেত, দ্বিতীয়টিও একটি টবের গাছের, তৃতীয়টি একটা মস্ত বড় ফোটা ডালিয়া ফুলের। চতুর্থও অন্য একটি ফার্ণ জাতীয় লতার এবং পঞ্চমটি একটি স্ত্রীলোকের। প্রথম চারটি প্রিন্ট্ বাঁ হাতের মধ্যে রেখে পঞ্চম প্রিন্ট্টি চোখের সামনে তুলে ধরলো কিরিটি।

বেঞ্চের ব্যাকে দু'হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। মাথার গুণ্ঠন খসে পড়েছে। অধরে একটা চাপা হাসির বিদ্যুৎস্ফুরণ!

হঠাৎ পাশ থেকে সুব্রতই বললে, বিমলাদেবী!

বিমলাদেবী! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে নামটা উচ্চারণ করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো কিরীটি সুব্রতর মুখের দিকে।

হাঁ! নরেন্দ্রনাথের আশ্রিতা বিধবা মাসতুতো বোন। বলে সংক্ষেপে বিমলাদেবী সম্পর্কে গতকাল যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিল বলে গেল।

হঠাৎ সুব্রতর কথা শেষ হলে কিরীটি প্রশ্ন করলো, তাহলে নির্মল চৌধুরীর কোন সংবাদ এখনো পাসনি?

না।

বিমলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিসনি, কোথায় তার যাওয়া সম্ভব বা কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যেতে পারে? কিরীটি আবার প্রশ্ন করে।

না। কিন্তু—

যাকগে। বলে এবারে হাত বাড়িয়ে ছুচালু করে কাটা পেনসিলটা তুলে নিয়ে বার দুই সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সামনের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চিঠিগুলো তুলে নিল। একটার পর একটা চিঠিগুলো পড়ে খামগুলো পরীক্ষা করে সাদা মুখ ছেঁড়া খামটা হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে বললে, এ চিঠিটা পোষ্টমার্ক নিয়ে একটা ছয় পেনির ফরেন ষ্ট্যাম্প্ আঁটা থাকলেও এটা কিন্তু ডাকে আসেনি বলেই আমার বিশ্বাস সুব্রত!

কি বলছিস কিরীটি!

হাঁ, ভাল করে টিকিটের উপর এর ডাকঘরের ছাপটা পরীক্ষা করলেই তোর ব্যাপারটা চোখে পড়বে। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার তোর নজরে পড়া উচিত ছিল।

কি!

ভারতবর্ষের কোন ডাকঘরেরই কোন ছাপ পড়েনি এ চিঠিটায়। এতো হতে পারে না। ভারতবর্ষে এসে ভারতের কোন ডাকঘরেরই ছাপ পড়বে না, ডাকঘরের আইনের এটা অন্তত বিপক্ষে।

সত্যিই তো ব্যাপারটা আমার নজরে পড়েনি।

তাহলে আমাদের বিমলাদেবী ও এই চিঠির কথা বাদ দিলে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষের হত্যার ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে?

কিন্তু নির্মল চৌধুরী? সুব্রত বাধা দিয়ে বলে।

হাঁ, তার কথাটাও অবশ্য মনে রাখতে হবে, বলে কিরীটি কিছুক্ষণের জন্য দুটি চক্ষু মুদ্রিত করে যেন কি ভাবে। তারপর আপন মনেই মৃদু কণ্ঠে একসময় বলতে শুরু করে ঃ সুস্থ, ধনী, সুখী, প্রতিপত্তিশালী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক—যার বাজারে কোন দেনা ছিল না, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেও কোন শত্রু ছিল বলে জানা যায় না। এবং একমাত্র ঐ বিধবা মাসতুতো ভগ্নী বিমলা দেবীর গৃহে উপস্থিতি ছাড়া বাকী সব গৃহে কর্মচারী ও মাইনে করা আশ্রিতের দল ছিল, তিনি নিহত হয়েছেন তীব্র বিষ পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্রিয়ায় তাঁরই বাগান বাড়ীর নির্জন সামার হাউসে। বেলা বারটা পর্যন্তও যে লোকটিকে জীবিতাবস্থায় তাঁর ভৃত্য নরেশ দেখেছে, বেলা আড়াইটার সময় তাঁকে দেখা গেল মৃতাবস্থায় মেঝের উপর পড়ে থাকতে ঐ সামার হাউসেই।

সুব্রত হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না, বেলা দেড়টা থেকে পৌনে দুইটার মধ্যে নির্মল চৌধুরীকে বাগানের সামার হাউস থেকে বের হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

কিরীটি এবারে সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু কণ্ঠে বললে, না ভুলিনি, আর তাকে বের হয়ে যেতে দেখেছেন তোমার বিমলাদেবী! যাহোক শ্রীমতী বিমলাদেবীর কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, একমাত্র ঐ নির্মল চৌধুরী একবার ও ভৃত্য নরেশ বেলা বারটার পর মাত্র একবারই সেখানে প্রবেশ করেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি।

নির্মল চৌধুরীর ব্যাপারটা তুই যেন অত্যন্ত হাল্কাভাবেই নিচ্ছিস বলে মনে হচ্ছে কিরীটি!

হালকাভাবে, আদপেই না। rather he is the most important clue এই হত্যার ব্যাপারে—বলে একটা সিগার পাশের চামড়ার বাক্সটা থেকে তুলে নিয়ে সেটায় অগ্নি সংযোগ করে, গোটা দুই টান দিয়ে কিরীটি আবার তার বক্তব্য শুরু করে, তোকে তো কতবার বলেছি সুব্রত আর তুই প্রমাণও পেয়েছিস, এ ধরনের মৃত্যু সর্বক্ষেত্রেই পশ্চাতে তার পথ-রেখা এঁকে দিয়ে যায় বা কোন না কোন চিহ্ন রেখে দিয়ে যায়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুনী তো দেখা যাচ্ছে কোন রকম চিহ্নই রেখে যায়নি। সুব্রত বলে।

একেবারে রেখে যায়নি বলতে পারিস না।

মানে?

বিমলাদেবী, তার আশপাশেই ভাল করে তোর নজর দিয়ে দেখতে হবে। আর সেই সঙ্গে এ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির সাইকোলজি তোকে জানতে হবে।

সাইকোলজি?

হ্যাঁ, এই হত্যার মূলে পৌঁছাতে হলে তোকে অনেক কিছুই ভাবতে হবে। প্রথমতঃ নরেন্দ্রনাথ সত্যি সত্যিই নিহত হয়েছেন, না তাঁর মৃত্যুটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা বা এ্যাকসিডেন্ট্ মাত্র, না দুটোর একটাও না, তিনি আত্মহত্যা'ই করেছেন।

কিন্তু—

বাধা দিয়ে এবারে কিরীটি বলে, ব্যাপারটা অবশ্যই আত্মহত্যা নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁর ব্যবসা যথেষ্ট ভাল ভাবেই চলছিল, কেউ তাঁর শত্রু ছিল না বলেই আমরা জেনেছি—যার ফলে তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই not a case of suicide! Next we come to accident—কোন কারণে ভুলে যদি তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড্ খেয়ে থাকেন। কিন্তু এই পেনসিলটার দিকে চেয়ে দেখ। যে লোক এমন sharp করে পেনসিলের ডগা বানাতে পারেন তাঁর প্রকৃতি যে খুব অন্যমনস্ক নয় সহজেই আমরা ভেবে নিতে পারি। তাছাড়া অত বড় একটা বিজনেস যিনি অমন সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারেন তিনি অন্যমনস্ক প্রকৃতির হবেন ভাবাটাও something ridiculous নয় কি? অতএব দুর্ঘটনা বা accident ও আত্মহত্যা নয় যখন সেক্ষেত্রে বাকী থাকলো হত্যা! অর্থাৎ তিনি কারো দ্বারা নিহত হয়েছেন বা কেউ তাঁকে হত্যা করেছে। এবং এও আমরা Post mortem report-এ যে পাচ্ছি মৃত্যুর কারণ পটাসিয়াম সায়ানাইড্। কিন্তু এমন কোন সূত্র মৃতদেহ পরীক্ষা করে বা অকুস্থান থেকে পাচ্ছি না যা থেকে প্রমাণ হতে পারে যে তাঁকে কেউ জোর জবরদস্তি করে বিষপ্রয়োগ করেছে। বরং অকুস্থানে এবং মৃতদেহে কোনরূপ struggle-এর চিহ্ন না থাকায় এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিমান rather I should say চতুর কোন লোক অত্যন্ত tractfully পটাসিয়াম সায়ানাইড্ বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেছে। এবং খুব সম্ভবত the man behind হত্যার ঠিক সময়টিতে victim-এর ধারে কাছে তো ছিলই না বরং was at a long distance away.

কিরীটির শেষের কথায় নিঃশব্দে মৃদু হেসে সামনের টেবিলের পরে রক্ষিত ফিল্মের এ্যালুমিনিয়ামের শূন্য কেসটা হাতে তুলে নিয়ে তার গায়ের adhesive rape-টা সরু পেনসিলটার ডগার সাহায্যে সামান্য একটু তুলে কণ্ঠস্বরে একটু যেন রহস্য মিশিয়ে বললে, আচ্ছা এই কেসের গায়ে এই adhesive tape-টা সম্পর্কে কিছু মনে হয় তোর?

ঐ টেপ্‌টা?

হ্যাঁ!

কি আবার মনে হবে! Is there anything abnormal?

আচ্ছা নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি বিশেষদের কথা ছেড়ে দিলে স্বভাবত আমাদের দৃষ্টি আর কোন্ কোন্ বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হতে পারে বলে তোর মনে হয়?

কেন ঐ চিঠিপত্র, ফিল্মের প্রিন্ট্—

বেশ—চিঠির কথাই যদি ধরা যায় তো দেখা যাচ্ছে স্মিথ কোম্পানীর ঐ চিঠিটির সঙ্গে ঐ প্রিন্টের নেগেটিভের একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জনসন স্মিথ এন্ড কোম্পানীর চিঠিতে অনুরোধ জানাচ্ছে নরেন্দ্রনাথকে, একটা ফিল্মের স্পেসিমেন পাঠিয়ে ফটো তুলে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য যার বিশেষ হবি হচ্ছে ছবি তোলা। এবং ঐ খালি এ্যালুমিনিয়ম কেসটা যখন অকুস্থানে পাওয়া গেছে, সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে common sense-এর সাহায্যে যে, নেগেটিভ্ ফিল্ম রোলটা ঐ কেসের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছিল—কেমন কিনা?

তা হতে পারে। মৃদু কণ্ঠে সুব্রত জবাব দেয়।

শুধু ঐ এ্যালুমিনিয়াম কেস ও তার গায়ে adhesive tape-টাই নয়, ফিল্মটা exposed হবার পর develope-এর আগে ফিল্মটাকে রোল করে যাতে সেটা কোন রকমে আলোর সংস্পর্শে না আসে সেজন্য ফিল্ম রোলের সঙ্গে সঙ্গে যে কালো রংয়ের কাগজটা জড়ানো থাকে তার শেষ প্রান্তে এবং কাগজের অংশে যে শুকনো আঠা লাগানো থাকে, যেটা সাধারণত exposed ফিল্মকে

রোল করে আমরা জলে ভিজিয়ে বা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুখের থুতুর সাহায্যেই ভিজিয়ে এঁটে দিই, সেই আঠা লাগানো অংশটা সেটাও চাই আমাদের।

ডেভালাপ তো আমি নিজেই করেছি, সে কাগজটা আছে। এনে দেবোখন।

আরো একটা সংবাদ চাই।

কি?

এ্যাবার্ডিনে Jhonson Smith & Co. নামে ইউরোপের কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, আর থাকলে তারা এ ধরনের চিঠি নরেন্দ্রনাথকে লিখেছিল কিনা!

বেশ। আর কিছু?

আপাততঃ আর কিছু নয়। অবিশ্যি ইতিমধ্যে যদি নির্মল চৌধুরীর কোন সংবাদ পাস তো—

পাবো বলে মনে হচ্ছে না।

কেন? লোকটা উবে গেছে নাকি!

প্রায় তাই!

কি রকম?

টালায় ইন্দ্রবিশ্বাস রোডে তার এক মাসীর কাছেই নির্মল থাকতো কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম গতকাল ভোরবেলা সেই যে সে বাড়ী থেকে বের হয়ে এসেছে আর সে ফেরেনি আজ বিকাল পর্যন্তও। তবে একজনকে সে বাড়ীর প্রহরায় রাখা হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। কোন রকম সংবাদ থাকলে পেতে দেরি হবে না।

॥ চার ॥

সত্যিই নির্মল চৌধুরীর সংবাদ পেতে খুব বেশী দেরি হলো না সুব্রতর। এবং শুধু সংবাদই নয় তার সেই সংবাদের সঙ্গে এলো আরো এক অভাবিত মৃত্যু সংবাদ। নরেন্দ্রনাথের অফিসের ম্যানেজার শ্রীনাথ করের মৃত্যু সংবাদ।

একটানা চলতে চলতে যেখানে মসৃণ মেটাল বাঁধানো ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডটা হঠাৎ বাঁদিকে একটা বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের দিকে, সেই সংযোগ স্থল থেকে কিছুটা এগিয়ে রাস্তার ডান দিকে পরের দিন সকালে আবিষ্কৃত হলো স্যুট পরিহিত রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ নরেন্দ্রনাথের অফিস ম্যানেজার শ্রীনাথ করের মৃতদেহটা ও তারই পাশে অজ্ঞান অচৈতন্য নির্মল চৌধুরীকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এবং তার পাশে পড়েছিল একটি ছয় চেম্বারের ওয়েভারলী রিভলভার। ব্যাপারটা অবিশ্যি কিছুটা আকস্মিক ভাবেই আবিষ্কার করেছিল পানিহাটি থানার একজন এ. এস. আই, শেষ রাত্রের দিকে পুলিশ ট্রাকে করে ঐ পথে একটা তদন্ত সেরে ফিরবার সময়।

সকাল নয়টা নাগাদ সুশীল সোমের কাছ থেকে টেলিফোনে সংবাদটি পেয়েই সুব্রত পানিহাটি থানায় চলে যায়।

মৃতদেহ এক পাশে থানার বারান্দায় ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে।

নির্মল চৌধুরীরও জ্ঞান ফিরে এসেছে তখন।

রুক্ষ এলোমেলো চুল, জামা কাপড়ে কাদা ও রক্তের দাগ। পায়ে কাবুলী সান্ডেল। পরিধানে ধুতি ও পাঞ্জাবী! বসে আছেন একটা চেয়ারের উপরে নিঃশব্দে মাথা নিচু করে নির্মল চৌধুরী। ঘরে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত নির্মল চৌধুরীর দিকে চেয়ে সুব্রত হাত বাড়িয়ে সামনের টেবিলের পর থেকে প্রথমেই অকুস্থানে যে রিভলবারটা পাওয়া গিয়েছে সেটা তুলে পরীক্ষা করে দেখলে সন্তর্পণে পকেট থেকে রুমাল বের করে সেটার সাহায্যে। পাঁচটা চেম্বারে তখনো গুলি ভর্তি। একটি মাত্র গুলিই ছোড়া হয়েছে। রিভলবারের বাঁটে N.G. ইংরাজী অক্ষর দুটি খোদাই করা। রিভলবারটা পরীক্ষান্তে সন্তর্পণে একপাশে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সুব্রত দ্বিতীয়বার তাকালো নির্মল চৌধুরীর দিকে।

বয়স ছাব্বিশ সাতাশের বেশী হবে না। বলিষ্ঠ দোহারা দেহের গঠন। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান। প্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত ললাট! তীক্ষ্ণ নাসা,

দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ ও ধারালো চিবুক। নির্মল চৌধুরীর পূর্বের চেহারার কোন অদলবদল হয়নি মনে হলো সুব্রতর।

নির্মলবাবু!

সুব্রতর ডাকে নির্মল চৌধুরী এবারে মুখ তুলে তাকালো।

আমাকে চিনতে পারছেন?

সুব্রতর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো ভদ্রলোক।

চিনতে পারছেন না!

না।

আমার নাম সুব্রত রায়। মিঃ ঘোষ, মানে আপনার মনিবের অফিস সংক্রান্ত একটা কেসের ব্যাপারে কয়েক দিন তাঁর অফিসে আর বাড়িতে বছর দুই আগে যাতায়াত করেছিলাম। মনে পড়ছে?

মুহূর্ত কাল কি ভেবে নির্মল বলে, হ্যাঁ! মনে পড়েছে।

পরশু সকালে আপনি শুনেছি বাড়ী থেকে বের হয়ে যান তারপর গতকাল রাত দশটা পর্য্যন্তই আপনি বাড়ীতে ফেরেননি। কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রত্যুত্তরে নির্মল চৌধুরী মাথা নিচু করলো, কোন সাড়াশব্দই আর পাওয়া গেল না।

নির্মলবাবু!

জানি না।

জানেন না?

না।

ঐ পরশু সকাল থেকে কাল রাত পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন জানেন না?

না, কারণ পরশু সকালে খুব ভোরে এক ভদ্রলোকের ডাকাডাকিতে নিচে এসে দেখি শ্রীনাথবাবু অফিসের গাড়ি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, মিঃ ঘোষ নাকি কি এক জরুরী কাজের জন্য এখুনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই যেতে হবে।

তারপর?

মাঝে মাঝে হঠাৎ অমনি করে মিঃ ঘোষ আমাকে ডেকে পাঠাতেন, তাই তাড়াতাড়ি গায়ে একটা জামা দিয়ে মাসীকে কোন কিছু না বলেই আমি সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠি—বলতে বলতে নির্মল চৌধুরী থামল।

থামলেন কেন, বলুন তারপর?

তারপর আর আমিই নিজে কিছু জানি না।

মানে?

গাড়িতে উঠবার পর গাড়ি ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটার মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো —তারপর ধীরে ধীরে কেমন যেন সর্বাঙ্গ আমার অবশ অনড় হয়ে গেল!

অবশ অনড় হয়ে গেল!

হ্যাঁ। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। জ্ঞান হবার পর দেখছি এই থানায় আমি।

হুঁ। আপনি বলছেন তাহলে কেউ আপনাকে এ কয় ঘণ্টা অজ্ঞান করেই রেখেছিল।

এখন মনে হচ্ছে তাই!

কিন্তু কেউ আপনাকে অজ্ঞান করলো গাড়ির মধ্যে অথচ আপনি সেটা টের পেলেন না কিছুই?

না তবে—

তবে কি!

গাড়ির সীটে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই এখন মনে হচ্ছে কি যেন আমার গায়ে ছুঁচের মত ফুটেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝবার আগেই ধীরে ধীরে এমন অসাড় অনড় হয়ে গেলাম যে কিছু বলবার বা করবার কোন ক্ষমতা হয়নি। ব্যাপারটা আগাগোড়াই এখনো আমার একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে যে—আবার থামলো নির্মল চৌধুরী।

মোট কথা ঐটুকু ছাড়া নির্মল চৌধুরীর জবানবন্দী থেকে আর বিশেষ কোন সংবাদই সংগ্রহ করা গেল না।

অতঃপর সুব্রত মৃতদেহ পরীক্ষা করলো। নির্মল চৌধুরীই মৃতদেহ সনাক্ত করে বলেছিল সে শ্রীনাথ কর, নরেন্দ্রনাথের অফিসের ম্যানেজার। লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রোগাটে, দড়ির মত পাকানো চেহারা। পরিধানে কালো ট্রপিক্যাল দামী স্যুট্। পায়ে ক্রেপসোলের কালো জুতা। বুকের বাঁ দিকে তাকে গুলি করা হয়েছে। এবং সেই গুলিতেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

পানিহাটি থানার ইনচার্জ ও সুশীল সোম দুজনাই বললেন, নির্মল চৌধুরীর আগাগোড়াই সব ধাপ্পা, মিথ্যা। আসলে সেই নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করের হত্যাকারী! এবং সেই সন্দেহেই নির্মল চৌধুরী বিচার সাপেক্ষ হিসাবে হাজতে প্রেরিত হলো।

সুব্রতও বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করলো না।

কারণ ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে ও বিচারবুদ্ধিতে সুব্রতর মন যেন কেন নির্মল চৌধুরীর সমস্ত উক্তি একেবারে সুশীল সোম ও পানিহাটির থানা ইনচার্জের মত এক কথায় নাকচ করে দিতে পারেনি। থানা অফিসারদ্বয়ের নির্মল চৌধুরীকে অপরাধী ভাববার আরও একটি জোরালো evidence স্বপক্ষে ছিল। প্রথমতঃ মৃতদেহের পাশে যে ছয় চেম্বারের ওয়েভারলী রিভলবারটি পাওয়া গিয়েছিল এবং যার বাঁটে N.G. ইংরাজী অক্ষর দু'টি খোদাই করা ছিল, প্রমাণিত হয়েছিল সেটা নরেন্দ্রনাথেরই নিজস্ব আগ্নেয়াস্ত্র, এবং সেটা তার শয়ন ঘরে আল্মারীর ড্রয়ারের মধ্যেই থাকতো। কাজ, কর্মের ব্যাপারে নির্মল চৌধুরীর সর্বদাই সে ঘরে যাতায়াত ছিল। অতএব তার পক্ষে কোন এক সময় নরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতে আগ্নেয়াস্ত্রটি চুরি করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিমলাদেবীর জবানবন্দী থেকে জানা যায়, নির্মল চৌধুরী নরেন্দ্রনাথের হত্যার দিন সকালে ও দ্বিপ্রহরে দুইবার অন্যের অলক্ষে ঘোষ নিবাসে গিয়েছিল। যদিচ নির্মল চৌধুরী ব্যাপারটা সম্পূর্ণই অস্বীকার করেছে। তার জবানবন্দী অনুসারে সে ঐ সময়টা কোন তীব্র ঔষধের প্রভাবে নাকি অজ্ঞান হয়ে ছিল। তৃতীয়তঃ আগ্নেয়াস্ত্রটার গায়ে যে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে সেটা নির্মল চৌধুরীরই। চতুর্থতঃ নরেন্দ্রনাথের অফিসের কাগজপত্র রেকর্ড থেকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, কোন কারণে নির্মল চৌধুরীর পরে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত বা ডিসচার্জ করবেন বলে নাকি নরেন্দ্রনাথ মনস্থ করেছিলেন। অফিসের রেকর্ডের কথা নির্মল চৌধুরীকে বলায় সেও সে কথা স্বীকার করেছে। বলেছে, হাঁ, কোন একটা ব্যাপারে মতদ্বৈধ হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ তাকে ডিসচার্জ করবেন চাকরি থেকে কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলেন কয়েকদিন আগেই। তবে ডিসচার্জ লেটার তখনো সে পাইনি। ডিসচার্জের কারণ জিজ্ঞাসা করায় নির্মল চৌধুরী বলেছে, সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই সে সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলতে নির্মল চৌধুরী সম্মত নয়। কাজে কাজেই এর পর নির্দোর্ষিতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্মল চৌধুরীকে পুলিশ আইনের দিক থেকে ছেড়ে দিতে পারে না।

সুব্রত তাই সেদিন দ্বিপ্রহরে এসেছিল হাজতে নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যদি আর নতুন কিছু জানতে পারে।

কিন্তু নির্মল চৌধুরীর সেই এক কথা, যা সে আজ পর্যন্ত পুলিশের কাছে বলেছে তার বেশী আর কিছুই তার বক্তব্য নেই! সে জানেও না।

এমন সময় হাজত কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন ইন্সেপেক্টার মন্মথ সান্ন্যাল।

মিঃ চৌধুরী, আপনার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো নির্মল সান্ন্যালের দিকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, কে, মাসীমা?

না। আপনার মাসীমা নন! অল্প বয়েস, বললেন তাঁর নাম করবী ঘোষ।

কে! করবী! মুহূর্তের জন্য চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেই পরক্ষণে ম্লান হয়ে যায়। অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলে, তাকে যেতে বলুন! .....

যেতে বলবো, দেখা করবেন না।

না।

কিন্তু তিনি যখন এসেছেন এতদূর—একবার দেখা না হয় করলেনই নির্মলবাবু। কথাটা এবারে বললো সুব্রত। তারপর সান্ন্যালের দিকে ফিরে তাকিয়ে নির্মলের সম্মতির কোন অপেক্ষা না রেখেই

বললে, যান মিঃ সান্ন্যাল তাকে এঘরে পাঠিয়ে দিন।

সান্ন্যাল চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সুব্রত হাত বাড়িয়ে ঘরের বিদ্যুৎবাতিটা জ্বেলে দিল।

মিনিট কয়েক পরেই দরজার গোড়ায় পদশব্দ শোনা গেল। নির্মল চৌধুরী নিঝুম হয়ে দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে লোহার খাটটার উপরে যেমন বসেছিল তেমনিই বসে রইলো। তাকালোও না।

একুশ বাইশ বছরের একটি তরুণী ঘরে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ করলো। দোহারা চেহারা। গায়ের রঙ রীতিমত গৌর বললেও অত্যুক্তি হয় না। নাকটা একটু চাপা, পাতলা ওষ্ঠ। সমস্ত মুখখানি ব্যেপে একটা করুণ বিষণ্ণ ভাব থাকলেও চোখ-মুখের বুদ্ধির প্রাখর্যটা চোখে পড়ে প্রথম দৃষ্টিতেই। হাতে একগাছি করে কঙ্কণ ব্যতীত অন্য কোন অলঙ্কারই নেই। পরিধানে সাধারণ গেরুয়া রঙের শাড়ী ও সাদা চিকণের ব্লাউজ। পায়ে সাধারণ একটি চপ্পল।

সুব্রত ধীরে ধীরে ঐসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কিন্তু বের হয়ে গেলেও দূরে গেল না। দরজার পাশেই নিঃশব্দে নিজেকে আড়াল করে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো।

করবী দেখছিল নির্নিমেষে তার সম্মুখেই খাটের উপরে উপবিষ্ট নির্মল চৌধুরীকে।

একি চেহারা হয়েছে নির্মলের এই কয়দিনেই!

মাত্র সাতদিন আগেও তো দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে!

করবীর চোখের কোল দুটি আপনা থেকেই যেন ছল ছল করে ওঠে অবাধ্য অশ্রুতে। মৃদু—অতি মৃদু কণ্ঠে ডাকে, নির্মল!

নির্মল সাড়া দেয় না, মুখও তোলে না।

করবী আর একটু কাছে এগিয়ে এসে আবার ডাকে, নির্মল!

তবু সাড়া নেই।

কথাও বলবে না আমার সঙ্গে নির্মল?

রক্তের মত লাল চোখের দৃষ্টি তুলে এবারে তাকালো নির্মল করবীর দিকে।

কি দেখতে এসেছো রুবি, খুনী আসামী নির্মল চৌধুরীকে!

নির্মল! আর্ত অস্ফুট একটা চিৎকার যেন বের হয়ে আসে করবীর কণ্ঠ থেকে।

হ্যাঁ, সবাই যখন আজ আমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলছে, আমি খুনী মিঃ ঘোষ ও শ্রীনাথবাবুর হত্যাকারী, তখন তুমিই বা বাদ যাবে কেন!

চুপ করো, চুপ করো!

চুপ করবোই বা কেন! সবাই যদি আজ আমাকে খুনী বলে বিশ্বাস করতে পারে তুমিই বা পারবে না কেন!

না, তবু আমি বিশ্বাস করবো না।

তবু বিশ্বাস করবে না! কিন্তু কতদিন তোমার এ মনের জোর রাখতে পারবে রুবি! একদিন তোমাকেও বিশ্বাস হারাতে হবে।

তুমি চুপ করবে, না এখান থেকে চলে যাবো?

চলে তো যাবেই। খুনী আসামী —

নির্মল! আর্ত অস্ফুট কণ্ঠে করবী নির্মল চৌধুরীকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু নির্মল চৌধুরী যেন শুনেও শোনে না। বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও যাও, এখানে আর থেকো না। তোমার বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে, হাজতে তুমি একজন খুনী আসামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছো, তিনিও তোমাকে ক্ষমা করবেন না। যাও —

চোখে জল এসে গিয়েছিল করবীর। অতি কষ্টে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে এবার, আমি তোমার কি করেছি, যে আজ সেই থেকে কেবলই তুমি আমাকে এখানে আসা অবধি আঘাতই করছো?

আঘাত! না রুবি, আঘাত তোমাকে আমি করিনি, পাছে আমার আজকের এ কলঙ্ক তোমাকে- -তোমার পরিচয়কে মলিন করে ফেলে শুধু সেই— সেইজন্যেই—

কিন্তু তা নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আজ এমনি করে ভেঙ্গে পড়েছো যে—

ভেঙ্গে পড়েছি!

হ্যাঁ, পড়েছো। কিন্তু এমনি করে যদি সামান্য একটা মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে ভেঙে পড়ো—

জানিনা ভেঙে পড়েছি কিনা। কিন্তু তোমাকে বোঝাতে পারবো না, আর তুমি বুঝবেও না আজকের আমার এ অবস্থা! যদি বুঝতে—তারপর একটু থেমে আবার নির্মল বলে, যাক্—কিন্তু এখানে আর তুমি থেকো না রুবি। যাও, এখান থেকে যাও।

এমন সময় একজন জেল অফিসার দ্বারের ওপাশে এসে দাঁড়াল। করবীর দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, সময় হয়ে গেছে করবীদেবী।

হ্যাঁ চলুন। আমি তাহলে যাই নির্মল?

নির্মল কোন জবাব দিল না করবীর কথায়, এমন কি চোখ তুলে তাকালও না। করবী একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে মন্থর পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল কোনমতে উদ্গত অশ্রুকে চাপতে চাপতে।

।। পাঁচ ।।

বরাহনগরের বাজার ছাড়িয়ে বাঁয়ে যে রাস্তাটা গঙ্গার ধার বরাবর চলে গিয়েছে, বলতে গেলে সেই রাস্তারই গায়ে গঙ্গার একেবারে কোল ঘেঁষে পুরোনো দিনের সাবেকী প্যাটার্ণের একটা দোতলা বাড়ী। বাড়ীটার দুটি অংশ। সামনে একটি অংশ তারপর একটি বাঁধানো উঠান তারপর আর একটি অংশ পশ্চাৎভাগে।

সামনের অংশটায় ছোটবড় খান আষ্টেক ঘর। সেই ঘরগুলোর মধ্যে এসে ভিড় করেছে নানা ভাষাভাষী নানা জাতের জন পনের-ষোল পুরুষ ও নারী নানা বয়েসের। তাদেব মধ্যে দু একজন স্বামী-স্ত্রীও আছে। কেউ এপারের তেলকলে বা পাটকলে কুলী কামিনের কাজ করে, কারো বাজারে ছোটখাটো ব্যবসাও আছে। আবার সম্পূর্ণ বেকারও দুচারজন যে না আছে তা নয় ঐ দলের মধ্যে।

ভিতরের অংশে একতলা ও দোতলায় খান সাতেক ঘর। একতলায় দুখানা ঘর ও উপরের দক্ষিণ প্রান্তের ছোট ঘরটা ভাড়া নিয়েছেন অনিমেষ হালদার নামে এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চেহারাটা রোগাটে ঢ্যাঙ্গা। ডান পাটা ভদ্রলোকের ডিফেকটিভ, চলার সময় দেখা যায় ডান পাটা সামান্য টেনে টেনে চলেছেন। মাথার চুল কদমছাঁট করা। মুখ ভর্তি বসন্তের কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। একটা চোখ কানা বলে সর্বদা চোখে একটা নীল কাচের চশমা ব্যবহার করে থাকেন। উপরের তলায় যে ঘরটিতে ভদ্রলোক বাস করেন ও নীচের তলায় যে দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছেন তিনটি ঘরেরই আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল।

তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা করবীদের সঙ্গে। কারণ ঐ অংশেরই একতলার একখানি ঘর ও দোতালার দুখানি ঘর নিয়ে থাকেন করবীর বাবা রমেনবাবু ও তাঁর একমাত্র মেয়ে করবী। রমেনবাবু কলকাতার একটা মার্চেন্ট অফিসে সামান্য মাইনের কেরাণী। করবী নিজেও বি-এ পাশ করে দক্ষিণেশ্বরের এক স্কুলে টিচারি করে।

অনিমেষ হালদার ঐ বাড়ীতে থাকলেও মাসে অন্তত দু'চারবার পাঁচ ছয় দিনের জন্য কোথায় যে যান তিনিই জানেন। এবং তিনি কি কাজ করেন ও তাঁর অর্থাগমের পথটা যে কি তা করবীর জানা নেই। ঐ বাড়ীতে করবীরা বছর খানেক হবে মাত্র এসেছে। তার আগে কলকাতাতেই ছিল। করবী যতদূর জানে ঐ বাড়ীর সমস্ত অংশটাই অনিমেষবাবুরই ভাড়া নেওয়া ছিল, তিনিই রমেনবাবুকে সাবলেট্ করেছেন তিনখানা ঘব। কিন্তু কি সূত্রে যে এবং কখন যে রমেনবাবুর সঙ্গে অনিমেষবাবুর পরিচয় ঘটেছিল করবী তা জানেনা বা বাবাকেও সে সম্পর্কে কখনো কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি।

করবীদের সংসারে সে, তার বাবা রমেনবাবু এবং ভৃত্য ও রাঁধুনী কম-বাইণ্ডহ্যাণ্ড অনেকদিনের পুরানো লোক রাজেন্দ্র। এক বাড়ীতে দীর্ঘ এক বৎসর থাকার দরুণ অনিমেষ হালদারের সঙ্গে করবীর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু সেটা ঐ পরিচয়ই, তার বেশী কিছু নয়। কারণ করবীর মতো অনিমেষ হালদার লোকটিও স্বল্পবাক এবং একান্তভাবেই নির্জনতা-প্রিয়। কারো সঙ্গেই তিনি বড় একটা মেলামেশা করেন না। বাড়ীতে যে সময়টা থাকেন তাঁর নিজের ঘরেই থাকেন দোতলায় ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে।

ক্লান্ত শরীর ও বিষণ্ণ মন নিয়ে করবী বরাহনগরের বাড়ীতে সেদিন যখন ফিরে এলো রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে। বাড়ীর মধ্যের উঠানের পাশ দিয়ে সরু প্যাসেজটা পার হয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়িটার আধাআধি আসতেই ওর কানে এলো বেহালার সুর। এ-বাড়ীতে বেহালার সুর

যে কোথা থেকে আসছে তা করবীর অজানা নয়। নিজের ঘরে নির্জনে বসে অনিমেষবাবুই বেহালা বাজাচ্ছেন। গত তিনদিন অনিমেষবাবুই ছিলেন না। বেহালার সুর শুনে বুঝতে পারে করবী তিনি ফিরেছেন। কি জানি কি ভেবে করবী সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বারান্দাটা অতিক্রম করে সোজা একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে অনিমেষের ঘরের ভেজানো দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বেহালার সুরটা এখন আরো স্পষ্ট শোনা যায়। মুহূর্তকাল ভেজানো দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে করবী কি যেন ভাবলো, তারপর ভেজানো দরজার কবাটের গায়ে মৃদু টোকা দিল পর পর দুটি।

সঙ্গে সঙ্গে বেহালার সুর থেমে গেল। ভিতর থেকে পুরুষ-কণ্ঠে সাড়া এলো, কে?

মৃদু কণ্ঠে করবী জবাব দেয়, আমি!

আসুন, ভিতরে আসুন করবীদেবী।

ঈষৎ ঠেলা দিতেই ভেজানো দরজার কবাট দুটো খুলে গেল আর নাকে এসে ঝাপটা দিলে রজনীগন্ধার এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ। নিঃশব্দ পায়ে করবী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। অত্যন্ত মৃদু অস্পষ্ট একটা নীল সেডে ঢাকা কম শক্তির বিদ্যুৎবাতির আলোয় ঘরটা যেন থম থম করছে। ঘরের মধ্যে সব কিছু দেখা গেলেও খুব স্পষ্ট দেখা যায় না।

গঙ্গার দিককার খোলা জানালাটার সামনে বেহালা হাতে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনিমেষ। ওর পদশব্দে ফিরে দাঁড়িয়ে হাতের বেহালাটা পাশের টেবিলের একপাশে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখলেন।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র সামান্য হলেও তার সবকিছুর মধ্যে একটা সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় আছে। এক পাশে একটি সিংগিল খাট, শয্যাটি একটি দামী সবুজ বেডকভারে ঢাকা, তার পাশে একটি কাচের বুক সেল্‌ফ। সেল্‌ফের উপরে একটি ধ্যানস্থ বুদ্ধ মূর্তি। তার পাশে চমৎকার একটি গোল কাচের ভাসে এক থোকা সদ্য প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধা। ঘরের অন্যদিকে একটি স্টিলের মাঝারী আকারের আলমারি, তার পাশে একটি রাইটিং টেবিল ও রিভলভিং চেয়ার। ঘরের মাঝামাঝি ছোট একটি গোল টেবিল ও দুখানি চেয়ার। একটি আরাম চেয়ার অন্যটি সাধারণ স্টিলের চেয়ার। এক পাশে কাঠের স্ট্যাণ্ডে জলের কুঁজো। পাশে একটি কাচের গ্লাস। ঘরের মেঝেতে অত্যন্ত দামী পুরু ইজিপসিয়ান কার্পেট বিছানো। ঘরের দেওয়ালে একটি দেওয়ালপঞ্জী ও একটি বড় আর্শি। সিলিং থেকে ঝুলছে একটি ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখা ও একটি কমশক্তির নীল ডোমে ঢাকা আলো। ঘরের তিনটি জানালা খোলা থাকলেও তাতে দামী পুরু নীল সাটিনের পর্দা টাঙ্গানো।

বসুন করবীদেবী, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

ক্লান্ত করবী নিঃশব্দে আরাম কেদারাটার উপরেই বসে পড়লো। অনিমেষ জানালার ধারে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই স্বল্প আলোর মধ্যেই ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে অনিমেষ কথা বললেন, কি হয়েছে করবীদেবী?

অনিমেষের প্রশ্নে সহসা যেন চমকে ওঠে করবী। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে, না, কিছুতো হয়নি!

হয়নি! মৃদু হাসলেন অনিমেষ। তারপর আবার বললেন, আপনার মুখ দেখে কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

করবী চুপ। কোন জবাব দেয় না।

অবিশ্যি যা আপনার একান্ত নিজস্ব আমাকে তা বলবেনই বা কেন? কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যে আমাদের একটা বন্ধুত্বের দাবী আছে, সে দাবীতেও কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারিনা কথাটা করবীদেবী? হয়ত আপনার কোন সাহায্যেও—

না, না—সেকি! ওকথা বলবেন না অনিমেষবাবু। ....তারপর আবার একটু থেমে বলে, আমি, মানে—

বলুন, থামলেন কেন?

পরশুর সংবাদপত্রে বিশেষ একটা সংবাদ পড়েছেন কিনা জানি না—

কোন্ বিশেষ সংবাদটির কথা বলছেন বলুন তো?

আমি বলছিলাম বি. টি. রোডে শ্রীনাথ করের হত্যার ব্যাপারটা—

অনিমেষ চকিতে মনে মনে কি যেন ভাবলেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে বুঝি আপনার পরিচয় আছে করবীদেবী?

করবী মাথা নিচু করে, কোন জবাব দেয় না। অতঃপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। ঘরের মধ্যে যেন একটা পাষাণভার স্তব্ধতা। খোলা জানালাপথে গঙ্গাবক্ষ থেকে একটা ষ্টিম লঞ্চের হুইস্‌ল ভেসে এলো।

অনিমেষই আবার কথা বললেন, করবীদেবী!

বলুন।

নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে আপনার অনেকদিনের পরিচয় না?

হ্যাঁ,—আমরা—

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার বাবা, মানে রমেনবাবু—

কি?

বলছিলাম, একথা জানেন?

না। ভেবেছিলাম এবারে সব বলবো, কিন্তু—

আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার কি মনে হয় করবীদেবী, নির্মলবাবু সত্যিই নিরপরাধ?

আপনি নির্মলকে জানেন না অনিমেষবাবু, এ সংসারে এতটুকু অন্যায় করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। সামান্য একটা কীটকে পর্যন্ত সে মারতে পারে না। তা—

কিন্তু রিভলবারটার কথা ভুলবেন না। তাছাড়া নরেন্দ্রনাথের হত্যার ব্যাপারে পুলিশ তার বিপক্ষে যে সব এভিডেন্স সংগ্রহ করেছে—

বিশ্বাস করি না আমি, সব মিথ্যা—একটা ষড়যন্ত্র—

তাঁর অফিসে কোন কর্মচারীর সঙ্গে কোনরকম মনোমালিন্য বা শত্রুতা ছিল বলে আপনি জানেন?

না, সেরকম কখনো কিছু শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু এখন আমি কি করি বলতে পারেন অনিমেষবাবু? নির্মল আজ আমার সহানুভূতিটুকুকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখছে। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বললো না সে।—শেষের দিকে করবীর কণ্ঠস্বর অশ্রুতে জড়িয়ে গেল।

এমনিই হয় করবীদেবী, মনের যেখানে নিবীড় সম্পর্ক সেখানে মন সামান্য অপমানটুকুও সহ্য করতে পারে না। কিন্তু কোথায় তার সঙ্গে আপনার দেখা হলো?

হাজতে।

সে কি, আপনি সেখানে গিয়েছিলেন।

আপনি বুঝতে পারবেন না অনিমেষবাবু, আমি—

বুঝেছি। কিন্তু সত্যিই মনে হচ্ছে আপনি আজ খুব ক্লান্ত। যান বিশ্রাম করুনগে—

করবী অতঃপর চেয়ার থেকে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অনিমেষ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। করবী নির্মলকে ভালবাসে। নির্মল তুমি ভাগ্যবান! এক সময় পায়চারি থামিয়ে ধীরে ধীরে অনিমেষ আবার টেবিলের ওপর থেকে বেহালাটা তুলে নিয়ে তার বুকে ছড় টানলেন। সে রাত্রে করবী ঘুমোতে পারেনি। এবং নিদ্রাহীন রাত্রির মধ্যপ্রহর পর্যন্ত সে বেহালার সুর শুনতে পেয়েছিল।

।। ছয় ।।

নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে করবীর সমস্ত কথোপকথনই সুব্রতর কানে এসেছিল এবং বিকালের দিকে একবার টালীগঞ্জ থানায় ঘুরে কিরীটির ওখানে যখন এলো তখনও সেই কথাগুলোই তার মনের মধ্যে আনাগোনা করছে।

কিরীটি একটা ক্রসওয়ার্ড পাজল্‌ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সুব্রতর পদশব্দে কাগজ থেকে চোখ না তুলেই সুব্রতকে সম্বোধন করে বললো, বল, ওয়ান হুঁ লাভস্‌ সিক্রেটলি। কি হবে?

সুব্রত পাশেই একটা সোফার পরে বসতে বসতে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, পুরুষ না নারী?

যদি বলি নারী? —বলতে বলতে কিরীটি ফিরে তাকালো স্মিতভাবে সুব্রতর মুখের দিকে।

তবে উইডো হবে। —সুব্রত জবাব দেয়।

হুঁ। তা তোর উইডোর সংবাদ কি? —কথাটা বলে কিরীটি আবার হাতের কাগজে মনোনিবেশ করে?

আমার উইডো! সে আবার কি?

আরে তোর মানে কি তোর নিজের। হুঁ! কোন কুমারীর সঙ্গেই আজ পর্যন্ত একটা প্রেম করতে

পারলি না, তুই করবি উইডোর সঙ্গে প্রেম! বলছিলাম তোর বিমলাদেবীর কথা। —বলতে বলতে কিরীটি এবার সোজা হয়ে বসে। পাশেই ত্রিপয়ের পরে রক্ষিত এ্যাসট্রের উপর থেকে নির্বাপিত অর্ধদগ্ধ সিগারেট তুলে নিয়ে আবার তাতে অগ্নিসংযোগে মনোনিবেশ করে।

বিমলাদেবী?

হুঁ। খোঁজ নিসনি, ঐ তো তোর দোষ সুব্রত। আরে এটা বুঝিস না কেন, যেখানেই নিষিদ্ধ প্রেম সেখানেই গণ্ডগোল। যাক—নরেন্দ্রভ্রাতা বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে একবার দেখা করেছিলি?

না।

তা করবি কেন সেখানে গেলে হয়তো দু'চারটে ইম্পর্টেণ্ট ক্লু পেয়ে গেলেও পেতিস। তাছাড়া সেখানে শ্রীমতী বেবী ঘোষের—আধুনিক সোসাইটির সো কল্‌ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গটির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতো—

তুই চিনিস নাকি বেবী ঘোষকে?

সাক্ষাৎ পরিচয়ের আজো সৌভাগ্য হয়নি বটে তবে স্বনামধন্যা তো, দু'চারবার অভিজাত সোসাইটির ফাংশনে কর্তৃত্ব করতে দেখেছি দূর থেকে। যাক্ সেই ফিল্ম স্পুলের শেষাংশর কাগজটুকু যে এ্যানালিসিস্ করে দেখতে বলেছিলাম। রথীনের কাছে ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়েছিলি?

হ্যাঁ, সে কাগজে নাকি পটাশিয়াম সায়ানাইড মাখানো ছিল।

যা আশা করেছিলাম তাহলে তাই। পটাশিয়াম সায়ানাইড তাহলে সেই ফিল্ম স্পুলের উপরের ব্ল্যাক কাগজটার গায়ে মাখিয়েই হত্যাকারী তার কাজ সুসম্পন্ন করেছে। উঃ, লোকটা ক্রিমিন্যাল হলে কি হবে, ব্রেন আছে। চমৎকার উপায়ে মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করেছে। বেচারা নরেন্দ্রনাথ সমস্ত ফিল্মটা এক্সপোজ্ করে, ডেভালাপের জন্য রোল করে নিঃসংশয় চিত্তে যেমন জিভের লালা দিয়ে রোলটা আঁটবার পূর্বে ভিজাতে গিয়েছেন, সাক্ষাৎ মৃত্যুবিষ তাকে শেষ চুম্বনে একেবারে মুহূর্তে লোকান্তরিত করে দিয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এবারে তোমার হত্যাকারী অর্থাৎ তোমার প্রতিপক্ষটি কি চিজ্!

তাতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু—এক্ষেত্রে তাহলে কে নরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী হতে পারে?

নরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী যিনিই হোন, একটা কথা হত্যাকারী সম্পর্কে এখুনি তোমাকে নিশ্চয়ই করে বলতে পারি সুব্রত—যেটা সেদিন আমার মনে সামান্য সন্দেহের ছায়া ফেলেছিল মাত্র। মহাশয় ব্যক্তিটি হত্যার সময়ে ধারে কাছে একেবারেত ছিলেনই না বরং নরেন্দ্রনাথের নিকট হতে বেশ দূরত্ব রেখেই হাসতে হাসতে নিশ্চিন্ত মনে অতীব কৌশলে পটাশিয়াম সায়ানাইড নামক অব্যর্থ ও অমোঘ মৃত্যুবাণটি সেই ফিল্মরোলের মধ্যেই পুরে প্রেরণ করেছিলেন।

তাহলে বিমলাদেবী?

তিনিই হয়ত খুব সম্ভবত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

চকিতে একটা সম্ভাবনা সুব্রতর মনের মধ্যে উঁকি দেয়। সে তাড়াতাড়ি বলে, তবে কি—

কিন্তু তার ভাবাবেগে বাধা দিল সঙ্গে সঙ্গে কিরীটি। বললে, নো, নট্ সো ফাস্ট—অত দ্রুত নয়। কনক্লুশনে জাম্প করার আগে নিজের যুক্তিতে আগে নিঃসন্দেহ হতে হবে।

আচ্ছা নির্মল চৌধুরী সম্পর্কে তোর কি মনে হয় কিরীটি?

নিঃসন্দেহে এ নাটকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র তিনিই। অবহেলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কর্তব্য নয়। দেখ না, কয়েকদিনের মধ্যেই তো তার মামলা আদালতে শুরু হবে। সে সময় উভয় পক্ষের উকিলের সওয়ালে অনেক কথাই হয়ত আরো, জানতে পারবি।

আজ তার সঙ্গে আবার হাজতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। —সুব্রত বলে।

নতুন কিছু জানতে পারলি?

না। —বলে সংক্ষেপে ঐ দিনকার দ্বিপ্রহরের সমস্ত কাহিনী সুব্রত কিরীটিকে শুনিয়ে দিল।

কিরীটি সব শুনে বললে, হুঁ, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে সেই চিরাচরিত ত্রিভুজ কাহিনী। নির্মল, করবী ও বিমলাদেবী।

কিরীটি বলেছিল সুব্রতকে বিনয়েন্দ্র ও তাঁর ভাইঝি শ্রীমতী বেবীর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে আসবার জন্য; কিন্তু বিনয়েন্দ্রের সঙ্গে না হলেও দিন দুই বাদে একান্ত আকস্মিকভাবেই অদ্ভুত

এক পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীমতী বেবীর সঙ্গে সুব্রতর সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়ে গেল। পাটনায় এক বন্ধুর বিয়ে একরাত্রির জন্য হলেও যেতেই হবে সুব্রতকে। কাজের চাপের দোহাই দেখিয়েও সুব্রত রেহাই পায়নি। তাই সে শেষ পর্যন্ত বন্ধুকে বলেছিল জরুরী একটা কাজে বিয়ের আগের দিন সে বর্ধমানে যাচ্ছে সেখান থেকেই সে দিল্লী এক্সপ্রেস ধরে পরের দিন সকালে পাটনায় গিয়ে নিশ্চয়ই পৌছাবে। এবং বলা বাহুল্য যে রাত্রে পাটনা যাত্রী সুব্রতর বর্ধমান থেকে দিল্লী এক্সপ্রেস ধরবার কথা, সেই রাত্রেই দিল্লী এক্সপ্রেসে বেবী চলেছিল একটা ফার্স্টক্লাশ কূপে রিজার্ভ করে, লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে কনভার্ট করে দিল্লীতে কোন এক নারী সঙ্ঘের মিটিংয়ে যোগ দিতে।

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা দিল্লী এক্সপ্রেস এসে দাঁড়ালো বর্ধমানে। রাত্রে চলন্ত ট্রেনে বেবী কোনদিনই ঘুমোতে পারে না বলে সাধারণত ঐ ধরনের জার্নির সময় বেবী একগাদা পেঙ্গুইন সিরিজের ক্রাইম ফিক্‌সন নিয়ে যেতো। বেবীর বয়স তেইশ চব্বিশের বেশী হবে না। ঘোষেদের পিতৃদেবের জীবিতবস্থায় যখন একান্নবর্তী পরিবার ছিল সেই সময় থেকেই বাড়ীর মধ্যে ঐ একটিমাত্র মেয়ে হওয়ায় চিরদিন একটু বেশী আদরই পেয়ে এসেছে। এবং অল্পবয়সে মা মারা যাওয়ায় বেবীর বাবা অমরেন্দ্রনাথ সর্বদা মেয়েকে একটু বেশী আদর ও প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছেন বরাবর। ছোটকাকা বিনয়েন্দ্রনাথও বেবীকে বরাবরই একটু বেশী স্নেহ করতেন। সকলের স্নেহ ও প্রশ্রয়ের মধ্যে মানুষ হওয়ায় বেবী হয়ে উঠেছিল বিশেষ রকম খেয়ালী ও চঞ্চল।

ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর পৃথক হয়ে কাকার ওখানে এসে ওঠায় এবং কোন ব্যাপারেই কাকা বিনয়েন্দ্র তাকে কোনরূপ বাধা না দেওয়ায় তার সেই চঞ্চল ও খেয়ালী স্বভাবটা যেন আরো বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রোগাটে চেহারা। মাথায় একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, জোড়া ভ্রূ—টানাটানা দুটি চোখ, অদ্ভুত একটা শ্রী যেন ছিল চোখে মুখে। তার উপরে বুদ্ধির দীপ্তিতে যেন আরো সজীব মনে হতো।

কলকাতা শহরে শ্রীমতী বেবীকে চিনতো না এমন খুব কম লোকই ছিল এবং সর্বত্র তার আসল নামটা চাপা পড়ে গিয়ে তাঁর বাপের আদরের প্রিয় বেবী নামটিতেই সে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। ছাত্রী সঙ্ঘের সে নেত্রী, এক্‌জিবিসন, জলসা, থিয়েটার, নৃত্যনাট্য সর্বপ্রকার কৃষ্টির ব্যাপারে সেই ছিল অন্যতমা প্রধানা উদ্যোক্তা।

লোয়ার বার্থে বালিশের উপর হেলান দিয়ে আধশোয়া ও আধবসা অবস্থায় বেবী গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা ক্রাইম ফিক্‌সন পড়ছিল। এক সময় গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, গার্ডের হুইস্‌লের শব্দ শোনা গেল, ও গাড়ি মন্থর গতিতে চলতে শুরু করল। এবং গাড়ি প্ল্যাটফরম ছাড়বার আগেই সহসা চলমান গাড়ির বন্ধ দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে খুলে একটা সুটকেশ হাতে সুব্রত এসে হাঁপাতে হাঁপাতে কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে পড়লো, কিন্তু কামরার মধ্যে একাকিনী তরুণী বেবীকে জেগে থাকতে দেখে একটু যেন বিব্রত হয়েই বিনীত নম্র স্বরে বললে, এক্সকিউজ মি, মানে—

বেবীর মনেই ছিল না যে ক্ষণপূর্বে বর্ধমানে একজন লেডি টি. টি. উঠেছিল তার কূপেতে টিকিট চেক করবার জন্যে। এবং সে নেমে যাবার পর অসাবধানতা বশতঃ সে দরজায় লক্ করতে ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু ততক্ষণে বেবী বার্থের উপরে বইটা হাতে করে ধড়ফড় করে সোজা হয়ে উঠে বসেছে। এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুক সুব্রতর দিকে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে, হোয়াট্‌স দি আইডিয়া। কে আপনি? জানেন এটা লেডিজ রিজার্ভড ফার্স্টক্লাশ।

বিশ্বাস করুন, তাড়াহুড়োয় এবং সমস্ত ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার দরজার ভিতর থেকে লক্-আপ করা থাকায় এ গাড়িতে উঠে পড়েছি। লেডিজ বা রিজার্ভড দেখবার মত সত্যিই আমার সময় ছিল না।

সময় ছিল না মানে কি! ডু ইউ মিন টু সে ইউ আর ব্লাইণ্ড—অন্ধ বলতে চান? —রাগত কণ্ঠে বেবী আবার প্রশ্ন করে।

না অন্ধ হবো কেন! তাড়াতাড়িতে—

যান এখুনি নেমে যান এ কামরা থেকে!

কি বলছেন আপনি। এই চলন্ত গাড়ি থেকে! জানেন কত স্পীডে ট্রেনটা এখন ছুটছে, চল্লিশ

মাইলের কম নয় ঘণ্টায়। আর উঠে যখন পড়েছিই—

কোন কথা আপনার আমি শুনতে চাই না। নেমে যাবেন কিনা বলুন?

দেখুন, বিশ্বাস করুন, আমি চোর ডাকাত নই আর আমার নামে দুর্নাম যারা রটাতে পারে তারাও দুশ্চরিত্রের অপবাদ আমাকে দিতে পারবে না। মিথ্যে আপনি অধীর হচ্ছেন। আমি বসতেও চাই না—

কি বললেন? বসবেন?

না, বলছিলাম দাঁড়িয়ে আছি, বাকী পথটুকু আসানসোল পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকবো, তারপর ট্রেন স্টেশনে থামলেই নেমে যাবো!

বেবী এবারে সোজা হাত বাড়িয়ে এলার্ম সিগন্যালের চেনটা ধরবার চেষ্টা করতেই সুব্রত বাধা দিয়ে বলে ওঠে, আরে—করেন কি! আপনি তো দেখছি সাংঘাতিক চঞ্চলমতী!

কি বললেন?

বলছিলাম, কেন মিথ্যে পঞ্চাশটা টাকা জরিমানা দেবেন।

পঞ্চাশ টাকা কেন হাজার টাকা জরিমানাও যদি দিতে হয় তবু আপনাকে আমি ধরিয়ে দেবো। ভাবছেন আপনার মতলবটা আমি এখনো বুঝতে পারিনি, উইদাউট টিকিটে জার্নি করবার মজাটা এখুনি টের পাবেন।

বাঃ চমৎকার উর্বর দেখছি আপনার চিন্তাশক্তি। শেষ পর্যন্ত বুঝে নিলেন উব্লিউ-টি। কথাটা বলতেই হঠাৎ সুব্রতর মাথার মধ্যে একটা দুষ্টুবুদ্ধি এসে উঁকি দেয়। তার সহযাত্রিনীকে নিয়ে খানিকটা মজা করবার লোভ সামলাতে পারে না। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, দেখুন এটা কিন্তু সত্যিই আপনি আমার পরে অবিচার করছেন—একটিবার দয়া করে ভেবে দেখুন—

যথেষ্ট ভেবেছি।

না, আপনি একটুও ভাবেননি। গাড়িতে ওঠা অবধিই তো কেবল ঝগড়াই করছেন, ভাববার সময় পেলেন কখন। —কথার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর ওষ্ঠপ্রান্তে একটা চাপা হাসি যেন ছিলিক দিয়ে ওঠে। এবং দুর্ভাগ্য সুব্রতর সেই চাপা হাসিটুকু বেবীর দৃষ্টি এড়ায় না।

ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে বেবী বলে ওঠে, আবার হাসছেন! ডোণ্ট ইউ ফিল্ এ্যাশেমড্!

না, লজ্জা—লজ্জার কি আছে এতে! কিন্তু সত্যি বলছি নাহোক আপনার সঙ্গে সেই তর্ক করতে করতে গলাটা আমার শুকিয়ে উঠেছে। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড—বলতে বলতে হুকের সঙ্গে ঝুলন্ত পেটমোটা ফ্লাস্কটার দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলে, ওই ফ্লাস্কটায় নিশ্চয় আপনার চা আছে?

হ্যাঁ, আপনার জন্যে তৈরী করে এনেছি—রাগত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় বেবী।

তাই কি আর ভাবতে পারি।

কি বললেন?

না, বলছিলাম, কুজো দেখছি না সঙ্গে, আপনার বুঝি জল তেষ্টা পায় না?

হঠাৎ কি ভেবে বেবী এবারে উঠে দাঁড়ালো বার্থ থেকে এবং এগিয়ে গিয়ে হুক থেকে ফ্লাস্কটা নামিয়ে এগিয়ে দিয়ে সুব্রতর দিকে বললে, নিন্—

থ্যাঙ্কস্।

এবারে আর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজের জায়গায় পা গুটিয়ে বসে অর্ধপঠিত ফিক্সনটা তুলে নিয়ে বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলো বেবী। সুব্রত কিন্তু ফ্লাস্কটায় হাতও দেয় না! বার্থের অর্ধেকটারও বেশী খালি পড়ে আছে। পা গুটিয়ে বসে বেবী পড়ছে। সুব্রত দরজার একপাশে হেলান দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। গতির বেগে গাড়িটা যেন মন্দাক্রান্তা তালে দুলছে। একঘেয়ে চাকার ঘট ঘট ঘটাং ঘট ঘট ঘটাং শব্দটা একটানা শোনা যাচ্ছে!

হঠাৎ বেবী আড়চোখে একবার দণ্ডায়মান সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললো, অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে আপনাকে আমি বলেছি নাকি? এবং কথাটা বলে আবার বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করল।

সুব্রত মৃদু হেসে হাতের সুটকেশটা এবারে একপাশে নামিয়ে রেখে বার্থের উপর বসল। গাড়ি তেমনই চলেছে। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো সুব্রত—রাত সোয়া বারটা। আসানসোলে পৌঁছাতে এখনো কিছু দেরি আছে। দুজনাই চুপচাপ। কিন্তু এমনি করে বোবার মত চুপচাপ—বিশেষ করে পাশেই এক তরুণী সহযাত্রিনী বসে থাকলে ট্রেন জার্নি করা যায় নাকি! অন্তত সুব্রতর কুষ্ঠিতে

তা লেখা নেই।

সুব্রতই এবারে কথা বললে, কতদূর যাচ্ছেন?

রুক্ষকণ্ঠে জবাব এলো, তাতে আপনার দরকার?

দরকার আর কি। ট্রেনজার্নির সময় সহযাত্রী হিসাবে তাঁর সহযাত্রিনীর গন্তব্য স্থানের খবরাখবরটা নেওয়াও তো একটা রেওয়াজ কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম আর কি। তা একাই যাচ্ছেন বুঝি?

হ্যাঁ, একাই আমি যেয়ে থাকি।

তাই দেখছি।

মানে?

না, তাই বলছিলাম।

কথা না বলে পিপাসা পেয়েছিল বলছিলেন, ফ্লাস্ক থেকে চা খান।

না, ধন্যবাদ।

বেবী আর একবার তেরছা ভাবে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের বইতে মন দিল।

আবার সুব্রত কথা বললে, আপনি দেখছি এখনো আমার ওপর রেগেই আছেন। ....

বেবী কোন জবাব দেয় না।

সুব্রত বেবীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, তাড়াহুড়োর মাথায় স্টেশনের আলোয় ভাল করে না দেখতে পাওয়ার দরুণ একটা না হয় ভুল করেই ফেলেছি, এবং সে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতেও প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও যদি আপনি—

এরকম ভুল আর করবেন না।

নিশ্চয়ই না। তারপর একটু থেমে বলে, মাপ করবেন, এখুনি গাড়ি স্টেশনে এসে যাবে, নেমে পড়বো। কিন্তু আমাদের এই অদ্ভুত পরিচয়েব ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অপরিচয়ের মধ্যেই থেকে যায় সেটা কি ভাল দেখাবে? তাই বলছিলাম আমার নাম সুব্রত রায়, আপনার নামটা—

বই থেকে মুখ না তুলেই পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠে বেবী জবাব দিল, মমতা ঘোষ!

মমতা ঘোষ!

হ্যাঁ, কিন্তু সকলে আমাকে বেবী ঘোষই বলে—

হঠাৎ যেন সুব্রত চমকে ওঠে। বলে, কি বললেন?

সুব্রতর কণ্ঠস্বরে বেবীও চমকে ফিরে তাকিয়েছিল। বলে আবার, বেবী ঘোষ।

আপনি—আপনি কি?

কি আমি?

নরেন্দ্রনাথ ঘোষ—মানে যিনি কিছুদিন আগে—

হ্যাঁ, আমার বড়কাকা ছিলেন তিনি।

আই-সি।

আপনি তাঁকে চিনতেন নাকি?

হ্যাঁ, মানে—

ইতিমধ্যে ট্রেনের গতি যে মন্থর হয়ে এসেছে দুজনের একজনও তা টের পায়নি। ধীরে ধীরে এক্সপ্রেস আসানসোল প্ল্যাটফর্মে ইন্ করলো। যাত্রী, কুলী ও ভেণ্ডারদের চেঁচামেচি ও আলো দেখে সুব্রত উঠে দাঁড়াল। এবং হাত বাড়িয়ে সুটকেশটা তুলে নিয়ে বললে, আসানসোল, আচ্ছা তাহলে চলি মিস্ ঘোষ।

চললেন নাকি?

হ্যাঁ—সুব্রত গাড়ির কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে গেল।

॥ সাত ॥

তারপর একদিন আদালতে নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীনাথ করের হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে ধৃত নির্মল চৌধুরীর বিচার শুরু হলো। বিমলাদেবীর সাক্ষ্য, নির্মল চৌধুরীর পুলিশের কাছে দেয় জবানবন্দীর মধ্যে কিছু অংশ স্বেচ্ছায় গোপন করে যাওয়া, সব কিছু মিলে নির্মল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগটা যেন রীতিমত ঘোরালো হয়ে ওঠে! এবং ফলে মামলা যে তার স্বপক্ষে যাবে না

বুঝতে কারোরই কষ্ট হয় না।

ইতিমধ্যে করবী আর একদিন হাজতে গিয়ে নির্মলের সঙ্গে দেখা করেছিল। করবী বলেছিল, কেন তুমি এখনো সব কথা খুলে বলছো না।

কি খুলে বলবো, সবই তো বলেছি। আর যা বলেছি এক বর্ণও তার মধ্যে মিথ্যা নেই।

করবী প্রতিবাদ জানিয়েছিল, না, তুমি বলোনি! দুটো রাত ও একটা দিন তুমি কোথায় ছিলে?

জানলে তো বলবো। নিজেই বুঝতে পারিনি। সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান ফিরে এসেছিল মাঝখানে, কিন্তু সে সময় যা দেখেছি বা শুনেছি তা যেমন অস্পষ্ট তেমনি ধোঁয়াটে। সে কথা বলতে যাওয়া শুধু বোকামীই নয়, বাতুলতা—

তবু—তবু তুমি সব বলো। অকপটে সব স্বীকার করো নির্মল।

সব মিথ্যে, কোন লাভ হবে না তাতে করে রুবি। আমাদের মত লোকেরা চিরদিন এমনি ভাবে অপমানিত হয়, কলঙ্কের বোঝা মাথা পেতে চিরদিন নিয়ে এসেছে, আজো নিতে হবে।

না, না—ওকথা বলো না।

তুমি যদি ভেবে থাকো যে, এরা আমাকে মুক্তি দেবে তাহলে ভুল করছো। ভুল—হ্যাঁ, ভুল আমি করেছি বৈকি। অর্থের মোহে নিজের বুদ্ধিকে বিক্রি করেছি। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। করতে হবে বৈকি। তাই আবার তোমাকে বলছি রুবি, আমাকে তুমি ভুলে যাও, নির্মল বলে কেউ কখনো তোমার জীবনে এসেছিল ভুলে যাও সে কথা। তুমি আর এখানে এসো না, যাও, যাও।

মামলা চলেছে আজ প্রায় একমাস ধরে। দীর্ঘ এই একটি মাসের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত যে কি দুঃসহ চিন্তার মধ্যে নির্মলের গিয়েছে একমাত্র তা নির্মলই জানে। আশা নেই, আকাঙ্খা নেই, শুধু বুকভরা নিরাশা, বেদনা, ও লজ্জার এক মর্মান্তিক একটানা দুঃসহ পীড়ন। এই এক মাসের মধ্যেই নির্মলকে যেন আজ আর চিনবার উপায় নেই। এক মুখ দাড়ি, গলার কণ্ঠার হাড় দুটো বিশ্রী ভাবে ঠেলে উঠেছে। চোয়ালের হাড় জেগে উঠেছে। বুকের পাঁজরাগুলো যেন প্রত্যেকটি গোনা যায়। মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো রুক্ষ, ধূলি-মলিন, জট পাকিয়ে গিয়েছে। দুচোখের দৃষ্টিটা কেবল যেন আরো উজ্জ্বল, আরো অন্তর্ভেদি হয়ে উঠেছে উপায়হীন অন্তর্জালার এক তীব্র অগ্নিদাহে, সমস্ত জগতের উপর এক নিষ্ঠুর বিদ্বেষ ও ঘৃণায়।

এক এক সময় নির্মলের ইচ্ছা যায় ঐ জেলের সামনের লোহার গরাদ ভেঙ্গে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায়। কেন, কেন সে এই বিচার প্রহসনের মধ্যে কাঠের পুতুলের মত নিরুপায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সে কি বুঝতে পারছে না এই বিচার প্রহসনের শেষ অধ্যায়ে তার জন্য কি অপেক্ষা কবছে। তবে কেন এই যুক্তিহীন প্রহসনের মর্মান্তিক দুঃসহ জ্বালা বোকার মত স্বীকার করে নেবে। আবার এক এক সময় মনে হতো, একবার যদি কোনক্রমে এই পাষাণ প্রাচীরের বাইরে যেতে পারতো, এমনি করে যে তার জীবনকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যেমন করে হোক তাকে বের করতোই। উঃ, আগে যদি ঘৃণাক্ষরেও জানতে পারতো। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। এমনি করেই আজ তাকে হয় এ পৃথিবী থেকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে চলে যেতে হবে, নচেৎ জীবনের বাকী কটা দিন এই কারা প্রাচীরের অন্তরালে নিঃশেষে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয়িয়ে ফেলতে হবে।

শনিবার। সকাল থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সমস্ত আকাশটা একেবারে মেঘে মেঘে যেন কালো হয়ে আছে। দ্বিপ্রহরের খাদ্য এখনো তেমনই পড়ে আছে থালায়, নির্মল স্পর্শও করেনি।

গরাদের সামনে বসে নির্মল জেল প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে ছিল। জেলরক্ষী রহমান গরাদের ওপাশে এসে দাঁড়ালো এবং নির্মল কিছু বুঝে উঠবার আগেই রহমান বারেকের জন্য এদিক ওদিক তাকিয়ে চট্ করে তার নীল কোর্তার পকেট থেকে একটা খামেভরা চিঠি বের করে টুপ করে গরাদ গলিয়ে নির্মলের সামনে ফেলে দিয়েই আবার চলে গেল।

নির্মল একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তবু হাত বাড়িয়ে খামটা সে তুলে নিল। খামটা হাতে

করে নির্মল সেলের একপাশে গিয়ে ভাল করে খামটার দিকে তাকালো। একটা মুখ আঁটা নীল রংয়ের খাম। উপরে কোন নাম বা কিছু লেখা নেই।

খানিকটা বিস্ময় খানিকটা কৌতূহল। খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলতেই অনুরূপ নীল রংয়ের একটি ছোট চৌকো চিঠির কাগজ বের হয়ে এলো। কিন্তু চিঠির বিষয়বস্তু নির্মলের এতটুকুও বোধগম্য হয় না। ইংরাজী অক্ষরে টাইপ করা চিঠির বিয়য়বস্তু কিন্তু তার কোন অর্থ বা মানেই খুঁজে পায় না নির্মল। চিঠির মধ্যে যা টাইপ করা।

JE CHITHI DEACHE, TARSANGE KATHA BALOON, JADI MUKTI CHAN. SAEE PATH BATLE DEBE.

একবার দুবার তিনবার চারবার টাইপ করা ইংরাজী অক্ষরগুলো পড়ে গেল নির্মল কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। অর্থ কি! দুর্বোধ্য এই পাশাপাশি টাইপ করা ইংরাজী শব্দগুলোর কি অর্থ! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এর কোন অর্থ আছে। অথচ সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

ধোঁয়ার মত মস্তিষ্কের কোষে কোষে চিন্তাটা নির্মলের ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে থাকে। কখনো মনে হয় এক সারি ছোট ছোট কালো পিঁপড়ে যেন মাথার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আবার কখনো মনে হয় কতকগুলো কালো কালো ছোট ছোট বিন্দু পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে কি যেন একটা দুর্বোধ্য শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। শুধু কি সেগুলো শব্দই! কোন অর্থই নেই তার! না, এ যেন কোন একটা পরিচিত গানের সুর হঠাৎ একদিন খুব ভাল লেগেছিল অথচ এখন কিছুতেই মনে পড়েছ না সেই চেনা সুরের কথাগুলো।

একটা রাত একটা দিন তারপর কেটে গেল নির্মলের, কিন্তু চিঠির কোন রহস্যই কিনারা করতে পারলো না সে। ইতিমধ্যে রহমান আরো দু'বার ওর সামনে এসে ঘুরে গিয়েছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে গিয়েও না বলে সরে গিয়েছে। অথচ নির্মলেরও সাহসে কুলোয়নি রহমানকে কোন প্রশ্ন করতে।

তৃতীয় দিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে নির্মল ঐ চিঠির রহস্যের কথাই আনমনে চিন্তা করছিল। কাল আবার আদালতে তার মামলার শুনানী আছে। মাথার উপরে ঝুলন্ত কম শক্তির বিদ্যুৎবাতির চারপাশে একটা মথ্ ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। হঠাৎ একটা কথা ওর মনের উঁকি দিল। JE CHITHI পরপর ইংরাজী অক্ষরগুলোর মানে কি! মানে 'যে চিঠি' তো নয়! সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে উত্তেজনায় উঠে বসলো নির্মল। ইংরাজী টাইপ দিয়ে বাংলা কথাই লেখেনি তো লেখক। হ্যাঁ, ঠিক! আশ্চর্য! আশ্চর্য! তাইতো।

"যে চিঠি দিয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলুন, যদি মুক্তি চান সে পথ বাতলে দেবে!"

বিস্ময়ে কৌতূহলে উত্তেজনায় নির্মলের সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপছে। ঢং করে জেলখানার পেটা ঘড়িটা রাত্রি সাড়ে এগারটা ঘোষণা করলো। পায়চারি করতে থাকে নির্মল ক্ষুদ্র সেলটার মধ্যে অস্থির অশান্ত মনে। যে চিঠি দিয়েছে, মানে রহমান। রহমানই তো তাকে চিঠি দিয়েছে।....

সত্যি সত্যিই কি ঐ চিঠি এনেছে তার বন্দী জীবনে কোন মুক্তির আশা। না সবটাই তার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। না গত দুই মাসের দুর্বিসহ চিন্তাক্লিষ্ট মনেরই একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু যদি তা না হয়, সত্যি সত্যিই যদি তার সামনে আজ এসে থাকে সুনিশ্চিৎ মুক্তির এক সম্ভাবনা। তাহলে, সে কি তাকে হেলায় হারাবে। আবার পরক্ষণেই মনে হয় মুক্তি, এই সদাসতর্ক প্রহরী বেষ্টিত কারাঘরের থেকে মুক্তি, এও কি সম্ভব! এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো, সে যে শুধু অসম্ভবই নয়, অবিশ্বাস্য। পরক্ষণেই আবার মনে হয়, যে এই সাংকেতিক চিঠি তাকে প্রেরণ করেছে সে কি সব না বুঝেই দিয়েছে! আরো একটা কথা আছে, সে না হয় কোন মতে এদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে এখান থেকে মুক্তি পেল। তারপর! চিহ্নিত বিচারাধীন খুনী আসামী সে! বাইরে বের হলেই বা তার নিষ্কৃতি কোথায়। অনেকেই তাকে চেনে। তারপর বিরাট পুলিশ বাহিনী, তারাই কি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে! তবে?—

না, না—সে আর ভাববে না এখানে থাকলেই যে সে বিচারে মুক্তি পাবে তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং সে আশা কমই! তবে কেন সে অন্যায়,অত্যাচারকে মাথা পেতে মেনে নেবে! কেন সে ভীরুর মত কলঙ্ককে স্বীকার করে নেবে। না, না—সে মুক্তির সম্ভাবনা যখন এসেছে তাকেই সে গ্রহণ করবে। মনস্থির করে ফেলে নির্মল।

রহমান, রহমান!

টিপ্ টিপ্ করে আজো সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে বৃষ্টিঝরা নিকষ কালো অন্ধকার রাত্রি। চোখের দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যায়।

রহমান, রহমান—আজ একবার এই মুহূর্তে আসে না। বাইরের বারান্দায় ও কিসের শব্দ! প্রহরীর পায়ের শব্দ তো নয়। সে যে তার যথেষ্ট পরিচিত। তবু পায়ের শব্দই! শব্দই এদিকে আসছে। মুহূর্তে নির্মলের সমস্ত শ্রবণশক্তি যেন প্রখর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। অধীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সমস্ত দেহ যেন রোমাঞ্চিত হয় তার। কে আসছে!

সহসা ঐ সময় বাহিরে বিদ্যুতের আলোয় মুহূর্তের জন্য চারিদিক যেন ঝলসে দিয়ে গেল।

কে, কে ঐ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, রহমান না!......হ্যাঁ রহমান!

চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকে নির্মল, রহমান।

বাবু!

রহমান!

দরজার মোটা মোটা লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রহমান। ঘরের আলো খানিকটা রহমানের চোখে মুখে পড়েছে। কঠিন ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রহমান ওর মুখের দিকে।

চিঠি পড়েছি রহমান।

হিস্, আস্তে—

আমি প্রস্তুত।

ঠিক আছে, রাত দুটোয় আসবো।

বলেই রহমান আর সেখানে দাঁড়ালো না। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আড়াই ঘন্টা! আর মাত্র আড়াই ঘন্টা। তারপরই এই তীব্র মানসিক যন্ত্রণার পলে পলে নিষ্পেষণ থেকে সে মুক্তি পাবে। দুইমাস ধরে নিরুপায় এই অপমান আর মর্মান্তিক লজ্জার পীড়ন। পারছে না, পারছে না আর সহ্য করতে নির্মল। শুধু তাই নয়, যেভাবে ষড়যন্ত্রের জাল তাকে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরেছে, এ জাল ছিঁড়ে কোনদিন যে সে আবার সহজ মুক্ত নিষ্কলঙ্ক জীবনের মধ্যে ফিরে যাবে সেও সুদূর পরাহত। কোন নিশ্চয়তাই নেই। একটি মাত্র ক্ষীণ আশা, সেও এখন পলকা সূতোয় ঝুলছে, যে কোন মুহূর্তে সেটা ছিঁড়ে যেতে পারে। তবে কেন এ অত্যাচার সে সহ্য করবে। না, না—সে মুক্তিই দেবে। সৌভাগ্য এমনি করে যখন তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, মূর্খের মত সে তাকে ফিরিয়ে দেবে না। দেখতে চায় সে একবার, এ অন্যায়ের প্রতিকার আছে কি না! এই জুলুম এই অত্যাচারের কোন মীমাংসা আছে কি না! হে অদৃশ্য লিপিকার। হে অদৃশ্য সুহৃদ, তুমি যেই হও তোমাকে নমস্কার।.....

উঃ কি দীর্ঘ মন্থর এই রাত্রির প্রহরগুলি! কখন, কখন রাত দুটো বাজবে। বাবু!

কে? চমকে তাকালো বাহিরে অন্ধকারের দিকে নির্মল। ইতিমধ্যে কখন তালা খুলে গিয়েছে দরজার নির্মল টেরও পায়নি। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রহমান।

আসুন, আর দেরি করবেন না।

বেরিয়ে এলো নির্মল। এক মুহূর্ত আর দেরি করলো না। লম্বা একটা টানা বারান্দা, তারপরই সরু একটা প্যাসেজ জেল প্রাঙ্গণের গা ঘেঁষে। বৃষ্টিও তখন যেন নেমেছে একেবারে আকাশ ভেঙ্গে! ঝম্ ঝম্ করে যেন বাজনা বাজছে। নিঃশব্দে রহমানের পিছনে পিছনে সরু প্যাসেজটা অতিক্রম করে দ্বিতীয় দ্বারপথে আর একটি ছোট প্রাঙ্গণে এসে পড়লো নির্মল। সেটা পার হয়ে দুজনে এসে একটা ঘরে ঢুকলো।

।। আট ।।

ঘরে ঢুকেই রহমান দরজাটা ভিতর থেকে এঁটে দিল। অন্ধকার ঘর। সুইচ টিপে আলো জ্বালালো রহমান। সামান্য আসবাব ঘরটার মধ্যে। একপাশে একটি লোহার খাট। একটি ছোট স্টিল ট্রাংক রং চটা। তার পাশে একটা ষ্টোভ, একটা জলের কুঁজো ও একটা এ্যালুমিনিআমের টি-পট্। দড়ির আলনায় রহমানের আর এক প্রস্থ পোষাক ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে সেই পোষাকটা তুলে নির্মলের হাতে দিতে দিতে রহমান বললে, চটপট এই পোষাকটা গায়ে দিয়ে নিন বাবু।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রহমানের নির্দেশমত নির্মল পোষাক বদলে নিল। রহমান অতঃপর বিছানার তলা থেকে একটা প্যাকেট করা ধুতি ও সার্ট বের করে ওর সামনে রেখে বললে, বসুন, ঐ যে খুর আয়না সব রয়েছে তাড়াতাড়ি দাড়ি গোঁফগুলো কামিয়ে নিন।

আরো মিনিট পনের বাদে রহমানের সাহায্যে নির্মল যখন জেলের বাইরে এসে দাঁড়ালো, বৃষ্টির ঝাপটায় চারিদিক তখন কুয়াশাচ্ছন্ন। এক হাতের মধ্যেও দৃষ্টি চলে না। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো চোখেমুখে এসে যেন ছুঁচ ফোটায়। সব কিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললো সেই ঝড় জল অন্ধকারের মধ্যেই নির্মল।

রহমান!

জেলের মেট্ রহমান খুশির উচ্ছলতায় গুন গুন করে একটা সিনেমার গান গাইতে গাইতে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। পকেটের মধ্যে করকরে একগাদা নোট। কাজও হাসিল! বাকী যা রহমান ম্যানেজ করে নেবে। বিছানার নিচে লুকানো একটা বোতল ছিল, সেটা টেনে বের করে দাঁত দিয়ে ছিপিটা খুলে নির্জলা খানিকটা এ্যালকহল গলার মধ্যে ঢেলে দিল। আর চাকরি করে কি হবে। এবারে ইস্তফা! তারপর গাঁয়ে গিয়ে রহিম শেখের বোন জুবেদাকে সঙ্গী করে ছোট একটি সুখের নীড় বাঁধবে সে।

ছুটি, ছুটি, এবারে ছুটি।

হঠাৎ নজরে পড়লো মেজের উপরে তখনো পড়ে আছে নির্মলের পোষাকগুলো। শরীরের রক্তে নেশা তখন চন চন করছে। জামা কাপড়গুলো নষ্ট করে কি হবে। যদি গায়ে লেগে যায়। নিজের জামা কাপড় গা থেকে খুলে একে একে নির্মলের পরিত্যক্ত জামা কাপড়গুলো পরিধান করলো রহমান। দেওয়ালে একটা আর্শী ঝোলানো ছিল সেটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো কেমন মানিয়েছে। না। নেহাৎ খারাপ দেখাচ্ছে না। বরং বেশ মানিয়েছে বলতে হবে। ওষ্ঠের উপরে পুরুষ্টু গোঁফে একবার তা দিয়ে, নূর দাড়িতে সস্নেহে একবার হাত বুলিয়ে আর্শীর বুকে প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো রহমান। তারপর আর একবার খাটের উপরে বসে বোতালটা খুলে আরো খানিকটা তরল পদার্থ গলার মধ্যে ঢেলে দিল। গুন গুন করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে একটা সিগ্রেট ধরালো। শয্যার ওপর তারপর গাটা এলিয়ে দিয়ে ধূমপান করতে লাগলো।

কিন্তু ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। নির্মলের পালাবার সব ব্যবস্থা করার উত্তেজনার মধ্যে রাত্রে তখনও পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয়নি। চারটে আন্ডা ষ্টোররুম থেকে গতকাল সরিয়ে এনে ঘরে রেখে দিয়েছিল। উঠে বসলো রহমান। ষ্টোভটা জ্বালিয়ে আন্ডাগুলো ভেজে নেওয়া যাক। স্পিরিট ঢালতে গিয়ে নেশার ঝোঁকে বোতল থেকে একগাদা স্পিরিট ষ্টোভের গা বেয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু রহমানের সেদিকে নজর দেবার মত অবস্থা তখন নয়। দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালালো।

আগুনের একটা নীলাভ ঝলক। একটা প্রকান্ড বিস্ফোরণের শব্দ। একটা মৃত্যু-কাতর শেষ চিৎকার। লকলকে আগুনের শিখা যেন শতবাহু মেলে ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

শব্দে প্রহরী ছুটে এলো। হৈ হৈ চিৎকার ঃ আগুন, আগুন—

পাগলা ঘন্টি রাতের স্তব্ধতাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে বেজে ওঠে ঢং.......ঢং......ঢং!

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। শুধু বর্ষণক্লান্ত ভিজা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রথম ভোরের আলো যেন স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে।

।। নয় ।।

পরের দিন বেলা তখন সাড়ে সাতটা কি আটটা হবে, বালীগঞ্জ রেল ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা মাঝারি রেস্টুরেন্ট, 'চা-ঘর', মাথায় আদ্দির চিকনের কাজ করা টুপি, চোখে চশমা, পরিধানে ধুতি ও চুড়িদার পাঞ্জাবী এক তরুণ যুবক চা পান করতে করতে ঐ দিনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশেষ সংবাদটি পড়ছিল।

।। সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে ভয়াবহ হত্যাপরাধী বিচারধীন আসামী নির্মল চৌধুরীর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যু ও জেল মেট্ বজলুল রহমানের রহস্যময় অন্তর্ধান।।

বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ ঘোষের ও তাঁর অফিসের ম্যানেজার শ্রীনাথ করের হত্যাপরাধে ধৃত নরেন্দ্রনাথেরই প্রাইভেট সেক্রেটারি নির্মল চৌধুরী—বিচারাধীন আসামীকে জেল কক্ষের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। যে সেলের মধ্যে নির্মল চৌধুরী আটক ছিল তাহার দরজার তালাটি ভগ্ন অবস্থায় দরজার গোড়াতেই পড়িয়াছিল। এবং জেলে মেথর প্রবেশের যে দ্বারটি ছিল তাহারও তালাটি ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে! আর ঐ সঙ্গে জেল মেট্ বজলুল রহমান নিরুদ্দেশ। জেল কর্তৃপক্ষের ধারণা বজলুল রহমানের অন্তর্ধান ও নির্মল চৌধুরীর অগ্নিদগ্ধাবস্থায় শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে একটি রহস্যপূর্ণ যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে। সরকার পক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন পলাতক বজলুল রহমানকে কেহ ধরাইয়া দিতে পারিলে হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পাইবেন।

বিচারাধীন হত্যাপরাধে অপরাধী নির্মল চৌধুরী মৃত।

সংবাদপত্রে উক্ত সংবাদটি পাঠ করতে করতে যুবকের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির একটা ঝিলিক খেলে যায়। হত্যাপরাধে অপরাধী আদালতে বিচারধীন নির্মল চৌধুরী আজ জগতের চোখে অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে মৃত আর জেল মেট বজলুল রহমান রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্ট।

পুলিশ খুঁজছে রহমানকে। খোঁজ যত খুশী, স্বর্গ মর্ত পাতাল, যেখানে খুশী খোঁজ। যত পারো খোঁজ।

আর নির্মল চৌধুবী, তুমি আজ মৃত। আগুনে পুড়ে তুমি দগ্ধে দগ্ধে মরেছো। হত্যাপরাধে অপরাধী, বিচারাধীন আসামী নির্মল চৌধুরী তোমার আর কোন অস্তিত্বই পৃথিবীতে আজ নেই।

বাইরের রাস্তায় একদল শবযাত্রীর মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বল হরি, হরি বোল! যুবকের বুকখানা কাঁপিয়ে কি একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। দুটো দিন দুটো রাত অনির্দিষ্ট উদ্‌ভ্রান্তের মত যুবক শহরের আশে পাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো। কোথায় যাবে আজ সে। পরিচিত জনদের দুয়ার আজ তার সামনে বন্ধ! আর অপরিচিত যারা তারা তো দুয়ার খুলবেই না। অজ্ঞাত কুলশীল। কত চেনা মুখ মনে পড়ে কিন্তু আশার বিন্দুমাত্র আলোও কোথাও নেই।

মুহূর্তের হঠকারীতায় এ কি করলো সে। এই অপরিচিত নামহীন চোরের মত আত্মগোপনের মর্মান্তিক পীড়ন ও নিরাশার চাইতে সেই জেল প্রকোষ্ঠের মধ্যে মুক্তির ক্ষীণতম আশা নিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণনা যে ঢের সুখের, শান্তির ছিল। জেল থেকে পালানোর সঙ্গে সঙ্গে যে তার এতদিনকার কষ্টার্জিত জীবনের সমস্ত পরিচয় সমস্ত অধিকারকে যে সে নিজ হাতে মুছে দিয়ে এসেছে। কেন সে উত্তেজনার মুখে একবারও এ কথাটা ভাবেনি!

মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে এই সাতাশ বছরের জীবনটা, কত আশা, কত আকাঙ্খা নিয়ে যা সে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল, তার সমস্ত অস্তিত্ব, সমস্ত স্বীকৃতি সে এমনি করে একটি প্রলোভনের মুহূর্তের উত্তেজনায় জেল প্রকোষ্ঠের মধ্যে ফেলে রেখে চলে এলো। এ সে কি করলো!

আসার সময় রহমান তার জামার পকেটে দশটাকার গোটা দুই নোট দিয়ে দিয়েছিল, তাও প্রায় শেষ হয়ে এলো। সামান্য গোটা সাতেক টাকা অবশিষ্ট আছে। তারপরই তো কপর্দকহীন অবস্থা! পরিচয়হীন শূন্য পকেট, সামনে নিষ্ঠুর বাস্তব মুখব্যাদন করে আছে।

সেদিন এক পার্কের এক বেঞ্চিতে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে বসে সংবাদপত্রে একটা নিউজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা পরিকল্পনা মাথার মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল বিদ্যুৎচমকের মত। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। ঠিক। ছাত্রজীবনের সবার চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার জহর।

ডাঃ জহর সেন! এফ্, আর, সি, এস। প্লাস্টিক সার্জারীর অন্যতম বিশেষজ্ঞ! সংবাদপত্রটা হাতে করে উঠে দাঁড়াল সে।

এককালে কলেজ জীবনে নির্মল চৌধুরীর পরম বন্ধু ছিল ধনী ব্যারিষ্টারের একমাত্র পুত্র জহর সেন। বি-এস্ সি ডিগ্রী নিয়ে, কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে সার্জারীতে অনার্স এম-বি পাশ করার পর, জহর সাগর পাড়ি দিয়েছিল। এফ্, আর, সি, এস হয়ে প্লাস্টিক সার্জারীর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিলাতের বিখ্যাত এক প্লাস্টিক সার্জেনের সহকারী হিসাবে সুদীর্ঘ চার বৎসর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর জহর সেন আবার দেশে ফিরে এসে টালীগঞ্জ অঞ্চলে তার পৈতৃক বাড়ীতেই নিজস্ব এক সার্জারী তৈরি করে প্রাক্‌টিস করছে গত বছরখানেক ধরে।

জহর তার সমস্ত ইতিহাস শুনলে নিশ্চয়ই তাকে ফেলে দেবে না, চিরদিনের জন্য না হলেও

কিছুকালের জন্য তাকে তার গৃহে আশ্রয় দেবেই। জহর আজও অবিবাহিত এবং গৃহে তার চাকর বাকর ছাড়া লোকজনও নেই। কিছু কালের জন্য অন্তত আত্মগোপন করে থাকবার মত জহরের গৃহ ব্যাতীত অন্য কোন স্থান আপাতত ওর মনে পড়ে না। তাছাড়া জহরের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কোন পথও হয়ত খুঁজে বের করা যেতে পারে।

রাত্রি তখন সাড়ে বারটা হবে। টালীগঞ্জ অঞ্চলে বিরাট কম্পাউণ্ডওয়ালা জহরের পৈতৃক বাড়ীটা যেখানে, সে অঞ্চলটা একেবারে তখন যেন ঘুমের স্তব্ধতায় তলিয়ে গিয়েছে। রাস্তার দুধারে গ্যাসপোষ্টগুলো কেবল ঈষৎ নীলাভ একচক্ষু মেলে অতন্দ্র প্রহরীর মত ঠায় একপায়ে দাঁড়িয়ে।

ডাঃ জহর সেন কিন্তু তখনো জেগেই ছিল। তার নির্জন বাড়ীর একতলায় বসে টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় একটা সার্জারীর জার্নাল পড়ছিল গভীর মনোযোগের সঙ্গে। পুরনো চাকর শম্ভু আজ দশদিন হলো ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে একমাসের জন্য। আর একজন চাকর, ঠাকুর তারাও যে যার কাজ সেরে ঘুমোচ্ছে। সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে একা জেগে ছিল জহরই। স্টাডির কাচের সার্সীর ওপাশে একটা মুখ চকিতের জন্য দেখা গেল। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী এক জোড়া চক্ষু।

টুক্ টুক্ টুক্......কাচের সার্সীর গায়ে মৃদু টোকা পড়লো।

প্রথমবার সে ক্ষীণ শব্দ জহরের কানে প্রবেশ করে না। আবার পূর্বের মত টোকা পড়তেই মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে শব্দ অনুসরণ করে তাকালো জহর।

সার্সীর ওপাশে একটা মুখ।

কে? কে ওখানে? ত্বরিতপদে উঠে দাঁড়াল জহর এবং এগিয়ে গেল জানালার দিকে। মুখটা কিন্তু সরে না।

চকিতে কাচের সার্সী খুলে ফেলে জহর ঃ কে?

আমি।

কে?

আমি, আমি—নির্মল!

এবারে সত্যিই চমকে ওঠে জহর—নির্মল!

হ্যাঁ, নির্মল চৌধুরী।

নির্মল! বিস্ময়ে উত্তেজনায় গলার স্বর যেন বুজে আসে জহরের। এ কি অসম্ভব ব্যাপার। খবরের কাগজে তবে যে দুদিন আগে নিউজ বের হয়েছে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নির্মল চৌধুরী মারা গিয়েছে।

সত্যিই আমি নির্মল জহর। আগুনে পুড়ে আমি মরিনি।

ঘরের মধ্যে মুখোমুখি দুজনে। নির্মল আর জহর। অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা কেবল একঘেয়ে টক্ টক্ একটা শব্দ তরঙ্গ জাগিয়ে চলেছে। এখনো বিশ্বাস করতে পারছিস না, সত্যিই সত্যিই আমি নির্মল!

কিন্তু—

সব শুনবি! আগে এককাপ চা খাওয়াতে পারিস?

চল, উপরে চল্—

তাই চল্।

আরো ঘন্টাখানেক পরে।

জহরের শোবার ঘরে দুজনে পাশাপাশি দুটো সোফায় বসে। নির্মল সংক্ষেপে তার সমস্ত কাহিনী জহরকে বলে একটু থেমে ওর মুখের দিকে তাকাল।

তারপর?

তারপর আর কি। পুলিশের চোখে আজ আমি মৃত হলেও এই কলকাতা শহরে এমন অনেক বন্ধু বান্ধব ও পরিচিতের দল আছে যারা হয়ত আমাকে দেখলেই চিনে ফেলবে।

তা সত্যি! কিন্তু একাজ তুই করতে গেলি কেন নির্মল! হয়ত বিচারে শেষ পর্যন্ত তুই মুক্তি পেতিস! কিন্তু এরপর—

হয়ত পেতাম আবার হয়ত নাও পেতে পারতাম। কিন্তু অনিশ্চয়ের সে প্রতীক্ষার যন্ত্রণা যে কি সে যাকে আমার মত এই দু'মাস ধরে কারাকক্ষের এক প্রকোষ্ঠে বসে সহ্য করতে হয়েছে শুধু সেই জানে। বিশ্বাস না হয় করলাম জহর শেষ পর্যন্ত হয়ত বা মুক্তি পেতাম কিন্তু তার

আগে হয়ত পাগল হয়েই যেতাম!

জহর চেয়ে থাকে বন্ধুর মুখের দিকে।

নির্মলের গলার স্বর কাঁপছে যেন এক মর্মান্তিক রুদ্ধ আক্রোশে। সে আবার বলে, তাছাড়া কেন, কেন এ অত্যাচার মুখ বুজে আমি সহ্য করবো বলতে পারিস জহর, কেন দুর্বল অশক্তের মত মাথা পেতে নেবো এ অন্যায়, এ অত্যাচার!

জহর কোন কথা বলে না চুপ করে থাকে।

নির্মল তখনো বলে চলেছে, যে অন্যায়, যে অত্যাচার আমার উপরে হয়েছে তার প্রতিশোধ আমি নেবো। তাকে—তাকে আমি ছাড়বো না!

কি বলছিস্ নির্মল! তাকে তুই চিনিস?

চিনিনা নামও তার জানি না। তাছাড়া নেশার ঘোরের মত আবছা তখন আমার স্মৃতিশক্তি। তবু তবু তার গলার স্বরটা আজও আমার মনে আছে। তাকে আমি যেমন করে হোক খুঁজে বের করবোই। করতে আমাকে হবেই—

কিন্তু কি করে সম্ভব হবে নির্মল! তুই বলিস তাকে চিনিস না, তার নাম পর্যন্ত জানিস না তুই!

কিন্তু তার গলার স্বর?

গলার স্বর তো কতজনের একরকম হতে পারে।

তা পারে। তবু তবু তাকে আমি ঠিক খুঁজে বের করতে পারবো। কেবল তুই—তুই যদি আমাকে একটু সাহায্য করিস।

আমি! আমি তোকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

পারিস। আর সেই জন্যই তোর কাছে আমি এসেছি—বলতে বলতে পকেট থেকে ভাঁজ করা সংবাদপত্রটা বের করে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটা নিউজের উপরে জহরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্মল বললো, এই যে নিউজের সঙ্গে আজকের কাগজে পাশাপাশি দুটি ফটো ছাপা হয়েছে একই ব্যক্তির এর মুখে প্লাষ্টিক অপারেশান তো তুই-ই করেছিস?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য অপারেশন করেছিস। কে বলবে যে এরা একই ব্যক্তি!

এতক্ষণে জহর ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে নির্মল তাকে কি বলতে চায়। বিস্ময়ে জহর নির্মলের মুখের দিকে তাকাল। বললে, এ তুই কি বলছিস নির্মল!

হ্যাঁ, অপারেশন করে তুই আমার মুখের এমন একটা অদল বদল করে দে যাতে করে পরিচিতেরা কেউ আর আমায় চিনতে না পারে।

কিন্তু—

কিন্তু নয় জহর, তোকে করতেই হবে ভাই। এছাড়া আজ আর আমার বাঁচবার দ্বিতীয় কোন পন্থাই নেই—

জহর যেন নির্মলের প্রস্তাবে কেমন চিন্তিত হয়ে পড়ে। বলে, দুটো দিন আমাকে ভাববার সময় দে ভাই! তুই যা বলছিস—

বেশ—ভাবতে চাস তুই ভাব। কিন্তু এটা তোকে করে দিতেই হবে।

দিন কয়েক পরে এক গভীর রাত্রে শেষবারের মত নির্মলের মুখে প্লাষ্টিক সার্জারির ছুরি চালিয়ে ডাঃ জহর সেন অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে এলো—নির্মলকে ওযুধের প্রভাবে ঘুম পাড়িয়ে।

আরো দিন কুড়ি পরে। একটা মস্তবড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের আলোয় নির্মল দেখছে তার নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে—প্রতিফলিত মসৃণ আয়নার কাচের গায়ে। পরিধানে মার্সেরাইজড় লাইট্ ব্লু রংয়ের সিল্কের সুট্।

পরিবর্তন! হ্যাঁ পরিবর্তন এমনি হয়েছে যে নিজেকেও আজ সে নিজে চিনতে পারবে না। সেই উন্নত খড়্গের মত নাক, দুদিকে যেন চেপে বসে বিশ্রী কুৎসিত থ্যাবড়া হয়ে গিয়েছে। ডান দিককার ভ্রূটা খানিকটা উঠে গিয়ে আগেকার সেই সুন্দর বাঁকানো যুগ্ম ভ্রূ চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মুখের দুপাশে গালের ওপরে কয়েকটা কঠিন রেখা হঠাৎ যেন দেখা দিয়ে পূর্বের সেই নমনীয়

শান্ত মুখশ্রীকে রুক্ষ ও কর্কশ করে তুলেছে। বাম দিককার চোখের বহির্কোণটা কেমন যেন একটু বেঁকে নিচের দিকে নেমে এসেছে। বাঁ দিককার কপালে একটা ক্ষত চিহ্ন। ডান দিককার চোয়ালে একটা কালো তিল। বাটারফ্লাই গোঁফ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে কালো মোটা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা।

পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল জহর। সে প্রশ্ন করে, কিরে, চিনতে পারছিস আর নিজেকে?

না—ফিরে তাকালো নির্মল। বললে, থ্যাঙ্ক ইউ। নাউ নির্মল চৌধুরী, ইজ্ ডেড্। মৃত নির্মল চৌধুরীর দেহে আজ আবার নতুন প্রাণ নিয়ে, নতুন জীবন নিয়ে বেঁচে উঠুক সলিল চৌধুরী।

।। দশ ।।

পরের দিন রাত্রে।

একটু আগে রাত তিনটের সংকেতধ্বনি শোনা গিয়েছে। জহরেরই বাড়ীর একতলার একটা ঘরে বিনিদ্র শয্যার 'পরে শুয়ে ছিল নির্মল! ঘুম ছিল না চোখে। এলোমেলো চিন্তা একটার পর একটা কেবলই যেন মস্তিষ্কের কোষে কোষে জট পাকাচ্ছিল।

ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল। ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদু একটা শব্দ তুলে ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল।

কে! ধড়ফড় করে শয্যার 'পরে উঠে বসে নির্মল।

অন্ধকারে অদূরে ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি।

কে! কে ওখানে?

মৃদু চাপা পুরুষ কণ্ঠে এবারে জবাব এলো, ভয় পাবে না নির্মলবাবু, আমি—

কে! কে তুমি?

আমাকে আপনি তো চিনবেন না। তবে শুধু এইটুকু পরিচয় দিলেই হয়ত যথেষ্ট হবে যে, আমারই সাহায্যে আপনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

আপনি!

হ্যাঁ। কিন্তু থাক সে কথা। এ ক'দিন আপনাকে সর্বত্র আমি অনুসরণ করে এসেছি। আপনার আজকের চেহারার পরিবর্তনও আমার অজ্ঞাত নয়—

সেকি!

হ্যাঁ! তার জন্য ভয়ের কিছু আপনার নেই। কারণ আমি জানি আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

আপনি জানেন!

হ্যাঁ। আর শুধু তাই নয়, যে আপনার এতবড় ক্ষতি করেছে, যে আপনাকে মিথ্যা হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িয়েছে—

আপনি, আপনি তাকে চেনেন?

না। তবে অনুমান করেছি একটা। কিন্তু কেবলমাত্র অনুমানেই তো হবে না কিছু, প্রমাণ চাই আজকের দিনে। আর সেই প্রমাণ যেমন করে হোক আমাকে খুঁজে বের করে হাতে নাতে তাকে ধরতে হবে।

কিন্তু—

তার জন্য সময়ের প্রয়োজন। অপেক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু এবারে আপনি কি করবেন কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলেন?

না। সেই কথাই তো ভাবছি আজ ক'দিন ধরে।

আমি একটা পথ আপনাকে বাতলাতে পারি।

কি?

বি এন এন্ড এন ঘোষ ও এন এন ঘোষ কোম্পানীর সঙ্গে তো আপনি কিছুটা পরিচিত?

হ্যাঁ।

বি এন এন্ড এন ঘোষ ও এন এন ঘোষ কোম্পানী আজ এ্যামালগেমেটেড হয়ে মেসার্স ঘোষ এন্ড কোম্পানী হয়েছে আবার। সেখানে শ্রীনাথ করের পোস্টটা আজও খালি আছে—

শ্রীনাথ করের পোস্ট!

হ্যাঁ, সেটাই চেষ্টা করুন।

কিন্তু—

ভয় করছেন কেন, আপনাকে তো চিনতে পারবে না।

কিন্তু আমার পরিচয়?

এই চিঠিটা নিয়ে কালই দেখা করুন,—বলতে বলতে ছায়ামূর্তি একটা চিঠির খাম ছুড়ে দিল নির্মলের দিকে। তারপর আবার বললে, ঐ চিঠির বাহকের নাম হচ্ছে, বিকাশ রায়। নামটা মনে রাখবেন। মান্দ্রাজ ওরিয়েন্টাল ফার্ম থেকে আপনি আসছেন। কথাগুলো মনে থাকবে?

থাকবে।

আপনি আসছেন এস্ রাঘবণের কাছ থেকে।

বেশ।

তাহলে এবারে চলি, গুড্ নাইট।—ছায়ামূর্তি পরক্ষণেই ঘর থেকে অদৃশ্য হলো।

॥ এগার ॥

বজলুল রহমানের রহস্যজনক নিরুদ্দেশ ও সেই সঙ্গে আকস্মিক নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, বিচারাধীন মামলার আসামী নির্মল চৌধুরীর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আরো রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশের কর্তৃপক্ষের মনে নির্মল চৌধুরী সম্পর্কে পূর্ব সন্দেহটা দৃঢ়মূল হলেও সুব্রত বা কিরীটি কিন্তু অত সহজে পুলিশের স্বপক্ষে রায় দিতে পারেনি। এবং সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে যে আরো দুর্জ্ঞেয় একটা রহস্য নিহিত আছে এটাই বরং তাদের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হয়েছিল। এবং পুলিশের দিক থেকে আপাততঃ ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেলেও সুব্রত একেবারে স্থির নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না।

সেদিন দ্বিপ্রহর থেকে বৈকাল পর্যন্ত সেই ব্যাপার নিয়েই কিরীটির বাড়ীতে তাঁর দোতলার বসবার ঘরে দুজনার মধ্যে আলোচনা চলছিল।

সুব্রত বলছিল, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা মস্তবড় রহস্য জড়িয়ে আছে আমারও তাই ধারণা।

শুধু তাই নয় সুব্রত—কিরীটি জবাব দেয়, অত্যন্ত বিশ্রীভাবে দগ্ধ যে মৃতদেহটা জেল প্রকোষ্ঠের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে সেটা যে আসলে কার মৃতদেহ, নির্মল চৌধুরী না রহমানের সেটাও বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখবার।

কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয় কিরীটি।—কিন্তু—

এটা অবিশ্যি ঠিক যে দুজনার একজন মারা গেছে। তেমনি অন্যজন পলাতক এও ঠিক। আর সেই দিক দিয়ে ঘটনাটার বিচার করতে গেলে বজলুল রহমানের মৃত্যুর একরকম তাৎপর্য আবার নির্মল চৌধুরীর মৃত্যুরও সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাৎপর্য। সমগ্র ঘটনার সত্যাসত্যের উপরে বর্তমান কেসের সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো দিক নির্ভর করছে।

সুব্রত কিরীটির কথা চুপ করে শুনতে থাকে।

কিন্তু আসল ঘটনার সত্যাসত্যের কথা ছাড়াও আর একটা কথা ভাববার আছে। আকস্মিক ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটতেই বা গেল কেন? কিরীটি আবার বলে।

আসল কালপ্রিট মানে নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করের হত্যাকারীরও তো এই ব্যাপারে হাত থাকতে পারে। বলে সুব্রত।

সম্ভবত না।

কেন?

কারণ একটা কথা ভেবে দেখ, জেল থেকে নির্মল চৌধুরীকে যদি সরাবারই মতলব করা হয়ে থাকে তাতে হত্যাকারীর লাভটা কি? যাকে অমন চমৎকার ভাবে অভিযুক্ত করে জেলের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, হত্যাকারী তাকেই আবার পালাবার পথ করে দেবে এটার কোন যুক্তি থাকতে পারে বলে তোর মনে হয়? কারণ এখন তো বুঝতে পারছিস হত্যার সঙ্গে নির্মল চৌধুরীর কোন যোগাযোগই ছিল না। তাকে কৌশলে জালে আবদ্ধ করা হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু নির্মল চৌধুরীর জেল থেকে পালাবার দিকটাই যদি ভেবে নিই তাহলে কে তাকে, এমন

ইন্টাররেস্টেড পার্টি যে বা যারা জেল থেকে তাকে পালাতে সাহায্য করতে পারে? সুব্রত পালটা প্রশ্ন তোলে এবারে।

সেটা পরে ভাববার বিষয়। আপাতত তোকে যা বলেছিলাম বিনয়েন্দ্র ঘোষ ও তস্য ভাইঝি শ্রীমতী নমিতা (বেবী) ঘোষের ওপর একটু নজর রাখতে, রেখেছিস?

হ্যাঁ।

এখন তো কোন অসুবিধাই নেই তোর, বেবী ঘোষের সঙ্গে যখন আলাপ হয়ে গিয়েছে মধ্যে মধ্যে এখন সেখানে যেতেও তো পারিস।

যাবো।

নরেন্দ্রবাবুর ছেলেও তো ফিরেছে শুনলাম। তার সঙ্গে আলাপ হলো?

না, এখনো সুযোগ করে উঠতে পারিনি।

বিমলাদেবী সম্পর্কে একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিস না কিন্তু—

তুই দেখছি বিমলাদেবীকে একেবারে ভুলতেই পারছিস না কিরীটি।

হাসিখুশির সেই কবিতাটা তোর মনে আছে নিশ্চয় সুব্রত।

কোন্ কবিতাটা?

প্রত্যুত্তরে কিরীটি মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করে—

বুলবুলিটির মুখটি কালো।
ভালুক জানে বাসতে ভালো।

মানে?

বুঝে দেখ।

ঐ দিনই রাত তখন আটটা বেজে মিনিট দশ পনের হবে। দক্ষিণ কলকাতার কোন একটি চিত্রগৃহে ক্যাবলাকুমার ও মিতা মিত্রের অভিনীত নতুন একটি বাংলা চিত্র রিলিজ করায় দর্শকের বেজায় ভিড়। দ্বিতীয় শো শুরু হতে আর মিনিট পনের বাকী। রাস্তায় মানুষ ও গাড়ির ভিড়ে তিল ধারণেরও স্থান নেই। সুব্রত সেই ভিড়ের মধ্যে ফিরতি পথে গাড়ি নিয়ে আটকে পড়েছে।

সহসা সিনেমা থেকে কিছু দূরে কার পার্কের কাছে একটা জনতার বেশী রকম ভিড় ও ঠেলাঠেলির কৌতুহল দেখে সুব্রত নিজের গাড়িটা একপাশে পার্ক করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল ব্যাপারটা কি জানবার জন্য।

কি হয়েছে মশাই? ব্যাপার কি?

কে একজন জবাব দেয়, গাড়ির মধ্যে একটা লোক মারা গেছে।

গাড়ির মধ্যে লোক মারা গেছে? সুব্রত কৌতূহলে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, এগিয়ে গিয়ে দেখুন না। এক ভদ্রমহিলার ড্রাইভার।

সুব্রত আরো এগিয়ে গেল। লাল পাগড়ীরও তখন সেখানে আবির্ভাব হয়েছে। সেই লাল পাগড়ীর সাহায্যেই, নিজের পরিচয় দিয়ে সুব্রত ভিড় খানিকটা দুপাশে সরিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট গাড়িটার খুব কাছে এগিয়ে গেল।

একটা মেরুন কলারের চক্‌চকে বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি।

গাড়ির ঠিক সামনেই খোলা দরজাটার হ্যাণ্ডেলটা ধরে, বটুয়া হাতে সুবেশা একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে তখনো। তার চোখে মুখে একটা ভয় ও বিস্ময়ের ছায়া। অদূরে লাইট পোষ্টের আলো তরুণীর চোখে মুখে এসে পড়েছে। তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়েই কিন্তু সুব্রতর মনে হয় মুখটা চেনা চেনা।

সুব্রত কৌতূহলে আরো সামনে এগিয়ে গেল। লাল পাগড়ীও সুব্রতর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায়। এবারে আর চিনতে কোন কষ্ট হয় না। শ্রীমতী বেবী ঘোষ।

কে! মিস্ ঘোষ না?

সুব্রতর প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকায় বেবী, কে?

চিনতে পারছেন না। আমি সুব্রত—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে।

কিন্তু ব্যাপার কি?

কিছুই তো বুঝতে পারছি না। দেখুন না কি বিভ্রাট। ড্রাইভারকে গাড়িতে বসিয়ে শো দেখতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি লোকটা ডেড্।

হুঁ। বলে সুব্রত এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ভিতর উঁকি দিতেই একটা ঝাঁঝালো কটু গন্ধ তার নাসারন্ধ্রে এসে যেন মৃদু একটা ঝাপটা দিল। আর সেই সঙ্গে নজরে পড়লো সামনের সীটে হেলান দিয়ে কে একজন বসে আছে। মাথাটা তার একপাশে হেলে পড়েছে। গাড়ির ড্যাসবোর্ডের আলোটা জ্বেলে দিয়ে লোকটাকে পরীক্ষা করতেই সে বুঝতে পারে লোকটা মৃত।

সুব্রত অতঃপর পাশেই দন্ডায়মান লালপাগড়ীর দিকে তাকিয়ে বলে, কি নাম তোমার সেপাইজী?

লছমন চৌবে সাব।

হুইসেল বাজিয়ে তোমার কোন সাথীকে ডেকে থানায় দারোগাবাবুকে একটা খবর দাও।

সেপাই তখুনি সজোরে হুইসেলে ফুৎকার দিল।

আরো ঘন্টাখানেক বাদে পুলিশের জিম্মায় আপাতত গাড়ি ও মৃতদেহ রেখে সুব্রত বেবীকে বললো, চলুন আমার গাড়িতে, আপনাকে আপনাদের বাড়ীতে ড্রপ করে দিয়ে যাই—

না, না—আমি ট্যাক্সী নিয়েই যেতে পারবোখন। —বেবী বলে।

তা পারবেন জানি। কিন্তু তবু আজ আমিই আপনাকে পৌঁছে দেবো চলুন।

সুব্রতর কণ্ঠস্বরে একটু যেন চমকেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেবী মৃদুকণ্ঠে বলে, চলুন।

গাড়িতে উঠে, সামনের সীটেরই পাশাপাশি দুজনে বসে। ষ্টার্ট দিল গাড়িতে সুব্রত। ক্লাচ ছাড়তে ছাড়তে বলে, লেক টেরেসে তো আপনাদের বাড়ী?

হ্যাঁ।

সুব্রত গাড়ি ব্যাক্ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল, এবং রসা রোড ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে আবার প্রশ্ন করল, আপনার অভিভাবক তো বিনয়েন্দ্রবাবু, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনার কাকা তো শুনেছি বিয়ে করেননি।

তাই, কিন্তু এসব কথা জানলেন কি করে আপনি?

আপনার বড় কাকা নরেন্দ্রবাবু আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁর মুখেই সব শোনা। হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনলাম আপনার বড় কাকার কোম্পানী ও আপনাদের কোম্পানী সব একত্র হয়ে গিয়েছে।

যায়নি এখনো, তবে যাচ্ছে। কাগজ পত্র সব তৈরী হচ্ছে।

হঠাৎ আবার সব একত্র হয়ে যাচ্ছে?

দাদা মানে রমেনদা, বড় কাকার ছেলে একা সব দেখা শোনা করতে পারবেন না বলে ছোটকাকার পরামর্শ মত সেই ব্যবস্থাতেই তিনি রাজী হয়েছেন।

ইতিমধ্যে গাড়ি প্রায় বেবীদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। বেবীই বলে দেয়, ঐ যে লাল রংয়ের চতুর্থ কোলাপ্সিবল গেটওয়ালা বাড়ীটা, ওটাই আমাদের বাড়ী।

গাড়ি গেটের সামনে আসতেই শিখ দারোয়ান হর্ন শুনে গেট খুলে দিল। সুব্রত গাড়ি নিয়ে গেটের মধ্যে প্রবেশ করে একেবারে গিয়ে পোর্টিকোর নিচে গাড়ি থামাল।

বেবী গাড়ি থেকে নেমে বলে, নামবেন না?

না।

বা রে, এককাপ চাও খেয়ে যাবেন না?

সে আর এক সময় হবে। একটা কথা বলবো ভাবছিলাম—

কি?

যখন তখন যেখানে সেখানে বিশেষ করে রাত্রে একা বেরুবেন না। আর রাত্রেও শোবার সময় ঘরের দরজা এঁটে শোবেন। একলা একটা ঘরেই শোন তো।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বেবী বলে, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো। এসব কথা বলছেন কেন?

কথাটা আপনাকে তাহলে একটু খুলেই বলি মিস্ ঘোষ। আপনার আজকের ড্রাইভারের মৃত্যুটা আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ন্যাচারাল অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু বা এ্যাকসিডেন্ট্ নয়।

কি বলছেন সুব্রতবাবু! বিস্মিত বেবী সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়।

যা মনে হয়েছে তাই বললাম। কারণ এই মাত্র বললাম তো আপনাকে, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তো, আপনার জীবনের উপরেই কেউ না কেউ এ্যাটেম্পট্ নিশ্চয়ই নিয়েছিল আজ এবং সেদিক থেকে আপনার ড্রাইভারের মৃত্যুটা সম্ভবত ঘটনাচক্রেই ঘটে গিয়েছে।

সে কি!

হ্যাঁ, আর সেই জন্যই বলছিলাম, সর্বদা একটু সতর্ক থাকবেন। কারণ সত্যিই যদি আপনার লাইফের 'পরেই আজ এ্যাটেম্পট্ হয়ে থাকে তাহলে আবার এ্যাটেম্পট্ তারা করবেই।

বেবী সত্যিই যেন সুব্রতর কথায় বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এসব আবার কি কথা! তার জীবনের পরে এ্যাটেম্পট্!

আচ্ছা গুড্ নাইট। আজকে তাহলে চলি—

গুড্ নাইট।

বেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইচ্ছা করেই সুব্রত ফিরতি পথে ভিড় বাঁচাবার জন্য বালীগঞ্জ সারকুলার রোড ধরেছিল।

এবং কিছুটা রাস্তা পার হবার পর হঠাৎ একটা জিনিস তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। সুব্রত সজাগ হয়ে ওঠে।

গাড়ির মধ্যেকার সামনের ভিউ মিরারে হঠাৎ সুব্রতর নজরে পড়ে, তার গাড়ির সঙ্গে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে একটা কালো রংয়ের গাড়ি পিছনে পিছনে আসছে তার।

সুব্রত একবার গাড়ির গতি কমিয়ে দিল, পিছনের গাড়িটারও স্পিড সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল। গাড়ি থামালো সুব্রত, পিছনের গাড়িটাও থামলো। এবারে নিঃসন্দেহ হয় সুব্রত যে, গাড়িটা তারই গাড়িটাকে ফলো করছে। নিজের মনেই হাসলো সুব্রত। এবং পরক্ষণেই হঠাৎ গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। একেবারে চল্লিশ মাইল।

।। বার ।।

বিকাশ রায়ের পরিচয়ে আশ্চর্য সত্যিই নির্মলের বিনয়েন্দ্রের অফিসে চাকরি পেতে কোন অসুবিধাই হলো না। বিনয়েন্দ্র ঘোষের নামে চিঠিটার মধ্যে কি লেখা ছিল নির্মল অবিশ্যি জানবার অবকাশ পায়নি, কারণ চিঠির মুখ আঁটা ছিল। বিনয়েন্দ্র চিঠিটা পড়ে সামান্য দু'চারটে মামুলী প্রশ্ন করেই নির্মলকে মৌখিক এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়ে বলে দিলেন পরের দিন থেকেই কাজে জয়েন করতে।

মৌখিক এ্যাপয়েন্টমেণ্ট পেয়ে নির্মল বিনয়েন্দ্রের অফিস থেকে বের হতেই গেটের সামনে একটা ভিখিরি গোছের ছেলে সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার নাম বিকাশ রায় কি? বেশ একটু যেন বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়েই নির্মল ছেলেটাকে শুধায়, হাঁ, কেন বলতো?

এই চিঠি—বলে ছেলেটি নির্মলের হাতে একটা চিঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেল। বিস্মিত বিকাশ (নির্মল) একটু এগিয়ে গিয়ে একটা লাইট পোষ্টের নিচে দাঁড়িয়ে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলো।

সংক্ষিপ্ত চিঠি! এবং পূর্ববৎ কোড লেটারে লেখা।

CHAKRI JODI HOE GEA THAKE, HOTELE UTHE JAN. অর্থাৎ চাকরি হয়ে গিয়ে থাকলে আর যাতে সে জহরের ওখানে না থাকে তারই নির্দেশ। কে তুমি অদৃশ্য বন্ধু জানি না, তোমার পরিচয়ও তুমি দেবে না, বেশ দিও না। তবে তোমার নির্দেশ মতই আমি কাজ করবো। মনস্থির করে ফেলে নির্মল। এবং সেই দিনই খুঁজে খুঁজে বৌবাজারের কাছাকাছি একটা হোটেলে তিন-তলার একটা নিরিবিলি ঘর এনগেজ করে পরের দিন উঠে এলো এখানে জহরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

দিন সাতেক পরে পূর্ববৎ কোডেই আর একটা চিঠি এলো নির্মলের হাতে। এবং এবারের চিঠিটার অর্থ হচ্ছে তোমাকে যে জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে কথাটা কি ভুলে গেলে। ভুলে গেলে কি যে তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের জালে ফেলে ফাঁসী কাঠের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল এক শয়তান! যদি বাঁচতে চাও তো সর্বাগ্রে তার মুখোসটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করো। অফিসের সব ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখলেই অনেক কিছু জানতে পারবে। ইতি—

অফিস সংক্রান্ত একটা জরুরী ফাইলের মধ্যে ডুবে ছিল নির্মল। চিঠিটা পেয়ে সমস্ত অতীত তার দুঃখ লজ্জা ও অপমানের জ্বালা নিয়ে চোখের সামনে যেন সঙ্গে সঙ্গে আবার ফুটে ওঠে। সেই সঙ্গে আজ আবার অনেকদিন পরে একটি প্রিয় মুখের ছবিও মনের পাতায় জ্বল জ্বল করে ওঠে। করবী। করবী কি আজও তাকে মনে রেখেছে, না সংবাদপত্রে তার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলের সমস্ত স্মৃতিই মন থেকে তার মুছে গিয়েছে। যদি তা গিয়েই থাকে সেটার জন্য কোন নালিশই তো চলবে না। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। তবু আবার মনে হয়। কেন, কেন ভুলে যাবে রুবি তাকে। সে তো কই এখনো একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না রুবিকে।

একটিবার, একটিবার সে কি রুবিকে গিয়ে দেখে আসতে পারে না। একবার শুধু যদি বলে আসে : রুবি, তুমি যা জেনেছো তা সত্যি নয়। আমি মরিনি। নির্মল আজও বেঁচে আছে। না, না—তা এখন হবার নয়। সে আজ মৃত। দুনিয়ার চোখে নির্মল চৌধুরী আজ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত।

কোন্ দুঃসাহসে তবে আজ সে রুবির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

রুবি যদি বলে কে তুমি, তোমাকে তো আমি চিনি না। তখন, তখন সে কি জবাব দেবে? রুবি! রুবি তার স্বপ্নের মানস প্রতিমা। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। না, না—তাব বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাকে মলিন করবে না। দূর আকাশের শুকতারার মতই তার স্মৃতির পাতায় থাক সে আজ নিভৃতে সেই দুঃখ নিশির শেষে প্রত্যুষের প্রতীক্ষায়। এই চোরের মত ছদ্ম ঘৃণিত জীবন যাপন—আগে এর শেষ হোক। অত্যাচারীর প্রতি সে আগে প্রতিশোধ নিক। তারপর ....

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে 'মতিঝিল' নামে যে বিঘে দেড়েক জমির উপরে সামনে ও পিছনে বাগানওয়ালা মস্তবড় দোতলা বাড়ীটা তার মালিক হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের এক প্রৌঢ় চিরকুমার জমিদার সন্তোষ মিত্র। ভদ্রলোকের বয়েস ঠিক যে কত তা বোঝবার উপায় নেই বলিষ্ঠ দেহ-সৌষ্ঠব দেখলে। তবে তিনি নিজে বলেন পঞ্চাশের উপরে নাকি তাঁর বয়স।

গায়ের বর্ণ মাজা মাজা। এক মুখ দাড়ি কাঁচায় পাকায় মেশানো। মাথার বড় বড় চুলও কাঁচায় পাকায় মেশানো। প্রথম যৌবনে কি একটা দুর্ঘটনায় ডান পায়ের পক্ষাঘাতে দীর্ঘদিন ধরে ভুগেছিলেন। হাঁটবার সময় তাই ডান পাটা একটু টেনে চলেন। তাছাড়া চোখের অসুখের জন্য সর্বদা রঙীন কাচের চশমা ব্যবহার করেন। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন বেশির ভাগ সময়ই, হয় লাইব্রেরী ঘরে বসে পড়াশোনা করেন, না হয় লাইব্রেরী ঘরেরই এক কোণে একটা বিরাট অর্গান আছে, সুর সাধনা করেন।

বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে গ্যারেজে বিরাট একটা গাড়ি আছে এবং একজন বৃদ্ধ ড্রাইভারও আছে। বেলা দশটা নাগাদ ও রাত্রে একবার করে বাইরে যান। সর্বদা দেখাশুনা ও ফাইফরমাস খাটাবার জন্য একটা নেপালী ভৃত্য আছে ঃ রণবাহাদুর থাপা। আর বাড়ী প্রহরার জন্য জনা দুই শিখ দারোয়ান আছে। ভদ্রলোক দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা কারো সঙ্গেই করেন না—বিশেষ করে আগে থাকতে এ্যাপয়েন্টমেন্ট না করা থাকলে। বেশী দিন নয় মাত্র বৎসর দুয়েক হবে সন্তোষ মিত্র 'মতিঝিল' কিনে ওখানে এসে বসবাস করছেন। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করলে কি হবে, মধ্যে মধ্যে মতিঝিল বিশেষ এক শ্রেণীর আগন্তুকদের বহুকণ্ঠের কলরবে সচকিত হয়ে ওঠে। এবং তাদের মধ্যে সকলেই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।

সেদিন বৈকালের দিকে সন্তোষ মিত্র একাকী তার বিরাট লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে বসে একটা মোটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন ও মধ্যে মধ্যে দরজার পর্দাটার দিকে তাকাচ্ছেন, পর্দার নিচে একজোড়া পরিচিত পায়ের শুভাগমনের প্রতীক্ষায়। হাতে বই ধরা থাকলেও কোন বিশেষ একজনের আগমনেব প্রতীক্ষায় যে সন্তোষ মিত্র বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন সেটা তাঁর চোখ মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পর্দার ওপাশে পদক্ষেপ শোনা গেল ও তার একটু পরেই স্যাণ্ডেল পরিহিত একজোড়া পা দেখা গেল।

ভিতরে আসতে পারি সন্তোষদা?

আরে কে করবী, এসো, এসো—সাগ্রহে আহ্বান জানালেন সন্তোষ মিত্র।

করবী এসে ঘরে প্রবেশ করলো। এই ক'দিনে করবীর চেহারা যেন আরো বিষণ্ণ মনে হয়।

বোস, বোস—

একটা সোফার 'পরে বসতে বসতে করবী ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, মণির সঙ্গে সেদিন রাস্তায় দেখা, সে বলছিল আপনি নাকি আমাকে বিশেষ কি কারণে একবার দেখা করতে বলেছেন।

হ্যাঁ, দেখা করতে বলেছিলাম। পর পর চার পাঁচটা সম্মিলনীতে তুমি এলেই না।

ভাল লাগে না তাই আসি না। —মৃদুকণ্ঠে বলে করবী।

একটা কথা বলবো করবী?

করবী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সন্তোষ মিত্রের মুখের দিকে তাকালো।

মিথ্যে নিজেকে আর এমনি করে কষ্ট দিয়ে লাভ কি বল! মৃত্যুর পরপার থেকে তো আর সে ফিরে আসবে না!

করবীর চোখের কোল দুটি অশ্রুতে ছল ছল করে ওঠে।

সন্তোষ মিত্র বলতে থাকেন, তাছাড়া আমার তো মনে হয় এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। কারণ হয় তাকে সারাটা জীবন ধরে কারাগারে থাকতে হতো না হয় ফাঁসীই যেতে হতো। তাছাড়া তুমি—হঠাৎ কণ্ঠের স্বর বদলে সন্তোষ মিত্র বলতে থাকেন, তুমিই বা কেন আজো তাকে মনে করে রাখবে! যে নরহত্যার কলঙ্কে এমনি করে তোমার ভালবাসাকে অপমান করে—

না, না—সহসা যেন আর্ত করুণ কণ্ঠে সন্তোষ মিত্রকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে করবী, বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না সন্তোষদা, নির্মল কোনদিন কাউকে হত্যা করতে পারে। সে নিষ্পাপ, নির্দোষ!

বেশ। তাই যদি হয় তাহলেও তো আজ সে সব কিছুর বাইরে চলে গেছে। তবে আজ আর মিথ্যা কেন তার স্মৃতিকে নিয়ে অশ্রুমোচন করবে!

পারবো না, কোনদিনই তাকে আমি ভুলতে পারবো না সন্তোষদা! অসম্ভব। আমার পক্ষে তা অসম্ভব! দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে করবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ছিঃ করবী! তুমি বুদ্ধিমতী! এমনি করে শোক করা তোমার সাজে না। তোমার সমস্ত জীবনটাই যে এখনো সামনে পড়ে। একবার ভেবে দেখ তো এভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে কি তুমি তোমার আত্মাকেই নিগ্রহ করছো না!

ও সব কথা থাক সন্তোষদা: আমি জানি তাকে এ জীবনে কোন দিনই ভুলতে পারবো না।

তা বেশ! বেশ—কিন্তু সোসাইটি একেবারে ছেড়ে দিলে কেন? সামনের বুধবার সন্ধ্যায় এখানে একটা গ্যাদারিং আছে, এসো!

চেষ্টা করবো।

চেষ্টা করবো নয়। এসো—

আমি তাহলে আজ উঠি সন্তোষদা?

এসো। হ্যাঁ ভাল কথা, সুহাস বলছিল তার কি বই কেনার দরকার, এই টাকাটা তাকে দিয়ে দিতে পারবে? সে তো তোমাদের স্কুলেই চাকরি করে—বলতে বলতে একশ টাকার একটা নোট পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিলেন সন্তোষ মিত্র করবীর দিকে।

পারবো।

টাকাটা নিয়ে নিজের হাত ব্যাগে রেখে নিঃশব্দে করবী ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাইরের বারান্দায় পদশব্দ মিলিয়ে যাবার পর সন্তোষ ধীরে ধীরে উঠে, পা টেনে টেনে গিয়ে অর্গানের সামনে টুলটার ওপরে বসে অর্গানের ডালা খুলে তার রিডগুলোয় হাত রেখে বাজাতে শুরু করলেন।

রাত বারটা বেজে গিয়েছে। কিন্তু করবীর চোখে ঘুম ছিল না। বিনিদ্র অবস্থায় সে তার নিজের শয়ন কক্ষের মধ্যে কেবলই পায়চারি করছিল। করবীর বাবা রমেন্দ্রবাবু দিন কয়েকের জন্য কি একটা কাজে যেন বেনারস গিয়েছেন। অনিমেষবাবুরও আজ দিন দুই কোন সংবাদ নেই। মধ্যে মধ্যে যেমন তিনি দু'চার দিনের মত ডুব দেন, তেমনই ডুব দিয়েছেন। বাড়ীতে সে ও ঝি চাকররাই আছে। কিন্তু অত রাত্রে তারাও নিচের ঘরে ঘুমিয়ে। বাড়ীটার বাইরের অংশেরও গোলমাল থেমে গিয়েছে।

করবী এক সময় গঙ্গার দিকের খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়ালো। জানালা থেকে গঙ্গার অনেকটা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয়। গঙ্গার মৃদু তরঙ্গ কল্লোল, নিঝুম রাতে যেন দূরাগত অস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনীর মতই মনে হয়। অন্ধকার রাত্রি। অগণিত নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ যেন প্রিয়া লাগি সহস্র চক্ষু মেলে নিশি জাগছে। মৃদু নক্ষত্রালোকে যেন গঙ্গাবক্ষে চলেছে আলোছায়ার একটা লুকোচুরি। বাঁধানো ঘাটের পাশে বিরাট শাখা পত্রবহুল বটগাছটা নিশীথের চোরা হাওয়ায় সিপ্ সিপ্ শব্দ করছে।

নির্মল কতদূরে তুমি জান না! কেন, কেন তুমি এমনি করে নিজেকে শেষ করে দিলে! এতটুকু ধৈর্য তুমি কেন ধরতে পারলে না!

সহসা দরজার ভেজানো কপাট দুটো মৃদু একটা শব্দ তুলে খুলে গেল।

কে? —চকিতে ফিরে দাঁড়ালো করবী।

মনের অস্থিরতায় ঘরের দরজাটা পর্যন্ত সে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল তাও মনে নেই। ভয়ে বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করছে তখন করবীর। দরজার ঠিক উপরে অন্ধকারে অস্পষ্ট কে একজন দাঁড়িয়ে।

কে! কে ওখানে! —গলা দিয়ে যেন করবীর স্বর বের হতে চায় না।

ভয় পাবেন না করবীদেবী।

কে? ....বিস্ময়ে চমকে ওঠে করবী, এ যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। আবার জিজ্ঞাসা করে করবী, কে? কে?

আমাকে আপনি চিনবেন না করবীদেবী। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। আপনার সঙ্গে যে দেখা করতে পারবো তা ভাবিনি, সৌভাগ্য যে আপনার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল, নচেৎ হয়ত নিরাশ হয়েই আমাকে ফিরে যেতে হতো। কিন্তু যাক্ দেখা যখন সৌভাগ্যক্রমে হয়েই গেল তখন আপনার সঙ্গে যে জন্য আমার এখানে এত রাত্রে ভাগ্যের 'পরে নির্ভর করে আসা, সে কথাটা জানিয়ে যাই। আপনি নির্মল চৌধুরীকে চিনতেন?

নির্মল! কিন্তু কে, কে আপনি?

বলতে পারেন সে আর আমি অভিন্ন হৃদয়। আর তাতেই আমি জানি, আপনার প্রতি তার কি গভীর ভালবাসাই না ছিল। কিন্তু হতভাগ্য সে—নইলে খুনের কলঙ্কের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়বে কেন! যাক্ সে কথা, শুধু একটা কথা আমি জানতে এসেছি, সে হতভাগ্যের স্মৃতি কি আজও আপনার মনে আছে?

যদি থাকেই, তাতেই বা আজ আর তার কি! সেতো সব কিছুরই শেষ মীমাংসা করে দিয়ে গিয়েছে।

করবীদেবী. যদি বলি নির্মল আজো বেঁচেই আছে—

কি! কি বললেন—আর্তকণ্ঠে যেন করবী অস্ফুট একটা চিৎকার করে ওঠে।

হ্যাঁ, করবীদেবী, নির্মল সত্যিই আজো বেঁচে আছে।

বেঁচে আছে! নির্মল আজো বেঁচে আছে! সত্যি, সত্যি বলছেন? উৎকণ্ঠার আবেগে করবীর কণ্ঠস্বর যেন ভেঙ্গে পড়ে।

হ্যাঁ, করবীদেবী। সে বেঁচে আছে। সেই সংবাদটুকু আপনাকে দেবার জন্যই সে আজ আমাকে এখানে পাঠিয়েছে—

বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায়, কোথায় সে?

ব্যস্ত হবেন না করবীদেবী, আপনার কথা গিয়ে তার কাছে আমি বলবো! কিন্তু যতদিন না যে কলঙ্কের সঙ্গে আজ সে জড়িত, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, ততদিন তার অজ্ঞাতবাসই চলবে। যতদিন না সেই শয়তানের মুখোস খুলে দিয়ে নিজেকে সে আজকের তার এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারে, ততদিনই সে আসবে না আপনার কাছে, তাই সে আমাকে জানিয়ে যেতে বলেছে শুধু আপনাকে! তাকে, যেন ভুল বুঝবেন না।

না, না—তাকে বলবেন, আমি, আমি—তাকে ভুল বুঝিনি, আর আমি, আমি—সেই দিনেরই অপেক্ষা করবো। কান্নায় করবীর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, গলার স্বর বুজে আসে।

করবী নিজেকে সামলে নেবার আগেই কিন্তু আগন্তুক কক্ষ ত্যাগ করেছে। এবং তারও কিছুক্ষণ

পরে করবী ঘরের আলোটা সুইচ টিপে জ্বালাতেই মেঝের 'পরে একটা জিনিষ তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করলো। কৌতূহলে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে দেখে একটা রুমাল।

রুমাল! এ রুমাল এখানে এলো কি করে? তবে কি ক্ষণকাল পূর্বের সেই আগন্তুকই ভুলক্রমে রুমালটা এখানে ফেলে গিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই রুমালে এক কোণে সবুজ সুতায় লেখা একটা নাম তার চোখে পড়তেই যেন চমকে ওঠে।

নির্মল!

এ কি! এ তো তারই হাতের সবুজ সুতো দিয়ে নির্মলের নামের আদ্যাক্ষর 'এন্' লিখে দেওয়া রুমাল! ছটা রুমালে সবুজ সুতো দিয়ে নাম তুলে গতবার জন্মদিনে নির্মলকে সে প্রেজেন্ট করেছিল। তবে। তবে কি! নির্মল! হ্যাঁ, তাই গলার স্বর এতো পরিচিত মনে হয়েছিল তার!

নির্মল! নির্মল—তুমি এলে তবু পরিচয় দিলে না তোমার রুবির কাছে। তোমার রুবিকে আজও তুমি চিনতে পারলে না নির্মল! মুক্তার মত অশ্রুর ফোঁটাগুলো করবীর চোখের কোলে, গণ্ড ও চিবুককে প্লাবিত করে নিঃশব্দে ঝরতে থাকে।

॥ তের ॥

ময়না তদন্তের দ্বারা সে রাত্রে বেবীর গাড়ির ড্রাইভার রতনলালের মৃত্যুর কারণটা জানা গিয়েছে। কার্বণ মেনোকসাইড পয়জনিং। থানা অফিসার সুশীল সোমের থানার নিজস্ব অফিস ঘরে দুজনে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে সুব্রত ও সুশীল সোমের মধ্যে সেই আলোচনাই চলছিল।

সুব্রত বলছিল, সত্যি হত্যাকারী এবারে হত্যা করবার জন্য যে পন্থা বেছে নিয়েছিল, বলতে বাধ্য হচ্ছি সেটা শুধু অদ্ভুতই নয় বিস্ময়কর।

কিন্তু এখনো আমি বুঝতে পারছি না সুব্রতবাবু, লোকটা কার্বন মনোকসাইড পয়জনিং-এ মরলো কি করে?

সে কথাই তো বলছি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট আপনার মুখ থেকে শোনবার পর যা আমার মনে হয়েছে তা হচ্ছে, আসলে হত্যাকারীর লক্ষ্য ছিল সে রাত্রে কিন্তু ড্রাইভার রতনলাল নয়।

তবে?

তার লক্ষ্য ছিল বেবী ঘোষ।

বলেন কি!

হ্যাঁ। রতনলালের মৃত্যুটা একটা পিওর এ্যাক্সিডেন্টও বলতে পারেন। হত্যাকারী যেই হোক্, সে জানতো খুব ভাল করেই যে বেবী সাধারণতঃ নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে থাকে। আর সদা সর্বদা সে ঐ গাড়িটাই ব্যবহার করে থাকে। রতনলালের মৃত্যু কপালে নেহাৎ ছিল বলেই বোধহয় সেদিন বেবী নিজে না গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভার রতনলালকে সঙ্গে নিয়েছিল ড্রাইভ করবার জন্য। যাহোক বেবী ঐ গাড়িটাই ব্যবহার করে ও নিজে সর্বদা ড্রাইভ করে জেনেই হত্যাকারী বেবীর বাড়ীর কোন চাকর বাকরকে টাকা খাইয়ে হাত করে কোন এক ফাঁকে গাড়ির মধ্যে কৌশলে ঐ ব্যবস্থা করে রেখেছিল যাতে করে এক সময় না এক সময় সহজেই বেবীকে শেষ করে ফেলা যেত পারে। শুধু তাই নয়, হত্যাকারী আরো ক্যাল্‌কুলেশন করেই ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। এখন বর্ষাকাল, প্রায়ই বৃষ্টি হয়। হঠাৎ রাস্তায় বৃষ্টি নামলে আরোহী বাধ্য হবে গাড়ির দরজার সব কাঁচ তুলে দিতে, যার ফলে বন্ধ গাড়ির মধ্যে ক্রমশঃ একজস্ট্ পাইপ থেকে বিষাক্ত কার্বন মনোক্‌সাইড গ্যাস এসে জড়ো হয়ে আরোহীকে ধীরে ধীরে অচেতন করে ফেলে হয় তাঁর মৃত্যু ঘটাবে না হয় বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে অচেতন অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে এ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবে ও আপনা থেকেই মৃত্যু হবে চালকের।

সত্যিই আপনি তাই মনে করেন মিঃ রায়? সুশীল সোম প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ। এ সম্পর্কে অনুমান আমার এতটুকু মিথ্যে নয়। এবং শুধু তাই নয়, বেবীকে ঐভাবে মারবার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এটাই আবার নতুন করে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নরেন্দ্রনাথ, শ্রীনাথ কর ও রতনলালের হত্যাকারী একই ব্যক্তি।

একই ব্যক্তি!

এখনো সেটা বুঝতে পারলেন না সুশীলবাবু! আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে

দেখলে বুঝতে পারবেন, পরপর এই হত্যাগুলো একই জায়গা বা বলতে পারেন একই মাটি থেকে রস শোষণ করছে।

তাহলে আপনি বলতে চান সুব্রতবাবু—

বাধা দেয় সুব্রত। বলে, বলতে চাই আপনারা নির্মল চৌধুরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ণচ্ছেদ টেনে বসে আছেন, এই তিন তিনটি হত্যার ব্যাপারে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ টানলে চলবে না। নতুন করে আবার আপনাকে ঐ হত্যা রহস্যের মীমাংসায় অগ্রসর হতে হবে।

কিন্তু নির্মল চৌধুরীর মৃত্যুটা তাহলে—

তার মৃত্যু হয়েছে সেটাই বা অবিসংবাদী ভাবে ধরে নিচ্ছেন কেন?

এখনো আপনি তাই বলতে চান সুব্রতবাবু!

নিশ্চয়ই, বিকৃত দগ্ধদেহ যেটা আমরা জেলের মধ্যে পেয়েছি, নির্মল চৌধুরী বলে তাকে সনাক্ত করবার একটি মাত্রই তো সূত্র আমাদের হাতে যে, তার দেহে নির্মল চৌধুরীর পোষাকটা ছিল, আর তো কোন সূত্রই আমরা পাইনি সুশীলবাবু।

তা অবিশ্যি ঠিক, কিন্তু—

তা ছাড়া আরো একটা কথা ভাববার আছে আমাদের। নির্মল চৌধুরী অমনভাবে পুড়ে মরলোই বা কেন? আর বজলুল রহমানের ঘরেই বা পুড়ে মরতে গেল কেন? তার সেলের তালা ভাঙ্গা ছিল ঠিকই কিন্তু কি কারণে সে রহমানের ঘরে আসতে যাবে। এবং রহমানই বা নিরুদ্দেশ হলো কেন? সব কিছু ভাবতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন একটু গোলমেলে ঠেকে না কি আপনিই বলুন?

তা অবিশ্যি মিথ্যে নয়। —মৃদু কণ্ঠে জবাব দেন সুশীল সোম।

তাহলেই ভেবে দেখুন আমরা ঐ ব্যাপারে পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারি না একমাত্র নির্মল চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে বলেই।

সুশীল সোম অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, তাহলে?

আমার আজ রাত্রে বিনয়েন্দ্রবাবুর গৃহে ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে, কাল সকালের দিকে আমার বাসায় একবার আসুন না। বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে যদি কোন নতুন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

তা কি সম্ভব?

দেখাই যাক না। হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনাকে বি. টি. রোডে, 'মতিঝিলে' সন্তোষ মিত্রের সংবাদ নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিলেন?

না, এখনো নিয়ে উঠতে পারিনি।

সংবাদটা নেবেন তাঁর। কেন তাঁর গৃহে মধ্যে মধ্যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলন হয়।

সে তো শুনেছি গরীব দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি নাকি সাহায্য করেন!

তা করেন কিন্তু তাঁর দানের হাতটা কেবল বিশেষ এক শ্রেণীর তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই প্রসারিত কেন এবং অন্যান্য ব্যাপারেই বা সেটা অত নির্দয় ও সঙ্কুচিত হয় কেন? তাছাড়া একটা কথা তো আপনাকে আমি বলেছি সেদিন, করবীদেবী ও বেবীরও সেখানে যাতায়াত আছে। তাদের দুজনার একজনও তো ঠিক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীর পর্যায়ে পড়ে না। যাক আজ উঠি।

অতঃপর সুব্রত নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

চিঠি দিয়ে বেবী তার কাকার হয়ে সুব্রতকে সেদিন রাত্রে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেদিনকার এ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে বিনয়েন্দ্রবাবু নাকি সুব্রতর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আলাপ করতে চান সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রতও সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল। ধনীগৃহে ডিনারের আমন্ত্রণ, সুব্রত একটু বিশেষভাবেই সাজগোজ করেছিল। দামী গরদের সুটে সত্যিই সুব্রতকে মানিয়েছিল চমৎকার।

সুব্রতর গাড়ি এসে রাত আটটা নাগাদ বিনয়েন্দ্র ঘোষের বালীগঞ্জের বাড়ীর করিডোরে দাঁড়াতেই সঙ্গে সঙ্গে করিডোরে অপেক্ষামান বেবীর সাদর মিষ্টি আহ্বান কানে এলো ঃ গুড ইভনিং!

করিডোরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয়, গাড়ি থেকে নেমে সম্মুখে দণ্ডায়মান বেবীর দিকে তাকিয়ে সুব্রত যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। সাদা রূপালী পাড় বসান দামী ইটালীয়ান জর্জেটে বেবীকে মানিয়েছিল

ভারি চমৎকার। সিংগিল করা চুল কাঁধে, পিঠে ও বুকের উপরে যেন রেশমের মত গুচ্ছে গুচ্ছে এলিয়ে আছে।

চলুন, কাকা আপনার জন্য সন্ধ্যা থেকেই বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন। আজ বের হননি পর্যন্ত—

বেবীর পাশে পাশে চলতে চলতে সুব্রত প্রশ্ন করে, কেন, আপনার কাকা কি এসময় বাড়ীতে থাকেন না?

কাকা যে বাড়ীতে কখন থাকেন আর কখন থাকেন না, তা তিনিই জানেন। এই আছেন আবার এই নেই—

বাড়ীতে বুঝি বিশেষ থাকেন না?

তাই তো দেখি।

হলঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে, বেবীকে অনুসরণ করে সুব্রত নিচের হলঘরের মত অনুরূপ একটি হলঘরে এসে প্রবেশ করলো। ধনীগৃহের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে চারিদিক যেন ঝক্ ঝক্ করছে। মেঝেয় দামী কার্পেট। ভেলভেটের কুশন গদীমোড়া সব সোফা। দেওয়ালে দেওয়ালে সব বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা বিখ্যাত সব ল্যাণ্ডস্কেপ। অদৃশ্য বাতিদান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোর বন্যা।

একটা সোফা দেখিয়ে বেবী বললে, বসুন, কাকাকে ডেকে আনি—

সুব্রতকে বসিয়ে বেবী ঘরের অন্য এক দ্বারপথের পর্দা তুলে অন্দরে অদৃশ্য হলো। কিন্তু মিনিট কয়েক পরে বেবী আবার একাই ফিরে এসে বললো, চলুন কাকার লাইব্রেরী ঘরে, কাকা সেখানেই নিয়ে যেতে বললেন।

বেবীকে অনুসরণ করে এবারে যে ঘরটির মধ্যে সুব্রত এসে প্রবেশ করলো সেটাও আকারে নেহাৎ ছোট নয়। এ ঘরেরও মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। চারপাশে আলমারি ভর্তি সব বই। মাঝখানে একটি গোল টেবিলের 'পরে সবুজ ঘেরাটোপ ঢাকা একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। চারপাশে তার খানকয়েক আরাম কেদারা। তারই একটায় বসে বিনয়েন্দ্র একটা মোটা বই পড়ছিলেন।

ছোটকা—

বেবীর ডাকে মুখ তুললেন বিনয়েন্দ্র।

ইতিপূর্বে একত্র থাকাকালীন সময়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুব্রতর আলাপ হবার সুযোগ হলেও বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে তাব সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি।

আসুন, আসুন—নমস্কার! —সাদর আহ্বান জানালেন বিনয়েন্দ্র।

সুব্রত প্রত্যুত্তরে দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সামনের একটা চেয়ারে উপবেশন করল। হাতের বিরাট মোটা বইটা একপাশে নামিয়ে রেখে বিনয়েন্দ্র বললেন, বেবীর মুখে আপনার কথা শোনা অবধি আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বারবার বেবীকে বলেছি! সত্যি, সে রাত্রে বেবীকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো।

না, না—এতে ধন্যবাদের কি আছে। মানুষমাত্রেরই যেটুকু কর্তব্য, তার বেশী কি আর করেছি বলুন মিঃ ঘোষ?

কি বলছেন সুব্রতবাবু, কর্তব্য আজকালকার দিনে ক'জন করে বলুন তো।

কথা বলতে বলতেই সুব্রত আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল বিনয়েন্দ্রকে। চমৎকার দেহ সৌষ্ঠব। বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে হলেও দেহের কোথাও এতটুকু যেন ভাঙ্গন ধরেনি। মাথার সম্মুখভাগে চকচকে মসৃণ একখানি টাক। প্রশস্ত নিভাঁজ কপাল। রগের দুপাশের চুলে মধ্যে মধ্যে রূপালী ইশারা সুস্পষ্ট। পাতলা ভ্রূ যুগল। নাকটা একটু চ্যাপ্টা। নাকের একপাশে একটা ক্ষতচিহ্ন বর্তমান। ছোট ছোট গোল গোল চক্ষু, দৃষ্টিতে সদাজাগ্রত শিকারীর তীক্ষ্ণতা যেন। পরিপাটি ঝক্‌ঝকে ছোট ছোট দুপাটি দাঁত। দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, গাত্রবর্ণ মাজা মাজা। খুব পরিষ্কারও নয় আবার কালোও নয়। কিন্তু সমস্ত চেহারা ও পোষাকের মধ্যে যেন একটা উদ্ধত রুক্ষ দাম্ভিকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সিল্কের ঢোলা পায়জামা ও কিমানো গায়ে। পায়ে ঘাসের চপ্পল।

মিঃ রায়, এনি কোল্ড ড্রিঙ্ক। অর ইফ ইউ লাইক এনি লিকার ইউ কেন হ্যাভ—

না, না-মিঃ ঘোষ। অন্য কিছুতে আমার অভ্যাস নেই, বরং—

কিযেমকে বল্ তো বেবী—

আমি দেখছি—বেবী দ্রুতপদে ভিতরে অদৃশ্য হলো।

পকেট থেকে একটা সোনার সিগ্রেট কেস্ বের করে প্রথমেই সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিলেন কেস্টা বিনয়েন্দ্র, সিগ্রেট—

নো, থ্যাঙ্কস্!

মৃদু হেসে বিনয়েন্দ্র এবার নিজে একটা সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। মুহূর্তে প্রজ্জ্বলিত সিগ্রেটের ধোঁয়ার বিশেষ একটা কটু গন্ধে সুব্রত বুঝতে পারে, স্পেশ্যাল ইজিপসিয়ান ব্রাণ্ডের সিগারেট। সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়ে খানিকটা ধূম ছাড়তে ছাড়তে মৃদু কণ্ঠে বিনয়েন্দ্র এবারে বললেন, আমার একবার আপনার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করা অবিশ্যি কর্তব্য ছিল—

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রত বিনয়েন্দ্রর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, দাদার আমস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে যখন আপনি সুশীল সোমের সঙ্গে ঘোষ নিবাসে এসেছিলেন, কিন্তু নানা কাজের ভিড়ে যাবো যাবো করেও যেয়ে উঠতে পারিনি। তারপর তো নির্মল চৌধুরীর মৃত্যুতে সব কিছুরই মীমাংসা হয়ে গেল—

কথাটা শেষ হলো না বিনয়েন্দ্রর। বেয়ারা এসে ঘরে প্রবেশ করে বললে, বিকাশবাবু এসেছেন।

বিকাশ এসেছে। যা পাঠিয়ে দে।

বেয়ারা চলে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

সুব্রত কোনরূপ প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও বিনয়েন্দ্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, এ নাইস ইয়ং ম্যান। মাদ্রাজ থেকে আমার দাদারই এক বন্ধুর সুপারিশ-চিঠি নিয়ে এসেছিল, আমি নির্মলের পোস্টেই ওকে এ্যাপয়েন্ট করেছি।

ও।

অদ্ভুত এবিলিটিস্ ছেলেটির। দুদিনেই যেন এতবড় অফিসটার সব কিছু একেবারে নখদর্পণে নিয়ে এসেছে। অবিশ্যি শুনেছি নির্মল ছেলেটিও নাকি ঐ রকমই করিৎকর্মা ছিল, কিন্তু দাদা মৃত্যুর ঠিক কয়েকদিন আগেই ডিসাইড করে ফেলেছিল শুনলাম, নির্মলকে আর চাকরিতে রাখবে না। সেদিক দিয়ে দাদা এই ছেলেটিকে পেলে বোধহয় লুফেই নিত।

হ্যাঁ, আমিও শুনেছি নির্মল চৌধুরীকে চাকরি থেকে ডিসচার্জ করবেন নরেন্দ্রবাবু স্থির করে রেখেছিলেন। কিন্তু জানেন কিছু সে কারণটা কি?

না, অফিসের লোকেরাও বলতে পারেনি। তবে হয়ত অফিস ম্যানেজার শ্রীনাথবাবু বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন ব্যাপারটা। তা তিনিও তো আজ নাগালের বাইরে।

ভৃত্যের হাতে ট্রেতে করে সুদৃশ্য জাপানী কাঁচের পাত্রে শীতল অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে বেবী এসে ঘরে ঢুকলো ঐসময়। ভৃত্যের হস্তধৃত ট্রের ওপর থেকে বেবীই নিজে একটি গ্লাস তুলে সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিল। সুব্রত গ্লাসটা হাতে নেয়।

ছোটকাকা তুমি?

না মা!—আমাকে বরং একটা বীয়ার দিতে বলো।

ভৃত্যের চোখের দিকে তাকাতেই সে ট্রেটা নিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। আর ঠিক পর মুহূর্তে দরজার বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল ও একটি চাপা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, ভিতরে আসতে পারি স্যার?

কে, বিকাশবাবু, আসুন আসুন—

দামী সুট্ পরিহিত বিকাশ এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

লেট্ মি ইনট্রোডিউস। বিকাশ রায়—আমাদের অফিসের নবনিযুক্ত সেক্রেটারী, আর ইনি সুব্রত রায়—সত্যান্বেষী।

নমস্কার।—বিকাশ হাত তুলে নমস্কার জানালো সুব্রতকে। সুব্রতও প্রতিনমস্কার জানায়।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বিকাশের মুখের দিকে। পরিচিত মুখ অথচ যেন মনে পড়ছে না!—অনেক সৌসাদৃশ্য আছে অথচ যেন ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মুখের ডৌলটি, ভ্রূ, ওষ্ঠ, কয়েকটি রেখা, কথা বলবার সময় ওষ্ঠাধরের কুঞ্চনের সঙ্গে অনেকখানি যেন পরিচিত অথচ চেনা-যাচ্ছে

না নিঃসংশয়ে।

আপনি আমাকে ডেকেছিলেন মিঃ ঘোষ?—বিকাশ মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, সুব্রতবাবু আপনি যদি কিছু না মনে করেন তো বিকাশবাবুর সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত আমার কিছু জরুরী কথা ছিল—

নিশ্চয়ই। আপনি যান।—সুব্রত বলে।

বিনয়েন্দ্র ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন, চলুন বিকাশবাবু—

ভৃত্য আবার ঐ সময় ঘরে এসে ঢুকলো ট্রের 'পরে এক গ্লাস ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে বিনয়েন্দ্রর জন্য।

বেবী বলে, কাকা ষ্টাডিতে গেলেন, সেখানে দিয়ে আয় গিয়ে।

ভৃত্য যেতে যেতে বললে, দিদিমণি, আপনাকে কে ফোনে ডাকছে।

সুব্রতবাবু, এক মিনিটের মধ্যেই শুনে আসছি আমি।

ভৃত্যের প্রায় পিছনে পিছনেই বেবীও ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এবারে একাকী সুব্রত। অলস অন্যমনস্কভাবে পাশেই চেয়ারের উপরে রক্ষিত বিনয়েন্দ্রর ফেলে যাওয়া মোটা বইটা তুলে নিল সুব্রত।

কোনান ডয়েলের রহস্য গল্পের রাজ সংস্করণ। কৌতূহলী সুব্রত বইটার পাতা উল্টাতে হঠাৎ একটা সাদা পুরু আইভরী লেটার পেপারে সবুজ কালীতে লেখা চিঠি ওর নজরে পড়লো। লেটার পেপারটার উপরে বেগুনী কালীতে এম্‌বস্‌ করা একটি বাংলা শব্দ সুব্রতর দৃষ্টিটা যেন বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

'মতিঝিল'। বাংলা অক্ষরটি হচ্ছে মতিঝিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি বাড়ী ও তৎসংলগ্ন ইতিহাস সুব্রতর মনের পাতায় ভেসে ওঠে। সংক্ষিপ্ত দুই লাইনে বাংলায় লেখা একটি চিঠি।

অপূর্ব,

আগামী ২২শে জুলাই শনিবার চায়না হোটেলে দেখা হবে। অত্যন্ত জরুরী। রাত দশটায়।

—রুইতন।

বার বার তিনবার লেখাগুলো পড়লো সুব্রত। চায়না হোটেল, রাত দশটায়, ২২শে জুলাই, শনিবার—রুইতন।

কিন্তু এ চিঠি এখানে কেন? এবং কেই বা ঐ অপূর্ব আর কেই বা ঐ রুইতন। দরজার ওপারে পদশব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা বইয়ের মধ্যে রেখে সুব্রত বইটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে নিজের জায়গায় ঠিক হয়ে বসলো।

ঘরে এসে ঢুকলেন বিনয়েন্দ্র।—স্যরি সুব্রতবাবু, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে—

না, না—তাতে কি হয়েছে।

আর বললেন কেন, দাদার মৃত্যুতে সব ঘাড়ে এসে পড়ায় যেন একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। নিজের কোনদিনই ঐ সব ব্যবসা ট্যাবসার দিকে ঝোঁক ছিল না। তাছাড়া বিয়ে থা করিনি, একা মানুষ। কিন্তু ঐ বেবী মেয়েটার জন্যই এ বয়েসে সব ঝামেলা নিয়ে থাকতে হচ্ছে।

শুনলাম আপনার দাদার বিজ্‌নেসও আপনাদের বিজ্‌নেসের সঙ্গে এ্যামালগেমেটেড হয়ে যাচ্ছে খুব শীঘ্র।

হ্যাঁ, দাদার ছেলেও আবার বেবীর এক কাঠি উপরে যায়। এসে বললে, ছোটকা, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আপনি যদি এখন ব্যবসা না দেখেন তো আমি সব বিক্রী করে দেবো।

সুব্রত প্রত্যুত্তরে কোন কথাই বলে না, কেবল শুনতে থাকে নিঃশব্দে।

কিন্তু আপনিই বলুন তো সুব্রতবাবু, সে কি একটা কথার কথা হলো। বাবার এত কষ্টে গড়ে তোলা বিজ্‌নেস সব বিক্রী হয়ে যাবে আমি বেঁচে থাকতে, দশজনে শুনলেই বা কি বলবে!

তাতো বটেই।

বলুন। তাই কি আর করি এখন, সব ঝক্কিই আমায় নিতে হয়েছে। নিজের না হয় বিয়ে হয়নি, ছেলেমেয়ে নেই, কিন্তু ওরাই তো আমার ছেলেমেয়ে।....

বেবী এসে ঐ সময় আবার ঘরে প্রবেশ করলো।

এই যে বেবী, দেখতো ডিনার রেডি কি না?

হ্যাঁ, ছোটকা—

তবে চলুন ওঠা যাক সুব্রতবাবু!

চলুন।

সকলে আপাতত পাশের ঘরে গিয়ে ডিনার টেবিলে বসালো।

॥ পনের ॥

রাত যখন প্রায় পৌনে এগারটা, আহারাদির পর আরো কিছুক্ষণ গল্প করে সুব্রত সে রাত্রের মত বিনয়েন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, শুভরাত্রি জানিয়ে নিচে নেমে এলো। বেবীও সঙ্গে সঙ্গে এলো তাকে গাড়িতে তুলে দিতে।

ভারি চমৎকার কাটলো আজকের কয়েকটি ঘন্টা মিস্ ঘোষ আপনাদের এখানে। সুব্রত মৃদু কণ্ঠে বলে।

সেটা বুঝি একা আপনারই, আমাদেরও তো!—মৃদু কণ্ঠে বেবী জবাব দেয়।—তাই বলছিলাম আসাটা যেন এখানেই শেষ না হয়ে যায় মিঃ রায়।

সুব্রত প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে।

গাড়ির দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে সুব্রত হঠাৎ ঘুরে বেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, মিস্ ঘোষ।

বলুন।

যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম।

বলুন না!

মতিঝিল বলে একটা বাড়ীর নাম কখনো শুনেছেন?

হ্যাঁ। বি. টি. রোডে, সন্তোষ মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ী। সেখানে দুবার গিয়েছিও, কিন্তু—

কিন্তু কি?

মৃদু হেসে বেবী বলে, দুর্ভাগ্য আমার দ্যাট্ ফেমাস্ সন্তোষবাবুর সঙ্গে দুবারের একবারও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। দুবারই তিনি বাইরে ছিলেন।

কি ব্যাপারে গিয়েছিলেন। বেড়াতে?

না ঠিক তা নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সম্মিলনে গিয়েছিলাম।

ও। আচ্ছা, আর একটা কথা, অপূর্ব বলে কারো সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

না। কই মনে পড়ছে না তো!

আর 'রুইতন' নামটা কখনো শুনেছেন?

রুইতন! না—কিন্তু হঠাৎ এসব জিজ্ঞাসা করছেন কেন সুব্রতবাবু?

এমনিই। হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার সেদিনকার সতর্ক বাণীগুলো আপনার মনে আছে তো?

আছে। কিন্তু সত্যিই বলুন তো সুব্রতবাবু, সে রকম কোন আশঙ্কার কারণ আমার জীবনের 'পরে আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

করি। আর করি বলেই আপনাকে সাবধান করেছি মিস্ ঘোষ। আচ্ছা এবারে তাহলে চলি।

সুব্রত গাড়িতে উঠে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল।

গুড্ নাইট।

সুব্রতবাবুকে বিদায় দিয়ে বেবী দোতলায় তার নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। এবং সুইচ টিপে আলোটা জ্বালাল।

বেশ প্রশস্ত ঘরখানি। ঘরের দেওয়ালে সবুজ রংয়ে ডিস্‌টেম্পার করা। মেঝেতে কোন কার্পেট নেই। ঠাণ্ডা মেঝেই বেবী বেশী পছন্দ করে। ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ঘেঁসে একটা বড় আয়না বসানো আলমারি। তারই পাশে সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিল।

টেবিলের 'পরে নানাবিধ মূল্যবান প্রসাধন সামগ্রী সাজানো। একপাশে সেই ড্রেসিং টেবিলের 'পরেই কাচের ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা রজনীগন্ধা। দামী সিংগল বেডে শয্যা বিস্তৃত। উপরে

বিছানো একটি লক্ষ্ণৌর বেড কভার।

বেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক একবার দেখে নিয়ে ঘরের দরজার অর্গল তুলে দিল। দামী শাড়ি ছেড়ে সাধারণ একটা পাতলা তাঁতের শাড়ি পরলো। ঘরের উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কম পাওয়ারের নীল আলোটা জ্বেলে দিল। ঘরের মধ্যে নেমে এলো যেন একটা স্বপ্নচ্ছায়া!

শিয়রের ধারে দেওয়ালে টাঙানো পিতার এন্‌লার্জড কালার-পেন্‌টিংটার সামনে এসে এবারে দাঁড়ালো বেবী।

বাবামণি, তুমি কোথায় আজ, কতদূরে। ডেকে সাড়া পাই না তবু মনে হয় যেন সর্বক্ষণই তুমি তোমার বেবীর পাশে রয়েছো। প্রতি মুহূর্তে যেন মনে হয় তুমি আমাকে স্পর্শ করে যাও। অথচ হাত বাড়িয়ে তোমার স্পর্শ পাই না। আদর করে বেবী বলে ডাক না।

পিতার ফটোকে প্রণাম করে বেবী এসে পালকের মত নরম শয্যায় দেহ এলিয়ে দিল।

পাশের বাড়ীর সেই ছেলেটি ছাদে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে সেই বাঁশীর সুর। সুর বলে যেন, আমার কত গান তো এমনি করে তোমাকে প্রতি রাত্রে শুনিয়েছি, কিন্তু কখনও তো বলিনি কিছু দাও বিনিময়ে। শুধু শোনাতেই আমার আনন্দ। তুমি শোন, এর বেশী কিছু চাই না গো চাই না। মনের নিভৃতে কোথায় যেন ভীরু একটি কামনা বাঁশীর ঐ সুরের সঙ্গে সঙ্গে বেবীর মনে গুনগুনিয়ে ওঠে। ক্লান্ত বোজা চোখের পাতায় ঘুম কি নামছে! কিন্তু সেই ঘুমের নিভৃতে কার ঐ ছবিটি আবছা কতগুলো রেখার মত ভাসছে। উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ গঠন। উজ্জ্বল কালো রং। বড় বড় দুটি চক্ষু। দৃঢ় সংযত ওষ্ঠপ্রান্তে সুন্দর একটি হাসি। কে! কে তুমি.....

ল্যান্সডাউন রোড ধরে খানিকটা এগুবার পর সুব্রত যেন আনমনেই গাড়িটা সোজা লেকের দিকে চালিয়ে দিল। রাস্তা নির্জন বললেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু জেগে আছে রাস্তার দু'পাশে পর পর একচক্ষু বাতিগুলো। ওদের চোখে তো ঘুম নেই। বাড়ী ফিরতে মন চায় না সুব্রতর। নিরর্থক উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি নিয়ে লেকের চারপাশে ঘুরতে থাকে।

সামান্য দুদিনের আলাপেই যেন বেবীর প্রতি তার কি রকম একটা আকর্ষণ পড়ে গিয়েছে। আর সেদিন কিরীটির সঙ্গে আলোচনা করবার পর থেকেই সর্বদা একটি আশঙ্কা মেয়েটিকে ঘিরে যেন সুব্রতর মনে উদয় হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে পর পর ঘটনাগুলো বিচার করে দেখতে গেলে সেদিন বেবীর ড্রাইভারের কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস পয়জনিংযে মৃত্যু স্পষ্টই বোঝা যায় বিশেষ কোন একটি উদ্দেশ্য নিয়েই সব কিছু যেন ঘটেছে।

সেদিন কিরীটি সুব্রতকে আর একটা কথা বলেছিল। অমরেন্দ্র, নরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রের বাপ মনোরঞ্জন ঘোষের যে উইল ছিল সেটা একবার যদি সম্ভব হয় তো তার বিষয়বস্তুটা ভাল করে জেনে নেবার জন্য। সুব্রত সে সম্পর্কে সুশীল সোমকে বলেওছিল যাতে করে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব ঘোষেদের সলিসিটার রাঘব ঘোষালের সঙ্গে একটিবার দেখা করেন। এবং সুশীল বলেছিল শীঘ্রই সে দেখা করে জানবার চেষ্টা করবে।

বেবীদের ওখান থেকে সে রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে আসা অবধি আরো নতুন একটা চিন্তা কেবলই সুব্রতর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এবং সেটা হচ্ছে বিনয়েন্দ্রর লাইব্রেরী ঘরে বইয়ের মধ্যে দেখা সেই চিঠিটা।

অপূর্ব নামক এক ব্যক্তিবিশেষকে ২২শে জুলাই চায়না হোটেলে রাত্রে দেখা করবার জন্য কোন এক 'রুইতন' ছদ্মনামধারী ব্যক্তি নির্দেশ দিয়েছে!

আজ ১৮ই জুলাই। আর তিনদিন পরে সেই নির্দিষ্ট দিনটি ঃ ২২শে জুলাই। সাংকেতিক ছদ্মনামধারী 'রুইতন' ব্যক্তিবিশেষটির সম্পর্কে সুব্রত কোনরূপ একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারলেও, পত্রে বর্ণিত 'চায়না' হোটেলটি সুব্রতর অপরিচিত ছিল না। টেরেটি বাজারের পিছন দিক দিয়ে যে রাস্তাটা বের হয়ে গিয়েছে সেই রাস্তার উপরেই চায়না হোটেলটা।

হোটেলটির খুব সুখ্যাতি কোনদিনই নেই। দোতলা একটি পুরাতন বাড়ীর নিচের হলঘর ও মাঝারি সাইজের খান চারেক ঘর ঘিরে হোটেলটি। হোটেলটিতে চাইনিজ ও ইংলিশ দুই রকমই ডিস্ সরবরাহ হয়। এবং ডিস্‌গুলোর বেশ একটা সুনামও আছে। কারণ খদ্দেরের ভিড় সর্বদাই লেগে আছে। আর শুধু ডিস্ই নয়, লিকার এবং গোপনে কোকেনও নাকি বিক্রী হয় হোটেলটিতে।

অভিজাত থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত সর্বশ্রেণীর খরিদ্দারেরই ভিড় হোটেলটিতে। হোটেলটির মালিক একজন এ্যাংলো চাইনীজ। নাম লিং চিন।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল অনিমেষ।

রাত্রি দশটা হবে তখন। বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু টোকা পড়ল।

কে?—বেহালা থামিয়ে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

বাইরে থেকে ভৃত্যের গলা শোনা গেল, বাবু আমি।

দরজা খুলে অনিমেষ প্রশ্ন করে, কি চাস?

একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কে? নাম বলেছে কিছু?

ভৃত্য বলে, হ্যাঁ, বারীনবাবু—

যা এখানে নিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ পরেই ষণ্ডা চেহারার একজন দীর্ঘকায় স্যুট পরিহিত ব্যক্তি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। অন্ধকার ঘরে পা দিয়ে মুহূর্তের জন্য যেন থমকে দাঁড়ালো বারীন।

তারপরই মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, আমাকে ডেকেছিলেন?

হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ করে দাও বারীন। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে।—অন্ধকার থেকে নির্দেশ এলো।

বারীন ফিরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

শোন বারীন, আপাতত বছর খানেকের জন্য ভাবছি কাজ কারবার সব বন্ধ রাখবো।

হঠাৎ?

হঠাৎ নয়। গত মাসখানেক ধরে ভেবেই এটা আমি স্থির করেছি। গত একমাসের মধ্যে আমাদের দলের তিন তিন জন লোক ধরা পড়েছে, একজন পাটনায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। পুলিশ হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের দলটাকে ধরবার জন্য।

কিন্তু স্যার, কারবার বন্ধ করলে—

বললাম তো তোমাকে আপাতত তা ছাড়া আর উপায় নেই। পেশোয়ারে আনোয়ার খান, বুন্দেলখণ্ডে মহব্বৎ খাঁকে সেই মর্মেই আমি সংবাদ পাঠিয়েছি—

এতদিনের এমন জমাট কারবারটা তুলে দেবেন স্যার তুচ্ছ ক'টা দলের লোক ধরা পড়েছে বলে? কাজ কারবার চালাতে এরকম তো হয়েই থাকে।

তা জানি!

তাছাড়া এর আগেও যে দু' একজন ধরা পড়েনি তাও তো নয় স্যার!

পরামর্শ দেবার জন্য তোমাকে আমি ডাকিনি বারীন। যা বলবার ছিল তা আমি বললাম। তুমি এবার যেতে পারো।

কিন্তু যে সব মাল এখনো আমাদের হাতে আছে?

রমজান তার ব্যবস্থা করে ফেলেছে, সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। যাও—

বারীন ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে গেল।

অনিমেষ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। না, আর আগুন নিয়ে খেলা নয়।

কিন্তু কেন? হঠাৎই বা অনিমেষের মনে এ বৈরাগ্য দশ বছর বাদে আজ এলো কেন? দশবছর ধরে নির্বিঘ্নে আফিমের চোরা কারবার গড়ে তুলেছে অনিমেষ বিখ্যাত চোরা কারবারী পাঠান কালু খাঁর সাহায্যে। বলতে গেলে ভারতবর্ষের সর্বত্র ধীরে ধীরে সেই কারবার আজ যখন শাখায় প্রশাখায় জমজমাট হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ সে কারবার গুটিয়ে নিতেই বা কেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অনিমেষ। দলের একজন মারা গেছে ও তিনজন একমাসের মধ্যে ধরা পড়েছে বলে পুলিশের ভয়ে? কিন্তু ইতিপূর্বে ঐ ধরনের ঘটনা যে ঘটেনি তা তো নয়, বারীন তো একটু আগে মিথ্যা বলেনি। তবে আজই বা অনিমেষ কারবার গুটিয়ে নেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেন?

আজ নয়, অনিমেষ হয়ত নিজেও বিশ্বাস করতে চাইবে না, গত এক বৎসর ধরেই অনিমেষের মনের মধ্যে সব ব্যাপারেই একটা নিস্পৃহতা জেগেছে। কিছুই তার আজকাল ভাল লাগে না, কোন

কিছুতেই যেন আর উৎসাহ পায় না। আজ যেন তার মনে হচ্ছে সব, সব ফাঁকি। এই পরিশ্রম, সর্বদা এই চোরের মত সশঙ্ক আত্মগোপন, সামান্য একটা সুতোর 'পরে জীবন নিয়ে ঘোরাফেরা করা, আজ যেন সব কিছু একান্ত নিরর্থক মনে হচ্ছে অনিমেষের। অর্থ, অর্থ—সে চোরাকারবারে প্রচুর উপার্জ্জন করেছে। তবু আজ কেন মনে হচ্ছে ঠিক এই জীবন বা জীবনের এই পরিণতি সে যেন কোনদিনই চায়নি। এ একটা বিরাট আত্ম প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্দিষ্ট একটি দড়িতে খুঁটোয় বাঁধা গরুর মত এই যে একই পরিধির মধ্যে কেবল কানামাছির মত ঘোরা, এর মধ্যে জীবন কোথায়? কোথায় এ জীবনের মধ্যে স্পন্দন। লোভ শুধু পাপের অন্ধকারে টেনেই নিয়ে চলেছে তাকে দিনের পর দিন।

আজ তাই যেন মনে হচ্ছে এর চাইতে বুঝি ঢের বেশী তৃপ্তি, ঢের বেশী শান্তি ছিল নির্জন একটি গৃহকোণের মধ্যে। একখানি প্রিয় হাতের মধুর স্পর্শ, মমতা মাখানো একটুখানি সেবা, দুটো মিষ্টি কথা, তাতে যেন ঢের বেশী তৃপ্তি, ঢের বেশী আনন্দ সে পেতে পাবতো।

সে তো চায়নি, কোনদিনই চায়নি সমাজকে এমনি করে অস্বীকার করতে। সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে তছনছ করে অভিশাপের অন্ধকার পথ ধরে চলতে। সমাজ! সমাজই তাকে ঠেলে দিয়েছে জন্মমুহূর্তে আজকের এই আবর্জনার মধ্যে! অনাথ আশ্রমের নাম গোত্র পরিচয়হীন জীবনের আঠারোটা বছর কাটিয়ে একদিন যখন সে এই শহরে এসে দাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখায়নি তাকে এতটুকু সহানুভূতি, এতটুকু আশা দেয়নি কেউ, দুয়ারে দুয়ারে প্রত্যাখ্যান হয়ে শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত চোরা কোকেন ও আফিং ব্যবসায়ী পাঠান কালু খাঁর নজরে পড়ে, তারই দয়ায় ক্রমে ক্রমে সে এই চোরা অন্ধকার পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর অকস্মাৎ একদিন মাল সমেত বড়বাজারের পাট্টিতে ধরা পড়ে সম্মুখ পুলিশের যুদ্ধে গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল তার পিতৃতুল্য পাঠান কালু খাঁ।

কিন্তু বছর দুই ধরে কালু খাঁ সবচাইতে প্রিয় শিষ্য হিসাবে অনিমেষকে যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল, সেটা ব্যর্থ হয়নি। অনিমেষ ধীরে ধীরে বুদ্ধি ও চাতুর্যের দ্বারা নিজের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। ক্রমে বিরাট দলের দলপতি হয়ে আজ সে ভারতের সর্বত্র চালাচ্ছে তার চোরা কারবার। কিন্তু কি কুক্ষণে যে দলের অন্যতম লোক রমেন্দ্রবাবুকে সে দয়া করে এই বরাহনগরের বাড়ীতে সকন্যা স্থান দিয়েছিল।

রমেন্দ্রের মেয়ে করবীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই যেন ক্রমে ক্রমে সব কিছু তার কাছে ফাঁকা ঠেকতে শুরু করলো। করবী, করবী যেন তার অন্ধকারে ঘুমন্ত আত্মার ঘুম ভাঙ্গালো সোনার কাঠির স্পর্শে সহসা একদিন, অন্ধকারে প্রথম যেন অনিমেষ চোখ মেলে তাকালো। কুটিল জীবনের পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে সহসা যেন ভেসে এলো একটি মধুগন্ধ স্বর্ণ চাঁপা।

প্রথমটায় অনিমেষের শঙ্কা বা লজ্জার অবধি ছিল না। একে নাম গোত্র পরিচয়হীন, দেখতে ভয়াবহ কুৎসিত এবং সর্বোপরি আফিমের চোরা কারবারী হিসাবে সমাজের নিম্নতম অন্ধকার আবর্তের মধ্যে গতিবিধি, করবীর সান্নিধ্যে পর্যন্ত যেতে তার সাহসে কুলতো না। কিন্তু সে সঙ্কোচ যেন করবীই তার মধুর ব্যবহারে একটু একটু করে ভেঙ্গে দিয়েছিল। এবং সেই সান্নিধ্যে যে ক্রমশঃ তাকে এক অন্ধ দুর্বার আকর্ষণে করবীর প্রতিই টানছিল, সেই সত্যটি যেদিন প্রথম অনিমেষের কাছে সুস্পষ্ট হলো সেদিন সে যেন লজ্জায় ও ভয়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল। একি দুরাশা, কোথায় করবী আর কোথায় সে এক পুলিশের ভয়ে সদা সশঙ্কিত পলাতক ছদ্মবেশী চোরা কারবারী। এবং সেই সত্যটুকুই নিজের কাছে উদঘাটিত হবার পর থেকেই গত কয়েকমাস ধরে নিজের মনের সঙ্গে দিবারাত্র যুদ্ধ করে ক্লান্ত অনিমেষ স্থির করেছিল এই বাড়ী ছেড়ে দূরে অনেক দূরে পালিয়ে যাবে। বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস নেই তার নিজের মনকে! এবং এতদিনে অনিমেষ চলেও যেতো, কিন্তু নির্মল চৌধুরীর ব্যাপারটায় হাত দেওয়ায় যাওয়া হয়নি তার। করবীর জীবনের পথ নিষ্কণ্টক করে তবে সে যাবে। চিরদিনের মতই দূরে চলে যাবে।

শুধু যে চলে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল অনিমেষ তাই নয়, যে ভালোবাসার আলো তার অন্ধকার মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল, সেই আলোর স্পর্শই তার মনের মধ্যে এনেছিল এতদিনকার কারবারেব প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণা। তাই আজ চিরদিনের মতই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে যাবে।

অনিমেষ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে চলে।

॥ ষোল ॥

পাশের ঘরে করবীও জেগে ছিল চুপটি করে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছা করেই দরজা ভিতর থেকে বন্ধ না করে মাত্র ভেজিয়ে অন্ধকারে সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। একটু শব্দ, তারপর ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে কি আবার দেখা দেবে না সে।

কেন যেন মন বলে বারবার, আসবে, আবার সেদিনের মত আসবে নির্মল তার ঘরে। কিন্তু কেন, কেন নির্মল তাকে ভুল বুঝলো। কেন নিজের পরিচয়টা দিল না। সেই রাত্রির পর থেকে করবী নির্মলকে কত খুঁজেছে।

পথ দিয়ে চলতে চলতে আশে পাশের প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। খুঁজেছে তার পরিচিত সেই প্রিয় মুখখানি, কিন্তু কোথাও পায়নি সে মুখের আদল। সে মুখ যে তার মনের পাতায় ছাপ কেটে বসে আছে।

কেন, কেন নির্মল তাকে দেখা দিচ্ছে না? পরক্ষণেই আবার মনে হয়, নির্মল তো তাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছে, আবার দেখা হবে। কলঙ্কমুক্ত হয়ে আবার সে দেখা দেবে। তবে কেন করবী মনে ধৈর্য ধরতে পারছে না।

সে রাত্রে হোটেলে নিজের নির্দিষ্ট ঘরটির মধ্যে একাকী বিনিদ্র শয্যার পরে শুয়ে শুয়ে করবীর কথাই ভাবছিল নির্মল। সে রাত্রে করবী কি তাকে চিনতে পারলো না!

কিন্তু সেই অদৃশ্য বন্ধুর কঠোর নির্দেশ আছে, আপাততঃ করবীর কথা সম্পূর্ণই তাকে ভুলে গিয়ে যে কারণে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে—তার ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোস খুলে দিতে হবে সর্বাগ্রে। তারপর করবী তাকে চিনতে পারুক না পারুক, সে রাত্রের সাক্ষাতের পর এটা তো সে স্পষ্টই বুঝেছে, করবী এখনো তারই আছে। করবী তাকে ভোলেনি। তবু অবুঝ মন বার বার করবীর সান্নিধ্যেই যেন ছুটে যেতে চায়।

না, না—করবীর কথা থাক। আগে তাকে এই আত্মগোপনের অপমান ও লজ্জা থেকে মুক্তি পেতে হবে।

কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রের রহস্যভেদের কোন কিনারাই সে এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। অদৃশ্য বন্ধু তাকে চিঠির সুপারিশে তার পুরাতন অফিসে চাকরি করে দিয়েছে যে কেন, তাকে সে কথা খোলাখুলি ভাবে না বললেও নির্মলের বুঝতে কষ্ট হয়নি। তার বিরুদ্ধে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বে একটা বিশ্রী ষড়যন্ত্রের মূলে যে কারা, সেটাই এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। শ্রীনাথ করকে যে কেন হত্যা করা হলো সেটাও এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারেনি না নির্মল।

নেহাৎ গোবেচারী ও অনেক দিনের পুরোনো লোক ছিল শ্রীনাথ কর। অফিসের ম্যানেজার হিসাবে তার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় ছিল তাতে করে লোকটাকে কোনদিন খারাপ বলে তো মনে হয়নি নির্মলের। তার মৃত্যুর ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য্যের।

কিন্তু আজ বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাত্রে বিনয়েন্দ্র যে কথাগুলো তাকে বললেন, সে কথাগুলোরই বা তাৎপর্য কি! পার্সোন্যাল একাউন্টে গত এক বৎসর ধরে নিজের অফিস থেকে ও বর্তমানে নরেন্দ্রনাথের অফিস থেকে গত দুই মাসে যে সব টাকা তিনি ড্র করেছেন, সে সব টাকা অফিসের মিস্‌লেনিয়াস খরচের খাতে দেখিয়ে দিতে বললেন।

এক আধটা টাকা নয় প্রায় হাজার কুড়িক টাকা। এতগুলো টাকা মিস্‌লেনিয়াস খাতে দেখানোও মুস্কিল।

আর তার প্রয়োজনই বা কী! অফিসের অন্যতম প্রোপাইটার হিসাবে তো অনায়াসেই ও টাকা তিনি নিজের ইচ্ছামত খরচ বাবদ দেখাতে পারেন। মিস্‌লেনিয়াস খাতে সে টাকা দেখানো মানে সহজভাবে যা বোঝা যাচ্ছে তা হচ্ছে সকলের ঘাড়েই সে খরচটা যাবে। কিন্তু নিজে যে টাকাটা খরচ করবেন ব্যক্তিগতভাবে সে টাকাটা ঐভাবে খরচ দেখানোর মানেটা তো খুব ভাল লাগছে না নির্মলের। তাছাড়া আরো একটা কথা; আজ রাত্রে বিনয়েন্দ্র তাকে যা বলেছেন অফিসের মনোহরবাবু সম্পর্কে সেটাও নির্মলের মনঃপূত হয়নি।

মনোহর শিকদার লোকটার চেহারা যেমন তেমনি যেন চরিত্র। কালো মোটা, থলথলে চর্ব্বিবহুল, ছোট ছোট চোখ, পুরু ওষ্ঠ ছড়ানো নাক ও চৌকো চোয়াল। দেখলেই কেমন যেন বিতৃষ্ণা জাগে।

বিনয়েন্দ্রের নিজস্ব অফিসে পূর্বে ম্যানেজার ছিল, এখন দুই অফিসেরই কাজকর্ম দেখছে সুপারভাইজার হিসাবে। যেমন রুক্ষ কথাবার্তা তেমনি সন্দিগ্ধ মন।

প্রথম দিন থেকেই মনোহর শিকদারকে নির্মলের ভাল লাগেনি। কিন্তু নির্মল কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল মনোহর শিকদার বিনয়েন্দ্রের নিজস্ব তাঁবের লোক। এবং সে হিসাবে অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে তার ক্ষমতাও অসীম।

অফিস সুপারভাইজার বটে মনোহর কিন্তু আসলে যে কি সুপারভাইজ করে তা নির্মল জানেনা বা এখনো সম্যক বুঝে উঠতে পারেনি। সর্বক্ষণ অফিসে থাকে না। হুট করে আসে আবার হুট করে চলে যায়। বিনয়েন্দ্রের অফিসের পাশেই একটা ছোট কামরায় মনোহরের অফিস। বিনয়েন্দ্র অফিসে এলেই মনোহর তার অফিস কামরায় গিয়ে ঢোকে এবং বিনয়েন্দ্র অফিস থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে-ঘর থেকে বের হয় না। নির্মলের সঙ্গে মনোহর যদিও আজ পর্যন্ত এই এক মাসে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেনি, তথাপি মনোহরকে নির্মলের এতটুকু ভাল লাগে না। শুধু নির্মলই নয়, মনোহরকে অফিসের কোন কর্মচারীই যেন পছন্দ করে না এ খবরটাও নির্মল সংগ্রহ করেছে ইতিমধ্যেই।

মনোহর সম্পর্কে বিনয়েন্দ্র আজ বলেছেন, তার সঙ্গে পরামর্শ না করে যেন অফিসের কোন কাজ না করা হয়।

॥ সতের ॥

টুক্ টুক্ টুক্। বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

কে! শোনবার ভুল নয়তো নির্মলের। এত রাত্রে হোটেলে তার ঘরের দরজায় কে নক্ করবে।

কিন্তু না, শোনবার ভুল নয়। টুক্ টুক্ টুক্। আবার পূর্ববৎ তিনটি টোকা পড়লো, এবারে আরো একটু স্পষ্ট তারই ঘরের দরজায়। কৌতূহলী নির্মল এগিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দরজার সামনে দাঁড়াল। এত রাত্রে কে, কে দরজায় নক্ করছে। খুলবে কি খুলবে না।

কে?

দরজাটা খুলুন নির্মলবাবু। চাপা সতর্ক কণ্ঠে দরজার ওপাশ থেকে কথাগুলো শোনা গেল!

নির্মল! তার নির্মল নামটা তো এখানে কেউ জানে না! শুধু তাই নয় নির্মল নামটা গত দুমাসে সে নিজেও কি প্রায় ভুলতে বসেনি। সে তো এখন বিকাশ নামেই পরিচিত। তবে কে, কে তাকে তার পূর্ব নাম ধরে ডাকছে এত রাত্রে দরজা খুলে দেবার জন্য।

নির্মলবাবু!—আবার পূর্ববৎ চাপা কণ্ঠে ডাক এলো।

নিশ্চয়ই তার কোন পূর্ব পরিচিত জন—যে জানে তার সত্য পরিচয়টা বর্তমান ছদ্মবেশের অন্তরালে। একমাত্র জানে বন্ধু ডাঃ জহর সেন আর—আর তো কেউ জানে না। জহর অবশ্য জানে তার এখানে অবস্থিতির কথাটাও। তবে কি জহরই।

নির্মল দরজাটা খুলে দিল। কিন্তু দরজার কপাট দুটো টেনে খুলতে গিয়ে পারল না। সামান্য একটু মেলেই যেন দরজার কপাট দুটো চকিতে বন্ধ হয়ে গেল ওপাশ থেকে কে টেনে ধরায়। এবং পরক্ষণেই পূর্ব কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো, আলোটা নিভিয়ে দিন দয়া করে।

এ কি! চমকে ওঠে নির্মল, এ যে তার পরিচিত কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই কণ্ঠস্বরই না সে শুনেছিল জহরের বাড়ীতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে একদিন রাত্রে। আর দ্বিধা করে না নির্মল। হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল আর নিঃশব্দে এক ছায়া মূর্তি এসে ঘরের মধ্যে পা দিল।

ভয় পাবেন না নির্মলবাবু। কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্য এসেছি। আশা করি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ।—অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় নির্মল।

আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীকে বোধ হয় এখনও আপনি চিনতে পারেননি?

না। কিন্তু আপনি যদি জানেন--

আমিও সঠিক জানি না। শুধু অনুমান মাত্র।--যাক যা বলতে এসেছিলাম। মনোহর শিকদারের উপরে একটু নজর রাখবেন।

মনোহর শিকদার!

হ্যাঁ, আপনাদের অফিসের মনোহর শিকদার। একটা কথা মনে রাখবেন, অফিসে আর কেউ আপনাকে আপাতত সন্দেহ না করলেও মনোহর কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

কি করে জানলেন?

প্রত্যুত্তরে মৃদু একটা হাসির শব্দ অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল। তারপর আবার জবাব এলো, অফিসে আমার লোক আছে।

সে কি!

হ্যাঁ, সে অবিশ্যি আপনার সাহায্যেই আসবে। তার দিক থেকে ভয় নেই, তার দ্বারা আপনার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যা বলছিলাম। মনোহরের বাসা বাদুড়বাগানে। অফিস থেকে বাসায় গিয়ে ফের সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাসা থেকে বের হয়ে প্রত্যহই প্রায় বি, টি, রোডের ওপরে 'মতিঝিল' নামে একটা বাগান বাড়ীতে যায় সে।

মতিঝিল।

হ্যাঁ, তাকে কিছুদিন সতর্কতার সঙ্গে ফলো করতে পারলে হয়ত আপনি কিছু জানতে পাববেন।

বেশ তাই হবে।

কাজটা অবিশ্যি আমিও করতে পারতাম, কিন্তু আমার সেখানে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু আমিই বা যাবো কি করে?

মধ্যে মধ্যে ঐ মতিঝিলে কলেজের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মেলন হয়। সামনের রবিবার একটা ঐ ধরনের সম্মেলন আছে। ঐ ধরনের সম্মেলনের সময় সেখানকার মানে ঐ মতিঝিলের মালিক ওখানে সাধারণতঃ অনুপস্থিত থাকেন। সেদিন যাতে আপনি সেখানে উপস্থিত থাকতে পাবেন গোপনে চেষ্টা করবেন।

কিন্তু—

বললাম তো। মতিঝিলের মালিক অনুপস্থিত থাকবেন সেদিন। একমাত্র তিনি ছাড়া আপনাকে কারোরই চিনবার সম্ভাবনা নেই।

তিনি! মতিঝিলের মালিক আমাকে চেনেন?

কি নাম তাঁর?

সন্তোষ মিত্র।

কিন্তু কই তাঁকে চিনি বলে তো আমার মনে পড়েছে না।

আপনিও তাঁকে চেনেন।

আমি তাঁকে চিনি?

হ্যাঁ। তবে সন্তোষ মিত্রকে দেখলে আপনি তাঁকে চিনতে পারবেন কিনা জানি না।

কি বলছেন আপনি! আপনার কথা তো ঠিক আমি—

একদিন সবই বুঝতে পারবেন। আর একটা কথা—

বলুন।

করবীদেবীর সঙ্গে ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন?

আপনি! আপনি সে কথা জানলেন কি করে?

জানি। কারণ আমার লোকেরা সর্বদাই আপনাকে পাহারা দিচ্ছে।

ও।

কিন্তু আর যাবেন না। ভুলে যাবেন না আপনি ছদ্মবেশে আছেন। তাছাড়া নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার করবী চিরদিন আপনারই থাকবে। কেউ তাকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। সে আপনারই—শেষের দিকে নির্মলের যেন মনে হলো বক্তার কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন রুদ্ধ হয়ে জড়িয়ে যায়।

চমকে অন্ধকারে ছায়ামূর্তির দিকে তাকালো নির্মল।

কিন্তু রুবি—করবীর মনের কথা আপনি জানলেন কি করে?

আমি জানলাম কি করে?

হ্যাঁ।

প্রত্যুত্তরে আর কোন জবাব এলো না। শুধু নির্মলের মনে হলো যেন অন্ধকারে একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

মুহূর্তের জন্য নির্মল বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সম্বিত ফিরে আসে দেখে ঘর শূন্য। ঘরে কেউ নেই। রহস্যময় সেই আগন্তুক ঘর থেকে ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে নিঃশব্দেই।

॥ আঠারো ॥

কিরীটির দোতলার বসবার ঘরে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসে কথা বলছিল কিরীটি আর সুব্রত। কিরীটি তার স্বভাবসিদ্ধ এলানো ভঙ্গীতে সোফার ব্যাকে হেলান দিয়ে পাইপ টানতে টানতে কথা বলছিল।

গত বৎসর খানেকের মধ্যে যে তিনটি সুন্দরী কলেজ তরুণী অত্যাশ্চর্যভাবে কলেজ গেটের সামনে থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে অবিশ্যি আজ পর্যন্ত একটিরও পাত্তা পাওয়া যায়নি, কিন্তু বাকী দুজনার মৃতদেহ দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি গঙ্গার ধারে পাওয়া গিয়েছিল।

হ্যাঁ, সে সংবাদ তো খবরের কাগজেই বের হয়েছিল।

পরশুদিন গ্রাণ্ডে একটা পার্টিতে ডিটেকটিভ ইনস্‌পেক্‌টার পূর্ণ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় তার মুখ থেকে আরো একটা সংবাদ পেয়েছি।

কি?

ময়না তদন্তে বলছে যে, ঐ দুটি তরুণীরই মৃত্যু হয়েছে নাকি জলে ডুবে। কজ্‌ অফ ডেথ্‌ ড্রাউনিং।

তাহলে আত্মহত্যা!

হতে যে পারে না তা নয়। তবে আত্মহত্যার কোন কারণই নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের। এবং খোঁজ করে জানা গেছে দুজনই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিল এবং দুজনই গরীব ঘরের মেয়ে ছিল।

কি বলতে চাস তুই কিরীটি।

বিশেষ কিছুই না। মেয়ে তিনটিই অর্থাৎ যে দুটিকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ও যেটি এখনো নিখোঁজ তিনজনই মতিঝিলে তরুণ-তরুণীর হৈ-হল্লায় দু' একবার যোগ দিয়েছে এ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। তাই মনে হচ্ছিল—

কি?

মতিঝিলে মধ্যে মধ্যে যে তরুণ-তরুণী সম্মেলন হয় সেটা হয়ত একেবারে নির্দোষ একটা হৈ-হল্লাই নয়।

কিন্তু সন্তোষ মিত্র সম্পর্কে আমি খুব ভাল করেই খোঁজ নিয়েছিলাম। লোকটা যেমন কাইন্ড হার্টেড্‌ তেমনি শুনেছি গরীব দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সিম্‌প্যাথেটিক।

তাতো বটেই! কাইন্ডনেস্‌ ও সিম্‌প্যাথি মানব চরিত্রের অতীব দুর্লভ দুটি সদ্‌গুণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কাইন্ডনেস্‌ ও সিম্‌প্যাথি প্রদর্শনের পাত্র পাত্রীরা আবার বিশেষ বয়েসের কিনা, তাই বলছিলাম—

তুই অত্যন্ত নোংরা হয়ে যাচ্ছিস কিরীটি আজকাল—

পৃথিবীটাই যে ক্রমশঃ নোংরা হয়ে উঠছে সুব্রত! যেমন দেখি তেমনি তো শিক্ষা হবে। সে থাক্‌—অপূর্ববাবুর সন্ধান পেলি?

না। আজই তো শনিবার। চায়না হোটেলে একবার ঘুরে তো আসি।

কিন্তু চায়না হোটেলের অভিসারের চাইতেও বেশী উপকৃত হবি তুই যদি সামনের রবিবার মতিঝলে একবার হানা দিতে পারিস।

কেন, রবিবারে সেখানে বুঝি আবার সম্মেলন?

হ্যাঁ। এবম্বিধ সংবাদই প্রাপ্ত হয়েছে।

তবে নিশ্চয়ই যাবো।

নিজে না গিয়ে কোন কলেজের ছাত্র বন্ধু একজন জোগাড় করতে পারিস তো তাই দেখ।

যুক্তি ভাল দিয়েছিস। দেখি—

টেরিটি বাজারের পিছন দিয়ে যে নয়া রাস্তাটা এসে ট্রাম রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঠিক সেইখানেই চায়না হোটেল। হোটেলটি সম্পর্কে অনেকদিন থেকেই একটা দুর্ণাম আছে বটে চোরাই মাদক দ্রব্যের ব্যাপারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশের সতর্ক গতিবিধি নিশ্চিত কোন প্রমাণই পায়নি। তবে সন্দেহের তালিকাভুক্ত আছে বলেই পুলিশ এখনো হোটেল থেকে তার দৃষ্টি তুলে নেয়নি।

চায়না হোটেলের বিশেষত্ব চাইনীজ ডিসের জন্য যেমন সেখানে অনেক ভোজন বিলাসীর গতায়াত হামেশাই, তেমনি সঙ্গে 'বার' থাকার দরুন মদ্যপায়ী অন্য এক শ্রেণীর নেশাখোরের ভিড়ও সেখানে হয়। এবং উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর নানা ভাষাভাষী খদ্দেরের জন্য হোটেলটায় রাত আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত প্রতি রাত্রে একটা কস্‌মোপলিটন ভিড় হয়। বিশেষ করে প্রতি শনিবার ভিড়টা যেন একটু বেশীই হয়।

পরিধানে পায়জামা, শেরওয়ানী ও লালচে আভাযুক্তি নূর দাড়িতে সুব্রতকে চিনবার উপায় ছিল না। বিরাট হলঘরের এক পাশে একটা ছোট টেবিলে এক গ্লাস বীয়ার ও কিছু কাজু বাদাম প্লেটে নিয়ে সুব্রত বসে ছিল। এবং মধ্যে মধ্যে বীয়ারের গ্লাসটা ঠোঁটের গোড়ায় ধরে ছোট্ট একটা সিপ্ দিচ্ছিল।

বিশ্রী তেতো। মুখের বিস্বাদকে নষ্ট করবার জন্য একটা একটা বাদাম মুখে দিয়ে চিবোচ্ছিল।

রাত ন'টার পর থেকে সুব্রত লক্ষ্য করে ভিড়টা ক্রমশঃ যেন জমে উঠছে বোতলসেবীদের নিয়েই। নানা বয়েসের পুরুষ, নারী, বিচিত্র সব পোষাক। বাঙ্গালী থেকে শুরু করে ইওরোপিয়ান, চাইনিজ, জাপানীজ, মদ্রদেশীয়, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ও মাড়োয়ারী সর্বদেশীয় লোকই আছে।

এককোণে ডায়াসে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে রুজ, লিপষ্টিক মাখা অর্ধ উলঙ্গ প্রায় বেশ কুৎসিত যৌন অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে আর নাকী সুরে গান গাইছে। সঙ্গে চলেছে অর্কেষ্ট্রা।

আই লাভ ইউ মাই হনি চাইল্ড
আই লাভ ইউ আই ডু।
আই কিস্ ইউ মাই হনি চাইল্ড
আই কিস্ ইউ আই ডু।

ফিটফাট উর্দি পরিহিত একটি ওয়েটার জার্মান সিলভারের একটা চক্‌চকে প্লেট হাতে সামনে এসে দাঁড়ালো সুব্রতর। সুব্রত ইতিমধ্যে একসময় সবার অলক্ষ্যে পাত্রটি সামনের টেবিলের 'পরে রক্ষিত কাচের ফ্লাওয়ার ভাসের মধ্যে ঢেলে দিয়ে খালি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল।

এনি মোর ড্রিঙ্ক স্যার?

ছোটা জিন্ এন্ড লাইম।—মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলে।

ওয়েটার চলে গেল।

হঠাৎ সুব্রতর নজরে পড়লো হলঘরের বিরাট কাচের পাল্লা নিঃশব্দে হিঞ্জের উপরে ঘুরে গিয়ে দ্বার উন্মুক্ত হলো এবং সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে মনোহর শিকদার ও একটি বাইশ তেইশ বৎসরের তরুণী হোটেলের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। তাদের পশ্চাতে দরজাটি আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মনোহর শিকদার! ও এখানে কেন? আর ঐ মেয়েটিই বা কে?

দামী শাড়ী পরিহিত এবং মুখের 'পরে একটা দামী স্কাই ব্লু রংয়ের সিল্কের ভেইল টানা। মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, কেবল সুশ্রী একখানি মুখের একটা আবছায়া ইঙ্গিত মাত্র যেন ভেইল ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে।

সমস্ত হোটেলে তখন একমাত্র সুব্রতর পাশের ছোট টেবিলের পাশে তিনটি চেয়ার ছাড়া সব ভর্তি। মনোহর ও তার সঙ্গিনী তরুণী এসে সেই টেবিলেই বসলো।

জায়গাটা একেবারে এক কোণে হওয়ায় ও একটা থামের আড়ালে পড়ায় যেন একটু নির্জনই বলতে হবে। হঠাৎ মৃদু নারী কণ্ঠের একটা কথা সুব্রতর কানে এলো ঃ এ কোথায় নিয়ে এলে বল তো?

কি করি। ইচ্ছাটা তো আর আমার নয়। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

কিন্তু এখানে আনবারই বা প্রয়োজন ছিল কি? ইচ্ছা করলেই তো সে আমার ওখানে যেতে পারতো।

দেখো, এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ আছে?

কিন্তু সত্যি বলতো ব্যাপারটা কি? তুমি একেবারে কিছুই জানো না, আমি বিশ্বাস করি না।

জানি না।

জানো নিশ্চয়ই!

সবটা জানি না, তবে কিছু কিছু কানে এসেছে।

তবে সেই কিছুটাই না হয় শুনি।

কালকের মতিঝিলে যে সম্মেলনটা আছে—

সুব্রত চমকে ওঠে 'মতিঝিল' নামটা শুনে। সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত করে ও যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে।

নারীকণ্ঠে আবার প্রশ্নোচ্চারিত হয়, তাই কি?

সামনের মাসের পনেরই যে কর্তার দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীতে পার্টি আছে—

দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীর পার্টি! —কথাটা উচ্চারণের মধ্যে যেন একটা ব্যগ্র উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে সেই নারীকণ্ঠ থেকে।

ব্যাপার কি! চমকে উঠলে যেন?

না......

বাকী কথাটা শোনা গেল না। প্রচণ্ড একটা করতালির শব্দে সমস্ত হলঘরটা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে গুঁড়িয়ে গেল।

কয়েকটা মুহূর্তের জন্য সুব্রত একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সুব্রতর যখন খেয়াল হলো তখন আবার সেই ফিরিঙ্গি মেয়েটি কুৎসিৎ নৃত্যের সঙ্গে গান শুরু করেছে। পাশ ফিরে তাকিয়ে সুব্রত মনোহর ও তার সঙ্গিনীকে আর দেখতে পেল না।

ইতিমধ্যে কখন তারা যেন চেয়াব শূন্য করে উঠে গিয়েছে।

সামান্য একটু অন্যমনস্কতার গাফিলতিতে সুব্রত বুঝতে পারে মনোহর শিকদার সঙ্গিনীসহ তার প্রখর দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে তবু চারিদিকে প্রখর দৃষ্টিতে একবার তাকাল, কিন্তু হলের মধ্যে কোথাও তাদের দেখতে পেল না। হাত ঘড়ির দিকে তাকালো একবার সুব্রত, রাত সাড়ে দশটা প্রায়। তবু অপেক্ষা করে সুব্রত, যদি আবার মনোহর ও তার সঙ্গিনীর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু বৃথাই। আর সে যুগল মূর্তিকে হলের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না।

॥ উনিশ ॥

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গালো সুব্রতর একটানা টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে।

চোখের ঘুম তখনো যেন চোখের পাতা ভারী করে আছে। কোন মতে এসে রিসিভারটা তুলে নিল সুব্রত, হ্যালো—

সুব্রতবাবু? —নারী কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এলো।

কথা বলছি। কে?

আমি বেবী।

মুহূর্তে যেন সুব্রতর চোখের পাতা থেকে ঘুম চলে যায়। উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সুব্রত, সুপ্রভাত।

চিনতে পারছেন তো?

মৃদু হেসে সুব্রত বলে, না।

পারলেন না চিনতে!

পূর্ববৎ মৃদু হেসে কৌতুকভরা কণ্ঠে সুব্রত জবাব দেয়, নাইবা চিনলাম, বলুন না কি কথা আছে।

আমি বেবী মানে নমিতা ঘোষ। বিনয়েন্দ্রনাথ ঘোষের--

চিনেছি চিনেছি—অত পরিচয় আর দিতে হবে না।

চিনেছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন না।

আপনার কথাই বোধহয় ঠিক।

কি ব্যাপার?

কাল রাত্রে আমার লাইফের 'পরে—

কি! কি বললেন?

হ্যাঁ, দেয়ার ওয়াজ এ্যানাদার এ্যাটেম্পট।

এ্যানাদার এ্যাটেম্পট! খুলে বলুন।

ফোনে বলা সম্ভব নয়। যদি একবার আসেন।

নিশ্চয়ই। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

সুব্রত আধঘণ্টার মধ্যেই বিনয়েন্দ্রের গৃহে পৌঁছে যায়।

করিডোরে একজন ভৃত্য দাঁড়িয়েছিল, সেই প্রশ্ন করে আপনি সুব্রতবাবু?

হ্যাঁ—

চলুন, দিদিমণি উপরে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

উপরে?

হ্যাঁ।

চল।

ভৃত্য দোতলায় একটা ঘরের পর্দা ঝোলানো দরজার সামনে এসে বললে, ভিতরে যান। দিদিমণি ঘরে আছেন।

তবু সুব্রত মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ভিতরে আসতে পারি?

আসুন। আসুন—সঙ্গে সঙ্গে ঘরেব ভিতব থেকে পরিচিত নারী কণ্ঠের আহ্বান এলো।

দামী পর্দাটা তুলে সুব্রত ঘরের ভিতরে পা দিল। বাহিরে ঝকঝকে সূর্যের আলো থাকলেও ঘরের মধ্যে যেন তার নিরঙ্কুশ প্রবেশাধিকার পায়নি। সব ক'টি জানালাতেই ভারী সবুজ রঙের পর্দা টানা।

আসুন সুব্রতবাবু।

সুব্রত মুখ তুলে তাকালো। একটা হেলান দেওয়া গদী আঁটা চেয়ারে বসে ছিল বেবী। মাথার চুল বিস্রস্ত। চোখে মুখে একটা সুস্পষ্ট উৎকণ্ঠা ও রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি। পবিধানে সাধারণ একটি মিলের শাড়ি।

বসুন।

সুব্রত সামনে শূন্য চেয়াবটিতে বসলো।

বাইরে আবার ভৃত্যের গলা শোনা গেল, দিদিমণি চা দেবো?

হ্যাঁ, নিয়ে আয়।

কি ব্যাপার মিস্ ঘোষ।

আপনার কথাই বোধহয় ঠিক।

সুব্রত বেবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সেদিন যখন আপনি আমাকে সাবধান করেছিলেন সুব্রতবাবু, কথাটা তো বিশ্বাস করিইনি, উপরন্তু মনে মনে হেসেছিলামও। আমার প্রাণ কেউ নিতে যাবে কেন? আমার সঙ্গে তো কারো কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রব্যাব্লি ইউ ওয়্যার রাইট্ মিঃ রায়—বলতে বলতে এবারে বেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সুব্রত তখনও চেয়ে আছে বেবীর মুখের দিকে।

আসুন—

কৌতূহলী সুব্রত এবারে উঠে দাঁড়ালো। বেবী অতঃপর সুব্রতকে অনুসরণ করতে বলে সোজা গিয়ে তার ঐ কক্ষেরই সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

বললে, ঐ দেখুন।

সুব্রত সামনের দিকে চেয়ে দেখে বাথরুমের বাথ্‌টবটার এক পাশে একটা রোমশ ককার স্প্যানিয়াল কুকুর পড়ে আছে।

বেবী বলে, মাই পুওর কিটি—সি ইজ্ ডেড সুব্রতবাবু! —বেদনায় বেবীর কণ্ঠস্বরটা যেন বুজে

আসতে চায়।

সুব্রত বেবীর মুখের দিকে তাকালো।

বেবীর দু'চোখের কোলে স্পষ্ট অশ্রুচিহ্ন চিক্ চিক্ করছে।

হাউ ইট্ হ্যাপেণ্ড। সুব্রত এবারে প্রশ্ন করে।

বেবী তখন সুব্রতর প্রশ্নোত্তরে সংক্ষেপে যা বললে তার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ বেবীর চিরদিনই টফির প্রতি অত্যন্ত একটা লোভ থাকায় সর্বদাই সে ঘরে ড্রেসিং টেবিলটার উপরেই একটা সুদৃশ্য কাচের কৌটোয় টফি কিনে রেখে দিত। দিনে ও রাত্রে যখন সে পড়াশুনা করতো, মধ্যে মধ্যে ঐ টফির কৌটো থেকে টফি তুলে নিয়ে খাওয়া তার যেন একটা রীতিমত অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর ককার স্প্যানিয়াল কুকুরটি—কিটি ছিল ওর অত্যন্ত আদরের ও প্রিয়। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতো বেবী ঐ কুকুরটি সর্বদা যেন ছায়ার মতই ওর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। মধ্যে মধ্যে বেবী কুকুরটিকে একটা দুটো মিষ্ট টফি দিত। কিটিও সানন্দে তার সদ্ব্যবহার করতে কোনরূপ দ্বিধা বা অনিচ্ছা ছিল না। গতকাল রাত্রি প্রায় দশটার পর এক বন্ধুর বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ সেরে ফিরে বেবী ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াতে যখন ব্যস্ত সেই সময় কিটি এসে ওর চারপাশে আনন্দে ঘোরাফেরা করতে থাকে। সেই সময় বেবী কৌটো থেকে দুটো টফি তুলে নিজের জন্য পাশে একটা রেখে অন্যটা ছুঁড়ে দেয় কিটিকে। তারই কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ ও ছটফটানীর সাড়া পেয়ে চকিতে বেবী তাকিয়ে দেখে কিটি তার পায়ের সামনে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণাকাতর শব্দ করছে আর তার দেহটা যেন নিদারুণ এক আক্ষেপে ভেঙে দুমড়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এবং ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই কিটির দেহটা স্থির হয়ে গেল। হতভম্ব বেবী কিটির দেহটা নাড়াচাড়া করতে গিয়েই বুঝতে পারে কিটির দেহে আর প্রাণ নেই এবং তার মুখের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে একটা রক্তের ক্ষীণ ধারা।

বেবী বলতে থাকে, ইট ওয়াজ সো সাডেন্ এণ্ড সো কুইক্ সুব্রতবাবু যে ব্যাপারটা যেন আমাকে একেবারে তখন স্টাণ্ট করে দিয়েছে। কি করবো, কি না করবো বুঝবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত যেন তখন আমার লোপ পেয়েছে।

॥ কুড়ি ॥

বেবী বলে চলে, তারপর যতই ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করতে লাগলাম ততই যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। সারাটা রাত ধরে কেবল ভেবেছি। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল আপনার সেদিনকার কথাগুলো। তবে কি আমাকেই হত্যা করবার জন্য বিযাক্ত টফি আমার মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কেউ!

সুব্রত বলে, সে বিষয়ে তো কোন ভুলই নেই।

এখন অবিশ্যি সেটা যে বুঝতে পারছি না তা নয়। কিন্তু এ যে এখনো আমি ভাবতে পারছি না সুব্রতবাবু। এ সংসারে এমন কে আমার শত্রু থাকতে পারে যে আমাকে সরাবার জন্য এভাবে দু দুবার চেষ্টা করলো!

একটা মস্ত বড় কথাই যে ভুলে যাচ্ছেন মিস্ ঘোষ। এ-সংসারে অর্থের মত অনর্থ ঘটাতে বোধহয় কিছুই পারেনা। আর সেই অর্থ আপনার প্রয়োজনের চাইতেও অনেক অনেক বেশী আছে।

অর্থ। কিন্তু জানি না বিশ্বাস করবেন কিনা সুব্রতবাবু, অর্থ—যা আপনি বললেন আমার অনেক আছে বটে কিন্তু সত্যি বলছি সে অর্থের 'পরে এতটুকু লোভ বা আসক্তি কোন দিনই আমার নেই। আর সত্যি যদি কেউ আমার সেই অর্থের লোভেই এ কাজ করে থাকে তো লেট্ হিম্ কাম ফরওয়ার্ড অত্যন্ত খুশি মনে আমার সবকিছু তার হাতে আমি তুলে দিতে রাজী আছি।

সুব্রত মৃদু হেসে ফেলে।

হাসছেন যে?

আপনি এখনো দেখছি একেবারে ছেলেমানুষই আছেন। দুনিয়ার মানুষগুলো যে কি বিচিত্র যদি জানতেন। আর ঐ লোভ ব্যাপারটি মানুষের মনের মধ্যে যখন বাঘের মত থাবা গেড়ে এসে বসে তখন সময় বিশেষে যে কত বড় বিস্ময়ও ঘটতে পারে, অনেক সময় আমাদের সেটা স্বপ্নেরও অগোচর থাকে মিস্ ঘোষ।

ভৃত্য ঐসময় ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

চা পান করতে করতে তাকাচ্ছিল সুব্রত বেবীর মুখের দিকে। সদানন্দময় মুখখানির উপরে যেন একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ ছায়া নেমেছে বেবীর।

ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত আপনার কথাই মনে পড়লো, আপনাকে আসবার জন্য টেলিফোন করলাম। বেবী আবার বলে।

এত ঘাবড়েই বা যাচ্ছেন কেন?

না মিঃ রায়, ঘাবড়াইনি আমি। কিন্তু একি অশান্তি বলুন তো। আমার জীবন নিয়ে যদি কেউ খুশি হয় তো হোক, কিন্তু—

খুশি হবে মানে, তোমার প্রাণটা কি এত তুচ্ছ যে একজনের খুশির জন্য সেটা অনায়াসেই তার হাতে তুলে দেবে বেবী!

নিছক অন্তরের তাগিদেই উত্তেজনার মাথায় কথার মধ্যে নাম ধরে ডাকা ও তুমি সম্বোধনটা যে বের হয়ে এসেছে সুব্রতর সেটা খেয়াল না থাকলেও বেবীর কানে বেজেছিল। সুব্রতর শূন্য কাপটায় বেবী লিকার ঢালছিল, হঠাৎ খানিকটা লিকার ছলকে ডিসে ও টেবিলক্লথে পড়তেই সুব্রতর খেয়াল ফিরে আসে।

বেবী তখনো সুব্রতর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

কি হলো?

য়্যাঁ। —বেবী যেন ঈষৎ চমকে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই বলে, কই না, কিছু না তো। বলছিলাম পেস্ট্রীগুলো একটাও তো আপনি ছুঁলেন না।

সুব্রত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো, মিস্ ঘোষ, আপনার কাকাবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন?

না, তাছাড়া গত পরশু সকাল থেকে তিনি বাড়ীতেও নেই।

বাড়ীতে নেই?

না। ধানবাদের কলিয়ারীতে অফিস ইন্‌সপেক্‌শনে গিয়েছেন।

মধ্যে মধ্যে যেতে হয়, না?

হ্যাঁ, প্রায়ই যান। কিন্তু বেশ তো তুমি বলে কথা বলছিলেন, হঠাৎ আবার আপনি শুরু করলেন কেন? আপনি আমাকে 'তুমি' বলে কথা বললেই বেশী সন্তুষ্ট হবো মিঃ রায়।

সুব্রত বেবীর মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু বেবী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল বলে চোখাচোখি হলো না। কত সময় তুচ্ছ একটা প্রশ্ন বা ততোধিক তুচ্ছ কোন অনুরোধ মানুষকে যে কি ভাবে বিব্রত করে তুলতে পারে ভাবতেও বুঝি বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তাই সুব্রত যখন আবার একটা নতুন প্রশ্ন তুলবার মুখে 'তুমি' ও 'আপনি' কি দিয়ে শুরু করবে ইতস্ততঃ করছে, এবং বলে, মানে তু—

বেবী মৃদু হেসে ওর মুখের দিকে তাকালো। বললে, বলুন না কি বলছেন।

হ্যাঁ, বলছিলাম ঐ কিটির মৃত্যুর ব্যাপারটা বাড়ীতে আর কেউ জেনেছে?

না, এখনো কাউকে জানাইনি, কিন্তু আর কিছুক্ষণ বাদে একসময় তো সকলেই জানবে।

সুব্রত বুঝতে পারে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বেবীর। এখনো সে তারই অপেক্ষায় বোধহয় ব্যাপারটা জানতে দেয়নি বাড়ীর কাউকে।

হ্যাঁ, জানবে তো নিশ্চয়ই। তবে টফির ব্যাপারটা আপাততঃ চেপে যাওয়াই ভাল। সুব্রত বললে।

না, বলবো না! —বলে একটু থেমে বেবী আবার বলে, কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম।

কি?

এলাহাবাদে আমার এক মাসী আছেন, তাঁর ওখানে গিয়ে মাসখানেক থেকে—

না। আপাততঃ তুমি কোথাও যেও না।

বেশ।

কলকাতাতে থাকলে সর্বদা তোমার 'পরে আমার নজর রাখবার সুবিধা হবে।

তাহলে যাবো না?

না। কিন্তু ইউ মাস্ট টেক্ ইট্ ইজি! কোনরকম রুড করতে পারবে না।

বেবী জবাবে এবার মৃদু হাসলো মাত্র।
আমি এবার তাহলে উঠি।
উঠবেন?
হ্যাঁ, কিন্তু একটা কথা, প্রয়োজনে আমাকে ফোন করে জানাতে কিন্তু এতটুকুও দ্বিধা করবে না আজকের মত, মনে থাকবে তো কথাটা?
থাকবে।
হ্যাঁ, ডোন্ট্ হেসিটেট্।

॥ একুশ ॥

দক্ষিণেশ্বরে একেবারে গঙ্গার কোল ঘেঁষে দোতলা একটি বাড়ী। বাড়ীটির সামনে প্রায় ১০/১২ কাটা জমি নিয়ে বিরাট একটি বাগান। নানা প্রকারের ফল ফুল ইত্যাদির গাছে সত্যিই বাগানটির মধ্যে একটি শান্ত নির্জনতা যেন দানা বেঁধে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে বেঞ্চ পাতা, উলঙ্গ পরীর মর্মর মূর্তি। বাড়ী ও তৎসংলগ্ন বাগানটি এককালে একজন মাড়োয়ারীর ছিল এবং তারও আগে যে কার ছিল বলা দুষ্কর। কেউ কেউ বলে লর্ড ক্যানিংয়ের আমলের বাড়ী। কিছু দিন হলো 'মতিঝিলে'র অধিকারী সন্তোষ মিত্র ক্রয় করে নিয়েছেন এবং বাড়ীটার মধ্যে অনেক অদল বদল করে তার সৌন্দর্য্য যেন অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাড়ীটা অনেক দিনের পুরানো হওয়ায় এবং নিয়মিত ব্যবহৃত হতো না বলে সব কিছুই বাড়ীটার জীর্ণ হয়ে এসেছিল।

প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে প্ল্যান করিয়ে বাড়ীটার আমূল সংস্কার সাধন করেছেন সন্তোষ মিত্র। বাড়ীটা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখন তিনজন মালী, দুজন দারোয়ান ও একজন পাঞ্জাবী কেয়ার টেকার নিযুক্ত করা হয়েছে। দোতলায় ও তিনতলায় চারখানি করে বড বড় আটখানি ঘর। দোতলার সামনের দিকে গঙ্গার দিকে মুখ করে মস্ত বড় টানা বারান্দা। মধ্যে মধ্যে ইদানীং সন্তোষ মিত্রের ঐ বাড়ীটায় একদল কলেজের ছেলে মেয়ে এসে একদিন দুদিন হৈ-হল্লা, স্ফুর্তি করে যায়।

কি একটা পর্ব উপলক্ষে কলেজে পর পর দুদিন ছুটি। সেই ছুটিকে উপলক্ষ করেই সন্তোষ মিত্র একদল তার অনুরাগী ও অনুরাগিণী কলেজের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন ঐ বাড়ীতে। এবং সেই দলের মধ্যে ছিল এক পাঞ্জাবী তরুণের ছদ্মবেশে সুব্রত রায়। নাম নিয়েছিল রঞ্জিৎ সিং। সে এসেছিল ঐ দলেরই একজন পাঞ্জাবী ছাত্রী রমা কাউরের বন্ধু হিসেবে। মাথায় পাগড়ি, চোখে চশমা ও স্যুট পরিহিত, মুখে দাড়ি সুব্রতকে চিনবারও উপায় ছিল না কারো।

সুব্রত ছাড়াও দলের মধ্যে ছিল নির্মল চৌধুরী। সে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের দলে ছিল না। একজন ছাত্রের ভৃত্য হিসাবে সে এসেছিল ভৃত্যের ছদ্মবেশে।

আবো পরিচিতের মধ্যে ছিল করবী, বেবী ও বিনয়েন্দ্রের অফিসের সুপারভাইজার, ম্যানেজার বা বিনয়েন্দ্রের সর্ব ব্যাপারে দক্ষিণ হস্ত মনোহর শিকদার।

একটা রাত ও দুটো দিন সকলেই ওখানে থাকবে; তাই উপরের চারখানা ঘরে আলাদা আলাদা ভাবে ছেলে ও মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

বেলা সাড়ে ন'টা হবে তখন। রঞ্জিৎ সিং ছদ্মবেশী সুব্রত গলায় একটা রোলিফ্লেক্স্ ক্যামেরা নিয়ে দোতলার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

বাগান পার্টির উদ্যোক্তা স্বয়ং সন্তোষ মিত্র এখনো এসে ওখানে পৌছাননি। বারান্দার এদিকে ওদিকে সব ডেক্ চেয়ারপাতা। সমাগতের দল কেউ কেউ সেই চেয়ারে বসে, আবার কেউ কেউ দাঁড়িয়ে হাসি গল্প করছে।

সুব্রত দেখল বারান্দার একপাশে দামী স্যুট্ পরিহিত মনোহর শিকদার একটি তরুণীর সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিম্ন কণ্ঠে হেসে হেসে কি যেন আলাপ করছে।

সুব্রত মুহূর্তে কি ভেবে ক্যামেরাট' রেডি করে মনোহর শিকদার ও তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হাসি গল্পেরত তরুণীটির একটি স্ন্যাপ নিয়ে নিল।

হঠাৎ একসময় সুব্রতর নজরে পড়লো বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে দূর গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বেবী। পরিধানে সাদা জর্জেট গায়েও সাদা জর্জেটের ফুল হাতা ব্লাউজ।

মাথায় চুল এলোমেলো খোঁপা করা, সুব্রত কি ভেবে দু'পা এগিয়ে যায় বেবীর দিকে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি তরুণী এগিয়ে এসে ইংরাজীতে বলে, গঙ্গার স্ন্যাপ নিলেন বুঝি মিঃ সিং?

হ্যাঁ। —মৃদু হেসে ইংরাজীতেই জবাব দেয় সুব্রত।

কি ক্যামেরা ওটা আপনার?

রোলিফ্লেক্স্।

ঐ সময় সুব্রত লক্ষ্য করে বেবী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাড়ীটার পিছন দিকে গঙ্গার পাড়ে বহু প্রাচীন এক বৃক্ষ শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে জায়গাটিকে ছায়া-শীতল করে রেখেছে। বিরাট বিরাট শিকড়গুলো মাটির বুকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিড় এড়িয়ে করবী সেই বটবৃক্ষের নিচে মোটা একটা শিকড়ের উপর একাকী চুপটি করে বসে ছিল। এবারকার পার্টিতে করবীর আদৌ আসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সুব্রত বিশেষভাবে ওকে টেলিফোনে আসবার জন্য অনুরোধ করায় ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ও এসেছে। অথচ সুব্রত টেলিফোনে ওকে বলেছিল, সেও এখানে আসবে, কিন্তু এখনও তার দেখা নেই।

করবী।

কে? চমকে ফিরে দেখে করবী পিছনে দাঁড়িয়ে সন্তোষ মিত্র।

সন্তোষবাবু! কখন এলেন আপনি?

এই তো কিছুক্ষণ।

টের পাইনি তো?

টের পেতে হলে যে মনের দরকার, মনের সে অবস্থা কি তোমার আছে করবী যে কারো আসা যাওয়া এত সহজে টের পাবে। কিন্তু সত্যি বলছি, এখনো কেন সেই পুরোনো কথা নিয়ে মন খারাপ করো বলতো?

পুরানো কথা!

তা নয়ত কি। তুমি কি মনে করো যে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সে আর কখনো ফিরে আসবে। তাছাড়া কি ছিল তার। তুমি কি এতই সহজলভ্যা যে নির্মলের মত অতি সাধারণ একজন ছেলে—

ওসব কথা থাক সন্তোষবাবু।

না, কেন থাকবে? কি এমন মহামূল্যবান বস্তু তুমি হারিয়েছ যার জন্যে জীবনের সমস্ত আনন্দকে এইভাবে বিসর্জন দিয়ে তোমাকে যৌবনে যোগিনী সাজতে হবে! না, না—রুবি, এভাবে তুমি তোমার আত্মাকে পীড়ন করো না, করা তোমার উচিত নয়। মানুষের জীবনটা এতো ছোট নয় রুবি যে, একজনের অভাবে তাকে এমনি করে সর্বস্ব ত্যাগের বৈরাগ্যের দুঃসহ কৃচ্ছ্র সাধন করতে হবে।

সন্তোষ মিত্রের শেষের কথাগুলোতে কণ্ঠস্বরে এমন একটা আবেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চমকিত করবী তাঁর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারে না। সহসা পরমুহূর্তেই এগিয়ে এসে সন্তোষ মিত্র করবীর একখানা হাত ধরে উঠবার জন্য ঈষৎ আকর্ষণ করে বলে ওঠেন, চল, ওঠো—জীবন শোকের নয়, আনন্দের।

আঃ ছাড়ুন মিঃ মিত্র। —হাতটা ছাড়িয়ে নিল করবী। এবং হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আর মুহূর্তমাত্রও সেখানে দাঁড়ালো না করবী। দ্রুতপদে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

তার ক্রমঅপসৃয়মান দেহটার দিকে তাকিয়ে প্রথমে মুহূর্তের জন্য সন্তোষ মিত্রের মুখভাব ক্রোধে আরক্তিম হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই ক্রোধ মিলিয়ে গিয়ে ওষ্ঠপ্রান্তে নীরব এক ক্রুর হাসি ফুটে উঠলো।

আর সেই সময় বেবী গঙ্গার একেবারে কোল ঘেঁষে যেখানে মস্ত বড় একটা পাথর পড়ে ছিল, সেই পাথরের উপর সামনের গঙ্গার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে একাকী দল ছাড়া হয়ে বসে ছিল। সুব্রতর অনুরোধে এখানে সে এসেছে বটে কিন্তু এক মুহূর্তও যেন তার থাকতে আর মন চাইছিল না। আজকের রাতটা কোনমতে কাটাতে পারলেই কাল প্রত্যূষেই সে চলে যাবে মনে মনে স্থির করে রেখেছে।

গঙ্গায় বোধহয় জোয়ার লাগলো। ঘোলা জলের স্ফীতি একেবারে হাতখানেকের মধ্যে এসে পড়েছে। গেরুয়া বর্ণের পাল তুলে মস্ত বড় মহাজনী নৌকাটা ভেসে চলেছে জোয়ারের টানে টানে। দোতলা থেকে অনেকগুলো কণ্ঠের মিলিত একটা গানের সুর ভেসে আসছে। সহসা কার চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বর যেন ওর কানে এলো!

বেবী!

চমকে ফিরে দেখে বেবী, পশ্চাতে তার দাঁড়িয়ে রঞ্জিৎ সিং।

সুব্রতবাবু!

বেবীর মুখে নিজের নামটা শুনে একটু যেন চমকেই ওঠে সুব্রত। এদিক ওদিক সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে পূর্ব্ববৎ চাপা নিম্ন কণ্ঠে বলে, চুপ্ —আস্তে—

বসুন—বেবী তার পাথরের একটা অংশ দেখিয়ে ওকে বসবার জন্য আহ্বান জানায়।

না, বসবো না। তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো তাহলে?

বেবী ওর কথার কোন জবাব দিল না। শুধু একটু হাসলো মাত্র। ক্ষণেকের জন্য মনে হয় বুঝি বেবীর, চিনতে তোমাকে পাববো না কেমন করে একথা বললে। যে মূর্তি হৃদয়ের সর্বত্র ছায়া ফেলেছে, যে কণ্ঠস্বর দু'কান ভরে অহোরহ দূরাগত সঙ্গীতধ্বনীর মতই বাজছে। কিন্তু না, সে কথা তো বলবার নয়। কাউকেই তো জানাবার নয়।

মৃদু কণ্ঠে বেবী বলে, কি ভেবেছিলেন আপনি?

কিন্তু.....

বাধা দিয়ে বেবী এবারে বলে, প্রথম দেখে ও আপনার গলার স্বর শুনেই চিনতে পেরেছি—

যাক্ সে কথা! একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যই তোমাকে কাল থেকে একলা খুঁজছিলাম—

একলা খুঁজছিলেন?

হ্যাঁ, আজকের রাতটা তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবেই, আর—

আর—

আর ঐ করবীদেবীর ওপর তোমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

করবীদেবীর ওপর?

হ্যাঁ।

কিন্তু ব্যাপার কি মিঃ রায়?

সব কথা পরে, জানবে। শুধু যা বললাম মনে থাকে যেন।

বেশ।

লক্ষ্মী মেয়ে! আচ্ছা, আমি চললাম। —সুব্রত দ্রুতপদে চলে গেল।

॥ বাইশ ॥

নিচের তলার ঠিক সিঁড়ির মুখেই যে ঘরের দরজাটা, সুব্রত বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগুতে গিয়ে সেই দরজার দিকে দৃষ্টি পড়তেই থমকে দাঁড়ালো। দীর্ঘ স্যুট পরিহিত এক ব্যক্তি বন্ধ ঘরের দরজার দুই কবাটের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে চট করে কি যেন একটা সাদা খামের মত ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে পাশের হলঘরে ঢুকে গেল ত্বরিৎপদে। এখানে আসা অবধি সুব্রত লক্ষ্য করেছিল নিচের তলার ঐ ঘরটির দরজায় শিকল তোলা। ঐ ঘরটিতে কেউ প্রবেশ করে না।

দেওয়ালের গা ঘেঁষে সুব্রত নিজেকে আত্মগোপন করেছিল। স্যুট পরিহিত ব্যক্তিটি পিছন ফিরে তাকায়। সুব্রত তাকে চিনতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত মনে মনে ভাবে, কে হতে পারে লোকটি। এখানে সদ্য উপস্থিত যারা সকলকেই মনে মনে একবার ভেবে নিল সুব্রত কিন্তু কারো সঙ্গেই যেন ক্ষণপূর্বে পিছন দিক হতে দৃষ্ট লোকটিকে সনাক্ত করতে পারলো না। কিন্তু পরক্ষণেই এদিক ওদিক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিল। নিচে তখন কেউ নেই। সকলেই উপরে জটলা পাকাচ্ছে। তাদের হৈ-হল্লা ও গান শোনা যাচ্ছে।

কৌতূহলী সুব্রত এগিয়ে গিয়ে চট্ করে শিকল খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ভিতর দিক থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ঘরটা খালি। একপাশে একটা বড় কাঠের দেওয়াল আলমারি ও একটা ড্রেসিং টেবিল মাত্র। ঘরের মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো।

দরজার সামনেই মেঝেতে কার্পেটের উপরে নজর পড়লো সুব্রতর, একটা সাদা খাম পড়ে আছে। নিচু হয়ে খামটা তুলে নিল সে। মুখটা খোলা খামের। সন্তর্পণে খামের ভিতর থেকে চিঠির একটা কাগজ বের করলো সুব্রত।

অপূর্ব, প্রস্তুত থেকো। রাত বারটার পর। 'রুইতন'।

আশ্চর্য! এ সেই হস্তাক্ষর। সেই অপূর্ব! খামের মধ্যে চিঠিটা যেমন মেঝেতে পড়েছিল তেমনি ফেলে রেখে সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে এসে আবার শিকল তুলে দিল।

মুহূর্তকাল কি যেন ভেবে নিল সে। তারপরই গেটের পাশে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে চললো। গ্যারেজের কাছাকাছি গিয়ে ও দেখতে পেল একটা গাড়ি গেট দিয়ে বের হয়ে চলে গেল। দূর থেকে চলন্ত গাড়ির নম্বরটা দেখে সুব্রত চম্‌কে ওঠে। সন্তোষ মিত্রের গাড়ি। সন্তোষ মিত্র কি তবে ইতিমধ্যে একসময় এসেছিল। আর এসেছিলই যদি তো চলে গেল কেন?

চিন্তিত সুব্রত নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। এখানে আসবার সময় গতকাল নিজের গাড়িটা আনেনি। এনেছিল তারই এক বন্ধুর গাড়িটা দিন দুয়েকের জন্য চেয়ে। সুব্রত গাড়িতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিল।

বেলা তখন গোটা সাড়ে বারো হবে। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ঘোষ এণ্ড কোম্পানির বিরাট অফিসের সামনে সুব্রত এসে গাড়িটা থামালো। ফুটপাতের ধারে যেখানে গাড়ির পার্কিং সেখানে গাড়িটা পার্ক করে গাড়ি থেকে নেমে অফিসের গেটের দিকে অগ্রসর হলো সে। লিফ্‌টে করে তিনতলায় উঠে এলো।

বিরাট হলঘরের চারিদিকে সব টেবিল চেয়ার পাতা। প্রায় সাত আটশত কর্মচারি যে যার কাজে ব্যস্ত। বহু কণ্ঠের মিলিত একটা গুঞ্জন ও টাইপ রাইটারের খট্‌ খট্‌ শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছে। এন্‌কোয়ারীতে জিজ্ঞাসা করে সুব্রত ম্যানেজিং ডাইরেকটারের অফিসের দিকে এগিয়ে গেল। ঝক্‌ঝকে বার্মা টিক উডের ভেজানো দরজার সামনে একজন বেয়ারা বসে ছিল।

কিসকো মাঙ্গতেহে সাব।

বলা বাহুল্য সুব্রত ইতিমধ্যে বাড়ীতে গিয়ে তার বেশভূষা বদল করে এসেছিল।

ম্যানেজিং ডাইরেকটার সাব্‌কো সাথ ভেট মাঙ্গতে হে—

সাব তো আভি অফিস্‌ মে নেই আয়া হ্যায় সাব্‌!—

লেকেন হামারা সাথ ইসি বখত জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট থা সাব্‌কো।

তো যাইয়ে না, ওয়েটিং রুমমে বৈঠিয়ে না।

না বসবো না। এখানে একজন বাবুর সঙ্গে আমার দেখা করবার আছে দেখা করে আসি—সুব্রত একটু এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেলেও সুব্রত আড়চোখে বেয়ারাটার উপর নজর রাখলো যদি কোন এক সময় বেয়ারাটা মুহূর্তের জন্যও ঐখান থেকে সরে যায় তো ও একবার এ্যাটেম্পট্‌ নিয়ে দেখতো যদি অফিস ঘরটা খোলা পায় ম্যানেজিং ডাইরেকটারের।

বেশীক্ষণ সুব্রতকে অপেক্ষা করতে হলো না। একটা বাজতেই অফিসের টিফিনের সময় এসে গেল। বেয়ারাটা টুল ছেড়ে উঠে গেল। সুব্রত ঐ সুযোগ হেলায় হারালো না। চট করে এক সময় অফিস ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বরাত ভালো সুব্রতর। দরজাটা খোলাই ছিল। ঠেলাতেই খুলে গেল এবং সেও চট করে অফিস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ম্যানেজিং ডাইরেকটার বিনয়েন্দ্রনাথের ঐ সময় অফিসে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ বেবীর মুখেই সে শুনেছে বিনয়েন্দ্র ধানবাদ গিয়েছেন এবং ফিরবেন দিন দশেক বাদে।

চমৎকার সাজানো গোছানো অফিস ঘরটি।

বিরাট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। একটি গদী মোড়া দামী রিভলভিং চেয়ার। একপাশে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড় করানো মস্ত বড় একটা ষ্টিলের আলমারি। একটি হ্যাট ও কোট রাখবার র‍্যাক তার পাশেই।

এদিক ওদিক তাকাতেই সুব্রতর নজর পড়লো ঘরের মধ্যে আরো দুটি দরজা দুদিকে। প্রথম দরজাটা ঠেলে খুলতেই দেখলো সেটা প্রিভি দ্বিতীয় দরজাটা ঠেলে খুলতেই অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ঘর চোখে পড়লো। এবং সেটাও যে একটা অফিস রুম দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না। সে ঘরের মধ্যেও তখন কেউ ছিল না।

সুব্রত ঘরের মধ্যে পা দিল দরজা পথে। মাঝারি গোছের একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একখানি চেয়ার, টেবিলের 'পরে ফোন। ঘরের একপাশে একটি ছোট টেবিলের 'পরে একটি টাইপ রাইটিং

মেসিন, তার পাশে একটি ষ্টিলের আলমারি মাঝারি সাইজের। এ ঘরের সংলগ্নও যে একটি বাথরুম আছে ঘরের মধ্যস্থিত আর একটি দ্বার দেখেই সেটা বুঝতে পারে সুব্রত। এগিয়ে গেল সুব্রত টাইপ রাইটিং মেসিনটা যে টেবিলের 'পরে ছিল সেটার সামনে।

পাশেই কয়েকটা কাগজ রাখা আছে টাইপ করা। অন্যমনস্ক ভাবেই সুব্রত একটা টাইপ করা কাগজ টেবিলের 'পর থেকে তুলে নিল। অফিস গোডাউনের একটা স্টেটমেন্ট।

সহসা স্টেটমেন্টটা দেখতে দেখতে টাইপ করা অক্ষরগুলোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব সুব্রতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। অক্ষরগুলোর মধ্যে ক্যাপিটাল 'ই' ও 'এন্' লেটারগুলো অস্পষ্ট। 'ই' ও 'এন্' অক্ষর দুইটি ভাঙ্গা। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় মাত্র আগের দিন সন্ধ্যার সময় কিরিটীর বাসায় বসে ঘোষনিবাসে নরেন্দ্রনাথের মৃতদেহের পাশে আকুস্থান 'সামার হাউসের' বেঞ্চের 'পরে যে এ্যাবার্ডিন থেকে ইংরাজীতে টাইপ করা চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল, সেই চিঠির সম্পর্কেই কিরীটি বলেছিল, চিঠির টাইপে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস কিনা জানিনা সুব্রত। টাইপের বড় হাতের 'ই' ও 'এন্' অক্ষরগুলো ভাঙ্গা।

উত্তেজিত সুব্রত এবারে টাইপ রাইটিং মেসিনের 'ই' ও 'এন্' অক্ষর দুটো পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলো অক্ষর দুটোই ভাঙ্গা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করলো মনোহর শিকদার।

কে?

সুব্রত ঘরের মধ্যে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল তাই প্রথমটা চিনতে না পেরে সম্পূর্ণ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তার প্রাইভেট অফিস ঘরে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সুব্রত ততোক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

নমস্কার মিঃ শিকদার।

হু দি ডেবিল ইউ আর! কে আপনি? হাউ কুড্ ইউ গেট ইন্ হিয়ার?

আমার নাম সুব্রত রায়!

সুব্রতবাবু!........কিন্তু কার হুকুমে এ ঘরে আপনি ঢুকলেন?—বলে শিকদার এগিয়ে গিয়ে টেবিল সংলগ্ন কলিং বেলটা বাজাতে যাবেন, সুব্রত তাকে বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, একটু অপেক্ষা করুন মিঃ শিকদার, কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে এ ঘরে ডেকে আনলে আপনারই অসুবিধা হবে। আপনিই বিব্রত হবেন।

বিব্রত হবো!

হ্যাঁ, কারণ আপনার এ ঘর এখন সার্চ করবার জন্য পুলিশকে ফোন করি—এবং তারা এসে সার্চ করে এমন কোন মারাত্মক প্রমাণ যদি পায় এই ঘরে—

মারাত্মক প্রমাণ! হোয়াট্ ডু ইউ মিন?

আই মিন, সেই প্রমাণ যদি এমন হয় যে, মৃত নরেন্দ্রনাথ ঘোষের, এই অফিসের পূর্বতন মালিক—তাঁর হত্যা-রহস্যের ফেভারে যায় তো বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা খুব সুবিধার হবে না তখন। তার চাইতে মিথ্যে একটা কেলেঙ্কারীর চেষ্টা না করে যদি সামনের ঐ চেয়ারটায় বসেন এবং আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দেন—

সুব্রতর শেষের কথাগুলো মনোহর শিকদারকে যে বেশ একটু বিচলিত করে দেয় সেটা সুব্রতর বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না। কারণ পরমুহূর্তেই কথা বলতে গিয়ে মনোহরের গলাটা একটু কেঁপে ওঠে। এবং তার চোখে মুখেও একটা সুস্পষ্ট বিহ্বলতা প্রকাশ পায়, সে তখন বলে, এসব কি বলছেন আপনি!

সুব্রত এবারে মনে মনে হেসে তার চরম অস্ত্রটি প্রয়োগ করে:

শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলে, বলছি, ঐ যে আপনার ঘরে টাইপ রাইটিং মেসিনটি টেবিলের 'পরে রয়েছে ওইটিই প্রমাণ করবে হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথ ঘোষের হত্যার প্রস্তুতির একেবারে মোক্ষম নিদর্শন।

মোক্ষম নিদর্শন! কি সব প্রলাপ বকছেন আপনি?

প্রলাপই বটে! তবে আদালত এ প্রলাপ থেকেই যখন আপনাকে নরেন্দ্রনাথের হত্যার অন্যতম সাহায্যকারী বলে কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে—

এতক্ষণে সত্যি সত্যিই মনোহর শিকদার সামনের চেয়ারটার উপরে বসে পড়লেন।

আরো নির্মম কণ্ঠে সুব্রত এবারে বলে, আরো বিশদ ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি মিঃ শিকদার। এ্যাবার্ডিনের এক বিলিতী কোম্পানীর নাম দিয়ে নরেন্দ্রনাথের ফটো তোলার নেশাকে উদ্রিক্ত করে ইংরাজীতে টাইপ করে, যে চিঠির ফাঁদ পেতেছিলেন, সে চিঠিটা যে আপনার টাইপ রাইটারেই টাইপ করা হয়েছিল সেটা প্রমাণ করবে ঐ মেসিনটিরই ভাঙ্গা 'ই' ও 'এন্' ইংরাজী অক্ষর দুটি। আশা করি এবারে আমার বক্তব্যটা বুঝতে আর আপনার কষ্ট হচ্ছে না!—তারপর একটু থেমে সুব্রত বলে, কলিং বেল টিপে এবারে ডাকবেন নাকি আপনার বেয়ারাকে মিঃ শিকদার?

মনোহর শিকদার এবারে একেবারে নিশ্চুপ। বোবা অসহায় আতঙ্কিত দৃষ্টি ফুটে ওঠে তার দু'চোখে।

আর আশা করি এটাও আপনার অজানা নেই যে, হত্যা যে করে ও সেই হত্যার ব্যাপারে যে সাহায্য করে উভয়েই মার্ডার ও এ্যাবেট্‌মেন্ট অফ মার্ডার আইনের চোখে সমান অপরাধী মিঃ শিকদার।

আমাকে বাঁচান সুব্রতবাবু!—সহসা যেন ভেঙ্গে পড়লেন মনোহর শিকদার।

বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি যদি আপনি আমার সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেন।

বলবো, নিশ্চয়ই যতটা আমার জানা আছে আমি বলবো!

বেশ, তবে বলুন নরেন্দ্রনাথকে ফটো তোলবার জন্য ডাকে ফিল্ম স্পুলটা কে পাঠিয়েছিল?

বিশ্বাস করুন সুব্রতবাবু, সত্যিই তা আমি জানি না।

জানেন না। এখনো চাতুরী খেলবার চেষ্টা করছেন?

ঈশ্বরের দোহাই! বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি ফিল্ম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

কিছুই জানেন না?

না।

বেশ! আপনার এ অফিসে সত্যিকারের ফাংসনটা কি? না সেটাও জানেন না?

আমি—

বলুন।

সন্তোষ মিত্রের রিপ্রেজেনটেটিভ্ হিসাবে আমি কাজ করি।

সন্তোষ মিত্র! মানে মতিঝিলের?

হ্যাঁ।

তাঁর এ অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক কি?

তিনি এ অফিসের একজন মেজর শেয়ার হোল্ডার বলেই আমি জানি।

আই-সি। আচ্ছা সন্তোষ মিত্র সম্পর্কে আপনি কতটুকু কি জানেন?

বিশ্বাস করুন তাঁর সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানি না।

কিছুই একেবারে জানেন না? তাঁর বাড়ী ঘর দোর, মতিঝিলে আবির্ভূত হবার আগে তিনি কোথায় ছিলেন?

না।

হুঁ আচ্ছা অপূর্ববাবু নামে কোন ব্যক্তি বিশেষকে আপনি জানেন?

না।—একটা ঢোক গিলে কথাটা কোনমতে উচ্চারণ করে শিকদার।

জানেন না। সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যিই বলছি।

হুঁ! রুইতন বলে কোন নাম আপনি কখনো শুনেছেন বা জানেন?

রুইতন!

হ্যাঁ—

না!

হুঁ। রুইতন নামটিও শোনেননি তাহলে। বেশ! গত শনিবার রাত্রে চায়না হোটেলে যে তরুণীটি আপনার সঙ্গে ছিল সে কে?

কি বলেছেন আপনি সুব্রতবাবু। গত শনিবার রাত্রে মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় বাড়ী থেকে মোটে আমি বেরই হইনি—

আপনি বেরই হননি?

না।

সুব্রত আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিতে যেতেই ব্যাকুল আর্তকণ্ঠে মনোহর শিকদার বলে ওঠে, ওকি সুব্রতবাবু—

হ্যালো, পুট মি টু পুলিশ হেড কোয়ার্টার—

সুব্রত মনোহরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, চুপচাপ বসে থাকেন যদি তো কোন কেলেঙ্কারীই হবে না। নচেৎ অপমানের একশেষ হবেন মিঃ শিকদার।

মনোহর অতঃপর কাজে আর বাধা দেয় না! নিঃশব্দে চেয়ারটার উপর বসে থাকে। সুব্রত তখন ফোনে বলে চলেছে, কে সোম! হ্যাঁ আমি সুব্রত কথা বলছি। এখুনি একটা জীপে করে কয়েকজন আর্মড প্লেন ড্রেসে পুলিশ পাঠান! আপনি আসছেন—বেশ তো আসুন—

সুব্রত ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

মিঃ রায়—

বললাম তো মিঃ শিকদার, কোন রকম কেলেঙ্কারীই করবো না আমি। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করের হত্যা রহস্যের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেবল আপনাকে থানায় নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন সুব্রতবাবু, ওদের দুজনার একজনকেও আমি হত্যা করিনি।

সেটা আদালতই বিচার করবে। আমার কিছুই করবার নেই। সত্যিই যদি তাদের বিচারে আপনি নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে সসম্মানে আপনি মুক্তি পাবেন বৈকি! তবে যতক্ষণ না সেটা প্রমাণিত হচ্ছে, কষ্ট আপনাকে একটু ভোগ করতেই হবে। কিন্তু ওরা আসবার আগে যদি একটা প্রশ্নের জবাব দেন, সন্তোষ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গলাভ কতদিন আপনার ঘটেছে?

ওর কাছে আমি বছর চারেক কাজ করছি।

তার আগে কোথায় ছিলেন!

সেটা জেনে আপনার কোন লাভ নেই।

বলবেন না এই তো। বেশ! কিন্তু সন্তোষ মিত্রের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা আপনি জানেন কি?

জানি। এককালে তিনি পূর্ববঙ্গের জমিদার ছিলেন।

কিন্তু আমি যদি বলি কোনদিন তিনি জমিদার ছিলেন না।

তাহলে আর আমাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করছেন কেন!

জিজ্ঞাসা করছিলাম এই জন্য যে—সুব্রতর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার গায়ে নক্ শোনা গেল।

উজ্জ্বল আলোয় সন্তোষ মিত্রের দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়ীটা ঝলমল করছিল সে রাত্রে। দোতলার হলঘরে ফরাস পেতে ঘরোয়া গান বাজনার আসর বসেছে। কলকাতা থেকে বিখ্যাত কয়েকজন গায়ক গায়িকা এসেছে। বিখ্যাত ঠুংরী গায়ক নূরুল্লা খান গান ধরেছেন। মুগ্ধ শ্রোতারা সব ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে বসে গান শুনছে একমনে। করবীও ছিল শ্রোতাদের মধ্যে একপাশে।

পাশের একটি মেয়ে করবীর গায়ে মৃদু অঙ্গুলি স্পর্শ করে বললে, তোমাকে কে বাইরে ডাকছে করবী।

করবী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইরের বারান্দায় উঠে এলো।

একজন ভৃত্য দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। সে করবীকে বলল, আপনার বাবা রমেন্দ্রবাবু আপনাকে এখুনি একবার নিচেয় ডাকছেন—

কে, বাবা!—চমকে ওঠে করবী।

এত রাত্রে তার বাবা এখানে! সে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় তিনি?

নিচের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই করবী সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। ভৃত্যও নামে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে তাকে।

এবং যে ঘরটা নিচের সর্বদা বন্ধই থাকতো, সেই ঘরের দিকেই নির্দেশ করে ভৃত্য বললে,

ঐ যে, ঐ ঘরে যান, ওই ঘরেই আপনার বাবা আছেন।

করবী সামনের ঘরের বন্ধ দরজাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল এবং সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই মুহূর্তেই দপ্ করে ঘরের আলোটা গেল নিভে এবং সেই নিশ্চিদ্র অন্ধকারের মধ্যে কোন কিছু বুঝে উঠবার আগেই লোহার সাঁড়াশীর মত কঠিন নির্মম দুটো হাত করবীকে জাপটে ধরে তার মুখটা চেপে ধরলো।

করবী কিছু বুঝতে পারলো না, সামান্যতম শব্দ পর্যন্ত করবারও যেন অবকাশ পেল না। কেবল একটা শ্বাসরোধকারী মিষ্টি গন্ধ তার সমগ্র চেতনা ও স্নায়ুকে যেন ধীরে ধীরে অবশ, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে ফেললো। সীমাহীন অন্ধকারে একটা নিশ্চিত ঘুমের অতলান্ত সমুদ্রের মধ্যে যেন তলিয়ে গেল করবী ধীরে ধীরে।

ঘরের মধ্যে এক পাশে দেওয়াল ঘেঁষে যে আলমারিটা দাঁড় করানো ছিল অন্ধকারে, সেটার বন্ধ কপাট দুটো খুলে গেল। এবং বোঝা গেল সেটা আলমারি নয়, ঘর থেকে বের হয়ে যাবার অন্য একটি দ্বারপথ। গুপ্ত দ্বারপথ। জ্ঞানহীন করবীর দেহটা কাঁধে করে দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি সেই দ্বারপথে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল অন্ধকারেই। এবং বের হয়ে যাবার পূর্বে আলমারির কপাট দুটো আবার ওদিক থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

বাগানবাড়িটা ছাড়িয়ে বড় রাস্তাটা কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে এসে একটা অপ্রশস্ত কাঁচা মাটির রাস্তায়। সেই রাস্তার উপরেই একটা বড় শাখাপ্রশাখা বহুল আমগাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিরাট কালো রংয়ের ডিসোটো গাড়ি।

একেই জায়গাটা সন্ধ্যার পর থেকে নির্জন হয়ে পড়ে, তার উপরে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে যেন করবখানার মত একটা ভয়াবহ ভৌতিক স্তব্ধতা নেমে আসে। থমথমে কালো অন্ধকারের মধ্যে কেবল আমগাছটার পাতাগুলো মধ্যে মধ্যে হাওয়ায় সিপ সিপ একটা শব্দ তুলেই থেমে যায়। একটি লোক গাড়ির ড্রাইভিং সিটে চুপটি করে বসে ছিল। মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে শ্যেন দৃষ্টি মেলে পশ্চাতের দিকে তাকাচ্ছিল যেন কিসের প্রতীক্ষায়।

গাড়ির মধ্যে উপবিষ্ট লোকটা কিন্তু জানতো না যে ঐ আমগাছটার অল্পদূরে ঠিক ঐ সময় আর একজোড়া চোখের তীক্ষ্ণ সজাক দৃষ্টি ঐ গাড়িটার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে, পথের পাশে বনমল্লিকার ঝোপের আড়াল থেকে নিজেকে আত্মগোপন করে। প্রচণ্ড মশা ঝোপের মধ্যে। এবং পরমানন্দে মশাগুলো লোকটার চোখে মুখে দংশন করে চলেছে, তবু যেন লোকটার কোনরূপ ধৈর্যচ্যুতি নেই।

একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় সচকিত হয়ে ওঠে সেই ঝোপের মধ্যে আত্মগোপনকারী লোকটি! একটা জুতোপরা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা এ দিকেই এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, তার অনুমান মিথ্যা নয়। অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি গাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে। হঠাৎ ঐ সময় গাড়ির ভিতরের আলোটা জ্বলে উঠলো দপ্ করে। এবং সেই আলোয় ও দেখলো, চাদরে আবৃত একটা অচৈতন্য দেহ, একজন লোক কাঁধের উপরে ফেলে গাড়ির খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে।

অচৈতন্য দেহটা, লোকটা অতঃপর গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতেই গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও দপ্ করে নিভে গেল। তারপরই শোনা গেল গাড়িতে স্টার্ট দেবার শব্দ।

গাড়িটা ছেড়ে দেবার পরই লোকটি ঝোপের একপাশে যে সাইকেলটা তার রাখা ছিল সেটার উপরে উঠে বসে যেদিকে গাড়িটা গিয়েছে সেই দিকে চালাল।

রঞ্জিৎ সিং বেশী সুব্রত আসরে গান শুনতে শুনতে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে এক সময় করবী আসর থেকে উঠে গিয়েছে তা সে টেরই পায়নি। হঠাৎ খেয়াল হতেই চেয়ে দেখে করবী তার জায়গায় নেই। আশ্চর্য! কোথায় গেল করবী? আসর থেকে উঠে পড়লো সুব্রত এবং হলঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বেবী নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

সুব্রতবাবু!

কে? ও বেবী।

কতবার আপনাকে বাইরে আসবার জন্য চোখের ইশারা করেছি, কিন্তু আপনি বুঝতেই পারলেন না।

কি ব্যাপার?

আধঘন্টাটাক আগে একটা চিঠি পেয়েছি।

চিঠি।

হ্যাঁ, এই যে দেখুন—

একটা পুরু চৌকো খাম এগিয়ে দিল বেবী সুব্রতর দিকে ব্লাউজের ভিতর থেকে বের করে।

হলঘরের দরজা থেকে একটু সরে গিয়ে সুব্রত খাম থেকে চিঠিটা বের করলো। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি।

বেবী,

গাড়ি পাঠালাম, চিঠি পাওয়া মাত্রই চলে আসবে। ছোটকাকা।

হঠাৎ বোধহয় কাকা ফিরে এসেছেন এবং এসে বাড়ীতে আমাকে না দেখতে পেয়ে বোধহয় চিঠি দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি বলেছিলেন আপনার অনুমতি না নিয়ে যেন এখান থেকে কোথাও না যাই, তাই—

বেশ করছো। আজ রাত্রে কোথাও যাবে না। কাল সকালে আমি নিজে তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবো। কিন্তু করবীদেবী কখন গানের আসর থেকে উঠে গেছেন খেয়াল করেছো?

না তো।

যাও তুমি হলঘরে। আমি নিচটা একটু ঘুরে আসছি। মনে থাকে যেন একা এ বাড়ী থেকে আর্জ রাত্রে কোথাও যাবে না। এমন কি আমি বললেও না।

বেশ।

বেবী হলঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো আর সুব্রত প্রথমে উপরের তলায় ঘরগুলো খুঁজে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো। অন্যমনস্ক ভাবে হাত ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো। রাত বারটা বেজে চল্লিশ মিনিট। উপরের তলায় ওস্তাদজী বাগেশ্রীর আলাপ ধরেছেন। নিস্তব্ধ বাড়ীটার মধ্যে উদাত্ত মধুকণ্ঠের সে সুরালাপ যেন মধ্যরজনীর ধ্যানের তন্ত্রীতে কি এক অনৈস্বর্গিক ঝঙ্কার তুলছে। আশ্চর্য! এত রাত্রে কোথায় গেল করবী?

হঠাৎ এলোমেলো চিন্তাস্রোতে যেন একটি লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হলো। মুহূর্তে জাগলো একটি আবর্ত! আজ সকালের সেই চিঠিটার কথাগুলো বিদ্যুৎ চমকের মতই যেন মনের পাতায় ভেসে উঠলো জ্বল জ্বল অক্ষরে সুব্রতর। অপূর্ব, প্রস্তুত থেকো। রাত বারটার পর। 'রুইতন'। এবং সঙ্গে সঙ্গে সোজা গিয়ে সকাল বেলার নিচের তলার সেই ঘরটির শিকল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলো সুব্রত।

অন্ধকার ঘর। মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যেন কি ভাবলো। তারপরই পকেট থেকে টর্চটা বের করে টর্চের আলোয় সুইচটা দেখে নিয়ে আলোটা জ্বেলে দিল সুব্রত।

সকালের মতই ঘরটা খালি। ঘরটা খালি বটে তবু যেন সুব্রতর কেমন মনে হয় ঘরের মধ্যে কি যেন ছিল ক্ষণপূর্বেই অথচ এখন আর নেই। একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ আর সেই গন্ধের সঙ্গে যেন আরো একটা কিসের গন্ধ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে আছে, মিষ্টি অথচ উগ্র! দুটি গন্ধের অপূর্ব একটি সংমিশ্রণ।

নাক দিয়ে গন্ধটা টেনে টেনে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে সুব্রত। আর সতৃষ্ণ প্রত্যাশী দৃষ্টি তার সেই সঙ্গে যেন ঘরের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ নজরে পড়ে, দেওয়ালে আলমারিটার সামনে কি একটা সাদা মত বস্তু পড়ে আছে। কৌতূহলে এগিয়ে যায় সুব্রত।

একটা রুমাল।

নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে রুমালটা তুলে নিতেই মিষ্টি একটা গন্ধ নাসারন্ধ্রে এসে মৃদু ঝাপটা দিল সুব্রতর।

এই তো সেই 'কালিফোর্নিয়ান পপি'র সুবাস। কালিফোর্নিয়ান পপি করবীর প্রিয় সেন্ট। মনে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। সুব্রত এবারে রুমালটা ভালো করে চোখের সামনে আলোতে মেলে ধরলো। ছোট লেডিজ রুমাল। এবং রুমালের এক কোণে লাল সিল্কের সুতোয় লেখা 'রুবি'।

নিঃসন্দেহ হয় এবার সুব্রত, করবীরই রুমাল। কিন্তু রুমালটা এ ঘরে এখানে পড়ে কেন আলমারিটার সামনে। তবে কি করবী আজ রাত্রে এ ঘরে এসেছিল। কিন্তু ঘরের দরজার শিকল বাইরে থেকে তোলা ছিল। তবে—আলমারিটার দিকে তাকালো সুব্রত। দেওয়ালে গাঁথা কাঠের আলমারি। আলমারির কবাটের গায়ে সাদা হাতীর দাঁতের দামী 'নব' বসানো।

করবীদেবী এঘরে নিশ্চয়ই এসেছিল। রুমালটা তার প্রমাণ।

কিন্তু রুমালটা এখানে পড়ে কেন? রুমাল ফেলে যাবার মত অন্যমনস্ক প্রকৃতির মেয়ে তো নয় করবী। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মত সুব্রত আলমারির গায়ে সাদা হাতীর দাঁতের নবটায় হাত দিয়ে মোচড় দিতেই যন্ত্রণায় একটা উঃ শব্দ করে ওঠে নিজের অজ্ঞাতেই যেন। কি যেন ছুঁচের মত হাতের পাতায় ফুটলো।

কি ফুটলো! হাতের পাতাটা সুব্রত চোখের সামনে মেলে ধরে দেখবার চেষ্টা করে আলোয়। এখনো চিন্ চিন্ করে জ্বালা করছে! আবার সুব্রত আলমারির গায়ে 'নব'টার দিকে তাকালো। কিন্তু এ কি! হাতটা যেন কেমন অসাড় হয়ে আসছে ক্রমশঃ। হাতের ক্রিয়াশীল পেশীগুলো যেন কেমন শিথিল—অনড় হয়ে আসছে। হাতটা সুব্রত তোলবার চেষ্টা করে কিন্তু তুলতে পারে না। শক্তি নেই হাতটা তুলবার মত, সামান্য শক্তিও যেন তার হাতের পেশীগুলোতে আর নেই। শুধু হাত কেন, পাও যেন ক্রমশঃ তার অবশ হয়ে আসছে। দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে।

নমস্কার সুব্রতবাবু!

সহসা একটি ভারী পুরুষের কণ্ঠস্বরে সুব্রত তার শিথিল অবসন্ন দৃষ্টি তুলে যেন সামনের দিকে তাকালো।

॥ তেইশ ॥

আগন্তুক ধীরে ধীরে ঘরের একটিমাত্র দ্বারপথ ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

করবীদেবীর সন্ধান করছেন বোধহয়। আগুন্তুক প্রশ্ন করে।

বোবা অসহায় দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে সুব্রত আগন্তুকের মুখের দিকে।

চলুন আমার প্রতি হুকুম আছে আপনাকে সেখানেই নিয়ে যেতে—সেখানে একটু আগে করবীদেবীকে পৌছে দেওয়া হয়েছে।

সুব্রত জবাব দেয় না, কেবল ধীরে ধীরে মেঝের 'পরে বসে পড়ে। সব দেখতে পাচ্ছে, সব বুঝতে পারছে অথচ ভাষায় সেটা প্রকাশ করতে পারছে না। বাক্‌শক্তি সে হারিয়েছে। হাত আছে পা আছে, কিন্তু সেগুলো অচল পাথর!

এগিয়ে এলো আগন্তুক এবার সুব্রতর সামনে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, পরিধানে লংস ও হাফ্ সার্ট। চওড়া উঁচু কপাল, ছোট ছোট গর্তে বসা চোখ। বাটারফ্লাই গোঁফ ও নূর দাড়ি। লোকটি এগিয়ে এসে মৃদু হেসে সুব্রতর নিশ্চল অথর্ব দেহটা কাঁধের উপর তুলে নিল, তারপর ঘরের সেই আলমারির দরজাটা খুলে ঘরের বাইরে এসে পা দিল।

ধীরে ধীরে চোখ মেলছে করবী। দু'চোখের পাতায় যেন এখনো ঘুমের অবসন্নতা। ভারী। ঘরের মধ্যে একটা নীলাভ আলোর জ্যোতি যেন কুয়াশার মত ছড়িয়ে আছে। একটা আরাম কেদারার উপর আধ শোওয়া ও বসা অবস্থায় রয়েছে করবী।

ঘরটার মধ্যে আসবাবপত্র একপ্রকার নেই বললেই হয়। যে আরাম কেদারাটার উপরে করবী রয়েছে সেটা ছাড়া দেখা যাচ্ছে আর গোটা দুই চেয়ার ও একটা ছোট টেবিল। মাথার উপরে একটি সিলিং ফ্যান বন বন শব্দে ঘুরে চলেছে। দুটি মাত্র জানালা ঘরের তাও বন্ধ। এবং একটি মাত্র দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরের সিলিংয়ের ঠিক মধ্যস্থলে চৌকো বাক্সের মত একটা জায়গা—স্কাই লাইট। চার দিকে কাঠের ফ্রেমে কাচ বসানো পাল্লা। সেগুলো হিঞ্জের 'পরে এদিক ওদিক ঘোরে। ঘরের টেবিলটার সামনে দণ্ডায়মান দেখা যাচ্ছে সন্তোষ মিত্রকে।

ক্রমে করবী চোখ মেলে তাকালো। দৃষ্টিতে বিস্ময় তার। এদিক ওদিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো।

ঘুম ভাঙ্গলো রুবি?

সেই কণ্ঠস্বরে চমকে মুখ তুলে ঐ দিকে তাকালো করবী। চোখাচোখি হলো এক জোড়া ক্ষুধিত দৃষ্টির সঙ্গে।

আবার প্রশ্ন হলো, ঘুম ভাঙ্গলো?

সন্তোষবাবু!—বিস্মিত করবী নামটা উচ্চারণ করে।

চিনতে পেরেছো দেবী, ধন্যবাদ।

চেয়ে আছে নির্বাক করবী সন্তোষ মিত্রের দিকে। সমস্ত ঘটনাটা সে যেন মনে মনে বুঝবার চেষ্টা করে। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত চিন্তাটা ক্রমশঃ একটা নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছে। ছিল বাগানবাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে। গানের আসরে বসে গান শুনছিল। তার বাবা রমেন্দ্রবাবু তাকে ডাকছেন বলে একজন ভৃত্য এসে তাকে সংবাদ দেয়। তাড়াতাড়ি সে গানের আসর থেকে উঠে আসে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে আসে। তারপর সেই ঘর। —সব মনে পড়ছে করবীর। সে আবার তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অদূরে দণ্ডায়মান সন্তোষ মিত্রের দিকে।

বাধ্য হয়েই একান্ত অনিচ্ছায় যে জবরদস্তিটুকু করতে হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত আমি। ক্ষমা চাইছি। ইঙ্গিত আমার বুঝতে পারলে আর এ কষ্টটুকু তোমাকে পেতে হতো না রুবী।

এ সবের মানে কি সন্তোষবাবু?

মানেটা কি এখনো তোমার কাছে অস্পষ্ট রয়েছে করবী?

নিশ্চয়ই। এভাবে বাগান বাড়ী থেকে আমাকে ধরে নিয়ে আসলেন কেন চাতুরী করে?

এই সামান্য চাতুরীটুকু না করলে কি তুমি ধরা দিতে করবী। চাতুরী আমি সহজে কারো সঙ্গে করি না, যদি না সে চাতুরী খেলায়।

ভাল চান তো আমাকে ছেড়ে দিন—

পাগলী। ছেড়ে দেবো বলে বুঝি এত কষ্ট করে ধরে নিয়ে এলাম?

করবী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। একটা সিল্ক কর্ড দিয়ে তার কোমরের সঙ্গে বসবার চেয়ারটায় বাঁধা—উঠতে গিয়েই সেটা সে টের পায়।

করবীর উঠবার চেষ্টা দেখে হেসে ফেলে সন্তোষ মিত্র। এবং বলে ব্যস্ত কি, বোস না—আঘাটায় আর কিছু এসে তো পড়োনি তো।

দরজায় এ সময় মৃদু নক্ পড়লো। তিনটি পর পর।

কি?

আবার পূর্বের মত তিনবার নক্ পড়লো।

এগিয়ে গিয়ে সন্তোষ মিত্র ঘরের দরজাটা এবারে খুলে দিতেই হাত পা বাঁধা অবস্থায় সুব্রতকে কাঁধে নিয়ে পূর্বের সেই লোকটি এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

এনেছি। লোকটি বলে।

ঐ চেয়ারটার উপরে বসিয়ে দে—

সুব্রতকে লোকটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে এগুতেই সন্তোষ বললে, বাইরে অপেক্ষা কর ভজা, কাজ আছে।

এবারে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা আবার পূর্ববৎ ভিতর থেকে বন্ধ করে উপবিষ্ট সুব্রতর মুখোমুখি ফিরে দাঁড়ালো সন্তোষ মিত্র।

তারপর মিঃ সিং, ওরফে টিকটিকি সুব্রতবাবু—

সুব্রত কোন জবাব দেয় না, শুধু চেয়ে থাকে সন্তোষ মিত্রের মুখের দিকে।

সন্তোষ মিত্র আবার বলে, কিছুদিন থেকেই তোমার ধৃষ্টতা লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু কিছু জানতে দিইনি তোমাকে। দেখছিলাম কেবল তোমার দৌড়টা কতদূর?

সুব্রত নির্বাক।

কি রায় মশাই, একেবারে যে বোবা বনে গেলেন। বোবা অবিশ্যি আপনাকে আমি একটু পরেই চিরদিনের মত করে দেবো। একেবারে জ্যান্ত মাটিব নিচে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারবেন বাকী জীবনটার মতো বোবা হয়েই।

আত্মপ্রসাদের গর্বে দিশেহারা সন্তোষ মিত্র লক্ষ্য করেনি যে, ঠিক ঐ সময় মাথার উপবে স্কাইলাইটের পাল্লাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে এবং একটা কুৎসিত মুখ সেই পাল্লা পথে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে।

সুব্রতবাবু! —আর্তকণ্ঠে ডেকে ওঠে করবী।

সুব্রত তাকালো করবীর মুখের দিকে। বললে. ভয় নেই করবীদেবী। ওকে আস্ফালন করতে দিন। ওর বাগানবাড়ীর চারপাশে পুলিশ প্রহরীরা ওৎ পেতে আছে।

বটে। এখনো তাহলে আশা, তারা এসে সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করবে। ভাল, ভাল—

হঠাৎ ঐ সময় ঘরের মধ্যে একটা ঝফ করে শব্দ হতেই যুগপৎ সকলেই চমকে তাকালো।

দীর্ঘকায় কুৎসিত এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে লোকটা ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে।

কথা বলে প্রথমে সন্তোষ মিত্রই, বংশী।

হ্যাঁ, বংশীই। —লোকটি জবাব দেয় তারপর এগিয়ে যায় করবীর দিকে।

চেঁচিয়ে ওঠে সন্তোষ মিত্র, বংশী!

বারেকের জন্য ফিরে তাকালো বংশী সন্তোষ মিত্রের দিকে, তারপরই আবার করবীর দিকে এগিয়ে যায়।

সুব্রত আর করবী নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ক্ষণপূর্বে স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে যে কুৎসিত লোকটা ঘরের মধ্যে এসে লাফিয়ে পড়েছে তারই মুখের দিকে। আগন্তুক বংশী যেমন দীর্ঘ তেমনি বলিষ্ঠ। তার পরিধানে ছিল কালো রংয়ের একটা লংস্ ও গায়ে একটা অনুরূপ হাত কাটা গেঞ্জী। আচমকা লোকটাকে দেখলে সতিই শিউরে উঠতে হয়। মাথার চুল ছোট ছোট করে কদম ছাঁট দেওয়া। ছোট কপাল, নাকের নীচটা বসা। ছোট ছোট চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এককালে মুখখানা যে রকমই থাকুক না কেন, এখন তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই আগুনে পুড়ে গিয়ে। চামড়া পুড়ে কুচ্‌কে গিয়ে একটা চোখ ট্যারা হয়ে গিয়েছে। এবং সেই কারণেই উপরের ওষ্ঠে টান ধরায় উপরের পাটি দাঁত মাড়ি সমেত প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে সমস্ত মুখখানাই ভয়াবহ একটা কুৎসিত আকার নিয়েছে। গায়ের রং কালো!

বংশীকে করবীর দিকে এগিয়ে যেতে দেখে তীক্ষ্ণ আক্রোশভরা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সন্তোষ মিত্র, খবরদার বংশী, খুন করে ফেলবো—

বংশীর তখন ভ্রূক্ষেপও নেই যেন। সে এগিয়ে গিয়ে করবীর বন্ধনটা খুলে দেবার জন্য হাত বাড়ায়। . এবং সেই মুহূর্তে সন্তোষ মিত্র ত্বরিতপদে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই, যে লোকটা অল্পক্ষণ আগে সুব্রতকে নিয়ে এসেছিল সে এসে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু ততক্ষণে বংশী ধারালো একটা ছুরির সাহায্যে করবীর বন্ধন কেটে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে ক্ষিপ্র হস্তে বলতে গেলে চক্ষের পলকে।

করবী উঠে দাঁড়ায়।

যান, শিগ্‌গির পালান। বাইরে নির্মল গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। বংশী দ্রুতকণ্ঠে করবীকে বলে।

ওদিকে লোকটা তখন বংশীর উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বংশী তার আক্রমণকারীকে তলপেটে একটা ঘুসি বসিয়ে ছিট্‌কে ফেলে দিল দূরে।

সন্তোষ মিত্রও এবারে এগিয়ে আসে বংশীকে আক্রমণ করবার জন্য।

॥ চব্বিশ ॥

সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে বংশী যখন যুঝছে এবং দ্বিতীয় ধরাশায়ী লোকটা ওদিকে উঠে বসবার চেষ্টা করছে, তখন করবী বংশীর ভূপতিত ছোরাটা তুলে নিয়ে চটপট সুব্রতর হাতের ও পায়ের বাঁধনগুলো কেটে দেয়। দ্বিতীয় লোকটি ততক্ষণে এগিয়ে এসে সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বংশীকে আক্রমণ করেছে।

আক্রমণকারীদের বাধা দিতে দিতে বংশী চেঁচিয়ে বলে, কি করছেন সুব্রতবাবু, করবীদেবীকে নিয়ে পালান। আর পুলিশে একটা ফোন করে দিন, পাশের ঘরে ফোন আছে।

কে? কে আপনি? —সহসা করবী এতক্ষণে যেন কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরে বংশীর দিকে চেয়ে চিৎকার করে ওঠে।

করবী হতভম্ব।

আঃ, কি করছেন করবীদেবী, যান, যান—বংশী আবার চেঁচিয়ে বলে।

সুব্রতর শরীরের শৈথিল্য ও অবসাদ তখনো পুরোপুরি কাটেনি। তথাপি কোনমতে করবীর সাহায্যে সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে যায়। সন্তোষ মিত্রের অনুচর তখন বংশীকে প্রায় মাটিতে শুইয়ে ফেলে কায়দা করে এনেছে।

করবীর সাহায্যেই সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে প্রথমেই দরজার শিকলটা করবীকে তুলে দিতে বললো।

করবী দরজার শিকল তুলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।
তার সর্বাঙ্গ তখনো কাঁপছে ভয়ে উত্তেজনায়।
চলুন পাশের ঘরে করবীদেবী। বংশী বললো ঐ ঘরে নাকি ফোন আছে। সুব্রত বলে।
দুজনে এসে পাশের ঘরে ঢুকলো। সুব্রতই পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফোন করে দিল।

আরো আধ ঘণ্টা পরে যখন মতিঝিলে পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়ালো সুব্রত তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার দেহের স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরে এসেছে। বংশী বলা সত্ত্বেও সুব্রত করবীকে যেতে দেয়নি। তাকে ঘরের মধ্যেই বসিয়ে রেখেছে।

বারান্দায় লাইট জ্বালিয়ে ওরা অপেক্ষা করছিল। গেট দিয়ে ঢুকে পুলিশের কালো রংয়ের ভ্যান দুটো তীব্র স্পট্ লাইট জ্বেলে বারান্দার সামনে এসে পর পর দাঁড়ালো। প্রথমেই ভ্যান থেকে নামলেন পুলিশ ইনসপেক্টর রথীন রুদ্র।

এই যে সুব্রতবাবু।

আমি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, নইলে কাল্‌প্রিটকে আমিই ধরতে পারতাম। তাহলেও ঘরের মধ্যে আটকেছি। সুব্রত বলে।

কোন্ ঘরে?

চার্ পাঁচজন আর্মড পুলিশকে ডাকুন, একত্রে সব ঘরের মধ্যে ঢুকতে হবে। সুব্রত ইনস্‌পেক্টরকে সতর্ক করে দেয়।

রথীন রুদ্রের নির্দেশে তখুনি চারজন গুর্খা আর্মড পুলিশ ভ্যান থেকে নেমে এলো। সকলে মিলে তারপর শিকল তোলা পাশের দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। সুব্রত বন্ধ দরজার গায়ে কান পেতে প্রথমে শুনবার চেষ্টা করলো কোন শব্দ টব্দ কিছু পাওয়া যায় কিনা! প্রথমে কিছুই শুনতে পায় না। তারপর একটা ক্ষীণ গোঙ্গানীর শব্দ যেন মনে হলো ঘরের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে সুব্রত শিকলটা খুলেই দড়াম করে কপাট দুটো একেবারে ঠেলে দিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়েই সুব্রত থমকে দাঁড়াল অর্ধস্ফুট একটা শব্দ করে। ঘরের মধ্যে বংশী ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণীই নেই। এবং বংশী রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝের উপরে পড়ে ছটফট করছে আর গোঙ্গাচ্ছে যন্ত্রণায়। সুব্রত তাড়াতাড়ি এসে বংশীর সামনে দাঁড়ালো।

বংশী!

করবীও পুলিশের পিছনে পিছনে সকলের অজ্ঞাতে পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

অনিমেষের চেহারার সঙ্গে তার পরিচয় নেই বলেই বংশীকে সে চিনতে পারেনি। কিন্তু প্রথমটায় তার গলার স্বরে তাকে চিনতে না পারলেও শেষের দিকে চিনেছিল।

বংশী আর কেউ নয় অনিমেষবাবুই।

কিন্তু বিস্ময় তখনো তার কাটেনি।

বংশীই অনিমেষ, ব্যাপারটা যেন তখনো তার কাছে কি রকম গোলমেলে মনে হয়।

আমাকে ছোরা মেরে ওরা ঘরের বাথরুমের দরজা দিয়ে পালিয়েছে। কথাগুলো কোনমতে টেনে টেনে বলে বংশী হাঁপাতে থাকে।

নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে করবী রক্তাক্ত বংশীর দিকে।

কোথায়? কোথায় গিয়েছে সে? সুব্রত আবার প্রশ্ন করে!

জানিনা—সুব্রতবাবু!

করবী যে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে বংশী কিন্তু টের পায় না। কারণ করবী সুব্রতর পশ্চাতে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল তখন।

বংশী আবার বলে, যে বাড়ীতে করবীদেবী থাকেন বরাহনগরে আমিও সেই বাড়ীতেই থাকতাম। আমার ঘরে লিখবার টেবিলের ড্রয়াবে একটা চিঠি আছে করবীদেবীর নামে, তাকে সে চিঠিটা দেবেন দয়া করে—

তাহলে করবী আপনাকে চিনতো?

য়্যাঁ! না—চাক্ষুস তিনি আমাকে কখনো দেখেননি—একটু জল—সুব্রত একজন পুলিশকে বললো

পাশের ঘর থেকে জল নিয়ে আসতে। করবীদেবীকে ডাকবো? সুব্রত বলে।

না, না—আর্তকণ্ঠে মিনতি জানায় বংশী!

একটা কথা বংশী, নির্মল চৌধুরী কি আজও বেঁচে আছে?

হ্যাঁ।—

গ্লাসে করে জল নিয়ে পুলিশটা এসে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু বংশীর মুখে জল দেওয়া সত্ত্বেও সে জল গিলতে পারলো না। কষ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

করবী ঐ সময় বংশীর সামনে এগিয়ে এসে ডাকলো, অনিমেষবাবু!

কে!

আমি রুবি, চিনতে পারছেন না আমাকে—

না, না—আপনি কেন এখানে এলেন, যান, যান—নির্মল নির্মল আপনার জন্য—

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলো না অনিমেষ। একটা হেঁচকি তুলে কণ্ঠ তার চিরদিনের মতই থেমে গেল।

শেষবারের মত বংশীর আগুনে পোড়া, কুৎসিত মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হলো। তারপরই টেনে একটা শ্বাস নিয়ে বংশীর প্রাণটা বের হয়ে গেল।

অনিমেষ! অনিমেষ—চিৎকার করে ওঠে সুব্রত।

অনিমেষবাবু—করবী চেঁচিয়ে ডাকে।

কিন্তু সবই তো তখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

মুহূর্তকাল বংশীর মৃত্যুশান্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন কণ্ঠে সুব্রত বললে, এখনো জানি না মিঃ রুদ্র আসলে লোকটা কে, কি ওর সত্য পরিচয়। বাট্ আই মাস্ট সে, আজ ও না থাকলে আমার ও করবীদেবীর মৃতদেহ হয়ত এরই মতো এইভাবে এই ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতো এতক্ষণ। তারপরই একটু থেমে আবার সুব্রত যেন আপন মনেই বলে, আশ্চর্য্য ভালবাসা!

ভালবাসা কার?

ঐ বংশীর—অনিমেষের। কিন্তু সে কথা পরে শুনবেন, আগে সেই শয়তানটার খোঁজ করতে হবে।

বলতে বলতে সুব্রত বাথরুমের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল বাথরুমের দরজা বাইরের দিকে থেকে বন্ধ।

যা ভেবেছিলাম তাই। ওদিক থেকে দরজা বন্ধ করে পালিয়েছে। সুব্রত রুদ্রকে বললে।

বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে ঘুরে সকলে গিয়ে দেখলো, বাথরুমের অন্য দরজাটি তখনো খোলাই রয়েছে। বুঝতে কষ্ট হলো না পাখী উড়ে গিয়েছে।

গ্যারেজে সন্তোষ মিত্রের গাড়িটাও দেখা গেল না।

সুব্রত মৃদু হেসে বললে, চলুন এবারে মহাপ্রভুর আসল আস্তানায় যাওয়া যাক্ মিঃ রুদ্র।

আসল আস্তানা?—বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল রথীন রুদ্র সুব্রতর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, সন্তোষ মিত্র পরিচয়টা তো ছিল তার ছদ্মবেশ মাত্র। সে অবিশ্যি এখনো জানে না যে, তার আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা আর আমার কাছে গোপন নেই। ভেবেছিলাম রেড হ্যাণ্ড ধরবো কিন্তু তা আর হলো না।

কতদূর যেতে হবে?

মতিঝিলে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করে পুলিশ ভ্যানে করেই সকলে যখন রওনা হলো রাত তখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। করবীকেও সুব্রত সঙ্গেই নিল।

বললে, সকালেই আপনাকে আপনার বাড়ি পৌঁছে দেবো করবীদেবী। বাকী রাতটুকু আমাদের সঙ্গেই থাকুন।

চলন্ত ভ্যানের মধ্যে রথীন রুদ্রের পাশাপাশি বসে সুব্রত বললে, মিঃ রুদ্র, এই যে ছদ্মনামধারী সন্তোষ মিত্র, ইনিই হচ্ছেন আমাদের নরেন্দ্রনাথ ঘোষের হত্যাকারী। এবং শুধু নরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীই নন, ইনিই নরেন্দ্রনাথের অফিস ম্যানেজার শ্রীনাথ করকেও হত্যা করেছেন।

তবে নির্মল চৌধুরী—

না, বেচারীকে কৌশলে দুটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেই আসল হত্যাকারী জড়িয়েছিল মাত্র।

কিন্তু কেন?

প্রথমটায় অবিশ্যি মোটিভটা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়নি, পরে বুঝতে পেরেছি। যেহেতু হতভাগ্য নির্মল চৌধুরী এই করবীদেবীকে ভালবাসতেন।

সে কি!

এখনো বুঝতে পারেননি?

কতকটা বুঝেছি।

করবী তখন অন্ধকারে ভ্যানের মধ্যে একপাশে চুপটি করে মাথা নিচু করে বসে।

একবার তার দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলতে লাগলো।

হ্যাঁ, বেচারী নির্মল চৌধুরীর ভালবাসাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল হত্যাকারীর চোখে অমার্জনীয় অপরাধ। যে কারণে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্যে কৌশলে জড়িয়ে নির্ভুলভাবে হত্যাকারী ফাঁসী কাঠের দিকে তাকে ঠেলে দিয়েছিল। চতুর চূড়ামণি সন্দেহ নেই লোকটি। কারণ সে এক তীরেই দুটি লক্ষ্যভেদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, অনেক ভেবে চিন্তে কৌশলে নিরাপদ দূরত্বে বসে নির্বিঘ্নে তীর ছুঁড়লেও তিনটি মারাত্মক ভুল সে করেছিল।

কি রকম?

প্রথম ভুল তার, যে অব্যর্থ চিঠির টোপ ফেলে ফটোগ্রাফীর নেশাগ্রস্ত নরেন্দ্রনাথকে নির্ভুলভাবে, বিষ মাখানো ফিল্ম স্পুলটি ব্যবহারে প্রলোভিত করেছিল; সেই চিঠিটি নিজের উপরে অসাধারণ বিশ্বাস বশে নিজেরই টাইপ রাইটিং মেসিনে টাইপ করে।

কি রকম? রথীন রুদ্র প্রশ্ন করেন।

সেই মেশিনের টাইপগুলোর মধ্যে দুটি অক্ষর ড্যামেজড্ ছিল, বড় হাতের 'ইউ' ও 'এন্'। এবং যেটা সেই টাইপ করা চিঠির মধ্যে হত্যাপ্রচেষ্টার অব্যর্থ প্রমাণ হিসাবে আদালতে উপস্থাপিত হবে। এবং দ্বিতীয় ভুল তার হয়েছিল সেই চিঠিটার ইউ. কে, র একটি ব্যবহৃত ষ্টাম্প ব্যবহার করলেও চিঠিটা ডাকে না পাঠিয়ে হাতে পাঠিয়ে, যেটা আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়েছে, ভারতবর্ষের কোন পোষ্ট অফিসের চিঠিটার উপরে ছাপ না থাকায়।

তারপর?

তারপর তৃতীয় ও শেষ পয়েন্ট হচ্ছে শ্রীনাথ করকে হত্যার পর রিভলবারটা অকুস্থানে ফেলে রেখে গেলেও সে জানতো না যে, নির্মল চৌধুরী যদি ঐ রিভলবার দিয়ে হত্যা করে থাকেই, তাতে কেবল যে রিভলবারের ট্রিগারেই তার আঙুলের ছাপই থাকবে তাই নয়, তার হাতে নাইট্রাইটের ডিপোজিটও থাকবে গুলি ছুঁড়ে থাকলে এবং যেটা তার হাতের প্যারাফিন কাষ্ট নিলেই ধরা পড়বে।

পাওয়া গিয়েছিল সে রকম কিছু নির্মল চৌধুরীর হাতে? —রথীন রুদ্র আবার প্রশ্ন করেন।

না। —সুব্রত ধীর কণ্ঠে জবাব দেয়।

করবী একবার ঐ সময় চমকে অন্ধকারেই সুব্রতর দিকে তাকাল।

জগুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে তখন গাড়ি ছুটেছে ভবানীপুরের দিকে। আকাশে ভোরের আলো আরও স্পষ্ট মনে হয়।

রথীন রুদ্রকে ড্রাইভার প্রশ্ন করে, কোন্ দিকে যাবো?

সুব্রত ঠিকানা বলে দেয়।

বিনয়েন্দ্রের বালীগঞ্জের বাড়ীর সামনে এসে পুলিশ ভ্যান দুটো দাঁড়ালো। সুব্রতই এগিয়ে গিয়ে কলিং বেল টিপলো।

একটু পরেই চোখ মুছতে মুছতে ভৃত্য বের হয়ে এলো।

কাকে চান?

বাবুকে একবার খবর দাও। বলো, সুব্রতবাবু দেখা করতে চান, জরুরী দরকার।

বাবু তো নেই।

নেই মানে?

না আজ পাঁচ ছ'দিন হলো ধানবাদ গেছেন, এখনো ফেরেননি।

এখনো ফেরেননি?

না।

সুব্রত যেন কি ভাবে ক্ষণকাল। তারপরই বলে, ঠিক আছে তুমি একবার উপরে গিয়ে বাবুর ঘরটা দেখে এসো তিনি ফিরেছেন কিনা।

সহসা এমন সময় দ্বারপথে নারী কণ্ঠ শোনা গেল, কে রে পরেশ?

সেই নারীকণ্ঠ শোনামাত্রই সুব্রত চম্‌কে উঠেছিল।

পরিচিত নারী কণ্ঠ।

সুব্রত সামনের দিকে তাকালো। তার ভুল হয়নি। বিমলাদেবীই!

নমস্কার বিমলাদেবী! আমাকে চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই?

আপনি?—

সুব্রত রায়। ঘোষ নিবাসে নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল আমার। মনে পড়ছে নিশ্চয়ই—

হ্যাঁ।......

বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চাই যে—

কিন্তু বিনুদা তো বাড়ীতে নেই। তিনি ধানবাদে—

না, আপনি মিথ্যে বলছেন বিমলাদেবী।

বলতে বলতে রথীন রুদ্রকে চোখের ইঙ্গিত করে তাকে অনুসরণ করতে বলে ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সুব্রত আবার বলে, চলুন ঘরের ভিতরে বিমলাদেবী।

সকলে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

বিমলা যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে।

বিনয়েন্দ্রবাবুকে একটিবার ডাকুন। সুব্রত আবার বলে।

বললাম তো তিনি বাড়ীতে নেই।

কিন্তু আমি জানি তিনি আছেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন শাক দিয়ে চিরদিন মাছ ঢাকা চলে না বিমলাদেবী।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে বিমলা সুব্রতর মুখের দিকে।

সুব্রত আবার বলে, হ্যাঁ আপনাদের মনোরম পাখীর বাসা এবারে সত্যি সত্যি হাওয়ায় নড়ে উঠেছে।

বিমলা পূর্ব্ববৎ চেয়েই থাকে সুব্রতর মুখের দিকে

চেয়ে আছেন কি আমার মুখের দিকে। এখনো চুপ করে কেন দাঁড়িয়ে আছেন—

এসব কদর্য ইঙ্গিতের মানে কি সুব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কিন্তু আমি যদি বলি বিমলাদেবী, আমার কদর্য ইঙ্গিতের চাইতেও ঢের বেশী কদর্য জঘন্য ব্যবহার বিনয়েন্দ্রবাবু করেছেন আপনার সঙ্গে—।

কি বললেন!

হ্যাঁ, এদিকে আপনার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলে অন্যত্র নিত্য নতুন নারী সম্ভোগের লীলাখেলায় তিনি—

সুব্রতর শেষের কথাগুলো যেন সহসা মন্ত্রপূত বারি ছিটিয়ে দিল বিমলাদেবীর সর্বাঙ্গে। সে যে চিরন্তন নারী। ভালবাসার ব্যাপারে কোনদিনই যে কোন নারী অন্য নারীর প্রতি তার প্রেমিকের এতটুকু আকর্ষণও, বিশেষ করে পরকীয়া ও গোপন প্রেমের ব্যাপার একেবারে সহ্য করতে পারে না, সেটাই যেন আবার প্রমাণিত হয়ে গেল নতুন করে।

সব কিছু ভুলে বিমলাদেবী চিৎকার করে উঠলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, না, অসম্ভব কখনোই না।

সুব্রত উল্লসিত হয়ে ওঠে। তার নিক্ষিপ্ত তীর ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে। সুব্রত শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলে, কেন না? কেনই বা অসম্ভব! হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথকে যখন আপনি প্রেমের স্বপ্নে মশগুল করে গোপনে তাঁর ছোট ভাই বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছিলেন তখন কেন ভাবতে পারেননি যে, পুরুষ অন্যের ভালবাসার পাত্রীকে জেনে শুনে ছিনিয়ে নিতে পারে বিশ্বাসের মূল্য তার কাছে এক কপর্দকও নেই—

না, না—বিশ্বাস করি না, আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। বিনয়—

বিশ্বাস করেন না, না। যান তো মিঃ রুদ্র, করবীদেবীকে এ ঘরে ডেকে নিয়ে আসুন একবার।

রথীন রুদ্র ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

একটু পরে করবী প্রবেশ করতেই সুব্রত তাকে দেখিয়ে বিমলাকে বলে, এই যে জিজ্ঞাসা করুন এই করবীদেবীকে। আজ রাত্রে ইনিই আপনার অসীম প্রেমাস্পদের আর একজন ভিক্‌টিম্ হতে চলেছিলেন। এবং হতেনও এতক্ষণে যদি না ভাগ্যক্রমে তাঁর থাবা থেকে ওকে আজ উদ্ধার করতে সক্ষম হতো আর এক হতভাগ্য।

না, না—

॥ পঁচিশ ॥

আমি জানি বিমলাদেবী, আপনি বিনয়েন্দ্রের আসল চরিত্রটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। মানুষের দেহে লুকিয়ে ছিল জঘন্য এক নারীদেহ লোলুপ পিশাচ বললেও অত্যুক্তি হয় না তাকে। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন্ পিশাচকে ভালবেসে আপনি আপনার সর্বস্ব দিয়েছিলেন নিশ্চিত বিশ্বাসে।

বিমলা একটা সোফার 'পরে তখন বসে পড়েছে।

তার চোখে মুখে সর্বস্ব হারাবার মর্মান্তিক বেদনা যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্ষত বিক্ষত বিমলার হৃদয়ে তখনো সুব্রত নিষ্ঠুরতার চাবুক হেনে চলেছে। সে বলে চলে, আজ বুঝতে পারছেন আপনার অকৃত্রিম ভালবাসার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীনের মত আপনার প্রতি সে ব্যবহার করেছে। আপনার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে দিনের পর দিন আপনার অসাক্ষাতে কিভাবে অন্য নারীকে নিয়ে স্ফূর্তি করেছে—

ঠিক ঐ সময় পরিচিত এক কণ্ঠস্বরে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই যুগপৎ অন্দরে প্রবেশের দ্বারপথের দিকে সচকিতে দৃষ্টিপাত করে।

দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়েছেন বিনয়েন্দ্রনাথ। তাঁর পরিধানে পায়জামা ও স্লিপিং গাউন। মাথার চুল রুক্ষ। দেখলেই মনে হবে সদ্য বুঝি ঘুম ভেঙ্গে শয্যা থেকে উঠে এলেন। কিন্তু কেউ কোন সাড়া দেয় না। ঘরের মধ্যে যেন একটা অখণ্ড স্তব্ধতা থম থম করছে।

একি সুব্রতবাবু, কি ব্যাপার? এ অসময়ে! বিনয়েন্দ্র এবারে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়েই কথা বলেন। অদ্ভুত শান্ত ও ধীর তাঁর কণ্ঠস্বর।

সহসা ঐ সময় করবী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, চিনেছি, চিনেছি সুব্রতবাবু, সন্তোষ, সন্তোষ মিত্র—এই, এই সেই স্কাউণ্ড্রেল।

ব্যাপার কি সুব্রতবাবু? হু ইজ দিস্ গার্ল? —পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে কথা বলেন আবার বিনয়েন্দ্র।

শয়তান, স্কাউণ্ড্রেল—আবার চেঁচিয়ে ওঠে করবী।

ইজ সি ম্যাড?

কিন্তু কেউ তাঁর প্রশ্নের জবাব দেয় না।

বিনয়েন্দ্র তখন পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে সুব্রতর দিকে তাকিয়েই আবার প্রশ্ন করেন, এ সবের মানে কি সুব্রতবাবু? এরা সব কারা? আর বিমলা তুমিই বা এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

এবারে সুব্রত কথা বলে, ওকে আপনি চিনবেন না মিঃ ঘোষ। রথীন রুদ্র, পুলিশ ইনস্‌পেক্টার. হ্যাঁ—উনি আপনাকে এ্যারেস্ট করতে এসেছেন—

সুব্রতবাবু, ভুলে যাবেন না এটা আমার বাড়ী! এভাবে শেষরাত্রে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁর বিনা পারমিশনে প্রবেশ করে—

কিন্তু বিনয়েন্দ্রের কথা শেষ হলো না। সুব্রত বাধা দিয়ে বললে, অনধিকার প্রবেশ কিনা সেটা আদালতই বিচার করবে। উনি এসেছেন আপনাকে এ্যারেস্ট করতে—

এ্যারেস্ট করতে! তা চার্জটা কি শুনি?

সে তো একটা আধটা নয়। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীনাথ করকে হত্যা—

হোয়াট ডু ইউ মিন—চিৎকার করে ওঠে বিনয়েন্দ্র।

নট্ সো ফাস্ট মিঃ ঘোষ, আরো চার্জ আছে! আরো দুটি কলেজ গার্লকে গুম করে তাদের হত্যা করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া এবং ঐ করবীদেবীকে আজ রাত্রে বলপূর্বক ধরে নিয়ে

গিয়ে তার উপরে অত্যাচার—

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে—আবার চিৎকার করে ওঠে বিনয়েন্দ্র!

বেরিয়ে নিশ্চয়ই যাবো। তবে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে। আরো চার্জ আছে, আপনার ভাইঝি বেবীকে দু'দুবার হত্যার প্রচেষ্টা—

উঃ বিনয় তুমি, তুমি—বলতে বলতে বিমলাদেবী দুহাতে মুখ ঢাকলো।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন বিনয়েন্দ্র বিমলার দিকে, বিমলা। বিমলা—

না, না—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে—চিৎকার করে ওঠে বিমলা।

বিমলা, বিমলা—সব, সব মিথ্যা!—

না, না—না......

বিমলাদেবী সামনের চেয়ারটার উপর বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে যেন মর্মান্তিক এক বেদনায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন।

বিনয়েন্দ্র আবার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বিমলাদেবীর দিকে সুব্রত হাত তুলে বিনয়েন্দ্রকে বাধা দিল নিঃশব্দে এবং চোখের ইংগিতে পুলিশ ইন্সপেক্টার রথীন রুদ্রকে কি একটা নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে রথীন রুদ্র বিনয়েন্দ্রের একটা হাত চেপে ধরে মৃদু কণ্ঠে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

বিনয়েন্দ্র তথাপি বাধা দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু পূর্ব্ববৎ মৃদু রীতিমত কঠিন কণ্ঠে এবারে রুদ্র বললেন, আসুন।

এবারে আর বিনয়েন্দ্র দ্বিরুক্তি করলেন না।

রথীন রুদ্রর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আকর্ষণে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

করবীদেবীকেও সুব্রত এবারে চোখের ইংগিতে ঘর ত্যাগ করতে বললেন।

করবীও বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে রইলো কেবল সুব্রত ও দুহাতে মুখ ঢেকে ক্রন্দনরতা বিমলাদেবী একটা চেয়ারের উপর উপবিষ্টা।

আরো কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

বিমলাদেবী পূর্ব্ববৎ দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছেন।

সুব্রত আরো একটু এগিয়ে এলো বিমলাদেবীর দিকে।

বিমলাদেবী!

মৃদুকণ্ঠে ডাকলো সুব্রত।

কিন্তু বিমলাদেবী কোন সাড়া দেন না।

আপনার দুঃখ, আপনার লজ্জা, আমি বুঝতে পারছি বিমলাদেবী! কিন্তু—

না, না—সহসা যেন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, রোগিণীর মতই প্রতিবাদে তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন বিমলাদেবী, না, না—সুব্রতবাবু, বুঝতে আপনি পারেননি, পারবেনও না। জানেন না কত বড় মহাপাপ আমি করেছি। এ সব, সবই আমার পাপেরই ফল।

সত্যিই আমি সব জানি না বিমলাদেবী আর জানারও কথা আমার নয়। তবে অনুমানে যতটুকু বুঝতে পেরেছি।

অনুমান! বিমলাদেবী এতক্ষণে মুখের থেকে হাত সরিয়ে সুব্রতর মুখের দিকে তাকালেন। দু'চোখের কোল বেয়ে অবিরল অশ্রুর ধারা। অপরিসীম বেদনার ছায়া সমস্ত মুখখানি জুড়ে আছে যেন তাঁর। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ওর জন্য যে আমি আমার সর্বস্ব একদিন ত্যাগ করেছিলাম সুব্রতবাবু! আমার ইহকাল, পরকাল, সমাজ সব কিছু। আর সমস্ত কিছুর বিনিময়ে যে ওকেই একমাত্র নির্ভর করে আমি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম!

॥ ছাব্বিশ ॥

চোখের জলের ভিতর দিয়ে অতঃপর বিমলাদেবী শোনালেন এক করুণ কাহিনী! একটি নারী এক শয়তান পুরুষকে ভালবেসে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে যে গোপন দুঃখের কাঁটা বুকের মাঝখানে বয়ে বেড়িয়ে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন তারই করুণ কাহিনী। সুব্রতর অনুমান ভুল হয়েছিল

বিমলাদেবীর বয়স সম্পর্কে! এক একজন স্ত্রী পুরুষ আছে যাদের বয়েস হলেও দেহের কোথায়ও বয়েসের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে না, বিমলাদেবী ছিলেন তাদেরই দলের, সুব্রত বুঝতে পারেনি।

বিমলাদেবীর বয়স অনেক হয়েছিল। চুয়াল্লিশ। কিন্তু তাকে দেখলে তা মনে হতো না। মনে হতো বুঝি ত্রিশের কোঠাও তখনো উত্তীর্ণ হয়নি।

বিমলা—নরেন্দ্র আর বিনয়েন্দ্রর দূর সম্পর্কীয় মাসতুত বোন। বিমলার জননী মমতাময়ী বিধবা হবার পর, এক প্রকার নিঃসম্বল অবস্থাতে নয় বছরের একমাত্র কন্যা বিমলার হাত ধরে এসে একদিন ঐ ঘোষ পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওদের পিতার দয়াতেই। এবং ঘোষ মশায়ই চোদ্দ বছরের সময় বিমলার বিবাহ দেন একটি সৎপাত্র দেখে। কিন্তু বিমলার কপালে সে সুখ টিকলো না। এক বৎসরের মধ্যেই কিশোরী বিমলা স্বামীকে হারিয়ে আবার ঘোষ নিবাসে ফিরে এলেন। একমাত্র কন্যার অকাল বৈধব্যের নিদারুণ আঘাত সইতে পারলেন না মমতাময়ী। এক মাস বাদে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন।

বিমলা আর কোথায় যাবে, ঘোষ নিবাসেই থেকে গেল।

বিনয়েন্দ্র তখন তরুণ যুবক।

বিনয়েন্দ্র চিরদিনই ছিল উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের। ক্রমশঃ এক বাড়ীতে সর্বক্ষণ কাছাকাছি থাকার দরুন বিমলার প্রতি আকৃষ্ট হলেন বিনয়েন্দ্র।

কেবল বিমলারই প্রতি বিনয়েন্দ্রই যে আকর্ষিত হলেন তাই নয়, বিমলাও বিনয়েন্দ্রের প্রতি আকর্ষিতা হলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা বাড়ীব কেউই জানতে পারলো না।

অমনি ভাবেই হয়তো দীর্ঘ দিন চলতো যদি না ইতিমধ্যে বিমলার মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দিত।

গর্ভের সেই অনাগত শিশুকে সম্ভবনাতেই নষ্ট করে ফেলবার জন্য বিনয়েন্দ্র বিমলাকে অনেক বোঝালেন কিন্তু বিমলা কিছুতেই সম্মত হলো না।

সে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, না, বিনয়েন্দ্র তার গর্ভের সন্তানকে স্বীকৃতি না দেয় দিক সে এতবড় মহাপাপ মা হয়ে করতে পারবে না।

পিতাকে বিনয়েন্দ্র যমের মত ভয় করতেন।

ঘুণাক্ষরেও পিতা ঐ কথা জানতে পারলে তাকে নিঃসন্দেহে ত্যেজ্যপুত্র করবেন বিনয়েন্দ্র তা ভাল ভাবেই জানতেন।

দিশেহারা হয়ে পড়লেন বিনয়েন্দ্র।

ঐ সময় একটা সুযোগও সহসা এসে গেল।

বিনয়দের এক জ্যেঠি তাদেরই আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি তীর্থ করতে যাবেন, বিনয়েন্দ্রের পরামর্শ মত বিমলা সেই সঙ্গে তীর্থে যাবার অনুমতি বিনয়েন্দ্রের পিতার কাছ থেকে আদায় করে নিলেন।

এবং বিনয়েন্দ্রই তাদের সঙ্গে করে তীর্থে নিয়ে গেলেন।

প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন করে সকলে এসে উঠলেন কাশীতে।

অশীতিপরা বৃদ্ধা জেঠাইমার চোখে ধুলো দেওয়া বিশেষ কষ্ট ছিল না। তথাপি বিমলা বিনয়েন্দ্রকে বাধ্য করলেন তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিতে এবং কাশীতেই শৈবমতে উভয়ের বিবাহ হলো এই চুক্তিতে যে বিমলা ইহজীবনে কোন দিন তাদের বিবাহের কথা কাউকে জানাবেন না।

ওদিকে জ্যেঠাইমাকে মন্ত্রণা দিয়ে কৌশলে বিনয়েন্দ্র তাকে বাকী জীবনটা কাশীতে থাকবার জন্য রাজী করালেন।

বিনয়েন্দ্রের পিতাও অমত করলেন না।

এবং জেঠাইমার সঙ্গে আপাতত বিনয়েন্দ্র ও বিমলা কাশীতেই রইল। কয়েক মাস পরে প্রসবের দিন যখন ঘনিয়ে এলো তখন বিমলা বিনয়েন্দ্রকে বললে, এরপর আর একত্রে সন্তান নিয়ে এক বাড়ীতে জেঠির সঙ্গে তো বাস করা চলবে না। তখন বিমলার ইচ্ছা ও চাপে পড়েই বিনয়েন্দ্র বিমলার পৃথক বাসের ব্যবস্থা করতে সম্মত হলো। এবং যথা সময়ে বিমলা হাসপাতালে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলে।

কিন্তু মুখে সম্মত হলেও মনে মনে বিনয়েন্দ্রের অন্য মতলব ছিল।

হাসপাতাল থেকে ফিরবার পথে বিনয়েন্দ্র কৌশলে বিমলার গর্ভজাত সন্তানটিকে সরিয়ে দিল। এবং বিমলাকে এনে জেঠাইমার ওখানেই তুললো।

বেচারী হতভাগিনি বিমলা! চোরের বোবা কান্নায় তার বুক ভেঙ্গে যেতে লাগলো অহর্নিশি কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা কাউকেই সে জানাতে পারলো না।

ঐ সময় সুব্রত প্রশ্ন করে, কোথায় যে বিনযবাবু আপনার নবজাত শিশু পুত্রটিকে সরিয়ে ফেললো কিছুই বুঝতে পারলেন না!

না!

শিশুটিকে নিয়ে দাই একটা টাঙ্গায় ছিল আর আমি তার সঙ্গে অন্য একটা টাঙ্গায় আসছিলাম।

তারপর!

আমাকে এনে তুললো তাদের আগের বাড়ীতেই! আমি তো অবাক। নিজের মনে নিজে ছট্‌ফট্ করছি অথচ কাউকে কিছু বলতে পারি না।

বিনয়বাবুকে বললেন না কেন!

বলবো কি! আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই এই আসছি বলে সেই যে সে চলে গেল, ফিরে এলো দশ দিন পরে।

সে কি!

হ্যাঁ। সে দশটা দিন যে আমার কিভাবে কেটেছে তারপর দশ দিন পরে যখন সে ফিরে এলো তখন জিজ্ঞাসা করলাম—খোকা, আমার খোকা কোথায়?

নেই! সে বললে।

আমি তখন তার পায়ের উপরে আছড়ে পড়ে কেঁদে বললাম, ওগো আমার ছেলে আমাকে ফিরিয়ে দাও, তোমাকে কথা দিচ্ছি যেদিকে দু'চোখ যায় আমার ছেলেকে নিয়ে চলে যাবো। কেউ ঘুণাক্ষরেও কোনদিন জানতে পারবে না এ সব কথা ।

কিন্তু বিনযেদ্র বললে, না, তা হয় না বিমলা।

কেন, কেন হয় না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

কেন ব্যস্ত হচ্ছো বিমলা! তোমার ছেলে বেঁচেই আছে!

না, না—আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না গো, আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও!

মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছো বিমলা তুমি, আমি বলছি, সময় হলেই তোমার ছেলেকে তুমি পাবে।

কতবার পায়ে ধরে কাঁদলাম কিন্তু সে আমার কোন কথাই শুনলো না।

বিমলা কাঁদতে লাগলেন।

তারপর!

মাস কয়েক বাদে আবার একদিন আমরা কাশী থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কিন্তু আপনি বিনয় বাবুকে ভয় দেখালেন না কেন যে সব কথা প্রকাশ করে দেবেন।

তাও দেখিয়েছি কিন্তু তাতে সে কি জবাব দিয়েছিল জানেন সুব্রতবাবু।

কি?

বলেছিল সে তাহলে আমার সন্তানকে হত্যা করবে।

শয়তান। স্কাউণ্ড্রেল! তারপর এই সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের মধ্যে আর কোন সন্ধানই আপনি আপনার ছেলের পাননি?

পেয়েছি—কিন্তু সে সংবাদ বোধহয় না পেলেই ভাল হতো।

কেন?

ছেলেকে নিয়ে শ্রীরামপুরের এক স্বামীজীর অনাথ আশ্রমে রেখে এসেছিল সে।

অনাথ আশ্রমে!

হ্যাঁ।

এবং সেখানেই যখন তার আঠারো বছর বয়েস সেই সময় হঠাৎ আশ্রমে আগুন লাগে—

তারপর?

সেই আশ্রমের মধ্যে আগুন ধরার দিন সে ও অন্য একটি ছেলে মনোহর যে কোথায় আশ্রম

থেকে সরে পড়লো আর তাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

মনোহর?

হ্যাঁ, মনোহর শিকদার!

চকিতে ঐ সময় একটা কথা সুব্রতর মনে পড়ে যায়। মনোহর শিকদার। কোন্ মনোহর শিকদার। ঘোষ কোম্পানীর অফিসের মনোহর শিকদার নয় তো। যে বর্তমান পুলিসের হেফাজতে আছে।

আচ্ছা মিসেস ঘোষ—

সুব্রতর ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকালেন বিমলা তার দিকে।

চমকে উঠলেন কেন। সত্যিই তো আপনি আইনত ও ধর্মত এই ঘোষ বাড়ীরই বধূ!

না, না—সুব্রতবাবু, ও পরিচয় আর আমার আজ প্রয়োজন নেই! বিমলা কলঙ্কিনীই থাক।

আচ্ছা একটা কথা বিমলাদেবী—

বলুন!

শ্রীরামপুরের অনাথ আশ্রমে আপনার সেই ছেলের কি নাম ছিল কিছু জানেন?

প্রথমে জানতাম না কিন্তু পরে জেনেছিলাম। কারণ আশ্রমে আগুন লেগে পুড়ে যাবায় পরের দিন ওর সঙ্গে গাড়িতে করে সেই আশ্রমে যাবার পর স্বামীজির মুখেই শুনেছিলাম তার নামটা।

আপনি গিয়েছিলেন আশ্রমে?

হ্যাঁ, সেইখানেই স্বামীজি স্বরূপানন্দর মুখে সব কথা শুনি। নচেৎ ওর মুখের কথায় কোন দিনই আমি বিশ্বাস করতাম না।

কিন্তু সেও তো সব সাজানো ব্যাপার হতে পারে বিনয়বাবুরই।

না। সাজানো নয়, সব সত্যি! কিন্তু যা বলছিলাম, স্বামীজির মুখেই প্রথম শুনেছিলাম, আমার ছেলের নাম ছিল অনিমেষ।

কি! কি বললেন বিমলাদেবী! ভূত দেখার মতই যেন চমকে ওঠে সুব্রত।

অনিমেষ!

হ্যাঁ, অনিমেষ! এবং স্বামীজির পূর্বাশ্রমের নামের পদবী অনুসারে তিনি তাকে পিতৃত্ব দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়ায় আশ্রমে তার নাম ছিল অনিমেষ হালদার।

সুব্রত বিমলাদেবীর শেষের কথাটায় যেন একেবারে পাথর হয়ে যায়।

ক্ষণপূর্বের একটি রক্তাক্ত বিভৎস দৃশ্য তার চোখের দৃষ্টির সামনে যেন ভেসে ওঠে চকিতে।

অনিমেষ! অনিমেষ হালদার তাহলে অজ্ঞাত অপরিচিত নয়, এই বিমলা ও বিনয়েন্দ্ররই সন্তান।

কিন্তু সুব্রতবাবু, আপনি—আপনি নামটা শুনে অমন করে চমকে উঠলেন কেন! আপনি—

আমি!

হ্যাঁ, বলুন, বলুন—শুধু বলুন আজো কি সে বেঁচে আছে?

আপনি এই ঘরে একটু অপেক্ষা করুন বিমলাদেবী, আমি এখুনি আসছি। বলেই সুব্রত তড়িৎপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ সাতাশ ॥

রাত্রিশেষের আলোর আভাষ পূর্বদিগন্তে তখন একটু একটু করে ফুটে উঠছে।

সুব্রত এসে পাশের ঘরে ঢুকলো।

যে ঘরে সতর্ক প্রহরায় তখনো একটা চেয়ারে বিনয়েন্দ্রকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

সামনেই অবশ্য আর একটা চেয়ারে বসে ছিলেন ইনস্পেক্টার রথীন রুদ্র। করবী বাড়ী চলে গিয়েছিল।

পদশব্দে সকলেই সুব্রতর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

বিনয়েন্দ্রবাবু!

বিনয়েন্দ্র সুব্রতর গম্ভীর কণ্ঠে মুখ তুলে তাকালো।

অনিমেষ হালদারকে চেনেন।

কে! চমকে তাকালেন বিনয়েন্দ্রবাবু সুব্রতর মুখের দিকে।

অনিমেষ হালদার।

কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে যেন সামলে নিয়েছেন বিনয়েন্দ্র। কঠিন কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন, না!

জানেন না?

না!

কিন্তু বিমলাদেবী, আপনার স্ত্রী—

কে!

আপনার স্ত্রী বিমলাদেবী, সব কথাই আমাকে বলেছেন।'

তাই যদি বলে থাকে তো আমায় আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

জিজ্ঞাসা করছি এই জন্য যে, আপনি কি জানেন দীর্ঘ নয় বৎসর আগে শ্রীরামপুরের এক অনাথ আশ্রম থেকে অনিমেষ নামে যে ছেলেটি আশ্রমে অগ্নিকান্ডর গোলমালের মধ্যে অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল সে এখন কোথায়?

না!

সে আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি জানেন না! কিন্তু মনোহর শিকদার, সেও আপনাকে কিছু বলতে পারেনি—

মনোহর!

হাঁ, সে তো আপনারই আশ্রয়ে ছিল দীর্ঘদিন, আপনার যত কুকীর্তির দক্ষিণ হস্ত রূপে।

বিনয়েন্দ্র চুপ করে থাকেন।

কোন সাড়াই আর দেন না!

কিন্তু আমি জানি আপনার সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলে এখন কোথায়!

কোথায়!

দেখতে চান!

নিশ্চয়ই!

বেশ। তবে চলুন—উঠুন—

ক্রমে ভোরের আলোয় প্রকৃতি তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথমে জীপ গাড়িটা ও তার পশ্চাতে কালো রঙের পুলিশ ভ্যানটা এসে ব্যারাকপুর রোডে মতিঝিলের গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

মতিঝিলের সর্বত্র তখন লাল পাগড়ী পাহারা দিচ্ছে।

জীপ থেকে সুব্রত ও রথীন রুদ্র নামলো তারপর তারা এগিয়ে গিয়ে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় বিনয়েন্দ্রকে পুলিশ ভ্যান থেকে নামালো।

বিনয়েন্দ্র একেবারে নিশ্চুপ, মুখে কোন শব্দ পর্যন্ত নেই।

বারান্দা দিয়ে উঠে হলঘরের দিকে যেতে যেতে সুব্রত বললে, চিনতে আশা করি কষ্ট হচ্ছে না বিনয়েন্দ্রবাবু, আপনার লীলা নিকেতন 'মতিঝিল'কে।

বিনয়েন্দ্র কোন জবাব দেন না।

এগিয়ে গিয়ে সকলে প্রহরী বেষ্টিত বিনয়েন্দ্রকে নিয়ে রাত্রের সেই কক্ষে প্রবেশ করলো, যে কক্ষে কয়েক ঘন্টা পূর্বে একটা রক্তাক্ত দৃশ্যের মর্মন্তুদ অভিনয় হয়ে গিয়েছে। সকলে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই যে দুজন পুলিশ প্রহরী ঘরের মধ্যে দন্ডায়মান ছিল তারা সরে দাঁড়ালো সসম্ভ্রমে।

মেঝের উপরেই তখনো ঢাকা কম্বলে অনিমেষের মৃতদেহটা শায়িত ছিল। সুব্রতই সর্বাগ্রে এগিয়ে গিয়ে সেই কম্বলে আবৃত মৃতদেহটার সামনে দাঁড়ালো, তারপর যেন মুহূর্তকাল একটু ইতস্তত করে সহসা নিচু হয়ে মৃতদেহের উপর থেকে কালো কম্বলটা একটানে সরিয়ে দিয়ে, বিনয়েন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখুন তো বিনয়েন্দ্রবাবু, এই হতভাগাকে চিনতে পারেন কি না!

বিনয়েন্দ্রর চোখে মুখে কোনরকম পরিবর্তনই দেখা গেল না।

তিনি বারেকের জন্য মেঝের উপর শায়িত অনিমেষের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়েই পুনরায় দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন।

চিনতে পারছেন না আশ্চর্য! মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে আপনি একেই মারাত্মক রকম আঘাত করায় কিছুক্ষণের মধ্যেই এর মৃত্যু হয়েছে। একে কিন্তু আপনার চিনতে পারা উচিত ছিল।

বিনয়েন্দ্র নির্বাক।

ভাল করে চেয়ে দেখুন, সুব্রত আবার বলে, নয় বৎসর পূর্বে অনাথ আশ্রমে পরিত্যক্ত আপনার সেই ছেলেই এই অনিমেষ বিনয়বাবু।

মুহূর্তে যেন বিনয়েন্দ্রের পাথরের মত দেহে প্রাণ সঞ্চার হলো।

অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে ওঠেন বিনয়েন্দ্র, হ্যাঁ—

হ্যাঁ মিঃ ঘোষ! আপনার অপরিসীম পাপের, আপনার কলঙ্কিত পিতৃত্বের ঋণ শোধই ওই বেচারী করেছে আজ, আপনারই দেওয়া প্রাণটা আপনারই হাতে তুলে দিয়ে।

না, না—বিশ্বাস করি না, এ আমি বিশ্বাস করি না। পাগলের মতই যেন চিৎকার করে উঠ্‌লেন বিনয়েন্দ্র।

বিশ্বাস না করলেও কথাটা কঠিন সত্য! আপনিই আপনার নিজের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের হাতে আজ হত্যা করেছেন।

দু'হাতের মধ্যে এবারে মুখ ঢেকে বিনয়েন্দ্র বললেন, আমাকে এ ঘর থেকে নিয়ে চলুন, দয়া করুন, দয়া করুন, দয়া করুন।

সুব্রত চোখের ইংগিত করলো বিনয়েন্দ্রকে অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্য।

সকলে এসে মতিঝিলের লাইব্রেরী ঘরে পুনরায় প্রবেশ করলেন।

আমি বসতে পারি একটু মিঃ রায়? ক্লান্ত অবসন্ন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে যেন বিনয়েন্দ্র বললেন।

নিশ্চয়ই, বসুন—

সুব্রতর অনুমতি পেয়ে বিনয়েন্দ্র একটা সোফার উপরে ঝুপ্ করে বসে পড়লেন। এবং দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন।

ঘরের মধ্যে সুব্রত ও মিঃ রুদ্র এবং অন্য দুজন আর্মড্ সার্জেন্ট নিকটে দাঁড়িয়ে। বরফের মত একটা জমাট স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে থম্ থম্ করতে থাকে।

দেওয়ালে টাঙ্গানো সুদৃশ্য জার্মান ক্লকটা কেবল এক ঘেয়ে টক্ টক্ শব্দ তুলে সময় সমুদ্রের বুকে স্পন্দন জাগিয়ে চলেছে।

সকলেরই দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ, অদূরে হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট বিনয়ন্দ্রের দিকে।

ধীরে ধীরে এক সময় মুখ তুললেন বিনয়েন্দ্র। এবং ম্লান অবসন্ন কণ্ঠে বললেন, মিঃ রায়! সব আমি বলবো—কিছুই আর গোপন করবো না। আমার সমস্ত অপরাধের স্বীকৃতি আমি নিজ মুখেই দেবো।

সুব্রত কোন কথা বলে না।

বিনয়েন্দ্র একটু থেমে আবার বলেন, কিন্তু তার আগে সামান্য একটু ফেভার যদি আপনাদের কাছে আমি চাই—

নিশ্চয়ই, বলুন—

ঐ যে দেখছেন আলমারিটা, ওটা খুলে দেখুন একটা বোতল আর পেগ গ্লাস আছে, যদি একটা পেগ এলাও করেন।

বিনীত করুণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন বিনয়েন্দ্র সুব্রতর মুখের দিকে।

সুব্রত মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলো তারপর তাকালো পাশেই দণ্ডায়মান ইন্সপেক্টার রথীন রুদ্রর দিকে।

রুদ্র মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন, বেশতো দিন—

এবারে সুব্রতই নিজে এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট কাচের দেওয়াল আলমারিটার দিকে। আলমারির দরজা খোলাই ছিল। পাশাপাশি দুটো কালো ছোট ভ্যাট্ 69এর বোতল ছিল। একটা সম্পূর্ণ বোতল, সিলই খোলা হয়নি। অন্যটা অর্ধেকখালি। পাশেই ছিল একটা পেগ গ্লাস।

সুব্রত সিল খোলা বোতল থেকে পেগ গ্লাসে এক পেগ পরিমাণ তরল পদার্থ ঢেলে এদিকে ওদিক তাকাচ্ছিল, বিনয়েন্দ্র বললেন তাড়াতাড়ি, না, না—এমনি 'র'ই দিন।

সুব্রত এগিয়ে এসে পেগ গ্লাসটা বিনয়েন্দ্রের হাতে দিল।

পেগ গ্লাসটা হাতে ধরে দৃষ্টির সামনে তুলে আবার বিনয়েন্দ্র সুব্রতর দিকে তাকালেন।

সহসা ঐ সময় কি একটা অজানিত আশংকায় মুহূর্তের জন্য সুব্রত যেন কেঁপে ওঠে, বিনয়েন্দ্রর চোখে মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠতে দেখে।

কিন্তু তার আগেই যা ঘটবার ঘটে গিয়েছে।

এক চুমুকে হাতে পেগ গ্লাসটা শেষ করেই সেটা অবহেলা ভরে বিনয়েন্দ্র ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন!

ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাঁচের পেগ গ্লাসটা শতধায় চূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল এবং সশব্দে বিনয়েন্দ্রের অসাড় দেহটা চেয়ারের উপর থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো পর মুহূর্তেই।

মাত্র কয়েকটি যন্ত্রণাকাতর দেহের আক্ষেপ, তারপরই সব স্থির।

ঘরের মধ্যে সকলেই হতভম্ব ঘটনার আকস্মিকতায়।

রথীন রুদ্র তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল, মৃদু শান্ত কণ্ঠে সুব্রত তাকে বাধা দিল, হি ইজ্ ডেড্ রথীনবাবু।

ডেড্!

হ্যাঁ, খুব সম্ভবতঃ পটাসিয়াম সায়ানাইড!

পটাসিয়াম সায়ানাইড্।

হ্যাঁ, যে মৃত্যু বিষ কৌশলে প্রয়োগ করে একদিন ঐ বিনয়েন্দ্র তার জ্যেষ্ঠ ভাই নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করেছিল, সেই বিষই উনি ঐ লিকারের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল কিন্তু—

উঃ ইট ওয়াজ সো আনএক্সপেক্টেড—রথীন রুদ্র মৃদু কণ্ঠে বললেন কেবল।

হ্যাঁ। কিন্তু এখানে আর দেরি করে লাভ নেই এখনি আবার আমাদের একবার বিনয়বাবুর বালীগঞ্জের বাড়ীতে যেতে হবে, যেখানে বিমলাদেবীকে একা রেখে এসেছি।

কিন্তু সেখানেও পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর।

বালীগঞ্জ পৌঁছে বিমলা দেবীর খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলো, বিমলাদেবী নেই। বেবীও জানে না, এমন কি দাসদাসীরাও টের পায়নি কখন এক সময় ইতিমধ্যে বিমলাদেবী নিঃশব্দে তার এতদিনকার আশ্রয়, এত কলঙ্ক, দুঃখ ও বেদনার আশ্রয়টি ত্যাগ করে কোথায় চলে গিয়েছেন।

॥ আটাশ ॥

বিমলাদেবীর আর কোন অনুসন্ধান না পাওয়া গেলেও তার ঘরে একটি চিঠি পাওয়া গেল।

চিঠিখানি খামের মধ্যে ভরে মুখ এঁটে সুব্রতর নামই উপরে লিখে শয্যার বালিশের উপরে রেখে গিয়েছেন বিমলাদেবী।

খামটা ছিঁড়ে সুব্রত চিঠিটা সামনে মেলে ধরলো।

সুব্রতবাবু!

আর কেউ না বুঝলেই আশা করি আপনি বুঝলেন এ বাড়ী ছেড়ে এরপর চলে যাওয়া ছাড়া আর সামনে দ্বিতীয় কোন পথই ছিল না। তাই আপনি ফিরে আসবার পূর্বেই চিরদিনের মত এ বাড়ী ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। যাবার পূর্বে একটা শুধু, একটি মাত্র অনুরোধ, যত পাপ, যত কুকীর্ত্তিই আমি করে থাকি না কেন, নিশ্চয়ই বুঝলেন সবই আমাকে করতে হয়েছিল আমার স্বামীরই নির্দেশে। হয়ত আপনি বলবেন অন্যায় জেনেও কেন নির্বিকারে তার সব আদেশ পালন করে এই মহাপাপ করেছি। তার জবাবে বলবো, শুধু তিনি আমার স্বামীই ছিলেন না, পৃথিবীতে এমনি করে আমার মত বোধহয় খুব কম স্ত্রীই তার স্বামীকে ভালবাসতে পেরেছে। এবং সেই ভালবাসার কাছেই আমার সমস্ত পাপ পুণ্য, ইহকাল পরকাল একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাক সে কথা। আমার সমস্ত কথা, সমস্ত প্রশ্ন ও তার সমস্ত মীমাংসা আমি আমারই সঙ্গে নিয়ে চললাম। তাই চির বিদায়ের পূর্বে এই শেষ অনুরোধ, আমার সন্ধান আর করবেন না দয়া করে। অন্তত এই লজ্জায় আমাকে অন্যের অগোচরে মুখ ঢেকে থাকবার ক্ষমাটুকু দেবেন। আর একটা কথা। আমার ভাসুর নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর ব্যাপারে প্রথম দিন আমার স্বামীরই নির্দেশ মত নির্মলের বিরুদ্ধে যে আপনাদের কাছে জবানবন্দী

দিয়েছিলাম, জানবেন তা সবই মিথ্যা! নির্মল সম্পূর্ণ নির্দোষ। এখন বুঝতে পারছি, করবীদেবীর ব্যাপারে তার প্রতি আক্রোশবশতঃই তিনি ঐ ব্যাপারে নির্মলকে ফাঁসাতে চেয়েছিলেন, তাকে সরাতে চেয়েছিলেন খুনের অপরাধ তার কাঁধের উপরে চাপিয়ে। আজ নির্মলবাবু বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেও আমি মার্জনা চেয়ে যেতাম। সেইদিন দ্বিপ্রহরে, আমিই ডাকের চিঠিগুলো আমার ভাসুরের হাতে সামার হাউসে পৌছে দিই। এবং আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার স্বামীর নির্দেশেই লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে আমার পূজনীয় ভাসুরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হয়েছিল। পাপীয়সী আমি তাই তাঁর মত লোকের সঙ্গেও প্রেমের অভিনয় করতে হয়তো আমার বাধেনি। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, ঐ ফিল্ম রোলের মধ্যে যে মারাত্মক বিষ মেশানো ছিল তা আমি ঘৃণাক্ষরেও জানতাম না। পরে অবশ্য আমি অনুমান করেছিলাম। আর এও আমি জানতাম না যে, সে তার ভাইঝি বেবীকে মারবার চেষ্টা করবেন। তাহলে আমি বাধা দিতাম। বেবীর কাছে পৃথক চিঠি দেবার আমার আর কোন মুখ নেই বলেই দিলাম না। তাকে বলবেন অভাগিনী বিমলাকে কোনদিন যদি ক্ষমা করতে পারে তো যেন করে।

ইতি—

হতভাগিনী বিমলা।

কি জানি কেন বিমলার শেষ চিঠিটা পড়তে পড়তে সুব্রতর দু'চোখের কোলে জল ভরে আসে।

বেবী পাশেই দাঁড়িয়েছিল তখনো। সে মৃদু কণ্ঠে শুধায়, কি লিখেছেন পিসিমা চিঠিতে সুব্রতবাবু?

চিঠির কথা তুমি জিজ্ঞাসা করো না বেবী। মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলে।

কেন!

তাও শুনতে পাবে না তুমি।

বেশ।

একবার ভেবেছিল সুব্রত বিমলাদেবীর সত্যিকারের তাদের সঙ্গে পরিচয়টা বেবীর কাছে খুলে বলে কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে সেটা আর বললে না।

যাদের নিয়ে কথাটা তাদের একজন যখন সমস্ত কিছুর বাইরে চিরদিনের মতই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তখন সে দুঃখ কলঙ্ককে নতুন করে জাগিয়ে তুলে কিই বা আর লাভ!

তাদের গোপন কথা গোপনই থাক।

বিমলা! দুঃখিনী বিমলা হারিয়ে গিয়েছে, হারিয়েই যাক।

ঐ ঘটনার আরো দিন দুই পরে।

নির্মল চৌধুরী নিজে থেকেই গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে সব স্বীকৃতি দিয়েছে।

থানার সুশীল সোমের অফিস ঘরে বসে সুব্রত বলছিল, মুনি ঋষিরা ঠিকই বলে গিয়েছেন সুশীলবাবু—

কি?

নরনারীর প্রেম ব্যাপারটা দেবতারই বোধগম্য নয় তো মানুষ তো কোন্ কথা।

কার কথা বলছেন মিঃ রায়?

সুব্রত তখন পর্যন্ত বিমলাদেবীর সমস্ত কাহিনী সুশীল সোমকে জানায়নি। ধীরে ধীরে সংক্ষেপে সে বিমলার কাহিনী বলে গেল।

সব শুনে সুশীল সোম বললেন, আশ্চর্য—

তাই, নইলে হতভাগিনী দূর সম্পর্কীয়া বলে বিধবা মাসতুতো বোন বিমলাদেবী বিনয়েন্দ্রের মত এক নরপিশাচকে কেমন করে অমন গভীর ভাবে ভালবাসতে পারলো। আর সেই ভালবাসারই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নরপিশাচ বিনয়েন্দ্র হতভাগিনী বিমলাকে শেষ পর্যন্ত হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করতে পেরেছিল। হতভাগিনীর জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হয় মিঃ সোম! জানিনা সে কোথায় গিয়েছে তবে যেখানেই যাক না কেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যিনি মানুষের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন তাঁর ক্ষমা থেকে ঐ দুঃখিনী যেন বঞ্চিতা না হয়!

তারপর একটু থেমে আবার সুব্রত বলে, তাই বলছিলাম বিচিত্র এই নরনারীর প্রেমের ব্যাপারটা। দুর্জ্ঞেয় অপার। জন্মমুহূর্তে শয়তান পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত, চির অবহেলিত, নাম গোত্র পরিচয়হীন

এক কুৎসিত পুরুষ, ঐ অনিমেষ, করবীকে ভালবেসে হাসতে হাসতে তার জন্য প্রাণ দিয়ে গেল। আর এক নারী পাকেচক্রে অসামাজিক প্রেমের কলঙ্ক চিরদিন নিঃশব্দে মাথায় বয়ে, নিঃশব্দে কোথায় গিয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকল। এবং এদের দুজনেরই এই মর্মন্তুদ পরিণতির জন্য দায়ী হচ্ছে ঐ নরপশু বিনয়েন্দ্র!

সুশীল সোম ঐ সময় বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু বংশী ওরফে অনিমেষের চোরা মাদকদ্রব্যের কারবারে নিজেকে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত করে রাখার ব্যাপারটা কি সেদিক দিয়ে একটু বিচিত্রই মনে হয় না সুব্রতবাবু!

হয় বৈ কি! সুব্রত জবাবে বলে, তবে সেজন্যও অনিমেষের চাইতে তার জন্মদাতা পিতা, বিনয়েন্দ্রকেই আমি বেশী দায়ী করবো।

কিন্তু সে ব্যাপারে তার বাবা দায়ী হতে যাবে কেন!

নিশ্চয়ই, সে দায়ী বইকি। দুষ্কৃতকারী ও ক্রিমিন্যাল মাইন্ডেড তার পিতার চরিত্রগত ক্রাইমের টেনডেনসিই ছাপ ফেলেছিল তার ঔরসজাত পুত্রেরও চরিত্রে। কিরীটি বলে এ হচ্ছে চরিত্রের ক্রোমোজোম ফ্যাকটার। এবং সেই জন্মগত পাপের টেনডেনসিকেই ধূমায়িত করেছে ইন্ধন জুগিয়ে জুগিয়ে মনোহর।

আপনি এ থিয়োরী বিশ্বাস করেন সুব্রতবাবু!

করি বৈ কি! এবং পৃথিবীতে মানব চরিত্রে যে সব জঘন্য ক্রাইম দেখা দেয় বেশীর ভাগ তাদের মূলেও আমার মতে ঐ থিয়োরীটি খুব বড় কথা।

কিন্তু—

মনোহর শিকদার কাল যে জবানবন্দী দিয়েছে আপনার কাছে সেটাও ভেবে দেখুন মিঃ সোম। স্বরূপানন্দর শ্রীরামপুরের আশ্রমে থাকাকালীন সময়ে মনোহরের সঙ্গে অনিমেষের বন্ধুত্ব জন্মায়; এবং মনোহর হচ্ছে এক দুর্ধর্ষ খুনী মা বাপের সন্তান। অনিমেষের মনোহরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মূলেও ছিল তার জন্মগত চরিত্রের ক্রাইমেরই বৈশিষ্ট্য। আর সেই কারণেই মনোহর ও অনিমেষের দুষ্কৃতির জন্য স্বরূপানন্দ তাদের তিরস্কার করায়, মনোহরেরই পরামর্শে অনিমেষ আশ্রমে একদিন রাত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এবং সেই সময়েই ঘটনাচক্রে অনিমেষের মুখটা অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিকৃত হওয়ায় ও ধরা পড়বার ভয়ে মনোহরেরই পরামর্শে দুজনে আশ্রম থেকে সে রাত্রে পালায়। তারপর নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে মনোহর ও অনিমেষ দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়ে। মনোহর নানা দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে অবশেষে সন্তোষ মিত্র বেশী বিনয়েন্দ্রর দলে গিয়ে ভেড়ে আর অনিমেষ কালু খাঁর সঙ্গে মিশে শেষপর্যন্ত তার কারবারের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের চরিত্রেই যে কিছু না কিছু সৎ প্রবৃত্তি থাকে, সেই সৎ প্রবৃত্তিই অবশেষে একদিন অনিমেষের সর্বপাপের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল করবীদেবীর সংস্পর্শে আসবার পর ধীরে ধীরে। দুষ্কৃতির মধ্যে জন্ম নিয়েছিল শুদ্ধ প্রেম, ভালবাসা। যে ভালবাসাই তাকে অন্ধের মত টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু পরিণতির মধ্যে। সত্যিকারের ভালবাসা ও প্রেম এমনি করেই সময়ে সময়ে মানুষের চরিত্রগত নীতি ও সংস্কারকে পর্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যায় এবং করবীদেবী যদি অনিমেষের জীবনে না আসতো তবে হয়তো আজকের অনিমেষকে কোনদিনই আমরা চোরা কারবারী অনিমেষের মধ্যে জন্ম নিতে দেখতাম না! তার ক্রিমিন্যাল বাপের মতই সেও হয়তো একদিন পাপের দুর্নিবার স্রোতের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যেতো। তাইতো যখনই আমার অনিমেষ ও তার হতভাগিনী মা বিমলাদেবীর কথা মনে পড়ে, তখন চোখে জল এসে যায়। ভাবি কি এমন অপরাধে বিমলা স্বামী পেয়েও স্বামী পেল না। সংসারের আর দশজন নারীর মতই দয়িতকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেও ইহজীবনে সে ভালবাসার স্বীকৃতি তো পেলই না, বরং লজ্জা ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে শেষপর্যন্ত নিঃশব্দে কোথায় হারিয়ে গেল। নারীর চিরআকাঙ্খিত সন্তানকে বুকে পেয়েও ইহজীবনে মা ডাক শুনতে পেল না। বলতে বলতে সুব্রতর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা যেন থম্ থম্ করতে থাকে।

সত্যি, একটি মাত্র মানুষের দুষ্কৃতির মূল্য শোধ করতে গিয়ে আর দুটি নিরপরাধ নিষ্পাপ মানুষের এই যে চরম পরিণতি ভাবতেও বিস্ময় লাগে সুব্রতবাবু!

এমনি করে যে কত নিষ্পাপ নিরপরাধীকে আর একজনের পাপের মাশুল দিয়ে যেতে হয়

মিঃ সোম সময়ে সময়ে,—বলে একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে সুব্রত। তারপর একটু থেমে আবার বলে, যাক যা বলছিলাম—

কিরীটি যখন বিমলাদেবী সম্পর্কে বার বার আমাকে সতর্ক হতে বলেছিল তখন বুঝিনি যে, এমনি একটা জটিল রহস্য নরেন্দ্রনাথের হত্যা ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে আছে। নরেন্দ্রনাথ বা শ্রীনাথ করকে হত্যার ব্যাপারটা তবু কিছুটা বোঝা যায় কিন্তু বেবীকে হত্যাপ্রচেষ্টা সত্যিই আমাকে প্রথমটায় বিস্মিত করে দিয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি, বেবীকে হত্যার প্রচেষ্টা না করলে হয়তো কোনদিনই আমার দৃষ্টি বিনয়েন্দ্রের উপর গিয়ে কেন্দ্রীভূত হতো কিনা সন্দেহ।

কিন্তু কালও নমিতাদেবী বলছিলেন তাঁর কাকা যে তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছেন এখনো তিনি তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। সুশীল সোম বললেন।

স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থ এমনই অনর্থের ব্যাপার সুশীলবাবু যে, সে লোভের কাছে অতি বড় স্নেহের পাত্রও তুচ্ছ হয়ে যায়। এর প্রমাণ শুধু এবারই নয় আগেও অনেকবার পেয়েছি। বেবীকে হত্যা প্রচেষ্টার ব্যাপারে যে শুধু বিনয়েন্দ্রর দিকেই দৃষ্টি আমার কেন্দ্রীভূত হয় তাই নয়, অর্থই যে এক্ষেত্রে অনর্থ ঘটিয়েছে অর্থাৎ 'মোটিভ' যে অর্থই সেটাও আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের দৃষ্টি কিন্তু আদপেই ওদিকে যায়নি।

না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমতঃ অনেকদিন আগেই বিনয়েন্দ্র পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, দূরেও থাকতেন দাদার কাছ থেকে।

আচ্ছা সুব্রতবাবু, একটা ব্যাপার এখনো আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না, বিমলাদেবী যদি সত্যি সত্যিই বিনয়েন্দ্রর স্ত্রী ছিলেন তাহলে তিনি বিনয়েন্দ্রর কাছে না থেকে নরেন্দ্রবাবুর গৃহে ছিলেন কেন? সুশীল সোম প্রশ্ন করেন।

আমার যতদূর মনে হয় সেটাও হয়ত বিনয়েন্দ্ররই পরামর্শে। আগেই আপনাকে বলেছি, অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির শয়তান ছিল লোকটা। তার সব কিছু একেবারে ধীরে সুস্থে প্ল্যান করে করা। খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে এগিয়েছিল বিনয়েন্দ্র। প্রথমতঃ, বিমলাকে সঙ্গে নেয়নি তার কারণ ছিল, হয়ত তাহলে নরেন্দ্রনাথের হত্যার ব্যাপারে বিমলার কাছ থেকে যে সাহায্যটা সে পেয়েছিল সেটা পেত না। দ্বিতীয়তঃ, বিমলার কাছাকাছি থাকলে তার অন্য নারীর প্রতি আসক্তির ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যাবারও একটা ভয় ছিল মনে মনে। তাছাড়া বিমলার মত বিনয়েন্দ্র কোনদিনই তো তাকে সত্যিকারের ভালবাসেনি। সে যাক্ যা বলছিলাম। নরেন্দ্রনাথেরও যে বিমলার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে সেটা বিনয়েন্দ্রর অজ্ঞাত ছিল না। আর সেইটাই তার কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে বিমলার দ্বারা হয়েছিল প্রধান অস্ত্রস্বরূপ। পূর্ববৎ সব প্ল্যান করে এবং যেহেতু বেচারী নির্মল তার আকাঙ্খিতাকে ভালবাসে সেই আক্রোশে একই ঢিলে দুই পাখী মারবার মতলবে, শ্রীনাথ করের সাহায্যে নরেন্দ্রর মনটা ক্রমশ নির্মলের প্রতি আগে থাকতেই বিষিয়ে দিয়ে, একটা পূর্ব ক্ষেত্র রচনা করে রেখে কৌশলে বিনয়েন্দ্র নির্মলের হাত দিয়েই হত্যার অমোঘ অস্ত্র দুটি, টাইপ করা পত্রটি ও পার্শেলের মধ্যে একটি বিষ মাখানো ফিল্ম রোল্ হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথও তাঁর ফটো তুলবার দুর্বলতায় সে বিষাক্ত টোপ সানন্দে গ্রহণ করে মৃত্যুকে বরণ করলেন। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই চিঠির মধ্যে ভাঙ্গা টাইপের মোক্ষম প্রমাণ এত কান্ডের পরও থেকে গেল মৃত্যুর পশ্চাতে। হত্যা ব্যাপারটা ছক কেটে সাজাবার প্রচন্ড উল্লাসে হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে যদি বিনয়েন্দ্র সেই টাইপ করা চিঠিটা পূর্বেই সরিয়ে ফেলতো বিমলার সাহায্যে, তবে কারো সাধ্য ছিল না ঐ হত্যার কোন প্রমাণ তার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর।

কিন্তু শ্রীনাথ করের ব্যাপারটা?

সেটা বোধহয় প্রয়োজনের তাগিদে করতে হয়েছিল। শ্রীনাথ করই সম্ভবত ছিল নির্মলের প্রতি নরেন্দ্রনাথের মন ভাঙ্গানোর ব্যাপারে ইনস্ট্রুমেন্ট। কাজেই কাজ হাসিলের পর তার সরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি বলুন? কিন্তু অতি লোভে হলো তাঁতী নষ্ট। নির্মলের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে নরেন্দ্রর ব্যাপারটা যখন ধামাচাপা পড়ে গেল, বিনয়েন্দ্র তখন সম্পত্তি গ্রাস করবার লোভে বেবীকেই চিরতরে ইহজগত থেকে সরাবার মতলব করলেন। আর সেইখানেই হলো তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় ভুল বা প্রমাদ। এক ভুল চালেই কিস্তিমাৎ হয়ে গেল। সুব্রত চুপ করলো।

॥ উনিশ ॥

ঐদিন সন্ধ্যার দিকে একটা জরুরী টেলিফোন কল্ পেয়ে সুব্রত যখন বেবীর ওখানে এসে হাজির হলো, বেবী তখন তার ঘরের মধ্যে একাকী বসে ছিল।

কি ব্যাপার? এত জরুরী ডাক।

আসুন একটা পরামর্শের জন্য ডেকেছি। বসুন---

বসতে বসতে সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি?

ভাবছি আমিও এ সম্পত্তি চাই না সুব্রতবাবু।

সে কি!

হ্যাঁ, যে অর্থের পিছনে এত হত্যা, এত রক্তপাত, সে অভিশাপের বোঝা আর যেই বয়ে বেড়াক আমি অন্তত বয়ে বেড়াতে পারবো না।

বেবী!

হ্যাঁ, আমি মনস্থির করে ফেলেছি সুব্রতবাবু।

হঠাৎ এ বৈরাগ্য—

বৈরাগ্য কেন হবে। আপনিই বলুন তো, কি হবে এই অর্থ দিয়ে।

কি বলছো তুমি বেবী, অর্থই তো মানুষের জীবনে সব—

না। আমি এসব কিছুই চাই না---

এসব কিছুই চাও না—

না।

তবে কি চাও?

বেবী চুপ।

কি বল। চুপ করলে কেন?

বেবী মাথা নিচু করে।

সুব্রত ধীরে ধীরে উঠে এসে উপবিষ্ট আনতমুখী বেবীর কাঁধের উপর একখানি হাতের মৃদু স্পর্শ রেখে কোমল কণ্ঠে ডাকে, বেবী। সত্যিই আর তোমার কি কিছুই চাই না?

বেবী সহসা সোফার হাতলের 'পরে মুখ গুঁজে কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়লো।

খোঁপাটা ভেঙ্গে সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চুলে আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে সুব্রত আবার ডাকে, বেবী।

বেবী কাঁদছে, তবু কাঁদছে।

যেদিন আদালতের বিচারে মনোহরের সাত বৎসরের সশ্রম কারাবাসের রায় দিলেন বিচারক, সেইদিনই রাত্রে করবীর সঙ্গে নির্মলের বিবাহ।

ঘরের মধ্যে মালাচন্দন অলঙ্কার ভূষিতা করবী চিত্রকরা পিঁড়ির উপর বসেছিল।

বাইরে সানাই বাজছে।

সুব্রত এসে ঘরে ঢুকলো।

করবীদেবী।

কে, সুব্রতবাবু, আসুন---কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন অনিমেষবাবুর সব কথা আজ আমাকে বলবেন।

সেই জন্যই বিশেষ করে এসেছি করবীদেবী—বলতে বলতে একটা খাম এগিয়ে দিল সুব্রত করবীর হাতে, এই নিন, এই চিঠি পড়লেই সব জানতে পারবেন। কিন্তু এখনো না। বিয়ের পর রাত্রে বাসর ঘরে পড়বেন।

বেশ।—করবী চিঠিটা জামার মধ্যে রেখে দিল।

বাসর ঘর।

মৃদু নীলাভ আলোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নির্মল আর করবী চিঠিটা পড়ছিল।

সুচরিতাসু,

আজ আর আমি নেই তাই অসঙ্কোচে আমার অতীতের আমিকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি অনেকদিন আমার পরিচয়টা জানতে চেয়েছেন, কিন্তু দিইনি। বিশ্বাস করুন, দিইনি এইজন্য যে দেবার মত আমার কিছুই ছিল না। নাম গোত্র পরিচয়হীন—অনাথ আশ্রমে পালিত। তবু বয়েস হবার পর একদিন যখন জগতের সামনে মুখোমুখি দাঁড়ালাম, যেখানে কেউ আমার নেই, আমি কারো নই। জন্মমুহূর্তে পরিত্যক্ত আমি, দুনিয়ার চির পরিত্যক্ত। সেদিন কিন্তু অতটা দুঃখ হয়নি। কারণ তখন আমার একমাত্র প্রশ্ন সামনে, বাঁচতে হবে। বাঁচলাম—অর্থাৎ বেঁচে রইলাম। এবং সেই বাঁচার রস পেলাম আফিমের চোরা কারবারে। তাই ঐভাবে পলাতক সর্বদা সশঙ্কিত জীবন অন্ধকার ঘরে যাপন করতাম। কিন্তু যেদিন প্রথম সেই অন্ধকারে এক জ্যোতির্ময় আলোর শিখা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো, আমার বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ সব যেন পাল্টে গেল। যাক্ সে কথা। আমার একান্ত নিজস্ব হ্যাঁ, নিজস্ব কথা আমারই থাক। আমার নগদ কিছু টাকা ছিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে। আপনার নামে সেটা আছে। সে টাকাটা নিলে সত্যিই বলছি আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হবে। পরপার থেকে আপনাদের কুশল কামনা করবো।

করবী চিঠিটা শেষ করে নির্মলের দিকে তাকালো।

করবীর চোখে জল। সানাই তখনো বাজছে ক্লান্ত সুরে।

রাত্রির শেষ যাম প্রত্যুষের প্রত্যাশায় প্রহর গুণে চলেছে কেবল।

মিথুন লগ্ন

চিন্তা ও কল্পনার বাইরে এক এক সময় এমন এক একটা ব্যাপার বা ঘটনা ঘটে যায় যে হঠাৎ যেন কেমন বিমূঢ় করে দেয়।

সংবাদটা শুনে মায়ামঞ্চ থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার সৌরীন কুন্ডু ঠিক তেমনিই বিমূঢ় হয়ে যায় যেন।

সংবাদটা এনেছিল তার থিয়েটারের কেয়ারটেকার লোকনাথ।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সৌরীন কুন্ডু চায়ের কাপটি সামনে নিয়ে সবে ঐদিনকার সংবাদ পত্রে এমিউজমেন্ট কলম্‌টার উপর একবার চোখ বুলিয়ে সবে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চোখ বুলচ্ছে এমন সময় লোকনাথ যেন ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুকল।

তার গৃহে লোকনাথের অবারিত দ্বার।

লোকনাথ সোজা একেবারে উপরে তার বসবার ঘরে এসেই ঢুকছিল।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে লোকনাথের দিকে চেয়েই চম্‌কে উঠেছিল সৌরীন কুন্ডু।

চোখে মুখে একটা আতংক যেন স্পষ্ট।

মাথার চুল এলো মেলো।

পরনের শার্টের বোতামগুলো ভাল করে লাগায়নি পর্যন্ত।

লোকনাথ—এই সকালে কি ব্যাপার?

শিগ্‌গিরী একবার থিয়েটারে চলুন স্যার—কথাটা বলতে বলতে লোকনাথের গলাটা যেন বুজে আসে।

থিয়েটারে কেন—কি হয়েছে?

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে স্যার।

সর্বনাশ!

হ্যাঁ—মায়া—

মায়া কি—কি হয়েছে মায়ার?

জানি না ঠিক কি হয়েছে তার—তবে—

কি তবে?

মায়া নেই।

মায়া নেই! তার মানে! কোথায় গেছে?

মায়া বেঁচে নেই স্যার।

সেকি!

সৌরীন কুন্ডু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, থিয়েটারের সাজ-ঘরের মধ্যে মায়ার মৃত দেহ পড়ে আছে।

মায়ার মৃত দেহ—

সৌরীন কুণ্ডু আবার বসে পড়ে।

কি বলছো তুমি পাগলের মত যা তা লোকনাথ!

চলুন স্যার—আপনি এক্ষুনি একবার চলুন—মনে হচ্ছে সে আত্মহত্যা করেছে।

মায়া আত্মহত্যা করেছে!

সেই রকমই মনে হচ্ছে—

কিন্তু কেন—মায়া আত্মহত্যা করবে কেন!

তা জানি না স্যার—আপনি চলুন এখুনি একবার—

সৌরীন কুন্ডু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি যাও—আমি আসছি।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ও চিন্তার অতীত হলেও ঘটেছে এবং সেই কথাটাই জানিয়ে দিয়ে গেল লোকনাথ।

লোকনাথ চলে গেল কিন্তু সৌরিন্দ্র কুন্ডু তখনো বসে থাকে চেয়ারটার উপরে।

একটু বেলা করেই আজ ঘুমটা ভেঙেছিল সৌরীন কুন্ডুর।

গত রাত্রে নতুন নাটকের শততম রজনী উৎসব গিয়েছে—পর পর দু'টো নাটকে মার খাবার পর বর্তমান নাটকটি যেন জমেছে বুঝতে পারা গিয়েছিল গত পঞ্চাশ রাত্রি থেকেই।

ক্রমশঃ জমে উঠেছে নাটকটি।

অথচ নতুন নাট্যকার, নতুন অভিনেতা-অভীনেত্রী সব কিছুই নতুন।

নাম মাত্র খরচে ও প্রয়াসে সৌরীন কুন্ডু নতুন নাটকটি খুলেছিল।

বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাসে মাসে এক রাশ করে টাকা দিয়ে নাটক করবার মত কোমরের জোর সত্যিই যেন কমে গিয়েছিল সৌরিন কুন্ডুর।

কিন্তু তাহলেও জানা দু' তিন জন যে বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিল তার মধ্যে তাদের ছাড়াতে পারেনি সৌরিন কুন্ডু।

তাদের বলেছিল, একটা ভাল নাটক দেখে শুনে ভাল করে একটু রিহার্শেল দিয়ে পুজোর আগে শুরু কর্া যাবে। মাঝখানে ক'টা মাসের জন্য একটা স্টপ্ গ্যাপ্ হিসাবে যেমন তেমন একটা নাটক করব ভাবছি—

অভিনেতা ও অভীনেত্রীরা বলেছিল, বেশ ত' তাই করুন।

আর তাতেই এই নাটক শুরু করেছিল সৌরীন কুন্ডু।

নতুন একটি ছেলে প্রদীপ—এ্যামেচার ক্লাবে এখানে ওখানে কিছু অভিনয় করেছে—চেহারাটা সুন্দর দেখে ছেলেটিকে পছন্দ হওয়ায় কয়েক মাস ধরে তাকে সামান্য মাইনে দিয়ে সৌরীন কুন্ডু বসিয়ে রেখেছিল।

সেই প্রদীপকেই মেইন রোল দিয়ে ও তাদেরই এ্যামেচার গ্রুপের সম্পূর্ণ নতুন একটি মেয়ে, মায়া—তাকে নায়িকার রোলটি দিয়ে, সামান্য কয়েক দিন রিহার্সেল দিয়ে পুরানো সেট সেটিংস নিয়েই খুলে দিয়েছিল সৌরীন কুন্ডু নাটকটা।

সত্য কথা বলতে কি সৌরীন কুন্ডু থেকে শুরু করে ঐ নতুন নাটকের উপরে থিয়েটারের সকলেরই কেমন যেন একটা স্পষ্ট তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল।

কেউ যেন ওদিকে তাকানোও প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং কেউ কেউ তো মুখ বেঁকিয়ে বলেছে, সৌরীনবাবুর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। বড় বড় নাট্যকারের নাটক, বাঘা বাঘা অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়েই যখন জমানো গেল না তখন—

সৌরীন কুন্ডু নিজেও কোন উৎসাহ বা উত্তেজনা পোষণ করেনি।

নিয়মিত যেমন থিয়েটারে আসে তেমনি আসছিল। হঠাৎ এক শনিবার নাটকের সেল দেখে চমকে উঠেছিল সৌরীন কুন্ডু।

নাটকটির তখন চল্লিশ রজনী চলছে।

নতুন নাটক খুললেও সে নাটকের উপরে কোন আস্থা ছিল না বলেই তখনো সৌরীন কুন্ডু নতুন নাটক খুঁজছে—মুখ্য অভিনেতা অশোক মুখার্জীর সঙ্গে প্রায়ই তার ঘরে বসে ভবিষ্যৎ প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা চলেছে।

ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারাই যেন মিলছে না।

এমন সময় অনিল পাল বুকিং থেকে এসে ঐদিনকার সেলের স্টেটমেন্টটা রাখল, স্যার হাউস ফুল—পর পর দুটো শোই।

হাউস ফুল!

সৌরীন কুন্ডু তাকাল অনিলের দিকে।

নাটকটা বোধহয় ধরে যাবে স্যার—কারণ আজকের এ্যাডভান্সও দেখে মনে হচ্ছে—সামনের বৃহস্পতিবারও হাউস ফুল যাবে।

সামনের বৃহস্পতিবার কোন ছুটি আছে নাকি অনিল?

সৌরীন কুন্ডু প্রশ্ন করে।

না—স্যার। আমি বলছিলাম কি—

কি?

কিছু বড় পোস্টার ছাড়লে হতো না স্যার?

পোস্টার!

হ্যাঁ স্যার—ভাল করে একটু পাবলিসিটি দিতে পারলে—

ঠিক আছে তুমি যাও বুকিংয়ে—

অনিল পাল ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সৌরীন কুন্ডু তার ঘর থেকে উঠে স্টেজ বক্সে গিয়ে বসল।

এতদিন নাটকটা চলেছে কোনদিন এদিকে পা বাড়ায়নি।

বক্স থেকেই তার নজরে পড়ে, গম গম করছে একেবারে হাউস যেন।

তিলধারণের যেন স্থান নেই।

বসে বসে সৌরীন কুন্ডু অভিনয় দেখতে লাগল। নতুন ছেলেটির ও মেয়েটির অভিনয় যেন ভালই লাগে সৌরীন কুন্ডুর।

সেই চিরাচরিত লাউড্ অভিনয় নয়—অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করছে ছেলে ও মেয়ে দুটি।

ঠিক যেন ঘরোয়া পরিবেশে দু'জনে কথাবার্তা বলছে।

দর্শকরা নিঃশব্দে বসে শুনছে। হাততালি নেই—চেঁচামেচি নেই—

শেষ পর্যন্ত অভিনয়টা সে রাত্রে সৌরীন কুন্ডু দেখলো। বক্সে বসে বসেই দেখলো।

॥ ২ ॥

বুকিংয়ের অনিল পাল ছোকরাটি মিথ্যে বলেনি—

সত্যিই পরের বৃহস্পতিবার শোর ঘন্টাদুই আগেই হাউসফুল হয়ে গেল।

তারপরের শনি ও রবিবারও প্রত্যেকটি হাউস ফুল।

প্রতি রাত্রেই সৌরীন কুন্ডু ঐ রাতের পর অভিনয় দেখেছে—ভেবেছে এবং বুঝতে পেরেছে ঐ নতুন ছেলে-মেয়ে দুটির টিম ওয়ার্ক সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয়ই নাটকটি জমিয়ে দিয়েছে।

ব্যবসায়ী মানুষ সৌরীন কুন্ডু। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে—ব্যবসা সে বোঝে।

পাবলিসিটি অফিসার ফণি ঘোষকে ডেকে পাঠাল সৌরীন কুন্ডু—ঘন্টা দুই তার সঙ্গে পরামর্শ করল—তারপরই নাটকের পাবলিসিটি শুরু হলো।

অনিল মিথ্যে বলেনি, পাবলিসিটিতে কাজ হলো।

নাটক জমে গেল সত্যিই—যাকে বলে একেবারে রম্-রমা।

শুধু জমা নয়, গত দশ বছরে সৌরীন কুন্ডু অত পয়সা পায়নি...। সারাটা শহর জুড়ে কেবল ঐ নাটকের কথা সকলের মুখে মুখে।

মায়া-মঞ্চের নতুন নাটক—'প্রথম ও শেষ।'

মায়া-মঞ্চের সর্বপ্রধান অভিনেতা অশোক মুখার্জী কিন্তু মৃদু হেসে বলেছিল, ও কিছু না বাবা—স্রেফ মানুষ একটু হুজুক তুলেছে—ও দু'দিনেই ঠান্ডা হয়ে এলো বলে। দেখে নিও।

কিন্তু সেও যখন দেখলো নাটকের সেল কমা ত দূরে থাক আরো যেন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, তখন একদিন যেন কৌতূহলের বশেই ষ্টেজ বক্সে গিয়ে বসল অশোক।

প্যাক্ড্ হাউস।

পাকা অভিনেতা অশোক মুখার্জী—উনিশ বছর বয়সে ষ্টেজে এসেছিল আজ তার বয়স আটচল্লিশ পার হতে চলেছে।

বলতে গেলে একটা যুগ সে ষ্টেজ, নাটক ও অভিনয় নিয়েই আছে—আজ অভিনেতা হিসাবে তার নাম ও খ্যাতি মধ্য গগনে। তার নামেই আজ টিকিট বিক্রী হয়।

অশোক মুখার্জীর বুঝতে দেরি হয় না যে নাটকটি জমেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলবে আরো।

নাটকের টিম ওয়ার্কটি অদ্ভুত হয়েছে।

প্রত্যেকেই বলতে গেলে নতুন—সামান্য দু'চারজন পুরাতন অভিনেতা।

বিশেষ করে ঐ নতুন মেয়েটির অভিনয় যেন অশোককে সত্যিই মুগ্ধ করে।

মেয়েটি যেন স্বচ্ছন্দ এক ঝর্ণার মত আপন খুশিতে হেসে গেয়ে নেচে চলেছে মঞ্চের উপরে—কোন প্রয়াস বা কৃত্রিমতা নেই।

মেয়েটির বয়সও ত বেশী নয়। বড় জোর আঠার উনিশ হবে।

রোগা পাতলা চেহারা।

লম্বাও খুব নয়—পাঁচ ফুট ২।১ ইঞ্চির বেশী নয়। গায়ের রঙও কালোই বলতে হবে।

কিন্তু চোখ দুটি যেমন অপূর্ব—তার চাউনি ও ভঙ্গি তেমনি মিষ্টি।

আর গলার স্বরে যেন একটা আদি-রস ঝলকে উঠছে। কোন প্রয়াস কিছু নেই—সহজ স্বাভাবিক।

অভিনয় করে করে আজ কতকগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এমন আদি-রস ভরা গলার স্বর অশোক বুঝি ইতিপূর্বে কোন অভিনেত্রীর কণ্ঠেই পায়নি।

শ্রোতাদের যেন মুগ্ধ বিস্মিত করে রেখেছে মায়া।

অশোক বুঝতে পারে এ নাটক এখন চললো। রাতের পর রাত চলবে এ নাটক এখন অব্যাহত গতিতে।

এক সময় অভিনয় শেষ হলো।

একে একে দর্শকরা হল-প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। কিন্তু অশোক বসে থাকে।

আরো অনেকক্ষণ পরে অশোক ষ্টেজ বক্স থেকে বের হ'য়ে সোজা সৌরীন কুন্ডুর ঘরে এসে ঢুকল ধীরে ধীরে।

অনিল পাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সৌরীন কুন্ডুকে তখন বলছে, সামনের বৃহস্পতিবার হাউস ফুল হয়ে গেল স্যার। বুঝলেন স্যার—

আরো যেন কি বলবার ইচ্ছা ছিল অনিলের কিন্তু অশোককে ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল অনিল।

যাবার সময় আড়চোখে একবার তাকিয়ে গেল অশোকের মুখের দিকে।

সৌরীন কুন্ডু অশোকের মুখের দিকে তাকায়, এই যে অশোক কখন এলে?

অভিনয় দেখছিলাম—বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে বসল অশোক।

দেখলে নাটকটা?

প্রশ্নটা করে সৌরীন অশোকের দিকে আবার তাকায়।

হ্যাঁ—

সত্যি, আশাই করতে পারিনি পার্বিলিক এমন করে নাটকটা নেবে!

হুঁ। অশোক একটা সিগ্রেট ধরায়. সে যেন একটু অন্যমনস্ক।

সৌরীন কুন্ডু বলে, সেল যেমন দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এবার দু'পয়সা পাবো—

হুঁ।

সত্যি কথা বলতে কি অশোক, এ থিয়েটার লিজ্ নেওয়া অবধি এমন আমি সেল দেখিনি। আমি কি ভাবছি জানো।

কি?

কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীকে ত বসিয়ে রেখেছি—তাদের নোটিশ দিয়ে দিই।

সেটা কি ভাল হবে?

কিন্তু বসিয়েই বা কত দিন আর মাইনা দেবো। শুধু শুধু আসবে, যাবে আর মাইনে নেবে।

তা ঠিক।

তারপরই যেন একটু ইতস্ততঃ করে বলে সৌরীন কুন্ডু, তুমিও ত বলছিলে অশোক তোমার শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। কিছুদিন ছুটি পেলে ভাল হতো—তা আমি বলছিলাম কি—

অশোক সৌরিন কুন্ডুর মুখের দিকে তাকাল।

তুমিও বরং কিছুদিনের ছুটি নাও না।

ছুটি!

হ্যাঁ—যাও কোথাও ৬।৭ মাসের জন্য ঘুরে এসো। ছয় সাত মাসের মধ্যে ত নতুন নাটকের কথা যখন আর ভাববার প্রয়োজন হচ্ছে না—কি বল।

দেখি—

না—যাও। আরে বাবা—শরীরটা আগে—বুঝলে না—তোমাদের গিরীশ ঘোষই ত বলে গেছেন দেহপট সনে নট সকলি মিলায়—তা দেহটাই যদি ভেঙ্গে যায়—

বিজ্ঞের হাসি হাসে সৌরীন কুণ্ডু।

অথচ ঐ সৌরীন কুণ্ডুই কয়েক মাস আগে ছুটি নেওয়ার কথায় অশোককে বলেছিল, বল কি ছুটি নেবে! তার চাইতে গলায় আমার পা দিয়ে চলে যাও না কেন।

এখন সেই সৌরীন কুণ্ডুর গলাতেই অন্য সুর।

হাতের সিগারেটটায় কয়েকটা টান দিয়ে অশোক মৃদু কণ্ঠে ডাকে, দেখ সৌরীন—

কিছু বলছো?

সৌরীন অশোকের মুখের দিকে তাকায়।

বলেছিলাম কি—

কি বল ত?

তোমার এই নাটকে ঐ যে স্মাগলারের রোলটা আছে—

হ্যাঁ-হ্যাঁ চমৎকার করেছে ছেলেটি। নতুন ছেলে, অথচ—

পার্টটার মধ্যে জিনিস আছে—তেমন করে অভিনয় করতে পারলে নাটকে একটা ক্যারেক্টার সৃষ্টি করা যায়—

ছেলেটি অভিনয় করছে সত্যিই ভাল—তাই না?

হুঁ—তবে আরো ভাল হতে পারত। ভাবছি—

কি?

ঐ রোলটা আমি করবো।

তুমি!

হ্যাঁ—অভিনয় দেখতে দেখতে ঐ কথাটাই ভাবছিলাম—বুঝলে রোলটার মধ্যে এমন একটা আবেগ এমন একটা ডেপ্থ আছে—যেটা হয়ত সত্যিকার অভিনয় করতে পারলে একটা বৈচিত্র্যের চমক—

কিন্তু—সত্তর রজনী পার হয়ে গেল। আজ—এ সময় টিম ভাঙ্গা কি উচিৎ হবে?

অশোক যেন আশ্চর্য্য হয়েই সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকায়।

তার মত একজন অভিনেতা সামান্য একটা সাইড্ রোল স্বেচ্ছায় করতে চাইছে, অথচ—

সৌরীন কুণ্ডু ইতস্ততঃ করছে।

অবিশ্যি রোলটা করলে তুমি একটা হৈ হৈ পড়ে যাবে জানি—কিন্তু—জমা জিনিস—সৌরীন আমতা আমতা করে বলে আবার।

আরো জমিয়ে দেবো বুঝলে? তুমি পোস্টার কালই ছাড়—তাহলে সেই কথাই রইলো বুঝলে—কাল, পরশু দুদিন একটু রিহার্সেল দিয়ে নেবো তারপর বৃহস্পতিবারের শোতে নামব।

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়াল অশোক।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

শো অনেকক্ষণ ভেঙ্গে গিয়েছে—অভিনেতারাও যে যার চলে গিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নেমে কম্পাউন্ড পার হয়ে অশোক রাস্তায় এসে নামল।

শীতের রাত—দশটা বেজে গিয়েছে।

গাড়ি, ট্রাম, বাস চলছে বটে তবে মানুষজনের ভিড় কমে এসেছে।

অন্যান্য দিন অশোক ট্যাক্সিতে চেপেই বাসায় যায় আজ কিন্তু কোন ট্যাক্সি নিল না।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই এগিয়ে চলল।

বাগবাজারে বাসা।

থিয়েটার থেকে খুব একটা দূর নয়।

বার বার যেন ঐ মায়া মেয়েটির যৌবনোচ্ছল দেহবল্লরী তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

দেহের কি লীলায়িত ভঙ্গি।

হাঁটা-চলা কথা বার্তা—প্রতিটি মুভমেন্টের মধ্যে যেন অপূর্ব এক যৌবন-সুষমা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছিল। আর কি আদি-রসাত্মক কণ্ঠস্বরটি।

সেই সুনন্দ ডাকটি—যেন এখনো দু'কান ভরে বাজছে।

অভিমানের সেই সিন্‌টি—চাপা কণ্ঠস্বরে মৃদু বেদনার অভিমান জড়ানো কথাগুলো যেন সত্যিই শিহরণ তুলছিল শুনতে শুনতে অশোকের সারা দেহে।

স্ত্রীলোক সম্পর্কে অশোকের কোন দিনই কোন প্রেজুডিস্ নেই—মঞ্চে ও ছায়া-ছবিতে অভিনয় করতে করতে আজ পর্যন্ত তার জীবনে বহু মেয়েই এসেছে, আবার চলে গিয়েছে।

কাউকে দুদিন, কাউকে হয়ত দশদিন নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছে কিন্তু কই মনে ও পড়ছে না অশোকের কেউ আজ পর্য্যন্ত তার মনের মধ্যে সত্যিকারের কোন তৃষ্ণা জাগিয়েছে।

অথচ ঐ মায়া মেয়েটি—

কি অদ্ভুত আর্কষণ মেয়েটির।

নাটকে ঐ মেয়েটিই প্রাণ!

মৌচাকের ঐ মক্ষীরাণী। ওকে ঘিরেই উৎসব। নাটকের বর্তমান সাফল্যের মূলে ঐ মায়া মেয়েটিই।

মায়া—কি যেন মেয়েটির পুরো নাম!

মায়া শিকদার।

প্রথম দিন মেয়েটিকে দেখে অশোকের মনে হয়েছিল অত্যন্ত সাধারণ—অত্যন্ত তুচ্ছ একটা মেয়ে।

রোগা—কালো—চোখে-মুখে একটা বোকা বোকা ভাব।

অদ্ভুত শান্ত—যেন প্রাণহীন।

ঐ মেয়েটিই তরুণী নায়িকার রোল করছে শুনে সেদিন হেসে উঠেছিল অশোক সৌরীন কুন্ডুর সামনেই।

বলেছিল, সুইসাইডিং পলিসি—

অন্যান্য যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও হেসেছিল। সমর্থনই করেছিল তাকে।

অথচ সেই মেয়েটিকেই আজ মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় যেন সম্পূর্ণ অন্য মনে হয়েছিল।

মনে হয়েছিল ও যেন অনন্ত-যৌবনা।

পুরুষের মনে ওরাই জাগিয়েছে তৃষ্ণা চিরদিন সত্যিকারের। ওদের জন্যই বুঝি পুরুষ পাগল হয়েছে, যেমন ঐ নাটকের তরুণ নায়ক সুনন্দ হয়েছে।

সুনন্দ আর জয়তী—

আর তাদের মাঝখানে ঐ স্মাগলার লোকটি—ভবানীশঙ্কর।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি নাটকে ভবানীশঙ্করের জয়—অর্থের বিনিময়ে সে-ই একদিন কিনে ছিনিয়ে নিয়ে গেল জয়তীকে।

ভালবাসার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু দেহটাই পেল বটে জয়ন্তীর ভবানীশঙ্কর—জয়তীকে পেল না।

জয়তীর যে দেহের মধ্যে প্রাণ একদিন কানায় কানায় উছলে উঠছিল আজ ভবানীশঙ্করের মনে হলো সেই জয়তীকে ঘরে এনে তার ওপর আধিপত্য করার পর—ও বুঝি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

মরা জয়তী।

মৃত—নিস্পন্দ—পাথর জয়তী।

রাতের পর রাত—তারপর ভবানীশঙ্করের মৃত জয়তীকে নিয়ে শব-সাধনা —অবশেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে থামল ভবানীশঙ্কর। জয়তীকে বললে, বেব হয়ে যাও—আমার বাড়ি থেকে তুমি বের হয়ে যাও।

জয়তী যেন ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না—তার উপলব্ধিকে স্পর্শ করছে না ব্যাপারটা—সে কেমন যেন বোবা অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভবানীশঙ্করের দিকে।

ও তো জানে না—ভবানীশঙ্কর আজ হেরে গিয়েছে।

দুর্দান্ত বেপরোয়া স্মাগলার ভবানীশঙ্কর— যাকে পুলিশ কোনদিন ধরতে ছুঁতে পারেনি সকলের চোখের উপর দিয়ে যে নির্ভীক ভাবে এগিয়ে গিয়েছে—সে আজ সামান্য একটা মেয়ের কাছে হেরে গেছে।

যে মানুষটা কখনো কিছুতে ব্যর্থকাম হয়নি—চিরদিন মুঠো ভর্তি করে পেয়েছে, আজ তারই পরাজয় ঘটেছে ঐ তুচ্ছ একটা মেয়ের কাছে।

জয়তীর কাছে আজ তার হার হয়েছে।

আজ যেন সে প্রথম উপলব্ধি করলো স্মাগলার ভবানীশঙ্কর জীবনের সব চাইতেই বড় স্মাগলিংয়েই সে ফাঁকিতে পড়েছে।

হঠাৎ আপন মনেই পথ চলতে চলতে অশোক হেসে ওঠে।

বোকা। ভবানীশঙ্কর বোকা। আর তাই সে জয়তীর মধ্যে মৃত্যুকে ডেকে এনেছে।

সে জানে জয়তীকে বাঁচাবার মন্ত্র!

একটা হোঁচট খেল অশোক।

আর এতক্ষণে তার প্রথম খেয়াল হলো—বাড়ির পথে না গিয়ে সে এতক্ষণ উল্টো পথে হেঁটে এসেছে।

সৌরীন কুন্ডু কিন্তু অশোকের সে রাত্রের প্রস্তাবটা নাকচ করতে পারল না।

অশোককে চটাবার মত সাহস তার ছিল না।

মঞ্চজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট—আজ না হলেও দুদিন বাদে আবার তাকে প্রয়োজন হবে—যে কারণেই হোক বর্তমান নাটকটি জমে গেছে বলেই—ওদের নিয়ে পরবর্তী নাটকও যে জমবে তার কোন গ্যারান্টিও নেই।

কে বলতে পারে এ নাটকটা হয়ত একটা স্রেফ এ্যাক্সিডেন্ট!

সৌরীন কুন্ডু পরের দিনই থিয়েটারে এসে পোস্টারের ব্যবস্থা করল। অশোকের নামে পোস্টার পড়ল।

এবং নির্দিষ্ট দিনে অশোক ভবানীশঙ্করের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

দর্শকরা একটা প্রত্যাশা নিয়ে সে রাত্রে শো দেখতে এলো। কিন্তু দেখা গেল—নাটক যেন সে রাত্রে তেমন জমলই না।

অশোক সমস্ত প্রাণ দিয়ে অভিনয় করছিল তবু যেন জমলো না নাটক।

প্রেক্ষাগৃহে একটা গুঞ্জন ওঠে।

কোন মতে সে রাতটা কাটল।

পরের রাত্রে অশোক আরো সতর্ক হয়ে তার সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে অভিনয় করে—কিন্তু তবু নিজেই যেন বুঝতে পারে নাটক জমছে না।

নিজে নিজেই অশোক বিশ্লেষণ করে—বুঝবার চেষ্টা করে কেন জমছে না নাটক।

অভিনয়ে কোথায় ক্রটি! ঘাটতি কোথায়!

আরো তিন রাত্রি চলে গেল।

কাগজে কাগজে তার অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরুল—ভবানীশঙ্কর অশোকের জীবনের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

অভূতপূর্ব অভিনয়-স্বাক্ষর।

কিন্তু অশোক নিজে বুঝতে পারে সে যা মনে মনে আশা করেছিল তা হচ্ছে না।

মনের মধ্যে যে রূপটি সে কল্পনা করেছিল অভিনয়ে সেটা সে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না।

কিন্তু কেন—কেন তা সে পারছে না।

অকস্মাৎ সে যেন আবিষ্কার করে—তার ব্যর্থতার মূলে রয়েছে মায়া।

মায়া তার পার্শ্ব-অভিনেত্রী—শুধু তাই নয়, নাটকে তার যে সব দৃশ্যগুলি সবচাইতে জমাট হয়ে উঠবার কথা সে সব দৃশ্যেই মায়া উপস্থিত।

মায়ার সঙ্গেই তার অভিনয়।

বিশেষ করে ঐ দৃশ্যগুলোই যেন বিশেষ করে ঝুলে যাচ্ছে! কেমন প্রাণহীন জলো হয়ে যাচ্ছে।

কেমন যেন নিরুত্তাপ। মন্থর—শিথিল।

ষ্টেজবক্সে বসে বসে মায়ার মধ্যে যে অভিনয়-প্রতিভা—অভিনয়ের মধ্যে যে প্রাণসঞ্চার দেখেছিল—ক্ষণে ক্ষণে তার চোখের মুখের ভাবের পরিবর্তন, লীলাচাঞ্চল্য তাকে নেশার মত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তার যে কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না মায়ার মধ্যে।

যে দুর্বার আর্কষণ তাকে মায়ার প্রতি নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল তার কিছুই যেন সে পাচ্ছে না মায়ার অভিনয়ের মধ্যে।

জয়তী যেন প্রথম দৃশ্য থেকেই মৃতা।

একটা প্রাণহীন চরিত্র যেন মঞ্চে তার সঙ্গে নড়ে চড়ে কথা বলে যাচ্ছে, হেসে যাচ্ছে মাত্র।

॥ ৪ ॥

সেদিন অভিনয়ের পর অশোক ডেকে পাঠাল মায়াকে তার সাজঘরে ড্রেসার অমূল্যকে দিয়ে।

মায়া এসে হাজির হলো।

দরজার ওপাশ থেকে তার গলা শোনা গেল, অশোকবাবু আপনি আমাকে ডেকেছেন?

অশোক তখনো তার মেক্‌আপ তোলেনি—শেষ দৃশ্যের পোষাক ছাড়েনি—ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে একটা সিগ্রেট টানছিল।

ক্ষণে ক্ষণে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হচ্ছিল।

অস্থির একটা আক্ষেপে যেন মধ্যে মধ্যে মাথার বড় বড় এলোমেলো তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলো টানছিল।

পায়চারি থামিয়ে বললে, ভিতরে এসো।

মায়া ভিতরে এসে দাঁড়াল।

শোন, তোমার অভিনয় এরকম হচ্ছে কেন?

আজ্ঞে—

মায়া অশোকের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

বলছি আজ কয়দিন থেকে তোমার অভিনয় আগেকার মত হচ্ছে না কেন? কোন প্রাণ নেই, কোন কিছু নেই।

আমি ত যেমন আমাকে শেখানো হয়েছিল তেমনিই অভিনয় করছি—

শেখানো হয়েছিল তোমাকে !

হ্যাঁ—

মিথ্যা কথা বলো না—তুমি জাত-অভিনেত্রী—তোমাকে কারো অভিনয় শেখাতে হয় না—

আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না—

আই ওয়ান্ট সিন্‌সিয়ার কো-অপারেশন্—সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই তোমার অভিনয়ের সময়—

আমি—

শোন, অভিনয়ে তোমার যে চরিত্র তাতে তোমায় আরো প্যাসোনেট্—আরো সেকস্ এপিলিং হতে হবে। আই মীন—বুঝতে পারছো তুমি আমার কথাটা।

মায়া চুপ করে থাকে। মাথা নীচু করে থাকে।

আমার সঙ্গে অভিনয় করতে কি তোমার ভয় হয় ?

না—

তবে—অমন প্রাণহীন অভিনয় করছো কেন?

আপনি বিশ্বাস করুন আমি আমার যথাসাধ্যই করবার চেষ্টা করি কিন্তু—

কিন্তু কি?

আপনার মধ্যে যেন আমি—

বল থামলে কেন?—

অলক্তর মধ্যে—তার অভিনয়ের যে আবেগ আমি পেতাম সেটা যেন আমি এখন পাচ্ছি না।

অলক্ত!

হ্যাঁ—আপনার আগে যে ভবানীশঙ্কর করছিল—

হুঁ—

কিছুক্ষণ আবার পায়চারি করলো অশোক তারপর ওর মুখের দিকে তাকাল, মায়া—

বলুন।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর কনফেসন্। তোমার স্পষ্টবাদীতায় সত্যিই আমি খুশি হয়েছি।

তারপরই একটু মৃদু হাসলো।

প্রশ্রয়ের হাসি।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন মায়া—বোস—বোস ঐ চেয়ারটায়—

মায়া বসে না—দাঁড়িয়েই থাকে।

বোস—

ঐ সময় থিয়েটারে ভৃত্য কালী কাপে করে গরম কফি নিয়ে এলো।

অভিনয়ের মধ্যে এক কাপ গরম কফি পান করা অশোকের বহুদিনকার অভ্যাস।

কফি খাবে মায়া? অশোক জিজ্ঞাসা করে

না—মায়া মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

বোস না—

মায়া এবার বসল চেয়ারটায়।

কালী কফির কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল, কাপটা হাতে তুলে নিল অশোক।

কাপে একটা চুমুক দিল।

অনেকেই জানত অশোক অভিনয়ের সময় এতটুকু মদ্যপান করে না যদিও মদ্যাপানের ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা দুষ্কর।

কিন্তু অনেকেই জানত না ঐ কফি পানই ছিল তার মদ্য পান। কফির সঙ্গে থ্রি এক্স রাম মিশিয়ে দিয়ে যেতো কালী অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে।

বোতলটা কালীর জীন্মাতেই থাকত।

কাপে আর একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে পুনরায় মায়ার দিকে তাকিয়ে ডাকে অশোক, মায়া—

বলুন—

কত দিন তুমি অভিনয় করছো?

এখানে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে মধ্যে মধ্যে এ্যামেচার ও অফিস ক্লাবে দু'চার বার অভিনয় করেছি—

ব্যাস!

হ্যাঁ—

তাহলে বলবো তুমি জন্ম অভিনেত্রী, অভিনয়ের একটা প্রতিভা নিয়েই তুমি জন্মেছো, কর্ণের সহজাত কবচ-কুন্ডলের মত। এতকাল আমি স্টেজে আছি কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জেনো, তোমার মত এমন অভিনয়-প্রতিভা ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি—

মায়া মৃদু হাসে।

আমি বলছি একদিন তুমি স্টেজ জ্বালিয়ে দেবে তোমার অভিনয় দিয়ে। ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী-সম্রাজ্ঞী তুমি।

মায়া মাথা নীচু করে।

তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—বাড়ি যেতে হবে—

ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাবো। তোমার বাড়ি কোথায়? কোথায় থাকো তুমি?

নেতাজী কলোনীতে—

কোথায় সেটা—

বেলগাছিয়ায়—

আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবোখন। বাড়িতে কে কে আছে তোমার?

মা—বাবা—আর ছোট দুটি ভাই বোন।

বাবা কি করেন?

বাবা প্যারালিসিসে পঙ্গু হয়ে আজ চার বছর প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

বল কি—তাহলে বোধহয় তুমিই ফ্যামিলির একমাত্র আরনিং মেম্বার?

হ্যাঁ—লেখাপড়া ত শিখতে পারিনি—অভিনয় করে যা পাই তাই দিয়েই কোন মতে সংসার চলে—

মাসে কত দেয় তোমাকে সৌরীন?

এসেছিলাম সত্তর টাকায়, গত মাস থেকে মাসে একশ' করে দিচ্ছেন।

মাত্র একশ। দাঁড়াও আমি কালই বলবো সৌরীনকে—

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে পোযাক বদলে নিচ্ছিল অশোক। পায়জামা—পাঞ্জাবী—মুখের মেকআপও তুলে নিয়েছিল।

কালী এসে ঐ সময় দরজার ফাঁকে উঁকি দেয়—

কিরে কালী!

ট্যাক্সী এসে গেছে—

যা আমি আসছি—চল মায়া—

মায়া উঠে দাঁড়াল।

॥ ৫ ॥

দুজনে সাজঘর থেকে বেরুতেই প্যাসেজে অলক্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অলক্ত মায়ার অপেক্ষাতেই প্যাসেজে দাঁড়িয়েছিল তখন।

রোজ সে-ই অভিনয়ের শেষে মায়াকে তার গৃহে পৌঁছে দেয়—আগে বরাবর অভিনয়ের শেষে অলক্ত মায়ার জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু কিছুদিন থেকে অশোক তার পার্টটা করায় সে বসে আছে—কোন পার্ট নেই তার—তাহলেও সৌরীন কুণ্ডু তাকে ছাড়েনি, মাইনা দিয়ে যাচ্ছে।

রোজই সে থিয়েটারে আসে এবং অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর অভিনয়ের শেষে মায়াকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাসায় যায়।

সেও মায়াদের বাড়ির কাছাকাছি থাকে—পাতিপুকুরে।

অলক্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যেন মায়ার ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়। থমকে দাঁড়ায় সে।

কি বলবে, কি করবে যেন বুঝতে পারে না।

কিন্তু অলক্তই কথা বলে, বাড়ি যাবে না মায়া?

একটু বুঝি ইতস্তঃত করে সে—কি বুঝি বলবার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই অশোকের ব্যাপারটা নজরে পড়ে গিয়েছিল, সে-ই বলে, আমি ওকে পৌঁছে দিচ্ছি—এসো মায়া—

মায়া মাথা নীচু করে।

অশোক এগিয়ে যায়—মায়া তাকে অনুসরণ করে।

পরের দিন মায়া থিয়েটারে নিজের মেকআপ রুমে বসে মেকআপ নিচ্ছে, সৌরীন কুণ্ডুর গলা শোনা গেল—

মায়াদেবী—

কে?

আমি সৌরীন কুণ্ডু—

আসুন—আসুন—

সৌরীন কুণ্ডু এসে ঘরে ঢুকল, অশোককে আপনার মাইনের কথা বলতে গেলেন কেন, আমি ত ঠিক করে রেখেছিলাম সামনের মাস থেকে আপনার মাইনে আরো কিছু বাড়িয়ে দেবো—

মায়া বিব্রত বোধ করে। বলে, আমি ত তাকে—

আপনাকে সামনের মাস থেকে দুশো করে দেবো। খুশি ত—

মায়া কোন জবাব দেয় না।

সৌরীন কুণ্ডু সংবাদটা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিন্তু মায়া সত্যিই খুশি হয়—এবার একেবারে ডবল—দুশো টাকা করে সে পাবে—যাক এবার আর তত অভাব থাকবে না।

বাবার ঔষধপত্র কেনা যাবে।

ভাই বোন দুটিকেও আবার স্কুলে ভর্তি করা যাবে।

সত্যি, অশোকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা তার ভরে ওঠে।

অশোককে ধন্যবাদ একটা জানানোর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সে।

সে রাত্রেও অভিনয়ের শেষে অশোকের ঘর থেকে তার ডাক এলো।

তাড়াতাড়ি মেক্‌আপ তুলে বেশ বদল করে মায়া অশোকের সাজঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ভিতরে আসবো—

কে মায়া—এসো, এসো—

সামনে কফির কাপ রাম মিশ্রিত—আয়নার সামনে বসে মেক্‌আপ তুলতে তুলতে অশোক মধ্যে মধ্যে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল।

আমাকে ডেকেছিলেন?

বোস—

মায়া আজ আর ইতস্ততঃ করে না। চেয়ারটায় বসে পড়ে।

হ্যাঁ—ফিল্মে অভিনয় করবে?

ফিল্ম!

হ্যাঁ—রোলটা অবিশ্যি ছোট, দিন তিনেকের কাজ—

করবো—

ঢোক এ লাইনে—তারপর তোমার পার্টস আছে—তুমি ঠিক ফিল্ম লাইনেও জায়গা করে নিতে পারবে—তিন দিনের জন্য তোমাকে তিনশ টাকা দেবে।

আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো অশোকবাবু—

অশোক হাসি মুখে ফিরে তাকাল মায়ার দিকে, ধন্যবাদটা এখন তোলা থাক মায়া।

মায়া খুশি ও লজ্জায় মাথা নীচু করে।

অশোক আবার বলে, তাহলে কাল দুপুরে তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো—

কাল!

হ্যাঁ—কালই তোমাকে স্টুডিওতে যাবার পথে তুলে নিয়ে যাবো।

দুপুরে কখন?

বেলা বারোটা নাগাদ।

থাকবো।

সে রাত্রেও দুজনে বেরুতেই অলক্তকে দেখতে পেল।

আজ কিন্তু অলক্তকে দেখে মায়া এতটুকু বিব্রত বোধ করল না বা সংকোচ বোধ করল না।

একি—অলক্ত—তুমি দাঁড়িয়ে আছো বুঝি—আমি ত অশোবাবুর সঙ্গে যাচ্ছি—

মায়াই বলে ওঠে নিজের থেকে।

অলক্ত একবার মায়ার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিন্তু কোন সাড়া দিল না।

এসো মায়া—

অশোক ডাকে।

চলুন—

এগিয়ে যায় দুজনা পাশাপাশি।

অলক্ত দাঁড়িয়েই থাকে।

প্যাসেজের মৃদু আলোয় অশোক ও মায়া তার সামনে থেকে মিলিয়ে যায়।

প্যাসেজের পরেই কাঠের সিঁড়ি।

ওদের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

সবাই প্রায় চলে গিয়েছে তখন।

নীচে সিফ্‌টাররা দু তিনজন মঞ্চের উপর সিনগুলো সব গুছিয়ে রাখছে।

শূন্য মঞ্চ।

টিম্‌টিম্‌ করে একটা আলো জ্বলছে।

অলক্ত ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

বুকের মধ্যে একটা জ্বালা যেন সে অনুভব করছিল।

মায়ার সঙ্গে তার পরিচয় আজকের নয়।

পাড়ায় তাদের একটা থিয়েটার ক্লাব ছিল—ও আর প্রদীপ দু'জনে মিলে গড়ে তুলেছিল সে ক্লাব।

এপাড়া ওপাড়া থেকে সব ছেলে মেয়েদের সংগ্রহ করে মধ্যে মধ্যে অভিনয় করত। বলতে গেলে মায়ার অভিনয়ের হাতে খড়ি তাদের 'নিশান' ক্লাব থেকেই।

সুরম্য নাট্যকার আর প্রদীপ ছিল পরিচালক ক্লাবের।

প্রদীপের সঙ্গে সৌরীন কুন্ডুর কি করে যোগাযোগ হয়েছিল অলক্ত জানে না।

তবে মাঝখানে সুরম্য শুনেছিল প্রদীপ মায়া-মঞ্চে চাকরি পেয়েছে—একস্ট্রা হিসাবে মাইনে পাচ্ছে বর্তমানে।

হঠাৎ একদিন ক্লাবে গিয়ে অলক্ত দেখে খুব হৈ হৈ হচ্ছে।

প্রদীপ ও সুরম্যকে ঘিরে সবাই ঘনিষ্ঠ হয়ে পরম উৎসাহের সঙ্গে নানা কথা বলছে।

এমনিতে চিরদিন মুখচোরা টাইপের ছেলে সুরম্য—বেশী কথা কোন দিনই বলতো না, মুচকি মুচকি কেবল হাসত।

সেদিন যেন সুরম্য অকস্মাৎ বাচাল হয়ে উঠেছিল।

অনেক কষ্টে জানতে পারলে অলক্ত সুরম্যর যে নাটকটা সামনের পুজোয় অভিনয় করা হবে বলে লেখা হয়েছিল সেই নাটকটাই নাকি মায়া-মঞ্চে অভিনীত হবে—শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই ঐ নাটকে অভিনয়ের চান্স পাচ্ছে।

কটা দিন তারপর কি উত্তেজনা ক্লাবের সকলের ওদের।

কূপের মূষিক হঠাৎ সাগরে গিয়ে যেন পড়েছে।

ক্লাবের পান্ডা প্রদীপ আর অলক্ত।

প্রদীপ ত আগেই মায়া-মঞ্চে চাকরি করছিল অভিনয় না করলেও সৌরীন কুন্ডু আরো অনেককে ও সেই সঙ্গে মায়াকেও ডেকে নিল। এবং মায়াকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে ওদের দুজনারই প্রচেষ্টা ছিল। প্রদীপ ও অলক্ত!

আজ সেই মায়াই তাকে এড়িয়ে গেল।

অলক্তর চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছিল।

মঞ্চের নামী অভিনেতা অশোকবাবুর দৃষ্টি আজ মায়ার উপর পড়েছে, তাই মায়া আজ অলক্তকে ভুলে গিয়েছে।

মায়া হয়ত আজ নতুন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু মায়া কি জানে না ঐ অশোকবাবু কি চরিত্রের লোক!

ভাল অভিনেতা সে হতে পারে, কিন্তু মদ্যপ—চরিত্রহীন।

সকলেই জানে লোকটা একের নম্বরের লম্পট।

মায়াও যে শোনেনি কথাটা তা তো নয়।

এখন অলক্ত বুঝতে পারছে তাকে নাটক থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে অশোক তার ঐ চরিত্রে অবতীর্ণ হবার পশ্চাতে ঐ মায়াই।

মায়ার উপরে নজর পড়েছে অশোকবাবুর তাই সে কৌশলে ঐ কান্ডটা ঘটিয়েছে—এই সুযোগে সে মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে।

আর কার্যত তাই দেখা যাচ্ছে।

প্রথমে আক্রোশ হয় অলক্তর তারপর হয় অভিমান।

ঠিক আছে, মায়া যদি তার ভালটা না বোঝে, নিজের ধ্বংস নিজে টেনে আনে ত আনুক।

অশোকবাবুর সখ মিটে গেলেই সে মায়াকে ছেঁড়া জুতোর মত আবার একদিন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ওদের মত লোকের সখ মিটতে আর কয়দিন!

দু'দিনেই সখ মিটে যাবে। মায়ার প্রয়োজনও ওর কাছে ফুরিয়ে যাবে তখন।

অলক্ত সেই রাত্রেই মন-স্থির করে মায়ার ব্যাপারে আর সে মাথা ঘামাবে না! মায়া যা খুশি করে করুক!

আরো দুটো মাস কেটে গেল।

অলক্ত থিয়েটারে যায় আসে—কোন কাজ কর্ম নেই, উইংসের পাশে বসে বসে অভিনয় দেখে, তারপর এক সময় থিয়েটার শেষে বাড়ি ফিরে আসে হাঁটতে হাঁটতে।

মায়ার সঙ্গে অশোকের আরো ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

থিয়েটারে শেষে এক সঙ্গে বাড়ি ফেরে।

কোন কোন দিন দু'জনে এক সঙ্গেই থিয়েটারে আসে।

নাটকের সেল বেশ ভালই। মনে হয় শত রজনী গৌরবের সঙ্গে পার হয়ে যাবে।

অশোকের সঙ্গে মায়ার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা থিয়েটারে সকলেরই চোখে পড়ে।

থিয়েটারের পুরানো লোকেরা আড়ালে চোখ টিপে হাসাহাসি করে।

মায়ার যে সেটা নজরে পড়ে না তাও নয়—কিন্তু মায়ার যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই সে জন্য।

মায়া ইতিমধ্যে দু'একটা ছবিতে অশোকের জন্য ছোটখাটো চান্সও পেয়েছে। মায়ার মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা যায় যেন।

মায়া যেন আগের সেই লাজুক নম্র শান্ত মায়া আর নেই।

ভাল করে সবার সঙ্গে আজকাল আর সে কথাও বলে না।

কারো সঙ্গে মেশেও না।

যা কিছু তার মেলামেশা ঐ অশোকের সঙ্গেই।

অলক্ত দূরে দূরেই থাকে—মায়ার ধারে কাছেও আসে না।

কিন্তু একদিন অকস্মাৎ প্রদীপের সঙ্গে খিটিমিটি বেধে যায় মায়ার।

প্রদীপ মায়াকে বলে, মায়া তোর অভিনয় দিন দিন ডেটোরিয়েট্ করছে—

মানে?

মায়া গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকাল প্রদীপের দিকে।

এর আগের সিনটা তুই ঐ ভাবে নষ্ট করলি কেন?

নষ্ট আমি করিনি—করেছো তুমি প্রদীপদা—

কি বললি?

হ্যাঁ—যেভাবে আজ ঐ সিনটা আমি অভিনয় করলাম ওটাই কারেক্ট—

না।

হ্যাঁ—

হুঁ—তাহলে আজকাল অশোকবাবুর কাছে নতুন করে অভিনয়ের পাঠ নিচ্ছিস তুই—

প্রয়োজন হয়েছে তাই নিয়েছি—ভুলো না অশোকবাবুর পায়ের তলায় বসে এখনো দশ বছর তুমি অভিনয় শিখতে পারো প্রদীপদা—

হঠাৎ প্রদীপ উত্তরে বলে বসে, তাই বুঝি তার সঙ্গে রোজ রাত্রে তার বাড়িতে অভিনয়ের পাঠ নিতে যাস?

যাই ত—তাতে তোমার কি?

ভাল—ভাল—তা অভিনয়েরই পাঠ নিস, না আরো কিছুর পাঠ নিস?

মুখ সামলে কথা বলো প্রদীপদা—

কেন তোর ভয়ে, না তোর অশোকবাবুর ভয়ে? প্রদীপ গুহ তোদের ভয় করে না বুঝলি? কথাটা বলে প্রদীপ আর দাঁড়ায়নি।

কিন্তু কথাটা ত মিথ্যে নয় একেবারে।

মায়াকে আজকাল প্রায়ই অশোক তার ফ্ল্যাটে রাত্রে অভিনয়ের শেষে নিয়ে যায় এবং বাসায় ফিরতে তার কোন কোন দিন অনেক রাত হয়ে যায়।

মায়ার মা মৃন্ময়ী দেবীও মেয়েকে প্রশ্ন করেছিল, এত রাত করে ফিরিস কেন? থিয়েটার ত সাড়ে নয়টাতেই ভেঙ্গে যায় শুনেছি।

মায়া জবাব দিয়েছে, থিয়েটার ভাঙ্গলেই ত থিয়েটারের কাজ শেষ হয় না—অনেক সময় আবার

রিহার্সেল দিতে হয়—তাই রাত হয়ে যায়।

মৃন্ময়ী অত শত বোঝে না—ভাবে—হবেও বা।

কিন্তু মায়ার পঙ্গু বাবা রাধানাথ রাত্রে মেয়ের মধ্যে মধ্যে অত দেরি করে বাসায় ফেরাটা ভালভাবে নিতে পারে না।

স্ত্রীকে বলে, বয়সের মেয়ে—এত রাত করে ফেরে।

কিন্তু সাহস করে কড়া কথা বলতে পারে না মেয়েকে—আজ মেয়ের আয়েই সংসার চলছে—নিজে আজ সে পঙ্গু—একটা পয়সা আনবার ক্ষমতা তার নেই আজ।

সম্পূর্ণ ভাবেই মেয়ের মুখাপেক্ষী তারা।

॥ ৭ ॥

এমনি যখন পরিস্থিতি তখনই ঠিক ব্যাপারটা ঘটলো

সকালবেলা থিয়েটারের জমাদার সুখলাল সাজঘর পরিষ্কার করতে এসে মায়ার সাজঘরে ঢুকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দরজাটা ঠেলে।

মায়ার সাজঘরটা ছিল আলাদা। ভিতরের দিকে—ছোট ঘরটা।

সাজঘরের মেঝেতে মায়ার মৃতদেহটা পড়ে আছে।

প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় সুখলাল যেন কয়েকটা মহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিল তারপরই অস্ফুট একটা চিৎকার করে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বেলা তখন খুব বেশী হয়নি—সকাল সাড়ে সাতটা মাত্র। টিকিট ঘর তখনো খোলেনি।

লোকজনের মধ্যে থিয়েটারে তখন দু'জন দারোয়ান—জমাদার সুখলাল ও কেয়ারটেকার বোবাবাবু অর্থাৎ লোকনাথ।

বোকাবাবু সৌরীন কুণ্ডুরই কি এক রকম দূর আত্মীয়ের ছেলে। ভাল নাম লোকনাথ।

বিশেষ লেখাপড়া করেনি—সাদা-সিধে হাবাগোবা মানুষ—

থিয়েটারেই সে সর্বক্ষণ থাকে— কেবল দু'বেলা খাবার জন্য কিছু সময়ের জন্য বাইরে যায়।

বোকা ঘুম থেকে উঠে বাইরের লবিতে দাঁড়িয়ে একটা দাঁতন নিয়ে দন্ত ধাবন করছিল।

সুখলাল হাউ হাউ করে সেখানেই এসে পড়ে বোকাবাবুকে বলে, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে বোকাবাবু।—

সর্বনাশ! কি হয়েছে?

মায়া দিদিমণি—

মায়া দিদিমণি, কি হয়েছে তারা?

চল শিগ্‌গিরী দেখবে চল—মায়া দিদিমণি নেই—

নেই?

হ্যাঁ—মরে গেছে।

কি পাগলের মত যা-তা বকছিস!

ভয়ে উত্তেজনায় সুখলাল তখন ভাল করে—স্পষ্ট করে সব কথা বলতে পারছে না, কথাগুলো তার জড়িয়ে জড়িয়ে যায়।

বোকাবাবু, কি হবে?

কোথায় দেখেছিস তুই মায়া দিদিমণিকে?

তার সাজঘরে।

সেকি! সাজঘরে!

হ্যাঁ—

চল, দেখি—

বোকাবাবু এগিয়ে যায় স্টেজের দিকে—সুখলাল ওর পিছনে পিছনে যায়।

বোকাবাবু মায়ার সাজঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়।

সত্যিই মায়া পড়ে আছে তার সাজঘরের মেঝেতে চিৎ হয়ে।

চোখ দু'টো ঠেলে বের হয়ে এসেছে যেন—মুখটা সামান্য হ্যাঁ করা, কষ বেয়ে পড়েছে খানিকটা

রক্ত মিশ্রিত লালা।

একটা মাছি মুখের উপরে উড়ছে।

শুধু তাই নয়—সবচাইতে যেটা বেশী আশ্চর্য করে বোকাবাবুকে, গত রাত্রের থিয়েটারের মেক আপ্ পর্যন্ত তখনো মায়ার মুখে লেগে রয়েছে।

পরনে সেই লাস্ট সিনের নীল রংয়ের সিল্কের শাড়িটা—কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর।

বোকা আর দাঁড়াতে পারে না।

মাথাটা তার ঘুরতে শুরু করেছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

কি করা উচিত। কি এখন করবে বোকাবাবু!

প্রথমেই যে কথাটা তার মনে হয় সেটা হচ্ছে অবিলম্বে সৌরীনদাকে একটা খবর দিতে হবে।

কালই মাত্র নতুন নাটকের মহাসমারোহ করে শততম রজনী অভিনয় হয়ে গিয়েছে।

পুরস্কার বিতরণ ছিল—নাট্যকার থেকে শুরু করে মায় গেটকিপার ও সুইপাররা পর্যপ্ত সকলেরই পুরস্কার মিলেছে।

এখনো চারিদিকে ফুলের মালা ঝুলছে।

সৌরীন কুন্ডু ফিরেছিল বেশ একটু রাত করেই। তাছাড়া গতকালই সৌরীনদা বলছিল বাড়ির ফোনটা নাকি আউট অফ্ অর্ডার হয়ে আছে।

নচেৎ এখুনি একটা ফোনই করে দেওয়া যেত।

অবিশ্যি খবর না পাঠালেও এখুনি হয়ত সৌরীন কুন্ডু এসে পড়বে থিয়েটারে। প্রত্যহ সে সকাল আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে একবার থিয়েটারে আসেই। বেলা প্রায় বারটা পর্যন্ত থাকে।

এ্যাডভান্স সেল কি রকম হলো না হলো খবর নেয়—

তাছাড়া সৌরীনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ঐ সময় সকালের দিকে থিয়েটারে আড্ডা দিতে আসে।

মুড়ি সিঙ্গাড়া কচুড়ী সঙ্গে চা চলে ও সেই সঙ্গে আড্ডা।

বোকা অর্থাৎ লোকনাথ আর দেরি করে না।

তখুনি সৌরীন কুন্ডুর বাড়ির দিকে ছোটে সংবাদটা দেবার জন্য একটা ট্যাক্সী নিয়ে।

সৌরীন কুন্ডুকে সংবাদটা দিয়ে ফিরে এলো আবার বোকা থিয়েটারে হন্ত দন্ত হয়ে।

বোকা ফিরে এসে অফিস ঘরের মধ্যেই বসেছিল।

সাজ-ঘরের মধ্যে মায়ার মৃত দেহটা দেখা অবধি বোকা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল।

সাদাসিধে সরল প্রকৃতির মানুষ বোকা।

কোন ঘোর প্যাঁচ বেচারী বোঝেও না থাকেও না কোন ঘোর প্যাঁচের মধ্যে কখনো।

সৌরীন কুন্ডু থিয়েটারটা লীজ নেবার আগে বোকা সৌরীন কুন্ডুর বাসাতেই থাকত। দু'বেলা দুটি খেত আর টুক্‌টাক্ কাজ করত।

সৌরীন কুন্ডুই তাকে মাসে মাসে দু'চার টাকা করে হাত খরচা দিত। বোকার তাতেই চলে যেতো।

থিয়েটার লীজ নেবার পরে বোকাই বলেছিল, আমাকে একটা কাজ দিন থিয়েটারে—

সৌরীন কুন্ডু হেসে বলেছিল, কি কাজ তুই করবি থিয়েটারে—

দিন না যা হয় একটা কিছু—

বেশ—তুই থিয়েটারে কেয়ারটেকার হয়ে থাক।

সেই অবধি বছর পাঁচেক ধরে বোকা থিয়েটারেই থাকে সর্বক্ষণ। মাসে মাসে গোটা চল্লিশ করে টাকা দিত সৌরীন বোকাকে।

ঐ টাকায় খাওয়া পরা দিব্যিই চলে যায় বোকার।

কখনো দুটো ভাত ডাল সিদ্ধ করে নেয় কখনো হোটেলে খায় আর সাজঘরের বাইরে বড় সোফাটার পরে শুয়ে ঘুমায়।

সৌরীন কুন্ডু একটু পরেই এসে হাজির হলো থিয়েটারে।

ইতিমধ্যে বুকিংয়ের গৌরবাবু, প্রম্পটার মণিবাবুও এসে গিয়েছিল—তারা দুজন, দরোয়ান ও জমাদার সকলে মিলে কি লবিতে জটলা করছিল।

সৌরীনকে আসতে দেখে সকলে চুপ করে। ওর মুখের দিকে তাকায়।

বোকাও অফিস ঘর থেকে বের হয়ে আসে সৌরীনের সাড়া পেয়ে।

বোকার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করে, কোথায়?

সাজঘরে—

সৌরীন এগিয়ে যায়—বোকা তার পিছনে পিছনে যায়।

মৃতদেহ দেখে এসে কিছুক্ষণ যেন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সৌরীন, তারপর এক সময় আবার নিজের অফিস ঘরে ফিরে এসে ঐ এলাকার থানার ও-সি শম্ভু চাটুয্যেকে একটা ফোন করে দেয়।

থানা অফিসার শম্ভু চাটুয্যে ওর পরিচিত।

থিয়েটারে আসা-যাওয়া আছে।

শম্ভু চাটুয্যেও সংবাদটা পেয়ে কম অবাক হয় না। বলে, বলেন কি মিঃ কুন্ডু—

হ্যাঁ—আপনি আসুন—

আমি এখুনি আসছি—

সৌরীন যেন সত্যি অন্ধকার দেখে।

কাল শনিবার ছিল—আজ রবিবার দুটো শো। সামনের বুধবার আরো দুটো শো।

আজকের দুটো শোর সব টিকিট ত বিক্রীই হয়ে গিয়েছে—আগামী কাল ও পরের বুধবারের টিকিটও অগ্রীম বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

নাটকটা যে ভাবে জমে উঠেছে তাতে করে তিনশ রজনী ত হবেই—কত আশা করেছিল সৌরীন।

ঠিক এই সময় একি বিভ্রাট ঘটলো!

কিন্তু মায়া মেয়েটা সুইসাইডইবা করলো কেন?

নিজে ত গেলই, তার থিয়েটারের চালু নাটকটারও সমাপ্তি ঘটিয়ে গেল।

আজকের শো ত মাথায় উঠলো—সব টিকিট রিফান্ড দিতে হবে— পরেই বা ওই পার্টটা কাকে দিয়ে করাবে সৌরীন।

ওই বয়সের অমন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তার ষ্টেজে আর এখন কোথায়। তাছাড়া যে-ই এখন ওর ওই পার্ট করবে সে যদি নিঃসংশয়ে ওকে টেক্কা না দিতে পারে ত সব গেল।

নাটকের সেল দেখতে দেখতে পড়ে যাবে।

অর্থাৎ, নাটকটা মরে গেল। আচ্ছা মেয়েটির কি আক্কেল। সুইসাইড করতে গেলি কেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সৌরীনের ইদানীং মেয়েটা নাকি রীতিমত উড়তে শুরু করেছিল—অশোকের সঙ্গে লটঘট শুরু হয়েছিল।

এদের পছন্দের, রুচিরও বাবা বলিহারী—অশোক ত ওর বাপের বয়েসী।

॥ ৮ ॥

শম্ভু চাটুয্যে এসে ঘরে ঢুকল।

সৌরীনবাবু!

সৌরীনের চিন্তাধারার ছেদ পড়ে।

এই যে আসুন—চলুন—

কোথায় ডেড বডি?

সাজঘরে।

চলুন—

দুজনে সাজঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

সাজঘরে ঢুকে শম্ভু চাটুয্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পরীক্ষা করলো। প্রথমে মৃতদেহ ও পরে ঘরটা।

ছোট স্বল্প-পরিসর ঘর—

একটা ছোট বেঞ্চ পাতা আছে এক ধারে—দেওয়ালে ব্র্যাকেট লাগানো—তার সামনে একটি আর্সী ফিট করা।

খান দুই চেয়ার। একটা মাঝারী সাইজের আলমারী।

ঘরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য দুটো দরজা—একটা পশ্চিমমুখী—অন্যটা দু'ঘরের মধ্যবর্তী দক্ষিণমুখী—আর একটা ছোট দরজা আছে—ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে যাবার জন্য—বাথরুম দিয়েও বের হয়ে যাওয়া যায় পশ্চিম দিককার প্যাসেজে।

দু'ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই ছিল—সুখলাল ওই দরজাপথেই প্রথমে সাজঘরে ঢুকেছিল।

বাকী দুটো দরজাই বন্ধ ছিল ভিতর থেকে।

শম্ভু চাটুয্যে সৌরীন কুন্ডুর মুখের দিকে তাকাল, চলুন আপনার ঘরে যাওয়া যাক।

চলুন।

ওরা এসে আবার সৌরীন কুন্ডুর ঘরে বসল।

ইতিমধ্যে থিয়েটারের আরো কিছু কিছু লোক এসে গিয়েছে।

টিকিট ঘরের সামনে ভিড়—

টিকিট বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মায়া দেবীর আকস্মিক অসুস্থতার একটা নোটিশ হাতে লিখে টিকিট-কাউন্টারের সামনে টাঙ্গিয়ে দিয়ে।

সৌরীনবাবু!

শম্ভু চাটুয্যের ডাকে সৌরীন ওর মুখের দিকে তাকাল।

ব্যাপারটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—

কি? সৌরীন একটু চাপা উৎকণ্ঠার সঙ্গেই প্রশ্নটা করে।

সৌরীন কুন্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে শম্ভু চাটুয্যে বলে, মনে হচ্ছে আত্মহত্যাটত্যা নয়—

তবে কি?

পিওর কেস অফ মার্ডার—নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যা—

হত্যা!

হ্যাঁ—

কি বলেছেন আপনি?

হ্যাঁ—অবিশ্যি পোষ্টমর্টেম না করা পর্য্যন্ত আমরা ডেফিনিট্ হতে পারেবো না।

আপনি বলছেন মিঃ চ্যাটার্জী, মায়াকে কেউ হত্যা করেছে! সৌরীন পুনরায় প্রশ্ন করে।

অন্ততঃ বর্তমানে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে আপনাকে এক কাজ করতে হবে।

কি?

অপনি থিয়েটারের সকলকে ডেকে পাঠান। সকলকেই আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই—

ডেকে পাঠাবার আর বোধহয় প্রয়োজন ছিল না—কারণ ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার সংবাদটা অনেক দূর ছড়িয়ে গিয়েছিল মুখে মুখে।

এবং আশে পাশে থিয়েটাররের যারা থাকত তারা ইতিমধ্যে থিয়েটারের লবিতে এসে ভিড় করেছিল।

থিয়েটারের লোহার গেট্ দুটো ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

টিকিট ঘরের দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও থিয়েটারের সামনে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গিয়েছিল।

মুখরোচক সংবাদ।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাদ দিলেও একটা থিয়েটাররের কর্মীসংখ্যা ত নেহাৎ কম নয়।

চার পাঁচজন সিফটার—তিনজন ইলেকট্রিসিয়ান—বেয়ারা জন তিনেক—

ভিতরে একটা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য টি ষ্টলের মত আছে—তারাও দুজন এবং দুজন জমাদার—ড্রেস ইত্যাদির ইনচার্জে একজন ও সে-সবের সরবরাহের জন্য একজন—চৌদ্দজন।

তাছাড়া—মেয়েদের জন্য একজন ও ছেলেদের একজন মেকআপ ম্যান। এবং মিউজিক্ হ্যান্ডস্ জন ছয়েক—দুজন প্রম্পটার।

একে একে যারা এসে গিয়েছিল তাদের ডেকে শম্ভু চাটুয্যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে।

এবং তাদের মুখ থেকে যতদূর জানা গেল—

॥ ৯ ॥

গতকাল রবিবার দুটো শো ছিল। এবং শোর সেদিন শততম রজনীর স্মারক উৎসব—হাউস ফুল ছিল।

রাত নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে শো শেষ হয়। তারপর যেমন অন্যান্য দিনর মত একে একে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা থিয়েটার থেকে চলে যায় তেমন সবাই চলে গিয়েছে।

কেউই বলতে পারল না—গত রাত্রে মায়াকে অভিনয়ের শেষে থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিল কিনা।

অন্যান্য দিন প্রায়ই সবার শেষে থিয়েটার থেকে বের হয় অশোক এবং তার সঙ্গেই বের হয় মায়া।

কিন্তু গত রাত্রে অশোক নাকি একাই বের হয়ে গিয়েছিল—এবং অন্যান্য দিনের চাইতে একটু আগেই।

জানা গেল অশোককে বাইরে বের হয়ে যেতে দেখেছে দুজন। বেয়ারা অতুল ও ইলেকট্রিসিয়ান প্রভাস।

অশোকের সঙ্গে যে ইদানীং মায়ার একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল এবং সেটা সকলেরই নজরে পড়েছিল, তাও শম্ভু চাটুজ্যে জানতে পারে।

আরো কিছু কিছু সংবাদ সংগৃহীত হলো।

ঐ মায়া মেয়েটিকে ঘিরে ইদানিং থিয়েটারের মধ্যে বেশ একটা নাকি আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। সে আবর্তের মধ্যে তিনজন জড়িয়ে ছিল—অশোক, প্রদীপ ও অলক্ত। অথচ মেয়েটি, যতদূর জানা গেল, অশোকের সঙ্গেই ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল প্রথমোক্ত, দুজনার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও।

আপাততঃ তখনকার মত মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে থিয়েটারের সাজঘরটা লক্ আপ করে এবং দুজন পুলিশ প্রহরায় রেখে শম্ভু চাটুয্যে তখনকার মত চলে গেল।

সৌবীন কুন্ডুকে বলে গেল, অভিনেতাদের সকলের সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলতে চায় সে।

কুন্ডু যেন সকলকেই একটা খবর দেয় সন্ধ্যায় থিয়েটারে আসার জন্য ঐ দিনই।

সৌরীন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

শম্ভু চাটুয্যে চলে যাবার পর সৌরীন তার ঘরের মধ্যেই ঝিম্ দিয়ে বসে থাকে।

সৌরীনের যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হচ্ছিল।

একি হলো!

একটা সাজানো ছক সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল!

তাছাড়া শম্ভু চাটুয্যে যা বলে গেল তাই যদি হয়—মায়া খুনই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ত আর এক ঝামেলা।

কিন্তু তাই বা হবে কি করে!

মায়াকে হত্যা করতেই বা যাবে কেন কেউ!

কিন্তু শম্ভু চাটুয্যে যখন বলে গেল তার ধারণা মায়াকে কেউ হত্যাই করেছে তখন কথাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলাও যাচ্ছে না।

সন্ধ্যাবেলো শম্ভু চাটুয্যে আবার থিয়েটারে এলো।

মোটামুটি অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই এসেছিল।

সকলে এসে প্রেক্ষা-গৃহের মধ্যে জমায়েত হয়েছিল।

সকলেই বিস্ময়ে যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

সবার শেষে এসেছিল অশোক—সকলেই আড় চোখে অশোকের দিকে তাকায়।

অশোক সকলের থেকে পৃথক হয়ে অডিটোরিয়ামের ফ্রন্ট-রোর একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে সিগ্রেট টেনে চলে।

শম্ভু চাটুয্যে সৌরীন কুন্ডুর ঘরে বসে একে একে সকলকে ডেকে পাঠাচ্ছিল।

প্রভাত—একজন প্রৌঢ় অভিনেতা।

অনেক দিন ধরে ঐ থিয়েটারে আছে। বেঁটেখাটো ফর্সা। টাইপ রোলে অভিনয় করে।

সে বললে শেষ দৃশ্যের শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকতে হয় একমাত্র মায়াকেই। এবং তার উপস্থিতিতেই যবনিকা নামে।

গত রাত্রে যখন যবনিকা পড়ে শেষ দৃশ্যে প্রভাত তখন উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে প্রম্পটার মণি চাটুয্যের সঙ্গে কথা বলছিল।

সে নিজের চোখে দেখেছে মায়াকে সিন থেকে বের হয়ে আসতে। এবং মায়ার বের হয়ে আসার কয়েক মুহূর্ত আগেই বের হয়ে আসে অশোক।

দুজনকেই প্রভাত বের হয়ে আসতে দেখেছে।

সকালবেলা থিয়েটারের বেয়ারা কালী তার জবানবন্দীতে বলেছিল, গত রাত্রে শোর পর সে মায়াকে তার সাজঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখেছে এবং তার একটু পরেই সে দেখছিল অশোক দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বের হয়ে গেল।

অশোকের সঙ্গে মায়া ছিল না।

অশোক একলাই গিয়েছে।

॥ ১০ ॥

অলক্ত সাক্ষী দিতে এসে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বললেন—অশোককে সেও ষ্টেজ থেকে বের হতে দেখেছে, কিন্তু সে বাইরে চলে যায়নি সঙ্গে সঙ্গে—

প্যাসেজে এসে সে—প্যাসেজের দিককার মায়ার সাজঘরের যে দরজা সেই দরজায় সে অশোককে নক্ করতে দেখেছে।

মায়া দরজা খুলে দেয়। দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। অলক্ত ব্যাপারটা দেখেছে কারণ ঐ সময় সে প্যাসেজেই ছিল দাঁড়িয়ে।

তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে সে বলতে পারে না কারণ অলক্ত একটু পরেই থিয়েটার থেকে বের হয়ে যায়।

রাত তখন কটা হবে? প্রশ্ন করে শম্ভু চাটুয্যে অলক্তকে।

বোধহয় সোয়া দশটার কাছাকাছি হবে।

তারপর?

তারপর আমি কিছু জানি না, আমি সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

আপনার সঙ্গে মায়াদেবীর ত এক কালে ভালই ঘনিষ্ঠতা ছিল তাই না?

ঘনিষ্ঠতা আবার কি—এক ক্লাবে অভিনয় করতাম—এক ফ্ল্যাটে থাকতাম। কাজেই—

বলুন, থামলেন কেন?

আলাপ পরিচয় ছিল একটু—

আর কিছু নয়? শম্ভু চাটুয্যে পুনরায় প্রশ্ন করে।

না—

কিন্তু আমি রিপোর্ট পেয়েছি মায়াদেবীর সঙ্গে আপনার একটু বেশী ঘনিষ্ঠতাই ছিল—

একটুও না। ভুল শুনেছেন।

ভুল শুনেছি!

শম্ভু চাটুয্যে হাসল।

হ্যাঁ—ভুলই শুনেছেন কারণ কোন রকম ঘনিষ্ঠতাই কখনো তার সঙ্গে আমার ছিল না।

ওঃ আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেতে পারেন। প্রদীপ বাবুকে পাঠিয়ে দিন এবারে—

একটু পরে প্রদীপ এলো।

প্রদীপ তার জবানবন্দীতে বললে, নাটকের শেষ দৃশ্যে তার এ্যাপিয়ারেন্স নেই—কাজেই বরাবর সে শো ভাঙ্গবার আগেই থিয়েটার থেকে চলে যায়। সে কিছু জানে না, কিছু বলতে পারে না।

শম্ভু চাটুয্যে এবার প্রশ্ন করে, মায়াদেবীর সঙ্গে আপনার ত বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল শুনলাম।

ঘনিষ্ঠতা বলতে আপনি কি বলতে চান বুঝতে পারছি না—তবে আলাপ পরিচয় ত অনেক দিন ধরেই ছিল। শেষটায় কিছুদিন ধরে অবিশ্যি তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ওর সঙ্গে আমি কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম—

তা হঠাৎ এমন কি ঘটেছিল যে একেবারে কথা বলাও বন্ধ করেছিলেন।

ক্ষমা করবেন, সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার—

অতঃপর অশোকের ডাক পড়ল।

অশোক বললে, মায়ার সঙ্গে ইদানীং তার একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ঠিকই—কারণ মেয়েটির অপূর্ব প্রতিভার জন্যই অশোক মেয়েটিকে লাইক করতো—মেয়েটিও তাকে পছন্দ করতো—তার বেশী কিছু নয়।

গত রাত্রে শো'র পর আপনি নীচে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে মায়াদেবীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

কে বললে! না ত।

কিন্তু একজন আপনাকে দেখেছে—

হতেই পারে না—এ্যাবসার্ড—কাল শো'র পর মায়ার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। সোজা আমাকে স্টুডিওতে চলে যেতে হয়েছিল নাইট সুটিং ছিল বলে।

থিয়েটার থেকে আপনি কখন বের হয়ে যান?

ঠিক রাত ন'টা চল্লিশে। গেটে দারোয়ান আমাকে দেখেছে। গেটের বাইরে বেরুতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাই। সেই ট্যাক্সিতে করেই সোজা আমি স্টুডিওতে যাই।

স্টুডিওতে কখন পৌঁছান?

বোধহয় সাড়ে দশটার পর—দশটা পঁয়তাল্লিশ হবে—

শ্যামবাজার থেকে টালীগঞ্জে যেতে রাত্রে ঐ সময় অতক্ষণ লাগলো!

তা কখনো কখনো লাগে বৈকি ট্রাফিক জ্যাম থাকলে!

হুঁ—ষ্টুডিও থেকে কখন ফিরলেন?

সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসি

কেন?

কারণ সুটিং শেষ পর্য্যন্ত হয় নি—

ওঃ তারপর কোথায় গিয়েছিলেন?

গিয়েছিলাম একজায়গায়—

কতরাত পর্যন্ত ছিলেন সেখানে?

তা দুটো আড়াইটা হবে—

আর কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছ থেকে বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করা গেল না।

মায়াকে সাজঘরে অভিনয়ের পর ঢুকতে দেখা গিয়েছে বটে কিন্তু বের হতে কেউ দেখে নি।

শম্ভু চাটুয্যের ধারণা যে মিথ্যা নয় সেটা পরের দিনই সন্ধ্যায় জানা গেল।

পোষ্টমর্টমে রিপোর্ট পাওয়া গেল—গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মায়ার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

সম্ভবতঃ কাপড় জাতীয় কিছু গলায় পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ করা হয়েছিল।

এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে আবার শো শুরু করল সৌরীন কুন্ডু মায়ার জায়গায় একটি নতুন মেয়েকে নিয়ে।

নতুন করে অভিনয় শুরু হলো—অশোক কিন্তু অভিনয় করল না।

অলক্ত তার পূর্বের রোলে ফিরে এলো।

হাউসে দর্শক মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু দেখা গেল অভিনয় যেন জমছে না। কিছুতেই দানা বাঁধছে না।

নাটকের সর্বত্র মায়ার অভাব অনুভূত হয়।

বোঝা যায় যেন মায়াই ছিল নাটকের প্রাণ।

প্রদীপ—অলক্ত—অশোক কেউ নাটকের প্রাণ ছিল না। আজ কথাটা মায়ার অভাবে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে সকলের কাছে।

আরো কয়েক রাত্রি পর পর অভিনয় হলো নাটকের কিন্তু দেখা গেল নাটকের সেল ক্রমশঃ যেন কমছে।

সৌরীন ঝানু লোক এ লাইনে। বুঝতে পারে এ নাটক এখন আর চলবে না—নতুন নাটকের প্রয়োজন।

অশোকও সৌরীনকে বার বার সে কথাই বলতে লাগল।

ওদিকে মায়ার হত্যার ব্যাপারটাও যেন কেমন চাপা পড়ে গেল।

১১ ॥

এমন সময় থিয়েটারে আর একটা ব্যাপার ঘটলো।

মায়া মাসের কুড়ি দিন কাজ করেছিল। কুড়ি দিনের সেই মাইনা মায়ার প্রাপ্য ছিল। একদিন সন্ধ্যায় মায়ার মা মৃন্ময়ী দেবী এলো সেই মাইনা নিতে সৌরীনের কাছ থেকে।

মৃন্ময়ী বলছিল সৌরীনকে, মেয়েটাকে আমার কে বা কারা অমন করে মেরে ফেললো আপনারা ধরতে পারলেন না?

পুলিশ ত কম চেষ্টা করেনি কিন্তু কিছুতেই ত হদিশ করতে পারলো না। সৌরীন বলে।

সে রকম করে চেষ্টা করলে কি আর পারত না।

আপনি জানেন না সবরকম চেষ্টাই করা হয়েছে—

না, তাহলে হয়ত নিশ্চয়ই ধরা পড়তো কোন হত্যাকারী।

আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন মৃণ্ময়ী দেবী?

হঠাৎ সৌরীন প্রশ্ন করে।

আমার ধারণা—

বলুন থামলেন কেন?

মানে বলছিলাম—আমি বোধহয় জানি কে মায়াকে হত্যা করেছে—হঠাৎ মৃণ্ময়ী বলে।

সৌরীন কুন্ডু কথাটা শুনে যেন চমকে ওঠে।

বলে, জানেন!

হ্যাঁ—

কে?

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সৌরীন কুন্ডু মায়ার মার মুখের দিকে।

মৃণ্ময়ী তখন কতকগুলো চিঠি বের করে সৌরীনের হাতে দেয়।

কি এগুলো? চিঠি বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ—চিঠি মায়ার সুটকেশের মধ্যে ছিল—আমার ছোট মেয়ে রীণা তার দিদির সুটকেশের মধ্যে এই চিঠিগুলো পেয়েছিল। এগুলো পড়লে হয়ত বুঝতে পারবেন আপনিও ব্যাপারটা—

সৌরীন একটু কৌতুহলের সঙ্গেই যেন চিঠিগুলো হাতে নেয়।

বলে, তা এ চিঠিগুলো পুলিশ যখন আপনাদের ওখানে গিয়েছিল তাকে দেন নি কেন, তারপর একটু থেমে বলে, কবে এ চিঠিগুলো পেয়েছেন?

মায়ার মৃত্যুর দুতিন দিন পরেই।

সাদা খামে চিঠিগুলো ভরা—ডাকে আসেনি—হাতে হাতে বোধ হয় ছাড়া হয়েছে।

বেশী নয়—খান তিনেক চিঠি।

প্রত্যেক খামের উপরে লেখা, মায়া।

মৃণ্ময়ী বললে, প্রকৃতপক্ষে এই চিঠিগুলো আপনার হাতে দেবার জন্যই আমি এসেছি। চিঠিগুলো পড়ুন আপনি। তাহলেই আন্দাজ করতে পারবেন হয়ত সব কিছু।

সৌরীন একে একে তিনখান চিঠিই পড়ে।

সংক্ষিপ্ত চিঠি—প্রত্যেক চিঠির সারবস্তু মোটামুটি এক। প্রত্যেক চিঠিতেই মায়াকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এবং কোন চিঠিতেই নাম নেই তলায়, কেবল লেখা ইতি।

বোঝা যায় উড়ো চিঠি।

মায়া, যে পথে চলেছো সে পথ থেকে নিজের মঙ্গল চাও ত এখনো ফেরো। ও তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দশ দিন তোমাকে সময় দিলাম হয় তুমি ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করবে নচেৎ জেনো ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। ইতি।

আর একটা চিঠি—একই ভাবের লেখা—

মায়া, দশ দিন তোমাকে সময় দিয়েছিলাম—কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি ব্যাপারটার মধ্যে কোন গুরুত্বই দাওনি।

আবারও বলছি—ফের, নচেৎ প্রাণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমার এ বোকামির মাশুল দিতে হবে

জেনো। ইতি—

শেষ চিঠি—

মায়া, শেষবারের মত তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—এখনো ফেরো। মরতে যদি না চাও ত এখনো ফেরো। ইতি।

পড়লেন চিঠিগুলো? মৃণ্ময়ী শুধায়।

পড়লাম। ঠিক আছে এগুলো থাক আমার কাছে। আচ্ছা এ চিঠি কার লেখা বলে আপনার মনে হয় মৃন্ময়ী দেবী?

মনে হচ্ছে অলক্তর—

অলক্তর!

হ্যাঁ—

কেন—তার হাতের লেখা কি আপনি চেনেন?

না—তবে তার লেখা বলেই মনে হয়—কারণ যে রাত্রে ঐ ঘটনা ঘটে তার দিন পনর আগে অলক্তর সঙ্গে নাকি রাত্রে পথে ওর ভীষণ ঝগড়া হয়।

কে বললো সে কথা আপনাকে?

কেন মায়াই বলেছিল।

হুঁ। আচ্ছা আপনি যান—

মৃন্ময়ী দেবী বিদায় নেবার পরই সৌরীন কুণ্ডু শম্ভু চাটুয্যেকে থানায় ফোন করে—এবং শম্ভু চাটুয্যে আসতেই তার হাতে চিঠিগুলো তুলে দেয় সৌরীন।

সেদিন থিয়েটার ছিল না।

শম্ভু চাটুয্যে চিঠিগুলো নিয়ে থানায় ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখে কিরীটী তার ঘরে বসে আছে তারই অপেক্ষায়।

ঘরের বাতাস সিগারেটের গন্ধে ভরে উঠেছে।

কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের বিশেষ পরিচিত।

অনেক দিন থেকেই উভয়ের পরিচয়।

ঘরে ঢুকেই তাকে দেখে সোল্লাসে শম্ভু চাটুয্যে বলে ওঠে, কিরীটী কতক্ষণ রে?

বেশ কিছুক্ষণ।

সত্যি?

হ্যাঁ—একটু দরকার ছিল তোর কাছে।

সে ত বুঝতেই পারছি নচেৎ কি আর মহাপ্রভুর পদার্পণ ঘটেছে এখানে! তা এতদিন দেখিনি—কোলকাতায় ছিলি না নাকি?

না, মাদ্রাজ গিয়েছিলাম।

মাদ্রাজ হঠাৎ?

এই একটু ঘুরতে, তা শোন তোর কাছে একটা সংবাদের জন্য এসেছি।

কি সংবাদ?

বছর দেড়েক আগে, মনে আছে তোর নিশ্চয়ই, ভূপেন বোস য়্যাভিন্যুতে একটা ফ্ল্যাট-বাড়ির দোতলার একটা ফ্ল্যাটে অবিনাশলিঙ্গম নামে এক দক্ষিণী ভদ্রলোককে তার ফ্ল্যাটের ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ও সেই সঙ্গে তার তরুণী ভার্যাটি নিখোঁজ হয়ে যায়।

হ্যাঁ—মনে আছে বৈকি। শেষ পর্যন্ত কেসটা চাপা পড়ে যায়—সেই মেয়েটিকেও পাওয়া যায় না এবং ভদ্রলোকের মৃত্যুর ব্যাপারটারও কোন হদিশ পাওয়া যায় নি।

তা হঠাৎ এতদিন পরে আবার সে কেসটা সম্পর্কে—

চুরোটটা ইতিমধ্যে নিভে গিয়েছিল সেটায় নতুন করে অগ্নিসংযোগ করতে করতে কিরীটী বলে, সরকার পক্ষ থেকে সেই কেসটা গত মাসে আমার স্কন্ধে আরোপ করা হয়েছে। যাক—শোন, যে জন্য আমি তোর কাছে এসেছি—তোর ত মায়ামঞ্চ থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে যথেষ্ট দহরম আছে।

হ্যাঁ—তা আছে, সেখানেই ত গিয়েছিলাম।

কেন, থিয়েটার দেখতে?

না—সে এক ব্যাপার, থিয়েটারের এক অভিনেত্রীর খুনের ব্যাপার নিয়ে।

কি রকম?

শম্ভু চাটুয্যে তখন সংক্ষেপে মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা বিবৃত করে কিরীটীর কাছে। চুরোট টানতে টানতে সব শুনল কিরীটী তারপর বললে, খুব একটা জটিল ব্যাপার বলে ত' মনে হচ্ছে না। সে যাক—তাহলে ত তোর অভিনেতা অশোকের সঙ্গে পরিচয় আছে?

তা আছে।

কি রকম পরিচয় রে?

বেশ ভালই

হুঁ—তাহলে অশোকের সঙ্গে মায়ার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল?

সেই রকমই ত সংবাদে প্রকাশ।

কিরীটী আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকে। একটু যেন অন্যমনস্ক ভাব।

আচ্ছা সত্যিই তুই কি মনে করিস কিরীটী, ব্যাপারটা খুব কঠিন নয়?

সব শুনে ত তাই মনে হচ্ছে, তারপরই একটু থেমে বলে, সে চিঠিগুলো এনেছিস?

হ্যাঁ—

দেখি—

শম্ভু চিঠিগুলো কিরীটীর হাতে তুলে দিল। কিরীটী চিঠিগুলো একে একে পড়ল।

॥ ১২ ॥

এক-সময় পড়া শেষ হলে কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের মুখের দিকে তাকাল।

বুঝতে পারলি কিছু? শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

কি?

চিঠিগুলো অলক্তই লিখেছে, তাই না?

তা যদি লিখেও থাকে ত তুই সেটা প্রমাণ করতে পারবি না শম্ভু।

কেন?

কারণ তার হাতের লেখার সঙ্গে মিলবে না।

তার মানে?

তার মানে ঐ চিঠিগুলোর দ্বারা আমার মনে হচ্ছে—

কি?

হত্যাকারী তার অপরাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপাবার একটা ছেলেমানুষী চেষ্টা করেছে।

তাই তোর মনে হচ্ছে?

শুধু তাই না, মনে হচ্ছে তোর সব কথা শুনে আগাগোড়া ব্যাপারটাই যেন একটা এ্যামেচারিস ব্যাপার।

এ্যামেচারিস্!

তাই ত মনে হচ্ছে, আর তুই ত একটু ভাল করে চিন্তা করলেই বুঝতে পারতিস ব্যাপারটার মধ্যে খুব বেশী একটা কিছু জটিলতা হয়ত নেই।

কিন্তু—আমি ত ভাই এখন পর্যন্ত ভেবে ভেবে কোন কূল কিনারাই করতে পারিনি।

হয়ত তুই যে লাইন ধরে ভেবেছিস আসলে সে লাইনটা ভুল—গোড়াতেই গলদ। কিরীটী চুরোটে মধ্যে মধ্যে টান দিতে দিতে কথাগুলো বলছিল। বসবার ভঙ্গিটা তার শিথিল আয়েসী।

তুই কি বলতে চাস কিরীটী মায়ার হত্যার ব্যাপারটা যেভাবে আমি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি সেটা ভুল!

তাই যেন মনে হচ্ছে।

কেন?

প্রথমতঃ ভেবে দেখ, হত্যাকান্ড কোথায় ঘটেছিল—বা কিভাবে ঘটতে পারে?

নিশ্চয়ই থিয়েটারের মধ্যেই।

হ্যাঁ—কারণ মৃতদেহ থিয়েটারের সাজঘরের মধ্যেই পরের দিন আবিষ্কৃত হয়েছে, আর সেই

কারণেই সর্বাগ্রে দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ শোর কয়েক ঘন্টা. তোর খোঁজ নেওয়া উচিৎ ছিল, মায়ার কাছাকাছি কে কে এসেছিল। সেদিন কার কার সঙ্গে সন্ধ্যায় তার দেখা হয়েছিল, তারা কে কে এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মায়ার কেমন ঘনিষ্ঠতা বা পরিচয় ছিল। তাদের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল—

তা মোটামুটি যা জানতে পেরেছি সবই ত তোকে বললাম।

হ্যাঁ বলেছিস তবে তার মধ্যে অনেক জায়গায় অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছে।

ফাঁক!

হ্যাঁ—তারপর তুই বললি ইদানীং অশোকের সঙ্গে মায়ার আলাপ হবার পর থেকে শো ভাঙ্গলে ওরা দুজনে একসঙ্গেই থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতো—দুর্ঘটনার রাত্রে কেন গেল না! অশোক ঠিক কখন বের হয়ে গিয়েছিল শো ভাঙ্গবার পর?

অশোক সে রাত্রে থিয়েটার ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গেই বের হয়ে যায় তার নাইট সুটিং ছিল বলে—

সুটিং সত্যিই সে করেছিল কি?

তা অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করিনি।

তারপর ধর, মায়ার মৃতদেহ পরের দিন সকালে আবিষ্কৃত হবার পর দেখা যায়, আগের রাত্রের শোর কাপড় জামাই তখনো তার পরিধানে ছিল। তাহলে মায়া সে শো ভাঙ্গবার পর শোর জামা কাপড়ও যেমন বদলাবার অবকাশ পায়নি তেমনি থিয়েটার থেকে আদৌ বের হয়নি শো ভাঙ্গাবার পরও—

তাই ত মনে হয়।

কেবল মনে হলেই ত হবে না—সে যে কাপড় না বদলালেও বা বদলাবার অবকাশ না পেলও সে যে আদৌ থিয়েটার থেকে শো ভাঙ্গবার পর বের হয়নি তারও সাক্ষ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন। নচেৎ—

কি?

আসলে হত্যাকান্ডটা কোথায় সংঘটিত হয়েছিল সেটাই গোলমাল হয়ে যাবে—

কিন্তু ওর দেহে যখন তখনো আগের রাত্রের শোর জামা-কাপড়ই ছিল তখন ত স্বতঃসিদ্ধ ভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে সাজঘরের মধ্যে থিয়েটারেই ব্যাপারটা ঘটেছে।

না।

কেন?

হত্যাকারীর অপরাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর একটা প্রয়াসও হতে পারে ব্যাপারটা।

তাই তোর মনে হয়?

কি মনে হয় না হয় সেটা এখন অবান্তর। তার আগে তুই একটা কাজ করতে পারিস?

কি বল।

কাল ত থিয়েটার আছে?

হ্যাঁ।

কাল একবার থিয়েটারে যাবো চল—ওদের কয়েকজনকে আমি কিছু কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

বেশ ত—কিন্তু কাকে কাকে প্রশ্ন করবি বল?

ঐ অলক্ত, প্রদীপ, অশোক- জমাদার রূপলাল—দু'জন দারোয়ান যারা বাইরে থাকে—বেয়ারা কালী আর মেয়েদের মেকআপ রুমে যে মেয়েটি ওদের সাহায্য করে—কি যেন তার নাম?

লাবণ্য।

হ্যাঁ, তাকে এবং মায়ার পাশের ঘরে যেসব অভিনেত্রীরা বসত তাদের। তাহলে আজ আমি উঠি—কাল আসবো। ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় এখান থেকে থিয়েটারে যাবো। থিয়েটারের সেই সাজঘরে বসেই ওদের প্রশ্ন করবো। ব্যবস্থাটা তুই করতে পারবি ত?

কেন পারব না, খুব পারব।

॥ ১৩ ॥

পরের দিন থিয়েটার।

শম্ভু চাটুয্যে আগেই ফোনে সৌরীন কুন্ডুকে সব কথা বলে রেখেছিল। সৌরীন বলেছিল সে

সব ব্যবস্থা করে রাখবে।

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ শম্ভু চাটুয্যে ও কিরীটী মায়ামঞ্চে এসে হাজির হলো।

তখন প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক চলছে।

সৌরীন কুণ্ডু তার নিজের ঘরে বসেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

শম্ভু চাটুয্যে কিরীটীর পরিচয় দেয়।

কিন্তু তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না কারণ কিরীটীর নামটা সৌরীন কুণ্ডুর অজানা নয়। কিরীটীর নামের সঙ্গে তার পূর্বে পরিচয় ছিল সংবাদপত্র মারফৎ।

শম্ভু চাটুয্যে জিজ্ঞসা করে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সব বলে রেখেছেন ত?

হ্যাঁ—কিন্তু কোথায় বসে ওদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলবেন উনি?

কিরীটীই জবাব দেয়, মায়াদেবীর সাজঘরে বসে।

আসলে গত সন্ধ্যায় শম্ভু চাটুয্যের মুখে মায়ার মৃত্যু কাহিনী শুনতে শুনতে এতটুকুও আকৃষ্ট হয়নি কিরীটী। কিন্তু শম্ভু কোন কূলকিনারা করতে পারেনি শুনে কৌতূহল জাগে তার। বিশেষ করে ঐ থিয়েটারে অশোকও আছে বলে কাল মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটাও তাকে আরো বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত করে তোলে।

এবং মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা চিন্তা করতে করতেই যেসব লোকগুলো মায়ার থিয়েটার-জীবনের সংগে জড়িয়ে ছিল তাদের নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবার ইচ্ছা হয়।

তাছাড়া আরো একটা কারণ ছিল।

অশোকের সংগে সে পবিচিত হতে চায়—সেটারও একটা সুযোগ সে পেয়ে যাবে থিয়েটাবে গেলে।

তাই কিরীটী শম্ভু চাটুয্যেকে অনুরোধ জানায় পরের দিন থিয়েটারে তাকে একটিবার নিয়ে যাবার জন্য—তাতে করে দু'কাজই হবে—শম্ভুর ব্যাপারটার সঙ্গে মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটাও নেড়ে চেড়ে দেখা যাবে, সেই সংগে অশোকের সঙ্গেও হয়ত পরিচয়ের একটু সুযোগ সে পেয়ে যাবে।

ক্রমে এক সময় থিয়েটার শেষ হলো

ইতিমধ্যে কুণ্ডুই ভিতরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল।

যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে কিরীটী কথা বলতে চায় তাদের ত আগেই সৌবীন বলে রেখেছিল।

শো ভাঙ্গবার পর একে একে সব দর্শকরা চলে গেল—প্রেক্ষাগৃহ খালি হয়ে গেল— যাদের প্রয়োজন নেই তারাও চলে গেল।

কেবল সাজঘরের সামনে অপেক্ষা করতে থাকে অশোক, প্রদীপ, অলক্ত, মায়ার ঘরের পাশে যে আরো দুটি মেয়ে বসত—রঞ্জনা ও সুপ্রিয়া, এছাড়া লাবণ্য, দারোয়ান মহাবীর সিং, রামপ্রসাদ, বেয়ারা কালী এবং জমাদার রূপলাল—তারাও একটু দূরে অপেক্ষা করতে থাকে।

সাজঘরে এসে সকলে প্রবেশ করল।

কিরীটী, শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন।

প্রথমেই ভাল করে ঘরটা, যে ঘরের মধ্যে মায়ার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই ঘর ভাল করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল কিরীটী।

তারপর প্যাসেজটা, সংলগ্ন বাথরুমটা পরীক্ষা করে দেখল।

জেনে নিল মৃতদেহ কোথায় ছিল।

প্রথমেই কিরীটী বললে দারোয়ান দুজনকে ডাকতে।

রামপ্রসাদ ও মহাবীর সিং।

ওদের একজন লবিতে ও অন্যজন গেটের সামনে থিয়েটারেব শো শুরু হওয়া থেকে ভাঙ্গার পরও অনেকক্ষণ ছিল।

তাদের ডিউটিই ঐ ভাবে থাকা। নজর রাখা থিয়েটারে কে আসে— কে যায়—সর্বক্ষণ।

প্রথমেই ডাকা হলো দরোয়ান রামপ্রসাদকে।

দরোয়ান রামপ্রসাদ অনেক দিন থেকে সৌরীন কুণ্ডুর কাছে আছে।

একটা সাপ্তাহিক সিনেমা থিয়েটার সংক্রান্ত কাগজ ছিল এক সময় সৌরীনের। সেই সময় থেকেই

রামপ্রসাদ ওর কাছে কাজ করছে।

এবং সৌরীন কুণ্ডু থিয়েটারটা লিজ্ নেবার পর থিয়েটারেই দরোয়ানের কাজ করছে কয়েক বছর ধরে।

সৌরীন কুণ্ডু আগেই বলেছিল, রামপ্রসাদ লোকটা বিশ্বাসী ও সৎপ্রকৃতির।

কিরীটী রামপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, মায়াদেবীকে ত তুমি অনেক দিনই দেখছো রামপ্রসাদ—ভাল করেই তাকে চিনতে তাই না?

জী।

তবে সে রাত্রে যাকে থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিলে সে মায়াদেবী কি না ঠিক করে বলতে পারছো না কেন? লবিতেই ত তুমি ছিলে—আর লবির সামনে দিয়ে সে বের হয়ে গিয়েছিল যখন—

আজ্ঞে অনেকেই ত তখন থিয়েটার ভাঙ্গবার পর বের হয়ে যাচ্ছিল তাই ঠিক ভাল করে নজর করতে পারিনি।

তা নয় রামপ্রসাদ, কিরীটী বলে, যাকে তুমি দেখেছো সে হয়ত আদৌ মায়াদেবী ছিল না—

হতে পারে বাবুজী।

অশোকবাবুকে বের হয়ে যেতে দেখো নি?

না—

অলক্তবাবুকে?

না—

আচ্ছা রামপ্রসাদ সবাই যখন সে রাত্রে থিয়েটার ভাঙ্গার পর চলে গেল তারপর তুমি কি করছিলে?

পুব দিকের প্যাসেজে যে ছোট ঘরটা আছে সেখানেই আমি থাকি সেখানেই চলে গিয়েছিলাম—তারপর এক সময় খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়ি।

থিয়েটারের ভিতরে আর ঢোকেনি?

না।

হুঁ। আচ্ছা, সে রাত্রে কেউ মায়াদিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি?

না। কেউ এলে আমাকে না জানিয়ে ভিতরে যেতে পারে না।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও।

রামপ্রসাদের পর থিয়েটারের দ্বিতীয় দরোয়ান, মহাবীর সিংকে ডাকা হলো। মধ্যবয়সী লোকটা।

তোমার নাম মহাবীর সিং? কিরীটী প্রশ্ন করে মহাবীরের মুখের দিকে চেয়ে।

জী!

কতদিন এখানে কাজ করছো?

এক সাল হবে।

তাহলে থিয়েটারের সকলকেই জান, সকলকেই চিনতে তুমি?

জী!

সে রাত্রে তুমি শো ভাঙ্গার পর কোথায় ছিলে?

জী গেটের সামনে—

মায়াদেবীকে তুমি বের হয়ে যেতে দেখেছিলে?

না।

অশোকবাবুকে?

না।

অলক্তবাবুকে?

দেখেছি।

কখন?

শো ভাঙ্গার আধঘন্টা পরে হবে তখন ভিড়টা অনেক পাতলা হয়ে এসেছে।

মহাবীর!

জী!

অলক্তবাবুর সঙ্গে আর কাউকে তুমি যেতে দেখেছো, মানে থিয়েটারের আর কাউকে?
না ত! অলক্তবাবু একাই ছিলেন। তবে—
কি! বল, থামলে কেন?
অলক্তবাবুকে দেখে মনে হয়েছিল যেন—
কি?
অলক্তবাবু নেশা করেছেন।
কেন!
অলক্তবাবু টলছিলেন। ভাল করে চলতে পারছিলেন না।
ঠিক আছে। তুমি যেতে পার।
কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে।
মহাবীর সিং অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
কিরীটী সৌরীন কুন্ডুর মুখের দিকে তাকাল, সৌরীনবাবু!
বলুন।
অলক্তবাবু কি নেশা করেন নাকি!
কখনো ত চোখে পড়েনি তাছাড়া আমার কড়া নির্দেশ আছে শো চলাকালে—আগে বা পরে মঞ্চে কেউ ড্রিংক করতে পারবে না।
সবাই কি আপনার সে নির্দেশ মেনে চলেন?
নিশ্চয়ই।
অশোকবাবু?
অশোক!
হ্যাঁ—শুনেছি তিনি নাকি খুব বেশী ড্রিংক করেন।
করে তা আমিও জানি তবে শো চলার সময় সে কখনো ড্রিংক করে না।
কিরীটী মৃদু হাসল।
সৌরীন আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।
শম্ভু এবার জিজ্ঞাসা করে, এবার কাকে ডাকব?
রূপলালকে ডাক—
সাজঘরের দরজায় যে কনেস্টবলটি দাঁড়িয়েছিল তাকে বললে রূপলালকে ডাকবার জন্য।
রূপলাল এ থিয়েটারে কতদিন আছে সৌরীনবাবু?
বছর দুই হবে।
লোকটা নেশা ভাঙ্গ করে?
শুনেছি করে।
এখানে রূপলালের ডিউটি কি? কি করতে হয় তাকে?
রূপলালের ডিউটি শোর সময় সর্বক্ষণ ভিতরে থাকার—তারপর শো ভাঙ্গলে টুকটাক সব কাজ সেরে ষ্টেজঘরের আলো নিভিয়ে ষ্টেজের দরজায় তালা লাগান।
ষ্টেজঘরের চাবি তাহলে রূপলালের কাছেই থাকে।
হ্যাঁ—
থিয়েটারেই থাকে নিশ্চয়ই রূপলাল?
হ্যাঁ—ষ্টেজের পিছনে ঘর আছে সেই ঘরেই থাকে রূপলাল।

॥ ১৪ ॥

রূপলাল এসে ঘরে ঢুকল।
যন্ডা পেশী বহুল চেহারা। বয়েস চল্লিশের মধ্যেই বলে মনে হয়। পরনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড়।
মাথায় চকচকে তেড়ি।
ছোট ছোট দুটো চোখ—বেশ রক্তিম। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ধূর্ত প্রকৃতির লোক।

কিরীটির হঠাৎ মনে হয় রূপলালের মুখটা যেন তার চেনা, কবে কোথায় যে দেখেছে কিন্তু সঠিক মনে করতে পারে না, মনের মধ্যে হাতড়াতে থাকে। কোথায় দেখেছে রূপলালকে সে—কোথায়?

তোমার নাম রূপলাল? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জী।

দেশ কোথায় তোমার?

জী—ছাপরা জিলা।

এখানে কত মাইনে পাও?

জী?

মাইনে কত পাও?

আশি রূপেয়া—

রূপলাল!

জী!

সে রাত্রে ষ্টেজের দরজায় তালা দিয়েছিলে?

জরুর।

ষ্টেজে যখন তালা লাগাও তখন ষ্টেজে কাউকে দেখেছিলে?

নেহি।

রূপলাল!

জী!

সে রাত্রে তুমি কতটা সরাব পিয়েছিলে?

এক বুঁদও খাইনি হুজুর—

ঝুট মাত্ বোল—

বিশ্বোয়াস করিয়ে সাব্—ম্যায় নে—

আবার ঝুট বলছো! তুমি খেয়েছিলে। আমি জানি—

রূপলাল আচমকা যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। চুপ করে থাকে।

কি—খাও নি? সাচ্ সাচ্ বাতাও—

জী। খুব সামান্য—

কতটুকু?

খুব সামান্য।

হুঁ! ষ্টেজে তালা লাগাবার আগে ত সব আলো নিভিয়ে দিতে তাই না?

জী।

সাজঘরের আলো জ্বলছে কিনা দেখতে না?

ওহি ত হামার কাম সাব্—

সেদিন রাত্রে শো শেষ হবার পর তাহলে তুমি সব আলো নিভিয়ে সাজঘরে চাবি দিয়েছিল, রূপলালকে প্রশ্ন করে কিরীটী।

জী।

এ ঘরের আলোও নিভিয়েছিলে?

জী হাঁ—

না নেভাওনি। তুমি আবার ঝুট্ বলছো।

হঠাৎ কিরীটীর প্রতিবাদে রূপলাল যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়।

বোকার মত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে।

তুমি এ ঘরে ঢোকইনি, তাই না রূপলাল?

এ ঘরের আলোটা নিভানই ছিল—ঘর অন্ধকার ছিল তাই—

এ ঘরের ঢোকনি তুমি তাই ত!

না আমি ঢুকিনি।

অতঃপর রূপলালকে বিদায় দিল কিরীটী।

কিরীটী এবারে শম্ভু চাটুয্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার মুখে কাল সব শুনে ঐরকমই আমি একটা মনে মনে ধারণা করেছিলাম শম্ভু। কারণ আমার বিশ্বাস, সে-রাত্রে শেষ সিন করে মায়াদেবী এই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ী অতর্কিতে একটা কাপড় বা রুমাল জাতীয় কিছু দিয়ে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে তার মুখ বন্ধ করে দেয়, তারপর—

কি—কি তারপর! শম্ভু শুধায়।

তারপর আততায়ী তাকে স্ট্রাঙ্গল্ করে, মানে শ্বাসরোধ করে মায়াদেবীকে হত্যা করে। এবং কাজ শেষ করে বাথরুমের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার আগে এ ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যায়।

তাহলে তুমি বলতে চাও—কিরীটী—

হ্যাঁ—আততায়ী এই ঘরের মধ্যে আগে থাকতেই ওৎ পেতে ছিল।

কিন্তু কোথা দিয়ে এলো আততায়ী এ ঘরে?

সম্ভবতঃ বাথরুমের দরজা-পথেই।

কিন্তু—

কিম্বা এমনও হতে পারে আততায়ী কোন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে স্টেজের ভিতর দিয়েই, সকলের চোখের সামনে দিয়ে এক ফাঁকে এই ঘরে এসে ঢুকে আত্মগোপন করেছিল। এবং সম্ভবতঃ তখন মঞ্চে শেষ সিন অভিনীত হচ্ছে—রূপলাল এবং অনেকেই হয়ত তাকে দেখেছে আসতে। কিন্তু স্ত্রীলোকের বেশ থাকায় কেউ হয়ত দেখলেও তাকে সন্দেহ করেনি—

তাহলে তুমি বলতে চাও সে রাত্রে মায়াদেবীর হত্যাকারী কোন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে আগে থাকতেই বাথরুমের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওৎ পেতে ছিল? শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

সেই রকমই যে ঘটেছিল তা আমি বলিনি তবে তেমনটা ঘটে থাকতেও পারে। কিরীটী বলে।

তাহলে ব্যাপারটা Pre-arranged!

মনে হয় তাই।

শম্ভু চাটুয্যেকে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হয় অতঃপর।

কিরীটী বলে, সে রাতটা ছিল থিয়েটারের স্পেশাল নাইট। শততম রজনী-উৎসব। অন্যান্য রাত্তির চাইতে সে রাত্রে সবাই ব্যস্ত থাকবে—উৎসবের ব্যাপার—সেই জন্য হয়ত হত্যাকারী বিশেষ করে ঐ রাতটিই বেছে নিয়েছিল তার কাজ হাসিল করবার জন্য, তাছাড়া আর একটা কথা ভুলে যেও না—

কি?

শম্ভু চাটুয্যে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

মায়াদেবীকে সত্যি সত্যি কেউ সে রাত্রে শোর পর থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতেও দেখেনি—

কিন্তু রামপ্রসাদ—

সেও হলফ্ করে বলতে পারেনি কথাটা, এখন কথা হচ্ছে—

কি?

কেউ সে রাত্রে মায়াদেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না!

রামপ্রসাদের অজ্ঞাতে ত সেটা হতে পারে না, রামপ্রসাদই তাই বলে গেল।

কিন্তু রামপ্রসাদের অজ্ঞাতেও ত কেউ যেতে পারে স্টেজের ভিতরে—

তার মানে?

মানে যদি কোন স্ত্রীলোক হয়—যাক্ গে—এবারে তোমাদের অশোবাবুকে ডাক।

সাজঘরের সামনেই সরু জায়গাটায় যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভিড় করেছিল তাদের মধ্যে অশোকও ছিল।

শম্ভু চাটুয্যে অশোককে ঘরে ডেকে নিয়ে এল।

॥ ১৫ ॥

বয়েস হলে কি হবে এবং রগের দু'পাশের চুলে রূপালী ছোঁওয়া লাগলে কি হবে এখনও চেহারার মধ্যে রীতিমত একটা জৌলুস আছে যেন।

সুন্দর—সুগঠিত সুশ্রী চেহারা।

বসুন অশোকবাবু! কিরীটীই আহ্বান জানাল।

আপনি? অশোক প্রশ্ন করে, আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে যেন মনে হচ্ছে।

দেখে থাকবেন হয়ত—

শম্ভু চাটুয্যেই তখন বলে, কিরীটী রায়।

অশোক সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

বসুন অশোকবাবু—আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, কিরীটী বলে।

অশোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

অশোকবাবু!

বলুন!

সে রাত্রে আপনি ঠিক কখন থিয়েটার থেকে যান?

বলতে পারেন শো ভাঙ্গার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—

শুনলাম আপনার সে রাত্রে নাইট সুটিং ছিল।

হ্যাঁ—

সুটিং হয়েছিল সে রাত্রে?

না—

বাড়িতে ফিরে আসেন কখন তাহলে স্টুডিও থেকে?

প্রায় সোয়া দুটো হবে—

শুনেছি ইদানীং মায়াদেবীর যে দিন শো থাকতো শোর পর তিনি আপনার সঙ্গেই যেতেন।

হ্যাঁ—ওকে নামিয়ে দিয়ে যেতাম মধ্যে মধ্যেই—

তাহলে রোজ যেতেন না?

না।

সে রাত্রে কি মায়াদেবী জানতেন যে আপনার নাইট সুটিং আছে?

হ্যাঁ—আগে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম শিবুকে দিয়ে—

জানিয়ে দিয়েছিলেন!

হ্যাঁ—

আচ্ছা শো ভাঙ্গার পরই আপনি সে রাত্রে চলে গিয়েছিলেন বলছেন—রাত তখন আন্দাজ কটা হবে?

সে রাত্রে শো ভাঙ্গে নটা চল্লিশে, দশ মিনিটের মধ্যেই আমি চলে যাই।

আপনি যখন থিয়েটার থেকে বের হয়ে যান—কেউ আপনাকে দেখেছিল?

কেন! সৌরীনইত জানে সে কথা—বেরুবার সময় প্যাসেজে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়—

আচ্ছা অশোকবাবু স্টুডিও থেকে কিসে আপনি ফেরেন?

স্টুডিওতে আমি যাইনি—

যানই নি?

না—থিয়েটার থেকে বেরুতেই প্রোডাকসনের একটি ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়—সে সুটিং হবে না ক্যানেসেলড্ হয়ে গিয়েছে সেই কথাটাই আমাকে বলতে আসছিল। তার মুখে সুটিং হবে না শুনে আর স্টুডিওতে যাই নি।

কোথায় গিয়েছিলেন তাহলে থিয়েটার থেকে বের হয়ে সে রাত্রে?

ক্ষমা করবেন—সেটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তার মানে কোথায় সে রাত্রে গিয়েছিলেন আপনি বলতে চান না!

যা মনে করেন।

শুনেছি ইদানীং মায়াদেবীর সঙ্গে আপনার বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—

তা যদি হয়েই থাকে ত তাতে কি?

না তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ঘনিষ্ঠতা বলতে কি আপনি মীন্ করছেন জানি না—তবে মেয়েটিকে আমার ভাল লাগত—

মধ্যে মধ্যে শোর পর মায়াদেবী আপনার ফ্ল্যাটে যেতেন?

যেতো—

মধ্যে মধ্যে রাতও কাটাতেন মায়াদেবী আপনার ফ্ল্যাটে—

মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা?

হ্যাঁ—সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। মাঝে মাঝে রাত্রে আমার সঙ্গে যেতো তবে কখনো সেখানে কোনদিন রাত্রে থাকেনি।

ওঃ আমি যেন শুনেছিলাম মায়াদেবী মধ্যে মধ্যে রাত্রে আপনার ফ্ল্যাটে রাত কাটাতেন।

॥ ১৬ ॥

অতঃপর কিরীটী শম্ভু চাটুয্যেকে কি যেন ইংগীত করে।

শম্ভু একটা সাদা কাগজ ও একটা কলম অশোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, অশোকবাবু যা খুশি আপনার দু'লাইনে এই কাগজটায় লিখে নামটা সই করে দিন।

অশোক ভ্রূ কুঞ্চিত করে শম্ভু চাটুয্যের দিকে তাকায়।

কই লিখুন।

কিন্তু কেন বলুনত!

লিখুন না—পরে বলছি—কিরীটী এবার বলে।

অশোক মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে—যেন একটু ইতঃস্তত করে তারপর কাগজটা টেনে নিয়ে নিজের পকেট থেকেই ঝর্ণা কলমটা বের করে খস্ খস্ করে দুটো লাইন লিখে নাম সই করে কাগজটা শম্ভু চাটুয্যের হাতে ফিরিয়ে দিল, নিন—কিন্তু এবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—এটার কি প্রয়োজন ছিল?

কিরীটীর ইংগীতে আবার শম্ভু চাটুয্যে মায়ার মার দেওয়া একখানা চিঠি পকেট থেকে বের করে অশোকের দিকে এগিয়ে দেয়।

কি এটা?

একটা চিঠি।

চিঠি?

হ্যাঁ—পড়ে দেখুন ত—এই চিঠির হাতের লেখাটা আপনি চেনেন কিনা!

অশোক শম্ভু চাটুয্যের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ল—

এ ত দেখছি মায়াকে লেখা চিঠি! অশোক বলে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ—হাতের লেখাটা চিনতে পারছেন?

না।

কে মায়াদেবীকে ঐ ধরনের চিঠি লিখতে পারে বলে আপনার মনে হয়।

বলতে পারবো না।

মায়ার কোন শত্রু ছিল আপনার মনে হয়—

কেমন করে জানব!

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী—

কার?

ধরুন আপনারই—

ননসেন্স্—কি আবোল তাবোল সব বকছেন। আমাদের মধ্যে সে রকম কোন relation-ই ছিল না কোনদিন।

অশোকবাবু আপনি শকুন্তলাদেবী নামে কাউকে চিনতেন?

হঠাৎ যেন মনে হলো অশোক একটু থতমত খেল—কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ় গলায় বলে, না—ও নাম কখনো পূর্বে শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না।

ভদ্রমহিলা দক্ষিণী—তার স্বামীর নাম ছিল অবিনাশলিঙ্গম—একটা বিলিতী কম্পানীতে পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন—

না—ও নামে কাউকে কখনও আমি চিনতাম না।

স্বামী স্ত্রী ওরা ভূপেন বোস য়্যাভিনুর দোতলার একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতেন, মনে করবার চেষ্টা করুন—আমি জানি আপনি তাদের চিনতেন—তাদের ফ্ল্যাটে আপনার যাতায়াতও ছিল—শুধু তাই না—আপনার ও শকুন্তলা দেবীর একটা ফটোও—

ফটো!

হ্যাঁ—ফটোটা তার মৃত্যুর পর তার হ্যান্ড-ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায়।

অশোক চুপ করে থাকে।

কি। মনে পড়ছে এবার বোধহয় আপনার অশোকবাবু।

য়্যা—হ্যাঁ—মানে তেমন কিছু না—সামান্য আলাপ ছিল, এক আধবার গিয়েছি তাই মনে পড়ছিল না।

যাক শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনার মনে পড়ছে ভদ্রমহিলাকে—কিন্তু তার ফটোটা দেখে মনে হয় না যে সামান্য আলাপ মাত্র ছিল আপনাদের মধ্যে।

মানে—

মানে পুলিশের তাই ধারণা—

পুলিশ!

হ্যাঁ—আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—ঐ শকুন্তলাকে একদিন ছোরা বিদ্ধ মৃত অবস্থায় তার ফ্ল্যাটের বেড্-রুমে পাওয়া যায়। অবিনাশ লিঙ্গম সে সময় টুরে কলকাতার বাইরে ছিল—মনে পড়ছে নিশ্চয়ই সব কথা আপনার।

হ্যাঁ—তবে—

বলুন!

সে সময়ই ত পুলিশকে আমি বলেছিলাম শকুন্তলাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় আমার ছিল তবে তার সঙ্গে তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না কোন দিনই—

কিন্তু পুলিশ আপনার সে কথা বিশ্বাস করেনি।

না বিশ্বাস করলে আমি আর কি করতে পারি!

না—তাই বলছি—তা ছাড়া আপনি বোধহয় জানেন না—শকুন্তলা দেবীর মৃত দেহ পোষ্ট-মর্টম্ করে জানা গিয়েছিল যে সে সময় শকুন্তলা সন্তান সম্ভবা ছিল—

তাই নাকি?

হ্যাঁ—অথচ অবিনাশলিঙ্গম বিবাহের আগে থাকতেই পুরুষত্ব হীনতায় ভুগছিল—তার পক্ষে কোন দিনই সন্তানের বাপ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

কে বললে আপনাকে?

পুলিশের কাছেই অবিনাশলিঙ্গম নিজের জবান বন্দীতে বলেছে কথাটা। এবং সেই কারণেই তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের বছর দুই পর থেকেই একটা মনকষা-কষি চলছিল—যদিও সে কারণে সেপারেশন্ বা ডির্ভোস হয় নি শেষ পর্যন্ত—

কথাটা একটু absurd বলে মনে হচ্ছে নাকি মিঃ রায়?

হ্যাঁ শুনতে absurd-ই মনে হবার কথা তাহলেও তাদের মধ্যে মানে তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা তখন পর্যন্ত বজায়ই ছিল যে কারণেই হোক; এবং ঐ সময়ই সম্ভবতঃ আপনার সঙ্গে শকুন্তলা দেবীর পরিচয় হয়—

আপনি দেখছি অনেক কিছুই জানেন মিঃ রায় শকুন্তলা দেবী সম্পর্কে। অশোকের গলার স্বরে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়।

তা অবশ্য জানি। কারণ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে সে সময় শকুন্তলা দেবীর হত্যা রহস্যের কিনারা করবার জন্য অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল যদিও শেষ-পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তেই তারা পৌঁছাতে পারে নি। এবং আজও পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগ তাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে—

তা আমাকে এ সব প্রশ্ন করছেন কেন মিঃ রায়? আপনার কি ধারণা আমিই আপনাদের সেই শকুন্তলা দেবীকে হত্যা করেছি?

সে জন্য নয়—

তা হঠাৎ আজকের মামলার মধ্যে সে প্রসঙ্গটা আসছে কি করে?

আপনার সঙ্গে শকুন্তলা দেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল কথাটা জানতে পেরেই আমি আপনাকে প্রশ্নগুলো করেছি যদি আপনি সেই ব্যাপারে কোন আলোক-সম্পাৎ করতে পারেন কিছুটা এই আর কি!

তা এতকাল পরে পুলিশের ঐ কথাটা মনে হওয়ার কারণ? তাছাড়া পুলিশ যদি আমাকে সন্দেহই কবে থাকবে তাহলে তখনই বা আমাকে গ্রেপ্তার করেনি কেন?

তাহলে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি। স্ত্রীর মৃত্যুর পরই অবিনাশলিঙ্গম তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তার দেশে ত্রিচিনাপল্লীতে চলে যায় এবং কয়েক মাস পরে ব্যবসা শুরু করে বেশ একটা মোটা টাকার মূলধন নিয়ে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—এবং এখনো মধ্যে মধ্যে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচ-দশ হাজার করে টাকা পায়,—যদিও পুলিশ জানতে পারে নি টাকার উৎসটা, কোথায়, অর্থাৎ কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে অবিনাশলিঙ্গম গত এক বছর ধরে মধ্যে মধ্যে ঐ টাকাটা পাচ্ছে—আপনি তো তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আপনি বলতে পারেন এমন কোন source তার টাকা পাওয়ার থাকতে পারে কি-না।

না—ক্ষমা করবেন। আমি জানি না—জানবার কোন কারণও আমার দিক থেকে থাকতে পারে না।

কিরীটী মৃদু হাসল, তারপর বলে—

পুলিশের আর একটা ধারণা কি জানেন?

কি?

ব্ল্যাক মেইলিং করেই কাউকে অবিনাশলিঙ্গম ঐ টাকাটা পাচ্ছে। ব্ল্যাক মেইলং?

হ্যাঁ—।

তা টাকা যে ঐ ভাবে সে পাচ্ছেই আপনারা জানলেন কি করে—আর যদি জানতেই পারছেন তো আজও তার হদিস করতেই বা পারছেন না কেন?

কারণ টাকাটা চেকে পেমেন্ট হয় না—

তবে—

নগদ পেমেন্ট হয়—

কি করে জানলেন?

জানতে পারা গেছে, তার পরই হঠাৎ একটু চুপ করে থেকে কিরীটী বলে, আচ্ছা অশোকবাবু, আপনি যখন কোন ছবিতে কাজ করেন ব্ল্যাক-মানি নেন তাই না?

না—

নেন—একথা সকলেই আপনাদের লাইনে জানে। এবং যেহেতু কাগজে-কলমে তার কোন প্রমাণ থাকে না বলেই আপনারা যাঁরা ব্ল্যাক মানি নিয়ে থাকেন—বরাবর ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান।

অশোক কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

যাক—এবারে আপনি যেতে পারেন আমার আপনাকে যা জিজ্ঞাস্য ছিল জিজ্ঞাসা কবা হয়ে গিয়েছে। অশোক ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ১৭ ॥

অশোক ও কিরীটীর কথা-বার্তা এতক্ষণ সৌরীন কুন্ডু ও শম্ভু চাটুয্যে দুজনাই মনোযোগেব সঙ্গে শুনছিল কেউ একটি কথা বলেনি।

অশোক ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর শম্ভু চাটুয্যে বলে, শকুন্তলা দেবীর হত্যার ব্যাপারটা ত বছর খানেক আগেকার ঘটনা কিরীটী—

তাই। এবং এতদিন রহস্যটা অনুদঘাটিত থাকলেও মনে হচ্ছে এবাবে হয়ত আসল ব্যাপাবটা জানা যাবে।

কিরীটী বাবু!

সৌরীন কুন্ডুর ডাকে কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকাল।

একটা কথা জিজ্ঞাসা কববো কিছু যদি মনে না করেন –

নিশ্চয়ই না। বলুন।

অশোককে কি আপনারা সন্দেহ করছেন?

টাকাটা অবিনাশলিঙ্গম কোথা থেকে পাচ্ছে অন্তত সে-কথাটা অশোক বাবু জানেন এটাই আমার ধারণা—যাক আমাদের কাজটা এখনো শেষ হয়নি, এবারে অলক্তবাবুকে ডাকুন—

শম্ভু চাটুয্যেই ঘর থেকে বের হয়ে অলক্তকে ডেকে নিয়ে এল।

বয়স বেশী না অলক্তর।

চব্বিশ পঁচিশের মধ্যেই হবে।

বেশ বলিষ্ঠ চেহারা—গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম।

আপনার নামই অলক্ত বসু?

কিরীটী প্রশ্ন করে।

মুখটা বেশ গম্ভীর অলক্তর—মনে হয় সে যেন একটু বিরক্তই হয়েছে।

অলক্ত মৃদু স্বরে জবাব দেয়, হ্যাঁ—

বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!

হঠাৎ অলক্ত যেন রীতিমত বিরক্তি-ভরা কণ্ঠেই বলে ওঠে, আচ্ছা আপনারা সকলে এখনো এভাবে একটা ফার্স করছেন কেন বলুন ত মায়ার হত্যার ব্যাপারটা নিয়ে?

ফার্স করছি? কিরীটী বলে।

তাছাড়া এটাকে আর কি বলবো!

কেন বলুন ত!

কেন আবার কি! সবটাইত বোঝা যাচ্ছে কার কীর্তি।

কিরীটী বলে, কার কীর্তি আপনি জানেন নাকি অলক্তবাবু?

কেবল আমি কেন; একটু সামান্য মস্তিষ্কের চালনা করলেই আপনাদেরও মশাই বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়—

আপনার ধারণা তাহলে অশোকবাবুই মায়াদেবীকে হত্যা করেছেন সে রাত্রে!

নিশ্চয়ই।

কিন্তু কেন বলুন তো—আপনি আপনার জবান-বন্দীতে বলেছেন ওদের মধ্যে ভালবাসা হয়েছিল তাই নয় কি?

হ্যাঁ—সে কথা থিয়েটারের সবাই জানে।

তাই যদি হয় ত অশোকবাবু off all persons তার সেই ভালবাসার পাত্রীকে হত্যাই বা করতে যাবেন কেন!

ও পারে। ও সব পারে—

কিন্তু কেন! আপনি কোন যুক্তিতে ও-কথা অত জোর গলায় বলছেন?

অতশত জানি না মশাই—তবে আমি হলফ্ করে বলতে পারি ও মানে ঐ অশোকবাবুরই কাজ—

কিন্তু যাকে ভালবাসে তাকে কেউ—

ঐ—ঐখানেই আপনাদের ভুল হয়েছে—

ভুল হয়েছে!

হ্যাঁ—অশোকবাবু ওকে কেবল ভোগ করতেই চেয়েছিল—ভালবাসাবাসির কোন গন্ধও ছিল না কোথায়ও।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—আর সেই কারণেই মায়া অশোকবাবুকে প্রচন্ড রকম ঘৃণা করতো—ডিসলাইক্ করতো—

তাই যদি ত মায়াদেবী অশোকবাবুর ফ্ল্যাটে যেতেন কেন রাত্রে?

এটা বুঝলেন না—পুয়োর গার্ল, ওর পয়সার দরকার ছিল আর আপনাদের অশোকবাবু তারই সুযোগটা পুরোপুরি নিয়ে—

বুঝলাম কিন্তু সে জন্য অশোকবাবু তাকে খুন করতেই বা যাবেন কেন?

অশোকবাবু যে মুহূর্তে জানতে পেরেছিল মায়া তাকে ঘৃণা করে তখনই আক্রোশের বশে তাকে খুন করে।

কিন্তু অলক্তবাবু, আপনি হয়ত এখনো জানেন না শম্ভুবাবু আপনাকেই সন্দেহ করছেন—

কি বললেন?

বললাম ত শম্ভুবাবুর ধারণা তাই—

Nonsense. আমি—আমি মায়াকে হত্যা করেছি—

সেটাই ত স্বাভাবিক—

মানে? কি বলতে চান আপনি?

আপনি মায়াদেবীকে ভালবাসতেন তাই—

অলক্ত যেন হঠাৎ চুপসে যায়।

কি! চুপ করে গেলেন যে! ভালবাসতেন না?

না—

ভালবাসতেন না?

না।

আচ্ছা অলক্তবাবু—এই থিয়েটারের চাকরি ছাড়া আপনার উপার্জনের আব কোন source ছিল কি?

আমি একটা মার্চেন্ট অফিসে কাজ করি।

কতদিন সেখানে কাজ করছেন?

মাস পাঁচেক হলো।

মাইনা কত?

দেড়শ—।

কতদূর পর্যন্ত আপনি লেখাপড়া করেছেন?

বি, এ পর্যন্ত পড়েছি।

হুঁ। এবার বলুন ত অলক্তবাবু—আপনার সঙ্গে মায়াদেবীর এতটা ঘনিষ্ঠতা যদি নাই ছিল ত আপনি তাকে চিঠি লিখে সাবধান বলুন, সাবধান-থ্রেটেন বলুন থ্রেটেন করতে চেয়েছিলেন কেন?

কি বলছেন পাগলের মত। আমি মায়াকে চিঠি দিয়েছি!

চিঠি কখনো তাকে আপনি লেখেন নি বলতে চান?

নিশ্চয়ই না—

আর ইউ সিওর?

হ্যাঁ—

কিরীটী পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে অলক্তর দিকে এগিয়ে ধরে বলে, দেখুন ত এই হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা!

কি ওটা—

দেখুন না—একটা চিঠি!

চিঠি—কার চিঠি?

দেখলেই বুঝতে পারবেন। মায়াদেবীর সুটকেশে যে চিঠিগুলো পাওয়া গিয়েছে—তারই একটা এটা—

সুটকেশে পাওয়া গিয়েছে!

হ্যাঁ—দেখুন না—

হঠাৎ যেন অলক্তর মুখের চেহারার পরিবর্তন ঘটে—মুখটা তার কেমন যেন ফ্যাকাশে বিবর্ণ মনে হয়, একটু ইতঃস্তত করে তারপর নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে কিরীটীর হাত থেকে চিঠিটা নেয়।

দেখুন—চেনেন—চিনতে পারছেন কার হাতের লেখা চিঠি।

অলক্ত চিঠিটা পড়লো!

তারপর কিরীটির মুখের দিকে তাকাল।

এ—এ চিঠি কোথায় পেয়েছেন?

বললাম ত—মায়াদেবীর সুটকেশে, আপনারই লেখা চিঠিটা তাই নয় কি?

না—

আপনার লেখা চিঠি নয়?

না-

ওঃ তা বেশ—বলে কিরীটী কাগজ ও পেনটা এগিয়ে দেয়—এই কাগজটায় যা হয় দুটো লাইন লিখে আপনার নামটা সই করে দিন—

মানে!

যা বললাম তাই করুন—

কেন?

উনি যা বলছেন—করুণ অলক্তবাবু—এবারে শম্ভু চাটুয্যেই বলে।

কিন্তু কেন! কেন আমি লিখবো—লিখবো না আমি—

তীব্র ঝাঁঝাল গলায় প্রতিবাদ করে ওঠে অলক্ত।

লিখবেন না?

না—

না লেখার অর্থ বুঝতে পারছেন আপনি অলক্তবাবু? শম্ভু চাটুয্যে বলে।

বুঝতে আমি চাই না—

কিরীটী বাধা দেয়, থাক শম্ভু উনি যখন লিখতে চাইছেন না—

তখন বাধ্য হয়েই ওকে এ্যারেষ্ট করতে হবে—শম্ভু চাটুয্যে বলে।

এ্যারেস্ট করবেন আমাকে! কেন?

মায়াদেবীকে হত্যার অপরাধে—

আমি তাকে হত্যা করেছি আপনাদের ধারণা তাহলে?

স্বাভাবিক সেটাই ত—

তাহলে শুনুন—চিঠিগুলো আমারই লেখা কিন্তু হত্যা তাকে আমি করিনি—চিঠিতে তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম—

সাবধান করে দিয়েছিলেন—

হ্যাঁ করেছিলাম—কারণ ওকে সত্যি-সত্যিই আমি ভালবাসতাম।

যাকে ভালবাসি সে দিনের পর দিন আমার চোখের সামনে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে—সেটা সইতে পারছিলাম না বলেই ওকে ঐ ভাবে চিঠি দিয়েছিলাম দারোগাবাবু, বলতে বলতে অলক্তর গলার স্বর যেন অশ্রুতে বুজে আসে।

নিজেকে বুঝি একটু সামলে নিয়ে আবার বলে, কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে শেষ পর্য্যন্ত ওকে এমন ভাবে নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হবে, বিশ্বাস করুন, স্বপ্নেও আমি ভাবিনি—

অলক্তর চোখের কোল বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ঠিক আছে আপনি বাইরে গিয়ে বসুন—প্রদীপবাবুকে পাঠিয়ে দিন—

॥ ১৮ ॥

প্রদীপ এলো।

রোগা পাতলা—সুশ্রী চেহারা প্রদীপের।

কিরীটীই প্রশ্ন শুরু করে—

আপনার সঙ্গে ত মায়াদেবীর যথেষ্ট পরিচয় ছিল প্রদীপবাবু তাই না!

হ্যাঁ—প্রদীপ মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় ব্যাপারটা—মানে কে মায়াদেবীকে হত্যা করতে পারে?

বলতে পারবো না।

কাউকে আপনি সন্দেহও করেন না?

না—

আচ্ছা অশোকবাবুর সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা কেমন?

তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁকেও আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যিকারের উঁচুদরের একজন অভিনেতা অশোকবাবু—

আচ্ছা অশোকবাবুর সঙ্গে মায়াদেবীর যে হৃদ্যতা হয়েছিল সেটা আপনি কি ভাবে নিয়েছিলেন—

ভাল লাগেনি ব্যাপারটা আমার।

কেন?

কারণ আমি জানতাম অলক্ত তাকে ভালবাসে আর সেও অলক্তকে ভালবাসত—কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে অশোকবাবু এলেন—সব যেন বিশ্রী ওলোট-পালোট হয়ে গেল বলে আমার তখন ধারণা হয়েছিল প্রথমে—কিন্তু পরে জানতে পেরেছিলাম যদিও অলক্তকে আমি সে কথা বলা সত্ত্বেও সে আমায় বিশ্বাস করেনি—

কি কথা!

অশোকবাবুর সঙ্গে সে মিশত বটে তবে—মনে মনে অশোকবাবুকে সত্যিই তেমন পছন্দ করতো না—

কি বলছেন আপনি! তাহলে তিনি অশোকবাবুর সঙ্গে ওভাবে—

সেটাই বিস্ময় একটা—তবে আমার মনে হয়েছিল পরে—

কি?

অশোকবাবুর এমন একটা আর্কষণী শক্তি ছিল যেটা হয়ত মায়ার মত দুর্বলচিত্ত মেয়ে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না—

শুধু কি তাই?

না—আরো একটা কথা আমার মনে হয়।

কি?

মায়ার প্রচন্ড উচ্চাকাঙ্খা ছিল মস্তবড় অভিনেত্রী হবে সে—প্রচুর নাম ডাক অর্থ—যেটা সে হয়ত ভেবেছিল অশোকবাবুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলে একদিন তার ভাগ্যে জুটতেও পারে। সেই কারণেই অশোকবাবুর সঙ্গে হয়ত অত ঘনিষ্ঠতা সে করেছে—

কিরীটী মনোযোগ দিয়ে প্রদীপের কথাগুলো শোনে। প্রদীপ একটু থেমে আবার বলে—

অলক্ত মায়ার চরিত্রের ঐটাই জানত যে মায়া তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অত্যন্ত নীচুতেও নেমে যেতে পারত। কিন্তু ঐখানেই মায়াকে চিনতে ভুল করেছিল বলে আমার মনে হয়।

সবশেষে লাবণ্য এলো।

লাবণ্য মেয়েটিই অভিনেত্রীদের শোর সময় তাদের ঘরে থাকত ও তাদের সব কাজে সাহায্য করত।

লাবণ্যকে প্রশ্ন করল কিরীটী, আপনি সে রাত্রে কখন গিয়েছিলেন?

শো শেষ হবার পর—লাবণ্য জবাব দেয়।

কতক্ষণ পরে—

মিনিট দশেক পরে।

যাবার আগে মায়াদেবীর সঙ্গে দেখা হয়নি?

না—আমি বাইরে একটা কাজে গিয়েছিলাম—ফিরে এসে দেখি অন্যান্য অভিনেত্রীরা চলে গিয়েছে—মায়ার ঘর অন্ধকার। তাইতেই ভেবেছি মায়াও বুঝি চলে গিয়েছে।

অন্ধকার ঘর দেখে আর এ ঘরে ঢোকেননি?

না। তবে—

কি—

সেদিন দারোগাবাবুকে আমি বলিনি—আমি যখন বের হয়ে যাই—প্যাসেজে এই ঘরের দরজার সামনে একজন ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম—

জিজ্ঞসা করেন নি সে কে?

না—একজন প্রৌঢ় বিধবা মহিলা প্রায়ই আসেন অভিনেত্রীদের কাছে ভিক্ষা নিতে। ভেবেছি বুঝি তিনিই—

কে তিনি?

শুনেছি এককালে তিনি নাকি স্টেজে অভিনয় করতেন—

আপনি জানেন সৌরীনবাবু কে সে?

হ্যাঁ মানদাসুন্দরী—সে আসতো প্রায়ই থিয়েটারে সাহায্যের জন্য—

কোথায় থাকেন তিনি জানেন?

জানি—নেবুতলায় একটা খোলার বস্তিতে—

তাঁকে এখুনি কি একবার গাড়ি পাঠিয়ে ডেকে আনা যায়?

চেষ্টা করে দেখতে পারি—

তবে দেখুন একটু—আর ভাল কথা, ওদের সব আজকের মত যেতে বলুন—কাল ত রবিবার থিয়েটার আছে—কাল সেকেণ্ড শোর পর আবার আমরা এখানে মিট্ করবো ওদের বলে দিন।

বেশ।

সৌরীন কুণ্ডুর প্রেরিত লোক আধঘন্টার মধ্যেই ফিরে এলো।

মানদাসুন্দরী আসতে পারে নি—সপ্তাহ দুই ধরে অসুস্থ; একেবারে শয্যাশায়ী বললেও হয়।

রাতও হয়েছিল। প্রায় সাড়ে এগারোটা।

কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের দিকে চেয়ে বললে, চল ওঠা যাক—

শম্ভু চাটুয্যে উঠে দাঁড়ালো।

সৌরীন কুণ্ডু মহাবীর সিংকে একটা ট্যাক্সী ডেকে আনতে বলে তার জন্য।

মহাবীর সিং এগিয়ে যাচ্ছিল গেটের দিকে। লবিতে এক পাশে দাঁড়িয়ে কিরীটী হাতের সিগ্রেটটায় টান দিচ্ছিল, সে বাধা দেয়, থাক্ মহাবীর সিং ডাকতে হবে না, আপনি কোন দিকে যাবেন কুণ্ডু মশাই,—

মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের দিকে—

চলুন আমার গাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবোখন—

না, না—আবার আপনি কেন কষ্ট করবেন—

কষ্ট আর কি ঐ পথেই ত আমি যাবো।

শম্ভু বলে, তাহলে আমি চলি কিরীটী—

কিরীটী শম্ভুকে দাঁড়াতে বলে নিজের হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল—রাত তখন প্রায় পৌনে বারটা।

কি যেন আপন মনেই ভাবল কিরীটী—তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, শম্ভু—

কি?

আমার মনে হয় আর দেরি করা উচিত হবে না—

কি ব্যাপার?

অলক্তবাবুর বাড়ি তুই চিনিস?

চিনি না তবে ঠিকানা জানি—পাতিপুকুরে থাকে—

চল একবার সেখানে যাই—

সেখানে কেন?

সৌরীন কুণ্ডু বা শম্ভু চাটুয্যে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না অত রাত্রে হঠাৎ অলক্তর বাসায় যাবার এমন কি জরুরী প্রয়োজন বোধ করল কিরীটী।

কিন্তু কিরীটী আর কোন কথাই বলে না, এগিয়ে যায় সোজা তার গাড়ির দিকে—

অগত্য ওরা দুজনে ওকে অনুসরণ করে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। কিরীটী দুইজন পুলিশকে থানা থেকে যাবার পথে তুলে নিতে বললো শম্ভুকে।

॥ ১৯ ॥

গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিরীটী ড্রাইভারকে গাড়ি পাতিপুকুরের দিকে চালাতে বললো।

শীতের মধ্য রাত—স্তব্ধ, জনমনুষ্যহীন।

মধ্যে মধ্যে কেবল দু'একটা রিক্সা টুং টাং করতে করতে মন্থর গতিতে চলেছে বা দু'একটা ট্যাক্সি ছুটে চলে যায়।

ট্রাম অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

যাত্রীবাহী শূন্য একটা বাস চলে গেল—বোধহয় গ্যারেজে।

কিরীটী চুপচাপ বসে চুরোট টেনে যাচ্ছে—ওরা দুজনে পাশে বসে আছে কিন্তু কারো মুখেই

কোন কথা নেই।

শম্ভু চাটুয্যে অবিশ্যি বুঝতে পারছিল বিশেষ একটা কারণেই এত রাত্রে চলেছে অলক্তর গৃহে কিরীটী।

থানা থেকে দু'জন পুলিশকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

তবে কি শেষ পর্যন্ত অলক্তই নাকি! তাই নিশীথে এই আয়োজন! এই তড়িঘড়ি!

যাইহোক শেষ পর্যন্ত পাতিপুকুরে পৌছে অত রাত্রে অলক্তর বাসা খুঁজে বের করতে একটু যেন কষ্টই হয়।

এত রাত্রে কাউকে চোখে পড়ছে না—কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তোলাও যায় না।

বিষম মুশকিলে পড়ে ওরা—এদিক ওদিক অনির্দিষ্টভাবে ঘুরতে থাকে। কিরীটীর হঠাৎ নজরে পড়ে রাস্তার এক পাশে একটা ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সীর আলোটা নেভানো।

তাহলেও ট্যাক্সির চালকের সীটে বসে কে যেন আবছা অন্ধকারে বিড়ি ফুঁকছে।

সেদিকে এগিয়ে গেল কিরীটী।

সামনে এগোতে ট্যাক্সীর নম্বরটা চোখে পড়ল—নম্বরটা পরিচিত কিরীটীর, সীতারামের ট্যাক্সী।

সীতারাম হয়ত এদিকেই থাকে বা এদিকে কোন সওয়ারী নিয়ে এসে থাকবে, এদিকটা ওর চেনাজানাও হতে পারে—ঐ কথা ভেবেই এগিয়ে যায় কিরীটী—পথের আলো ঐ জায়গায় তেমন আলোকিত করেনি।

ভাড়া যাবে? প্রশ্ন করে কিরীটী।

কে! রায় মশাই—

সীতারাম নাকি?

হ্যাঁ, আপনি—আপনার গাড়ি আনেন নি?

তুমি সওয়ারী নিয়ে এসেছো নাকি!

আর বলেন কেন—এক ঘন্টার কাছাকাছি প্রায় বসে আছি—অপেক্ষা করতে বলে সেই যে এখুনি আসছি বলে গেলেন—

তুমি কি এর আগে এ-পাড়ায় এসেছো?

অনেকবার, কেন বলুন ত?

সাতের বি নম্বরটা কোথায় বলতে পারো?

সামনের ঐ গলির মধ্যে হবে—

কিরীটী ওদের সকলের আগে গলির দিকে এগুতে এগুতে বলে চল শম্ভু।

কিরীটী ওদের আগেই গলির দিকে এগিয়ে যায়।

বেশীদূর যেতে হলো না—খান-সাত-আট বাড়ির পরেই দেখা গেল একটা পানের দোকান বন্ধ হচ্ছে।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দোকানদারকে, এখানে থিয়েটারে অভিনয় করে অলক্তবাবু কোথায় থাকে বলতে পারো ভাই?

ঐ ত সাতের বি—এগিয়ে যান। লোকটা কথাটা বলে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

সাতের বি পাওয়া গেল।

একটা ভাঙ্গা দোতলা বাড়ির একতলার একটা ঘরে তখনো আলো জ্বলছিল—কিরীটী উঁকি দিল রাস্তার দিকে জানালা দিয়ে।

একজন বুড়ো মত লোক বসে তামাক টানছিল।

কিরীটী তাকেই জিজ্ঞাসা করে, এ বাড়িতে অলক্তবাবু থাকেন?

থাকেন, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান—বলে বুড়ো তামাক টানতে লাগল।

সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারে উঠতে উঠতে হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ কানে আসে কিরীটীর।

কিরীটীর পিছনে পিছনে উঠছিল সিঁড়ি দিয়ে শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুণ্ডু।

শম্ভু চাটুয্যে বুঝতে পারিছিল না হঠাৎ কিরীটী এত রাত্রে অলক্তর সন্ধানে পাতিপুকুরে ছুটে এলো কেন!

জিজ্ঞাসাও করেনি কারণ শম্ভু চাটুয্যে কিরীটীকে ভাল করেই চিনত—প্রশ্ন করে ঐ সময় কিরীটীর কাছ থেকে কিছুই জানা যাবে না।

গোঁ গোঁ শব্দটা শুনেই কিরীটী তার চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল, প্রায় লাফিয়ে সিঁড়িগুলো অতিক্রম করেছিল অন্ধকারে।

শম্ভু চাটুয্যেও তার চলার গতি বাড়িয়ে দেয়।

সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে সামনেই যে ঘরটা সবার আগে পড়লো তার দরজাটা খোলাই ছিল এবং ভিতরে আলো জ্বলছিল।

সেই আলোতেই চোখে পড়ে সবার একই সময় ঘরের মেঝেতে দুজন লোক ঝটা-পটি করছে—আর গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে।

কিরীটীই সবার আগে এ লাফে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এবং যারা ঝটাপটি করছিল তাদের উপরে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল।

একজন আর একজনের গলায় কি যেন একটা পেঁচিয়ে তার শ্বাস রোধ করে এনেছে তখন প্রায়।

কিরীটী উপরের লোকটির ঘাড়ে প্রচন্ড জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিতেই লোকটা টলে পড়ে—সেই মুহূর্তে কিরীটী আর একটা ঘুসি চালায় তাকে লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় ঘুসিতে লোকটা এক পাশে টলে পড়ে যায়।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় যে লোকটি তখনো মেঝেতে পড়েছিল তার সামনে গিয়ে তাড়াতাড়ি তার গলা থেকে পেঁচান সিল্কের রুমালটা গোটা দুই টান দিয়ে খুলে নেয়।

লোকটি এলিয়ে পড়ে।

শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুন্ডু এতক্ষণে তার দিকে তাকিয়ে যেন চমকে উঠে—সে আর কেউ নয়—অলক্ত।

এদিকে যে পর পর দুটো ঘুসি খেয়ে টলে পড়েছিল সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কিরীটী তার দিকে ফিরে তাকিয়ে কঠোর গলায় বলে, উঠে দাঁড়াও রূপলাল।

রূপলাল!

সৌরীন কুন্ডুর গলা দিয়ে বিস্মিত একটা শব্দ বের হয় মাত্র, একি সত্যিই ত রূপলাল!

শম্ভু ঐ কুঁজো থেকে জল নিয়ে অলক্তবাবুর চোখে মুখে দাও—

শম্ভু চাটুয্যের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে।

অলক্ত মেঝের উপর তখনো নেতিয়ে পড়ে আছে।

রূপলাল একপাশে যেন পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল।

তার দিকে তাকাল কিরীটী, সৌরীনবাবু, আমি জানতাম মায়াদেবীর হত্যার পিছনে যে আসল ব্রেণ সে আমার মুখ থেকে সব কথা শোনবার পর আর এক মুহূর্তও দেরী করবে না—সর্বাগ্রে অলক্তবাবুকে পৃথিবী থেকে সরাবার তার প্রয়োজন হবেই—আমিও তাই আর দেরি করিনি—সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভুবাবুকে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এত রাত্রেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।

শম্ভু চাটুয্যে তখনো সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি—সে একবার কিরীটীর মুখের দিকে আর একবার রূপলালের মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

॥ ২০ ॥

চোখে মুখে কিছুক্ষণ জলের ছিঁটে দিতেই ধীরে ধীরে অলক্ত চোখ মেলে তাকায় কোন মতে।

কিরীটী জিজ্ঞাসা করে এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি অলক্তবাবু!

হ্যাঁ—

অলক্ত উঠে বসে। গলায় হাত বুলাতে থাকে অলক্ত।

যান—ঐ খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ুন—আপনার সর্বাগ্রে এখন একটু বিশ্রাম দরকার—

অলক্ত অদূরে দন্ডায়মান রূপলালের দিকে চেয়ে বলে, ঐ শয়তানটা যে আমাকে খুন করতে এসেছে তা আমি বুঝতে পারিনি—

বুঝতে পারা আপনার উচিত ছিল, কিরীটী বলে, আর এখন বুঝতে ত পারছেন মিথ্যে

না নিয়ে সব কথা আজ সন্ধ্যাবেলাই আপনার আমাকে জানানো উচিৎ ছিল—

আমি—

আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় ত আপনি নিশ্চয় জানতে পেরেছিলেন কে টাকা খাইয়ে ঐ রূপলালকে মায়াদেবীকে হত্যা করার জন্য নিয়োগ করে—তাই নয় কি!

অলক্ত চুপ করে থাকে।

বলুন চুপ করে থাকবেন না—

আমি ঠিক বুঝতে পারি নি!

বুঝতে পারেন নি?

না মানে অন্ধকারে লোকটা যে কে তা ঠিক চিনতে পারিনি—

তখন না পারলেও পরে অনুমান করতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই—

হ্যাঁ—

সে কথা তাহলে পুলিশকে জানাননি কেন?

ভয়ে—মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় অলক্ত।

কিরীটী এবার শম্ভু চাটুয্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, আর দেরী করো না শম্ভু, রূপলালের হাতে হাতকড়া লাগাও, উনি সাধারণ ব্যক্তি নন—জেল পলাতক এক দুর্ধর্ষ খুনে আসামী—

বল কি!

হ্যাঁ—ওর আসল নাম ছেদীলাল মাহাতো। পুলিশের খাতায় ওর ফটো আছে—তবে চেহারার একটু পরিবর্তন আছে। ফটোতে আছে মাথায় ছোট ছোট কদম ছাঁট চুল আর এখন তেল চকচকে ঢেউ খেলান তেরীর বাহার—

শম্ভু আর দেরী করে না।

নিজেই এগিয়ে গিয়ে ছেদীলাল মাহাতোর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। তারপর কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ওকে তুমি চিনলে কি করে কিরীটী?

ছেদীর মনে নেই—বছর আড়াই আগে ও যখন বিচারাধীন ফাঁসীর আসামী—তখন ওকে আমার এলাহাবাদের ইন্‌সপেকটার বন্ধু শিউশরণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তারই ওখানে মানে থানায় একবার দেখেছিলাম। ও জানত না একবার যে মুখ আমি দেখি বড় একটা ভুলি না—আর সেটাই হয়েছে ওর চরমতম দুর্ভাগ্যের কারণ—একটু কেসে কিরীটী বলে, অনেকদিন আগে দেখলেও আজ সন্ধ্যায় সাজ ঘরে ওকে দেখেই আমি তাই হঠাৎ যেন চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু প্রথমটায় ঠিক ধরতে পারি নি—পরে চিন্তা করতে গিয়ে সব পরিষ্কার হয়ে যায়—সব মনে পড়ে যায়—

রূপলালই—মানে ঐ ছেদীলালই তাহলে—

হ্যাঁ—কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের কথাটা সমাপ্ত করে, মায়াদেবীকে সে রাত্রে ঐ সিল্কের রুমালটার সাহায্যেই গলা পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ করে হত্যা করেছিল।

কিন্তু কেন?

কেন আবার! টাকার লোভে।

কিন্তু কে! কে এমন কাজ করলো! সৌরীন কুণ্ডুই এবারে প্রশ্ন করে।

ঐ রূপলালকেই জিজ্ঞাসা করুন না। কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু রূপলালের কাছ থেকে কোন কিছুই জানা গেল না। লোকটা মুখ খুললো না।

শম্ভু চাটুয্যে অনেক শাসালো কিন্তু রূপলাল যেন একেবারে বোবা!

মুখে শব্দটি নেই।

কিরীটী বলে, ব্যস্ত হয়ো না শম্ভু—আসল ব্যক্তিটি, অর্থাৎ এ খেলার রঙের গোলামটিকে আশা করছি রাত্রেই ধরতে পারবো। কিন্তু আর দেরি নয়—চল এখুনি আমাদের যেতে হবে।

কোথায়?

বেশী দূর নয়। এই কাছেই—

হাতকড়া-বদ্ধ রূপলালকে পুলিশের প্রহরায় একটা জীপে করে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে দুজন কনেস্টবলের সঙ্গে কিরীটীর গাড়িতে সবাই উঠে বসল।

কিরীটী নিজেই ড্রাইভ করছিল।

গাড়িতে স্টার্ট দিতে শম্ভু প্রশ্ন করে, এবারে কোন্ দিকে?

কিরীটী ড্রাইভ করতে করতে মৃদু গলায় বলে, অশোক বাবুকে আমাদের একটু প্রয়োজন—

অশোক!

হ্যাঁ কুন্ডু মশাই, আজকের রাত্রের শেষ কাজটুকু আমাদের অশোক বাবুর সামনেই সম্পন্ন করতে হবে—

কিন্তু এখন কি তাকে তার ফ্ল্যাটে পাওয়া যাবে? সৌরীন কুন্ডু বলে।

চলুন দেখা যাক। হয়ত পাওয়াও যেতে পারে।

গেলেও সে যে এখন কি অবস্থায় আছে!—

কি আর! মদের বোতল নিয়ে বসে আছেন তাই ত!

হ্যাঁ—

অশোকের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে একে একে সকলে গাড়ি থেকে নামল।

সৌরীন কুণ্ডুই সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

পাঁচতলা বাড়ি—ফ্ল্যাট সিসটেম্।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল—ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সবাই তখন ঘুমাচ্ছে।

বারোয়ারী ফ্ল্যাটের মেইন্ গেট খোলাই থাকে—রাত্রি দিন।

দরোয়ান একজন থাকে বটে তবে সে ঐ নামেই। সেও তখন খাটিয়ায় শুয়ে নাসিকাগর্জন করছিল।

সিঁড়িতে আলো ছিল।

সকলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায় সৌরীন কুণ্ডুর পিছনে পিছনে।

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এসে সৌরীন কুণ্ডু দাঁড়াল।

দরজার গায়ে প্ল্যাস্টিক্ প্লেটে অশোকের নাম চোখে পড়ে।

বন্ধ দরজার গায়ে কিরীটীই নক্ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো ভিতর থেকে, কে?

কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুকে ইংগিত করে—সৌরীন কুণ্ডুই সাড়া দেয়, অশোক! দরজাটা খোল—আমি সৌরীন—

একটু পরেই দরজা খুলে গেল—মুখ বাড়াল অশোক খোলা দরজা পথে।

কি ব্যাপার সৌরীন! এত রাত্রে—

কিন্তু কথাটা শেষ হয় না, অশোক হঠাৎ চুপ করে যায়—দরজার সামনে কিরীটী ও শম্ভু চাটুয্যেকে দেখে।

কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে অশোক ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভিতরে আসতে পারি অশোকবাবু? কিরীটী জিজ্ঞাসা করে।

অশোক তার বিহ্বল ভাবটা ততক্ষণে সামলে উঠেছে। বলে, কি ব্যাপার কিরীটীবাবু! এত রাত্রে!—

একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে—

কি কথা?

ভিতরে চলুন বলছি—

অশোক যেন মুহূর্তকাল ইতঃস্তত করে তারপরই দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলে, আসুন—

সকলে ঘরের মধ্যে ঢোকে একে একে।

॥ ২১ ॥

মাঝারী আকারের ঘর।

ঐটাই শোবার ঘর—

দামী আসবাব-পত্র রয়েছে ঘরের মধ্যে তবে সব কিছুই যেন বিশৃংখল—এলোমেলো।

এক পাশে একটা সোফার উপর একটা ছোট সুটকেশ খোলা—পাশে কিছু জামা কাপড়—মনে হলো বোধহয় ঐ সুটকেশে জামা কাপড় গোছান হচ্ছিল। বারেক সে দিকে দৃষ্টিপাত করে কিরীটী অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার—সুটকেশ গোছাচ্ছিলেন মনে হচ্ছে—কোথায়ও যাবেন বুঝি?

হ্যাঁ—কাল সকালে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, মৃদু গলায় জবাব দেয় অশোক।

বাইরে—কোথায়? মাদ্রাজ—

চমকে তাকায় কিরীটীর কথায় ওর মুখের দিকে সঙ্গে সঙ্গে অশোক।

কিরীটী যেন সেটা লক্ষ্যই করেনি এমনি ভঙ্গীতে বলে, কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না—অবিনাশলিঙ্গম কালকের ভোরের প্লেনেই কলকাতায় এসে পৌঁছাচ্ছেন।

অবিনাশলিঙ্গম!

হ্যাঁ—তাঁর সঙ্গেই ত দেখা করতে যাচ্ছিলেন মাদ্রাজ?

কে বললে আপনাকে? তাছাড়া মাদ্রাজ মোটেই আমি যাচ্ছিলাম না।

আমি জানি। আপনি মাদ্রাজেই যাচ্ছিলেন।

ঠিক জানেন? আপনি দেখছি মশাই সর্বজ্ঞ—

সর্বজ্ঞ কি না জানি না—তবে অশোকবাবু, একটু থেমে কিরীটী শান্ত গলায় বলে, আপনি কিরীটী রায় নামটাই হয়ত কেবল শুনেছেন তার সঠিক পরিচয়টা হয়ত আপনার জানা নেই, নচেৎ আপনি বুঝতেন আপনার আজকের সন্ধ্যায় তার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর—আপনার পরবর্তী প্ল্যানটা কি হবে বা হতে পারে সেটা সে অনুমান করে নেবে এবং সেই ভাবেই সে কাজ করবে—

তাহলে এখানে এ সময়ে আসাটা আপনার প্ল্যান মত?

তাই—

অর্থাৎ—

এখনো বুঝতে পারছেন না কিছু?

না—

তাহলে শুনুন—রূপলাল successful হতে পারে নি—

রূপলাল!

হ্যাঁ এবং he has been caught red handed—সে এখন হাজতে এবং আপনার প্ল্যানের একটা অংশ ভেস্তে গিয়েছে—

তাই বুঝি!

হ্যাঁ অশোকবাবু—আপনি নিঃসন্দেহে একজন বড় অভিনেতা—তাহলেও বলবো অভিনয়টা আমার সঙ্গে করবার চেষ্টা না করলে বুদ্ধিরই পরিচয় দেবেন কারণ সেটা কোন কাজেই লাগবে না। শুনুন—আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

এসব কি ব্যাপার সৌরীন! মনে হচ্ছে তুমিও এর মধ্যে আছো—

সেও ত আপনিই ওকে বাধ্য করেছেন অশোকবাবু—কিরীটীই বলে।

দেখুন মশাই, এই রাত দুপুরে আপনাদের এভাবে একজন ভদ্রলোকের শোবার ঘরে হামলা করবার অর্থটা ঠিক এখনো আমি বুঝছি না—তবে বুঝি না বুঝি—আপনাদের সকলকে এই মুহূর্তে এঘর থেকে চলে যেতে বলছি।

অশোকের গলায় রীতিমত উষ্মা ফুটে ওঠে।

যেতে আমরা রাজী আছি অবিশ্যি যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যান—

What do you mean?

চীৎকার করে ওঠে সহসা অশোক।

কিরীটী ফিরে তাকাল শম্ভু চাটুয্যের দিকে, শম্ভু—এই অশোকবাবুই হচ্ছেন শকুন্তলা দেবীর হত্যাকারী—আর এরই নির্দেশে টাকা খেয়ে রূপলাল মায়াদেবীকে গ্রীণরুমে সিল্কের রুমাল গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং—

Are you mad?

আবার চিৎকার করে ওঠে অশোক।

ম্যাড্ যদি কেউ এঘরে এই মুহূর্তে থাকে ত—কিরীটী বলে, সে আপনিই—

Shut up! will you?

গর্জন করে ওঠে আবার অশোক।

চিৎকার করে সব কিছু অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেই যা সত্য—যা ঘটেছে—তা মিথ্যে হয়ে

যাবে না অশোকবাবু, তা হবে না। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। শম্ভু—arrest him.

শম্ভু এগিযে যাবার চেষ্টা করে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দু পা পেছিয়ে অশোক পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে গর্জন করে ওঠে, খবরদার এক পা কেউ এগুবেন ত মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো—হাত তুলুন সবাই—

সহসা যেন সম্পূর্ণ এক বিপরীত পরিস্থিতি!

সবাই নির্বাক—হতচকিত!

সহসা কিরীটী হেসে ওঠে, অশোকবাবু, আপনি কি আমাকে এতই বোকা মনে করেন যে—আপনার পিস্তলের কথাটা আমি বেমালুম ভুলে যাবো—অনেক আগেই ওর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি—ওর ম্যাগাজিনের চেম্বারে একটি গুলিও আর নেই সব আগে থাকতেই আমি বের করে নিয়েছি—

হঠাৎ যেন কেমন থতমত খেয়ে যায় অশোক আর ঠিক সেই মুহূর্তে চকিতে বাঘের মত ঝাপিয়ে পড়ে কিরীটী অশোকের হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়।

হ্যাঁ—এবার শান্ত সুবোধ বালকের মত আমাদের থানার ও. সি.-কে তার কর্তব্য করতে দিন—শম্ভু! arrest him—লৌহ বলয় দুটো এবার পরিয়ে দাও। শম্ভু চাটুয্যে আর দেরি করে না—দরজার গোড়ায় কনেস্টবলটিকে ইঙ্গিত করতেই সে এসে অশোকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

অভিনয় আমরাও করতে পারি অশোকবাবু দেখলেন ত! কিরীটী হেসে বলে, অনেক বড় অভিনেতা আপনি অশোকবাবু—মঞ্চে নানা ভূমিকায় শুনেছি অভিনয় করেছেন—কখনো কোন কয়েদীর ভূমিকাতেও হযত অভিনয় করেছেন—কিন্তু আজকের আমাদের অভিনয়টা নিশ্চয়ই আপনার খুব প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে—যথেষ্ট thrill অনুভব করছেন—

আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে অশোক তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে একবার, তারপরই তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

আর আজকের এই অভিনয়ের দৃশ্যটা কাল যখন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছবিসহ প্রকাশিত হবে—ভাবুন ত কত বড় একটা surprise হবে দর্শকবৃন্দের কাছে যদিও সে সময় তাদের মুখের চেহারাটা আপনি দেখতে পাবেন না। কিরীটী বলে।

অশোক নীরব।

একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হয় না।

অদূরে একটি চমৎকার জাপানী ওয়াল ক্লক দেওয়ালে বসানো ছিল— সেই ক্লকে ঢং ঢং করে রাত চারটা ঘোষণা করল।

কিরীটী বলে, শম্ভু! রাত ত শেষ হয়ে এলো প্রায়—তুমি তোমার আসামীকে নিয়ে যাও আর আমরাও বাড়ী যাই—

সৌরীন কুণ্ডুও এতক্ষণ যেন পাথরের মত স্তব্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্যাপারটা তার কাছে শুধু আকস্মিকই নয় কল্পনারও অতীত ছিল বোধহয়।

চলুন সৌরীনবাবু!

চলুন।

পরের দিন থানায় বসে কিরীটী বলছিল—শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুণ্ডুর সঙ্গে গত রাত্রের ব্যাপারটাই সন্ধ্যার দিকে আলোচনা প্রসঙ্গে, ঘটনাচক্রে শকুন্তলার হত্যার ব্যাপারটা ইনভেসটিগেট্ করতে করতে আমি অশোকের সন্ধানে শম্ভুর ওখানে না গেলে সেদিন সন্ধ্যায় হয়ত ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসাই হতো না—

সৌরীন কুণ্ডু জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অশোককে আপনি সন্দেহ করলেন কি করে?

দুটি কারণে, কিরীটী বলে, ওর প্রতি আমার সন্দেহ জাগে—প্রথমতঃ মায়ার সঙ্গে ওর রীতিমত ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা যেটা আপনাদের কাছ থেকেই জেনেছিলাম—দ্বিতীয়তঃ তার সে রাত্রে সুটিং ক্যানসেল্ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, যে উনি বরাবর নিজের আত্মরক্ষার জন্য চমৎকার ভাবে একটা alibi-র সৃষ্টি করেছিলেন।

কি রকম? শম্ভু শুধায়।

প্রথমতঃ উনি যে প্রকৃতির লোক তাতে করে সে রাত্রে সুটিং ক্যানসেল্ হওয়ায়— সেটা উনি আগে থাকতে জানতে নিশ্চয়ই পেরেছিলেন তাই থিয়েটার থেকে বের হয়ে কোন বিশেষ জায়গায় বা কোন স্ত্রীলোকের কাছে যদি যেতেনই সেটা বলবার ওঁর কোন বাধা থাকবার কথা নয়—তবু উনি বলতে চাননি। একান্ত ব্যক্তিগত বলে এড়িয়ে গিয়েছেন—এবং এড়িয়ে যাচ্ছিলেন বলেই মনে আমার প্রশ্ন জাগে—কোথায় তবে তিনি ছিলেন শো ভাঙ্গাবার পর—রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত কি করেছিলেন! কেনই বা বলতে চাইছেন না সে কথাটা!

কিরীটী একটু থেমে বলে, কিন্তু প্রশ্নই জেগেছিল মনে—কোন সলুশন্ যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পেলাম অলক্তবাবু ও প্রদীপবাবুর কথায়।

কোন কথায় তাদের? শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

মায়াদেবীর একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল বরাবরই সে কারণেই হয়ত সে অশোককে ভর করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিল এমন কি সে কারণে সে নিজের দেহটা পর্যন্ত অশোকের হাতে তুলে দিয়েছিল—হয়ত অবিশ্যি এটা সম্পূর্ণই আমার অনুমান, মায়াদেবী যখন তার স্বার্থের খাতিরে আরো নিবিড় করে অশোকে আঁকড়ে ধরতে চায় এবং যার ফলে হয়ত বেচারী শকুন্তলার মতই অন্তঃস্বত্তা হয় তখন অশোক হয়ত মরীয়া হয়েই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান করে রূপলালকে টাকা দিয়ে হাত করে—

মায়া was pregnant? সৌরীন কুণ্ডু প্রশ্ন করে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ—পোষ্টমর্টেম্ রিপোর্টে তাই বলেছে—

কিন্তু—

একটা কথা ভুলে যেও না শম্ভু! অশোকের মত লোকের সাধ মিটে গেলে অযথা ঝামেলা বহে বেড়াবার আর ইচ্ছা কোনদিনই থাকে না। যা হোক যা বলছিলাম—তাহলেও সে নিজের হাতে কাজটা করতে চায়নি হয়ত! অতি সহজেই সন্দেহটা তার উপরেই এসে পড়বে বলে। অথচ মায়াকে সরান দরকার—অনন্যোপায় হয়েই তখন রূপলালের সাহায্য তাকে নিতে হয়েছিল হয়ত।

কিন্তু রূপলালের হাতে কাজের ভারটা তুলে দিলেও পুরোপুরি তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি অশোক তাই অকুস্থানের আশে-পাশেই কাজটা যখন সম্পন্ন হয় তাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল—

তাহলে তুমি বলতে চাও কিরীটী—

হ্যাঁ, শম্ভু, হত্যার সময় অশোক অকুস্থানের আশে-পাশেই কোথায়ও ছিল, সে আদৌ সে-রাত্রে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মঞ্চ ছেড়ে যায়নি এবং ঐ যে এক নারীর উপস্থিতি যাকে লাবণ্য প্যাসেজে দেখেছিল সম্ভবতঃ সেই আমাদের অশোক—

বল কি!

অন্তত তাই আমার অনুমান! কিন্তু গলাটা শুকিয়ে উঠেছে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর শম্ভু।

॥ ২২ ॥

শম্ভু তাড়াতাড়ি একজনকে ডেকে তিন কাপ চায়ের কথা বলে দেয়। একটু পরেই চা এলো।

চা পানের পর কিরীটী আবার শুরু করে।

এখন কথা হচ্ছে রূপলালকে সন্দেহ করলাম আমি কেন! রূপলালকে প্রথম দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। মাথার চুলের বাহার পাল্টে দিলেও তার চোখ নাক ও থুতনী চোয়ালের কাটিংটা সে বদলাতে পারেনি আর সেটা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়। প্রত্যেক মানুষেরই মুখের কাটিং বা ডৌলের একটি বিশেষত্ব থাকে নিজের নিজের। ছেদীলাল বা রূপলালের তা আছে—বহু ক্ষেত্রেই ঐ মুখের গঠন ও চেহারা মানুষের ভেতরটাকে প্রতিফলিত করে এবং দেখতে জানলে তা চোখে পড়ে।

সৌরীন কুণ্ডু ঐ সময় বলে, কিন্তু গত দু'বছরে রূপলাল যে এত বড় একটা ক্রিমিন্যাল হতে পারে আমার কখনো তা মনে হয়নি।

রূপলাল ষ্টেজে অভিনয় না করলেও তার ভিতরে একটু অভিনয় প্রতিভা ছিল সৌরীনবাবু—আর সেই অভিনয়ের দ্বারাই সে আপনাদের সকলকে প্রতারিত করেছে। অশোক হয়ত কোন ক্রমে রূপলালের আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছিল—নিজের মনের আয়নাতেই রূপলালকে প্রতিফলিত করে। তারপর সে হয়ত আরো রূপলাল সম্পর্কে খোঁজ খবব করে রূপলালের সত্য পরিচয়টা

কিছু কিছু জানতে পারে—

কিন্তু রূপলালই যে হত্যাকারী বুঝলেন কি করে রায় মশাই?

সৌরীন কুণ্ডু আবার প্রশ্ন করে।

কিরীটী বলে, ভেবে দেখুন সমগ্র ঘটনাটা। মায়াকে তার সাজঘরেই হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যাকারী আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে সাজ-ঘরের মধ্যে মায়াদেবীর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। সেটা কার পক্ষে সম্ভব—একমাত্র ঐ থিয়েটারেরই কারো বিশেষ করে যাদের ঐ সাজঘরে গতায়াতের সুবিধা ছিল তাদেরই পক্ষে সম্ভব। রূপলালের হাতেই ছিল মঞ্চের সব দেখাশুনা করা ও চাবী দেওয়ার ভার। সেই যেত সবার শেষে মঞ্চ থেকে ঘরে ঘরে সব চাবী দিয়ে।

কিন্তু মায়া রূপলালকে ঘরে দেখে ঐ সময়—

চেঁচায়নি বা কিছু বলারও সুবিধা পায়নি—কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তার আগেই অতর্কিতে রূপলাল তার বলিষ্ঠ হাতে মায়াদেবীর মুখ বন্ধ করে গলায় রুমাল পেঁচিয়ে তাকে হত্যা করে আলোটা নিভিয়ে দেয় সাজ-ঘরের বা সাজ-ঘরের আলো হয়ত আগেই নিভিয়ে রেখেছিল এবং অন্ধকারেই সব কিছু করেছিল—

তারপর?

তারপর ত খুব সোজা—অন্ধকার ঘর দেখে লাবণ্য মায়া চলে গিয়েছে ভেবে চলে যায়—এবং রূপলাল সেই সময় হয়ত সাজ-ঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং ঘটনাটা সম্ভবতঃ রাত নয়টা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে কোন এক সময় ঘটে—

আচ্ছা শকুন্তলাদেবীকে অশোক হত্যা করেছিল কেন?

সম্ভবতঃ শকুন্তলা অশোককে ছাড়তে চায়নি বলে অথচ শকুন্তলার সাধ তখন অশোকবাবুর মিটে গিয়েছিল—

তাই বলে হত্যা—

কারণ সেখানেও ব্যাপারটা চরমে উঠেছিল।

কি রকম!

অবিনাশলিঙ্গম শকুন্তলার স্বামী মধ্যে মধ্যে টুরে যেত। আর সেই সময়ই অশোক শকুন্তলার ফ্ল্যাটে যেতো, শকুন্তলা হয়ত যখন দেখলো অশোককে ধরে রাখতে পারবে না আর তখনই তাকে তার মা হবার সংবাদ দিয়ে ভয় দেখায়—তবে আমার ধারণা—অশোকবাবু যাই বলুক—অবিনাশ-লিঙ্গম যে পুরুষত্বহীনতায় ভুগছিল সে কথাটা পুরোপুরি না জানলেও একটা অনুমান করতে পেরেছিল তাই শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়েই অশোকবাবু তার পথের কাঁটা শকুন্তলা দেবীকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেয়—কিন্তু তখন সে কল্পনা করতে পারেনি—অবিনাশলিঙ্গমের দিক থেকে একটা উল্টো চাপ আসতে পারে—

উল্টো চাপ! সৌরীন কুণ্ডু প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কি! অবিনাশলিঙ্গম অশোকের সঙ্গে তার স্ত্রীর হৃদ্যতার ব্যাপারটা জানত না যে এমন নয় এবং জেনেশুনেও সে চুপ করেই ছিল কতকটা অনন্যোপায় হয়েই—কিন্তু সে জানতে পারেনি শকুন্তলা মা হতে চলেছে—ময়না তদন্তে সেই রহস্য প্রকাশ হবার পরই তার সন্দেহ গিয়ে পড়ে অশোকের 'পরে। সে তাকে চাপ দেয়—ভয় দেখায়। অনন্যোপায় অশোক তখন অবিনাশের মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করে কিন্তু তাব বোঝা উচিৎ ছিল ব্ল্যাক-মেলিং একবার শুরু হলে তার আর শেষ হয় না বরং ক্রমশঃ সেটা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলতে থাকে—আর হয়েছিলও তাই—

একটু হেসে কিরীটী বলে, হয়ত অবিনাশলিঙ্গমের ব্যাপারটা অশোক ইতিমধ্যে চুকিয়েই ফেলত যদি না মায়াদেবীর সঙ্গে সে ইতিমধ্যে জড়িয়ে পড়ত। ফলে তাকে মায়াকে শেষ পর্যন্ত সরাতে হলো আর নিজেও ঐ সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। পাপ এমনি জিনিষ সৌরীনবাবু যে তা চাপা ত থাকেই না বরং চাপা দেবার চেষ্টা করলে আরো পাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়।

কিরীটী থামল।

কিন্তু রাত অনেক হলো—এবারে আমি উঠবো! কিরীটী উঠে দাঁড়ায়।

বাইরে রাত তখন ঝিম্ ঝিম্ করছে।

ক্লান্ত বিহঙ্গ

কি জানি শ্যামল, দেড় বছর ত হয়ে গেল—কেন যেন এখন আমার মনে হচ্ছে সীতা বুঝি আর ভাল হবে না—

কান্নায় যেন সমীরের গলাটা বুজে এলো।

কেন ওকথা মনে করছো সমীর, আমি বলচি ও নিশ্চয়ই আবার ভাল হবে—সুস্থ হয়ে উঠবে।

মা ওকে সাত বছরের রেখে হঠাৎ মারা গেলেন, তার বছর খানেক পরে বাবাও চলে গেলেন—সাত বছরের এতটুকু সীতাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি—

সবই ত শুনেছি তোমার কাছে—

ওকে একা কার কাছে রেখে যাবো সেই ভেবে, সমীর বলতে লাগল, পাশ করবার সাত বছর পরে বিলেত গেলাম—দেড় বছরের মধ্যে এফ-আর সি-এস করে ফিরে এলাম—মাত্র দেড় বছরের জন্য ওর কাছ থেকে দূরে ছিলাম—একটা মুহূর্ত ওর দাদাভাইকে না হলে চলতো না—আমার বোন বলে বলচি না শ্যামল, সীতার মত মেয়ে আর ত আমার চোখে পড়েনি, সরল নিষ্পাপ যেন এক গোছা ফুল—কিন্তু স্কাউন্ড্রেল জয়ন্ত বোস তাকে একেবারে ধুলোর মধ্যে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল—

দেখা করবে একটিবার ওর সঙ্গে সমীর---

না থাক। ওর মুখের দিকে আর আমি চাইতে পারি না। উঃ, একটু থেমে আবার সমীর বলতে লাগল, কোথা থেকে কি হয়ে গেল—সীতা আজ তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে—আর আমি এক খুনি আসামী—পলাতক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—যদি ও ভাল হয়ে উঠতো এখুনি গিয়ে ধরা দিতাম পুলিশের হাতে। এমনি করে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধে দগ্ধে---

তুমি ত জান আমার অবস্থা সমীর। কত আশা ছিল মনে বড় একজন শিকায়াট্রিক হবো, বিলেত যাবো, শেষ কপর্দকটি খরচ করে মেন্টাল হোম করলাম—কিন্তু আজ অর্থের অভাবে তাও আর কতদিন চালাতে পারবো জানি না—নচেৎ তোমার বোনের চিকিৎসার জন্য তোমার কাছ থেকে আমি টাকা—

না, না—ও কথা কেন ভাবছো শ্যামল, তুমি যা ওর জন্য করচো এই দেড় বছর ধরে—টাকা দিলেই কি তা পেতাম আমি অন্য কোথাও। আমি যেখানেই থাকি না কেন নিশ্চিন্ত থাকি যে ও তোমার কাছে আছে। হঠাৎ যদি ধরাও পড়ি তাহলেও জানি তুমি ওকে ফেলবে না। তা ছাড়া সীতার ও অবস্থার জন্যত আমিই দায়ী—আর একটু যদি ওর পরে চোখ রাখতাম—প্র্যাকটিস নিয়ে না মেতে উঠতাম—হয়ত এমনটা ঘটতো না।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে রাত দুটো ঘোষণা করল।

সমীর চমকে ওঠে, রাত দুটো—এবারে উঠি ভাই—এই টাকাটা রাখ—বলতে বলতে পকেট থেকে চারশ টাকার নোট বের করে দিল সমীর শ্যামলের সামনে।

এখন কোথায় যাবে?

গত চার মাস থেকে ভুটানের বর্ডারে একটা জায়গায়—একটা ছোট ডিসপেনসারী খুলে প্র্যাকটিস করচি—সেখানেই আবার ফিরে যাবো—কত জায়গায়ই ত ডেরা ফেললাম এই দেড় বছরে—একটা না একটা গোলযোগ ঘটে—তাড়াতাড়ি সব ফেলে পালাই—আবার নতুন করে শুরু করি; গভর্ণমেন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টা অন্তত যদি আমার সিল না করে দিত—যাক—চলি ভাই—

সমীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শ্যামল টাকাগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে রইল।

ভুটানের বর্ডারে ছোট একটা জায়গা।

ছোট একটা বাজার—সেই বাজারের মধ্যেই সমীর ডাক্তারের ডিসপেনসারী।

ঐখানে বসার মাস খানেকের মধ্যেই ভুটানীদের মধ্যে সে তার প্র্যাকটিসটা জমিয়ে নিয়েছিল—নাম নিয়েছিল অর্জুন সিং—

তার আগে যে তিন জায়গায় ডেরা বেঁধেছে সব ডেরা তার ভেঙ্গে গিয়েছে—

সেদিন সন্ধ্যায়—সমীর তার ডিসপেনসারীতে বসে আছে—প্রচণ্ড শীত বাইরে—পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফ। বর্ডার ফোর্সের একজন ইনটেলিজেন্স অফিসার ক্যাঃ সানজানা এসে ঘরে ঢুকল—

গুড ইভনিং ডঃ সিং—

গুড ইভনিং—বোস ক্যাঃ, এই শীতের মধ্যে ক্যাম্প থেকে বের হয়েছো—

কি করি বলো—কাল একটা ম্যাসেজ এসেছে—একজন absconder নাকি এই তল্লাটে এসে ডেরা বেঁধেছে—

সেকি!

আর বল কেন—মার্ডারার—অথচ লোকটা শুনেছি একজন বিলাত ফেরত ডাক্তার—

কফি করে আনি—

কফি! মন্দ নয়—

রাম খাবে? রাম আছে বিলাতী রাম—

সত্যি—

হ্যাঁ—তবে তাই আনো।

একটা রামের বোতল এনে পাশে রাখল সমীর, ক্যাঃ সানজানা ড্রিংক করতে শুরু করে—বোস মাটন আছে রোস্ট করে আনি।

বোতল দিয়ে বসিয়ে রেখে ক্যাঃকে সমীর সোজা এসে তার ঘরে ঢুকে গায়ে ওভার কোটটা চাপাল তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে ক্যাঃয়ের জীপে উঠে বসে জীপটা চালিয়ে দিল—

পাহাড়ী পথ ধরে অন্ধকারে হেড লাইট জ্বালিয়ে জীপ চালাতে লাগল সমীর।

ঐ ঘটনারই দিন পনের পরে—

রাত—সন্ধ্যা রাত সাড়ে সাতটা। মধ্যপ্রদেশের একটা পুলিশ স্টেশন। শীতের রাত।

সিগন্যাল মেসেজ—

হ্যালো হ্যালো হ্যালো—নট থ্রি ফাইভ্—

থানা অফিসার বলদেব দেশাই ফোনটা কানে লাগিয়ে মেসেজ নেন। মেসেজটা নিতে নিতে দেশাইয়ের কানটা খাড়া হয়ে ওঠে।

ছোট মেসেজ কিন্তু মারাত্মক।

ভুটান থেকে পলাতক অ্যাবস্‌কনডার ডাঃ সমীর চৌধুরীকে নাকি ঐ তল্লাটে দেখা গিয়েছে। সে হাঁটাপথে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছে। কয়েকজন আদিবাসী জঙ্গলে কাঠ কুড়োচ্ছিল—তাকে যেতে দেখেছে।

পরনে ট্রাউজার—একটা গলাবন্ধ কোট গায়ে—মাথায় একটা মিলিটারী টুপি।

কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না আজ দেড়টা বছর আপ্রাণ চেষ্টা করেও লোকটাকে।

কখনো পশ্চিমবঙ্গে কখনো উত্তরবঙ্গে—কখনো উত্তরপ্রদেশে কখনো মহারাষ্ট্রে—কখনো মহীশূরে কখনো দক্ষিণ ভারতে—কখনো ভুটানে—মানুষটা যেন এই আছে ত এই নেই।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পুলিশবাহিনী লোকটার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না।

খুনী আসামী ডাঃ সমীর চৌধুরী।

কলকাতা শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র জয়ন্ত বোসকে হত্যা করে গত দেড় বছর ধরে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে মানুষটা বেড়াচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত লোকটাকে ধরবার ভার পড়েছে সেন্ট্রালের সুদক্ষ অফিসার মিঃ চন্দন সিংয়ের উপরে।

মধ্যপ্রদেশের একটা পুলিশ স্টেশন।

তারই অফিসার বলদেব দেশাই।

মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলদেব দেশাই উঠে পড়লেন। একটু মোটা মানুষ—তাহলে কি হবে খুব ক্ষিপ্র এবং কর্মঠ! বয়স চল্লিশের কিছু উপরে।

থানাটা যেখানে অবস্থিত তারই মাইল দুয়েকের মধ্যে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। দুজন বন্দুকধারী সেপাই নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলদেব দেশাই বের হয়ে পড়লেন।

জীপ সরু রাস্তা ধরে জঙ্গলের দিকে ছুটে চলল।

কয়দিন থেকেই প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

হাড়কাঁপানো শীত।

কিন্তু উপায় কি, যেতেই হবে, জরুরী মেসেজ!

শীতের রাত—তার উপরে বেশ অন্ধকার।

জঙ্গলের মুখেই ইনফরমার দাঁড়িয়েছিল—সে বললে, লোকটার ডান পাটা বোধহয় জখম হয়েছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাকে ঘন্টাখানেক আগে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পূব থেকে পশ্চিম মুখে যেতে দেখা গিয়েছে।

দেশাই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন—

কিন্তু জীপ ঘন জঙ্গলের মধ্যে বেশীদূর এগুল না। মাইলখানেক গিয়েই জীপ থেকে ওরা নেমে পড়ল। ঘন অন্ধকার চারিদিকে।

এবারে টর্চের আলো ফেলে দেশাই অগ্রসর হলেন।

লোকটার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। এবং লক্ষ্যভেদে সে নাকি অব্যর্থ।

রাত্রির জঙ্গলে বিচিত্র সব শব্দ।

কিন্তু উপায় নেই যেতেই হবে!

ডালপালা কাঁটাঝোপ—দু-পা এগোয় ত তিন পা পিছিয়ে আসতে হয়।

শালার পুলিশের চাকরির নিকুচি করেছে—মনে মনে গজরাতে থাকে বলদেব দেশাই। হাতের জোরালো টর্চের আলো ফেলে ফেলে সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হচ্ছে—

আগে দুজন সেপাই—

পিছনে বলদেব দেশাই।

ও শালা ভাগ্ গিয়া হুজুর, একজন সেপাই বলে।

অন্যজন মন্তব্য করে, এহি আঁধারী মে ঢুড়না বেফায়দা হ্যায় হুজুর—

বলদেব খিঁচিয়ে ওঠে, বকো মাত্ আগে বাঢ়—

ওরা যখন জঙ্গলের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে ফেলে সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে—

তখন জঙ্গলের অন্যপ্রান্তে যে জোড়া রেল লাইন—সেই রেল লাইন ধরে একটা আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেন দূরে রেড্ সিগন্যাল দেখে ধীরে ধীরে থেমে গেল।

জঙ্গলের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে কে একজন ট্রেনের কাছাকাছি আসতেই ট্রেনটা তখন সিগন্যাল ডাউন পেয়ে আবার চলতে শুরু করেছে—কোনক্রমে চলন্ত ট্রেনের একটা হাতল ধরে সেই লোকটি ট্রেনের পাদানীতে উঠে পড়ল।

ট্রেনটা স্পীড্ নেয়।

শীতের রাত—কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। উঁকি দিয়ে দেখলো ও—সমস্ত কামরার মধ্যে বসে জনা দুই যাত্রী—চুপচাপ চাদর মুড়ি দিয়ে শীতে বসে আছে—কি যেন ভাবলো লোকটি তারপরে দরজার লকটা ঘুরিয়ে খুলে ফেলল—

খোলা দরজা পথে ভিতরে পা দিল—যাত্রীরা তাকালও না ওর দিকে।

রাত দশটা প্রায়।

ছোট একটি রেল স্টেশন।

ছোট প্ল্যাটফরম—স্টেশন মাষ্টারের ঘর—একটি ওয়েটিং রুম ও একটি গোডাউন।

ছোট হলেও স্টেশনটির গুরুত্ব আছে। কিছুদূরে জঙ্গল থেকে কাঠ চালানের ব্যাপারে।

স্টেশন মাষ্টার শান্তাপ্রসাদ অনুপস্থিত—পয়েন্টস্‌ম্যান বংশীলালই স্টেশনের ডিউটি করছে—সেই স্টেশন মাষ্টার—সেই গেটকীপার—সেই পয়েন্টস্‌ম্যান—অবিশ্যি আরো একজন আছে সিগন্যালম্যান কামতাপ্রসাদ।

স্টেশন মাষ্টার শান্তাপ্রসাদের বয়েস হয়েছে—রিটায়ার করবার আর বৎসরখানেক আছে। শান্তশিষ্ট গোবেচারা মানুষ।

স্ত্রী অনেকদিনই গত হয়েছে—একমাত্র বন্ধন ছিল কন্যা যমুনা—যমুনাকে লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন।

শহরে থেকে সে কলেজে পড়ত।

চমৎকার দেখতে যমুনা—গানের গলা ছিল অদ্ভুত মিষ্টি। গানবাজনার শখও ছিল—এবং নিজেই চেষ্টা করে গানবাজনা শেখে।

শেষ পর্যন্ত ঐ গানবাজনা শখই তার জীবনে আনল চরম এক অভিশাপ।

এক তরুণ গায়কের প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করেছিল যমুনা শান্তাপ্রসাদের অজান্তেই—

একমাত্র মাতৃহারা কন্যা যমুনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন শান্তাপ্রসাদ—যখন বিবাহের ব্যাপারটা জানতে পারলেন মনে দুঃখ পেলেন প্রচণ্ড কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

বৎসর খানেক বাদে সংবাদ পেলেন শান্তাপ্রসাদ যমুনাকে ফেলে তার স্বামী যেন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে বোম্বাই সহর থেকে।

সংবাদ পেয়ে শান্তাপ্রসাদ ছুটে গেলেন—যমুনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এলেন নিজের কাছে।

প্রথমটায় যমুনা কিছুতেই বাপের সঙ্গে আসতে চায়নি।

যমুনা তখন অন্তঃসত্ত্বা।

কিন্তু কলহাসিনী সদা আনন্দমুখরা যমুনা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

সে কথা বলে না, হাসে না—গান গায় না, শান্তাপ্রসাদ খোঁজ করতে লাগলেন যমুনার স্বামীর কিন্তু কোন খোঁজ পেলেন না।

কিছুদিন বাদে যমুনার একটি পুত্রসন্তান হলো—সন্তান জন্মের আগে থাকতেই যমুনার কিছু কিছু মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিয়েছিল—পরে সে একেবারেই বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেল।

বিকৃতমস্তিষ্ক হলেও যমুনা ভায়োলেন্ট কখনো হয়নি।

দিনরাত বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বেশীর ভাগ সময় দিনে রাত্রে বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াত—মধ্যে মধ্যে কখনও বাড়িতে আসত। নিজের সন্তানটির প্রতি কোন দৃষ্টি ছিল না—কোন আকর্ষণ বা মমতাও ছিল না।

প্রৌঢ় শান্তাপ্রসাদই বুকে করে যমুনার সন্তানটি আগলে বেড়াতেন যেন।

যমুনার আর একটা বিচিত্র নেশা ছিল—রাত্রে সে স্টেশনের আশে পাশেই ঘুরে বেড়াত এবং কোন ট্রেন এলে ছুটে যেত—

শান্তাপ্রসাদও মেয়েকে মধ্যে মধ্যে ধরে ধরে আনতেন কিন্তু সে আবার ঘর ছেড়ে চলে যেত—শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন শান্তাপ্রাসাদ।

তারপর আট বছর কেটে গিয়েছে।

যমুনার সন্তান বাবুয়াকে নিয়েই শান্তাপ্রসাদ কন্যার বিকৃত মস্তিষ্কের দুঃখটা যেন ভুলে ছিলেন।

এমনি করে আটটা বছর চলে গিয়েছে।

আজো যমুনা ছিন্ন মলিন বসন—একমাথা রুক্ষ চুল—বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ায়।

সবাই চেনে ও তল্লাটে শান্তাপ্রসাদের বিকৃতমস্তিষ্ক মেয়ে যমুনাকে।

যে রাত্রির কথা বলছি—

শান্তাপ্রসাদের নাতি বাবুয়ার আজ কয়দিন ধরে জ্বর চলছিল এক নাগাড়ে।

স্থানীয় ডাক্তার যুগলকিশোরই দেখছেন বাবুয়াকে। কিন্তু যুগলকিশোর মানুষটা একটি অর্থপিশাচ—স্থানীয় বলতে ঠিক স্থানীয় নয়—মাইল দুয়েক দূরে ছোট্ট শহরটিতে থাকেন যুগলকিশোর। একটি টমটম আছে—তাতেই চড়ে এখানে ওখানে আশে পাশে রুগী দেখে বেড়ান।

আগেকার দিনের স্কুলের পাস।

বাবুয়ার জ্বরটা দুপুর থেকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে—বিকেলের দিকে বংশীলালকে পাঠিয়েছিলেন

শান্তাপ্রসাদ বাবুয়াকে একবার এসে দেখে যাবার জন্য কিন্তু যুগলকিশোর আসেননি।

বলেছেন পরের দিন সকালে যাব। যে ঔষধ চলছে সেই ঔষধই চলুক।

নাতিকে আগলে শান্তাপ্রসাদকে বসে থাকতে হয়েছে—বংশীলালকে বিকেলের দিকে স্টেশন থেকে চলে আসবার সময় বলেছিলেন শান্তাপ্রসাদ, বংশী আমি আজ আর রাত্রে স্টেশনে আসব না—রাত পৌনে দশটার প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা পাস করিয়ে দিও—

বংশীলাল বলেছিল, ঠিক হ্যায় মাস্টারজী, আপ যাইয়ে—স্টেশনকা কামকা লিয়ে আপ্ ফিকার না করিয়ে—ম্যায় সব সামহালুঙ্গা—

স্টেশনের অল্প দূরে স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার।

অগর কিসিকা জরুরত হোয়ত মুঝে খবর দেনা—সমঝা!

জী।

অবিশ্যি শান্তাপ্রসাদ ভাল করেই জানতেন রাত্রে তার কোন বিশেষ প্রয়োজন হবে না।

ছোট স্টেশন—দিনের বেলা গোটা দুই আপ ও ডাউন ট্রেন যাতায়াত করে—রাত্রে দশটা নাগাদ একটি আপ ট্রেন যায়।

তাতেও যাত্রী বড় একটা থাকে না বেশীর ভাগ দিনই।

বংশীলাল ঘড়িতে দেখল ডাউন ট্রেনটা আসার প্রায় সময় হয়েছে—বাইরে বের হয়ে কামতাপ্রসাদকে ডেকে সিগন্যাল ডাউন দিতে বললে।

শীতের রাত—

বাইরে বেশ কনকনে শীত।

ট্রেনের শব্দ আসছে দূর থেকে—এতক্ষণে বোধহয় ট্রেনটা এসে পড়ল।

একটা কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে সবুজ আলোটা হাতে বংশীলাল স্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

প্ল্যাটফরম ত ঠিক নয়—বরাবর খানিকটা লাইনের পাশে পাশে সুরকী পেটান বাঁধানো জায়গা।

সর্বসাকুল্যে গোটা চারেক আলোর ব্যবস্থা সমস্ত প্ল্যাটফরমটায়—তাও কেরোসিনের বাতি ভিতরে এবং বাইরের চিমনির যে অবস্থা—ঝাপসা একটা আলো আঁধারীর সৃষ্টি করেছে মাত্র। নতুন ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা হচ্ছে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

দূরে ওভার ব্রীজটা দেখা যায়।

স্টেশন প্ল্যাটফরমে একটিই পান সিগারেট ও খাবারের দোকান হরিরামের—তা শীতের জন্য সেও সন্ধ্যার পর পরই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গিয়েছে।

খাঁ-খাঁ করছে স্টেশনটা।

দূরে গাড়ির আলো দেখা গেল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন—কোন যাত্রী নেই—হয়ত ট্রেন থেকেও কোন যাত্রী নামবে না বংশীলাল জানে তবু ডিউটি দিতে হবে।

গাড়িটা পাস করিয়ে দিতে পারলেই রাতের মত ছুটি—কাল সকাল ছটার পরে সেই প্রথম ট্রেন।

গাড়িটা এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল ধীরে ধীরে একসময়।

বংশীলাল ভেবেছিল যাত্রী থাকবে না কিন্তু দেখা গেল দুজন যাত্রী এগিয়ে আসছে—

কাছে আসতেই দেখল একটি তরুণী ও অন্যজন যাত্রী নয়—টি. টি. আই.

তরুণীকে দেখলে অভিজাত ভদ্রঘরের বলেই মনে হয়।

পাতলা চেহারা—হাতে সোনার চুড়ি—পরনে একটি দামী সিল্কের শাড়ি।

গায়ে জড়ানো একটা দামী শাদা শাল।

পায়ে চপ্পল।

কাঁধে ঝোলান একটা হ্যাণ্ডব্যাগও।

টি. টি. আই. এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, স্টেশন মাস্টার কোথায়?

কেন? কি দরকার তাঁকে? বংশীলাল শুধায়।

এই মেয়েটি বিনা টিকিটে ট্রাভল করছিল—একে জি. আর. পি. র হাতে তুলে দিতে হবে—

গার্ড ইতিমধ্যে সবুজ আলো দেখিয়েছে—

বংশীলাল সত্য সংবাদটা ভাঙ্গল না। বললে, ঠিক আছে আপনি যান—স্টেশন মাস্টার ঘরে আছে, আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

সত্যি কথাটা বলল না বংশীলাল টি. টি. আই.কে যে স্টেশন মাস্টার কোয়ার্টারে।

টি. টি. আই. আর দাঁড়াল না। ট্রেনও ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছিল—এক লাফে চলতি গাড়ির একটা কামরার হ্যাণ্ডল ধরে উঠে পড়ল।

ট্রেনটা চলে গেল।

স্টেশনটা আবার খাঁ-খাঁ করে।

বংশীলালের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী হবে না। একাই থাকে ও এখানে। দেশে স্ত্রী ও দুই মেয়ে।

বংশীলাল শুধাল বিনা টিকিটে যাচ্ছিলেন কেন?

মেয়েটি কোন জবাব দেয় না।

কোথা থেকে আসছেন? বংশীলাল আবার জিজ্ঞাসা করে।

বোম্বাই থেকে—মেয়েটি এবারে বললে।

কোথায় যাবেন?

কলকাতা—

কিন্তু এ ট্রেন ত কলকাতায় যায় না—এ ত নাগপুর থেকে অন্য লাইনে যাবে—তা যেখানেই যান টিকিট না কেটে ট্রেনে উঠেছিলেন কেন?

মেয়েটি এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

বংশীলাল যেন কি ভাবল, তারপর বললে, কলকাতায় যাবার ট্রেন ত কাল বিকেল চারটার পর—ঐ একটা ট্রেনই কলকাতায় যায়—

তাহলে?

তাইত জিজ্ঞাসা করছি এখানে ত কাউকে চেনেনও না আপনি—

না—কেমন করে চিনবো—

তা ঠিক—তবে আর টাকা পাবেন কোথায়? টিকিটের দামটা দিলে স্টেশন মাস্টার শান্তাপ্রসাদ হয়ত আপনাকে ছেড়ে দিত—

মেয়েটি কোন জবাব দেয় না।

চলিয়ে রাত মে ওয়েটিং রুম মে ঠারিয়ে—কাল সুবে স্টেশন মাস্টার আয়েগা তব্ ফ্যায়সলা হোগা।

তরুণী বংশীলালের কথায় এবারেও কোন জবাব দিল না।

বংশীলাল এগিয়ে যায় লণ্ঠনটা হাতে—

তরুণী তার পিছনে পিছনে চলে।

বংশীলালের কুর্তার পকেটেই ওয়েটিং রুমের চাবিটা ছিল—

কোচড় থেকে চাবীর গোছা বের করে হাতের লণ্ঠনটা একপাশে নামিয়ে রেখে বংশীলাল চাবী ঘুরিয়ে তালাটা খুললো।

ঠেলে দরজার কবাট দুটো খুলতেই অন্ধকার ওয়েটিং রুম থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বদ্ধ বাতাসে ভেসে এলো।

ঠারিয়ে—বাত্তি জ্বালানে দিজিয়ে—

বংশীলালই আগে আগে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

একটু পরে ফস্ করে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানর শব্দ শোনা গেল।

ওয়েটিং রুমের মাঝখানে যে ডিম্বাকৃতি বড় গোল টেবিলটা ছিল সেটার উপরেই বাতিটা ছিল।

আলো জ্বালালো বংশীলাল।

আইয়ে ভিতর—

বংশীলালের আহ্বানে তরুণী ভিতরে প্রবেশ করল।

অপরিষ্কার চিমনি—কতদিন পরিষ্কার করা হয়নি কে জানে। আলো যেন কেমন ঝাপসা ঝাপসা।

সেই ঝাপসা ঝাপসা আলোতেই মেয়েটি দেখল ছোট একটি ঘর।

দু'পাশে দুটো বেঞ্চ পাতা—ছোট একটি টেবিল, খান দুই চেয়ার —ব্যস্ আর কোন আসবাবপত্র নেই—

জানালা দুটো—কাচের সার্সী লাগান—বন্ধ।

লাগোয়া বাথরুমও একটা আছে।

কাঠের ব্যবসায়ীরা এপথে যাতায়াত করার সময় মধ্যে মধ্যে দু'এক ঘণ্টা বসে বলে ঐ ওয়েটিং রুমটির ব্যবস্থা।

বাইরের কনকনে শীত থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেন বেশ আরামই বোধ হয় তরুণীর।

থাকুন আপনি—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবেন—ভয়ের কিছু নেই—বাইরেই সিগন্যালার গোডাউনের দরজায় শুয়ে থাকে, আর আমিও থাকব স্টেশন ঘরে।

তরুণী কোন জবাব দেয় না।

কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকায়।

বংশীলাল আবার বলে, কাল সকালে স্টেশন মাস্টার এলে, আপনার ব্যবস্থা হবে—

বংশীলাল আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল দরজার কবাট দুটো টেনে দিয়ে বাইরে থেকে।

তরুণী আবার দরজার দিকে তাকাল ঘরের ঝাপসা আলোয়।

উঃ, কি বিপদেই পড়া গেল!

টিকিট কেটে যদি ট্রেনে উঠতো তবে ত ঐ বিভ্রাট হতো না। কিন্তু টিকিট কাটবে কি—ও তখন ভাবছে বাড়িতে নিশ্চয়ই ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গিয়েছে—বান্দ্রার বাড়িতে তাদের হইচই পড়ে গিয়েছে।

চারিদিকে টেলিফোনের পর টেলিফোন।

কোনমতে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে দিয়েই সুড়ুৎ করে গেট পাস করে প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়েছিল।

সামনেই একটা ট্রেন তখন ছাড়ছে—সেই ট্রেনটাতেই উঠে পড়েছিল। ট্রেনটা প্ল্যাটফরম ছাড়াবার পর তার নিশ্চিন্তি।

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে করতে গেট দিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢোকার সময় কখন যে কে তার হাতের ব্যাগটা কোন ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে ফাঁসিয়ে তার ব্যাগটা একেবারে খালি করে দিয়েছে জানতেও পারেনি—জানতে পারল গোটা সাতেক স্টেশনের পর রাত্রি নয়টা নাগাদ চেকার এসে টিকিট চাইতে।

টিকিট কাটাতে পারেনি তাড়াহুড়াতে—টাকা দিচ্ছে সে। কিন্তু ব্যাগ খুলতে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। ব্যাগ ফাঁকা।

টি. টি. আই. বিশ্বাসই করল না তার কথা। মাঝপথে এইখানে নামিয়ে দিল।

তাড়াহুড়াতে বেশী আনতে পারেনি—ব্যাগে শ'চারেক মাত্র টাকা নিয়ে এসেছিল।

না—এখন আর ভেবে কি হবে।

রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। অবিশ্যি একা একা রাতটা এই নির্জন স্টেশনের এক ওয়েটিং রুমে কাটাতে হবে বলে তার কোন ভয় করছে না।

ঐ লোকটা ভাল। মনে হলো দয়ামায়া আছে। ওকেই কাল সকালে ধরতে হবে একটা ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু স্টেশন মাস্টার লোকটা, সে যদি তাকে না ছাড়ে—শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতেই তুলে দেয়।

দূর ছাই—ভেবে কোন লাভ নেই, যা হবার হবে। রাতটা এখানে যখন কাটাতেই হবে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া ভাল।

ঘুম হবে না ঠিকই, তবু ত এই অচেনা অজানা জায়গায় ঘরের মধ্যে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

এগিয়ে গেল তরুণী দরজার ছিটকানিটা তুলে দেবার জন্য—তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা যেন বিশ্রী অস্পষ্ট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ওর কানে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি—

বাথরুমের দরজাটা—

হ্যাঁ—ঐ ত বাথরুমের দরজাটাই খুলে যাচ্ছে—কেমন যেন একটা বিস্ময়-আতঙ্কমিশ্রিত দৃষ্টিতে দরজাটার দিকে তরুণী রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইল। দরজাটা খুলে যাচ্ছে—

॥ দুই ॥

খোলা দরজাপথে একটা মুখ।

মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

কে? Who are you?

ভয়ার্ত চাপা একটা চিৎকার যেন বের হয়ে আসল তরুণীর কণ্ঠ হতে ওর অজ্ঞাতেই।

ততক্ষণে বত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ বলিষ্ঠকায় এক যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বাথরুমের দরজা খুলে।

তাড়াতাড়ি সে ঠোঁটে আঙ্গুল তুলে চাপা গলায় হিন্দীতে বললে—উহুঁ। চেঁচাবেন না—আর চেঁচাবার যদি ফের চেষ্টা করেন, দু'পা এগিয়ে এলো আগন্তুক—গলাটা টিপে ধরবো—

তরুণী হঠাৎ যেন কেমন থমকে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়টা তখন বুঝি তার কাটেনি। চেয়ে আছে নিঃশব্দে আগন্তুকের দিকে।

পরনে আগন্তুকের মলিন একটা ট্রাউজার—গায়ে গলাবন্ধ কোট—মাথায় একটা মিলিটারী বেরে ক্যাপ।

যান, বসুন গিয়ে ঐ বেঞ্চটায়—

তরুণী তখনো আগন্তুকের দিকে চেয়ে আছে।

বৈঠিয়ে—যাইয়ে আরামসে বৈঠিয়ে—ডরিয়ে মাত্—

কৌন হো তুম? এতক্ষণে মেয়েটির গলার স্বর ফুটল যেন।

ম্যায়—

হাঁ—কৌন হো তুম—কে—কে আপনি?

বাঃ আপনি বাঙ্গালী দেখছি—বলে ওঠে আগন্তুক। আমিও বাঙ্গালী—আগন্তুক যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিল।

তরুণী ততক্ষণে নিজের সাহস যেন কিছুটা ফিরে পেয়েছে—আর বুঝতেই ত পারছিল এ সময় নার্ভ হারানো কোন কাজের কথা নয়।

প্রশ্ন করল তাই আবার, লেকেন কৌন হো তুম্—এ কামরামে ঘুসা কেইসে?

আমি? আমি মনে করুন না আপনারই মত একজন যাত্রী। যে ট্রেনটা থেকে আপনি নেমেছেন একটু আগে আমিও ঐ ট্রেনেরই যাত্রী—just আপনার ঠিক আগেই এ ঘরে ঢুকে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম—

মিথ্যে কথা! মেয়েটি বললে। যেন প্রতিবাদ জানাল।

মিথ্যে কথা? কেন—মিথ্যে কথা কেন?

হ্যাঁ, ঝুট্—এ ঘরের দরজা ত এতক্ষণ বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল—

তা ছিল তবে—হঠাৎ একটু হেসে বললে আগন্তুক, ঐ যে বাথরুমটা—ওর ভিতরে পিছনদিকে মেথরদের যাতায়াতের জন্য একটা দরজা আছে—সেটা খোলাই ছিল—

মিথ্যে কথা—আপনি ঐ বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন নিশ্চয়ই।

লুকিয়ে—লুকিয়ে থাকতে যাবো কেন—যুবক এবারে হেসে ফেললে।

আপনি মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই—

চোর না হয় একটা ডাকাত, তাই না—বেশ—তা যদি হইই আপনার ত ভয়ের কোন কারণ নেই—আপনার কাছে ত বোধহয় একটা ফুটো পয়সাও নেই—তাহলে নিশ্চয়ই অন্তত টিকিটের টাকাটা দিয়ে দিতেন—

দিতামই ত—ব্যাগটা কে যেন কেটে সব টাকা—

যুবক আবার হেসে বললে, কেটে নিয়েছে বুঝি ব্যাগ—ঠিক আছে বিশ্রাম করুন—তবে বিশ্বাস করুন আমি নয় কিন্তু—

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় মেয়েটি যুবকের দিকে—

অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? বিশ্বাস না হয় সার্চ করে দেখতে পারেন।

আপনি বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে।

ঐ বাথরুমের ভিতর দিয়ে—বিশ্বাস করুন ভীষণ নোংরা—দুর্গন্ধে এতক্ষণ দম আটকে ছিলাম—

আমি ঐ দরজা খুলে দিচ্ছি বের হয়ে যান।

সেটা কি ভাল হবে ম্যাডাম্, যুবক আবার হাসলো, তাছাড়া বেশীক্ষণ আমি থাকবোও না হয়ত, যতক্ষণ থাকবো—সে সময়ের জন্য আসুন না পরস্পরের মধ্যে একটা Pact করা যাক।

প্যাক্ট্—

হ্যাঁ—এসে যখন দুজনেই আমরা একই সময় একই ওয়েটিং রুমে পড়েছি—একটা রাত ত—তা আপনি ঐ বেঞ্চটায় থাকুন আর আমি এই বেঞ্চটায়—

না—

না?

না—এ ঘরে আপনি থাকতে পারবেন না—I won't allow you—

দেখুন—আমার পরিচয় যাই হোক না কেন, আপনি বিশ্বাস করতে পারেন আপনার প্রতি কোন রকম—

আপনি যাবেন কি না জানতে চাই!

আপনি দেখছি অত্যন্ত সিরিয়াস!

যাবেন—না আমি কাউকে চেঁচিয়ে ডাকব?

আচ্ছা ম্যাডাম আপনি অত হিস্টিরিক হচ্ছেন কেন বলুন ত! আপনি না হয় উইদাউট টিকেটে ট্রাভেল্ করার জন্য এ ঘরে ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন আর আমি না হয় এই শীতের রাত্রে জঙ্গলে না থেকে ওয়েটিং রুমটা খালি পাবো ভেবে ঢুকে পড়েছি অনন্যোপায় হয়েই—ভেবে দেখতে গেলে ত দুজনাই আমরা—

আপনি যদি এই মুহূর্তে এই ঘর থেকে বের হয়ে না যান ত—

চেঁচিয়ে লোক ডাকবেন—তা ডাকুন—আমাকে না হয় হদ্দমদ্দ এই ঘর থেকে বের করে দেবে কিন্তু আপনার আসল ব্যাপারটা যখন জানতে পারবে তখন আপনাকে—

আসল ব্যাপার মানে?

মানে আর কি এই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন—

পালিয়ে এসেছি মানে—ভ্রূ কুঁচকে তাকাল আগন্তুকের দিকে তরুণীটি।

মানে তাই ত মনে হচ্ছে—ঐ পরনের জামাকাপড়—হাতের সোনার চুড়ি—

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে মেয়েটি যুবকটির দিকে। যুবকটি মিটিমিটি হাসছে।

আর তা যদি না হয় ত—

যুবকটির কথা শেষ হলো না। সহসা একটা হাওয়ার ঝাপটায় একটা জানালার কাচের একটা পাল্লা শব্দ করে খুলে গেল, আর সেই সঙ্গেই শোনা গেল বাইরে অদূরে কোথায় একটা বন্যজন্তুর ডাক—

তরুণী তাড়াতাড়ি কয়েক পা যুবকের দিকে এগিয়ে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, ও—ও কিসের ডাক?

সম্ভবত বাঘ—একান্ত নির্বিকার কণ্ঠে যুবকটি জবাব দিল।

বাঘ! আরো দু'পা এগিয়ে আসে তরুণী, যুবকের দিকে।

যুবকটি আবার নির্বিকার কণ্ঠেই যেন জবাব দিল, আছে বলেই ত শুনেছি—আশেপাশে যে রকম জঙ্গল—লোকে এখানে বাঘ শিকার করতে আসে।

তরুণী আরো দু'পা ততক্ষণে যুবকটির কাছে এগিয়ে এসেছে। যুবকটি বুঝতে পারে তরুণীর গলার স্বরেই সে ভয় পেয়েছে।

সত্যি এখানে বাঘ আছে নাকি?

খুব জঙ্গল?

হ্যাঁ—আশেপাশে ঘন জঙ্গল—

জানালার খোলা পাল্লাটা হাওয়ায় আবার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে খোলে ও বন্ধ হয়—

যুবকটি ততক্ষণে জানালার অপর দিকে যে বেঞ্চটা ছিল তার উপরে গিয়ে আরাম করে বসে পড়েছে।

তরুণী এগিয়ে গিয়ে যুবকটি যে বেঞ্চে বসেছিল সেই বেঞ্চেই বসে পড়ল।

জানালাটা—তরুণী যেন কেমন বোজা গলায় বললে—

কি হয়েছে? পকেট থেকে একটা সিগারেটের বাক্স বের করল যুবক—

বন্ধ করে দিলে হতো না জানালাটা—

তা হতো তবে মনে হচ্ছে ওটা বন্ধ করলেও হয়ত বন্ধ হবে না—

বন্ধ হবে না—কেন?

বোধহয় জানালার ছিটকিনি নেই—

তরুণী জানালার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে তাকাতে আরো একটু পাশে ঘেঁষে বসে যুবকের। খোলা জানালাপথে নানা ধরনের বিচিত্র শব্দ ও ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসে ঘরের মধ্যে।

কিছুক্ষণ দুজনাই চুপ চাপ—তরুণী চুপচাপ বসে ঘন ঘন খোলা জানালা পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছে আর যুবকটি নির্বিকার বসে বসে সিগ্রেট টানছে।

হঠাৎ একটি মুখ জানালাপথে দেখা গেল। একটি নারীর মুখ—বয়স ত্রিশ বত্রিশের মধ্যে হবে—মাথার চুল এলোমেলো। তরুণীর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই সব ভুলে গিয়ে ভয়ে যুবকটিকে দু'হাতে জাপটে ধরে ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, কে—কে ওখানে?

একটা খিলখিল হাসি তার পরই মুখটা জানালা থেকে অপসারিত হয়।

যুবকটি থতমত খেয়ে গিয়েছিল—বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল—অকস্মাৎ তরুণী তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরায়।

কি? কি হলো? কোথায় কে?

ঐ—ঐ জানালায়—

কোথায়?

এইমাত্র কে যেন—একটা মুখ—বন্ধ করে দিন—বন্ধ করে দিন জানালাটা।

যুবকটি নিজেকে মেয়েটির আলিঙ্গন থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলে, আঃ ছাড়ুন না—না হলে জানালাটা বন্ধ করবো কি করে।

না—

যুবকটি হেসে ফেলল, এই সাহস নিয়ে আপনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন—

মেয়েটি তার আলিঙ্গন শিথিল করে, একটু সরে বসে বলে, কে বলেছে আমি পালিয়েছি বাড়ি থেকে?

পালিয়েছেন, আর শুধু পালাননি—বড়লোকের আদুরে মেয়ে—কিন্তু আর একটু সরে বসুন না—একেবারে যে বেঞ্চ থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দেবার যোগাড় করলেন—

তরুণী ভ্রূ কুঁচকে তাকাল একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা যুবকটির দিকে এবং এবারে আরো একটু সরে বসল।

Thanks! যুবকটি বললে।

দূর থেকে ঐ সময় একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ গানের সুর যেন ভেসে এলো নারীকণ্ঠে। কে যেন দূরে গান গাইছে।

শুনছেন?

উঁ।

শুনতে পাচ্ছেন?

কি? যুবক তরুণীর মুখের দিকে তাকাল।

ঐ যে!

কী?

কে গান গাইছে যেন। তরুণী বললে।

কোন পেত্নীটেত্নী হবে আর কি! নির্বিকারভাবে জ্বলন্ত সিগ্রেটে একটা মৃদু টান দিয়ে যুবকটি বললে।

পেত্নী?

আশ্চর্য কি!

গানের কথাগুলো অস্পষ্ট—সুরটা ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তরুণী আবার জানালার দিকে তাকায়, আর ঠিক ঐ সময় একটা দমকা হাওয়া এসে ঘরের একটিমাত্র টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দেয়। একটা বন্যজন্তুর চীৎকার শোনা যায়।

মেয়েটি সব ভুলে পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকটিকে আবার দুহাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই যুবকটি উঠে পড়েছিল জানালা বন্ধ করবার জন্য।

মেয়েটি অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটা অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ওঠে, উঃ—

কি হলো—পড়ে গেলেন নাকি?

মেয়েটির সাড়া পাওয়া গেল না।

॥ তিন ॥

যুবক পকেট থেকে টর্চটা বের করে জ্বালাল, দেখল তরুণী তার বাঁ পাটা ডান হাতে চেপে মেঝেতে বসে আছে।

কি হলো—হাতটা ধরুন আমার—উঠুন। যুবকটি বললে।

সরে যান—

হাতটা ধরুন আমার।

না—

যুবক তখন পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে কোনমতে আবার টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালাল, জানালাটা বন্ধ করে দিল, তরুণী তখনো বসে আছে মেঝের 'পরে—মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন।

এগিয়ে এলো যুবকটি। হাত বাড়াল, উঠুন—ইঃ কেটে গেছে মনে হচ্ছে—রক্ত। দেখি দেখি—

যুবক তরুণীর সামনে ঝুঁকে পড়ে বোধহয় ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করবার জন্যেই—

না—সরে যান—

তরুণী আবার ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠে,

Don't behave like a school girl—ধমকে উঠল যুবকটি।

আমি ইউনিভারসিটিতে পড়ি—

সে ত বোঝাই যাচ্ছে—বলতে বলতে তরুণীর সম্মতির অপেক্ষা আর না রেখে হাত ধরে তুলে তাকে বেঞ্চের উপর বসিয়ে দিল।

উঃ আঃ তরুণী কাতর অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

ইস কেটেছে বেশ! দাঁড়ান দেখি—আমার কাছে ব্যাণ্ডেজ আয়োডিন আছে—

তরুণীর আপত্তি ও বাধা দেওয়া সত্ত্বেও যুবকটি তার জামার পকেট থেকে আয়োডিন ও ব্যাণ্ডেজ বের করে মেয়েটির পায়ের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দেয়। তরুণী যন্ত্রণায় উঃ আঃ করতে থাকে।

নিন এবারে চুপটি করে বসে থাকুন। তা পড়লেন কি করে বলুন ত।

জানি না।

যুবকটি হাসল। তারপর গিয়ে ঘরের অন্য বেঞ্চেতে বসল।

প্রচণ্ড মশা।

যুবক আর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে টানতে মধ্যে মধ্যে হাত দিয়ে মশা তাড়ায়।

এ যে এক একটা বাদুড়ের মত মশারে বাবা—

অস্ফুট গলায় যুবক কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বলে।

তরুণীও মশা তাড়াচ্ছিল হাত চালিয়ে কোন জবাব দিল না।

হঠাৎ যুবক উঠে দাঁড়াল।

এবং তাকে দরজার দিকে এগুতে দেখে তরুণী ভয় মিশ্রিত গলায় বলে, কোথায় যাচ্ছেন?

বাইরে—

কেন?

বাঃ একটু আগেই ত বলছিলেন—Get out of this room.

আমি কি সত্যি সত্যিই বলেছি নাকি! মিনমিনে গলায় তরুণী বললে।

তবে কি মিথ্যে মিথ্যে বলেছেন।
না—মানে আমি—
থামলেন কেন বলুন।
না। মানে আপনাকে যেতে হবে না।
যুবকটি মৃদু হাসলো। তারপর বললে, বেশী দূর যাবো না—আশেপাশে একটু—
না—
তার মানে?
আমি এখানে এই ঘরে একা একা থাকবো নাকি!
তা একাই ত বের হয়েছিলেন!
বেশ করেছি—তা আপনারই বা বেরুবার দরকারটা কি শুনি এই রাত্রে!
দু'দিন পেটে কিছু পড়েনি—হাসতে হাসতে বললে যুবক, আজকের রাতটাও হরিমটর করবার খুব একটা বাসনা নেই, তাই দেখি যদি কিছু খাদ্যবস্তু আশেপাশে কোথায়ও মেলে—আপনারও ত মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত ডিনারফিনার হয়নি।
আমার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।
এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হওয়া ভাল। তাছাড়া কাল জেলে খাদ্য জুটবে কিনা আপনার তাই বা কে জানে!
জেলে যেতে হবে নাকি?
তা উইদাউট টিকেটে ট্রাভ্‌ল্ করলে—
আমি কি ইচ্ছে করে করেছি নাকি? ব্যাগ থেকে কেটে কে যেন সব টাকা নিয়ে গেল—
তা কি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিশ্বাস করবেন?
কেন করবে না শুনি!
জজ ম্যাজিস্ট্রেট ওরা কি আসামীর কথা সহজে বিশ্বাস করে?
করে না?
উহুঁ! আসামীর কাঠগড়ার অমনিই মজা—একবার সেখানে দাঁড়ালে—
ঠিক আছে যা হবার হবে—
তা ঠিক—অমন sportsmanlike spirit থাকাই ভাল! জেল বই ত নয় আর উপবাস বই ত নয়—তাহলে বসুন আপনি—আমি দেখি বাইরে কিছু পাওয়া যায় নাকি।
তরুণীকে আর কোন প্রতিবাদ জানাবার অবকাশমাত্রও না দিয়ে যুবকটি দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বললে, দরজাটা বন্ধ করে দিন ভিতর থেকে—আমি ডাকলে খুলে দেবেন—
শুনছেন?
কি হলো আবার? যুবকটি ঘুরে দাঁড়াল।
সত্যি আপনি—
কি?
আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছেন না ত?
হেসে ফেলে যুবকটি, না—
ফিরে আসবেন সত্যিই?
হ্যাঁ—
তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু—
আচ্ছা—দরজাটা বন্ধ করে দিন—
যুবকটি চলে গেল।

কত রাত হবে কে জানে। তবে রাত সাড়ে দশটার কম ত নয়ই—
আকাশে কৃষ্ণা চতুর্দশীর বাঁকা চাঁদ দেখা দিয়েছিল ইতিমধ্যে। তারই সামান্য আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।
কাঠের ব্যবসায়ীদের আনাগোনা ছাড়া জায়গাটার কোন গুরুত্বই নেই।

লোকের বসতি বলতে যা কিছু ঐ তল্লাটে তাও মাইল দেড়েক দূরে—

ছোট একটি স্টেশন—ছোট্ট একটি বাজার—কয়েকটা দোকান। তারও বেশির ভাগ বন্ধ। কেবল খোলা ছিল তখনো একটি চায়ের দোকান।

চায়ের দোকানে আলো দেখেই যুবক সেই দিকে এগিয়ে চলে। কনকনে শীত যেন হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি জাগায়।

নাতিপ্রশস্ত কাঁচা একটি সড়ক—মধ্যে মধ্যে খোয়া বের হয়ে আছে।

রাস্তার একপাশে কাঠবোঝাই বিরাট বিরাট দুটো লরী দাঁড়িয়ে। একটা টাঙ্গাও চোখে পড়ে।

রাস্তায় কোন লোকজন চোখে পড়ে না।

চায়ের দোকানের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল যুবকটি।

ভিতরে ত ঢুকতে যাচ্ছে—হঠাৎ তার মনে হলো যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে বা সন্দেহ করে। পুলিশ ত চারিদিকে তার খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে।

গুলির অভাবে সঙ্গের আগ্নেয়াস্ত্রটি পর্যন্ত ফেলে দিয়েছে জঙ্গলে আজই সন্ধ্যায়—সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা নিজের গালে একবার হাত বুলিয়ে নিল—কি যেন ভাবল—তারপর পকেট থেকে একটা মাফলার বের করে কান গলা মাথা ও গাল বেশ করে মাফলারটা দিয়ে জড়িয়ে ঢেকে নিল।

স্টেশনের কাছাকাছি কোন মানুষের বসতি নেই বললেই হয়। দুটো কাঠ চেরাইয়ের কল ও তৎসংলগ্ন গুদাম।

স্টেশনের আশেপাশে দোকান বলতে ঐ চায়ের দোকানটি ও গোটা দুই ছোটখাটো দোকান।

টিনের একটি ঘর।

ভিতরে আলো জ্বলছে দূর থেকেই নজরে পড়েছিল যুবকটির।

ও অবিশ্যি জানত না যে ওটা একটা কেবল চায়ের দোকানই নয় এখানে খাবার জিনিসও পাওয়া যায়—স্থানীয় কুলীদের জন্য।

ভিতরে আলো জ্বলতে দেখে ভেবেছিল ওখানেই সন্ধান নেবে আশেপাশে কোন মিঠাইয়ের দোকান আছে কিনা।

দরজাটা খোলাই ছিল।

দরজা বরাবর আসতেই ওর নজর পড়ল ভিতরে দৃষ্টিপাত করে—সামনেই উঁচু একটা চুল্লীতে বিরাট একটা কেতলি চাপান—চুল্লীতে গনগনে আগুন।

পাশে একটা কাচের শো-কেসে পাঁউরুটি, বিস্কুট, ডিম ও তেলেভাজা খাবার।

মোটামত একটি লোক গায়ে একটা কম্বল চাপিয়ে চুল্লীর সামনে একটা চৌকির উপরে বসে বোধহয় চা তৈরি করছে—

সামনের বেঞ্চে একটি লোক পিছন ফিরে বসে। স্থানীয় লোক বলেই মনে হয়—এবং গরীব মজদুর শ্রেণীর লোক।

চা তৈরি করতে করতে লোকটি বললে, বহুৎ ঠাণ্ডি—

সামনে উপবিষ্ট লোকটি বললে, হাঁ নাথুরামজী—এ সাল তো যাস্তি ঠাণ্ডি মালুম হোতি—

লিজিয়ে চা—চায়ের পাত্র এগিয়ে দিল দোকানদার।

যুবকটি দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

কৌন—

পরিষ্কার হিন্দীতে যুবক প্রশ্ন করে, কিছু খাবার মিলবে?

খাবার, সব খতম হয়ে গিয়েছে—ডবল রোটি আর বয়েল আণ্ডা মিলতে পারে—আর লাড্ডু—বৈঠিয়ে না—গরম চা রেডি হ্যায়—

না বসবো না। আমাকে দুটো রোটি আর গোটা আষ্টেক বয়েল আণ্ডা দিতে পার?

নাথুরাম যেন কি ভাবল—আগন্তুক যুবকের মুখের দিকে মনে হলো যেন কেমন করে তাকাল—তারপর প্রশ্ন করল, কিধারসে আতে হেঁ?

অনেক দূর থেকে আসছি—বাস পাইনি তাই হেঁটে আসছি—কাল ভোরের ট্রেনটা ধরতে হবে—একটু চিন্তা বা দ্বিধা না করে কথাগুলো বলে গেল যুবকটি।

নাথুরাম আর কোন প্রশ্ন করল না, রুটি ডিম দিয়ে টাকা নিয়ে নিল। যুবকটি বের হয়ে গেল—

যুবকটি চলে যাবার পর নাথুরাম যে সামনে বসে চা পান করছিল তার দিকে তাকিয়ে বললে, লোকটা বলছিল বাস পেল না—এদিকে আবার বাস কোথায় প্রেমজী?

আরে জানে দো ইয়ার—আউর এক পিয়ালা চা দো—মালুম হোতা হ্যায় কোই মাতোয়ালা বওরা।

লোকটাকে দেখে যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল—

কিঁউ?

কেন, চেহারাটা দেখনি?

নেহিতো—

তা তুমি এত রাত্রে এদিকে কোথায় এসেছিলে?

লেড়কিকে তার শ্বশুরাল থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম কিন্তু শালা দিল না—

নাথুরাম চা বানাতে থাকে।

বাইরে ঐ সময় ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল—স্থানীয় চৌকিদার রামেশীস এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

সেলাম চৌকিদার সাব্—নাথুরাম সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

আইয়ে বৈঠিয়ে—

সেলাম। চা হোবে নাকি?

জরুর—বৈঠিয়ে না।

রামেশীস বেঞ্চটার উপর বসল।

চা বানাতে বানাতেই প্রশ্ন করে, ডিউটিতে নাকি?

আর বল কেন—শালা কে একটা খুনি নাকি এই তল্লাটে এসেছে—চৌকিতে খবর এসেছে—

খুনি?

হাঁ—এদিকেই পালিয়ে এসেছে।

নাথুরামের চোখের মণিদুটো হঠাৎ যেন বারেকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটা তার দোকানে এসেছিল তার চেহারাটা দৃষ্টির উপর যেন ভেসে ওঠে। কিন্তু মুখ খোলে না, চা তৈরি করতে থাকে।

রামেশীস ঐ তল্লাটের চৌকিদার।

বয়স বেশী হবে না, চল্লিশের সামান্য উপরে হয়ত। লোকটা যেমন সাহসী তেমনি কর্মঠ।

চা পানের পর অন্য লোকটি চলে গেল—রামেশীস তখন চা পান শেষ করে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছে—

রামেশীসও উঠে পড়ে যাবার জন্য।

নাথুরাম বাধা দিল, চৌকিদার সাব্—

কেয়া?

যে লোকটা বলছিলে, তার চেহারা কেমন?

কৌন, কিসকো বাত তুম্ করতে হো ভাই—

ঐ যে আভি বোলা না—খুনী—

ওঃ হাঁ—হাঁ—

তা তাকে মানে লোকটা দেখতে কেমন?

আরে ভাই, মুঝে কেয়া পাত্তা—ব্রিফ খবরে মিলা—ইধারই কোই নজদিক আশ পাশ মে উয়ো রাতিন আয়া হ্যায়—

সাচ্—

হাঁ এই সাইত খবরে মিলা—

উসকো উমর কেতনা হোগা—আপ জানতে হেঁ?

কোই তিশ চৌতিশ হো সেকতা—লেকেন মুঝে ঠিক মালুম নেই—

মোটি না দুব্লা?

ওউভি মালুম নেহি—আরে ছোড় দো ইয়ার—চৌকীদার ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি করতে চায় মনে হলো।

কিন্তু নাথুরামের কৌতূহলের তখনো পুরো নিবৃত্তি হয়নি—তার মনের মধ্যে তখনো একটু আগের আগন্তুক ক্রেতার চেহারাটা—বিশেষ করে চৌকীদার রামেশীসের দেওয়া সংবাদের পর একটা কৌতূহলেরই উদ্রেক করেছিল।

তাই আবার সে বললে, চৌকীদাব সাব্—

কেয়া?

এক বাত কহুঁ!

কেয়া হ্যায়।

গলাটা একটু খাটো করে নাথুরাম বললে, থোড়ি পহেলে এক আদমী হামারা ইধার আয়া থা—

আদমী!

মুঝে মালুম হোতা হ্যায় উয়ো ইধার আশপাশকে রহেনেওয়ালা নেহি হ্যায়—কোই আনজান—

সাচ্—

জী—উয়ো আদমী ভি জোয়ান থা, করিব তিশ পঁয়তিশ সাল উমর হোগা—

ফির?

হামারা দোকান সে ডবল রোটি আউর আণ্ডা লে গিয়া—

নাথুরাম যথাসাধ্য তখন যুবকটির চেহারার একটা বর্ণনা দেয়।

রামেশীস উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

॥ চার ॥

যুবকটি চলে যাবার পর তরুণী দরজা বন্ধ করে ঘবের বেঞ্চের এক কোণে বসে থাকে।

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল তরুণী।

হুট করে বাড়ি থেকে অমনভাবে চলে আসাটা উচিত হয়নি। কিন্তু তার মামা সন্তোষ চ্যাটার্জীকে সে বিশ্বাস করতে আর যেন কিছুতেই পারছিল না। বিশেষ করে লোকটা যে তলে তলে অমন একটা শয়তানি মতলব এঁটেছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা বুঝেছিল এই মুহূর্তে যদি সে ওখান থেকে না পালায় তার মুক্তির আর কোন পথই খোলা থাকবে না। তার মামা স্যাণ্টা অর্থাৎ সন্তোষ চ্যাটার্জী সব পারে।

উঃ কি শয়তান লোকটা!

আর কি জঘন্য মতলবই না এতদিন ধরে মনে মনে এঁটেছে।

সেই গবেট কুমড়োপটাশ মামার শালা ব্রজদুলাল চক্রবর্তী ইদানীং বছরখানেক ধবেই ঘন ঘন তাদের বম্বের বান্দ্রার বাড়িতে আসা যাওয়া করছিল।

তখন কি ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে বন্দনা—

যেমন চেহারা তেমনি নাম। বিদ্যাবুদ্ধিও তেমনি—বারতিনেক হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল বোধহয়। সর্বক্ষণ একগাল পান মুখে দিয়ে গরুর মত জাবর কাটছে। কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় মাথাভর্তি গোবর।

তার বাবার রাখা ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা ও বম্বের বান্দ্রার বাড়িটা তার সঙ্গে ঐ কুমড়োপটাশের বিয়ে দিয়ে বাগাবার জন্য তলে তলে মামীর সঙ্গে তার মামা মতলব এঁটেছিল।

বন্দনা পালিয়ে না আসলে ও হয়ত ঠিকই সেই কুমড়োপটাশটার সঙ্গে তার বিয়ে দিত।

সত্যি, তার ভাগ্যটাই বিচিত্র!

নচেৎ কোথায় তার পিতৃবন্ধু সঞ্জয় চৌধুরীব ছেলেব সঙ্গে তার বিয়ে হবে—বিলেত থেকে পাস করা ডাক্তার।

বাবা ত সবই ঠিক করে রেখেছিলেন, হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল—ছেলেটি কাকে যেন খুন করে ফেরার হলো—

মামা স্যাণ্টা চ্যাটার্জীর সে সংবাদে কি উল্লাস!

বন্দনা, শুনেছিস?

বন্দনা সবে তখন ইউনিভারসিটি থেকে ক্লাস করে বাড়িতে ফিরেছে।

বললে, কি মামা?

সেই ছেলেটি রে—যার সঙ্গে তোর বিয়ে হবার কথা—

কি হয়েছে তার?

খুন করে ফেরার হয়েছে।

বল কি মামা!

আর বলি কি! খবরের কাগজে যে সব বের হয়েছে!

তাই নাকি!

হ্যাঁ—সাংঘাতিক ছেলে। ভাগ্যে বিয়েটা হয়নি—যাক তুই ভাবিস না—ভাল ছেলের অভাব কি? হুঁ! তোর মত মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা।

তখনো বুঝতে পারেনি বন্দনা সেই ভাল ছেলেটি কে—কেন মামার অত দরদ।

তারই হপ্তাখানেক পরে তাদের বান্দ্রার বাড়িতে কুমড়োপটাশের আবির্ভাব।

এসেছে—এসেছে মামার শালা—ও নজরই দেয়নি—তাছাড়া লোকটাকে দেখলেই ওর হাসি পেত এমন।

একদিনত ব্রজদুলাল জিজ্ঞাসাই করলো—বন্দনা, তুমি আমাকে দেখলে ফিক্ ফিক্ করে হাসো কেন?

—কে বললে?

—দেখেছি আমি—হাসো। কেন হাসো—

—আপনাকে দেখে হাসবো কেন? এমনিই ত আমি হাসি—

তারপরই একদিন সকালে—

মামী শুধান, আমার ভাইকে তোর কেমন লাগছেরে বন্দনা?

বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেয়েছিল কথাটা শুনে. কিন্তু হাসেনি, গম্ভীর হয়ে বলেছিল, মন্দ কি!

বেশ চেহারাটা না?

হুঁ। প্রাণপণে হাসি গোপন করার চেষ্টা করছে তখন বন্দনা।

লেখাপড়াতেও ভাল ছিল খুব—দারুণ মেধাবী কিন্তু পড়াশুনা করলো না—

কেন?

বিরাট কাজ কারবার ত—কে দেখা শোনা করে তাই আর কি।

তাই বুঝি?

তবে! পশ্চিমবাঙ্গলায় বিরাট ব্যবসা— বাড়ি গাড়ি—

খুব বড়লোক বুঝি?

তবে! অনেক টাকা ব্যাংকে।

বন্দনা পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল।

সে যাত্রায় দিন কুড়ি ছিল ব্রজদুলাল। বন্দনার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বন্দনা পাত্তা দেয়নি—পাশ কাটিয়ে গিয়েছে।

দিন কুড়ি বাদে চলে গেল,—আবার এলো মাসখানেক পরে—এবারে যেন আরো গায়ে পড়া হয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে ব্রজদুলাল।

তারপরই হঠাৎ একদিন—

সে সবে ইউনিভারসিটি থেকে ফিরেছে—দোতলায় নিজের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করছে।

ব্রজদুলাল এসে ঘরে ঢুকল, বন্দনা—

কি ব্যাপার? আপনি এ ঘরে কেন?

কেন—দোষ হয়েছে নাকি?

একগাল পান মুখে চিবুতে চিবুতে হাসতে থাকে ব্রজদুলাল ওর দিকে তাকিয়ে।

যান এ ঘর থেকে!

যাবো কেন—দু'দিন বাদে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে জান?

বিয়ে? আপনার সঙ্গে?

হ্যাঁ গো—কেন দিদি জামাইবাবু তোমায় কিছু বলেনি। এবারে ত সেইজন্যেই এসেছি—

—তাই নাকি?

—হুঁ।

—সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে বুঝি?

—হ্যাঁ—সব Complete. দিনক্ষণ পর্যন্ত স্থির—

—ঠিক আছে—যান আপনি এখন এ ঘর থেকে।

—চল না সিনেমায় যাই—দুজনে!

—আপনি যাবেন কিনা এ ঘর থেকে জানতে চাই?

—দু'দিন বাদেইত তোমার হাসব্যাণ্ড হচ্ছি আমি—

বন্দনা আর কোন কথা না বলে ঝড়ের মতই নিজের ঘব থেকে বের হয়ে সোজা মামীর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মামী আলমারী খুলে কি যেন বের করছিলেন।

বন্দনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল, মামী—

কি রে?

তোমার ভাইকে আমার ঘরে যেতে বারণ করো।

কেন? কি হয়েছে?

যা বললাম তাই করো।

মামীর মুখে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, কিন্তু তোর মামা ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবে স্থির করেছে—

তাহলে ওকে খুন করবো জেনো—

কি বললি?

হ্যাঁ—খুন—ওকে বলে দিও খুন যদি আমার হাতে না হতে চায় ত আমার ঘরে যেন আর না যায়—

কথাটা বলে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল। নিজের ঘরে এসে ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করেছিল।

বন্দনা তার মামাটিকে ভাল করেই জানত। লোকটা যেমন অর্থগৃধ্নু তেমনি স্বার্থপর—নিজের স্বার্থের জন্য দুনিয়ায় এমন কোন কাজ ছিল না তার মামা করতে পারত না।

তাহলেও বন্দনা ভেবেছিল—সম্পূর্ণ সাবালিকা সে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে হয়ত মামার সাহস হবে না।

মামা মামী অবিশ্যি ঐ দিনের পর তার বিবাহ সম্পর্কে কোন আর উচ্য-বাচাই করেনি—কিন্তু ব্রজদুলালকে দেখা গেল খোস মেজাজে তাদের বাদ্রার। বাড়িতেই অধিষ্ঠান করছে।

হঠাৎ একদিন বন্দনা লক্ষ্য করলো বাড়িতে দু'জন দরোয়ান নিযুক্ত হয়েছে—তারা দক্ষিণ গেটে প্রহরা দিচ্ছে। বাড়ির গাড়ির ড্রাইভারও বদল হলো কয়েকদিনের মধ্যে।

মামা মামী যেন প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করে—তাকে সামনে দেখলেই চুপ করে যায়। বন্দনা বুঝতে পারে একটা ষড়যন্ত্র তলে তলে দানা বাঁধছে।

বন্দনা কি রকম যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

বন্দনা প্রথমটা কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। অবশেষে অনেক ভেবে একটা মতলব ঠাওরায়।

এক বান্ধবীকে ফোনে আসতে বলল—

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করল—দিন দুই বাদে সেই বন্ধু এসে বললে, চল মেট্রোতে একটা ভাল ছবি এসেছে দেখে আসি—

মামা বাড়িতে ছিল না—বন্দনার ইংগিতে বান্ধবী গিয়ে মামীকে বললে, ওকে নিয়ে একটু সিনেমায় যাবো মামী?

সিনেমায়!

হ্যাঁ, টিকিট কেটে ফেলেছি—আমিই আবার নামিয়ে দিয়ে যাবো।

মামী, আপত্তি করতে পারল না।

নিজের কাছে শ চারেক টাকা ছিল সেই টাকা হ্যাণ্ড ব্যাগে নিয়ে বন্দনা তার বান্ধবীর সঙ্গে তাদেরই গাড়িতে সিনেমায় যাবার নাম করে বের হয়ে পড়লো।

কলকাতায় বন্দনার এক বান্ধবী থাকে তাকে আগেই চিঠি দিয়েছিল—বন্দনা যে কলকাতায় যাচ্ছে—

বান্ধবী বন্দনাকে ভি. টি. তে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বন্দনা স্টেশনে নেমে হঠাৎ দূর থেকে ব্রজদুলালকে দেখতে পেয়ে আর টিকিট কাটার সময় পেল না—সোজা গেট দিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়লো ভিড়ের মধ্যে।

সামনে যে ট্রেনটা পেয়েছিল তাতেই উঠে পড়েছিল।

বন্ধ দরজায়, ধাক্কা মৃদু মৃদু, শুনছেন—দরজাটা খুলুন—

সংবিৎ ফিরে এলো বন্দনার। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল ওয়েটিং রুমের—

কি ব্যাপার, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি? যুবক জিজ্ঞাসা করে, কখন থেকে ডাকছি—নামটাও জানি না আপনার, নিন—বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না—গোটা আষ্টেক বয়েল ডিম আর দুটো কোয়ার্টার পাঁউরুটি পাওয়া গিয়েছে—

যুবক চারটে ডিম ও একটা পাঁউরুটি এগিয়ে দিল বন্দনার দিকে, নিন—খেয়ে নিন—

না—

কি না?

আমার ক্ষিদে নেই।

এখন না থাকলেও কাল পাবেই ক্ষিদে—তখন এও জুটবে না হয়ত—

না জুটুক—

যুবক মুহূর্তকাল যেন ভাবল, তারপর বললে, বেশ—না খেলে আর কি করবো—

ঠিক ঐ সময় কাচের জানালার ওপাশে একটা মুখ দেখা গেল।

কে? কে ওখানে? বন্দনা চিৎকার করে ওঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে।

কোথায়? কোথায় কে?

একটু আগে জানালার ওপাশে একটা যেন মুখ দেখলাম—

যুবকটি তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলার শার্সি খুলে হাতের টর্চ ফেলে বাইরে দেখল কিন্তু কিছুই তার নজরে পড়ল না।

জানালা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলো, কই কেউ ত নেই—

আমি স্পষ্ট দেখেছি।

ঠিক আছে আপনি দরজা বন্ধ করে বসে থাকুন—আর কয় ঘন্টায়ই বা রাত আছে—ভয় করলে সিগন্যালার বা পয়েন্টস্‌ম্যানকে ডাকবেন।

কেন—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমায় এখুনি যেতে হবে—

যেতে হবে মানে?

মানে আর কি এখানে বসে থাকলে ত চলবে না।

আমি এখানে একলা থাকবো নাকি—

একলা থাকবেন বলেই ত এ ঘরে এসেছিলেন—

মরে গেলেও এখানে আমি একা একা থাকতে পারবো না, বলতে বলতে বন্দনা উঠে দাঁড়ায়, আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

আমার সঙ্গে যাবেন?

হ্যাঁ—

কোথায়?

যেখানে আপনি যাবেন।

আমার সঙ্গে আপনি যাবেন! আমার কোন পরিচয়ই ত আপনি জানেন না। কে আমি—কি রকম লোক—চোর ডাকাত না খুনি আসামী একটা—

যাই হোন আপনি—আমি যাবো আপনার সঙ্গে—

না, তা হয় না।

কেন হয় না—

আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন না—

খুব পারি—তারপরেই বলে, এইখানে আপনি আমাকে একা ফেলে যাবেন নাকি—খুব মানুষ ত আপনি!

বা রে—আপনি কি আমার সঙ্গে এসেছেন না আমি আপনার সঙ্গে এসেছি—যে আমি যেখানে যাবো সেখানে আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

অতশত আমি জানি না—মোট কথা আপনি আমাকে এখানে একা ফেলে যেতে পারবেন না—আর যদি যান ত আমিও সঙ্গে যাবো!

কিন্তু আপনি জানেন না যে আমি নিজে—

কিছু জানতে চাই না—আমি আপনার সঙ্গে যাবো—বন্দনার গলা যেন ভিজে ভিজে—বলতে বলতে বন্দনা উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু আমার সঙ্গে কোথায় যাবেন আপনি?

কলকাতায়—

কিন্তু আমি ত কলকাতায় যাবো না—ঠিক আছে আমি টাকা দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে—বলে দশ টাকার কয়েকটি নোট যুবক পকেট থেকে বের করল, এই টাকা রাখুন—কাল এখান পর্যন্ত টিকিটের টাকা দিয়েও এতে কলকাতা পর্যন্ত আপনার যাওয়া হয়ে যাবে—একটা কলকাতার টিকিট কেটে এবারে ট্রেনে উঠে বসবেন।

বন্দনা গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি হলো? নিন ধরুন টাকাটা—

না—

আমি জানি টাকার আপনার দরকার। বেশ এমনি না নেন মনে করুন ধার নিচ্ছেন—একটা ঠিকানা দিচ্ছি—ডাঃ সুধামাধব চক্রবর্তী, সেন্ট্রাল নার্সিং হোম, ৩ নং আয়রনসাইড রোড, কলকাতা—ঐ ঠিকানায় টাকাটা না হয় পাঠিয়ে দেবেন—নিন—

বন্দনা কোন সাড়া দেয় না—টাকা নেবার কোন লক্ষণও দেখায় না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

যুবকটি অতঃপর দরজার দিকে এগিয়ে যায়—বন্দনাও তার পিছনে পিছনে এগোয়।

যুবক আবার দাঁড়াল। এবং বললে, সত্যিই আপনি বিশ্বাস করুন আমার সঙ্গে আপনার যাওয়া সম্ভব নয়—তাছাড়া এখানে আর বেশীক্ষণ আমার পক্ষে থাকাও নিরাপদ নয়—নচেৎ আজ রাতটা থেকে কাল সকালে আপনাকে টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়ে তবে যেতাম।

কে আপনাকে অত দয়া দেখাতে বলছে। যান না যেখানে খুশি আপনার—

সত্যিই আমি কলকাতায় যাচ্ছি না—কোথায় যাবো তাও জানি না। শুধু এখুনি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমি এইটুকুই জানি—

আমি কি আপনাকে আটকে রেখেছি—চলে যান না—

যুবক হাসলো, ওটা ত আপনার রাগের কথা হলো। শুনুন—সত্যিই আমার সঙ্গে যাওয়ায় আপনার বিপদ আছে—

কোন বিপদ নেই। ও! কেবল আমাকে আপনি এড়াতে চান তাই ওকথা বলছেন।

যুবক অতঃপর যেন কি ভাবল। তারপর বললে, আপনি আমার সঙ্গেই যাবেন?

হ্যাঁ—

আমি যেখানে যাবো সেখানেই যাবেন?

হ্যাঁ—

ভয় করবে না আপনার একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে যেতে।

ভয় কি? আপনি ত আর বাঘ ভাল্লুক নয়—একজন ভদ্রলোক।

বুঝলেন কি করে আমি ভদ্রলোক।

জানি আমি—

জানেন?

হ্যাঁ—

বেশ তবে চলুন—তবে একটা শর্তে।

কি শর্ত শুনি?

প্রথমত আমি সোজা রাস্তা দিয়ে যাবো না—

তবে কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবেন?

যে রাস্তায় সাধারণত বড় একটা কেউ হাঁটা চলা করে না। হয়ত পথে বনজঙ্গল খানাখোদল পড়বে—পারবেন সে রাস্তায় যেতে?

পারবো।

তারপর কোথায় যাবো তারও ত কোন ঠিকঠিকানা নেই—

তা হোক—

তবু যাবেন?

হ্যাঁ—

বেশ তবে চলুন—তবে মনে রাখবেন। আপনি কিন্তু রাতটুকুই আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন—ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজনের পথ আলাদা—অর্থাৎ সেখান থেকেই আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নেবো—

বন্দনা মনে মনে যেন কি ভাবল তারপর বললে, বেশ—তাই হবে—

তবু যাবেনই আপনি আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ—

তবে আর কি—চলুন। আসুন—

যুবক ফুঁ দিয়ে ঘরের একটিমাত্র আলো নিভিয়ে দিল, তারপর দুজনে অন্ধকারে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ইতিমধ্যে আকাশে যে অসময়ে মেঘ জমেছে ওরা জানতেও পারেনি।

স্টেশনটা ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়তেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হলো।

একে প্রচণ্ড শীত তার উপরে ঐ বৃষ্টি।

দুজনে জোরে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে যায়—কিন্তু বৃষ্টি ক্রমশঃই ঝেঁপে আসে।

হঠাৎ যুবকের নজরে পড়ে অল্প দূরেই একটা বাড়ির জানালাপথে আলো দেখা যাচ্ছে!

নাঃ বৃষ্টি বেশ জোরে এলো দেখছি, যুবকটি বললে, চলুন ঐ বাড়িটায় আশ্রয় নেওয়া যাক—

দুজনে চলার গতি আরো দ্রুত করে।

ওরা জানত না যে ওটাই স্টেশন মাস্টার শান্তাপ্রসাদেরই কোয়ার্টার।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ওদের কানে এলো এক পুরুষকণ্ঠ, বংশীলাল, কোথায় গেলি জলদি যা, ডাক্তারবাবুকে এখুনি একবার ডেকে নিয়ে আয়—এই বংশীলাল—কোথায় গেলি! জ্বর ভীষণ বেড়েছে—কিরকম যেন করছে। বংশীলাল—বংশীলাল—

প্রৌঢ় শান্তাপ্রসাদ বিচলিত হয়ে কথাগুলো বলতে বলতে ঘরের বাইরে বের হয়ে এলেন—আর যুবকটি সেই সময় বন্দনাকে নিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে অনন্যোপায় হয়ে ঘরের সামনে বারান্দায় এসে উঠেছে।

বংশীলাল—

অন্ধকার—বৃষ্টিও মুষলধারায় নেমেছে ততক্ষণে—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

প্রথমটায় অন্ধকারে ওদের দেখতে পান না শান্তাপ্রসাদ—কিন্তু পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় ওদের দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন, কে? কে ওখানে—

আমরা বৃষ্টির জন্য—যুবক বললে!

বংশীলাল! চেঁচিয়ে ডাকলেন আবার শান্তাপ্রসাদ।

কি হয়েছে? কার, অসুখ? যুবক এবারে প্রশ্ন করল।

শান্তাপ্রসাদ বললেন, আমার নাতির—বংশীলাল—

কোথায় আপনার নাতি? যুবক আবার প্রশ্ন করল।

ভিতরের ঘরে—

চলুন ত দেখি—আমি একজন ডাক্তার।

আপনি ডাক্তার—আসুন আসুন—

যুবকটিকে নিয়ে শান্তাপ্রসাদ ভিতরের ঘরে নিয়ে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বন্দনাও যায়।

মাঝারি আকারের একটি শয়নঘর। একটা ভাঙ্গা কাঠের আলমারি—দুটো ট্রাংক—একটা আলনা।

একটা শয্যার উপরে দশ-এগার বছরের একটি বালক নিঃসাড়ে পড়ে আছে—কম্বল দিয়ে বুক পর্যন্ত আবৃত।

দেখিয়ে ডাকটার সাব্ মেহেরবানি করকে—আমার নাতি—ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না—শান্তাপ্রসাদের গলা কান্নায় যেন বুজে এলো।

যুবক এগিয়ে গেল। ছেলেটির নাড়ি পরীক্ষা করে বললে, খাবড়াইযে মাত্— থোড়া গরম পানি মিলেগা?

গরম পানি—

হাঁ—দেখিয়ে জলদি—

ঐ সময় বন্দনা এগিয়ে এলো, রান্নাঘর কোথায় চলুন—আমি গরম জল করে দিচ্ছি—

শান্তাপ্রসাদ বন্দনার দিকে তাকালেন, দামী শাড়ি পরনে—আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা যেন বিহ্বল মনে হয় তাঁর দৃষ্টি, এতক্ষণ বন্দনার দিকে তাঁর নজর পড়েনি—

যুবক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমার বোন—আমরা এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম—হঠাৎ বৃষ্টি আসায় আপনার বাড়ির দরজার সামনে উঠে পড়েছি—

শান্তাপ্রসাদের দৃষ্টির বিহ্বলতা তখনো কাটেনি। যদিও চোস্ত হিন্দীতে কথাগুলো বললে যুবকটি কিন্তু তার চেহারা বেশভূষা মলিন ট্রাউজার গলাবন্ধ একটি অনুরূপ মলিন কোট মাথায় মিলিটারী ব্যেরে ক্যাপ মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি—তার সঙ্গের ঐ সুন্দরী আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা দামী শাড়ি পরিহিতা মেয়েটি তার বোন—

বন্দনাও বোধহয় ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল।

গায়ে পড়া হয়ে যুবকটির এখানে ঢোকা তাব পছন্দ হয়নি কিন্তু এখন আর উপায় কি!

সেও তাড়াতাড়ি বললে, চলিয়ে না—

কিন্তু শান্তাপ্রসাদের অতশত ভাববার মত ঐ মুহূর্তে মনের অবস্থা ছিল না। তার একটিমাত্র আদরের নাতির সংকটময় অবস্থাই তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—সমস্ত চিন্তার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল।

যুবকটি আবার বললে, ইধার নজদিক আশপাশমে কোই দাবাখানা হ্যায়?

আশপাশ ত নেহি হ্যায়—যো হ্যায় ইঁহাসে এক মিইল হোগা করিব—শান্তাপ্রসাদ বললেন।

একঠো কাগজ আউর পিনসিল দিজিয়ে—একঠো দাওয়াই লিখ দেতা হ্যায়—জলদি কিসিকো ভেজকে দাওয়াইঠো লাইয়ে—

শান্তাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি একটুকরো কাগজ ও একটা পেনসিল এনে দিলেন।

যুবকটি একটা ঔষধের নাম কাগজে লিখে এগিয়ে দিল, লিজিয়ে কিসিকো জলদি ভেজ দিজিয়ে—

যুবকটি কাগজটা হাতে তুলে দিল শান্তাপ্রসাদেব।

মুঝেই যানে পড়েগা। বংশীলাল সাযেদ স্টেশন চলা গিয়া—

আউর কোই নেই হ্যায়? যুবক শুধায়।

কোই নেই হ্যায় ডকটর সাব্। এক নোকড়ানী হ্যায়—সুবে সাম দো টাইম আতি হ্যায়—ফির কাম করকে চলি যাতি হ্যায়—

শান্তাপ্রসাদের কথা শেষ হলো না—বংশীলাল ঠিক ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকল, মাস্টারজী—

কিন্তু ঘরের মধ্যে আরো দুজনকে দেখে হঠাৎ থেমে গিয়ে, বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চিনতে পেরে, বললে, আপ্ হিঁয়া—

বন্দনা বিব্রত বোধ করে—

বংশীলাল বললে, মাস্টারজী—ও ওহি জেনানা যিনে বিনা টিকিটসে—

শান্তাপ্রসাদের তখন ওসব কথা শোনার সময় নেই, তিনি বললেন, বংশীলাল, এক কাম করো ভাই—

কেয়া মাস্টারজী?

এই পূর্চাঠো লে যাও—জলদি দাওয়াঠো লাও—রূপিয়া দেতা হ্যায়—বলতে বলতে শান্তাপ্রসাদ ঘরের আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন।

বংশীলাল বললে, রূপিয়াকি জরুরৎ নেহি হ্যায় মাস্টারজী। হামারা পাশ হ্যায়—

তব জলদি যাও ভাই।

বংশীলাল আর কথা বাড়ায় না, চলে গেল।

সায়েদ মালুম হোতা হ্যায় আপহি স্টেশন মাস্টার হ্যায়? যুবক প্রশ্ন করল।

জী হাঁ—

লেকিন গরম পানিকো কেয়া হোগা—

ম্যায় আভি লাতা হুঁ পানি গরম করকে—

শান্তাপ্রসাদ পাশে রন্ধনাশালার দিকে এগোলেন। বন্দনা তাঁকে অনুসরণ করল।

দাবাখানার দিকে যেতে যেতে বংশীলাল একটা কথা ভাবছিল।

একটু আগে স্থানীয় চৌকিদার সাহেব রামেশীস স্টেশনে এসেছিল অদূরবর্তী থানায় একটা জরুরী টেলিফোন করবার জন্য।

বংশীলাল তখন শয়নের ব্যবস্থা করছে। বংশীলাল কোথায় ভেবেছিল কাছেই মাইলখানেকের মধ্যে মাঘী মেলা বসেছে—হৈহল্লা নাচগান—সেখানে স্ত্রী লছমীকে নিয়ে যাবে—কারণ রাতের ঐ ট্রেনটা পাস করবার পর ত রাতের মত ছুটি—তা আর হলো না—একে মাস্টারজীর নাতির অসুখ—মাস্টারজী তার উপরেই স্টেশনের ভার দিয়েছেন রাত্রির মত, তার উপরে এক ফ্যাসাদ।

এক জেনানা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল তাকে টি. টি. আই. তাদের জিম্মায় দিয়ে গিয়েছে। মাস্টারজীকে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছিল।

শান্তাপ্রসাদ বললেন, রাতে ওয়েটিং রুমেই থাক—ভোর হলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ও ভেবেছিল ওয়েটিং রুমে বাইরে থেকে একটা তালা লাগিয়ে চলে যাবে—পরে কি ভেবে মতলবটা পরিত্যাগ করেছিল।

মনটা তাই বিগড়েই ছিল।

কপালে আছে স্টেশনেই রাতটা কাটান—সেই ব্যবস্থাই করছিল এমন সময় রামেশীসের আবির্ভাব।

চৌকিদার সাহেব যে—কি খবর? এত রাত্রে—

একটা ফোন করবো—রামেশীস বললে।

ফোন। কোথায়?

থানায়—

কেন? কোন জরুরী খবর আছে নাকি?

আর বল কেন ভাই—এক বেটা খুনী এদিকেই কোথায় পালিয়ে এসেছে চৌকিতে কিছুক্ষণ আগে খবর এসেছিল—কি করি, ডিউটি—বের হয়েছিলাম ভাই—ঐ রেস্টুরেন্টের মালিক নাথুরাম বললে একটু আগে নাকি কে একটা অপরিচিত লোক ডবল রুটি আর আণ্ডা কিনে নিয়ে গিয়েছে—

কেমন দেখতে?

ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—দেখেছো নাকি এমন কাউকে ভাই এদিকে?

নেহি ত! এক জেনানা—

জেনানা?

হ্যাঁ—এক জেনানা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল—টি. টি. আই. সাহেব তাকে আমাদের জিম্মায় দিয়ে গিয়েছে—ওয়েটিং রুমে আছে—

সত্যি কথা বলতে কি বংশীলাল একটু ভীতু প্রকৃতিরই লোক—কোন এক খুনী আসামী এদিকে এসেছে শুনে তার ভয়ই ধরে যায়।

রামেশীস ফোন করে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো—

চললে চৌকিদার সাহেব?

হ্যাঁ—চলি—

যদি এখানে এসে পড়ে—

কে?

কে আবার সেই খুনী আসামীটা—

চৌকিতে একটা খবর পাঠিয়ে দিও—লোকটা ভারী ধূর্ত—শয়তান। দেড় বছর ধরে সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে—

বল কি! কি জাত—

শুনেছি নাকি বাঙ্গালী—তবে হিন্দী বাত্ খুব ভাল বলতে পারে—

গায়ে বুঝি খুব তাগত—

তা আর নেই—ভীষণ তাগত—

রামেশীষ চলে গেল।

বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি নেমেছে। বংশীলাল সিগন্যালার কামতাপ্রসাদকে ডাকল বাইরে বের হয়ে কিন্তু তার কোন পাত্তা পেল না।

একা স্টেশনে—যদি ঐ সময় খুনীটা এসে হাজির হয়—তাছাড়া স্টেশন মাস্টার তাকে নাতির অসুখের জন্য তার কোয়ার্টারেই থাকতে বলেছিল কিন্তু সে থাকেনি চলে এসেছে তাকে না জানিয়েই—

একা একা স্টেশনে থাকতেও ভয় করছে—বংশীলাল অবশেষে স্টেশন রুমে তালা দিয়ে বের হয়ে পড়ল—স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারের দিকেই আবার।

দাওয়াখানা যেতে যেতে অন্যমনস্ক ভাবে বংশীলাল ভাবছিল—শান্তাপ্রসাদের ঘরে এইমাত্র যে লোকটাকে দেখে এলো সে লোকটা কে? লোকটার মুখেও ত খোঁচা খোঁচা দাড়ি—কেমন যেন ষণ্ডাগুণ্ডাই দেখতে।

বংশীলাল জোরে জোরে পা চালায়।

বন্দনার সাহায্যেই চুল্লী জ্বালিয়ে শান্তাপ্রসাদ কোনমতে একটা কেতলিতে করে জল গরম করে নিয়ে আসেন।

তাঁর নাতি বাবুয়া তখনো অজ্ঞান।

লিজিয়ে ডক্টর সাব্ গরম পানি—শান্তাপ্রসাদ বললেন।

ঠিক হ্যায়, থোড়া ঠাণ্ডা পানিকে ভি জরুরৎ হ্যায়—

ম্যায় ঠাণ্ডা পানী আভি লাতা হুঁ বলে, শান্তাপ্রসাদ বের হয়ে গেলেন আবার ঘর থেকে। বাইরে তখনো অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে।

এক বালতি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলেন শান্তপ্রসাদ। বন্দনার সাহায্যে দুটো জল মিশিয়ে অসুস্থ বালকের মাথা ধুইয়ে দিল ও গা বেশ করে স্পঞ্জ করে দিল যুবকটি।

ধীরে ধীরে বালক চোখ মেলল একটু পরে—

বাবুয়া!

দাদু—

কেয়সা হ্যায় মেরে লাল—

মা—

জ্বর কমলেও তখনো একটা আচ্ছন্ন ভাব রয়েছে বালকের—

পাশেই ছিল বন্দনা, তার দিকে তাকিয়েই বোধ হয় ভুল করে বাবুয়া ডাকে, মা—

যুবকটির মুখের দিকে তাকায় বন্দনা—যুবকটি তাকে কি ইশারা করে।

বন্দনা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করে তারপর এগিযে যায় শয্যার কাছে, বাবুয়া—

তুম্ আ গেয়ি—মুঝে ছোড়কে আর নেহি যাওগি ত?

নেহি বেটা—তুম্ নিদ যাও—

বাবুয়া বন্দনার একটা হাত চেপে ধরে—জ্ঞান ফিরে এলেও জ্ঞান তখনও তার পরিষ্কার নয়—

ঝাপসা দুর্বল ক্ষীণ মস্তিষ্ক।

যুবকটি এবারে উঠে দাঁড়ায় শয্যার থেকে, মাস্টারজী—

ডকটর সাব্—

ইজাজৎ হো তো—আমি এবারে যাবো—

কিন্তু শান্তাপ্রসাদ কিছু বলার আগেই সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভেজা—মাথার চুল খোলা—এলোমেলো ভাবে শাড়ি পরা এক তরুণী এসে ঘরে ঢুকল—

শান্তাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে—বেটি, তোর লেড়কাব বহুৎ বুখাব -

ওরা বুঝতে পারে ঐ শান্তাপ্রসাদের বিকৃতমস্তিষ্কা কন্যা।

আব বন্দনা আশ্চর্য হয় ঐ মেয়েটির মুখই সে ওয়েটিংরুমেব জানলা পথে দেখেছিল।

উয়ো আয়া বাবুজী—শান্তাপ্রসাদের মেয়ে, ইধার জরুর আয়েগা—

কোন ট্রেন সে—কাপড়া বদল লেও বেটি—

কিঁউ—

সব গিলা হো গিয়া—

আহা ম্যায় চলতা হুঁ—তরুণী বের হয়ে গেল।

শান্তাপ্রসাদ ডাকেন বিটি—বিটিয়া—কোন সাড়া পাওয়া গেল না—দূব থেকে একটা গানেব কলি ভেসে এলো কেবল বৃষ্টির শব্দের মধ্যে—বাইবে তখনো বৃষ্টি ঝরছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা আবার যুবকটি বললে, তাহলে আমি এবারে যাই?

আপনি চলে যাবেন? শান্তাপ্রসাদ শুধান।

হ্যাঁ—যে ঔষধটা আনতে পাঠিয়েছি সেটা এলে দশ ফোঁটা জল দিয়ে খাইয়ে দেবেন—আবার এক ঘন্টা বাদে দশ ফোঁটা। এখন ও ঘুমোবে—আশা করছি কাল সকাল নাগাদ ও অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে—

বাবুয়া সত্যিই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখে-মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন অনেক কম।

॥ ছয় ॥

শান্তাপ্রসাদ কৃতজ্ঞতাভরা কণ্ঠে বললেন, জানি না ডকটর সাব্ এ সময় এখানে কোথা থেকে আপনি এলেন—নিশ্চয়ই আপনি ঈশ্বরপ্রেরিত—এ সময় আপনি এসে না পড়লে হয়ত ওকে বাঁচানোই যেতে না—

যুবকটি বললে, একজন ডাক্তার হিসাবে যতটুকু কর্তব্য তার বেশী ত আমি কিছুই করিনি মাস্টারজী। আচ্ছা যদি ইজাজৎ হয় ত আমি এবারে যাবো—

না ডকটর সাব্ এই ঠাণ্ডা শীতের রাত্রে বিশেষ করে এই বৃষ্টির মধ্যে আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না—ভোর হোক বৃষ্টি থামুক তারপর যাবেন—

না—আর আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়—

কতক্ষণই বা আর রাত আছে—বাকী রাতটুকু—

আপনি আমাকে যেতে দিন মাস্টারজী—

না—আমি আপনার কোন কথাই শুনবো না—

বুঝতে পারছেন না আপনি মাস্টারজী—

না, না—সেটা সতিাই অধর্ম হবে—কৃতজ্ঞতা বলেও ত একটা কথা আছে। শান্তাপ্রসাদ বললেন।

মাস্টারজী, আমি এখানে থাকলে হয়ত আপনার বিপদ হতে পাবে।

—বিপদ।

—হ্যাঁ—আর সেটা আমি চাই না—

—লেকিন—

—না মাস্টারজী আমার জন্য কেন আপনার বিপদ ডেকে আনবেন—

—আপনি থাকলে আমার বিপদ হবে। কি বলছেন আপনি—

—হ্যাঁ—মাস্টারজী তাই হবে—

মাস্টারজী এবার মৃদু গলায বললেন, বিপদ—

আপনি জানেন না কতবড় ঝঞ্ঝা আমার জীবনের উপর দিয়ে গিয়েছে—বিপদের ভয় আব

আমি করি না। তাছাড়া আমার বাবুয়া আপনি না থাকলে হয়ত বাঁচাবে না।

ভয় নেই আপনার—আমার মনে হয় যে ঔষধ লিখে দিয়েছি তাতেই আপনার নাতি ভাল হয়ে যাবে মাস্টারজী—আমাকে এবারে যেতে দিন—

—না—ভোর হোক তারপর—

—মাস্টারজী শুনুন, আপনি জানেন না কে আমি, কি আমার সত্য পরিচয়—কোথা থেকে আসছি—

যেই হোন আপনি ডক্‌টর সাব্—যে পরিচয়ই আপনার হোক—আপনি আমার কাছে ঈশ্বরপ্রেরিত—

শুনুন মাস্টারজী—আমি, একটা চোর—একটা ভয়ানক ডাকাত বা একটা খুনীও ত হতে পারি।

কভি নেহি—আপ দেওতা হ্যায়—

নেহি মাস্টারজী নেহি—হামারা বাত মানিয়ে—মুঝে যানে দিজিয়ে—শুধু একটা কাজ যদি করে দেন ত—

কেয়া ডকটর সাব্?

আমি কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি—বম্বে থেকে ওঁর টিকিটের ভাড়া কেটে বাকী টাকা দিয়ে ওঁর একটা কলকাতার টিকিট কেটে ওঁকে কলকাতাগামী ট্রেনে তুলে দেবেন—পথে ওঁর সব টাকা ব্যাগ কেটে চুরি হয়ে গিয়েছে—

সাচ্ বেটি? শান্তাপ্রসাদ বন্দনার দিকে ফিরে তাকালেন।

বন্দনা মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ—

কোই চিন্তা না করিয়ে ডকটর সাব্—লেকেন আপ আপকো বহিনকো একেলে ছোড়কে—

উনি আমার বোন নন মাস্টারজী—

আপনার বোন নন?

না—

তবে? তবে উনি কে?

জানি না ওঁর পরিচয়—আজই হঠাৎ ওয়েটিং রুমে প্রথম ওঁর সঙ্গে আমার দেখা—

শান্তাপ্রসাদ কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার যুবকটির মুখের দিকে তাকান তারপর বন্দনার মুখের দিকে।

যুবক বললে, ওঁর পরিচয় আমি জানি না, আর উনিও আমাকে চেনেন না—তবে উনি কোন ভদ্র ঘরেরই মেয়ে—আমার সঙ্গে উনি ওয়েটিং রুম থেকে জোর করে এসেছেন—আমার কোন কথা শোনেননি—কিন্তু উনি আমার সঙ্গে থাকলে ওঁর বিপদের সম্ভাবনাই বেশী—

বিপদ!

মাস্টারজী, আপনার কাছে আর গোপন করবো না—পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

পুলিশ!

যুগপৎ কথাটা শান্তাপ্রসাদ ও বন্দনার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ মাস্টারজী সত্যিই আমি একজন ফেরারী—খুনের অপরাধে অপরাধী। আজ দেড় বছর প্রায় পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে তাড়াখাওয়া কুকরের মত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছি—absconder—

নেহী—শান্তাপ্রসাদ তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন, এ হামে কভি নেহি বিশ্বোয়াস কর সকতে হো—আপ কিসিকো কভি খুন নেহি কর সকতা—নেহি নেহি—ইয়ে না মুমকিন হ্যায়—

কিন্তু সত্যিই আমি জয়ন্ত বোসকে খুন করেছি—Yes I murdered him.

আপনি—কাকে, কাকে খুন করেছেন বললেন, বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল বন্দনা।

জয়ন্ত বোসকে। বললে যুবক।

—সত্যি সত্যিই তাহলে আপনি তাকে খুন করেছেন।

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন, কেন খুন করলেন।

খুন হয়ত করতে আমি চাইনি—কিন্তু যে দৃশ্য আমি দেখেছিলাম তারপর কোন মানুষ স্থির

থাকতে পারে না—

আপনার নাম সমীর চৌধুরী—

আপনি আমাকে চেনেন? বিস্মিত সমীর প্রশ্নটা না করে পারে না বন্দনাকে।

চিনি—আপনাকে দেখেও প্রথমটায় যেন আমার মনে হয়েছিল চেনা চেনা মুখ—কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি—

আমি ত বম্বেতে কখনো থাকিনি।

না—তবে—

তবে?

আপনার ফটো দেখেছি কাগজে—

ফটো?

হ্যাঁ—কলকাতার বিখ্যাত সার্জন সমীর চৌধুরী, এফ-আর সি-এস? বন্দনার গলা দিয়ে কথাগুলো বের হয়ে আসে, কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনুতে আপনার বাড়ি?

হ্যাঁ—

জানি। আপনার সব কথাই জানি।

জানেন?

হ্যাঁ—আপনার বাবাও নামকরা একজন চিকিৎসক ছিলেন—ডাঃ সঞ্জয় চৌধুরী—

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি—

কিন্তু জয়ন্ত বোসকে আপনি খুন করেছিলেন কেন তাত বললেন না—

বললাম ত। আমার একমাত্র বোন সীতার ইজ্জত সে লুঠ করেছিল— that scoundrel–কিন্তু যাক সে কথা—এবার আমি যাবো—

কোথায় যাবেন? বন্দনা শুধায়।

জানি না কোথায়, শুধু জানি যেতে হবে এবং এই মুহূর্তে—

কিন্তু এমনি করে পালিয়ে পালিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কতদিন পারবেন—

কতদিন পারবো তা জানি না আর ধরাও হয়ত একদিন পড়বো—তারপর একটু থেমে সমীর বললে, আপনি বুঝবেন না—এইভাবে আত্মগোপন করে পালিয়ে পালিয়ে সত্যিই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এক এক সময় তাই ভাবি—ধরাই দিই। কিন্তু পারি না—যখনই আমার বোন সীতার কথা মনে পড়ে তখুনি মনে হয় ধরা দিলে তার কি হবে?

কেন? সীতা—আপনার বোনের কি হয়েছে।

তার দেহের উপর দিয়ে সে রাত্রে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল তারপরই সম্পূর্ণ আত্মবিকৃতি আসে amnesia–যতদিন না সুস্থ হয়ে সে ওঠে—তার চিকিৎসার খরচ আমি ছাড়া আর কে বহন করবে বলুন—আমি ছাড়া ত এ জগতে আমার সেই স্মৃতিভ্রংসা অভাগিনী বোনটির আর কেউ নেই। যাক্ শুনলেন ত সব কথা—এবারে আমি যাই—

বন্দনা চুপ করে থাকে।

মাস্টারজীও এতক্ষণ ওদের কথা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল।

ডকটর সাব্—শান্তাপ্রসাদ বললেন, এক বাত বলুঁ—

কেয়া মাস্টারজী?

আপ ইধারই রহিয়ে—

না, না—

আপনার কোন ডর নেই—এখান থেকে থানা চৌকি অনেক দূর—কেউ আপনার সন্ধান পাবে না—

তা হয় না মাস্টারজী—জেনে শুনে আপনাকে আমি বিপদের মধ্যে ফেলতে পারি না—

বিপদ—আমার আবার বিপদ কি? আপ ফিকার না করিয়ে—

না। তাছাড়া পুলিশের তাড়া খেয়ে আমি জঙ্গলে ঢুকেছিলাম—ছুটতে ছুটতে জঙ্গলের বাইরে এসে হঠাৎ একটা ট্রেন থামতে দেখে সেটায় উঠে এখানে আসি। সকলের অলক্ষ্যে ওয়েটিং রুমে—

সমীরের কথা শেষ হলো না বাইরে একটা গাড়ির তীব্র হেডলাইটের আলো ঘরের জানলার

উপর এসে পড়ে আবার সরে গেল।

বন্দনা তাড়াতাড়ি ছুটে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বললে, একটা জীপ মাস্টারজী—

একজন অফিসার দুজন সেপাই নামল জীপ থেকে—

সর্বনাশ! পুলিশ—

সমীর তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকবার চেষ্টা করতেই শান্তাপ্রসাদ বললেন, ওদিক দিয়ে পালাবার কোন রাস্তা নেই ডকটর সাব্—হ্যায় কিষণজী এ আমি কি করলাম—কেন একটু আগে ডাক্তার সাহেবকে যেতে দিলাম না—

বন্দনা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসেছে। চটপট তার পায়েব ব্যাণ্ডেজটা খুলে সমীরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, নিন—চটপট আপনার মুখ ও মাথা ব্যাণ্ডেজ করে আপনি বাবুয়ার পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ুন—যান আঃ কি করছেন—দেরী করবেন না আর—তাড়াতাড়ি করুন যা বলছি—

কিন্তু—

Please–সময় নষ্ট করবেন না—

পুলিশ অফিসার মিঃ সিংয়ের গলা শোনা গেল—দরজার গায়ে ধাক্কা পড়ল, মাস্টারজী, দরোয়াজা খুলিয়ে—

সমীর চটপট নিজের মাথা ও মুখ ব্যাণ্ডেজ করে নেয়—

লাল সিয়াহি হ্যায় মাস্টারজী? বন্দনা শুধায়।

হ্যাঁ—

জলদি লাইয়ে—

শান্তাপ্রসাদ একটা লাল কালির দোয়াত এনে দেন—বন্দনা তা থেকে লাল কালি সমীরেব ব্যাণ্ডেজে লাগিয়ে দেয়—তারপর নিজের ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে নিজের সিঁথিতে ও কপালে লাল রং লাগিয়ে দিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়।

'মাস্টারজী, দরোয়াজা খুলিয়ে—ম্যায় পুলিশ অফিসার সিং—

বন্দনাই তখন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

কৌন—

ইন্সপেক্টার সিং—

কেয়া মাংগতে হে ইন্সপেক্টার সাব্—বন্দনা প্রশ্ন করে।

আপ কৌন হ্যায়—মাস্টারজী কিধার—

হাম উসিকো ভাতিজা—কাকা অন্দরমে হ্যায়—কেয়া, বোলাউ উসকো?

সিং ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

শান্তাপ্রসাদ এবার এগিয়ে এসে বলেন, কেয়া বাত হ্যায় বিটি? ইন্সপেক্টার সাব্ আয়া।

ইন্সপেক্টার সাব্—নমস্তে—ইতনি রাতমে—কেয়া বাত হ্যায় সাব্—

ইন্সপেক্টার শান্তাপ্রসাদের কথার কোন জবাব না দিয়ে ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে শয্যায় ব্যাণ্ডেজবাঁধা শায়িত সমীরকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে, বিস্তারা পর লেটা হুয়া উয়ো কৌন হ্যা?

দামাদ।

দামাদ?

হ্যাঁ—এই আমার ভাতিজা—ওরই স্বামী—আমার কাছে আসছিল, গাড়িতে, আসতে আসতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সন্ধ্যার সময়. গাড়ি ফেলে রেখে ওরা পায়ে হেঁটে কোনমতে আমার এখানে এসেছে—এসেই জ্বর হয়েছে—ধুম জ্বর—অজ্ঞান প্রায়—

কেয়া নাম?

সুধাশংকর চৌবে।

কিধার রহেতে হে?

পুনা—

ইন্সপেক্টার সিং একবার শায়িত সমীরকে দেখল, তারপর ঘরগুলো একবার দেখল, তারপর শান্তাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললে, I am sorry to disturb you at this late hour of nigh. মাস্টারজী—

কোই বাত নেহি। লেকেন—বাত্ কেয়া হ্যায় ইন্সপেক্টার সাব্?

সুবে খবর মিলা থা এক কাতিল ভাগকে ইধার আয়া—

খুনী—

হাঁ—

কেয়া হোগা ইন্সপেক্টার সাব্—মুঝে ত বহুৎ ডর লাগতা হ্যায় আপকো বাত শুনকে—

ডরনেকো কুছ নেহি হ্যায়। হামলোক ত হ্যায়—

হাঁ—ওহি ত ভরসা—আপলোক হ্যায়—

আচ্ছা শান্তাপ্রসাদবাবু—চলতে হে—Good night, good night!

ইন্সপেক্টর সিং ঘর থেকে জুতোর মচমচ শব্দ তুলে বের হয়ে গেল।

শান্তাপ্রসাদ লোকটিকে ঐ তল্লাটে সকলেই চেনে—যেমন সৎ তেমনি সজ্জন ও ধর্মভীরু। কখনো মিথ্যা বলেন না।

বংশীলাল শান্তাপ্রসাদের কোয়ার্টারে ঢোকেনি। শান্তাপ্রসাদ যদি বুঝে ফেলে—তাছাড়া নিজেকে সে প্রকাশ করতেও চায়নি।

ডাক্তারখানায় সে গিয়েছিল এবং সেখান থেকেই সোজা স্টেশনে গিয়ে টেলিফোনে থানায় খবরটা দিয়েছিল, এবং এদের আসা পর্যন্ত এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল রাস্তার ধারে অন্ধকারে।

সিং বের হয়ে আসতেই অন্ধকার থেকে এগিয়ে এলো বংশীলাল।

সাগ্রহে প্রশ্ন করল, কেয়া সাব্—মিলা?

ইনেসপেক্টর সিং প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় বংশীলালের গালে বসিয়ে কেবল বললে, বুদ্ধু—এবং বলে আর দাঁড়াল না, সোজা এগিয়ে গিয়ে জীপে উঠে ড্রাইভারকে বললে, চলো—

জীপটা স্টার্ট দিয়ে শব্দ তুলে চলে গেল।

বংশীলাল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গালে হাত বুলোতে থাকে—ঐ ঠাণ্ডায় প্রচণ্ড চড়ে গালটা তার তখনো টনটন করছে।

বন্দনা জানালাপথে উঁকি দিয়ে দেখছিল। জীপটা স্টার্ট দিয়ে চলে যাবার পর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললে, চলে গেছে—

শান্তাপ্রসাদ এগিয়ে এলেন, চলা গিয়া?

হ্যাঁ মাস্টারজী। বন্দনা বললে।

সমীরও ততক্ষণে শয্যা থেকে নেমে মাথার ব্যাণ্ডেজটা খুলতে শুরু করেছে।

ঐ সময় বংশীলাল এসে ঘরে ঢুকল, মাস্টারজী, লিজিয়ে দাওয়া—বলতে বলতে বংশীলাল আড়চোখে সমীরের দিকে একবার—বন্দনার দিকে একবার তাকায়।

এতনা দের লাগায়া কিঁউ ভাই?

কেয়া করু মাস্টারজী, দাওয়াখানামে কমপাউণ্ডার নিদ পড়া—উঠনেই নেই চাতা—চিল্লাকে চিল্লাকে ত ম্যায় থাক্ গিয়া—

বংশীলাল শান্তাপ্রসাদের হাতে ঔষধের শিশিটা দিয়ে আর একবার আড়চোখে সমীর ও বন্দনাকে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টার সিংয়ের চড়ের আঘাতটার জ্বলুনি তখনো কমেনি।

সমীর শান্তাপ্রসাদের হাত থেকে ঔষধটা নিয়ে পরীক্ষা করে বাবুয়াকে জলের সঙ্গে কুড়ি ফোঁটা খাইয়ে দিল, তারপর বললে, মনে হয় মাস্টারজী এই ঔষধেই আপনার নাতি সুস্থ হয়ে উঠবে—সকালে আরো কুড়ি ফোঁটা ও দুপুরে কুড়ি ফোঁটা খাইয়ে দেবেন।

আপনি যে আমার কি উপকার করলেন ডকটর সাব্—আপনি না হঠাৎ এসে পড়লে যে আমার বাবুয়ার কি হতো—

বাবুয়া ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল ঔষধের গুণেই বোধহয়।

এবারে তাহলে আমি যাই মাস্টারজী—কথাটা বলে দরজার দিকে এগুতে যাবে সমীর, হঠাৎ ওর নজরে পড়ল সামনেই টেবিলের 'পরে একটা ভাঁজকরা সংবাদপত্র—তার পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুটো ফটো—

সমীর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সংবাদপত্রটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল ঃ ডাঃ শ্যামল রায় —প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সীতা চৌধুরী—তাঁর পত্নী—মাত্র কয়েকদিন পূর্বে কলকাতায় তাঁদের বিবাহ হয়েছে।

কি—কি পড়ছেন কাগজে? বন্দনাই শুধায়।

আঃ এতদিনে আমার মস্তবড় একটা দুর্ভাবনা গেল—

দুর্ভাবনা?

হ্যাঁ—আমার বোন সীতাকে শ্যামল বিয়ে করেছে—আর আমাকে পুলিশের তাড়া খেয়ে কুকুরের মত ছুটাছুটি করে বেড়াতে হবে না—আত্মগোপন করেও বেড়াতে হবে না—এবারে যদি তারা আমাকে ধরে ত ধরুক।

ধরা দেবেন? বন্দনা শুধায়।

হ্যাঁ—একটু আগেইত আপনাকে বলেছিলাম—এতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি কেবল ঐ সীতার চিকিৎসার জন্যই—যদি কেবল জানতে পারতাম সে আজ সম্পূর্ণ সুস্থ—

সীতা দেবী কো সাদী হো গিয়া ডকটর সাব্? শান্তাপ্রসাদ প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ মাস্টারজী—

উন্‌নে আচ্ছা হো গিয়া।

এই সাত কুছ লিখা নেহি হ্যায় আকবর মে—স্রিফ উসাকা সাদী হো গিয়া হামারা এক দোস্তকে সাথ—এহি লিখা—

তা ডঃ সাব্ তোমার বোনকে কি ঐ লোকটা মানে জয়ন্ত বোস চিনতো—

হ্যাঁ—চিনত—

সমীর বলতে লাগল ঃ

ঐ সীতা—আমার একমাত্র বোন। সীতা আমার চাইতে বার বছরের ছোট—ওকে জন্ম দিয়েই মা মারা যান—বাবাও মারা গেলেন তার আট বছর পরে। আমিই ওকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি মাস্টারজী—মেডিকেল কলেজের পড়া তখনো শেষ আমার হয়নি—তারপর আমি পাস করলাম—সীতা তখন কনভেণ্টে পড়ছে, তাকে কনভেণ্ট বোর্ডিংয়ে রেখেই আমি বিলেত চলে গেলাম—চার বছর বাদে বিলেত থেকে ফিরে এসে ওকে বাড়িতে নিয়ে এলাম—and that was my blunder মাস্টারজী—

কিঁউ?

প্র্যাকটিস জমানোর জন্য তখন আমাকে উদয়-অস্ত খাটতে হতো—হাসপাতাল—চেম্বার—সীতা একা থাকত বাড়িতে—যদি সে সময় তাকে বোর্ডিং থেকে না আনতাম তবে হয়ত তার জীবনের অতবড় calamity দেখা দিতো না—

calamity? শান্তাপ্রসাদ শুধান।

হ্যাঁ সীতা সিনিয়র কেমব্রীজ পাস করে তখন কলেজে ভর্তি হয়েছে—আর না পড়িয়ে তখন যদি তার একটা বিয়ে দিয়ে দিতাম একটি ভাল ছেলে দেখে—

॥ সাত ॥

হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সমীর প্রস্তুত হচ্ছিল—

বালিগঞ্জ অঞ্চলে ছোট একটি দোতলা বাড়ি—অনেকখানি জায়গা সামনে ও পিছনে খালি পড়ে আছে—

সমীরের বাবা ডাঃ সঞ্জয় চৌধুরী কলকাতার নামী ফিজিসীয়ান—দু'হাতে একসময় প্রচুর টাকা উপায় করেছেন।

সুখের সংসার—স্ত্রী বিনতা ও একটিমাত্র ছেলে সমীর।

বালিগঞ্জ সার্দান অ্যাভিনুতে জায়গা কিনেছিলেন মনের মত একটা বাড়ি করবেন বলে—প্ল্যানও তৈরী—কিন্তু হঠাৎ কালো মেঘ সঞ্চারিত হলো।

দশ বৎসর পরে সন্তানসম্ভাবিতা বিনতা নার্সিং হোমে একটি কন্যার জন্ম দিয়েই চোখ বুজলেন।

সঞ্জয় চৌধুরী স্ত্রীকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন—স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে যেন তিনি একেবারে জবুথবু

হয়ে গেলেন।

প্র্যাকটিস পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন—মনের মত করে বাড়ি তৈরি করবেন বলে ভেবেছিলেন সে আর করা হলো না—কোনমতে ছোটখাটো একটা বাড়ি তৈরী করলেন।

আট বছর তারপর বেঁচেছিলেন—ছেলেকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেছিলেন—সমীর তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে—দারুণ মেধাবী ছাত্র।

সঞ্জয় চৌধুরী শেষ শয্যায় ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন সে যেন পড়া শেষ করে বিলাত যায়। মেয়েকে কনভেণ্টে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

সমীর পাস করে বিলেত চলে গেল বোনকে কনভেন্ট বোর্ডিংয়ে রেখে।

দেশে ফিরে সমীর সীতাকে বাড়িতে নিয়ে এলো।

বোন সীতার বয়স আঠার তখন—সিনিয়র কেমব্রীজ পাস করে কলেজে ভর্তি হলো এবং বাড়ি থেকেই বাসে যাতায়াত করতে লাগল সীতা।

কনভেণ্টে মানুষ হওয়ার দরুণ সীতা অত্যন্ত অ্যাঙ্গলিসাইজড্ হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া অত্যধিক ভালবাসত এবং প্রশ্রয় দিত সমীর বোনকে।

সমীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছিল পাশের ঘর থেকে সীতার গলা ভেসে এলো, দাদাভাই—

কি রে?

তুমি বেরুচ্ছো?

হ্যাঁ—কেন?

সীতা এসে ঘরে ঢুকল। পরনে স্ল্যাকস্ আর একটা হাফ শার্ট—বেণীটা বুকের 'পরে লুটোচ্ছে, উদ্ভিন্নযৌবনা।

আরশিতে বোনের ছায়া পড়ে—সমীর শুধায়, কিছু বলবি?

আজ আমরা কয়জন বন্ধু মিলে বটানিকস্‌য়ে পিকনিকে যাচ্ছি—

কলেজ নেই তোর?

না—আজ তো ছুটি—

কিসের ছুটি?

আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপক গতকাল মারা গেছেন—

কখন ফিরবি?

ফিরতে হয়ত সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

কয়জন যাচ্ছিস?

দশ বার জন—

ঠিক আছে, টাকার দরকার হলে ড্রয়ারে আছে নিয়ে যাস—

সীতা চলে গেল গুনগুন করে একটা ইংরেজী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে—

ভৃত্য শংকর এসে ঘরে ঢুকল।

বহুকালের ভৃত্য শংকর—সমীর যখন পাঁচবছরের তখন শংকর এ বাড়িতে এসেছে—

কোটটা হ্যাংগার থেকে নিয়ে গায়ে চড়াতে চড়াতে সমীর জিজ্ঞাসা করে, কিরে শংকরদা—কিছু বলবি?

তুমি ত সর্বক্ষণই দেখছি প্র্যাকটিস নিয়েই ব্যস্ত—

কি করি বল শংকরদা—সবে প্র্যাকটিসটা জমছে—

বেশ ত জমাও না, কিন্তু বোনটার দিকেও তাকাতে হবে ত।

সমীর হেসে ফেলে, তাকাচ্ছি না নাকি?

ছাই তাকাচ্ছো—এই যে কেবলই পিকনিক সিনেমা পার্টি করে বেড়াচ্ছে—

আহা ছেলেমানুষ—তাছাড়া এই ত জীবনটা উপভোগ করবার সময়—

বোনের বয়স হয়েছে ভুলে যেও না—ছেলেমানুষটি আর নেই—

না, না—কি এমন—

যা বলি শোন, ওর বিয়ের চেষ্টা দেখো এবারে একটা—

হবে হবে—ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

দেখো, তোমাকে একটা কথা বলি।

কি?

এ পাড়ার ঐ যে বিরাট বাড়ি—বোসরা না কি—

হ্যাঁ জনার্দন বোস—বিরাট বিজনেস—

তার একটা লক্কামার্কা বখাটে ছেলে আছে জান—

কার কথা বলছিস? জয়ন্ত—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—

তা কি হয়েছে তার—

ঐ ছেলেটার সঙ্গে সীতাকে দুদিন মার্কেটে—কয়েকদিন লেকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি—

তা হয়েছে কি?

হয়েছে কি মানে! ও ছেলেটা আদৌ ভাল নয়—আমি তোমায় বলে দিচ্ছি সীতা ওর সঙ্গে ঘোরাফেরা করে—ভাল না এটা!

সমীর মৃদু মৃদু হাসে। টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে তা থেকে সিগারেট কেসটার মধ্যে একে একে সিগারেট ভরতে থাকে।

আর সেই ভদ্রলোকের মেয়েকেই বা কতদিন ফেলে রাখবে?

কোন্ ভদ্রলোকের মেয়েকে আবার ফেলে রাখলাম রে? সমীর হাসতে হাসতে শুধায়।

কত্তাবাবুর বন্ধুর মেয়ে—বোম্বাইয়ে থাকে—যার সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে তোমার—নিয়ে এসো না তাকে এবারে বিয়ে করে—

দাঁড়া দাঁড়া—তুই যে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে আছিস শংকরদা—আগে সীতার একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিই তারপর সে সব কথা ভাবা যাবে—

তোমার খেয়ালখুশি মত বুঝি?

তা নয়ত কি! বিয়ে অমনি করবো বললেই ত হয় না—

আর তার মামা যদি অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়—তার বাপ ত আর বেঁচে নেই—

তা যদি দেয় তো আর কি করা যাবে—

কি করা যাবে মানে! মেয়ের অত টাকা—সম্পত্তি—

শংকরদা—

কি?

তুই এত লোভী!

লোভটা আবার কোথায় দেখলে—

তা নয়ত কি! তাছাড়া একটা কথা তুই ভুলে যাসনে শংকরদা—আমার সঙ্গে যখন বাবার বড়লোক ব্যারিস্টার বন্ধু তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবা তখন কলকাতা শহরের একজন টপ ফিজিসিয়ান—হাজার হাজার টাকা ইনকাম করেন—আর এখন আমাদের কি আছে! সম্বলের মধ্যে ত এই বাড়িটা—আমি ত ভাবছি এ অসবর্ণ বিয়ে হতে পারে না—আমি তাদের জানিয়ে দেবো।

কি জানিয়ে দেবে—

তারা যেন অন্য পাত্র দেখে—

জানিয়ে দেবে, আর কত্তাবাবুর কথাটা—

বাবাও নেই আর তাঁর বন্ধুও নেই—যাঁদের মধ্যে কথা হয়েছিল।

তারা না থাক তোমরা ত আছো—ওসব হবে না বলছি—ওসব মতলব ছাড়ো—

আচ্ছা আচ্ছা—এখন চলি—

জয়ন্তর মোটরে চেপে সীতা তখন চলেছে—জয়ন্ত ড্রাইভ করছে, পাশে বসে সীতা।

দাদাকে কি বললে? জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করে ড্রাইভ করতে করতে।

পিকনিক।
তাই নাকি!
হুঁ।
তা পিকনিকটা কোথায়?
বটানিকসে—
তাহলে Let us go to Botanics
তা যেন হলো—ওদিকে যে দাদা পাত্র খুঁজছে—
বল কি! বাড়ির পাশেই এমন সোনার পাত্রটি তার চোখে পড়ল না!
দাদাকে তো জান—শুধু হাসপাতাল চেম্বার আর রোগী—
একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং—
জয়—
উঁ—
দাদাকে বলবে না?
হ্যাঁ—বলতেই হবে—
কবে?
শীগ্‌গির।

সমীর গাড়ী চালাতে চালাতে ভাবছিল, সত্যিই এবারে সীতার একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া দরকার।

শংকরদা ঠিকই বলেছে।

হাসপাতালে তার হাউস সার্জন ছেলেটি ডাঃ রণবীর মুখার্জী—ছেলেটি যেমন স্মার্ট তেমনি ব্রাইট। ক্যারিয়ারও ভাল।

হাসপাতালে ঢুকে গাড়ীটা পার্ক করে সমীর ইমারজেন্সীর সামনে দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

দোতলায় উঠতেই করিডোরে রণবীরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

একটা টেস্টটিউবে ব্লাড নিয়ে রণবীর ক্লিনিক্যাল রুমের দিকে যাচ্ছিল—

গুড মর্নিং স্যার—রণবীর বললে।
মর্নিং—১৩নং বেডের পেসেন্ট কেমন আছে রণবীর?
ভাল না স্যার—
হিমাচুরিয়াটা বন্ধ হয়নি?
না—
তাহলে কালকেই অপারেশনে দাও—
আপনি রাউণ্ড দেবেন ত স্যার?
হ্যাঁ—তুমি ঘুরে এসো—আমি সার্জেনস্ রুমে আছি।

একটু পরে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতে দিতে রণবীর ও সিস্টারকে নিয়ে সমীর একটা নতুন বেডের সামনে এসে দাঁড়াল, এ কবে ভর্তি হলো রণবীর?

কাল সন্ধ্যায় স্যার—
কমপ্লেন কি?
গ্যাসট্রাইটিস্—মনে হচ্ছে ডুডুন্যাল আলসার—
স্টমাক কনটেন্ট অ্যানালিসিসের জন্য পাঠাও—
কাল পাঠানো স্যার—

ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শুধায় সমীর, আজ ক'টা অপারেশন রণবীর?

একটাই স্যার—১২নং সেই ফিমেল কেসটা—গ্যাসট্রা জুজ্‌নোষ্টমি—
পেশেন্টকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

বোধহয় স্যার—

চল থিয়েটারে যাওয়া যাক—

অপারেশন শেষ হতে হতে বেলা পৌনে দুটো বেজে গেল।

অপারেশনের পর সার্জেন্স রুমে বসে কফি পান করতে করতে সমীর রণবীরকে প্রশ্ন করে, তারপর রণবীর কি ঠিক করলে? বিলেত যাচ্ছো ত এফ-আর-সি-এসটা দেবার জন্য?

আপনি ত জানেন স্যার আমাদের সংসারের অবস্থা—বাবার যা ইনকাম—

তুমি সব ব্যবস্থা করো রণবীর—টাকার জন্য ভেবো না—

ভাববো না?

না—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আমি সব বলবো—you must go to England!

বাবার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন কেন স্যার?

তাঁর সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে। তোমরা ত সেই শ্যামবাজারের বাড়িতেই আছো?

না স্যার—মাস দুই হলো আমরা আগরপাড়ায় চলে গিয়েছি—

সেখানে গেলে কেন?

বাড়িভাড়া অনেক কম—তাছাড়া গত মাসে বাবাও রিটায়ার করেছেন।

॥ আট ॥

সমীরের লণ্ডনের এক বন্ধু—সেও ডাক্তার—তবে লণ্ডনেই সেট্‌ল করেছে—আট বছর পরে কলকাতায় এসেছে তার মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

সে সেদিন সন্ধ্যায় সমীর যখন সবে চেম্বারে রোগী দেখা শেষ করেছে এমন সময় এসে হাজির।

সুরজিৎকে দেখে সমীর ভারি খুশি হয়। বলে, কবে এলে দেশে?

দিন দুই হলো—

একেবারেই ফিরে এলে নাকি?

ক্ষেপেছো! এদেশে ডাক্তারদের কোন স্কোপ নেই—তুমি যে কেন ফিরে এলে তা তুমিই জান।

স্কোপ তৈরি করে নেবার জন্য—হাসতে হাসতে সমীর বললে।

পারবে?

জানি না ভাই পারবো কিনা—তবে চেষ্টাত করতে পারব—

কিছুই হবে না। কিছুই করতে পারবে না সমীর—এ দেশ প্রতিভার মূল্য দেয় না—দিতে জানে না।

সমীর হাসল।

তারপর সুরজিৎ এক সময় বললে, জান—

ডাঃ গার্ডনার এখনো তোমার কথা বলেন।

তাই নাকি? বুড়ো কেমন আছে—

আগের মতই গোয়িং ষ্ট্রং—

তারপর এক সময় সুরজিৎ বললে—

চলো আজ রাত্রে কোথায়ও দুজনে ডিনার খাওয়া যাক।

সমীর প্রথমটায় যেতে রাজী হয়নি কিন্তু সুরজিৎ ছাড়েনি—একপ্রকার জোর করেই তাকে একটা চীনা হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল।

মৃদু আলোয় আলোকিত ঘর।

ডায়াসে একটি প্রায়-নগ্ন নর্তকী নানারূপ যৌন অঙ্গভঙ্গি করে নেচে নেচে গাইছে—গমগম করছে যেন হলটা।

কি খাবে বল? সুরজিৎ সুধায়—

তুমি খাবে খাও—আমি না—ও আর আমি খাই না—

বাঃ তাই কখনো হয়—লণ্ডনে ত বেশ চলত—

তা চলত—তবে এখানে চলে না—

কেন হে?

তুমি ত জান আমার একটি ছোট বোন আছে—

সীতা না কি যেন নাম তার—

হ্যাঁ—সে যদি জানতে পারে তার দাদাভাই ড্রিঙ্ক করে—

তাতে কি—

না হে—সে আমাকে শুধু ভালই বাসে না সুরজিৎ—সে আমাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে—তাকে আমি সুখী দেখতে চাই।

Nonsense!

তুমি ভাই বুঝবে না। বোন তো তোমার নেই—ভাই বোনের সম্পর্ক যে কত মধুর কত সুন্দর তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না।

বোন যেন আর দুনিয়ায় কারো নেই—আর তার ভাইয়েরা—

না সুরজিৎ তা নয়। ওকে যে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি—ও ত শুধু আমার বোনই নয় সন্তানের মত—ওকে—

কথাটা শেষ হলো না সমীরের হঠাৎ সে দেখতে পেল, হলঘরে এসে ঢুকল জয়ন্ত—সঙ্গে তিনটি তরুণী।

ওদের একটা টেবিলের পরের টেবিলেই এসে বসল।

বেয়ারাকে অর্ডার দিল—হুইস্কি সোড়া তিনঠো—

সমীর চেয়ে দেখে জয়ন্ত বোস তার তিনটি তরুণীসঙ্গিনীকে নিয়ে হাসতে হাসতে মদ্যপান করছে।

তাদের মধ্যে একজন তরুণী বললে, জয়, তুমি নাকি আজকাল ডক্টর সমীর চৌধুরীর বোনের সঙ্গে খুব মাখামাখি করছো—

আঃ মিমি—জয়ন্ত বলে ওঠে হুইস্কি গ্লাসে সিপ দিয়ে, don't be jealous my darling—I am going to marry her.

তিনটি তরুণীই একসঙ্গে বলে ওঠে মত্ত হাস্যরোল কণ্ঠে Really—

Why not? After all she is more charming than all of you!

হি হি করে হাসির তরঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তিনজন।

সমীর যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে—ইচ্ছা করে উঠে যায়, কিন্তু টেবিলে বেয়ারা খানা সার্ভ করেছে—তাছাড়া সুরজিৎই বা কি ভাববে—

ওদিকে জয়ন্তর টেবিলে মদ্যপান সমানেই চলতে থাকে।

জয়ন্ত বলে, মিমি—darling—don't take any more—you will be knocked down.

Don't be silly, মিমি বল উঠে, মিমি ঘোষ still can swallow a bottle—

অনেক রাত্রে ফিরে এলো সমীর।

পাশাপাশি দুটো ঘরে ভাই আর বোন থাকে। সীতার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে দেখে সমীর দরজা ঠেলে বোনের ঘরে ঢোকে।

শিয়রের কাছে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। সীতা বোধহয় পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

খোলা একটা বই তার বুকের 'পরে।

গভীর মমতায় বোনের ঘুমন্ত মুখখানির দিকে তাকাল সমীর।

ফুলের মত নিষ্পাপ মুখখানি।

কয়েকটি চূর্ণকুন্তল পাখার হাওয়াতে স্থানচ্যুত হয়ে কপোল ও কপালের উপর এসে পড়েছে।

গভীর স্নেহে আঙুল দিয়ে আলগোছে সন্তর্পণে চুলগুলি ঠিক করে দেয় সমীর—কিন্তু সেই সামান্য স্পর্শেই সীতার ঘুম ভেঙ্গে যায়, কে?

আমি—

দাদাভাই—

আলো জ্বেলে ঘুমোচ্ছিস কেন? হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে বেড ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল সমীর।

দাদাভাই—

কি রে?

এত দেরি করে ফিরলে—খেয়েছো?

আমি খেয়ে এসেছি রে। তুই ঘুমো—

সমীর তার শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

পরের দিনই সকালে ব্যাপারটা ঘটল।

সকালে সমীর হাসপাতালে বেরুবে বলে প্রস্তুত হয়েছে শংকর এসে ঘরে ঢুকল।

সমীর—

কিরে শংকরদা—

জয়ন্ত বোস এসেছে—

কে?

বোস বাড়ির সেই ছেলেটা—

সীতা কোথায়?

সে ত বাথরুমে—জয়ন্ত তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

সমীর যেন কি ভাবল, তারপর বললে, হুঁ, ঠিক আছে, তুই যা—আমি আসছি।

সমীর যখন ড্রয়িং-রুমে এসে ঢুকল, একটা সোফার পরে পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিয়ে জয়ন্ত সিগ্রেট টানছিল।

সমীরের পদশব্দে সিগারেটটা হাতেই উঠে দাঁড়াল, ডক্টর চৌধুরী, আমি একটা proposal নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

কিসের প্রোপোজাল?

ভ্রূ বেঁকিয়ে সমীর তাকাল।

আপনি হয়ত জানেন না—বিজনেস ম্যাগনেট জনার্দন বোসের ছেলে আমি—আমার নাম জয়ন্ত বোস—

জানি। কিন্তু প্রোপোজালটা কি?

Well! I want to marry your sister!

কিন্তু তা ত সম্ভব নয় জয়ন্তবাবু—

কেন?

কারণ তার বিয়ে আমি আগেই অন্যত্র স্থির করেছি।

ওঃ—তা আপনার বোন জানে সে কথা?

না—

জানে না?

না—ঠিক সময় মতই তাকে জানানো হবে—আর কিছু আপনার বলবার আছে জয়ন্তবাবু?

আপনি দুটো কথা ভুলে যাচ্ছেন ডঃ চৌধুরী—

কি বলুনত?

প্রথমতঃ সে নাবালিকা—আর—

আর?

সে আমাকে ভালবাসে। কাজেই—

বলুন—থামলেন কেন?

আমাদের বিয়ে আপনি আটকাতে পারবেন না।

বেশত—যদি না আটকাতে পারিই—বিয়ে করবেন তাকে।

জয়ন্ত সমীরের মুখের দিকে অতঃপর ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলো।

তাহলে এইটাই আপনার শেষ কথা—

হ্যাঁ—আসুন—নমস্কার—

জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায়—হাতের অর্ধদগ্ধ সিগ্রেটটা অ্যাশট্রেতে স্ম্যাশ করে সমীরের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাল, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল—

জয়ন্তবাবু, শুনুন—

জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়াল।

অতঃপর আমার বোন সীতার সঙ্গে আপনি মেশার না চেষ্টা করলেই খুশি হবো—

জয়ন্ত কোন জবাব দিল না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জয়ন্ত সোজা গেল একটা বারে।

হুইস্কির অর্ডার দিল।

বেলা বারটা পর্যন্ত একটানা ড্রিংক করে চলল—তার মধ্যেই একসময় উঠে গিয়ে বন্ধু কপিল দত্তকে ফোন করে এলো লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানিয়ে।

বেলা একটা নাগাদ কপিল যখন এলো তখনো সমানে ড্রিংক করে চলেছে জয়ন্ত।

কি রে—এই ভরদুপুরে হুইস্কি খাচ্ছিস কেন? কপিল পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললে।

কপিল—

কি ব্যাপার?

That swine insulted me.

কে? কার কথা বলছিস? কে আবার তোকে insult করলো?

That স্কাউড্রেল ডক্টর সমীর চৌধুরী—

তোর সেই ফিঁয়াসে সীতার দাদা—

Yes!

কিন্তু কেন?

জয়ন্ত তখন ব্যাপারটা ড্রিঙ্ক করতে করতেই জড়িত-গলায় বলে গেল, আমি সীতাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদাই দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঐ সমীর চৌধুরী—that imp of a Satan—

একটা কথা বলব জয়ন্ত?

কি?

বলছিলি না সীতা তোকে ভালবাসে—

নিশ্চয়ই—

তবে? সীতার সঙ্গে দেখা কর না—

না।

তবে?

ওকে আমি একটা ভাল lesson দিতে চাই—

Lesson?

Yes! Would you help me?

তুমি ত জান ব্রাদার I am always with you! কিন্তু—

কপিল, তুই ভাবিস না—বাবাকে বলবো তোর প্রোমোশনের জন্য—বলতে বলতে জয়ন্ত পকেট থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে বললে, এগুলো রাখ—

কপিল দত্ত কোনরকম দ্বিধা করে না, মৃদু হেসে নোটগুলো পকেটে ঢুকিয়ে দেয় টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে।

হুইস্কির গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বলে, Now listen my plan.

॥ আট ॥

সীতা অর্গানে একটা গানের সুর তোলার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে—আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়েছে, বোধকরি বৃষ্টি নামবে।

সমীর সেদিন একটু সকাল সকালই চেম্বার থেকে ফিরেছিল। মনটাও তার খুশি—ঐ দিনই দুপুরে আগরপাড়ায় রণবীরের বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে বলে এসেছে।

রণবীরের বাবাত হাতে স্বর্গ পেয়েছেন।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কানে এলো সীতা অর্গানে গানের সুর তোলার চেষ্টা করছে।

সমীর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গেয়ে ওঠে গানটা ঃ

মনে হলো পেরিয়ে এলেম অসীম পথ
আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামল পারে।

দাদাভাই—শীগ্‌গিরি এসো—চীৎকার করো ওঠে সীতা।

কি হলো রে?

শীগ্‌গিরি এসো—

হাসতে হাসতে ঘরে এসে ঢুকল সমীর, কি হলো—

হচ্ছে না—

কি হচ্ছে না—

গানটা আমাকে ঠিক করে দাও—লক্ষ্মীটি—

সমীর বোনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার বেণীটা ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, সর—ওঠ—

সীতা উঠে দাঁড়াল। সমীর অর্গানের সামনে বসে সুর দিল, নে গা—

মনে হলো পেরিয়ে এলেম অসীম পথ
আসিতে তোমার দ্বারে

সীতা সমীরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গায়—গায় দুজনে—

মরুতীর হতে সুধাশ্যামল পারে।
পথ হতে গেঁথে এনেছি সিক্ত যূথীর মালা,
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে।

বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে।

গান শেষ হলে সমীর ডাকে, সীতা—

কি দাদাভাই?

আমার হাউস সার্জন রণবীরকে তোর কেমন লাগে? Isn't he very bright?

বড্ড shy!

সমীর বললে, ভাল করে আলাপ হলে দেখবি সত্যিই ভাল ছেলেটি। ওকে ভাবছি একদিন আমাদের বাড়িতে রাত্রের ডিনারে ডাকবো। কি বলিস?

বেশ ত।

সেদিন তোর সেই মাংসের স্পেশাল ঝাল কারিটা খাইয়ে দিবি! কেমন—

যদি নিন্দে করে তোমার হাউস স্টাফ —

নিন্দে অমনি করলেই হলো! খেয়েছে নাকি অমন ডিস কোনদিন—

সবাই দাদাভাই নয়—

না, না—দেখিস ও ঠিক প্রশংসা করবে—

দাদাভাই—হঠাৎ বললে সীতা?

কি রে?

একটা কথা তোমাকে বলবো?

কি—বল না।

না—এখন থাক—

কেন, বল না—

না—পরে—সীতা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পরের দিন নার্সিং হোমে একটা জরুরী অপারেশন ছিল—তাই আর চেম্বারে যেতে পারেনি সমীর, সোজা ড্রাইভ করে বাড়ি চলে এসেছিল।

সন্ধ্যে তখন প্রায় পৌনে সাতটা—

তাছাড়া ঐদিন সকালে সমীর বোনকে কথা দিয়েছিল নাইট শোতে বোনকে নিয়ে সিনেমা যাবে।

গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকতেই শংকর এসে দাঁড়াল।

সীতা কোথায় রে শংকরদা, তাকে রেডি হতে বল।

সীতা ত নেই।

নেই! কোথায়?

এখনোত ফেরেইনি সে কলেজ থেকে।

এখনো ফেরেনি মানে—

সমীর যেন একটু চিন্তিতই হয়, হয়ত কলেজ থেকে কোথায়ও গিয়েছে—

কিন্তু আমাকে সে বলে গিয়েছিল চারটের পর সে বাড়ি ফিরে আসবে—তার এক বন্ধুকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিল, সে এতক্ষণ বসে থেকে থেকে একটু আগে চলে গেল।

তোকে বলে গিয়েছিল চারটের পর ফিরবে?

হ্যাঁ—আমার ভাল ঠেকছে না সমীর—তুমি বরং একবার কলেজে খোঁজ নাও—

কলেজ ত কখন ছুটি হয়ে গিয়েছে—

হঠাৎ ঐসময় পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিল সমীর, ডক্টর চৌধুরী স্পীকিং—

ডক্টর চৌধুরী—শুনুন আমি ব্যারাকপুর থেকে বলছি—

বলুন—

আপনার বোন সীতা—

সীতা।

হ্যাঁ—তাকে জয়ন্ত বোস কলেজ থেকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে তার ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে গিয়েছে—

কি? কি বললেন—

বোনের ইজ্জত যদি বাঁচাতে চান ত আর দেরি করবেন না—ব্যারাকপুর স্টেশনের আগেই গঙ্গার ধারে নীলকুঠি নামে জনার্দন বোসের যে বাগানবাড়িটা আছে জয়ন্ত সীতাকে সেইখানেই নিয়ে গেছে—

কে—কে আপনি?

আমার নাম জানার দরকার নেই আপনার—বোনকে বাঁচাতে চান ত আর দেরি করবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ফোনের কানেকশন কেটে গেল অন্য প্রান্তে।

হ্যালো—হ্যালো—ট্যাপ করে সমীর কিন্তু অন্য প্রান্তে—ফোন তখন ডেড।

সমীরের মাথার মধ্যে যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়।

শংকরকেও কোন কথা বলার সময় পায় না—ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দেয়।

ঝড়ের বেগেই যেন সমীর গাড়ি চালায়।

সার্দান অ্যাভিনু থেকে গোলপার্ক হয়ে রাসবিহারী মোড় ক্রস করে গড়িয়াহাটায় পড়ে—পার্ক সার্কাস থেকে সুন্দরীমোহন রোড ধরে—সার্কুলার রোড ধরে বহুবার অ্যাকসিডেন্ট বাঁচাতে বাঁচাতে যখন সমীর শ্যামবাজারের মোড় পার হয়ে—ব্রীজ পার হয়ে বি. টি. রোডে পড়ল রাত তখন পৌনে আটটা।

সিঁথির মোড় বরাহনগর পার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাবার বাঁয়ের রাস্তা ফেলে ডানলপ ব্রীজ যখন পার হলো তখন রাত প্রায় সোয়া আটটা।

বেলঘরিয়া—আগড়পাড়া—টিটাগড়—রাত সোয়া নয়টা প্রায়—

বাইরে তখন আবার ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

আকাশ মেঘে মেঘে একেবারে নিকষকালো।

যখন ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছল সমীর গাড়ি নিয়ে নীলকুঠি খুঁজে পেতে তার দেরি হলো না—ঐ অঞ্চলের এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করতেই সেই পথ বলে দিল।

গঙ্গার ধারে একেবারে নীলকুঠি।

অনেকখানি বাগান নিয়ে একটা ডাকবাংলো প্যাটার্নের বাড়ি।

বাড়ির রংটা নীল বলে স্থানীয় লোকেরা বলত ওকে নীলকুঠি।

জয়ন্তর বাবা জনার্দন বোস মধ্যে মধ্যে কলকাতার বাইরে এসে নিরিবিলিতে দু'চার দিন কাটানোর জন্য গঙ্গার ধারে ঐ বিশ্রামগৃহটি নির্মাণ করেছিলেন। ইদানীং তিনি বড় আর আসতেন না—জয়ন্তই মধ্যে মধ্যে বান্ধবী নিয়ে এসে ওখানে স্ফূর্তি করত।

কেয়ারটেকার একজন ছিল বাড়িটার—এক ওড়িয়া—নিতাইচন্দ্র।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই পথের দু'পাশে কয়েকটা বিরাট বিরাট ঝাউগাছ—বৃষ্টি তখন বেশ পড়ছে।

বাড়ির সামনেই জয়ন্তর ইম্‌পোর্টেড নতুন ঝকঝকে ফিয়াট গাড়িটা নজরে পড়ল।

কাচের জানালার ভিতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল।

গাড়িটা থামিয়ে সমীর গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

এদিক ওদিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায় সমীর।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

মেঘাবৃত আকাশ।

মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

মালী বা কেয়ারটেকার কাউকেই সমীর আশেপাশে কোথায়ও দেখতে পেল না।

চারদিকে ঘোরান বারান্দা। বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

বারান্দায় উঠে যে ঘরে আলো জ্বলছিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সমীর।

সমীর দরজায় ধাক্কা দিল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

বার বার ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও দরজা খুলল না। সমীর অস্থির হয়ে ওঠে—

বারান্দার দিককার জানালার কাচ দিয়ে ঘরের ভিতরের যেটুকু নজর পড়ে কিছুই দেখতে পায় না। সমীর এবারে বারান্দা দিয়ে ঘুরে ঘরের পিছন দিকে গেল। পিছনের কাচের জানালা পথে ভিতরে আবার উঁকি দিল।

তখুনি ঘরের মধ্যে নজরে পড়ল তার সীতা আর জয়ন্তকে— এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে ওঠে সমীর।

মেঝেতে গোটা দুই বোতল ও গ্লাস গড়াগড়ি দিচ্ছে।

সীতার সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র বিস্রস্ত—গায়ের ব্লাউজ ছিঁড়ে গিয়েছে—জয়ন্ত তাকে জোর করে ধরে খাটের উপরে নিয়ে গিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে—সীতা প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করছে।

সমীরের মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে যায়। সে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসাল কাচের জানলায়—ঝনঝন শব্দে কাচ ভেঙ্গে গেল আর সীতার চিৎকার শোনা গেল—না, না—জয়ন্ত না—

ততক্ষণে জয়ন্ত সীতাকে চিত করে ফেলেছে খাটের উপরে—জানলার ছিটকানি খুলতে প্রায় মিনিট পাঁচ সাত লাগল সমীরের—জানলার পাল্লা খুলে—ভাগ্যে কোন শিক বা গ্রিল ছিল না জানলায়—সমীর লাফিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

জয়ন্ত ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে—সীতার জ্ঞান হারিয়েছে—ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতই সমীর জয়ন্তর উপরে—কিন্তু জয়ন্তর শরীরেও কম শক্তি ছিল না—সে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল সমীরকে তারপরই পকেট থেকে পিস্তল বের করল, সমীর চৌধুরী—যে পথে এসেছো সে পথে বের হয়ে যাও—নচেৎ কুকুরের মত গুলি করে মারব তোমাকে।

সমীর মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় বুঝি।

অদূরে শয্যার উপর এলায়িতা প্রায়-উলঙ্গ সীতার নিশ্চল দেহটা চোখে পড়ে সমীরের—জয়ন্তও বোধহয় তাকিয়েছিল মুহূর্তের জন্য সেই দিকে—আর মুহূর্তটুকুর সুযোগেই আবার সমীর জয়ন্তর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দু'হাতে জাপটে ধরল।

ধস্তাধস্তি শুরু হয় আর তারই মধ্যে সমীর জয়ন্তর হাত থেকে তার পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়—

জয়ন্ত সমীরকে দু'হাতে আবার জাপটে ধরে—ধস্তাধস্তির মধ্যেই ফায়ারিং হয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার করে জয়ন্ত মেঝের 'পরে লুটিয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময় কেয়ারটেকার নিতাইচন্দ্র ভাঙ্গা জানালাপথে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিল।

সে চিৎকার করে ওঠে, খুন—খুন—

সমীর বিমূঢ়—পাথর—

নিতাই ঘরের দরজা খুলে 'খুন' 'খুন' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেল।

সমীর ততক্ষণে যেন তার সংবিৎ ফিরে পেয়েছে।

ছুটে গেল খাটের কাছে সমীর—সীতা তেমনি পড়ে আছে তখনো শয্যার উপরে—প্রায় বিবস্ত্রা—জ্ঞান নেই তার।

মুহূর্ত দেরী না করে সমীর সীতার অচেতন দেহটা তার পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে ভাল করে ঢেকে নিজের কাঁধের উপর তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বাইরে এসে গাড়ির দরজা খুলে ব্যাক সীটে সীতার অচেতন দেহটা শুইয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

॥ দশ ॥

পথেই একসময় সীতার জ্ঞান ফিরে এলো।

সীতাকে উঠে বসতে দেখে সমীর গাড়ি থামিয়ে তাকে সামনের সীটে তার পাশে এনে বসিয়ে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন।

অন্ধকারে ও বৃষ্টির ঝাপটায় সামনের রাস্তা কিছুই দেখা যায় না।

সচল ওয়াইপার গাড়ির সামনের কাচটাকে কেবল আরো ঝাপসা করে তোলে।

সীতা—

কোন সাড়া দেয় না সীতা।

সীতা—শীত করছে—সমীর আবার শুধায়।

কোন সাড়া নেই সীতার।

সে যেন কেমন ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে চেয়ে আছে। প্রাণহীন একটা পুতুলের মত।

এই সীতা—কথা বলছিস না কেন?

সীতা যেন প্রস্তরমূর্তির মত বসে আছে। যেন দেহে ওর প্রাণ নেই—

গাড়ি থামাল সমীর রাস্তার এক পাশে।

সীতা—এই সীতা—

সীতা কেমন আগের মতই ফ্যালফ্যাল করে সমীরের মুখের দিকে তাকায়।

সে দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই—বোবা দৃষ্টি।

সমীর দু'হাত বোনের কাঁধের উপর রেখে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়, এই সীতা—সীতা—

সীতা তবু নীরব।

এই সীতা, কথা বলছিস না কেন? সীতা!

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে তখনো।

অমন করে চেয়ে আছিস কেন—এই সীতা' আমাকে কি তুই চিনতে পারছিস না—আমি—আমি রে—দাদাভাই—

না। তবু সীতা নীরব। যেন পাথর। প্রাণহীন একটা পাথরের পুতুল যেন।

ডাক্তার সমীরের বুঝতে কষ্ট হয় না আর যে নিদারুণ মানসিক আঘাতেই সীতা বোবা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন সমীর কি করবে?

সে যে ভেবেছিল সীতাকে নিয়ে সে দূরে অনেক দূরে কোথায়ও চলে যাবে।

কিছুক্ষণ আগেকার ঘরের ভিতরের সেই বীভৎস দৃশ্য! রক্তের স্রোতের মধ্যে পড়ে আছে জয়ন্তর প্রাণহীন দেহটা—কেয়ারটেকারের সেই 'খুন খুন' চিৎকার।

এতক্ষণে হয়ত সে পুলিশ ডেকে এনেছে। পুলিশ হয়ত তার পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে।

কেমন আতঙ্কিত দৃষ্টিতে গাড়ির পশ্চাতের কাচ দিয়ে তাকাল পথের দিকে সমীর।

একটা গাড়ির হেডলাইট। বৃষ্টির ঝাপসার মধ্যেও আলোটা বহুদূর থেকে দেখতে পেল সমীর।

সমীর তাড়াতাড়ি গাড়িতে আবার স্টার্ট দিল।

টপ স্পীডে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

গাড়ি চালাতে চালাতেই সমীর চিন্তা করে—

কোথায় যাবে এখন! বাড়িতে গেলে পুলিশ হয়ত সেখানে গিয়ে হাজির হবে। তাকে যদি ধরে

নিয়ে যায় সীতার কি হবে!

চিন্তার আবর্ত মাথার মধ্যে চলতে থাকে সমীরের।

হঠাৎ—হঠাৎই মনে পড়ে সমীরের বন্ধু শ্যামলের কথা। তার পরিচিত ডাক্তার শ্যামল রায় মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ।

আয়রন সাইড রোডে তার চেম্বার ও ছোটখাটো একটি নার্সিং হোম।

ঐ বাড়িতেই তিনতলায় দুটো ঘর নিয়ে ডাঃ শ্যামল থাকে।

সোজা গাড়ি চালিয়ে শ্যামলের নার্সিং হোমেই গেল সমীর।

ক্রমশঃ বৃষ্টি তখন থেমে এসেছে। রাত তখন বোধহয় তিনটে।

কলিং বেল টিপতেই দারোয়ান দরজা খুলে দিল।

বাহাদুর—

জী!

ডাক্তার সাহেবকে এখুনি একবার খবর দাও—

আইয়ে বৈঠিয়ে—আভি হাম খবর দেতেহে—

বাহাদুরের অপরিচিত নয় সমীর। ওকে বাইরের ঘরে বসিয়ে বাহাদুর সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল।

একতলায় চারখানা ঘরে চেম্বার, ট্রিটমেন্ট রুম ও সিটিং রুম এবং শ্যামলের নিজস্ব লাইব্রেরী।

দোতালায় চারটে কেবিন ও সিসটারের থাকবার জায়গা।

তিনতলায় থাকে শ্যামল। এখনো বিয়ে থা করেনি। একটি কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড আছে—নারায়ণ।

সমীর অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল—একটা স্লিপিং গাউন গায়ে জড়িয়ে পায়ে চপ্পল শ্যামল এসে ঘরে ঢুকল।

শ্যামলের বয়েস সমীরের চাইতে দু'এক বছর বোধহয় বেশীই হবে।

সমীর—কি ব্যাপার—এত রাত্রে!

শ্যামল, আমি ভয়ানক একটা বিপদে পড়েছি ভাই—

বিপদ?

হ্যাঁ আমার বোন সীতা—

কি হয়েছে সীতার?

হঠাৎ একটা মেন্টাল শকে সে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে—

মেন্টাল শক?

হ্যাঁ—শ্যামল, সব কথা বলবার এখন আমার সময় নেই। জয়ন্ত বোস নামে একটা স্কাউণ্ড্রেল ওকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাগান বাড়িতে—and he raped her.

সেকি!

একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার সেখানে পৌছতে—কিন্তু ততক্ষণে—

তাকে তুমি spare করলে।

না করিনি—he is dead!

Dead!

হ্যাঁ—বুঝতেই পারছো পুলিশ হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকে—আমার জন্য আমি ভাবি না—ভাবছি আমি সীতার কথা—

তোমার বোন কোথায়?

গাড়িতে বাইরে—

যাও যাও নিয়ে এসো শীগ্‌গিরি—

সমীর বের হয়ে গেল—গাড়ির মধ্যে তখনো ঠিক তেমনি পাথরের মত বসে আছে সীতা।

সীতা—আয়—

কিন্তু সমীরের ডাকে এবারও সীতা কোন সাড়া দিল না।

সমীর সীতাকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে এলো।

শ্যামল—

এসো এসো—ওকে আমার কনসালটিং রুমে নিয়ে চল।

কনসালটিং রুমে নিয়ে গিয়ে শ্যামল সীতাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে সমীরকে বললে, You wait outside সমীর—

সমীর বের হয়ে গেল।

আধঘন্টা বাদে শ্যামল বের হয়ে এলো, সমীর, you are right—mental shock-কথাই শুধু বন্ধ হয়ে যায়নি Probably she has lost her memory!

lost her memory-you mean amnesia?

I am afraid সমীর, মনে হচ্ছে সেই রকমই।

কি হবে শ্যামল?

কিছু ভেবো না—ভাল হয়ে যাবে—তবে সময় লাগবে—

সীতা—সীতা ভাল হবে ত শ্যামল?

নিশ্চয়ই—she requires now mental rest and treatment.

তাহলে ওকে তোমার এখানেই রাখ—

বেশ ত!

টাকার জন্য তুমি ভেবো না শ্যামল, আমি টাকার ব্যবস্থা করব—

তুমি ত জান সমীর আমার অবস্থা—এই নিজস্ব নার্সিং হোম চালাতে গিয়ে একেবারে ফতুর হয়ে গিয়েছি আমি। তাছাড়া এসব চিকিৎসা বড্ড খরচের ব্যাপার—নচেৎ তোমার বোন—

না, না—টাকা আমি দেবো—তুমি শুধু ওকে all possible treatment দিয়ে ভাল করে তুলবে—টাকার জন্য তুমি ভেবো না—ও তাহলে—

আমার এখানেই থাক—একটা কেবিন আমার খালিও আছে—

আমি বাড়ি যাচ্ছি এখুনি—কিছু টাকা এবং ওর জামা কাপড় এনে দিচ্ছি—

তাই যাও—

সমীর ছুটলো এবারে বালিগঞ্জে।

আকাশে মেঘ থাকলেও ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পেতে তখন শুরু করেছে।

শংকর জেগেই ছিল।

সে শুধায়, কি হলো—সীতা কই?

আছে—তার এক বন্ধুর বাড়িতে—কোনমতে কথাগুলো বলে সমীর গিয়ে তার বেডরুমে ঢুকল—আলমারি খুলে যা টাকা ছিল সব নিল—একটা সুটকেসে সীতার কিছু জামা কাপড় ভরে নিল—

বেরুতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা সমীরের মনে হয়—তারও বোধহয় এখন কিছুদিন গাঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল—কারণ সীতার চিকিৎসার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হবার আগেই যদি পুলিশ তাকে ধরে তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সমীর তাড়াতাড়ি একটা ছোট অ্যাটাচীকেসে তার দু'চারটে জামা কাপড় ভরে নিল তারপর ডাকল, শংকরদা—

শংকর এলো।

কয়দিনের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি—

কোথায়?

এখনো জানি না ঠিক কোথায় তবে একটা জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে—সীতাও এখন কিছুদিন তার বন্ধুর বাড়িতেই থাকবে।

একটানা কথাগুলো বলে শংকরকে কোন কথা বলবার অবকাশমাত্রও না দিয়ে শংকরের পাশ কাটিয়ে সমীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সোজা গেল সমীর শ্যামলের ওখানে।

তার হাতে দেড় হাজার টাকা দিয়ে বললে, দু'চার দিনের মধ্যেই আবার সে এসে কিছু টাকা দিয়ে যাবে—

সমীর গাড়িতে উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কিন্তু এখন সে কোথায় যাবে?

এদিকে রাতও প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

একবার ভাবল সমীর যতদূর যাওয়া যায় গাড়ি চালিয়ে সে চলে যাবে—আপাতত কলকাতার বাইরে—

কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার মনে হয়—পুলিশ তাকে অনুসন্ধান করে বেড়াবেই—সে ক্ষেত্রে কতদিন আর সে পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয় সমীরের—সঙ্গে সঙ্গে সে ময়দানের এক পাশে গাড়িটা থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

এবার চৌরঙ্গীর দিকে হাঁটতে লাগল, সমীর গিয়ে উঠলো একটা নামকরা হোটেলে।

তিনটে দিন কোথায়ও সে বের হলো না হোটেল থেকে।

দ্বিতীয় দিন সকালে সংবাদপত্রে নীলকুঠিতে জয়ন্ত বোসের মৃত্যুসংবাদটা ওর চোখে পড়ল।

পুলিশ তার গাড়িটা ময়দানের ধারে পার্ক করা অবস্থায় পেয়েছে এবং ওকেই জয়ন্ত বোসের হত্যাকারী সন্দেহে—ওর খোঁজে ওর বাড়িতে গিয়ে হানা দিয়েছিল—এবং এখন সর্বত্র ওর খোঁজ করছে।

পুলিশ তাহলে তাকেই সন্দেহ করেছে হত্যাকারী বলে।

সর্বত্র তার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে পুলিশ।

তারপর একটা দিন একটা রাত চিন্তা করল সমীর।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যারাত্রে বেয়ারাকে ডেকে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিল—রাত দশটায় সে ঘরে ছেড়ে দেবে।

বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে সমীর আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কয়দিন সেভ করেনি—সারা মুখে দাড়ি গজিয়েছে।

॥ এগার ॥

রাত্রি তখন বোধহয় দশটা পঁয়তাল্লিশ হবে।

হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লী কালকা মেল ছেড়েছে কিছুক্ষণ আগে।

বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ফার্স্ট ক্লাস একটা কম্পার্টমেন্ট। ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্ট।

চারজন যাত্রী।

উপরের বার্থে দু'জন অঘোরে ঘুমোচ্ছে—উঠেই তারা শুয়ে পড়েছিল।

নীচের বার্থে দু'জন যাত্রী। দুজনেই জেগে।

একজন মধ্যবয়সী এক গুজরাটী ভদ্রলোক—নাম পুরুষোত্তম দাস—একটা ম্যাগাজিনের মধ্যে ডুবে আছেন—বিজনেস্ ম্যান।

বয়েস পঞ্চাশের ঊর্ধ্বেই বলে মনে হয়। নাদুসনুদুস চেহারা আমেদাবাদের কোন এক কাপড়ের কলের ম্যানেজিং ডাইরেকটার।

অন্যজন এক পাঞ্জাবী যুবক।

মুখে চাপ দাড়ি—চোখে চশমা—মাথায় পাগড়ি।

বর্ধমান ছাড়াবার পর গুজরাটী ভদ্রলোক হাতের ম্যাগাজিনটা মুড়ে পাঞ্জাবী যুবকটির দিকে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, How far you will be going?

দিল্লী।

দিল্লীমে কোই কামকে লিয়ে যা রহে হে?

হ্যাঁ—থোড়া বিজনেস প্রোপোজাল হ্যায়—

পাঞ্জাবী যুবকটির হাবভাব দেখে মনে হয় সে যেন আলাপ করতে চায় না।

অ্যাটচীকেস খুলে একটা বই বের করে সেটার পাতায় মনোনিবেশ করল।

পুরুষোত্তম দাস নিজের বার্থে শুয়ে পড়ে।

সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ ট্রেন মোগলসরাই জংশনে এসে পৌঁছল।

পাঞ্জাবী যুবকটি গাড়ি থেকে নেমে গেল।

একটা সংবদপত্র পেলে হতো।

স্টলে গিয়ে একটা সংবাদপত্র কিনল—পাতা ওলটাতেই তৃতীয় পৃষ্ঠায় নজরে পড়ল।

সমীর চৌধুরীর ফটো বের হয়েছে—

পলাতক খুনী আসামী সমীর চৌধুরী।

জনার্দ্দন বোস দশ হাজার টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করেছেন যদি কেউ তাঁর ছেলের হত্যাকারীর সংবাদ দিতে পারে বা ধরিয়ে দিতে পারে।

ঐ সঙ্গে আরো সংবাদ বের হয়েছে—তার সার্দান অ্যাভিনুর বাড়িতে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। ডাঃ সমীর চৌধুরী ও তার বোন সীতা চৌধুরীকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথায়ও।

পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের কোন সংবাদ পায়নি এখন পর্যন্ত। তবে তার গাড়িটা ময়দানের সামনে পাওয়া গিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ ঃ যে দুর্যোগের রাত্রে ব্যারাকপুরের নীলকুঠিতে প্রখ্যাত শিল্পপতি জনার্দন বোসের একমাত্র পুত্র নিহত হয় পিস্তলের গুলিতে।

সেই রাতে সুটপরিহিত এক যুবক ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছে এক স্টেশনারী দোকানের মালিক রসময় কুণ্ডুকে নীলকুঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কোথায় নীলকুঠিটা। রসময় কুণ্ডু ডাঃ সমীর চৌধুরীকে চিনতে পেরেছিল কারণ কিছুদিন আগে হাসপাতালে তার কন্যার অ্যাপেনডিসাইটিস্ অপারেশন করেছিল চৌধুরী। ডাঃ সমীর চৌধুরীর গাড়িটাও রসময় কুণ্ডু সনাক্ত করেছে।

নীলকুঠির কেয়ারটেকারের কাছেও যে বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে তাতেও প্রমাণিত হয় যে ডাঃ সমীর চৌধুরী ছাড়া আর কেউ নয়—কেয়ারটেকার নিতাইচন্দ্র ডাঃ সমীর চৌধুরীর গাড়ির নম্বরটাও মনে রেখেছিল।

তারপর ঐ রাত্রি থেকেই সমীর চৌধুরী নিরুদ্দেশ।

ভৃত্য শংকর অবিশ্যি বলতে পারেনি কোথায় গিয়েছে সমীর চৌধুরী। সব ঘটনা পর্যালোচনা করে পুলিশের স্থির ধারণা জয়ন্ত বোসের হত্যাকারী ঐ নিরুদ্দিষ্ট ডাঃ সমীর চৌধুরীই।

ইতিমধ্যে ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল—পাঞ্জাবী যুবকটি ট্রেন উঠে পড়ল।

নিজের কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে দেখে গুজরাটী ভদ্রলোক পুরুষোত্তম দাসই কেবল আছে—বাকী দু'জন যাত্রী পাটনায় নেমে গিয়েছে।

পুরুষোত্তমও গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঐদিনের সংবাদপত্রটা পড়ছিল।

পাঞ্জাবী যুবকটি একবার আড়চোখ দেখল—ডাঃ সমীর চৌধুরীর ব্যাপারটাই সে গভীর মনোযোগেব সহকারে পড়ছে।

পাঞ্জাবী যুবকটি তার সীটে বসল। সংবাদটা পড়তে লাগল। কিন্তু তার নজর ছিল পুরুষোত্তমের 'পরেই।

তার যেন মনে হলো পুরুষোত্তম মধ্যে মধ্যে আড়চোখে তাকেই লক্ষ্য করছে থেকে থেকে।

পাঞ্জাবী যুবকটি যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করে।

তারপরই একসময় পাঞ্জাবী যুবকটির নজরে পড়ল, পুরুষোত্তম ঘন ঘন তার পার্শ্বে রক্ষিত অ্যাটাচীকেসটার দিকে তাকাচ্ছে।

নিজের অ্যাটাচকেসেটার দিকে তাকাল পাঞ্জাবী যুবকটি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটার মধ্যে দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে।

সর্বনাশ—অ্যাটচীকেসটার উপর লেখা—ডাঃ এস. চৌধুরী।

ইস্—তাড়াহুড়োতে অ্যাটাচীকেসের উপরে লেখা নামটা তুলে ফেলতে তার মনে নেই।

বলাই বাহুল্য পাঞ্জাবী যুবকটি আর কেউ নয়—ডাঃ সমীর চৌধুরী।

রীতিমত একটা অস্বস্তি বোধ করে সমীর।

এখন উপায়—

নেকস্ট্ স্টপেজ এলাহাবাদ জংশন—

পুরুষোত্তম দাস উঠে কম্পার্টামেন্ট থেকে বের হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমীরও উঠে দাঁড়াল।

অ্যাটাচীকেসটা হাতে কম্পার্টমেণ্ট থেকে বের হয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল ল্যাভেটরীতে, চটপট বেশ

বদলে ফেলল।

ফলস্‌ দাড়ি খুলে নুর দাড়ি লাগাল—সরু গোঁফ লাগাল।

চট্‌পট্‌ সুট বদলে—পায়জামা ও সেরওয়ানী পরল। অ্যাটচীকেসের গায়ে লেখা নামটা ঘষে ঘষে তুলে ফেলল একটা ছুরি দিয়ে।

প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে সম্পূর্ণ অন্য বেশে বের হলো সমীর ল্যাভেটরী থেকে।

এবারে পাঞ্জাবী যুবক নয়—

খানদানী এক মুসলমান যুবক।

—এলাহাবাদ বোধহয় এসে পড়ল।

করিডর ট্রেন—নিজের কম্পার্টমেণ্টে আর না গিয়ে করিডর দিয়ে সমীর গিয়ে ঢুকল রেস্টুরেণ্ট কারে।

সুটকেসটা পায়ের নীচে রেখে সমীর বসল একটা চেয়ারে ব্রেকফাস্ট-এর অর্ডার দিয়ে।

ট্রেন ছুটে চলেছে তখন এলাহাবাদের দিকে।

ধীরে ধীরে একসময় ট্রেনটা এলাহাবাদ স্টেশনে এসে ঢুকল।

রেস্টুরেণ্ট কারের জানলাপথে সমীর বাহিরে দৃষ্টি রাখে—হঠাৎ তার নজরে পড়ল পুরুষোত্তম আর একজন পুলিশ অফিসার তাদের কম্পার্টমেণ্টের দিকে চলেছে কি যেন বলতে বলতে।

তাহলে তার অনুমান মিথ্যা নয়। পুরুষোত্তম তাকে সন্দেহ করেছে।

এলাহাবাদ থেকে ট্রেনটা ঠিক ছাড়ার মুখে অ্যাটচীকেসটা হাতে ঝুলিয়ে সমীর ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

না—পুলিশ অফিসারটি নামেনি—সম্ভবতঃ এখনো ট্রেনের সর্বত্র তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এলাহাবাদেই দুটো রাত একটা হোটেলে কাটিয়ে দিল সমীর জমীর খান পরিচয়ে।

নতুন একটা অ্যাটচীকেস কিনে পুরানো অ্যাটচীকেসটা ফেলে দিল।

এবার এলাহাবাদ ত্যাগ।

স্টেশনে এসে পৌঁছে সমীর জানতে পারল ডাউন ক্যালকাটা মেলটা আসতে খুব বেশী দেরি নেই।

আকাশে মেঘ করেছে—একটা অসহ্য গুমোট—বৃষ্টি নামবে হয়ত।

হোটেলের একটা বয়কে দিয়ে আগেই গয়া পর্যন্ত একটা টিকিট কাটিয়ে রেখেছিল সমীর ফার্স্ট ক্লাসের, সঙ্গে রিজার্ভেশনও।

ট্রেনেই বনোয়ারীলাল বাগলার সঙ্গে সমীরের পরিচয় হলো।

কাঠের ব্যবসায়ী—তরাই অঞ্চল থেকে বড় বড় গাছ কেটে বাগলা কলকাতায় চালান দেয়।

বনোয়ারীলাল লোকটার বয়স হয়েছে। বিয়ে করেছিল কিন্তু কোন সন্তানাদি নেই—স্ত্রীও বছর তিনেক হলো মারা গিয়েছে।

হঠাৎ ট্রেনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে বনোয়ারীলাল।

যে কূপেতে সমীর রিজার্ভেশন পেয়েছিল তারই লোয়ার বার্থে ছিল বনোয়ারীলাল।

ট্রেনে উঠে সমীর দেখল প্রচণ্ড জ্বরে কাতরাচ্ছে বনোয়ারীলাল।

সে তার দেশ আজমীরে গিয়েছিল—সেখানে থেকে কার্যস্থলে ফিরছে।

সমীরের অ্যাটচীকেসের মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ছিল।

বনোয়ারীলালকে ঔষধ দিয়ে শুশ্রূষা করে অনেকটা সুস্থ করে তোলে।

নিজের পরিচয় দিল সমীর, সে লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজ থেকে কিছুদিন আগে পাস করেছে—চাকরির সন্ধানে সে চলেছে গয়াতে, পরিচয় দিয়েছে রমাপ্রসাদ গুপ্তে বলে।

বনোয়ারী বললে, চলিয়ে না আমাদের তরাই অঞ্চলে—সেখানে ডাক্তার একেবারেই নেই। আমি সেখানে আপনার প্র্যাকটিশের সব ব্যবস্থা করে দেবো—চার পাঁচশ টাকা মাসে আপনার হেসে খেলে উপায় হবে।

সমীর দেখল মন্দ কি—কিছুদিন অন্ততঃ গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে, অর্থ উপার্জনেরও একটা ব্যবস্থা হবে। ব্যাংকে টাকা থাকলেও ত সে চেকে আপাততঃ টাকা তুলতে পারবে না।

চারিদিকে ঘন শাল জঙ্গল।

দুর্গম তরাই অঞ্চল।

বনোয়ারীলালের কাঠ চেরাইয়ের কারখানার অল্প দূরেই ছোট একটা বাংলোবাড়িতে সমীরের থাকার ব্যবস্থা হলো।

দূরে পাহাড়—একটা পার্বত্য নদীও আছে।

রাত্রে বন্যজন্তুর ডাক শোনা যায়।

লোকজনের বসতি কিছুটা দূরেই।

মাসখানেকের মধ্যেই সমীর সেখানে নিজের পসার করে নিল।

সবাই তাকে ভালবাসে।

রমাপ্রসাদ ডাক্তারের মত মানুষ নাকি হয় না।

মাস তিনেক বাদে হাজারখানেক টাকা সমীর কলকাতায় শ্যামলের নামে পাঠিয়ে দিল বনোয়ারীলালের ঠিকানা দিয়েই সীতার চিকিৎসার জন্য।

দিন পনের বাদে শ্যামলের চিঠি এলো ঃ সীতা তার পূর্বস্মৃতি এখনো ফিরে পায়নি বটে তবে সে সুস্থই আছে। এখনো সে নার্সিং হোমেই চিকিৎসায় আছে। তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। পুলিশ এখনো তার সন্ধান করছে—

সীতা।

কতদিন তাকে দেখেনি সমীর।

যাক্ তবু একটা সান্ত্বনা, পূর্বস্মৃতি ফিরে না পেলেও সে সুস্থই আছে এবং নিরাপদেই আছে।

কিন্তু বেশীদিন থাকা হলো না সমীরের তরাই অঞ্চলে।

দীননাথ চক্রবর্তী জলপাইগুড়ির এস. পি.—এসেছিলেন জীপে করে তরাই অঞ্চলে শিকারে। মাইল দেড়েক দূরে সরকারী রেস্ট হাউস—সেখানেই উঠেছিলেন।

বনোয়ারীলালের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় তাঁর ছিল।

শিকারে এসে চক্রবর্তী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বনোয়ারীলাল সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখতে গেল এবং একজন লোক পাঠিয়ে দিল রমাপ্রসাদবেশী সমীরকে ডেকে আনতে।

দীননাথ যে এস. পি. সমীর জানত না। বনোয়ারীলালের ডাকে সে সোজা চলে এসেছিল রেস্ট হাউসে।

সমীরের মুখে যদিও দাড়ি ছিল—দাড়ি সে কাটত না—তবু দীননাথের সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হলো।

মুখটা যেন চেনা চেনা।

সমীর চলে যাবার পর নানাভাবে সমীর সম্পর্কে বনোয়ারীর কাছে সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁর সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো।

এবং তাঁর সন্দেহের কথাটা বনোয়ারীকে জানালেন।

সন্ধ্যায় বনোয়ারী সমীরের সঙ্গে তার বাংলোয় দেখা করতে এলো।

শীতকাল—

সমীর তার শোবার ঘরে বসে একটা বই পড়ছিল।

ডাক্তার সাহেব আছেন নাকি?

কে! মিঃ বাগলা—আসুন আসুন—তারপর কেমন আছেন ভদ্রলোক?

ভাল। এস্. পি. সাহেব কি বলছিল জানেন?

কি?

আপনাকে নাকি এক পলাতক খুনী ডাক্তারের মত দেখতে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ—আমি ত হেসে বাঁচি না। বললাম—এ কখনই হতে পারে না—আপনি ভুল করছেন—

সমীরের মনের মধ্যে কিন্তু চিন্তা দেখা দেয়—বিশেষ করে দীননাথের পরিচয় পেয়ে।

না—এখানে আর এক মুহূর্তে নয়।

সেই দিনই গভীর রাত্রে সমীর বের হয়ে পড়ল আবার নিরুদ্দেশের পথে।

মাসখানেক পরে হাজারিবাগ অঞ্চলে এক মিশনারী স্কুলের বাস ড্রাইভারের পরিচয়ে।
সরযূপ্রসাদ ড্রাইভার।

।। বার ।।

মিশনারী স্কুলের রেকটার ফাদার জনসন।

যেমন শিক্ষিত তেমনি ধার্মিক মানুষটি— প্রথম যৌবনে সুদূর আয়ারল্যাণ্ড থেকে মিশনের কাজে এসেছিলেন ভারতে—আজ চল্লিশ বছর আছেন হাজারিবাগে।

মিশনের ছেলেদের নিয়ে ফাদার গিয়েছিলেন পিকনিকে।

সেখানে গিয়ে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। ড্রাইভার ব্রজলাল—অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে—দীর্ঘদিন গাড়ি চালাচ্ছে বটে কিন্তু গাড়ির কলকব্জা সম্বন্ধ কোনই জ্ঞান নেই।

জনসন সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো—মিশনের স্কুলবাড়ি অনেক দুরে—সঙ্গে পনের জন নানা বয়েসী ছেলে—

ব্রীজলালও কি করবে বুঝতে পারে না।

দেহাতীর ছদ্মবেশে কাঁধে একটা ঝোলা ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে সমীর যাচ্ছিল—সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

কেয়া হুয়া সাব্? গাড়িকো কই গড়বড়ি?

জনসন বললেন, হ্যাঁ—গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না—

ম্যায়ে দেখ সকতে হুঁ।

গাড়ির কলকব্জা সম্পর্কে তুমি কিছু জান? জনসন প্রশ্ন করেন।

থোড়ি থোড়ি—

তব্ দেখো—

সমীর কিন্তু মিনিট পনেরর মধ্যেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিল—ছেলের দল হইচই করে ওঠে।

কোথায় থাক তুমি? এদিকে কোথায় এসেছিলে—কি নাম তোমার? জনসন জিজ্ঞাসা করেন।

ফাদার জনসন ভারী খুশি।

বললেন, ইয়ংম্যান, কোথায় থাক তুমি, এ জংগলে কি করছিলে?

ঘুরতে ঘুরতে জংগলের মধ্যে এসে গিয়েছি।

কি নাম তোমার ইয়ংম্যান?

সরযূপ্রসাদ।

তুমি ত গাড়ির কাজ বেশ ভালই জান দেখছি সরযূ।

হ্যাঁ,—শিখেছিলাম কিছুদিন।

ড্রাইভিং জান?

জানি—কিন্তু লাইসেন্স নেই—

ডোন্ট ওরি—লাইসেন্সের ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে—আমার কাছে কাজ করবে তুমি—

কিঁউ নেহি সাব্—কাজইত একটা খুঁজছি আমি—

বেশ—তবে চল আমার সঙ্গে—আমাদের ড্রাইভার ব্রীজলালের বয়েস হয়েছে আর বুড়ঢা—

কত মাইনা চাও—

যা দেবেন—

দেড়শ টাকা পাবে—খাওয়া থাকা—রাজী আছো?

ঠিক হ্যায়—

সমীর সরযূপ্রসাদ ড্রাইভার হয়ে কাজ নিল মিশন স্কুলে।

মাস তিনেক কাজ করবার পর চার দিনের ছুটি চাইল।

কোথায় যাবে? ফাদার শুধালেন?

মুলুক—সাব্—

জনসন সাহেব ছুটি মঞ্জুর করলেন।

আসলে সমীরের মনটা ছটফট করছিল।

প্রায় দশমাস হলো সীতাকে সে দেখেনি—তরাই অঞ্চল ছাড়ার পর আর টাকাও পাঠাতে পারেনি—কিছু টাকা ইতিমধ্যে জমেছে, শ'ছয়েক মত— সে টাকাটাও দিয়ে আসতে হবে—তাই ছুটি চেয়েছিল সমীর।

গভীর রাতে সমীর গিয়ে শ্যামলের নার্সিং হোমের দরজায় দাঁড়াল—

পরনে সুট—মাথায় টুপি—মুখে পাকা দাড়ি। হাতে একটা মোটা লাঠি।

বেল বাজাতেই দরোয়ান এসে দরজা খুলে দিল।

কি চাই?

ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—বিশেষ জরুরী—

এত রাত্রে দেখা হবে না—ডাক্তার এখন নিদ যাচ্ছেন—

মেহেরবানি করে তাঁকে একটা খরব দাও—বলো একটা খুব খারাপ রোগীর জন্য তাঁকে ডাকতে এসেছি—

দরোয়ান এবার আর আপত্তি করে না।

সমীরকে ওয়েটিং রুমে বসতে বলে সে তিনতলায় সংবাদ দিতে গেল।

শ্যামল ঘুমোচ্ছিল—দরোয়ান গিয়ে বলতে ভৃত্য তাকে ডেকে তুলে দিল।

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে শ্যামল নেমে এলো নীচে।

কোথা থেকে আসচেন? শ্যামল প্রশ্ন করে।

শ্যামল—আমি সমীর—

সমীর, তুমি—good god! আমি ত তোমায় প্রথমটায় চিনতেই পারিনি—বোস—বোস—

সমীর একটা চেয়ারে বসল।

শ্যামল!

য়্যাঁ—

সীতা কেমন আছে ভাই।

ভাল। অনেকটা progress করেছে, কিন্তু এভাবে তোমার এখানে আসাটা উচিৎ হয়নি সমীর—পুলিশ এখানে তোমাকে আর সীতাকে খুঁজছে। কোন মতে যদি জানতে পারে তুমি এ শহরে এসেছো—তোমাকে ত arrest করবেই—সীতাকে নিয়েও হয়ত টানাটানি করবে—

জানি ভাই। সবই জানি—অনেক দিন তোমাকে কিছু পাঠাতে পারিনি—তাই ভাবলাম একবার খবরটা নিয়ে যাই—আর কিছু টাকাও তোমাকে দিয়ে যাই—এই নাও—

পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে সমীর শ্যামলের দিকে এগিয়ে ধরল—

টাকাটা নিতে নিতে শ্যামল বললে, তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই সমীর, খুব উপকার হলো ভাই এ সময়ে টাকাটা পেয়ে—দু'মাসের বাড়ীভাড়া বাকী—এ নার্সি হোম বোধহয় শেষ পর্যন্ত আমাকে তুলেই দিতে হবে—ভাবছি কেবল কনসালটেশন প্র্যাকটিস করবো—

তুলে দেবে?

কি করি বলো—খরচ চালাতে পারচি না। বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন, বিলেত থেকে পড়ে এসে এই নার্সিং হোম খুলতেই সব প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে—

না শ্যামল—এমন একটা প্রতিষ্ঠান, একে তুলে দিও না।

তুলে দিতে কি আমারই ইচ্ছা ভাই। যাকগে—তুমি আর এখানে থেকো না—একে সীতার জন্যে সর্বদাই আমার চিন্তা—

সীতাকে একবার দেখতে পারি শ্যামল?

না, না—

লক্ষ্মী ভাই—অনেকদিন তাকে দেখিনি—একটিবার চোখের দেখা—

বুঝলাম কিন্তু কোনক্রমে তোমাকে যদি কেউ সন্দেহ করে—তাহলে তুমিও বিপদে পড়বে আমিও পড়বো—

জানি—কিন্তু—

তাছাড়া এই রাত্রে—

একবার শুধু চোখের দেখা দেখে চলে আসবো—

কি জানি কেন শ্যামল আর না বলতে পারে না। সমীরের গলার স্বর তার কাকুতি তাকে যেন বিচলিত করে তোলে।

বলে, বেশ—চল—

সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে উপরে উঠে এলো।

দোতলার পর পর কেবিনগুলো। দুটি কেবিন খালি। দুটি কেবিনে পেসেণ্ট রয়েছে।

সিস্টার অন ডিউটিকে ডেকে শ্যামল বললে, সিস্টার, এঁকে ২নং কেবিনে নিয়ে যান—

কিন্তু পেসেণ্ট ত এখন ঘুমোচ্ছে।

উনি দেখেই চলে আসবেন। পেসেণ্টের আত্মীয়—

সিস্টার সমীরকে নিয়ে এগিয়ে গেল দু'নম্বর কেবিনের দিকে করিডোর দিয়ে।

দরজাটা ভেজান ছিল কেবিনের।

হাত দিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে সিস্টার বললে, Go inside but please don't disturb the patient.

সমীর ভিতরে ঢুকল।

মৃদু নীলাভ একটা আলো—রাত-আলো ঘরে জ্বলছে শয্যার পাশে।

সীতা শয্যায় শুয়ে—নিদ্রাভিভূত।

গলা পর্যন্ত একটা কম্বলে ঢাকা, মাথার রুক্ষ চুল বালিশে ছড়িয়ে রয়েছে।

সীতা। তার আদরের বোনটি। কতদিন—কতদিন পরে সমীর সীতাকে দেখছে।

ও যেন অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে।

সীতা—সীতা—

লোভ সামলাতে পারে না সমীর—আলগোছে একটা হাত সীতার মাথায় রাখে।

নীচু হয়ে তার ঠাণ্ডা কপালে একটা চুমো খায়।

সঙ্গে সঙ্গে সীতা জেগে ওঠে। চোখ মেলে তাকায়।

কে? কে?

আ—আমি—

কে—কে আপনি?

আমি একজন ডাক্তার। ভাল আছো?

হ্যাঁ—

ঘুমোও।

পারল না—সীতা তাকে আজো চিনতে পারল না।

সমীরের চোখদুটো জলে ভরে যায়।

সমীর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

সমীর লক্ষ্য করেনি—হাওড়া স্টেশন থেকেই একজন পুলিশ অফিসার তাকে অনুসরণ করছিল।

জনার্দন বোস অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—তাঁর একমাত্র ছেলে জয়ন্তর হত্যাকারী এখনো ধরা পড়ল না।

সেন্ট্রাল পর্যন্ত তিনি নাড়াচাড়া করেছিলেন।

তখন সেন্ট্রাল থেকেই ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন সুদক্ষ অফিসার চন্দন সিংকে ব্যাপারটা তদন্ত ও অনুসন্ধান করবার জন্য পাঠানো হয়।

দীর্ঘ দুই মাস ধরে নানাভাবে তদন্ত করে চন্দন সিংয়ের সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল জয়ন্তর হত্যাকারী আর কেউ নয় ঐ ডাঃ সমীর চৌধুরীই আর সেই কারণেই সে দুর্ঘটনার রাত্রি থেকে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে।

তার বোনেরও কোন সন্ধান নেই।

অনুসন্ধান করতে করতে চন্দন সিং এলাহাবাদ হোটেল—তরাই অঞ্চলে বনোয়ারীলালের ওখানেও যায়—এবং সেখানে যে সব তথ্য সে পায় তাতে করে তার দৃঢ় ধারণা হয় রমাপ্রসাদ গুপ্তে লোকটা আর কেউ নয় পলাতক সমীরই।

তরাই অঞ্চল থেকে যে সে কোথায় গেল সেটা খুঁজে বের করতে বেশ কিছুদিন লাগে।

আরো একটা ব্যাপার চন্দন সিংকে ভাবিত করে তুলেছিল—যে যে জায়গায় সমীরের সন্ধান সে পেয়েছে কোথায়ও তার সঙ্গে কোন মেয়েছেলে ছিল না।

সে একাই।

সমীরের বোন সীতা তাহলে কোথায় গেল।

সমীরের যে দূর বা নিকট-আত্মীয়রা ছিল সেখানেও সে খোঁজ করেছে কিন্তু কোথাও সীতার কোন সন্ধান পায়নি।

সীতার ব্যাপারটাও রীতিমত রহস্যজনক।

সমীর ডাক্তারের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও দেখা করেছে চন্দন সিং কিন্তু কেউ তার কোন খবর দিতে পারেনি।

শ্যামল ডাক্তারের ওখানেও সে গিয়েছিল।

অনেক রাত হয়েছিল—বোধহয় রাত পৌনে বারটা।

শীতের রাত তাই রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন হয়ে পড়েছিল। পথের দু'ধারে কেবল আলোগুলো জ্বলছিল, স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মত।

মধ্যে মধ্যে দু'একটা ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ি যাতায়াত করছিল।

শ্যামলের নার্সিং হোম থেকে বের হয়ে সমীর হেঁটে চলেছিল হ্যারিসন রোডে যে ছোট হোটেলটায় সে উঠেছিল সেই হোটেলটার দিকে।

হঠাৎ সমীরের মনে হলো কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে।

জুতোর একটা শব্দ যেন তার পিছনে পিছনে আসছে।

সমীর প্রথমটায় অতটা খেয়াল করেনি কিন্তু শব্দটা ক্রমান্বয়ে তার কানে আসতে সে বোধহয় একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

পিছনে তাকাল সমীর। হঠাৎ মনে হলো যেন কে একজন চট্ করে একটা লাইটপোস্টের আড়ালে চলে গেল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে লাগল সমীর—আবার সেই জুতোর শব্দ।

সমীর চট্ করে আবার একসময় পিছন ফিরে তাকাল—প্রায় হাত কুড়ি দূরে একটা লোক।

সামনে ও পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে—

লোকটাও দাঁড়িয়েছে তারই মত।

সমীর আবার হাঁটতে শুরু করল—স্পষ্ট বুঝতে পারল সমীর পিছনের সেই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও হাঁটা শুরু করেছে।

সমীরের আর কোন সন্দেহ থাকে না। লোকটা তাকে অনুসরণ করছে।

সমীর দ্রুত কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

ঘোরা রাস্তায় বেশ কিছুটা ঘুরে হোটেলের কাছাকাছি আসতেই সমীর চমকে উঠল—দু'জন লোক হোটেলের কাছে ঘোরাফেরা করছে আর অল্প দূরে একটা কালো পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে।

সমীর মুহূর্তমাত্র আর দেরি করে না—

হোটেলের দিকে আর না এগিয়ে সমীর অন্য পথে এগিয়ে গেল।

দিন দুই পরে সন্ধ্যা নাগাদ—মিশনে ফিরে ফাদারের সঙ্গে দেখা করবে বলে তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছে সমীর হঠাৎ নজরে পড়ল ফাদারের ঘরে আলো জ্বলছে, ঘরের মধ্যে ফাদার ও একজন পুলিশ অফিসার।

সমীর বুঝতে পারল এ মিশনের বাসও তার উঠল।

ফাদারের ঘরে আর যাওয়া হলো না, সমীর আবার পথে নামল।

দিন দুই বাদে।

কলকাতাগামী রাঁচি এক্সপ্রেসের একটা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে একজন সাধারণ যাত্রীর বেশে সমীরকে দেখা গেল।

পরনে ধুতি—মেরজাই ও পাগড়ি মাথায় বিরাট একটি। ভারী একজোড়া গোঁফ।

মুড়ি জংশনে একজন পুলিশ অফিসার এসে তার কম্পার্টমেন্টে উঠল।

সমীর আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

ঐ লোকটিকেই সে দু'দিন আগে হাজারিবাগে মিশনে ফাদারের ঘরে বসে গল্প করতে দেখেছে—সমীর লোকটির পরিচয় যদি জানত—

পুলিশ অফিসার চন্দন সিং।

চন্দন সিং পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে—সমীর যেখানে বসেছিল সেই দিকেই।

কাছাকাছি আসতেই একটু সরে বলে, বৈঠিয়ে না সাব্—ইধার ত থোড়া জায়গা হ্যায়।

চন্দন সিং তাকাল সমীরের দিকে—

নেহি নেহি—ঠিক হ্যায়—চন্দন সিং বললে।

বৈঠিয়ে না—বহুৎ ঠাণ্ডি—

চন্দন সিং এবারে আর আপত্তি করল না, বসল সমীরের পাশে।

একটু পরে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল সমীর, সিগ্রেট পিজিয়ে সাব্—

চন্দন সিং একটা সিগ্রেট নিল।

সমীরই অগ্নিসংযোগ করিয়ে দিল।

বহুৎ ঠাণ্ডি—সমীর বললে।

হাঁ—চন্দন সিং সাড়া দিয়ে কামরার সর্বত্র তাকাতে থাকে।

কোই কিসিকো ঢুঁড়তে হে আপ সাব্—

হ্যাঁ—হাঁ—

কোই ডাকুওকু?

হাঁ—

কোই বহুৎ বড়া ডাকু হ্যায় সাব্—

ডাকু নেহি খুনী।

আরে বাপ! ই কামরামে হ্যায় কেয়া?

হো সেক্তা—

মুঝে ত বহুৎ ডর লাগতে হে সাব্—কেয়া নাম উসকো? জেলসে ভাগা হুয়া কেয়া?

চন্দন সিং আর উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা একটা স্টেশনে এসে থামে।

সাব্—চায়ে পিয়োগে—সমীর শুধায়।

চায়ে—

হাঁ—লাউ—

লাইয়ে—

সমীর উঠে গিয়ে দু'ভাঁড় চা নিয়ে আসে—এক ভাঁড় নিজে নেয় অন্য ভাড় চন্দন সিংকে দেয়।

টাটানগরে ট্রেন থামলে সমীর নেমে যায়।

॥ তের ॥

তার পর থেকে দুটো মাস বোম্বাই ও নাগপুর অঞ্চলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি মাস্টারজী—চন্দন সিংয়ের তাড়া খেয়ে।

বলতে বলতে সমীর থামল।

শান্তাপ্রসাদ আর বন্দনা এতক্ষণ যেন পাথরের মত বসে সমীরের কাহিনী শুনছিল।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—

ভোরের আবছা আলো জানলাপথে দেখা যায়।

সমীর বললে, কিন্তু এবারে আমি নিশ্চিন্ত মাস্টারজী, সীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে—যে চিন্তাটা

সর্বক্ষণ আমাকে অস্থির করে রেখেছিল তা আর রইলো না। এবারে সারেণ্ডার করবো পুলিশের হাতে—

বন্দনা বলে ওঠে, পুলিশের হাতে সারেণ্ডার করবেন?

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন? বন্দনা শুধায়।

কেন? আর এ জীবন সহ্য করতে পারছি না। এই যে কুকুরের মত তাড়া খেয়ে খেয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান—I am tired—I am really sick of it.

কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা দিলে—

জানি বিচারে আমার ফাঁসি হবে। হত্যা করেছি একজনকে ফাঁসি হবে না—হবেই ত—

কিন্তু যে জন্য আপনি হত্যা করেছেন—

হত্যা হত্যাই—আচ্ছা মাস্টারজী ম্যায় চল রাহা হুঁ! এই রূপিয়া রাখিয়ে—

কয়েকটা নোট বের করল সমীর পকেট থেকে—

নেহি ডকটার সাব্—উসকে লিয়ে আপ ফিকার মত্ করিয়ে—যো করনা ম্যায় করুঙ্গা—

লেকেন মাস্টারজী—

নেহি মুঝে সরমিন্দা না করিয়ে—কিষণজী আপকো রকসা করেঙ্গে—

সমীর বের হয়ে এলো।

বনের পথই ধরেছিল সমীর—

হঠাৎ পিছনে পদশব্দ পেয়ে সমীর ঘুরে তাকিয়ে অবাক হলো—বন্দনা।

একি আপনি—আপনি কোথায় চলেছেন?

আপনার সঙ্গে—

আমার সঙ্গে! কোথায়?

যেখানে আপনি যাবেন।

এসব কি বলছেন আপনি! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে—যান যান ফিরে যান—

না।

মানে?

মানে আবার কি যাবো না—

যাবেন না?

না—আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবো—

অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত?

হ্যাঁ—আপনার প্রতি যে অন্যায় করেছি—

আমার প্রতি আপনি আবার কি অন্যায় করলেন?

করেছি, আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।

সমীর হেসে বললে, এখন বুঝি চিনে ফেলেছেন।

আপনিও আমাকে চেনেন আমিও আপনাকে চিনি এবং বহুদিন থেকেই—

সত্যি?

বন্দনার নাম আপনি শোনেননি বলতে চান—আপনার পিতৃবন্ধু বম্বের বিখ্যাত ব্যারিস্টার—

আ—আপনি

হ্যাঁ—তাঁরই মেয়ে আমি বন্দনা।

সমীর কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থাকে বন্দনার মুখের দিকে।

আপনি বন্দনা ব্যানার্জী?

হ্যাঁ—

ভোরের আলো তখন গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চারপাশে এসে পড়েছে।

কিন্তু আপনি কলকাতায় কেন যাচ্ছিলেন?

সে অনেক কথা—কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—কোথায় যাবেন চলুন—

আমি ত যাচ্ছি পুলিশ স্টেশনে surrender করতে। আপনি আমার সঙ্গে কোথায় যাবেন—

সত্যিই আপনি তাহলে সারেণ্ডার করবেন?

হ্যাঁ—

তাহলে—আমার—আমার কি হবে?

আপনি বম্বে ফিরে যান।

সে সম্ভব নয়।

কেন?

সেখানে ব্রজদুলাল আছে।

সে আবার কে?

মামা জোর করে তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল—

ওদের কথা শেষ হলো না—

ওদের চারপাশ থেকে একদল আর্মড পুলিশ ঘিরে ফেলেছে ততক্ষণে—

সমীরবাবু—হাত তুলুন—

সামনে দাঁড়িয়ে চন্দন সিং।

আমি থানাতেই যাচ্ছিলাম ইন্সপেকটার—ভালই হলো পথেই দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে—

চন্দন সিংয়ের ইঙ্গিতে একজন সেপাই এসে সমীরের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল।

বন্দনা দেবী, একটা অনুরোধ করে যাই—যদি সম্ভব হয় শ্যামলের সঙ্গে দেখা করে বলবেন ওদের বিয়েতে আমি খুব খুশী হয়েছি—আশীর্বাদ করছি ওরা সুখী হবে—

দেবী নয়—বন্দনা, বন্দনা বললে, তুমি কিছু ভেবো না সমীর—আমি বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার লাগাবো—বন্দনার চোখে জল আসে কথা বলতে বলতে।

ইন্সপেকটার—সমীর ডাকল।

ইয়েস—

ওঁকে আপনার লোক দিয়ে উনি যেখানে যেতে চান পৌঁছে দেবেন।

ঠিক আছে—

চলুন তাহলে—

চন্দন সিং সমীর ও বন্দনাকে নিয়ে অগ্রসর হলো।

শীতের এক সকাল।

সীতাকে বিয়ের পরই ডাঃ শ্যামল রায়ের জীবনে অদ্ভুত এক যোগাযোগ ঘটেছিল।

অনেকদিন থেকে সে চেষ্টা করছিল সরকারী সাহায্যের জন্য—হঠাৎ সেটা মঞ্জুর হওয়ার সংবাদ আসে।

এবং মাসখানেক বাদে সমস্ত বাড়িটাই একটা মেনটাল অ্যাসাইলামে পরিণত করে সে বালিগঞ্জ অঞ্চলেই তিন-কামরাওয়ালা একটা ফ্ল্যাট দেখে স্ত্রী সীতাকে নিয়ে উঠে আসে।

সে রাত্রে সমীর চলে যাবার পর শ্যামলের একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছিল—সীতার জন্য সত্যিই সমীরের যেন চিন্তার অবধি নেই। এবং ভাইয়ের বোনের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসাটাও তাকে মুগ্ধ করেছিল।

কেন যেন সে তার বন্ধু সমীরকে প্রথম দিন থেকেই একজন খুনী হত্যাকারী বলে ভাবতে পারেনি।

যদি সমীর ঘটনাচক্রে জয়ন্তর হত্যাকারী হয়ও তাহলে সে কি খুব একটা অন্যায় কাজ করেছে! সমীরকে সে খুব ভাল করেই চিনত—আব ধনীপুত্র উচ্ছৃঙ্খল লম্পট জয়ন্তর কথাও সে জানত না এমন নয়।

জয়ন্তর দ্বারা সবই সম্ভব।

তারপর সীতাকে নিজের নার্সিং হোমে রেখে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করতে করতে কেমন যেন একটা ভালবাসাও জন্মে গিয়েছিল সীতার প্রতি তার।

সীতা আর সমীরের কথা চিন্তা করতে করতেই সীতাকে বিবাহ করার কথাটা তার মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল।

একমাত্র সীতার পূর্বস্মৃতিটুকুই নেই—এক পক্ষে হয়ত সেটা তার প্রতি বিধাতার আশীর্বাদ।

তার দেহ ও মনের উপর দিয়ে যে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে অন্ততঃ সেটা ত সে স্মৃতিভ্রংশের জন্য ভুলে থাকতে পেরেছে।

সীতাকে সে যদি বিবাহ করে সমীর নিশ্চয়ই খুশি হবে।

সব কথা ভেবেই শ্যামল সীতাকে বিবাহ করেছিল।

হিন্দুমতেই বিবাহ করেছিল—ওদের পুরোনো চাকর শংকর উপস্থিত ছিল।

কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন সীতার এক দূরসম্পর্কীয় কাকা দীনেশ চৌধুরী।

সেই কাকা দীনেশ চৌধুরীর অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না, এবং সমীর বরাবর তাঁকে সাহায্য করেছে। কৃষ্ণনগরে থাকতেন।

শংকরের কাছেই তাঁর সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে তাঁকে সব কথা বলেছিল শ্যামল। এবং এও বলেছিল গোপনেই সে সীতাকে বিবাহ করতে চায়—নচেৎ ব্যাপারটা জানাজানি হলে গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে। এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছিল সমীরই ঐ বিবাহ স্থির করেছিল—বিবাহটা হয়নি শুধু হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগে সীতার স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায়।

শ্যামল চায়ের টেবিলে বসে চা পান করছিল—সীতা শ্যামলকে চা পরিবেশন করছিল এমন সময় ভৃত্য ঐ দিনকার সংবাদপত্রটা এনে টেবিলের 'পরে রাখল।

সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চোখ দিতেই শ্যামলা চমকে ওঠে : সমীরের ছবি দিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—মধ্যপ্রদেশের কোন এক জায়গায় সমীর ধরা পড়েছে। তাকে কলকাতায় আনা হবে—তারপর তার বিচার শুরু হবে।

সীতা!

কিছু বলছো?

আচ্ছা তোমার এক ভাই ছিল মনে পড়ে তোমার?

ভাই—

হ্যাঁ—আপন সহোদর ভাই—

আমার ভাই—

হ্যাঁ—দেখ তো এই ছবিটা—

সীতা ছবিটা দেখল কিন্তু তার চোখে মুখে কোন বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ পায় না।

বল তো এ কে? কার ছবি?

কে?

চিনতে পারছো না?

না—আমার দাদা—একটু থেমে বললে সীতা!

হ্যাঁ—তোমার দাদা।

কোথায় আছে এখন?

শ্যামল সংবাদপত্রটা ততক্ষণে একদিকে সরিয়ে ফেলেছে—সীতা যদি পড়ে ফেলে সংবাদটা সেই ভয়ে।

আছে এখানেই—এই কলকাতাতেই—দেখা করবে তার সঙ্গে?

করবো—

বেশ। নিয়ে যাবো তোমাকে একদিন।

বন্দনা কিন্তু বোম্বাই যায়নি—

চলে এসেছিল কলকাতায়। মিঃ সিং তাকে কলকাতায় আসবারই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

কলকাতায় এসে উঠেছিল তার বান্ধবী রাখীর বাড়িতে।

রাখীরা একসময় বোম্বাইয়ে ছিল দীর্ঘদিন।

রাখীর বাবা অমিয়নাথ সান্ন্যাল ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন তখন।
মাস চারেক হলো রাখীর বাবা রিটায়ার করেছিলেন।

রাখী প্রায়ই বন্দনাকে লিখতো কলকাতায় একবার ঘুরে যাবার জন্য।

বন্দনাকে দেখে রাখী অত্যন্ত খুশি হয়—

সত্যি তুই এসেছিস বন্দনা!

হ্যাঁ—চল তোর ঘরে—

তোর জিনিসপত্র কোথায়?

চল ঘরে—অনেক কথা আছে।

রাখীর ঘরে বসে বন্দনা তার সমস্ত ইতিহাস ও সমীরের কথা বলে গেল।

বলিস কি! এ যে এক রীতিমত উপন্যাস রে! রাখী বললে।

তাই! শোন আমি তোর সাহায্য চাই—সমীরকে কলকাতায়ই পুলিশ নিয়ে আসবে—তারপর হয়ত তার বিচার শুরু হবে—আমি একজন ভাল ব্যারিস্টার বা অ্যাডভোকেট দিয়ে তার মামলা চালাতে চাই—আমার নামে অনেক টাকা ব্যাংকে আছে—চেকবইও আমার সঙ্গে আছে—টাকার জন্য ভাবিস না।

তুই যে দেখছি সত্যিই মজেছিস বন্দনা। মৃদু হেসে রাখী বললে, কিন্তু—

কিন্তু কি?

সত্যিই যদি সে খুনী হয়—

না বিশ্বাস করি না সমীর কাউকে খুন করতে পারে। একেই বলে বোধহয় রে ভাগ্যের পরিহাস—

হয়ত তাই—নচেৎ বিচিত্রভাবেই না দু'জনার পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল—যাকে মনে মনে একপ্রকার বর্জন করেছিলাম—শেষ পর্যন্ত—

রাখী মৃদু হেসে বলে ওঠে, পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি—শেষ পর্যন্ত তারই সঙ্গে—

রাখী তার বাবা অমিয়নাথ সান্ন্যালকে ঐদিনই বন্দনার সব কথা বললে।

সব শুনে তিনি বললেন, বেশ কাল নিয়ে যাবো তোমার বান্ধবীকে অ্যাডভোকেট বরদাপ্রসন্নর কাছে—সে আমার বন্ধুও বটে দীর্ঘদিনের, ফৌজদারী মামলায় তার নামডাকও প্রচুর।

॥ চোদ্দ ॥

দুঁধে অ্যাডভোকেট বরদাপ্রসন্ন মল্লিক।

তিনি সব শুনে বললেন, ঠিক আছে—আমি খোঁজ নেবোখন সমীর চৌধুরীকে কলকাতায় আনা হয়েছে কিনা—তারপর তার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। তার মুখ থেকেও সব আমার শোনা প্রয়োজন।

বন্দনা বললে, কিন্তু কেসটা আপনাকে হাতে নিতে হবে মিঃ মল্লিক।

অমিয়র সঙ্গে যখন তুমি এসেছ মা আমার যথাসাধ্য আমি করবো—

দিন পাঁচেক বাদেই বরদাপ্রসন্ন খবর দিলেন সমীরকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে এনে রাখা হয়েছে।

সমীরের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারাটা শহরে একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল—বিশেষ করে চিকিৎসক মহলে।

কলকাতা শহরের উদীয়মান ডাক্তাররা সমীরকে বেশ ভাল করেই চিনত।

দেড় বছর পূর্বে তার সম্পর্কে যখন সংবাদপত্রে সংবাদটা প্রকাশিত হয়—সেই জনার্দন বোসের পুত্র জয়ন্ত বোসকে হত্যা করেছে—সবাই বিস্মিত হয়েছিল। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল—অনেকে বিশ্বাসও করেনি।

বিশেষ করে চিকিৎসক মহলে সমীরের যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

কিন্তু তারপর যখন জানা গেল সমীর ফেরার, তার কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না তখন অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দেয়।

তবে কি সংবাদটা সত্যি? মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপারটা এমনই পলকা বুঝি।

মাস দেড়েক বাদে যখন সমীর চৌধুরীর মামলাটা আদালতে উঠল—শহরের সমস্ত সংবাদপত্রেই তা ফলাও করে ছাপা হলো।

সমীরকে কথা দিয়েছিল বন্দনা শ্যামলের সঙ্গে সে দেখা করবে। সেইমতই একদিন শ্যামলের নার্সিং হোমে তার চেম্বারে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

আপনাকে ত চিনতে পারছি না বন্দনা দেবী? কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন—শ্যামল বললে।

বিশেষ দরকারেই দেখা করতে চেয়েছিলাম—বন্দনা জবাব দেয়।

কি ব্যাপার বলুন ত!

ডাঃ সমীর চৌধুরীকে আপনি চেনেন নিশ্চয়ই।

চিনি—সে আমার বিশেষ বন্ধু।

জানি। আর এও জানি সমীর তার বোন সীতাকে অসুস্থ অবস্থায় আপনার হাতেই চিকিৎসার জন্য তুলে দিয়ে গিয়েছিল—

আপনি! আপনি সে কথা জানলেন কি করে?

জানি। আর এও জানি সীতাকে আপনি বিয়ে করেছেন—সমীর আপনাদের আশীর্বাদ পাঠিয়েছে।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ—

আঃ আমার বুক থেকে এতদিনে একটা বোঝা নামল। কিন্তু আপনার পরিচয়টা ত এখনো পেলাম না—

আমি তার বাগ্‌দত্তা—

বাগ্‌দত্তা?

হ্যাঁ—আমার বাবা আর সমীরের বাবা বাল্যবন্ধু ছিলেন—তাঁরাই আমাদের বিবাহ স্থির করে যান। তারপরেই একটু থেমে বন্দনা বললে, ডাঃ রায়, আমি জানি সমীর নির্দোষ—

আমারও তাই ধারণা, কিন্তু আইন—

আইনের সঙ্গে লড়বো। আপনারও সাহায্যের হয়ত প্রয়োজন হবে।

নিশ্চয়ই—এ ব্যাপারে আমার সব সাহায্যই আপনি পাবেন।

তারপর একটু থেমে বন্দনা বললে, আমি শংকরের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম—সেও বিশ্বাস করে না সমীর কাউকে হত্যা করতে পারে। সে যাক—সীতা এখন কেমন আছে?

পূর্বস্মৃতি এখনো ফেরেনি—otherwise সে সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু একটা কথা—আপনি কি সমীরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

না—কাল করবো—আপনি দেখা করেছেন?

আজ দেখা করবো—শ্যামল বললে।

দেখা হলো দুই বন্ধুতে জেলের মধ্যে।

সমীর বললে, শ্যামল, তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো ভাই—সব জেনে শুনেও তুমি সীতাকে বিবাহ করবে এ আমি ভাবতেও পারিনি ভাই—

ও কথা থাক সমীর। বন্দনা আজ এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে—তুমি কিছু ভেবো না—সে খুব নামী একজন অ্যাডভোকেট দিচ্ছে তোমার মামলা চালাবার জন্য—

কি হবে ভাই ওসব করে—

কি বলছো তুমি!

ঠিকই বলছি—আর যাই করি না কেন আদালতে সীতার নাম ত মুখে আনতে পারবো না।

না, না—তা হলে যে সব কেঁচে যাবে!

তা যাক! সেই হতভাগিনী যার পূর্বস্মৃতি এখনো লুপ্ত—সব অন্ধকার—তাকে আমি কেমন করে আদালতের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করাবো বলতে পারো শ্যামল—আর কোন্ মুখেই বা ভাই হয়ে তাকে চরম দুঃখের কথা আদালতে সবার সামনে বলবো! ছিঃ ছিঃ, তা হয় না—

তাই বলে যা সত্য তাকে তুমি গোপন করে যাবে? তা তোমাকে কিছুতেই আমি করতে দেবো

না জেনো সমীর—

বুঝতে পারছো না কেন শ্যামল, সে আজ তোমার স্ত্রী—

তাকে ত আমি সব জেনে শুনেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি ভাই!

শ্যামল—

হ্যাঁ সমীর আমি বিশ্বাস করি না দেহটা একটা কাচের পাত্র—সামান্য আঘাতেই সেটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু সমাজের কথাটা ত ভাববে—

নিশ্চয়ই ভাববো কিন্তু সমাজ যদি একটা ক্ষণিকের ভুলকেই বড় করে দেখে আর গোটা মানুষটাকে অস্বীকার করে সে সমাজকে আমি স্বীকার করি না—

কিন্তু নিজেকে যে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না শ্যামল! যদি সীতার প্রতি আমার আর একটু সজাগ দৃষ্টি থাকতো তবে ত অতবড় বিপর্যয়টা ঘটতে পারতো না—

ওসব নিয়ে আর মনকে তুমি পীড়িত করো না সমীর। আর সীতা আজ আমার স্ত্রী—তার সকল দায়িত্বই আমার—

সীতা কেমন আছে ভাই?

ভাল।

তোমার মত স্বামী পেয়েছে যখন সে নিশ্চয়ই সুখী হবে। সুখী হও তোমরা—ভগবান তোমাদের সুখে রাখুন—

সমীরের গলার স্বর বুজে এলো।

আমি এখন আসি সমীর—

এসো।

পরের দিন এলো বন্দনা, সঙ্গে বরদাপ্রসন্ন।

ছিঃ ছিঃ এখানে কেন তুমি এলে বন্দনা, সমীর বললে।

বন্দনা বললে, অন্যায় করেছি বুঝি?

নিশ্চয়ই! ভুলে যাচ্ছো কেন একটা জঘন্য খুনের অপরাধে আজ আমার বিচার হতে চলেছে!

সে ত মিথ্যা—

না, না—বন্দনা, মিথ্যা নয়—সত্যিই জয়ন্তকে আমিই খুন করেছি—বললে সমীর।

সে কথা আদালতই বিচার করবে ডক্টর চৌধুরী, বরদাপ্রসন্ন বললেন, এবার আপনি আমাকে সে রাত্রের প্রকৃত ঘটনাটা বলুন ত! বন্দনা দেবী আমাকে আপনার হয়ে নিযুক্ত করেছেন—

আমাকে ক্ষমা করবেন—সত্য ঘটনা বলা মানেই আমার বোনকে আদালতে টেনে আনা—আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না—

এ আপনি কি বলছেন ডক্টর চৌধুরী—

আমার যা বলবার আমি বলেছি—

এর পরিণাম আপনি বুঝতে পারছেন!

কি আর হবে—ফাঁসি—এই ত—আর তা যদি নাই হয়—সাধারণের সমাজে আর ত আমার স্থান হবে না—চিরদিন দাগী হয়েই থাকতে হবে—তবে কেন আর নিজের মায়ের পেটের বোনের চরম দুঃখের কথাটা সবার সামনে উঁচু গলায় প্রকাশ করি! না, যা হবার তা হোক—সব কলঙ্ক সব দুঃখ আমারই থাক—সীতাকে আর আদালতে আমি টেনে আনতে চাই না—

বন্দনা ও বরদাপ্রসন্ন অনেক বোঝালেন সমীরকে কিন্তু সমীরের সেই এক কথা—সীতাকে সে কোনমতেই আদালতে টেনে আনতে পারবে না।

বন্দনা শেষে বললে, সমীর, একটু ভেবে দেখো—

আমি ভেবেই যা স্থির করবার স্থির করেছি বন্দনা।

॥ পনের ॥

যথাসময়ে আদালতে মামলা উঠল।

আদালতগৃহ সেদিন বলতে গেলে যেন ভেঙ্গে পড়েছে। শহরের এক প্রখ্যাত নামী চিকিৎসক

ডাঃ সমীর চৌধুরী আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়—হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামী।

জজ তাঁর আসনে সমাসীন—জুরিরাও যে যার আসনে সমাসীন।

আসামীর কাঠগড়ায় সমীর শান্ত—নির্লিপ্ত।

সরকার পক্ষের সুদক্ষ কৌন্সিলি প্রৌঢ় অমর বিশ্বাস সওয়াল করতে উঠলেন, মি লর্ড—আজকে যে হত্যা মামলার কথা আমি বলতে চলেছি তা সত্যিই বিচিত্র—হত্যাকারী—হ্যাঁ হত্যাকারী আজকের সমাজের এক অন্যতম সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার—তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি তাঁর প্রতিবেশী—শহরের প্রখ্যাত ধনী জনার্দন বোসের একমাত্র পুত্র জয়ন্ত বোসকে আজ থেকে এক বছর তিন মাস আগে ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে জনার্দন বোসেরই বিরামকুটির নীলকুঠিতে এক অঝোর বৃষ্টিঝরা রাত্রে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে এতদিন পলাতক থাকবার পর ধরা পড়েছেন।

সমস্ত আদালত স্তব্ধ।

অমর বিশ্বাস বলে চললেন, কিন্তু হত্যার কারণ কি? কেন এই নৃশংস হত্যা? আমরা জানতে পেরেছি জয়ন্তর সঙ্গে হত্যাকারী ডাঃ সমীর চৌধুরীর বোন সীতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে—

সমীর সহসা চিৎকার করে ওঠে, মিথ্যা কথা—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—জয়ন্ত বোস আমার বোনকে চিনতও না—

মিথ্যা যে নয় সে প্রমাণ অবশ্যই আদালতে পেশ করবো যথাসময়ে—

সমীর আবার বলে ওঠে, না, না হুজুর—কোন প্রমাণের দরকার নেই! আমি স্বীকার করছি জয়ন্ত বোসকে সে রাত্রে আমি হত্যা করেছি—তার সঙ্গে আমার প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল—আমি তাকে ঘৃণা করতাম—তাই—তাই তাকে সে রাত্রে আমি হত্যা করেছিলাম।

সমস্ত আদালত গৃহ যেন সমীরের ঐ উক্তিতে স্তব্ধ হয়ে যায়।

হাজার জোড়া চোখের দৃষ্টি যেন সমীরের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ে। তারপরই একটা মৃদু গুঞ্জনে আদালতকক্ষ যেন মুখরিত হয়ে উঠল।

জজ সাহেব স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, অর্ডার—অর্ডার। ডক্টর চৌধুরী, আপনার যা বলবার পরে বলবেন—আদালত অবশ্যই শুনবে—procced on মিঃ বিশ্বাস—

অমর বিশ্বাস আবার শুরু করলেন, হ্যাঁ—আমাদের হাতে প্রমাণ আছে যে আসামীর বোন সীতা চৌধুরীর মৃত জয়ন্ত বোসের সঙ্গে কেবল ঘনিষ্ঠতাই ছিল না উভয়ের মধ্যে প্রেমও ছিল—

সমীর আবার চিৎকার করে উঠল, Lie—lie—It is a downright lie—মিথ্যা—

জজ আবার সমীরকে থামিয়ে দিলেন—অমর বিশ্বাস আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন, জয়ন্ত বিবাহ করতে চেয়েছিল সীতাকে কিন্তু সমীর চৌধুরী তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে—আর তাতেই মনোমালিন্যের সৃষ্টি—আর সেই মনোমালিন্যের জন্যই ক্রোধের বশে সমীর চৌধুরী সে রাত্রে বেচারী জয়ন্ত বোস যখন তাদের ব্যারাকপুরের বিরামকুটিরে বিশ্রাম নিচ্ছিল সেখানে গিয়ে চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে—সেই হত্যার সাক্ষী বিরামকুটিরের কেয়ারটেকার নিতাইচন্দ্র—

অতঃপর নিতাইচন্দ্রকে ডাকা হলো—

সে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলে গেল, সে রাত্রে তার মনিব-পুত্র যখন বিরামকুটিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেই সময় গাড়িতে চেপে সমীর চৌধুরী সেখানে আসে—তারপর ঘরে গিয়ে ঢোকে যে ঘরে তার মনিব-পুত্র ছিলেন।

দুজনার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় তার বোনকে নিয়ে—সহসা একসময় পকেট থেকে পিস্তল বের করে সমীর চৌধুরী জয়ন্তবাবুর 'পরে গুলি চালায়—গুলি খেয়ে জয়ন্তবাবু পড়ে যান—তাঁর মৃত্যু হয়—সে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে থানায় খবর দেয়।

যাবার সময় সে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে যায়—কিন্তু সমীর চৌধুরী জানলার কাচ ভেঙে পালায়—দারোগাবাবু আর তাকে দেখতে পান না—

দ্বিতীয় সাক্ষী স্থানীয় দোকানদার ভবতারণ পাড়ুই—সে সাক্ষী দিল সমীর চৌধুরী তার দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে নীলকুঠি কোথায় জিজ্ঞাসা করেছিল—এবং সে সময় ভবতারণ তার হাতে পিস্তল দেখেছিল।

তৃতীয় সাক্ষী জয়ন্তর গাড়ির ড্রাইভার হরদয়াল। সে সাক্ষী দিল সমীর যখন গাড়িতে চেপে নীলকুঠিতে আসে সে তখন গাড়ির মধ্যে বৃষ্টির জন্য বসেছিল। সেও পিস্তলের আওয়াজ শুনেছে—

জানলার কাচ ভাঙ্গার আওয়াজ শুনেছে, পালাতেও দেখেছে সমীরকে অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে।

সেদিনকার মত অতঃপর বিচার মুলতুবী রইল। আদালত বন্ধ হলো। মামলার তারিখ আরো চারদিন পরে পড়ল।

বরদাপ্রসন্ন বাড়িতে তার কনসালটিং চেম্বারে বসে—আলোচনা চলছিল—শ্যামল, বন্দনা আর শংকর।

বরদাপ্রসন্ন বলছিলেন, ওরা কৌশলে সীতাকে নীলকুঠিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছে—সেইভাবেই সাক্ষী সব তৈরি করেছে—মামলা সাজিয়েছে—কিন্তু সীতার ব্যাপারটা এ মামলায় বিশেষ important—আমাদের সেই pointয়েই এগুতে হবে—কিন্তু সমীরবাবু যেরকম adament হয়ে আছেন। বন্দনা দেবী—

বলুন!

আপনি আর একবার সমীরবাবুর সঙ্গে দেখা করুন। তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করুন—

করবো—কিন্তু সে তার বোনকে যেরকম ভালবাসে—রাজী করান যাবে বলে আমার মনে হয় না।

কিন্তু এভাবে সীতা দেবীর ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে চেপে যাওয়া will be rather suiciding! মামলা আমাদের রীতিমত দুর্বল হয়ে যাবে—আচ্ছা শ্যামলবাবু—

বলুন! শ্যামল তাকাল বরদাপ্রসন্নর মুখের দিকে।

আপনার স্ত্রী সীতা দেবীকে একবার সমীরবাবুর সামনে নিয়ে গেলে কেমন হয়—হয়ত তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরে আসতেও পারে—

পারে কিনা জানি না, তবে বলছেন যখন একবার চেষ্টা করে দেখবো।

দ্বিপ্রহরে সেই দিন আহারাদির পর শ্যামল সীতাকে পাশে বসিয়ে তার সঙ্গে গল্প করছিল।

সীতা—

কিছু বলছিলে?

হ্যাঁ—তোমার দাদার সঙ্গে একবার দেখা করবে?

দাদা—

হ্যাঁ—বলছিলাম না সেদিন তোমার এক সহোদর ভাই আছেন যিনি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন—

সীতার চোখে মুখে কোন ভাববৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় না। সে যেন সংবাদটা শুনেও কেমন নির্লিপ্ত।

কি বলো একবার দেখা করবে?

না।

কেন?

আমার কেন যেন এখনো মনে পড়ছে না যে আমার এক দাদা আছেন—

আছে আছে, সত্যিই আছে।

তবে তিনি এতদিন আসেননি কেন? আমাদের বিয়ের সময়ও আসেননি কেন?

আসবেন কেমন করে—তিনি ত এখানে ছিলেন না—

তবে কোথায় ছিলেন?

অনেক দূরে—আচ্ছা সত্যিই তোমার দাদাকে একটুও মনে পড়ে না?

না।

শ্যামল উঠে গিয়ে সমীর আর সীতার একখানা ফটো যা সে শংকরের কাছ থেকে যোগাড় করেছিল দিন দুই আগে এনে সীতার সামনে ধরে বললে, দেখ—তোমার দাদা আর তুমি—

সীতা ফটোটা হাতে নিয়ে দেখল কিন্তু চোখে মুখে কোন আনন্দই প্রকাশ পায় না। কেমন যেন নির্লিপ্তভাবে ফটোটার দিকে চেয়ে থাকে।

পরের দিন আবার গেল বন্দনা জেলে সমীরের সঙ্গে দেখা করতে।

সমীর বললে, আবার তুমি কেন এলে বন্দনা—বুঝতে পারচো না কেন, এভাবে তোমার এখানে আসাটা ভাল নয়—

তুমি কেন সেদিন আদলতে ঐ কথা বললে? এভাবে কেন নিজেকে সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছো? ওরা একটা মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য কেন তা বুঝতে পারছো না—

উপায় নেই বন্দনা—উপায় নেই—একটা নিদারুণ আঘাত পেয়ে সে তার পূর্বস্মৃতি হারিয়েছে—আদালতে এলে হয়ত নতুন করে আর একটা আঘাত পাবে—তার চাইতে এই ত ভাল—সে আজ সুখী—পূর্বস্মৃতি যদি তার জীবনে নাও ফিরে আসে অন্তত এটুকু ত জেনে যাবো আমার সীতা সুখে আছে—শ্যামলের কাছে সে সুখেই আছে—

আর আমি—আমার কথা একবারও কি তোমার মনে পড়ছে না?

বন্দনা—

আমাকে বঞ্চিত করতে চাও তুমি কোন্ অধিকারে?

বন্দনার দু'চোখে জল ভরে আসে।

বন্দনা—

কি?

একটা কথা বলবো—মনে তুমি দুঃখ পাবে না ত?

কি কথা?

আমার কলঙ্ক—আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কেন তুমি নিজেকে জড়াচ্ছো এমন করে?

সমীর—

ভুলে যাও আমাকে তুমি—অন্য কাউকে বিয়ে করে—

আর কিছু বলবার আছে তোমার?

কেন তুমি বুঝতে পারছো না বন্দনা, আজ আমার পরিচয় তোমার কাছে শুধু দুঃখ আর লজ্জারই কারণ হবে—

আমি যাচ্ছি—

বন্দনা, রাগ করো না, শোন—

বন্দনা আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

॥ ষোল ॥

রাত্রের শোতে সেদিন শ্যামল সীতাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল।

দু'জনে অন্ধকারে পাশাপাশি বসে ছবি দেখছে—ছবির মাঝামাঝি জায়গায় ছিল একটি দৃশ্য—একটি মেয়েকে ভুলিয়ে এনে একটি ছেলে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে—মেয়েটি প্রাণপণে বাধা দিয়েও পারছে না—

হঠাৎ অন্ধকারে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল দর্শকদের মধ্যে থেকে, না, না, না—জয়ন্ত না—

দর্শকজন সচকিত হয়ে ওঠে—শ্যামল তাড়াতাড়ি সীতাকে ধরে ফেলে—কিন্তু সীতা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, ছাড় ছাড়—আমাকে যেতে দাও—দাদাভাই—

গোলমাল—হইচই কি হলো? কি ব্যাপার?

শো বন্ধ হয়ে গেল—প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে উঠল।

শ্যামল কিছুতেই সীতাকে ধরে রাখতে পারছে না—তখনও সীতা চেঁচাচ্ছে, আঃ ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—you brute—you dirty dog! Leave me leave me alone—

কামড়ে খিমচে শ্যামলকে সীতা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

কি? কি হয়েছে মশাই—

দর্শকরা ওদের ঘিরে ফেলে—

শ্যামলকে দর্শকরা এই মারে ত এই মারে—শ্যামল বহুকষ্টে উত্তেজিত দর্শকদের শান্ত করে বলে, শুনুন—শুনুন আপনারা—আমি একজন ডাক্তার—উনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী—ওঁর প্রচণ্ড একটা মানসিক আঘাতে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল—probably ছবির পর্দায় কিছু দেখে she has again come

back to her senses.

সীতা তখনো হাঁপাচ্ছে—

শ্যামল এবার সীতার দিকে তাকিয়ে বললে, সীতা, আমি জয়ন্ত নই—দেখো—আমি শ্যামল—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে—

সীতা বোধহয় শ্যামলকে চিনতে পারে—সে ধীরে ধীরে শান্ত হয় কিন্তু জ্ঞান হারায়—

শ্যামল তাকে বুকে করে নীচে নিয়ে এসে গাড়িতে তোলে।

গাড়ির মধ্যেই সীতার জ্ঞান আবার ফিরে আসে।

কিন্তু সে কেমন যেন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যায়।

বাড়িতে এসে ঘুমের ঔষধ দিয়ে সীতাকে শয্যায় শুইয়ে দেয় শ্যামল।

পরের দিন বেলা সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙ্গল সীতার। চোখ মেলে তাকাল। শ্যামল পাশেই একটা চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পড়ছিল।

সীতা—

সীতা তাকাল শ্যামলের দিকে।

কেমন আছো এখন?

সীতা কোন কথা বলে না।

শ্যামল এক কাপ কফি নিয়ে এলো, নাও এটা খাও—

সীতা জবাব দেয় না—সামনের আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ভেসে উঠছে সেই দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে।

এটা খাও—

তুমি আমাকে বিয়ে করেছো?

হ্যাঁ—

কিন্তু তুমি জান না—জান না—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সীতা, জয়ন্ত—জয়ন্ত আমার—

সীতার মাথাটা বুকের 'পরে টেনে নিয়ে শ্যামল তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, ওসব কথা ভুলে যাও সীতা—

ভুলে যাবো কেমন করে?

তোমার দাদাভাইয়ের কথা ভাবো।

দাদাভাই? কোথায়—কোথায় সে?

আছে—দেখা করবে তার সঙ্গে?

না—

কেন—কেন দেখা করবে না? তোমার দাদাভাইয়ের ইচ্ছাতেই ত তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। যাবে দাদাভাইকে দেখতে—

দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নাঝরা গলায় সীতা বলে, ছিঃ ছিঃ, না, না—

দাদাভাই তোমাকে ডেকেছে—

ডেকেছে?

হ্যাঁ—শোন—জয়ন্ত মারা গেছে—

মারা গেছে—

সবাই বলছে—

কি বলছে?

তোমার দাদাভাইই নাকি তাকে গুলি করে মেরেছে—তোমার প্রতি সেরাত্রে জয়ন্ত—

সে কি! দাদাভাই ত সেরাত্রে সেখানে ছিল না—

সীতা, আমরা জানি তোমার দাদাভাই জয়ন্তকে গুলি করে মারেনি—কিন্তু পাছে তোমার দুর্নাম হয় বলে তোমার দাদাভাই তোমায় আদালতে একেবারে চেপে গিয়েছে—সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছে টেনে—এখন একমাত্র তুমিই তাকে বাঁচাতে পারো—

আমি—

তুমি সব সত্য কথা আদালতে দাঁড়িয়ে বলবে—পারবে না—

পারবো—নিশ্চয়ই পারবো—

দাদাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

হ্যাঁ করবো—কিন্তু—

কি?

দাদাভাইয়ের কাছে এ মুখ দেখাবো কেমন করে?

আমি ত তোমার সঙ্গে থাকবো।

পরের দিন জেলে।

শ্যামলের সঙ্গে সীতাকে দেখে সমীর বলে উঠল, ওকে—ওকে কেন এখানে আনলে শ্যামল! ছিঃ ছিঃ—

দাদাভাই—সীতা ডেকে ওঠে।

চমকে ওর দিকে তাকায় সমীর—

ওর পূর্বস্মৃতি ফিরে এসেছে সমীর—শ্যামল বললে।

সত্যি—

দাদাভাই—এগিয়ে এলো গরাদের সামনে সীতা।

কি রে?

দাদাভাই—তুমি আমাকে এখনো বকছো না কেন?

বকবো—কেন রে?

আমি জয়ন্তকে চিনতে পারিনি—তার কথায় বিশ্বাস করে—

জানি—জানি—আমার বোন কি এমন ভুল করতে পারে—আয়—আমার কাছে আয়—

সীতা আরো সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে গভীর মমতায় সমীর বোনের মাথাটা চেপে ধরে, সীতা—লক্ষ্মী বোন আমার—সুখে থাক তুই—সুখে থাক—শ্যামল বড় ভাল ছেলে—যাও শ্যামল ওকে এবারে এখান থেকে নিয়ে যাও—

আমি আদালতে সব সত্য কথা বলবো—সীতা বললে।

না, না সীতা—অমন কাজও করিসনে বোন—

শ্যামলের দিকে ফিরে সীতা বললে, চল—

সমীর চেঁচিয়ে ওঠে, সীতা শোন—শোন—

কিন্তু সীতা দাঁড়াল না—

আদালতে বরদাপ্রসন্ন তাঁর ক্রস শুরু করলেন সাক্ষীদের। প্রথম সাক্ষী নিতাইচন্দ্র।

নিতাইচন্দ্র তোমার নাম?

আজ্ঞে—

তুমিই নীলকুঠির কেয়ারটেকার?

আজ্ঞে—

সে রাত্রে তুমি ছিলে ত?

ছিলাম হুজুর।

সে রাত্রে তোমার দাদাবাবু নীলকুঠিতে একা গিয়েছিলেন? সঙ্গে আর কেউ যায়নি?

না—একা।

মিথ্যে কথা। একটি মেয়ে সঙ্গে ছিল—সত্যি বল—আদালতে মিথ্যা বললে কি শাস্তি জান ত! জেল হয়ে যাবে—

আজ্ঞে—

সত্যি বল—একটি মেয়ে ছিল সঙ্গে এবং প্রায়ই তিনি মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করতে সেখানে যেতেন।

আজ্ঞে হুজুর—সে রাত্রেও একজন ছিল—

সেই মেয়েটিকে নিয়ে তোমার দাদাবাবু ঘরের দরজা ভিতর থেকে আটকে দেন—কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি চেঁচামেচি শুরু করে—বাঁচাও বাঁচাও দাদাভাই বলে—তুমি সে চিৎকার শুনেও ভিতরে যাওনি—

না—

মি লর্ড—সে রাত্রে ডাঃ চৌধুরীর বোনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল জয়ন্ত বোস—তারপর তার ইজ্জতহানির চেষ্টা করায় সে বাধা দেয়—এটা ঠিক সীতার সঙ্গে জয়ন্তর পরিচয় ছিল—কিন্তু সীতা জানত না জয়ন্ত কি চরিত্রের লোক—

অন্য পক্ষের অ্যাডভোকেট উঠে প্রতিবাদ জানালেন, Me Lord--it is an absolutely concocted story--

আদপেই তা নয়—বরদাপ্রসন্ন বললেন, প্রমাণ আমি দেবো—হুজুরের যদি অনুমতি হয় ত আমি আমার প্রধান সাক্ষী—এবং শুধু তাই নয় সে রাত্রের victimকে আদালতে সর্বসমক্ষে পেশ করতে পারি।

জজ অনুমতি দিলেন।

সীতা এসে দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

হুজুর, এই সেই মহিলা, ডাঃ সমীর চৌধুরীর একমাত্র সহোদরা বোন সীতা দেবী—বর্তমানে প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ শ্যামল রায়ের স্ত্রী—উনি নিজমুখেই ওঁর দুর্গতির কথা সকলের সামনে পেশ করবেন—

সমীর চিৎকার করে ওঠে, সীতা—না, না—

সীতা ফিরেও তাকাল না তার ভাইয়ের দিকে—সে তার কাহিনী শুরু করল—

জয়ন্তর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। প্রায়ই আমরা এখানে ওখানে বেড়াতে যেতাম—সে বলেছিল আমায় বিবাহ করবে—কিন্তু তখন বুঝিনি তার অন্য মতলব ছিল--he was a dirty creature!

ঘটনার দিন বিকেলের দিকে—college ছুটি হবার পর সীতা কলেজ থেকে বের হয়ে এসে গেটের সামনে দেখল জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সীতা—এসো—

কোথায়? সীতা মৃদু হেসে শুধায়।

চল না বেড়িয়ে আসি—

সীতা গাড়িতে উঠে বসল। সীতা তখনো জানতে পরেনি গাড়ির পিছনে আর একজন ঘাপটি মেরে বসেছিল—কপিল দত্ত।

গাড়ি শ্যামবাজার ছাড়িয়ে যখন বি. টি. রোড ধরেছে ব্রিজ পার হয়ে—সীতা জিজ্ঞাসা করল, এদিকে কোথায় চলেছো?

চল না দক্ষিণেশ্বর—

কিন্তু বাড়িতে শংকরদা ভাববে। তাছাড়া দাদাকেও কিছু বলা নেই—

আর কতক্ষণই বা। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে যাবে।

আকাশে মেঘ জমা হচ্ছিল।

সীতা বললে, কি রকম মেঘ করছে—

ভালই ত, জয়ন্ত বললে, বৃষ্টির মধ্যে driving ভারি প্লেজেন্ট ব্যাপার।

কিন্তু গাড়ি যখন দক্ষিণেশ্বরে যাবার রাস্তা বাঁয়ে না ঘুরে সোজা চলতে লাগল ডানলপ ব্রীজ পার হয়ে সীতা বলে, দক্ষিণেশ্বরে যাবে বলছিলে না—এদিকে কোথায় চলেছো।

চল না, একটা নতুন জায়গায় যাবো।

নতুন জায়গা?

হ্যাঁ—নীলকুঠিতে—

তোমাদের সেই বিরামকুটির—সে ত বলেছিলে ব্যারাকপুরে—

হ্যাঁ—সেখানেই—

না, না—please—আজ নয় অন্য একদিন—বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিতে দিতে জয়ন্ত বললে, কিছু দেরি হবে না—

না, ফেরো, দাদাভাই ভাববে—

ভাববে না—

এই জয়ন্ত কি হচ্ছে ফেরো—আজ যাবো না—

জয়ন্ত গাড়ির গতি তখন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে—

না, না—এই—সীতা জয়ন্তর স্টিয়ারিংয়ের উপরে রাখা হাতটা চেপে ধরে—এই জয়ন্ত—

Don't be silly সীতা—হলেই বা একটু রাত—কতদিন ত তুমি রাত করে ফেরো—

আজ শীলাকে সন্ধ্যায় চা খেতে বলেছি—সে হয়ত এতক্ষণ এসে বসে আছে—আজ নয়—লক্ষ্মীটি ফিরে চল—

ঠিক সেই সময়ই সীতার পিছন থেকে একটা রিভলভারের নল তার পিঠ স্পর্শ করে—ও চমকে ফিরে তাকায়, কে?

কপিল দত্ত বলে, চুপটি করে বসে থাক। চেঁচিয়েছো কি গুলি করবো—

সীতা যেন বোবা।

॥ সতের ॥

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমেছে চারিদিকে।

জয়ন্ত সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে আসে নীলকুঠিতে। নির্জন নীলকুঠি।

গাড়ি থামিয়ে জয়ন্ত বলে, নেমে এসো সীতা—

না—আমি নামবো না—

নেমে এসো—

কপিল পিছন থেকে একটা ধাক্কা দেয় সীতাকে, নাম নইলে গুলি চালাবো—

সীতা কি ভেবে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

তিনজন এসে ঘরো ঢুকল।

নিতাইচন্দ্র ছুটে আসে।

নিতাই—

দাদাবাবু—

বাইরেটায় নজর রাখবি—চল সীতা—

জয়ন্ত—

ভিতরে চল—

তিনজনে ভিতরে ঢোকে। সন্ধ্যা নেমেছে চারিদিকে তখন। জয়ন্ত সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালায়।

কপিল, পিস্তলটা দেখি—জয়ন্ত বললে।

কপিল পিস্তলটা দিয়ে দিল।

Now you go out of this room—

বেরিয়ে যাবো?

Yes! —জয়ন্ত বোস তার কোন কাজের সাক্ষী রাখে না—

জয়ন্ত—কি বলছো তুমি!

যা বলছি তাই করো—go out—

কপিলের চোখে আক্রোশ। তবু কপিল ফিরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত কপিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়—একটা চিৎকার করে ঘরের বাইরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কপিল।

নিতাই—

দাদাবাবু—

ওটা ওখানেই পড়ে থাক—যাবার সময় ওটার ব্যবস্থা করবো।

সীতা চেয়ে চেয়ে সব দেখছে। জয়ন্ত ঘরের দরজায় খিল তুলে দিল ভিতর থেকে—

জয়ন্ত আলমারি থেকে বোতল বের করে ঢক-ঢক করে খানিকটা নির্জলা মদই গলায় ঢেলে দেয়।

এসো সীতা—দূরে কেন!

সীতা নির্বাক। পাথর—

তোমার দাদাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তোমায় বিয়ে করবো—তা তিনি তাতে রাজী হলেন না। রাজী যখন হলেনই না তখন বিনা বিবাহেই আজ আমাদের বাসর রাত্রি—

সীতা নির্বাক।

কি হলো দাঁড়িয়ে কেন, এসো—

জয়ন্ত তুমি এত ইতর—

ইতর—হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে জয়ন্ত, তারপরই এগিয়ে আসে টলতে টলতে সীতার দিকে।

খবরদার বলছি এদিকে এগিয়ো না—

জড়িত গলায় জয়ন্ত বলে ওঠে, এগিয়ো না, না—না—না ওদিকে যেতে মানা সখি—

জয়ন্ত এগোয়—সীতা পিছু হাঁটে।

ধরতে গিয়েও ধরতে পারে না—চকিতে সীতা সরে যায়।

কত রঙ্গ আর দেখাবে সখি—

সীতা দরজার খিল খোলবার চেষ্টা করে—সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে জয়ন্ত সীতার উপরে, জাপটে ধরে তাকে—

ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

দু'জনে জাপটাজাপটি শুরু হয়। জয়ন্তকে কামড়ে খিমচে বাঘিনীর মতই যেন ফুঁসতে থাকে সীতা—

তবে রে হারামজাদী—জয়ন্ত সীতাকে জাপটে ধরে খাটের উপর নিয়ে ফেলল।

তার পরিধেয় শাড়ি আলগা হয়ে খুলে যায়—গায়ের জামা ছিঁড়ে যায়—চিৎকার করতে থাকে সীতা, বাঁচাও—বাঁচাও—দাদাভাই—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীতা আর পারে না, এলিয়ে পড়তে থাকে ক্রমশঃ।

তারপর—তারপর আর আমার কিছু মনে নেই—কিছু মনে নেই—সীতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সাক্ষীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

বরদাপ্রসন্ন বলেন—আসামী সীতা দেবীর দাদা সমীর চৌধুরী ততক্ষণে সেখানে পৌছে গিয়েছেন বোনের খোঁজে সংবাদ নিয়ে নিয়ে—এবং সে রাত্রে কি ঘটেছিল তার পরের ঘটনা বলবে আমার দ্বিতীয় সাক্ষী কপিল দত্ত—সে রাত্রে জয়ন্তর সে সঙ্গী ছিল।

কপিল দত্ত এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে—

কপিল দত্তের কোমরে ডান দিকে গুলি লেগেছিল—কিন্তু সে মৃত্যুর ভান করে পড়ে থাকে মাটিতে—জয়ন্তও ভাবে বুঝি কপিল মারাই গিয়েছে।

পাশের ঘরে ফোন আছে কপিল জানত। দরজা বন্ধ হতেই সে ঘেঁষটে ঘেঁষটে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং সমীরকে ফোন করে দেয়।

যন্ত্রণায় সে তখন অস্থির। রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যায়।

জ্ঞান ফেরে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে অনেকক্ষণ পরে। কপিল কোনমতে বাইরে আসে—বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যায়, দেখতে পায় সমীর গাড়ি থেকে নামছে—

সমীর দরজা বন্ধ দেখে অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও দরজা না খুলতে পেরে অন্যদিককার বারান্দায় ছুটে যায়।

ঘরের জানালায় কাচের সার্সী ছিল কিন্তু কোন গ্রিল বা রড ছিল না—সেই কাচের জানালাপথেই সমীর দেখতে পায় প্রায় চেতনাহীন সীতাকে রেপ করছে জয়ন্ত—

সমীর সেই সময় কাচের জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জয়ন্ত ও সমীরের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। জয়ন্ত গুলি করার চেষ্টা করে কিন্তু সমীর পিস্তলটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়।

ঐভাবে ধস্তাধস্তি করতে করতেই একসময় সমীরের হাতের রিভলভার থেকে গুলি বের হয়ে যায়। আমি তখনো জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে—কপিল দত্ত বলতে থাকে, জয়ন্তকে মাটিতে লুটিয়ে

পড়তে দেখেছি—সমীরকে আমি গুলি চালাতে দেখিনি—তবে কি করে যে গুলি ছুটল তাও বলতে পারি না—

তারপর? বরদাপ্রসন্ন প্রশ্ন করলেন।

তারপর আমি কোনমতে রক্তাক্ত অবস্থায় নীলকুঠি থেকে বের হয়ে আসি। একটা রিক্‌শা নিয়ে কোনমতে স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠি। সোদপুরে আমার বোনের বাড়ি— সেখানে যাই—তারাই আমার চিকিৎসা করায়। দীর্ঘ দুই মাস বাদে সুস্থ হলাম কিন্তু বাঁ পাটা অকর্মণ্য হয়ে গেল।

একটু থেমে আবার কপিল বলল, সংবাদপত্রে সমীরের বিচারের সংবাদ পড়ে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি কিন্তু সাহস হয় না আদালতে এসে সব কথা বলতে—কারণ আমিও যে জয়ন্তর সঙ্গী ছিলাম সে রাত্রে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম আদালতে এসে আমার সব কথা প্রকাশ করা উচিত, নচেৎ এক নির্দোষীর প্রাণদণ্ড হয়ে যাবে—তখুনি আমি বরদাবাবুর সঙ্গে দেখা করে সে রাত্রের সব কথা তাঁকে জানাই। হুজুর, আমিও দোষী—আমার যা শাস্তি প্রাপ্য আমি মাথা পেতেই নেবো—তবু একজন নির্দোষী যেন শাস্তি না পায়।

বরদাপ্রসন্ন তাঁর শেষ সওয়াল করতে উঠলেন।

মি লর্ড ও জেন্টলমেন অব দি জুরি, সেই দুর্যোগের রাত্রে সত্যি কি ঘটেছিল এবং কিভাবে জয়ন্ত বোসের মৃত্যু হয়েছিল সবই আপনারা শুনেছেন।

এক চরিত্রহীন লম্পট ধনীপুত্র কিভাবে একটি ভদ্র কুমারীর বিশ্বাস ও ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তার প্রতি চরম অত্যাচার করেছিল ব্যারাকপুরের নীলকুঠিতে নিয়ে গিয়ে তাও শুনেছেন—এবং যার ফলে সীতা দেবীর স্মৃতিভ্রংশ হয়।

এও শুনেছেন কিভাবে তাঁকে ডাঃ শ্যামল রায় ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলেন।

ডাঃ সমীর চৌধুরী জয়ন্ত বোসকে হত্যা করেননি—যদিও enough provocation there was during the struggle—সমীর ছিনিয়ে নেন জয়ন্তব হাত থেকে গুলিভরা পিস্তলটি এবং accidentally struggle-এর সময় গুলি ছুটে যায়—যে গুলি জয়ন্তকে বিদ্ধ করে তার মৃত্যু ঘটায়। সবটাই একটা accident ছাড়া আমি কিছু বলবো না, বলতে পারি না।

আশা করি আদালত সুবিচার করবেন।

জজ জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে ডাঃ সমীর চৌধুরীকে মুক্তি দিলেন সসম্মানে।

আদালত প্রাঙ্গণে সমীর এসে দাঁড়াতেই সীতা এসে তার গলা জড়িয়ে ধরল—

দাদাভাই—

অদূরে দাঁড়িয়ে বন্দনা—শান্তাপ্রসাদ—বাবুয়া—বরদাপ্রসন্ন—শংকর—শ্যামল রায়।

সকলেরই চোখে জল।

সুভদ্রা হরণ

এক এক সময় দেহে ও মনে কিরীটীর এমন একটা নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিত যখন সে হয়তো দিনের পর দিন তার বসবার ঘরটা থেকে বেরুতই না।

কেউ এলে দেখা পর্যন্ত করত না।

দেহ ও মনের ঐ নিষ্ক্রিয় ভাবটা কোন কোন সময় এক নাগাড়ে এক মাস দেড় মাস পর্যন্ত চলত।

ও যেন ঐ সময়টায় শামুকের মতই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখত।

বছর তিনেক আগেকার কথা—কিরীটীর সেই সময় ঠিক ঐ অবস্থা চলছিল।

সময়টা তখন গ্রীষ্মকাল।

একে শহরে প্যাচপ্যাচে বিশ্রী গরম—তার উপরে সারা শহর জুড়ে চলেছে সে সময় প্রচণ্ড এক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবাধ খুনোখুনি।

একে অন্যকে হত্যা করাটা যেন এক শ্রেণীর রাজনৈতিক আশ্রয়পুষ্ট বেপরোয়া কিশোর যুবকদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

কাউকে রিভলভারের গুলি চালিয়ে, কাউকে পাইপগান দিয়ে, কাউকে রাইফেলের গুলিতে, কাউকে ছোরা মেরে বা বোমার ঘায়ে কাউকে, যে যেমন পারছিল যেন এক নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল।

খবরের কাগজের পাতা খুললেই নিত্য ঐ ধরনের দু'চারটে মর্মন্তুদ হত্যা সংবাদ চোখে পড়বেই।

জনজীবনের সে যেন এক বীভৎস চিত্র—

কেবল কি তাই!

জনজীবন যেন সর্বদা আতংকিত—সন্ত্রস্ত।

মৃত্যু যেন সর্বত্র—সর্বক্ষণ ওৎপেতে আছে।

সকালে হয়তো বেরুল—

রাত ফুরিয়ে গেল আর ফিরলই না।

কাউকে হয়ত চলন্ত বাস থেকে নামিয়ে—দিনের আলোয় চারিদিকে মানুষজন, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে গেল সকলের চোখের সামনে।

রক্তাক্ত মৃতদেহটা তার রাস্তায়ই পড়ে রইল।

বাড়ির কেউ বের হলে না ফিরে আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তার শেস নেই।

সন্ধ্যার পর পরই যে যার বাড়িতে ফিরে যায়।

সহজ জীবনযাত্রাটাই যেন কেমন থমকে গিয়েছে।

কিরীটীর গড়িয়াহাট অঞ্চলটা কিন্তু কিছু শান্ত।

দ্বিপ্রহরে ঘরের মধ্যে বসে কিরীটী ও কৃষ্ণার মধ্যে সেই কথাই হচ্ছিল।

ভৃত্য জংলী এসে ঘরে ঢুকল—

এই জংলী চা কর—কিরীটী বললে।

চায়ের জল চাপিয়েছি—জংলী বললে, বাইরে একজন বাবু এসেছেন—

বলে দে দেখা হবে না।

কিরীটী কথাটা বলতেই জংলী বললে, বলেছিলাম, কিন্তু বাবু শুনছেন না—বলছেন ভীষণ জরুরী দরকার তার—

বলেছিস বুঝি আমি আছি বাড়িতে—

কিরীটী খিঁচিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ—

ভেংচে ওঠে কিরীটী, হ্যাঁ—তোকে না বলে দিয়েছি কেউ এলে বলবি বাবু বাড়িতে নেই—

কৃষ্ণা বলে, দেখই না কে? নিশ্চয়ই খুব বিপদ, নচেৎ এই প্রচণ্ড রৌদ্রে এই গরমে কেউ তোমার কাছে আসে—যা জংলী, বাবুকে এই ঘরেই পাঠিয়ে দে—

জংলী চলে গেল।

তার ওষ্ঠপ্রান্তে চপল হাসি।

মনে হল মনিব গৃহিণীর হুকুম পেয়ে সে যেন খুশিই হয়েছে।

খুশি হবার জংলীর কারণ আছে। কিরীটীর যখন ঐ ধরনের নিষ্ক্রিয়তা চলতে থাকে জংলীর ব্যাপারটা আদৌ ভাল লাগে না।

কেবল একা একা ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবে বাবু।

কারো সঙ্গে দেখা না, কথা পর্যন্ত না, এমন কি মাঈজীর সঙ্গেও কদাচিৎ এক আধটা কথার বেশী নয়।

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা চলে যাবার পরই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

সতর্ক জুতোর শব্দ।

দরজা ঠেলে আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী চোখ তুলে তাকাল আগন্তুকের দিকে।

লম্বা ঢ্যাঙা দড়ির মত পাকানো চেহারা।

পরনে দামী শান্তিপুরী ফাইন ধুতি ও গায়ে পাতলা আদ্দীর পাঞ্জাবি।

সারা গা থেকে ভুর ভুর করে একটা কড়া দিশী সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে।

গা যেন কেমন গুলিয়ে ওঠে।

হাতে একটা মোষের শিংয়ের লাঠি।

নমস্কার—আমার নাম হরিদাস সামন্ত—

কিরীটি নিরাসক্ত কণ্ঠে বললে, বসুন—

হরিদাস সামন্ত বসতে বসতে বললেন, আপনাকে এ সময় বিরক্ত করবার জন্য আমি সত্যিই খুব লজ্জিত, দুঃখিত রায় মশাই—কিন্তু নেহাত প্রাণের দায়ে—

কিরীটী দেখছিল আগন্তুকের চেহারা ও মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বেই হবে বলে মনে হয়।

রগের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে স্পষ্ট বোঝা যায়—কিন্তু কেশ বেশ সযত্নে ছাটা—মাঝখানে টেরি।

কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশ।

দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

লম্বাটে ধরনের মুখ।

চওড়া কপাল। কপালে রেখা স্পষ্ট।

কপালের রেখায়—চোখের কোণে—ভাঙা গালে যেন একটা অমিতাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

নাকটা সামান্য যেন ভোঁতা—ভাঙা গাল। ধারালো চিবুক।

চোখে সোনার দামী ফ্রেমের চশমা।

বড় বিপদে পড়েছি রায় মশাই—দেখুন আপনি হয়তো সব শুনে বলবেন পুলিসের কাছে গেলাম না কেন—গেলাম না কারণ তাদের দ্বারস্থ একবার হলে গোপনীয়তা বলে আর কিছু থাকে না। তাছাড়া অন্যপক্ষ যদি জানতে পারে যে, পুলিসের সাহায্য আমি নিচ্ছি তাহলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেই শেষ করে দেবে আমাকে—তাই বুঝলেন কিনা—

কথাগুলো বলতে বলতে হরিদাস সামন্ত পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিলেন।

দেখা গেল দু'হাতের আঙুলে গোটা চারেক আংটি। তার মধ্যে বোধহয় একটা রক্তমুখী নীলা মনে হলো কিরীটীর।

কিরীটী চেয়ে চেয়ে দেখছিল হরিদাস সামন্তকে।

মুখটা যেন চেনা চেনা, কবে কোথায় দেখেছে—ঝাপসা ঝাপসা মনে হচ্ছে।

মাপ করবেন হরিদাসবাবু, আপনাকে যেন আগে কোথাও দেখেছি—

দেখেছেন বইকি রায় মশাই—

দেখেছি—

হ্যাঁ—এককালে স্টেজে অভিনয় করতাম ত।

রঙমহল মঞ্চে—

হ্যাঁ—ছিলাম অনেক দিন—

উল্কা নাটকে আপনি অভিনয় করেছিলেন, তাই না!

হ্যাঁ—রাজীব ঘোষের ভূমিকায়, মনে আছে আপনার সে অভিনয়?

হ্যাঁ—মনে আছে বৈকি!

তা মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ—

কেন—মঞ্চে অভিনয় ছেড়ে দিলেন কেন?

আমাদের যুগ যে চলে গিয়েছে।

যুগ চলে গিয়েছে কি রকম?

তাছাড়া কি? আমরা তো এখন ডেড্—ফসিল—তবে ওই এ্যাকটিংয়ের নেশা জানেন তো কি ভয়ানক—তাই থিয়েটারের মঞ্চ ছেড়ে গিয়ে যোগ দিলাম যাত্রার দলে—

যাত্রার দলে?

হ্যাঁ, যাত্রা—তারপর, একদিন, পার্টনারশিপে আধা-আধি হিস্যায় নবকেতন যাত্রাপার্টি গড়ে তুললাম—

কতদিন হল যাত্রার দলে অভিনয় করছেন?

ত ধরুন বছর সাত আট তো হলই প্রায়—প্রথমটায় বছর দুয়েক এ দলে ও দলে গাওনা গেয়ে বেড়িয়েছি, তারপর দেখলাম—এ লাইনে বাঁচতে হলে নিজের দল গড়া ছাড়া উপায় নেই। তাই—

নিজের দল খুললেন?

হ্যাঁ—নবকেতন যাত্রা পার্টি—

নবকেতন যাত্রা পার্টি আপনি গড়েছিলেন?

ঠিক আমি একা নই। আমি আর রাধারমণ পাল মশাই—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বছর দুই বাদে শেয়ার বেচে দিয়ে পাল মশাইয়ের দলেই বর্তমানে চাকরি করছি—

জংলী ঐ সময় দু'কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

থিয়েটার অভিনয় ব্যাপারে কিরীটীর বরাবর একটা নেশা আছে।

নতুন নাটক কখনো কোন মঞ্চে সে বড় একটা বাদ দেয় না।

হরিদাস সামন্তর অভিনয় সে রঙ্গমঞ্চে বার দুই দেখেছে—সেও বছর সাত আট আগে—কিন্তু সে চেহারা নেই হরিদাস সামন্তর—সে চেহারা যেন শুকিয়ে গিয়েছে—তাহলেও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা চেনা মনে হয়েছিল সেই কারণেই।

নিন সামন্ত মশাই চা খান—

চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতে হরিদাস সামন্ত বললেন, আমার অভিনয় আপনি ত দেখেছেন রায় মশাই।

দেখেছি—

প্রথম যুগের অভিনয় হয়ত আমার দেখেননি?

দেখেছি—আপনার সিরাজদ্দৌলায়—সিরাজের পার্ট।

আর কিছু?

রত্নদীপে—সোনার হরিণ—

দেখেছেন—

হ্যাঁ—

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন হরিদাস সামন্তর বুক কাঁপিয়ে বের হয়ে এলো।

বললেন, হ্যাঁ—সে সময় হিরো থেকে ক্যারেকটার রোল পর্যন্ত করতাম—

আবার যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো সামন্তর।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আশ্চর্য—এখনো আপনার সে কথা মনে আছে? আপনি গুণী ব্যক্তি তাই অন্যের গুণের কথা আজো স্মরণ রেখেছেন। কেউ মনে রাখে না রায় মশাই—নটনটীদের কেউ মনে রাখে না। গিরীশচন্দ্র ঠিকই বলে গিয়েছেন— দেহপট সনে নট সকলই মিলায়—কথাগুলো বলতে বলতে হরিদাস সামন্তর চোখের কোণ দুটো সজল হয়ে ওঠে।

কিন্তু আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন তা ত কই এখনো বললেন না সামন্ত মশাই?

হ্যাঁ—বলব।

আর সেই জন্যই ত এসেছি—

রায় মশাই, আপনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের অদ্ভুত ক্ষমতার—শক্তির কথা আমি জানি—আর তাইতেই সর্বাগ্রে আপনার কথাই মনে হয়েছে—আমার সামনে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, তা থেকে মুক্ত যদি কেউ করতে পারে আমাকে একমাত্র আপনিই হয়ত পারবেন—

সামন্ত মশাই—জানি না আপনার কি ধরনের বিপদ উপস্থিত হয়েছে—তবে আমার যদি সাধ্যাতীত না হয়—আমার যথাসাধ্য আপনার আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবার চেষ্টা করব—

কিরীটীর বিরক্তির ভাবটা ততক্ষণে অনেকখানি কেটে গিয়েছে—বলতে কি সে যেন একটু কৌতূহলই বোধ করে—সামন্ত মশাইয়ের কথায়।

পারবেন রায় মশাই, কেউ যদি পারে তো একমাত্র আপনিই পারবেন—আপনাকে সব কথা খুলে না বললে গোড়া থেকে—আপনি বুঝতে পারবেন না। তাই গোড়া থেকেই বলছি—

॥ দুই ॥

হরিদাস সামন্ত অতঃপর বলতে শুরু করলেন তার কাহিনী।

থিয়েটারে নতুন নতুন সব ছেলেছোকরা অভিনেতাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাস সামন্তদের মত বয়স্ক অভিনেতাদের চাহিদা কমতে শুরু করেছিল।

তার অবিশ্যি আর একটা কারণও ছিল—নতুন অভিনেতারা সব নতুন ঢংয়ে অভিনয় করে যা আগের দিনের অভিনেতাদের সঙ্গে আদৌ মেলে না।

পাবলিকও চায় নতুন অভিনয় আজকাল।

অবিশ্যি হরিদাস সামন্তর ডিমাণ্ড কমে যাওয়ার আরো একটা কারণ ছিল—অতিরিক্ত মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারে শরীরটা যেন কেমন তার ভেঙে শুকিয়ে গিয়েছিল—বয়সের আন্দাজে বেশ বুড়োই মনে হত তাকে।

বয়সের জন্যই তাকে হিরোর রোল থেকে আগেই সরে আসতে হয়েছিল—শেষে ক্যারেকটার রোল থেকেও ক্রমশঃ তাকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল।

এবং শেষ পর্যন্ত একদিন যখন হরিদাস সামন্ত বুঝতে পারলেন মঞ্চের প্রয়োজন তার জন্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে—এবং হয়তো শীঘ্রই একদিন নোটিস পেতে হবে—হরিদাস সামন্ত নিজেই স্টেজ থেকে সরে গেলেন।

একটা সুযোগও তখন এসে গিয়েছিল—

নিউ অপেরা যাত্রাপার্টি থেকে তার ডাক এলো—মাইনাটাও মোটা রকমের। হরিদাস সামন্ত সঙ্গে সঙ্গে আগত লক্ষ্মীকে সাদরে বরণ করে নিলেন।

ঐ সময়টায় যাত্রার দলগুলো আবার নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল।

মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তারা দলে মোটা মাইনে দিয়ে টানতে শুরু করছিল।

অনেকে সেজন্য যাত্রার দলে নামও লেখাতে শুরু করেছিল।

সেইখানেই অভিনেত্রী সুভদ্রার সঙ্গে পরিচয়।

অভিনেত্রী বললে ভুল হবে কারণ সুভদ্রা তখন মাত্র মাস আষ্টেক হবে ঐ যাত্রার দলে যোগ দিয়েছে। নয়া রিক্রুট।

রেফিউজী কলোনীর মেয়ে—ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশুনা। সুভদ্রার বয়স তখন ২০।২১-এর বেশী নয়।

পাতলা দোহারা, গায়ের বর্ণ শ্যাম—কিন্তু চোখ-মুখের ও দেহের গড়নটি ভারি চমৎকার। যৌবন যেন সারা দেহে উপচে পড়ছে।

ওকে দেখে ও ওর ভাবভঙ্গি দেখে ঝানু অভিনেতা হরিদাস সামন্ত বুঝতে পেরেছিলেন—মেয়েটির মধ্যে পার্টস আছে—তালিম ঠিকমত দিয়ে খেটে খুটে তৈরী করতে পারলে মেয়েটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দলের প্রোপাইটার রাধারমণ পাল মশাইকে কথাটা বললেন হরিদাস সামন্ত।

পাল মশাই বললেন, বেশ ত—দেখুন না চেষ্টা করে—সামন্ত মশাই—

তাহলে ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন—আমি তৈরী করে দেব—

বেশ—করুন—

একটা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন হরিদাস সামন্ত এবং তার অনুমান যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল।

সুভদ্রার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তার অভিনয়ের দ্যুতি ঝিলমিল করে উঠল।

অভিনয়ের তালিম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার যে তলে তলে ঘটে যাচ্ছিল সেটা আর কেউ দলের না বুঝলেও রাধারমণ পাল মশাই সেটা বুঝতে পারছিলেন—কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি।

কারণ যাত্রার দলে ঐ ধরনের ব্যাপার ঘটেই থাকে।

এক একজন অভিনেতার সঙ্গে এক একজন অভিনেত্রী কেমন যেন জোট বেঁধে যায়।

ক্রমশঃ হরিদাস তাঁর বাড়িঘরের সঙ্গে সম্পর্কই প্রায় তুলে দিলেন।

বাড়িতে স্ত্রী চিররুগ্না—

দুটি ছেলে—বড়টি ২৩।২৪ বৎসরের, একটি ফ্যাক্টরিতে মেকানিক—সুশান্ত। ২০।২১ বৎসরের ছোটটি প্রশান্ত—পাড়ায় মস্তানী করে বেড়ায়।

প্রৌঢ় বয়সে কোন পুরুষের চোখে যদি কোন নারী পড়ে তখন তার সাধারণ লাজলজ্জার বালাইটাও বোধহয় থাকে না।

প্রৌঢ় হরিদাসেরও সুভদ্রার প্রতি নেশাটা যেন তাঁকে একেবারে বেপরোয়া করে তুলেছিল। যাত্রার দলে তিনি বেশ ভাল মাইনাই পেতেন এবং প্রোপ্রাইটার পাল মশাইয়েরও বোধহয় হরিদাসের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল—সেই কারণেই হরিদাস সুভদ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন।

হরিদাস নেবুতলায় একটা বাসা ভাড়া নিলেন, সুভদ্রা তাঁর সঙ্গে সেখানেই থাকতে লাগল।

ক্রমশঃ দলের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

কেউ কেউ আড়ালে মুখ টিপে হেসেছিল প্রৌঢ় হরিদাস ও যুবতী শুভদ্রার ব্যাপার স্যাপার দেখে।

বছর দুয়েক হরিদাসের বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

তারপরই হরিদাস সামন্তর ভাগ্যাকাশে যেন ধূমকেতুর উদয় হল।

তরুণ অভিনেতা বছর ছাব্বিশ হবে বয়েস শ্যামলকুমার এসে দলে যোগ দিল।

শ্যামলকুমার দেখতে শুনতেও যেমন চমৎকার তেমনি কণ্ঠস্বরটিও ভরাট ও মাধুর্যপূর্ণ—

অভিনয়েও পটু।

পাল মশাই শ্যামলকুমারকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন লুফে নিলেন।

কিছুদিন পরে নতুন বই খোলা হল, শ্যামলকুমার নায়ক—সুভদ্রা নায়িকা।

পালা দারুণ জমে গেল।

শ্যামলকুমার আসার কিছু আগে থাকতেই হরিদাস আর নায়কের রোল করতেন না।

ক্যারেক্টার রোলগুলো করতেন।

দলের অন্য একটি ছেলে নায়কের রোল করত—

শ্যামলকুমারের কিন্তু দলে এসেই সুভদ্রার প্রতি নজর পড়েছিল। সুভদ্রার যৌবন তাকে আকৃষ্ট করেছিল—

এবং দেখা গেল সুভদ্রাও পিছিয়ে নেই।

যোগাযোগটা স্বাভাবিক।

হরিদাস সামন্ত তখনো কিছু বুঝতে পারেননি।

বুঝতে পারেননি যে, সুভদ্রার মনটা ধীর ধীরে শ্যামলকুমারের দিকে ঝুঁকছে।

বুঝতে যখন পারলেন তখন নাটক অনেকখানি গড়িয়ে গিয়েছে।

স্ত্রী সুধাময়ীর অসুখটা হঠাৎ বাড়াবাড়ি হওয়ায় হরিদাস সামন্ত ক'টা দিন নেবুতলার বাসায় যেতে পারেননি—তারপর স্ত্রী মারা গেল।

শ্রাদ্ধ—শান্তি চুকবার পর এক রাত্রে আটটা নাগাদ হরিদাস নেবুতলার বাসায় গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন।

ভিতর থেকে একটু পরে সুভদ্রার সাড়া এলো, কে?

আমি হরিদাস—দরজা খোল—

আজ আমার শরীরটা ভাল নেই—তুমি বাড়ি যাও—কাল এসো—

তা দরজাটা খুলছ না কেন? দরজাটা খোল—

বলছি তো শরীর খারাপ—

জবাব এলো সুভদ্রার ভিতর থেকে।

হরিদাসের মনে কেমন সন্দেহ জাগে—ইদানীং কিছুদিন ধরে সুভদ্রার ব্যবহারটাও যেন কেমন ঠেকছিল—তাই তিনি বললেন, দরজা খোল সুভদ্রা—

দরজা অতঃপর খুলে গেল—কিন্তু খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা নয়—শ্যামলকুমার—

কয়েকটা মুহূর্তে হরিদাসের বাঙ্ নিষ্পত্তি হয় না।

তিনি যেন বোবা। পাথর।

শ্যামলকুমার পাশ কাটিয়ে বেরুবার উপক্রম করতেই হরিদাস সামন্ত বললেন, দাঁড়াও শ্যামল—

শ্যামলকুমার দাঁড়াল।

তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছিলে?

কেন বলুন ত?

শ্যামলকুমারের গলার স্বরটা যেন ধক্ করে হরিদাসের কানে বাজে।

এটা আমার বাসাবাড়ি জান?

জানি বইকি—আর কিছু আপনার বলবার আছে?

তোমার এতদূর স্পর্ধা!

সামন্ত মশাই ভুলে যাবেন না—আমি আপনার মাইনা করা ভৃত্য নই। কথাটা বলেই আর শ্যামলকুমার দাঁড়াল না, একপ্রকার যেন হরিদাসকে ধাক্কা দিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল সুভদ্রা। শ্যামলকুমারের ঠিক পিছনেই।

হরিদাস সামন্ত এবার ডাকলেন সুভদ্রা—

কি?

সুভদ্রা অন্ধকার থেকে এগিয়ে এলো হরিদাসের সামনে।

এ সবের মানে কি?

মানে আবার কি, দেখতেই ত পাচ্ছ—সুভদ্রার স্পষ্ট জবাব, বলায় কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই।

লজ্জা বা কোন অনুতাপের লেশমাত্রও নেই যেন।

তাহলে যা কানাঘুষায় শুনছিলাম তা মিথ্যা নয়!

মাঝ রাত্রে চেঁচিয়ো না—

কি বললি হারামজাদী, চেঁচাব না—একশবার চেঁচাব—হাজারবার চেঁচাব—আমারই ভাড়াবাড়িতে বসে আমরই খাবি—আমারই পরবি—

কিন্তু হরিদাস সামন্তকে কথাটা শেষ করতে দিল না সুভদ্রা, বললে, আমি তোমার বিয়ে করা সাতপাকের ইস্তিরী নই হরিদাসবাবু—অত চোখ রাঙারাঙি কিসের—

কি হল হরিদাসের—দপ্ করে যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল।

বাঘের মতই সুভদ্রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি সুভদ্রাকে কিল চড় ঘুষি লাথি চালাতে লাগলেন হরিদাস।

সুভদ্রা মাটিতে পড়ে কঁকিয়ে কাঁদতে লাগল।

হরিদাস সামন্ত ঐ পর্যন্ত বলে থামলেন।

তারপর? কিরীটী জিজ্ঞাসা করলে।

পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলে তারপর—বললেন হরিদাস সামন্ত।

তাহলে বলুন ব্যাপারটা মিটে গেল?

মিটল আর কোথায় রায় মশাই, আমিও ভেবেছিলাম বুঝি প্রথমটায় মিটে গেল—কিন্তু—তারপর দিন পনেরো না যেতেই বুঝলাম—

কি বুঝলেন?

সুভদ্রা বাইরে শান্ত ও চুপ করে থাকলেও গোপনে ওদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়নি—আবার একদিন ধরা পড়েও গেল—আবার ধোলাই দিলাম।

আবার মারধোর করলেন?

করবো না—কি বলচেন আপনি রায় মশাই—এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা—কিন্তু তারপরই যেন সমস্ত ব্যাপারটা অন্যদিকে বইতে শুরু করল।

কি রকম?

বুঝলাম ওরা দু'জনে তলে তলে আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর—কিন্তু মুখে অন্য রকম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ!

তারপর একটু থেমে হরিদাস সামন্ত বললেন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি—শ্যামলকুমার যে নাটক লিখতে জানে জানতাম না। হঠাৎ একদিন ঐ ঘটনার দিন পনেরো পরে পাল মশাই আমাকে ডেকে বললেন—

সামন্ত মশাই—একটা চমৎকার পালা হাতে এসেছে।

তাই নাকি? জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ—নতুন লেখক—আর কে জানেন?

কে?

আমাদেরই দলের একজনের লেখা।

কার লেখা? কে আবার আমাদের দলের নাটক লিখল?

বলুন ত কে? অনুমান করুন ত?

না মশাই পারলাম না।

পারলেন না ত—শ্যামলকুমার—।

বলেন কি?

হ্যাঁ, ছেলেটার মধ্যে সত্যিই একটা পার্টস আছে—পালাটা সত্যি চমৎকার হয়েছে—পালায় এক কামুক প্রৌঢ়ের পার্টটা দারুণ—ঠিক করেছি সেই প্রৌঢ়ের রোলটাই আপনি করবেন—নায়িকা করবে সুভদ্রা আর নায়ক শ্যামলকুমার, কাল থেকেই রিহার্শেল শুরু করচি। —গল্পটা মোটামুটি হচ্ছে ঐ প্রৌঢ়র কাছেই থাকত সুভদ্রা। পরে সেখানে এলো গল্পের নায়ক জ্যোতির্ময় বলে ছোকরাটি—তারপর আসল ও সত্যিকারের নাটকের শুরু—

একেবারে জমজমাট—আপনি—শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা যদি ঐ তিনটে রোল নেন ত দেখতে হবে না—একেবারে বাজী মাত।

তারপর? কিরীটী শুধাল।

আমি কি তখন জানি আসল নাটকে বিষয়বস্তুটা কি এবং কতখানি। বললাম—বেশ ত—নাটকটা যদি ভাল হয়—

ভাল কি বলচেন মশাই, একেবারে সত্যিকারের একখানি নাটক—এখন বলুন কাল থেকে রিহার্শেল শুরু করবেন ত! সামনের রথ-যাত্রার দিন থেকেই মহলা শুরু করা যাক। কি বলেন?

বেশ ত—

হরিদাস সামন্ত বলতে লাগলেন, নাটকের মহলা শুরু হল—নাটকের নাম কি জানেন রায় মশাই?

কি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

সুভদ্র-হরণ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ—সামাজিক পালার ঐ ধরনের নাম কখনো শুনেছেন? তার চাইতেই বড় কথা কি জানেন রায় মশাই?

কি?

নাটকের বিষয়বস্তু অবিকল আমার ও সুভদ্রার মধ্যে যেমন—শ্যামলকুমারের আবির্ভাব ঠিক তেমনি—তবে অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে।

কি রকম?

রাখালকে করা হয়েছে নাটকে সুভদ্রার পালিত বাপ—যে বাপ শেষ পর্যন্ত মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল—ভাবতে পারেন কি জঘন্য মনোবৃত্তি। পাল মশাইকে আমি বলেছিলাম ঐ ধরনের বিশ্রী ব্যাপার পালায় আদৌ থাকা উচিত নয়। কিন্তু পাল মশাই হেসেই উড়িয়ে দিলেন আমার কথাটা। বললেন—আধুনিকতা আছে ব্যাপারটার মধ্যে—

নাটকের শেষ কি?

নাটকের শেষ দৃশ্য রাখাল বিষপান করবে—ঘৃণায়—অপমানে। কাল বাদে পরশু সেই পালার প্রথম অভিনয় রজনী—চন্দননগরে।

তা এ ব্যাপারে আপনার দিক থেকে বিপদের বা আশঙ্কার কি আছে?

রায় মশাই আমি বুঝতে পারছি—

কি?

ওরা আমাকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই হত্যা করবার মতলব করছে।

হত্যা করবে? বলেন কি? কিরীটী বললে।

হ্যাঁ—কেন যেন, আমার মনে হচ্ছে, ঐ যে নাটকের মধ্যে বিষপ্রয়োগের ব্যাপারটা আছে—আমার কেন যেন মনে হচ্ছে—ঠিক ঐ থেকেই সত্যি সত্যিই আমাকে ওরা হত্যা করার—

না, না—তা কখনো সম্ভব?

সম্ভব। ওদের পক্ষে সবই এখন সম্ভব—ওরা মরীয়া হয়ে উঠেছে—

তা এতই যদি আপনার ভয় দল ছেড়ে দিন না।

ছাড়তে চাইলেও ছাড়া পাব না কারণ বেশ কিছু টাকা ধারি পাল মশাইয়ের কাছে, আমি। অথচ পুলিসকে একথা বললে তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি রায় মশাই—আমাকে আপনি বাঁচান—

কিরীটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—তারপর বললে, সুভদ্রার মনোভাব এখন আপনার প্রতি কেমন? সে এখনো আপনার সঙ্গেই আছে ত?

তা আছে। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তলে তলে ও ছুরি শানাচ্ছে—

সামন্ত মশাই—কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা বলব?

কি বলুন?

সুভদ্রাকে আপনি ছেড়ে দিন না—

সুভদ্রাকে ছাড়াও যা মৃত্যুবরণ করাও তা। তা যদি পারতাম তবে আর আপনার শরণাপন্ন হব কেন?

কথাগুলো বলতে বলতে সামন্ত পকেট থেকে দশ টাকার দশখানা নোট বের করে এগিয়ে ধরলেন—গরীব অভিনেতা আমি রায় মশাই, আপনার যোগ্য পারিশ্রমিক দেবার সাধ্য বা ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই—আপাততঃ এটা—

টাকা থাক সামন্ত মশাই—কারণ আমি নিজেই এখনো বুঝতে পারছি না কি ভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি—আচ্ছা পরশু ত চন্দননগরে আপনাদের অভিনয়—

হ্যাঁ—প্রথম গাওনা—

আমি যাব—আপনাদের গ্রীনরুমের আশে-পাশেই থাকব, তবে—

তবে?

আমাকে হয়ত চিনে ফেলবে শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা—তাই ভাবছি—

বলুন!

এক প্রৌঢ়ের ছদ্মবেশে—আপনার বন্ধুর পরিচয়ে যাব।

বেশ। খুব ভাল প্রস্তাব—

তাহলে সেই কথাই রইল—আমার নাম বলবেন ধূর্জটি রায়—এককালে অভিনয় করতাম, আপনার পুরাতন বন্ধু।

ঠিক আছে, তাই হবে।

অতঃপর হরিদাস সামন্ত বিদায় নিলেন।

॥ তিন ॥

হরিদাস সামন্ত বিদায় নেবার পরই কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল।

কেন এসেছিলেন গো ভদ্রলোক?

লোকটা কে জান কৃষ্ণা?

না—

এককালে মঞ্চের নামকরা অভিনেতা ছিল, এখন যাত্রার দলে অভিনয় করে। বয়েস হয়েছে, বোধকরি তিপান্ন চুয়ান্ন হবে—

তা কি চান উনি তোমার কাছে?

কিরীটী সংক্ষেপে হরিদাস-বৃত্তান্ত কৃষ্ণাকে শোনাল।

কৃষ্ণা সব শুনে বললে, বুড়োর এখনও এত রস!

বুড়ো বয়সেই ত রসাধিক্য হয়—বুঝতে পারছো না আমাকে দিয়ে—

তা কিছু কিছু বুঝতে পারছি বৈকি—

অতএব হে নারী সতর্ক হইয়ো--

বয়ে গেছে আমার—

বটে, এত সাহস—

যাও না—একবার দেখ না চেষ্টা করে---

পাচ্ছি না যে!

ওহো কি দুঃখ রে—

দুজনেই হেসে ওঠে।

কিরীটী হরিদাস সামন্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই স্থির করেছিল---যাত্রার দলের মানুষগুলো যারা হরিদাস সামন্তর জীবনে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী—বিশেষ করে শ্যামলকুমার ও সুভদ্রা—তাদের সে দেখবে। ওদের অফিসে গিয়েও পরিচয় হতে পারে কিন্তু একজন উটকোলোক দেখলে—বিশেষ করে কোনক্রমে যদি তারা পরিচয় জানতে পারে তারা---তারা হয়ত কিছুটা সচেতন হয়ে যেতে পারে—তাই সে মনে মনে স্থির করে যাত্রার আসরে গিয়ে—যাত্রাও দেখা হবে---লোকগুলোকে দেখাও হবে। চাইকি পরিচয়ও হতে পারে।

এবং তাতে করে হয়ত তাদের মনের খবরাখবরও কিছুটা আঁচ করাও যেতে পারে। সেই ভেবেই চন্দননগরে যেদিন পালা গান সেদিন সেখানে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

চন্দননগর শহরে এক বনেদী ধনীগৃহের বিরাট নাটমঞ্চে যাত্রার আসর বসেছে।

আর সে যুগ নেই---এখন কৃষ্টির অন্যতম ধারক ও বাহক যাত্রা পালা। আজকাল টিকিট কেটে যাত্রা-গান হয়।

শ্রোতাও হয় প্রচুর।

তাছাড়া নবকেতন যাত্রা পার্টির নাম খুব ছড়িয়েছিল ঐ সময়।

বিশেষ করে তাদের অভিনেতা-অভিনেত্রী শ্যামলকুমার ও সুভদ্রার জুটির জন্য।

পালা শুরু হবে রাত আটটায়।

কিরীটী সন্ধ্যার মুখোমুখিই গিয়ে চন্দননগব স্টেশনে নামল ট্রেন থেকে।

গ্রীষ্মকাল।

কিন্তু শহরের প্যাচপ্যাচে গরম এদিকটায় নেই যেন।

কিরীটীর চেহারা ও বেশভূষা দেখে তাকে কারো চিনবার উপায় ছিল না।

মাথার মাঝখানে টেরি।

অনেকটা সেকেলে কলকাতা শহরের বনেদী লোকেদের মত বেশভূষা।

পরনে শান্তিপুরের মিহি ধুতি— গায়ে গিলে করা আদ্দীর পাঞ্জাবী চোখে চশমা—পুরুষ্ট এক জোড় গোঁফ মোম দেওয়া।

গলায় একটি পাকানো চাদর—গিঁট দেওয়া।

পায়ে চকচকে পাম্পসু।

হাতে বাহারে ছড়ি।

এককালে ঐ ধরনের বাবুদের কলকাতা শহরে প্রায়ই দেখা যেত।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা সাইকেল রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই কিরীটী জানতে পারল—যাত্রার আসর কোথায় বসেছে।

রিক্সাওয়ালা শুধায়—যাত্রা দেখবেন বাবু?

কিরীটী হেসে বলে, আমার এক বন্ধু ঐ দলে অভিনয় করে—শ্রীরামপুরে থাকি—অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি—তার সঙ্গেও দেখা হবে—যাত্রাও দেখা হবে ঐ সঙ্গে।

উঠুন বাবু পৌঁছে দিচ্ছি—এক টাকা ভাড়া লাগবে।

তাই পাবে চল—

ওঠুন—

কিরীটী উঠে বসল সাইকেল রিক্সায়, রিক্সাওয়ালা একটা হিন্দী ফিল্মের গান গুন গুন করে গাইতে গাইতে রিক্সা চালাতে লাগল।

মিনিট পনেরো লাগল গানের আসরে পৌঁছতে।

মস্তবড় সেকেলে পুরাতন জমিদার বাড়ি।

বিরাট নাটমঞ্চ।

চারিদিক ঘিরে সেখানে আসরের ব্যবস্থা হয়েছে।

গেটের সামনে সাইকেল রিক্সা থেকে নেমে কিরীটী রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরের দিকে এগুল।

অল্পবয়সী যাত্রার দলের একটি ছোকরা গেটের সামনে বসে ছিল—শ্রোতাদের আসা তখনো ভাল করে শুরু হয়নি।

কিরীটী সেই ছেলেটিকেই শুধাল, হরিদাস সামন্ত মশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?

এখন তো তিনি গ্রীনরুমে আছেন—

তা জানি। তাকে যদি একটা খবর দেন—বলবেন তার অনেককালের বন্ধু ধূর্জটি রায় তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

আসুন আমার সঙ্গে—তারপর আবার কি ভেবে ছেলেটি অন্য একটি তরুণকে ডেকে বললে—ওরে সুবল—এই বাবুটিকে সামন্ত মশায়ের কাছে নিয়ে যা—

সুবল একবার কিরীটীর আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে, চলুন।

বিরাট নাটমঞ্চে কতকগুলো পাশাপাশি টিনের পার্টিশন তুলে ছোট ছোট ঘরের মত করে সাজঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তারই একটার সামনে এসে সুবল বললে, যান ভিতরে—সামন্তদা এই ঘরেই আছেন—

কিরীটী ভিতরে প্রবেশ করল।

কিন্তু ভিতরে পা ফেলেই থমকে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে হরিদাস সামন্ত ও একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবতী।

উভয়েই পিছন ফিরে ছিল বলে কিরীটীকে ওরা দেখতে পায় না।

মেয়েটির সারা দেহে যৌবন টলমল করছে।

মেয়েটি বিশেষ লম্বা নয়—বরং একটু বেঁটেরই দিকে—কিন্তু ছিপছিপে গড়নের জন্য বেমানান দেখায় না।

পরনে একটা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি—একামাথা চুল, এলো খোঁপা করা। খোঁপাটা পিঠের উপর

যেন ঝুলছে।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে—সামন্ত মশাইও দাঁড়িয়ে।

তার পরনে একটা লুঙ্গি ও গায়ে আদ্দীর পাঞ্জাবী।

ওদের কথাবার্তা কিরীটীর কানে আসে।

কেন ডাকছ কেন? মেয়েটি বলল।

সুভদ্রা —আজ পালা শেষ হলেই আমরা বের হয়ে পড়ব—হরিদাস সামন্ত বললেন।

না—আমি কাল ভোর রাত্রের ট্রেনে বর্ধমান যাব—সুভদ্রা বললে।

বর্ধমান, বর্ধমান কেন?

সবই তোমাকে বলতে হবে নাকি? সুভদ্রার কণ্ঠে যেন বিদ্রোহের সুর।

তা বলতে হবে না—সঙ্গে বোধহয় শ্যামলকুমার চলেছে?

চলেছে কি না চলেছে যাওয়ার সময়ই দেখতে পাবে।

সুভদ্রা, তুমি ভাবো, আমি কিছুই বুঝি না!

কি বুঝেছ শুনি?

সেদিনকার পিটুনির কথা নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি?

শোন—তোমাকেও আমি স্পষ্ট করে আজ বলে দিচ্ছি—তোমার নেবুতলার বাসায় আর আমি যাব না।

উঃ! তলে তলে তাহলে বাসাও ঠিক হয়ে গিয়েছে?

সুভদ্রা কোন জবাব দিল না, যাবার জন্যই বোধ করি ঘুরে দাঁড়াল—আর দাঁড়াতেই কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

কে আপনি?

হরিদাস সামন্তরও দৃষ্টি ইতিমধ্যে পড়েছিল কিরীটীর উপরে।

কি হে সামন্ত—চিনতে পার—

কে?

ধূর্জটি—আমি ধূর্জটি রায় হে—

ধূর্জটি!

চিনতে পারছো না—সেই যে—

হরিদাস সামন্ত প্রথমটায় সত্যিই কিরীটীকে চিনতে পারেননি—কিন্তু কিরীটী চোখ টিপে ইশারা করায় দু'দিন আগেকার সব কথা তার মনে পড়ে যায়—বলে ওঠে—ও—হাঁ—হ্যাঁ—ধূর্জটি—কোথা থেকে হে?

শুনলাম তুমি পালা গান গাইতে এসেছ—তাই ভাবলাম অনেক কাল দেখা সাক্ষাৎ নেই, দেখা করে যাই—

হ্যাঁ—হ্যা—এবার চিনেছি—উঃ, কতদিন পরে দেখা! তা—বেশ—বেশ করেছ—

আজ তোমাদের পালা ত সুভদ্রা-হরণ?

কথাটা বলে আড়চোখে একবার কিরীটী সুভদ্রার দিকে তাকাল।

হ্যাঁ—

উনিও বুঝি তোমাদের দলে অভিনয় করেন?

হ্যাঁ—এই ত নায়িকা সাজে—ওর নাম সুভদ্রা মণ্ডল।

নমস্কার—কিরীটী হাত তুলে নমস্কার করে।

সুভদ্রাও প্রতিনমস্কার জানায়।

কিরীটী বললে, পালার নামটির সঙ্গে আপনার নামটিও ত বেশ মিল করাই—পালাটা কে লিখেছে হে সামন্ত? পৌরাণিক?

না—সামাজিক—জবাব দিল সুভদ্রা।

সামাজিক?

হ্যাঁ—দেখবেন না পালাটা! ভাল লাগবে পালাটা আপনার—কথাগুলো বলতে বলতে বার দুই সুভদ্রা আড়চোখে হরিদাস সামন্তর দিকে তাকাল।

কিরীটীর মনে হল সুভদ্রার ওষ্ঠের প্রান্তে যেন একটা বাঁকা হাসির চকিত বিদ্যুৎ খেলে গেল।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই দেখব, এসেছি যখন—কিরীটী বললে।

সুভদ্রা—ওকে এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও।

তা ওহে সামন্ত—শুনেছি তোমাদের শ্যামলকুমার নাকি অদ্ভুত অভিনয় করে—তার সঙ্গে একটিবার আলাপ হয় না?

জবাব দিল সুভদ্রা, কেন হবে না—শ্যামলই ত এ নাটকের নাট্যকার—আমি এক্ষুণি শ্যামলকে ডেকে আনছি—

খুশিতে যেন ডগমগ হয়ে সুভদ্রা লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুভদ্রার পদশব্দ মিলিয়ে গেল বাইরে।

॥ চার ॥

কিরীটী হরিদাস সামন্তর দিকে ফিরে তাকাল।

এই আপনার সুভদ্রা সামন্ত মশাই?

হ্যাঁ—কি মতলব করেছে ওরা জানেন? আজই ওরা ভোর রাত্রের গাড়িতে বর্ধমান যাবে।

শুনলাম ত—

শুনেছেন?

হ্যাঁ—ঘরে ঢোকার মুখে আপনাদের শেষের কথাগুলো কানে এলো।

কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা তা হতে দিচ্ছি না—সামন্ত বললেন।

সামন্ত মশাই—ও কালনাগিনী—মিথ্যে শুধু ছোবল খাবেন—যাক্ সে কথা—আপনাদের পালা শুরু হচ্ছে কখন?

রাত ঠিক আটটায়—এখন সাড়ে ছ'টা—আর দেড় ঘণ্টা বাদে।

আমাকে আসরে বসবার একটা জায়গা করে দেবেন—

নিশ্চয়ই—

ভাল কথা—আপনাদের এই নাটকে কোন অঙ্কে যেন রাখালকে বিষ দেবার কথা?

বিষ কেউ দিচ্ছে না—পালায় আছে বিষ আমিই নিজে স্বেচ্ছায় পান করব—সুভদ্রা তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাচ্ছে জানতে পেরে।

ওঃ তাহলে জেনে শুনেই বিষ পান—বিষ প্রয়োগ নয়—কিরীটী বললে।

হ্যাঁ—জেনে শুনেই বিষ পান—

তবে?

কি তবে?

দৃশ্যটা কি রকম বলুন ত?

আমি একটা গ্লাস হাতে আসরে যাব—তাতে বিষ রয়েছে—

তারপর—

আসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করব বিষটা—তারপর গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে বের হয়ে আসব আসর থেকে।

তাহলে আসরের মধ্যে পতন ও মৃত্যু নয়?

না। নেপথ্যে —

তাহলে আর আপনার এত ভয় কেন?

মানে—

গ্লাস ত আপনিই নিয়ে যাবেন নিজে হাতে আসরে—

না।

তবে?

সুভদ্রাকে ডেকে বলব গ্লাসটা নিয়ে আসতে—সে এনে দেবে গ্লাস আসরে—

তাই নাকি! এ যে দেখছি—

কিরীটীর কথা শেষ হল না।

সুভদ্রা ও শ্যামলকুমার এসে সাজঘরে ঢুকল।

সুভদ্রার হাতে এক কাপ চা। কিরীটী দেখলো, শ্যামলকুমারের বয়স ২৮-২৯এর বেশী হবে না। ভারি সুশ্রী চোহারাটি, যেমন নায়কোচিত দেহের গঠন, তেমনি পুরুষোচিত। স্বাস্থ্য ও যৌবন যেন কানায় কানায় উপচে পড়ছে।

কালো রং হলেও দেখতে সুন্দর। যাকে বলে সত্যিকারের সুপুরুষ। অভিনেতার মতই চেহারা বটে।

সুভদ্রা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে কিরীটীর দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে এই নিন চা—এই আমাদের শ্যামলকুমার, নাটকও এরই লেখা—

আপনিই নাট্যকার?

আজ্ঞে—

এই বুঝি আপনার প্রথম নাটক? কিরীটী শুধায়।

হ্যাঁ—বিনীতভাবে জবাব দিল শ্যামল, শুনলাম আপনি সামন্তবাবুর বন্ধু—আজ আমাদের নাটকটা দেখে যান না—

এসেছি যখন দেখে যাব বৈকি!

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী আবার বললে, কিন্তু নাটকের অমন একটা অদ্ভুত পৌরাণিক প্যাটার্নের নাম রাখলেন কেন শ্যামলবাবু?

শ্যামলকুমার মৃদু হেসে বললে, নাটকটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না—আগে দেখুন তারপর আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। আচ্ছা তাহলে আমরা চলি—প্রথম দৃশ্যেই আমার আর সুভদ্রার প্রবেশ আছে—এসো সুভা।

শ্যামলকুমার সুভদ্রাকে ডেকে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিল আড়চোখে শ্যামলকুমার আর সুভদ্রার দিকে জ্বলন্ত অগ্নিক্ষরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন হরিদাস সামন্ত।

মনে হচ্ছিল যেন এখুনি ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং পারলে ওদের দু'জনার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলেন।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই হরিদাস সামন্ত যেন ফেটে পড়লেন, দেখলেন—দেখলেন ত স্বচক্ষে রায় মশাই—এর পরও বলবেন ওরা মনে মনে আমাকে হত্যা করবার সঙ্কল্প আঁটছে না? উঃ কি সাঙ্ঘাতিক—কি ভয়ানক শয়তানী—

অধীর হবেন না সামন্ত মশাই!

অধীর হব না—কি বলছেন রায় মশাই! আমি ত একটা মানুষ, না কি?

ঠিকই বলেছেন—কিন্তু তাহলেও একটা কথা কি জানেন? ওরা মনে মনে যদি কোন মতলব এঁটেই থাকে কৌশলে ওদের পথ থেকে আপনাকে সরাবার—বাগাবাগি করে চেঁচামেচি করলে বা এমন করে অধৈর্য হলে ওদের তাতে করে সুবিধাই হবে।

পারচি না—এত অত্যাচার আর আমি সহ্য করতে পারচি না রায় মশাই। তাছাড়া আপনাকে ত এখনো একটা কথা বলিই নি—

কি কথা?

আজ আবার এ রাস্কেলটার সঙ্গে দুপুরে আমার একচোট হয়ে গিয়েছে—

কার কথা বলচেন? কিরীটী শুধাল।

কার কথা বলচি বুঝতে পারছেন না?—ঐ শ্যামলকুমার।

কি হল তার সঙ্গে আবার?

জানেন, ও আমাকে আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছে আজ।

আলটিমেটাম?

হ্যাঁ—দুপুরে ট্রেনে আসতে আসতে শ্যামলকুমার আমাকে বলেছে—

কি বলেছে?

ওদের পথ থেকে যদি আমি না সরে দাঁড়াই ত ওরাই আমাকে সরাবার ব্যবস্থা করবে—

তাই নাকি!

কথাটা কয়েক দিন আগেও শ্যামলকুমার আমাকে একবার বলেছিল।

ওরাই মানে কি? আপনার কি মনে হয় ঐ ষড়যন্ত্রের মধ্যে সুভদ্রাও আছে?

নিশ্চয়ই আছে!

কিরীটী ক্ষণকালে যেন কি ভাবল—তারপর বলে, ঠিক আছে—

বাইরে ঐ সময় পালা শুরু হবার প্রথম বেল পড়ল।

ঐ যাঃ—প্রথম বেল পড়ল—প্রথম দৃশ্যের শেষের দিকে আমার এ্যাপিয়ারেন্স আছে—হরিদাস সামন্ত বলে উঠলেন।

আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন!

আপনি?

আসরে আমার বসবার একটা জায়গা করে দিন—সামনের রোতে—যাতে করে ওদের দু'জনকে আরো ভাল করে দেখে—নাটকটা ভাল করে শুনতে পারি।

ঠিক আছে—চলুন আপনাকে আমি বসিয়ে দিয়ে আসি—তারপর মেক্‌আপে বসব—চলুন।

চলুন—

সামন্ত মশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী ওর গ্রীনরুম থেকে বেরুল।

গম গম করছিল যেন আসর।

দর্শনার্থীতে একেবারে যেন ঠাসাঠাসি আসর তখন।

তিল-ধারণেরও স্থান নেই। হরিদাস সামন্ত পাল মশাইকে বলেই প্রথম সারিতে আসরের একেবারে সামনা সামনি একটা চেয়ারে কিরীটীকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে পালা শুরু হল।

কিরীটী তন্ময় হয়ে পালা শুনছিল।

নাটকটি বেশ লাগে কিরীটীর। চমৎকার লিখেছে ছেলেটি। কে বলবে একটি তরুণের ঐ প্রথম প্রয়াস!

যেমন ঘটনার বাঁধুনী—তেমনি নাটকীয় সংঘাত—আর তেমনি নাটকের সংলাপ।

আরো আশ্চর্য লাগছিল কিরীটীর—হরিদাস সামন্তর কাছে কয়েক দিন আগে শোনা তার জীবন-কাহিনীই যেন নাটকের কাহিনীর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে আছে।

এক বৃদ্ধের এক তরুণীর প্রতি আকর্ষণ—যে আকর্ষণের টানে সে তার নিজের সংসারকে ভাসিয়ে দিল—অথচ ঐ বৃদ্ধ ঐ তরুণীর সম্পর্কে পালিত পিতার মতই। —এমন সময় নাটকে শুরু হল ওদের সংসারে এক তরুণকে নিয়ে সংঘাত।

মেয়েটি সহজেই তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল স্বভাবতই—আর তাইতেই সংঘাত।

এক ত্রিকোণ সংঘাত।

শেষ পর্যন্ত পালিত পিতার নিজের বিকৃত বাসনার জন্য মেয়েটির প্রতি জেগে ওঠে এক গভীর অনুশোচনা—যার ফলে সে স্থির করল—সে নিজেই স্বেচ্ছায় ওদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে।

সে বিষ পান করবে।

বিষ সংগ্রহ করে নিয়ে এলো বৃদ্ধ এবং সেই বিষ সে এনে জলের পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিল এবং মনস্থ করলো মেয়েটির হাতের থেকে বিষ মিশানো জল পান করবে—যাতে করে সেই জল পান করলেই মৃত্যু হয়।

ক্রমশঃ নাটকের সেই দৃশ্য এলো।

সুভদ্রা (নাটকের নায়িকা) কোথায় বের হয়েছিল, অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে একাকী চুপ করে বসে আছে।

সুভদ্রা বললে, পাশের ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, খেয়েছো?

আজ আর কিছু খাব না সুভদ্রা।

খাবে না?

না—শুধু এক গ্লাস জল—টেবিলের পরে আছে, এনে দাও তো জলের গ্লাসটা—

শুধু জল খাবে?

হ্যাঁ—

সুভদ্রা চলে গেল এবং একটু পরে এক গ্লাস জল নিয়ে এলো, এই নাও জল—

যাও—তুমি শুয়ে পড়গে—

সুভদ্রা চলে গেল।

নিজের হাতে বিষ মিশ্রিত সেই জল পানের পূর্বে বৃদ্ধের সংলাপ : সুভদ্রা, তুমি সুখী হও। আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি—একটা চিঠি রেখে যাব—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

এই জলে বিষ মিশিয়ে রেখেছি তুমি জান না—তোমার হাত দিয়েই এই বিষ আমি পান করচি। আর—তাই ত তোমরা মনে মনে চেয়েছিলে, তাই হোক—তাই হোক।

সংলাপগুলো উচ্চারণ করতে করতে টলতে টলতে হরিদাস সামন্ত জলটুকু পান করে গ্লাসটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আসর থেকে প্রস্থান করলেন।

শেষ দৃশ্য—

রাখাল-বেশী হরিদাসের প্রস্থানের পরই সুভদ্রা আর নায়কের প্রবেশ।

কিরীটী যেন নাটকের কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

সুভদ্রা—

বল জ্যোতির্ময়!

আর এই খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে পারছি না।

কি করতে চাও—

এ যেন সত্যি আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে—দম বন্ধ হয়ে আসচে।

আমারও—

আমি ঠিক করেছি—

কি ঠিক করেছো?

আজ রাত্রেই আমরা পালাব।

আমি প্রস্তুত—

ইচ্ছা ছিল না আদৌ আমার এভাবে তোমাকে অপহরণ করে চোরের মত রাতের অন্ধকারে সরে পড়বার, কিন্তু—

কিন্তু কি?

সামনে দিয়ে গেলে ঐ বৃদ্ধ মনে নিদারুণ আঘাত পাবে—সুখের ঘর বাঁধতে চলেচি—কারো মনে কোনো দুঃখ দেব না—ভাল করে শেষ বারের মত ভেবে দেখ তোমার মনে কোন চিন্তা বা সংকোচ নেই তো?

এতটুকুও না, ওর কুৎসিত দৃষ্টি আমাকে যেন লোভীর মত সর্বক্ষণ লেহন করছে, অথচ ও আমার পালিত বাপ—মুক্তি চাই আমি, মুক্তি চাই—

চল—

দু'জনে হাত ধরাধরি করে আসর থেকে বের হয়ে যাবার উপক্রম করবে—আর ঠিক বেরুবার আগেই বাড়ির ভৃত্য এসে বলবে, দিদিমণি—শিগ্রি চলুন—বাবু—কত্তাবাবু—বোধহয় মারা গেছেন।

কিন্তু ভৃত্য আর আসে না।

ভৃত্যও আসে না—ওরাও নাটকের সংলাপগুলো বলতে পারে না।

ওরা ঘন ঘন ভৃত্য আসার প্রবেশপথের দিকে তাকাতে থাকে।

নিজেদের মধ্যেই অস্ফুট কণ্ঠে বলাবলি করে ওরা। কিরীটী সামনে বসেই শুনতে পায়।

কি ব্যাপার—চাকর আসছে না কেন?

দু' মিনিট—চার মিনিট—পাঁচ মিনিট কেটে গেল। অথচ ভৃত্য আসছে না আসরে।

সুভদ্রা আর শ্যামলকুমার পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

দু'জনারই চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

দর্শকরা প্রথমটায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নি, কিন্তু প্রায় যখন ৮-১০ মিনিট ঐ অবস্থায় কেটে যাবার উপক্রম হল তখন তাদের মধ্যেও একটা ফিসফিসানি—চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়।

লে বাবা—এরা দুটি সঙের মত দাঁড়িয়ে রইল কেন? কে একজন বললে।

আর একজন টিপ্পনী কাটল, কি বাবা—ভাগব বলে এখনো দাঁড়িয়ে কেন? কেটে পড়ো না বাপু—দুটিতে ত বেশ জোট মানিয়েছে—

ওরাও বোধহয়—সুভদ্রা আর শ্যামলকুমার কেমন অস্বোয়াস্তি বোধ করতে থাকে, বৃদ্ধের ভৃত্যের আবির্ভাবের পর যে সংলাপ তাও বলতে পারছে না—এদিকে ভৃত্যেরও দেখা নেই।

অবশেষে বুদ্ধি খাটিয়ে শ্যামলকুমার বললে, চল সুভদ্রা, আর দেরি করা উচিত নয়।

হ্যাঁ চল—

ওদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সারা প্যাণ্ডেল যেন এক অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল।

কিরীটী নাটকের শেষটুকু জানত।

হরিদাসের মুখেই শুনেছিল।

কিরীটীও ঠিক বুঝতে পারে না—ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটল।

ভৃত্যের আসরে আবির্ভাব হল না কেন?

হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়ায় তাড়াতাড়ি কিরীটী উঠে পড়ল এবং দ্রুত পদে সাজঘরের দিকে পা বাড়াল।

দর্শকরাও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না।

তারা তখন হাসি থামিয়ে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে—এটা কি হল—

এ কেমন পালা রে বাবা—

॥ পাঁচ ॥

হরিদাস সামন্তর সাজঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল কিরীটী।

সেখানে তখন যাত্রাদলের আট দশ জন জমায়েত হয়েছে—পাল মশাইও উপস্থিত—শ্যামলকুমার ও সুভদ্রাও পৌঁছে গিয়েছে সে ঘরে।

একটা চাপা গুঞ্জন ঘরের মধ্যে যেন বোবা একটা আতঙ্কের মত থম থম করছে! ভিড় ঠেলে সামনের দিকে দু'পা এগুতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল কিরীটীর।

সামন্ত মশাই চেয়ারের উপর বসে আছেন—পরনে তার অভিনয়েরই সাজপোশাক—মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে ঘাড়টা ভেঙে যেন।

দুটো হাত অসহায়ভাবে চেয়ারের দু'পাশে ঝুলছে।

পায়ের সামনে একটা কাচের গ্লাস।

কি ব্যাপার? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

বুঝতে পারচি না রায় মশাই—অধিকারী রাধারমণ পাল বললেন, ঘরে ঢুকে দেখি ঐ দৃশ্য—ডেকেও সাড়া না পেয়ে আপনার বন্ধুর—

কিরীটী এগিয়ে গেল, ঝুলে পড়া হরিদাস সামন্তর মুখটা তুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা আবার ঝুলে পড়ল বুকের 'পরে, মুখটা নীলচে।

ঠোঁট দুটিও নীলচে।

কষের কাছে সামান্য রক্তাক্ত ফেনা।

হাতটা তুলে নাড়ি পরীক্ষা করল কিরীটী, তারপর রাধারমণ পালের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, উনি বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই—সেকি!

একটা চাপা আর্তনাদের মতই যেন রাধারমণ পালের কণ্ঠ হতে কথাগুলো উচ্চারিত হল।

হ্যাঁ। মারা গেছেন।

কিরীটী আবার কথাটা উচ্চারণ করল।

মারা গেছেন?

কিরীটী ঐ সময় মাটি থেকে গ্লাসটা তুলে একবার নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলো।

তারপর সেটা পাশের একটা টুলের 'পরে নামিয়ে রেখে বললে, মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে!

বিষ!

কথাটা কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন উচ্চারিত হল শ্যামলকুমারের মুখ থেকে।

কিরীটী শ্যামলকুমারের মুখের দিকে তাকাল, শ্যামলকুমারের সমস্ত মুখে যেন একটা বিব্রত ভয়ের কালো ছায়া।

আমার তাই মনে হচ্ছে—কিরীটী আবার বললে, পুলিসে এখুনি একটা খবর দেওয়া দরকার।

পুলিস! পুলিস কি করবে? রাধারমণ একটা ঢোঁক গিলে কথাটা বললেন।

স্বাভাবিক মৃত্যু নয় যখন তখন পুলিসে একটা সংবাদ দিতে হবে বৈকি!

ঘরের মধ্যে, যাত্রাদলের সবাই তখন প্রায় ভিড় করেছে—সবার কানেই বোধ করি সংবাদটা পৌঁছে গিয়েছিল।

জনা ষোল-সতেরো মেয়ে-পুরুষ যাত্রার দলে।

ইতিমধ্যে বোধ করি বাড়ির কর্তা রমণীমোহন কুণ্ডুর কানেও সংবাদটা পৌঁছে গিয়েছিল—ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।

কি হয়েছে পাল মশাই? ব্যাপার কি?

রমণীমোহনের বয়স খুব বেশী নয়—পঞ্চাশ একান্নর মধ্যেই।

বেশ স্বাস্থ্যবান দেহ—পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে বোঝা যায় ভদ্রলোক রীতিমত শৌখিন।

পরনে কাঁচির কোঁচানো ধুতি চওড়া কালো পাড়, সাদা গিলে করা আদ্দীর পাঞ্জাবী, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি।

আপনি—কিরীটী প্রশ্ন করে রমণীমোহনের দিকে তাকিয়ে।

আমি এ বাড়ির মালিক—রমণীমোহন কুণ্ডু।

ওঃ, ইনি—সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু। রাধারমণ বললেন।

শুনলাম সামন্ত মশাইয়ের নাকি কি হয়েছে?

রাধারমণ পাল চুপ করেছিলেন, কিরীটীই প্রশ্নটার জবাব দিল।

মারা গেছেন। মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটেছে।

সর্বনাশ, পয়জনিং!

হ্যাঁ।

এখন উপায়?

থানায় একটা সংবাদ পাঠাতে হবে।

হ্যাঁ—এখুনি পাঠাচ্ছি—হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন রমণীমোহন কুণ্ডু।

কিরীটী আবার পাল মশাইয়ের দিকে তাকাল।

ভদ্রলোকের মুখটা যেন এর মধ্যেই কেমন শুকিয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে পুরু ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিচ্ছেন।

পাল মশাই!

আজ্ঞে।

আপনাদের দলের সর্বশেষ আজ রাত্রে কার সঙ্গে সামন্ত মশাইয়ের দেখা হয়েছিল—সে কথা জানতে পারলে হত।

পাল মশাই একটা ঢোঁক গিলে বললেন, আমার—সঙ্গে—মানে পালা শুরু হবার পর থেকে আমি এখানে আসিই নি—

তাহলে আপনার সঙ্গে পালা শুরু হবার পর আর সামন্ত মশাইয়ের দেখা হয় নি?

না—

হুঁ! আপনারা? কিরীটী পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে তাকাল।

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পর্যায়ক্রমে একে একে সকলের মুখের উপরই ঘুরে এলো।

চিত্রার্পিতের মত যেন সব দাঁড়িয়ে। কারো মুখে কথা নেই।

কেউ আপনাদের মধ্যে আজ পালা শুরু হবার পর এখানে আসেন নি?

কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

রোগা মত এক ব্যক্তি এগিয়ে এলো। বয়স বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে বলে মনে হয়।

কিরীটী পুনরায় তাকে প্রশ্ন করে, আপনি এসেছিলেন?

না—তবে তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবার পর একবার আমি এখানে শ্যামলকুমারকে আসতে দেখেছি—আর তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সামন্ত মশাই তখন আসরে—সুভদ্রা দেবীকে এই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিলাম।

কিরীটী বক্তার মুখের দিকে তাকাল।

রোগা পাকানো চেহারা।

চোখের কোল বসা—ভাঙা গাল। নাকটা খাঁড়ার মত উঁচু।

মাথায় একমাথা ঢেউ খেলানো বাবরি চুল।

মুখে প্রসাধনের চিহ্ন—পরনে তখনো অভিনয়ের পোশাক।

কিরীটীর মনে পড়ল—লোকটি ভাল অভিনেতা। বর্তমান নাটকে ভিলেনের পার্ট করছিল। পালায় নায়িকার অন্যতম প্রেমিক। হতাশায় যে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

কি নাম আপনার?

আজ্ঞে সুজিতকুমার মিত্র।

এই দলে আপনি কতদিন আছেন?

কতদিন—মানে, ধরুনগে বছর ছয়েক তো হবেই। আগে তো আমিই এ দলে হিরোর রোল করতাম! রোগে রোগে চেহারাটা ভেঙে যাওয়ায় পাল মশাই আর আমাকে হিরোর পার্ট দেন না ভিলেনের পার্ট করি।

হুঁ! তা আপনি দেখেছেন শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা দেবীকে এই ঘরে আসতে?

আজ্ঞে বললাম তো এই মাত্র—শ্যামলকুমারকে আমি ঢুকতে দেখেছি—কিন্তু বের হয়ে যেতে দেখি নি। আর সুভদ্রা দেবীকে বেরোতে দেখেছি কিন্তু ঢুকতে দেখি নি।

শ্যামলকুমার ভিড়ের মধ্যে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কিরীটী শ্যামলকুমারের মুখের দিকে তাকাল।

শ্যামলবাবু, তৃতীয় অঙ্কের গোড়ায়—কিরীটী প্রশ্ন করল, আপনি এসেছিলেন এ ঘরে?

হ্যাঁ—সামন্ত মশাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন—একটা চিরকুট দিয়ে।

চিরকুট!

হ্যাঁ,—এই যে দেখুন না—এখনো আছে আমার কাছে।

বলতে বলতে পকেটে হাত চালিয়ে ছোট এক টুকরো কাগজ বের করল শ্যামলকুমার।

দেখি—কিরীটী চিরকুটটা হাতে নিল।

ছোট এক টুকরো প্রোগ্রাম' ছেঁড়া কাগজ—তাতে পেনসিলে লেখা,—শ্যামল একবার আমার ঘরে এসো—

নীচে কোন নাম সই নেই।

এতে তো দেখছি কারুর নাম সই নেই! তা এটা যে সামন্তরই পাঠানো বুঝলেন কি করে?

আজ্ঞে দলের চাকর ভোলা আমাকে চিরকুটটা দেয়!

ভোলা? কোথায় সে?

ভোলা ভিড়ের মধ্যে সবার আড়ালে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এলো।

কালো বেঁটে—নাদুস-নুদুস চেহারা।

পরনে একটা ধুতি ও গায়ে গেঞ্জি।

বয়স বছর ত্রিশেক হবে।

চোখের দৃষ্টিতে বেশ যেন একটা সর্তকতা।

তোমার নাম ভোলা? কিরীটী শুধাল।

বাবুকে তুমি ঐ চিরকুটটা দিয়েছিলে?

আজ্ঞে—

সামন্ত মশাই তোমাকে দিতে দিয়েছিলেন?

আজ্ঞে নিজের হাতে দেননি—

তবে? চিরকুটটা তুমি কোথায় পেলে?

রাধারাণী দিদিমণি চিরকুটটা আমায় দিয়েছিলেন।

তিনি কে?

এবার একটি বছর ত্রিশ বয়সের রমণী এগিয়ে এলো।

আমার নাম রাধারাণী—

আপনি দিয়েছিলেন ওকে চিরকুটটা? কিরীটী প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ—

আপনাকে সামন্ত মশাই দিয়েছিলেন?

না—দ্বিতীয় অঙ্কের শেষের দিকে আমি যখন আসর থেকে সাজঘরের দিকে যাচ্ছি কে যেন আমাকে চিরকুটটা দিয়ে বললে, এটা ভোলাকে দিয়ে বলবেন—শ্যামলবাবুকে দিয়ে যেন বলে সামন্ত মশাই তাকে এ ঘরে ডেকেছেন।

কে সে?

প্যাসেজে ভাল আলো ছিল না। আর আমারও তাড়াতাড়ি ছিল—ভাল করে চেয়ে দেখি নি—নজরও দিই নি।

তার গলাও চেনেন নি?

না, ঠিক তাড়াতাড়িতে....

হুঁ, তারপর?

ভোলা আমাদের সাজঘরের বাইরেই ছিল—তাকে চিরকুটটা দিয়ে বলি শ্যামলবাবুকে দিয়ে আসতে, সামন্ত মশাই দিয়েছেন—শ্যামলবাবুর সাজঘরটা আমাদের পাশের ঘরেই।

ঐ সময় হঠাৎ দণ্ডায়মান অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্য থেকে মধ্যবয়সী কালো গাট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোক—যিনি সুভদ্রা-হরণ পালায় সুভদ্রার মামার পার্ট করেছিলেন—তিনি এগিয়ে এসে বেশ যেন একটু রুক্ষ কর্কশ গলাতেই বললেন, কিন্তু মশাই আপনার পরিচয়টি জানতে পারি কি? আপনি কে—পুলিসের মত আমাদের এই জেরা করছেন কেন? আপনি তো বাইরের লোক—পুলিসকে আসতে দিন, তাদের কাজ তারাই করবে।

রাধারমণ পাল তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, দোলগোবিন্দবাবু—উনি সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু!

বন্ধু তো হয়েছে কি?

ঠিক সেই সময় স্থানীয় থানার অফিসার-ইন-চার্জ মনীশ চক্রবর্তী হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন—তার পিছনে পিছনে, রমণীমোহন কুণ্ডু।

মনীশ চক্রবর্তীর বয়স চল্লিশের কিছু উর্ধ্বে বলেই মনে হয়।

রীতিমত পালোয়ান মত চেহারা।

পাকানো এক জোড়া গোঁফ। থুঁতনীতে নূর দাড়ি। পরনে পুলিসের ইউনিফর্ম।

কোথায়, কোথায় ডেড্ বডি?

ঐ যে—বললে কিরীটী।

মনীশ চক্রবর্তী এগিয়ে গিয়ে ডেড্ বডির সামনে দাঁড়ালেন—নানা ভঙ্গিতে দেখলেন দূর থেকে—সামনে থেকে—কখনো ঝুঁকে পড়ে—কখনো সামান্য একটু হেলে দাঁড়িয়ে।

কখন মারা গিয়েছে? I mean কখন ব্যাপারটা আপনারা জানতে পেরেছেন?

কথাগুলো বলে পর্যায়ক্রমে মনীশ চক্রবর্তী ঘরের মধ্যে উপস্থিত দণ্ডায়মান সকলের দিকেই তাকালেন।

সবাই চুপ, কারো মুখে কোন কথা নেই।

কি হল—সবাই আপনারা ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব্ স্কুলের ছাত্র হয়ে গেলেন নাকি? শুনতে পাচ্ছেন না কথাটা আমার, না জবাব দিতে পারছেন না?

তবু কারো মুখে কোন শব্দ নেই। পূর্ববৎ সবাই যেন বোবা—সবাই পুতুলের মত দাঁড়িয়ে।

ঐভাবে ধমক দিয়ে কি ওদের কারো মুখে কোন কথা বের করতে পারবেন অফিসার? এক এক করে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করুন!

কিরীটি মৃদু গলায় বললে, দেখছেন তো ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা সব ঘাবড়ে গিয়েছেন!

কিরীটীর দিকে তাকালেন মনীশ চক্রবর্তী।

বার কয়েক যেন তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিরীটীকে জরীপ করলেন।

তারপর বললেন, আপনি?

রাধারমণ পাল বললেন, সামন্ত মশাইয়ের উনি বন্ধু—

বন্ধু!

আজ্ঞে!

তা উনিও কি যাত্রাদলের—করাচার বেশ-ভূষা লক্ষ্য করেই মনীশ চক্রবর্তী কথাটা বললেন।

না—উনি এসেছিলেন ওর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে—তারপর পালা শুনছিলেন।

অফিসার—আপনার, সঙ্গে আমার কিন্তু কথা ছিল।—ঐ সময় কিরীটী বললে।

কি কথা?

আগে সকলকে ঘর থেকে একটু বেরুতে বলুন, তারপর বলচি—

মনীশ চক্রবর্তী ভ্রূ কুঁচকে যেন কি ভাবলেন মুহূর্তকাল, তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা একটু বাইরে যান।

সকলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল সবাই।

ঘর খালি হয়ে গেল।

কি বলছিলেন বলুন?

কিছু বলবার আগে বলতে চাই আজকের ব্যাপারটার একটা উপক্রমণিকা আছে মি: চক্রবর্তী—

উপক্রমণিকা! সে আবার কি?

কিরীটী তখন তার কাছে হরিদাস সামন্তর যাওয়া থেকে আজকের সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলে গেল, তারপর বললে, মানুষগুলোকে স্বচক্ষে দেখবার জন্য ও বুঝবার জন্যই আমি আজ এখানে এসেছিলাম—একবারও ভাবতে পারি নি সত্যিই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটবে।

কিন্তু এখনো আপনার আসল পরিচয়টা তো পেলাম না!

কিরীটী মৃদু গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করল।

মনীশ চক্রবর্তী যেন আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীকে জরীপ করলেন।

তারপর বললেন ও, আপনিই সেই বেসরকারী গোয়েন্দা—কিরীটী রায়—হ্যাঁ, নামটা আপনার শুনেছি দু'একবার—

আজ্ঞে—তবে গোয়েন্দা ঠিক নয়!

তবে?

রহস্যের সন্ধান করে আমি বিশেষ আনন্দ পাই। বলতে পারেন ওটা আমার একটা নেশা।

নেশাই দেখছি বড় জব্বর নেশা! তা আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন?

মনীশ চক্রবর্তীর কথা বলার ভঙ্গি ও কথাগুলোর মধ্যে স্পষ্টই যেন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পায়।

কিরীটী সেটা বুঝতে পেরেই মৃদু হেসে বলে, আমি আর কি বলব মি: চক্রবর্তী—আপনিই যখন এসে পড়েছেন—আপনার কি আর কিছু জানতে বা বুঝতে বাকী থাকবে!

কিরীটীর তোষামোদে মনীশ চক্রবর্তী একটু যেন প্রসন্ন হলেন।

নেহাত লোকটা অর্বাচীন নয় বোধহয় মনে হয় তার।

তবু আপনি তো প্রথম থেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন, তা সত্যিই কি আপনার ব্যাপারটা একটা মার্ডার বলেই মনে হয়, সত্যিই লোকটাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কিরীটীবাবু?

এত তাড়াতাড়ি কি কিছু বলা যায়? আপনিই বলুন না মি: চক্রবর্তী, আপনার তো এই লাইনে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।

তা ঠিক—তবে জবাববন্দী না নিয়ে কিছু বলতে পারচি না—তবে এটা ঠিক ওকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করাই হয়েছে। আর ঐ শ্যামলকুমার আর—

তারপরই একটু থেমে বললেন, কি নাম যেন মেয়েটির বললেন?

সুভদ্রা।

হ্যাঁ—সুভদ্রা—ওরা দুজনেই এর মধ্যে আছে। বুঝলেন মি: রায়—আপনার সব কথা শোনবার

পর মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্ত্রীলোক-ঘটিত ঈর্ষা। আর সেই ঈর্ষা থেকেই হত্যা—

অসম্ভব নয় কিছু।

॥ ছয় ॥

তাহলে এবার ওদের সকলের জবানবন্দী নেওয়া যাক, কি বলেন মিঃ রায়? কথাটা বলে মনীশ চক্রবর্তী কিরীটীর দিকে তাকালেন।

নিন না! তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তো—

কি বলুন?

এ ঘরে আমি—

থাকবেন—জবানবন্দী নেওয়ার সময়?

হ্যাঁ—

থাকুন। থাকুন—আপত্তির কি আছে এতে?

ধন্যবাদ। আপনাদের কাছে কত কিছু শিখবার আছে—কেমন করে আপনারা জবানবন্দী নেন—তার process—

শিখতে চান? বেশ—বেশ—কিউরিয়াসিটি থাকা ভাল—ওতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়?

কিরীটীর বোধহয় লোকটার পাকামী সহ্য হচ্ছিল না, তাই বললে, হ্যাঁ—আপনাদের বর্তমান আই. জি. মিঃ মল্লিক তাই বলেন—

মিঃ মল্লিক—তাঁকে আপনি চেনেন নাকি—সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় মনীশ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বরে।

সুকান্ত মল্লিক আমার বিশেষ বন্ধু।

আ—আপনার বন্ধু আমাদের বড়সাহেব—তা এ কথাটা এতক্ষণ বলেন নি কেন?

আপনার কাছে কি সে কথা বলতে পারি?

পারবেন না কেন? হাজারবার পারেন—তা আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—মনীশ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর ও চেহারা যেন সম্পূর্ণ পাল্টে যায় মুহূর্তেই—ভদ্রলোক যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

কুণ্ডু মশাই—ও কুণ্ডু মশাই? চেঁচিয়ে ওঠেন মনীশ চক্রবর্তী।

গৃহকর্তা রমণীমোহন কুণ্ডু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন,—কিছু বলছিলেন স্যার?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওঁর বসবার জন্য একটা চেয়ার এনে দিন।

এখুনি এনে দিচ্ছি স্যার!

হ্যাঁ—তারপর পাল মশাইকে এ ঘরে পাঠিয়ে দিন।

রমণীমোহন কুণ্ডু যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিলেন তেমনি আবার হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিঃ চক্রবর্তী?

বলুন—

আমি যদি আপনার জবানবন্দী নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা প্রশ্ন করি—

একশোবার করবেন। হাজারবার করবেন।

কিরীটী মনে মনে হাসল, চাকরির কি মহিমা, আই. জি. সুকান্ত মল্লিকের সঙ্গে আলাপ আছে শুনেই মনীশ চক্রবর্তী একেবারে যেন বিনয়াবনত। বশংবদ।

আরো মিনিট দশেক পরে—

প্রথম জবানবন্দী নেওয়া হচ্ছিল দলের অধিকারী রাধারমণ পালের।

মনীশ চক্রবর্তী প্রশ্নাদি করবার পর কিরীটী মুখ খুলল।

পাল মশাই—শুনেছি, হরিদাস সামন্ত একদিন আপনার পার্টনার ছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ—

তা পার্টনারশিপ ছেড়ে দিলেন কেন?

আপনি তো তার বন্ধুজন ছিলেন, জানেন না তার চরিত্রের কথা?

দীর্ঘদিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না—

ওর দুটি বিশেষ ব্যাধি ছিল।

ব্যাধি?

হ্যাঁ—একটি মদ্যপান আর—

আর—

স্ত্রীলোক সম্পর্কে ওর একটা বিশ্রী দুর্বলতা—তাই ত—

কি?

একের নম্বরের যাকে বলে লম্পট—

ঐ দুটি রোগই তো ওর সর্বনাশ করেছিল—নচেৎ অভিনয় প্রতিভা যেমন ছিল লোকটার তেমনি অন্য দিক দিয়ে সৎও ছিল, কিন্তু ঐ যে মদ্যপান ও স্ত্রীলোক ব্যাধি—সর্বগুণ হরে নিয়েছিল, নইলে মনে করুন কিনা—সুভদ্রা মেয়েটা ত ওর মেয়ের বয়সী না কি—

বাধা দিল কিরীটী, থাক ওকথা—আচ্ছা সবার আগে আপনিই তাহলে সামন্ত মশাইকে মৃত আবিষ্কার করেন?

আজ্ঞে—

এ ঘরে কি করতে এসেছিলেন, উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

না।

তবে?

কিছু টাকা চেয়েছিলেন—সেই টাকা দিতে এসেই ত—

আপনি ঘরে ঢুকে দেখলেন—ঐভাবে বসে আছেন?

হ্যাঁ—প্রথমটা তো বুঝতেই পারি নি, তারপর—

পাল মশাই?

আজ্ঞে—

নাটকের শেষ দৃশ্যে ছিল ভৃত্য গিয়ে আসরে খবর দেবে—কর্তাবাবুর মৃত্যু হয়েছে—তাই না?

হ্যাঁ—

ভৃত্য কে সেজেছিল?

ভৃত্য যে সাজত সে অনুপস্থিত আজ, তাই দোলগোবিন্দবাবুকে বলেছিলাম—দ্বিতীয় অঙ্কের পর তার ত পার্ট ছিল না—তাই বলেছিলাম সে-ই যেন ভৃত্যের মেক-আপ নিয়ে আসরে গিয়ে কথাগুলো বলে আসে—

পাল মশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, কিন্তু তিনি তো যান নি!

যান নি! সেকি? দোলগোবিন্দবাবু যান নি?

না। ফলে যা হবার তাই হয়েছিল—নাটকটি শেষ হতে পারে নি। কিরীটী অতঃপর শেষ দৃশ্যের ব্যাপারটা খুলে বললে।

দাঁড়ান তো দোলগোবিন্দবাবুকে ডাকি—

ব্যস্ত হবেন না পাল মশাই—পরেও কথাটা জিজ্ঞাসা করলে চলবে।

কেন গেল না—

এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন ত?

কি প্রশ্ন?

মনীশ চক্রবর্তী খিঁচিয়ে ওঠেন, যা জানতে চান উনি তার জবাব দিন!

আজ্ঞে—

পাল মশাই? কিরীটী ডাকল।

এই ব্যাপারে আপনার দলের কাউকে কি সন্দেহ হয়?

সন্দেহ? সন্দেহ কাকে করব—না না—আমার দলের মধ্যে কেউ এমন কাজ করতে পারেই না—তাছাড়া সামন্ত মশাইকে দলের সকলেই শ্রদ্ধা করত ভালবাসত ভক্তি করত—

মনীশ চক্রবর্তী ঐ সময় প্রশ্ন করলেন, শ্যামলকুমার?

শ্যামলকুমার!

হ্যাঁ—তার সঙ্গে তো শুনলাম সুভদ্রা বলে আপনার দলের মেয়েটিকে নিয়ে সামন্তর সঙ্গে রীতিমত

একটা রেষারেষি চলছিল ইদানিং—

না, না—রেষারেষি আবার কি! সামন্ত মশাইয়ের অবিশ্যি মনে তাই হয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম—সুভদ্রা সে রকম মেয়ে নয়—ওটা সামন্ত মশাইয়ের মনের ভুল। তাছাড়া শ্যামল ছেলেটি যেমন ভদ্র তেমনি ধীর স্থির—এসব খুনখারাপীর মধ্যে সে থাকতেই পারে না।

ঠিক আছে—মনীশ চক্রবর্তী বললেন।

কিন্তু পাল মশাই আমাদের ধারণা—কিরীটী বললে, আপনাদের দলেরই কেউ সামন্ত মশাইকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে।

এ আপনি কি বলছেন? না, না—হয়ত।

কি?

সামন্ত মশাই আত্মহত্যা করেছেন?

আত্মহত্যা!

—কেন—পারেন না?

তা পারেন তবে—বোধ হয় তা করেন নি—ঠিক আছে, আপনি দয়া করে শ্যামলকুমারকে এখন একবার পাঠিয়ে দিন।

রাধারমণ পাল ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন—একটু পরে শ্যামলকুমার এসে ঘরে ঢুকল।

মনীশ চক্রবর্তীই প্রথমে তাকে নানাবিধ প্রশ্ন শুরু করলেন, একটার পর একটা।

অবশেষে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে একসময় বললেন, ওকে জিজ্ঞাসা করবেন নাকি কিছু? জিজ্ঞাসা করবার আর কিছু আছে?

কিরীটী তাকাল শ্যামলকুমারের দিকে।

শ্যামলকুমার যেন কেমন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

হাতের আঙুলগুলো নিয়ে কেবলই নাড়াচাড়া করছে।

শ্যামলবাবু?

আজ্ঞে!

সুজিতবাবু বলছিলেন তখন—

কি? কি বলছিলেন সুজিতবাবু?

আজকের তৃতীয় অঙ্কের শুরু হবার পর একবার আপনি এই ঘরে এসেছিলেন!

হ্যাঁ—এসেছিলাম। সামন্তদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন সে কথা তো তখুনি আপনাকে বললাম।

হ্যাঁ, বলেছেন—তা কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা বলেননি।

সামন্তদার মনে ইদানীং একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল—

জানি। আপনার ইদানীং সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার জন্য—তিনি আদপেই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারছিলেন না—তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি? আপনি কি করে জানলেন? শ্যামলকুমার প্রশ্ন করে।

জানি।

তারপর একটু থেমে—

এবার বলুন শ্যামলবাবু, সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে সত্যিই কি আপনার....

হ্যাঁ—আমি তাকে ভালবাসি।

আর সুভদ্রা দেবী?

সে-ও আমাকে ভালবাসে।

হুঁ! তা কি কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে?

ঘরে এসে ঢুকতেই আজ উনি আমাকে বললেন, শেষবারের মত তোমাকে বলছি শ্যামল, আমাদের ভিতর থেকে তুমি সরে দাঁড়াও নচেৎ এমন শিক্ষা তোমাকে পেতে হবে যে জীবন দিয়ে তোমাকে তা শোধ করতে হবে।

আপনি কি জবাব দিলেন?

আমি বলেছিলাম, এই জন্যই যদি ডেকেছেন জানলে আসতাম না—যা বলবার আপনি সুভদ্রাকে

বলবেন। সে যদি আমাকে না চায় তো আমি নিশ্চয়ই সরে দাঁড়াব।

আর কোন কথা হয়নি?

না।

তারপর আর এঘরে আপনি আসেন নি?

না।

আচ্ছা, এ ব্যাপারে আপনার দলের কাউকে সন্দেহ হয়?

না।

আর কারো সঙ্গে দলের মধ্যে হরিদাসবাবুর কোন মনোমালিন্য বা ঝগড়াঝাঁটি কখনো হয়েছে বলে জানেন?

সুজিতের সঙ্গে তো ওর খিটিমিটি লেগেই ছিল।

তাই নাকি? কেন?

তা জানি না, তবে—

তবে?

এককালে শুনেছি ওর অবস্থা নাকি খুব ভাল ছিল—রেস খেলে ও মদ্যপান করে সব খুইয়েছে সুজিতবাবু। তাছাড়া—

তাছাড়া?

শুনেছি সুভদ্রাকে ও-ই দলে এনেছিল। এক সময় সুভদ্রার সঙ্গে ওর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও ছিল—সামন্তদা আসার পর থেকেই সামন্তদার সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল সুভদ্রা।

আচ্ছা, সুভদ্রাকে আপনার কি রকম মনে হয়?

খুব ভাল মেয়ে।

আজ পালা শেষ হবার পর রাত্রে সুভদ্রা বলছিল বর্ধমান যাবে?

আপনি জানেন সে কথা?

হ্যাঁ, আমাকে ও বলেছিল।

আপনারও সঙ্গে যাবার কথা ছিল কি?

না।

কেন যাবে বলেছিল সুভদ্রা বর্ধমানে, জানেন কি?

তার এক মাসী বর্ধমানে নাকি থাকে—তার অসুখ—তাকেই বলেছিল দেখতে যাবে বর্ধমানে।

আপনাকে সঙ্গে যেতে বলেনি?

বলেছিল—কিন্তু আমি বলেছিলাম যাব না।

ঠিক আছে—আপনি যান—সুজিতবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন।

শ্যামলকুমার চলে গেল।

মনীশ চক্রবর্তী কিরীটীর দিকে তাকালেন, ছেলেটাকে কি রকম মনে হলো কিরীটীবাবু?

আপনার কি মনে হলো?

গভীর জলের মাছ—তা বাছাধন জানেন না যে আমারও এ লাইনে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা—তাছাড়া ও সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে—এ আপনাকে আমি বলে রাখছি—ঐ-ঐ হচ্ছে—

মনীশ চক্রবর্তীর কথা শেষ হলো না।

সুজিতকুমার এসে ঘরে ঢুকল।

সুজিতকে প্রথমে মনীশ চক্রবর্তী প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

কিরীটী তখন ঘরের চারিদিকে আবার তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ঘরটা ভাল করে দেখা হয়নি।

হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ল—দরজার গোড়ায় একটা সিগারেটের পোড়া টুকরো।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে সিগারেটের টুকরোটা তুলে নিতে গিয়ে নজরে পড়ল যে চেয়ারের উপরে হরিদাস সামন্তর মৃতদেহটা উপবিষ্ট—তার নীচে কি একটা পড়ে আছে, চক্‌চক্ করছে।

মনীশ চক্রবর্তী তখন সুজিতকে নিয়ে ব্যস্ত—সেদিকে নজর দেবার মত অবকাশ ও মন কোনটাই ছিল না—সে তাকালও না কিরীটীর দিকে।

কিরীটী নীচু হয়ে চক্‌চকে বস্তুটি তুলে নিয়ে দেখল একটা শৌখিন গালার চুড়ির ভগ্নাংশ—আয়না কাঁচের চুম্‌কী বসানো।

সেই আয়না কাঁচের 'পরেই আলো পড়ে ঝিলিক দিচ্ছিল।

সিগারেটের শেষাংশটাও পরীক্ষা করল।

চারমিনার সিগারেট—এবং সেই সিগারেটটা যে খাচ্ছিল সে নিশ্চয়ই পান খেয়েছিল, কারণ শেষাংশে পানের ছাপ শুকিয়ে আছে।

দুটো বস্তুই কিরীটি পকেটে রেখে দিল সযত্নে।

মিঃ রায়!

মনীশ চক্রবর্তীর ডাকে কিরীটী ওর দিকে তাকাল।

দু'একটা প্রশ্ন করব। সুজিতবাবু—আপনি বলেছিলেন তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবার পব আপনি একবার শ্যামলকুমারকে এ ঘরে আসতে দেখেছিলেন!

হ্যাঁ।

তখন রাত্র ক'টা হবে বলে আপনার মনে হয়?

কত আর হবে—রাত সোয়া দশটা কি সাড়ে দশটা।

শ্যামলবাবু এ ঘরে কতক্ষণ ছিলেন জানেন?

তা মিনিট ১৫।২০ হতে পারে।

বুঝলেন কি করে—আপনি বুঝি ততক্ষণ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তা কেন—আমি—আমি চলে গিয়েছিলাম।

তাহলে জানলেন কি করে শ্যামলবাবু এ ঘরে মিনিট ১৫।২০ ছিলেন?

মানে মিনিট ১৫।২০ বাদে এদিকে আসছিলাম, তখন তাকে বেরুতে দেখেছিলাম এই ঘর থেকে।

হুঁ। তাদের পরস্পরের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল বলতে পারেন?

তা কেমন করে বলব—আমি তো আর ঘরে যাইনি।

তা ঠিক, তবে অনুমান তো করতে পারেন?

অনুমান!

হ্যাঁ অনুমান।

না।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে—

কি?

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও তো তাদের দু-একটা কথা আপনার কানে আসতে পারে!

না মশাই, তাছাড়া কোথাও আড়ি পাতা আমার অভ্যাস নেই।

হঠাৎ কিরীটী বলে, আপনি খুব পান খান সুজিতবাবু মনে হচ্ছে!

সুজিত একমুখ পান নিয়ে চিবোচ্ছিল।

দোক্তাসিক্ত লালচে এবড়ো খেবড়ো দু'পাটি দাঁত বের করে সুজিত বললে, হ্যাঁ—সর্বক্ষণ পান-দোক্তা না হলে আমার চলে না।

আর কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই আপনার সুজিতবাবু?

আসক্তি তো অনেক কিছুর 'পরেই ছিল, কিন্তু একে একে সবই ছেড়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, বড় বদ অভ্যাস। আর বদ অভ্যাসের 'পরে একবার আসক্তি জমলে তা সে যেমনই হোক না কেন ছাড়তে বড় কষ্ট হয়।

তা তো হবারই কথা, ড্রিংক-ট্রিংক করেন না?

এক সময় করতাম, এখন পেলে করি, না পেলে করি না—বুঝলেন না—মানে ঐ আর কি পরের পয়সায়—বলতে বলতে সুজিত পানের রসে রাঙানো লালচে দাঁতগুলো বের করে হাসল।

কিরীটী যেন সে হাসি দেখে গা ঘিন ঘিন করে।

আর সিগারেট? ধূমপান?

পানের সঙ্গে ওটা ঠিক জমে না বুঝলেন না!

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—তবে মিথ্যা বলব না—খাই—মানে ধূমপানে অভ্যস্ত আমি।

কি ব্র্যাণ্ড খান?

যা পাই।

আপনার পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আছে?

হ্যাঁ—সুজিত জামার পকেটে হাত চালিয়ে একটা দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করল—অর্ধেক খালি বাক্সটার।

কিরীটী সিগারেটের প্যাকেটটা দেখে ফিরিয়ে দিল।

সুজিতবাবু, আচ্ছা, হরিদাস সামন্ত পান খেতেন?

সুজিত লালচে দাঁতগুলো বের করে বললে, হ্যাঁ—তবে পাতা পান নয়, বোতল পান করতেন—মাত্রাধিক্যেই।

আর সিগারেট?

হ্যাঁ, তাও খেতেন।

কি ব্র্যাণ্ড খেতেন বলতে পারেন?

চারমিনার।

আচ্ছা সুজিতবাবু?

আজ্ঞে!

শ্যামলকুমার লোকটি কেমন?

ছুঁচো।

কি রকম?

ছুঁচো যেমন সর্বদা ছোঁক ছোঁক করে—তারও অভ্যাসটি তেমনি।

কি রকম? কিসের জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন?

বুঝলেন না?

না।

স্ত্রীলোক—বুঝলেন, স্ত্রীলোক!

হুঁ! তা এ দলে কোন মেয়ের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল নাকি?

কেন—হরিদাস সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু আপনি, শোনেননি তার কাছে কিছু?

না।

তার স্ত্রীলোকটির উপরই যে নজর ছিল শ্যামলকুমারের।

তাই নাকি?

একটু থেমে কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা সুজিতবাবু, হরিদাস সামন্তর সঙ্গে শ্যামলকুমারের কি রকম সদ্ভাব ছিল বলুন তো?

সাপ নেউলের সম্পর্ক যেমন তেমনি ধরনের সদ্ভাব ছিল বলতে পারেন।

কেন বলুন তো?

ঐ যে একটু আগেই বললাম—বুঝলেন না—

মানে!

মানে—সামন্ত মশাইয়ের মেয়েমানুষ ছিল সুভদ্রা—শ্যামলকুমার এসে সেই মেয়েমানুষটি হাতিয়ে নিয়েছিল—তার ফলে যা হবার তাই হয়েছিল।

হুঁ—আচ্ছা, আর একটা কথা!

কি বলুন?

আগে তো—মানে শ্যামলকুমার আসার আগে এ দলে বোধহয় হিরোর পার্ট আপনিই করতেন—তাই না?

করতাম—আর এখনো করতে পারি—শুধু তো মাকাল ফলের মত চেহারাই হলে হয় না মশাই—অভিনয় বস্তুটি হচ্ছে একটা আর্ট—বুঝলেন—গড় গড় করে তোতাপাখীর মত খানিকটা শেখানো বুলি আওড়ে গেলেই সেটা অভিনয়—acting হয় না—শ্যামল অভিনয়ের কি বোঝে! কিন্তু পাল

মশাইয়ের কি সে খেয়াল আছে!

আপনার অভিনয় কিন্তু আজ আমার সত্যি চমৎকার লেগেছে!

লেগেছে তো, লাগতেই হবে—আপনাদের মত অভিনয়রসিক বলেই বুঝেছেন।

আচ্ছা, হরিদাস সামন্ত কেমন অভিনয় করতেন?

এককালে ভাল অভিনয়ই করত—কিন্তু ঐ যে মহা দুটি ব্যাধি—মদ আর স্ত্রীলোক—ওতেই ওর সর্বনাশ হলো।

আপনি বলতে চান তাহলে মেয়েমানুষের জন্যই ওর প্রাণটা গেল?

নির্ঘাৎ—

মেয়েমানুষটি তাহলে আপনার মনে হয়—

আজ্ঞে হ্যাঁ—আমাদের সুভদ্রা দেবী—সাক্ষাৎ কালনাগিনী—বুঝলেন, বিষকন্যা!

।। সাত ।।

বিষকন্যা কেন বলছেন?

যে কন্যার সংস্পর্শই বিষ সেই তো প্রাণঘাতিনী বিষকন্যা।

তা বটে। তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, সুজিতবাবু—এবারে সত্যি করে বলুন তো—আজ অভিনয় শুরু হবার পর একবারও কি এ ঘরে আপনি আসেননি?

না।

ঠিক বলছেন?

নিশ্চয়ই।

মনে করে আবার ভাল করে—ভেবে বলুন!

ভাবাভাবির বা মনে করবার কি আছে—আসিনি।

কিন্তু আমি যদি বলি—

কি?

আজ অভিনয় শুরুর পরে এ ঘরে আপনি এসেছিলেন?

না।

সুজিতবাবু—আমার হাতে প্রমাণ আছে যে আপনি এ ঘরে এসেছিলেন।

প্রমাণ—এ কি বলছেন মশাই!

কিরীটীর মনে হলো গলাটা যেন কেমন বসে গেছে হঠাৎ সুজিতকুমারের।

গলার স্বরটা যেন ঠিক স্পষ্ট নয়।

কিরীটী বুঝতে পারে তার নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

অস্বীকার করে কোন লাভ নেই—বলুন কেন এসেছিলেন?

আমি আসিনি।

আপনার জামার পকেটে ওটা কি উঁচু হয়ে আছে—দেখি বের করুন তো!

ওটা একটা হাফ পাইন্ট্ বোতল।

বোতলটা বের করুন।

সুজিত পকেট থেকে একটা কালো চ্যাপটা মত হাফ পাইন্ট্ বিলিতি মদের বোতল বের করল।

কি আছে ওতে?

হুইসকী।

দেশী না বিলিতি?

দেশী।

বোতলটাতে দেখছি অর্ধেকের বেশী খালি—এটা কি পরস্মৈপদী নাকি?

মানে?

মানে পরের পয়সায় নাকি?

হ্যাঁ।

কে দিল?

পাল মশাই।

তারপরই একটু থেমে বললে, অভিনয়ের রাত্রে বিশেষ করে অভিনয়ের সময় মধ্যে মধ্যে না পান করলে আমি অভিনয় করতে পারি না—তাই পাল মশাই অভিনয়ের রাত্রে একটা পাইন্ট্ বোতল আমাকে দিয়ে থাকেন।

কিরীটী ক্ষণকাল অতঃপর সুজিতকুমারের দিকে চেয়ে রইল।

আমি এবারে যেতে পারি!

হ্যাঁ—কিন্তু বোতলটা আমার চাই—দিন।

বোতলটা—

হ্যাঁ—দিন।

নিন।

সুজিত বোতলটা কিরীটীর হাতে তুলে দিল, কিরীটী বোতলটা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখল, তারপর সেটা সামনের টেবিলের পরে রেখে দিল।

আচ্ছা—এবারে আপনি যেতে পারেন।

সুজিতকুমার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মনীশ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন—ও কি সত্যিই আজ রাত্রে একবার এঘরে এসেছিল বলে আপনার মনে হয় মিঃ রায়?

মনে হয় নয়—এসেছিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে কেমন যেন খট্‌কা লাগছে।

কি বলুন তো?

কিছু না—সুভদ্রা দেবীকে এবারে ডাকান না।

এখুনি ডাকচি।

মনীশ চক্রবর্তী ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে সুভদ্রাকে ঐ ঘরে পাঠিয়ে দেবার জন্য বললেন।

একটু পরে সুভদ্রা এলো।

কেঁদে কেঁদে তার দু'চোখের পাতা ফুলে উঠেছে।

চোখের পাতায় তখনো জল বোঝা যায়।

সুভদ্রা ইতিমধ্যেই তার অভিনয়ের সাজপোশাক ছেড়ে ফেলেছে।

পরনে সাধারণ একটি লাল রংয়ের চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি।

কিরীটী লক্ষ্য করল মুখের প্রসাধনও তুলে ফেলেছে সুভদ্রা ইতিমধ্যেই।

মনীশ চক্রবর্তী প্রথমে তার প্রচলিত ভঙ্গীতে প্রশ্ন শুরু করলেন আপনিই সুভদ্রা দেবী?

জলে ভরা চোখ দুটি তুলে নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সুভদ্রা সম্মতি জানাল।

অনেক দিন এ দলে আছেন?

হ্যাঁ।

সুজিতবাবু বলছিলেন আপনাকে তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সময়ে একবার নাকি এঘরে আসতে দেখেছিলেন?

সুজিতবাবু ঠিকই দেখেছিলেন। এসেছিলাম।

কেন?

সামন্ত মশাই আমাকে ডেকেছিলেন।

কিরীটী নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুভদ্রার সারা দেহ।

মনীশ চক্রবর্তী আবার প্রশ্ন করেন—কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

বলেছিলাম বর্ধমানে যাব—তাই বারণ করলেন যেন না যাই।

বর্ধমানে কেন যেতে চেয়েছিলেন?

মাসীর খুব অসুখ।

তারপর কতক্ষণ ছিলেন?

মিনিট দশেক।

ঐ সময় কিরীটীর দিকে তাকিয়ে মনীশ চক্রবর্তী বললেন—কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ওকে?

কিরীটী সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে বললে, সুভদ্রা দেবী, শুনলাম সুজিতবাবুই আপনাকে একদিন

এই যাত্রাদলে এনেছিলেন!

হ্যাঁ।

সুজিতবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

আমি এই যাত্রার দলে আসার আগে মধ্যে মধ্যে এ্যামেচার ক্লাবে প্লে করতাম—সুজিতবাবু একবার আমার প্লে দেখে আলাপ করেন। তারপর আমি যাত্রার দলে যোগ দিতে চাই কিনা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, হ্যাঁ—তখন উনি নিয়ে আসেন আমাকে। সেই থেকেই আমাদের পরিচয়।

তার আগে পরিচয় ছিল না? ওকে জানতেন না?

না।

আপনার মা বাবা ভাই বোন নেই?

না। ছোটবেলায় মা-বাবা মারা যায়—তারপব মাসীর কাছেই আমি মানুষ।

বর্ধমান থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতেন?

তা কেন?

তবে?

আমি পনেরো বছর বয়সেই কলকাতায় চলে আসি আমার স্বামীর সঙ্গে।

আপনার বিয়ে হয়েছিল?

হয়েছিল।

স্বামী এখন কোথায়?

কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

কতদিন আগে?

বছর দশেক আগে—বুঝতেই পারচেন—তারপর লেখাপড়া শিখিনি—বাঁচতে তো হবে—কাজেই এখানে-ওখানে অভিনয় শুরু করলাম।

ইদানীং হরিদাস সামন্তর সঙ্গেই বোধহয় ঘর করছিলেন?

সুভদ্রা মাথা নীচু করল।

সুভদ্রা দেবী!

বলুন!

আপনি যখন তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সময় এ ঘরে আসেন—সামন্ত মশাই তখন কি করছিলেন মনে আছে আপনার?

চুপচাপ বসে ছিলেন।

তিনি মদ্যপান করছিলেন না?

ঠিক মনে নেই। বোধহয় করছিলেন।

তাহলে ঘরে বোতল একটা নিশ্চয়ই থাকত—বোধহয় তিনি মদ্যপান করছিলেন না। মনে করে বলুন তো!

কি বললেন?

বলছি তিনি তখন মদ্যপান করছিলেন না বোধহয়?

তা হবে। আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি।

কোন গ্লাস ঘরে ছিল?

গ্লাস?

হ্যাঁ—ঐ কাঁচের গ্লাসটা—কিরীটী অদূরে, টুলের উপরে রক্ষিত শূন্য কাঁচের গ্লাসটা দেখাল।

দেখিনি

হুঁ! আচ্ছা, ইদানীং আপনার সঙ্গে তার মন কষাকষি চলছিল, তাই না?

অত্যন্ত সন্দেহ-বাতিক ছিল লোকটার।

স্বাভাবিক—নিম্নকণ্ঠে কিরীটী কথাটা উচ্চারণ করল।

কিছু বললেন?

না—আচ্ছা, কে আপনাদের মধ্যে সামন্ত মশাইকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বিষ?

হ্যাঁ—তীব্র কোন বিষ প্রয়োগেই ওর মৃত্যু হয়েছে।

না, না—ওর হার্টের ব্যামো ছিল—ব্লাড প্রেসারও ছিল।

তা হয়তো ছিল, তবে তার মৃত্যু বিষের ক্রিয়াতেই হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

কিন্তু কে তাকে বিষ দেবে? কেউ তো তার শত্রু এখানে ছিল না!

কার মনে কি আছে আপনি জানবেন কি করে? তারপরই হঠাৎ কিরীটী বললে—আপনার ডান হাতের, কব্জীর কাছে রক্তের দাগ কিসের দেখি—দেখি হাতটা আপনার!

রক্তের দাগ—কই? না তো—ও কিছু না—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে সন্ধ্যার সময় সাজঘরের টিনের পার্টিশনের একটা পেরেকে হাতটা কেটে গিয়েছিল কব্জীর কাছে।

অভিনয়ের সময় দেখেছিলাম—আপনার দু'হাতে কাঁচের আয়নার চুমকী বসানো দুটি চুড়ি—চুড়ি দুটো বুঝি খুলে রেখেছেন?

হ্যাঁ—সাজঘরে বাক্সর মধ্যে।

নিয়ে আসতে পারেন চুড়ি দুটো?

সুভদ্রা কেমন যেন এবারে একটু থতমত খেয়ে যায়। চুপ করে থাকে। কেমন যেন একটু মনে হয় ইতস্তত ভাব একটা।

কই যান! নিয়ে আসুন চুড়ি দুটো!

সুভদ্রা বেরুচ্ছিল, কিন্তু কিরীটী তাকে আবার কি ভেবে বাধা দিল, না, আপনি না—

মনীশ চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ চক্রবর্তী, বাইরে কাউকে বলুন তো সুভদ্রা দেবীর সাজঘর থেকে চুড়ি দুটো নিয়ে আসতে।

মনীশ চক্রবর্তী বের হয়ে গেলেন।

ঘরে এবারে একা সুভদ্রা।

সুভদ্রা যেন বেশ একটু বিব্রতই বোধ করে, অথচ মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও কিরীটীর বুঝতে কিন্তু অসুবিধা হয় না।

কিরীটী সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

সুভদ্রা দেবী!

য়্যা! আমায় কিছু বলছিলেন?

সুভদ্রা দেবী, আমার নামটা বোধহয় আপনি জানেন না—

সামন্ত মশাই যে বলেছিলেন ধূর্জটি রায় আপনার নাম!

নামটা আপনার মনে আছে দেখছি। কিন্তু ওটা তো আমার আসল নাম নয়।

তবে!

ওটা আমার অন্য একটি নাম—বিশেষ করে নামের আড়ালে যখন আমি আমাকে কিছুটা গোপন করতে চাই। বলতে পারেন ছদ্মনাম।

ছদ্মনাম!

হ্যাঁ।

সুভদ্রা তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—কিরীটী রায় নামটা কখনো শুনেছেন?

কিরীটী রায়—আপনিই কি তবে সেই বিখ্যাত রহস্যানুসন্ধানী—একটা ঢোক গিলে কেমন যেন শুকনো গলায় থেমে থেমে কথাগুলো টেনে টেনে উচ্চারণ করল সুভদ্রা।

হ্যাঁ—আমিই সেই।

তবে আপনি—

না। সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু আমি কোন দিনও ছিলাম না—তার সঙ্গে পরিচয় মাত্র আমার কয়েক দিন আগে। এবং আরো বোধহয় আপনার একটা কথা জানা দরকার—তিনি মৃত্যু আশঙ্কা করছিলেন বলেই আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

মৃত্যু আশঙ্কা!

হ্যাঁ—তার ধারণা হয়েছিল তাকে হত্যা করা হবে।

কে? কে তাকে হত্যা করবে?

হত্যা যে কেউ তাকে করেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছেন ঐ সামনে তার বিষ জর্জরিত মৃতদেহ—আর এও আমি জানি—

কি? কি জানেন?

আপনারা যারা আজ রাত্রে এখানে উপস্থিত হয়েছেন অভিনয়ের ব্যাপারে—সেই আপনাদের মধ্যেই কেউ একজন তাকে হত্যা করেছে।

কিরীটী শান্ত ধীর গলায় কথাগুলো বলে গেল।

কে? কে তাকে হত্যা করেছে?

আপনিই অনুমান করুন না কে তাকে হত্যা করতে পারে!

ঐ সময় মনীশ চক্রবর্তী পুনরায় এসে ঘরে ঢুকলেন, হাতে তার একটি গালার চুড়ি।

একটিই পেয়েছেন—অন্যটা জোড়ার পাননি তো? কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

না। একটিই পেলাম।

জানতাম পাবেন না। সুভদ্রা দেবী—জোড়ার অন্য চুড়িটা কোথায় গেল? সুভদ্রার দিকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী তার কথাটা প্রশ্নের ভিতর দিয়ে শেষ করল।

জা—জানি না—ওখানেই তো খুলে রেখেছিলাম!

না—রাখেননি!

রাখিনি—কি বলচেন আপনি!

ঠিকই বলচি। অন্যটা ভেঙে গিয়েছে।

ভেঙে গিয়েছে?

হ্যাঁ—তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবার পরই কোন এক সময় ভেঙে গিয়েছিল। কারণ তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সময় আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে হাতে আপনার চুড়ি ছিল—তা কি করে ভাঙল?

সুভদ্রা চুপ। একেবারে যেন বোবা, বিমূঢ়।

জবাব দিন—এই ঘরের মধ্যেই না? কিন্তু ভাঙল কি করে?

হ্যাঁ—এই ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় ধাক্কা লেগে চুড়িটা ভেঙে যায়।

আপনি মিথ্যা বলচেন—যেমন একটু আগে বলছিলেন পেরেকে হাত কেটেছেন।

কিন্তু!

বলুন সত্য কথাটা!

মিথ্যা আমি বলিনি।

বলচেন—এবার বলুন তো—আপনি সন্তান-সম্ভবা—তাই না?

হ্যাঁ—মাথাটা আবার নীচু করল সুভদ্রা।

কার সন্তান আপনার গর্ভে?

সামন্ত মশাইয়ের।

তিনি জানতেন কথাটা?

জানতেন।

আশ্চর্য! অস্ফুট স্বরে কথাটা কিরীটী উচ্চারণ করল।

কি বললেন?

কিছু না। আপনি যেতে পারেন—পাল মশাইকে এ ঘরে পাঠিয়ে দিন।

সুভদ্রা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত শেষ হয়ে আসছিল।

গ্রীষ্মের স্বল্পায়ু রাত্রি। খোলা জানালা পথে একটা ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া আসছিল।

রাধারমণ পাল এসে ঘরে ঢুকলেন।

ইতিমধ্যেই কিরীটীর পরামর্শে মনীশ চক্রবর্তী একটা চাদরে মৃতদেহটা ঢেকে দিয়েছিল, চেয়ার থেকে নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন পাল মশাইয়ের মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমায় ডেকেছেন?

পাল মশাই!

কিরীটীর ডাকে রাধারমণ পাল ওর মুখের দিকে তাকালেন।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি!

বলুন!

সুজিতবাবুকে আজ আপনি একটা পাইন্ট্ বোতল দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ।

অভিনয়ের রাত্রে অমনি প্রত্যেক বারই দিতেন?

আজ্ঞে!

পাল মশাই—একটা কাজ আপনাকে করতে হবে—কিরীটী বললে।

কি বলুন?

আপাততঃ যতদিন না সামন্ত মশাইয়ের মৃত্যু রহস্যের একটা মীমাংসায় পুলিস পৌছায় ততদিন আপনার দলের কয়েকজন কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না। ভাল কথা—দোলগোবিন্দবাবু আছেন তো—তাকে একবার যদি ডেকে দেন—কয়েকটা প্রশ্ন তাকে করতে চাই।

না মশাই—তার কোন সন্ধানই পাচ্ছি না।

সন্ধান পাচ্ছেন না?

হ্যাঁ।

আপনি জানেন না তিনি কোথায় গিয়েচেন?

না—হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়ার কারণও তো কিছু বুঝতে পারচি না।

কিরীটী একটু যেন কি ভাবল—তারপর বললে,

তিনি তো অনেক দিন আপনার দলে আছেন?

হ্যাঁ—তা ধরুন প্রায় বছর সাতেক তো হবেই—তবে মনে হচ্ছে—

কি?

ফ্রেঞ্চ লিকারের সন্ধানে বোধহয় গিয়েছে—সারাটা দিনই উসখুস করছিল, কিন্তু আমি যেতে দিইনি—নেশা করলে ওর হুঁশ থাকে না—পার্ট করতে পারবে না—নচেৎ সে পালাবার লোক নয়—নেশা একটু বেশি করে বটে— লোকটা সাদাসিধে—ঘোরপ্যাঁচ তেমন কিছু নেই—কিন্তু আপনি দলের কাদের কথা বলছিলেন—

আপনার দলের দেখচি সকলেরই বোতল-প্রীতি রয়েছে—কিরীটী বললে।

আজ্ঞে—

আর কে কে মদ্যপান করে থাকেন এ দলে?

সবাই করে অল্প বিস্তর।

শ্যামলকুমার?

বলতে পারি না।

আপনি?

না—জীবনে আজ পর্যন্ত মদ স্পর্শ করিনি।

হুঁ—তাহলে ঐ কথাই রইলো—ওরা যেন কলকাতার বাইরে না যায়!

কিন্তু আপনি দলের কাদের কথা বলছিলেন যারা পুলিসের বিনানুমতিতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না?

শ্যামলকুমার—সুজিতকুমার—সুভদ্রা দেবী আর আপনি—ও দোলগোবিন্দবাবু—

রাধারমণ পাল যেন কেমন ফ্যালফ্যাল করে বোবা অসহায় দৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর কিছুক্ষণ বাদে শুকনো গলায় প্রশ্ন করেন জিভটা দিয়ে ঠোঁট চেটে—কেন—আমাদের কি আপনি সন্দেহ করেন?

আপনাদের সকলের উপরই যে পুলিসের সন্দেহ পড়েচে তা নয়—

তবে?

বুঝতেই পারচেন—আপনারা যারা যারা মৃত হরিদাস সামন্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এ হত্যা রহস্যের মীমাংসায় একটা পৌছাতে হলে আপনাদের প্রত্যেকেরই, যাদের নাম করলাম আমাদের প্রয়োজন।

কিন্তু—ইতস্তত করলেন রাধারমণ পাল।

বলুন—থামলেন কেন?

সত্যিই কি আপনারা মনে করেন হরিদাস সামন্তকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে?

পুলিসের ধারণা আপাতত তাই—তবে ময়না তদন্তে যদি অন্য কিছু প্রকাশ পায়—

কিন্তু আমরা আমাদের এককালের একজন সহকর্মীকে হত্যা করতে যাবই বা কেন?

সেটা জানতে পারলে তো সব কিছুর মীমাংসা হয়েই যেত পাল মশাই—যাক, যা বললাম সেইমত সকলকে বলে দিন—আর পরশু বা তরশু বিকেলের দিকে আপনাদের চিৎপুরের অফিসে যাব—ওদের সকলকে উপস্থিত থাকতে বলবেন।

আর উপস্থিত থাকা! দল বোধহয় আমার ভেঙেই গেল রায়মশাই!

রাধারমণ পালের গলার স্বরটা যেন বুজে আসে।

না, না—দল ভাঙবে কেন?

কি বলেন—এর পরও দল আর থাকবে—তাছাড়া যা আপনারা বলচেন তা যদি সত্যিই হয়—উঃ, আমি আর ভাবতে পারচি না রায় মশাই—এ কি সর্বনাশ হলো! এখন দেখতে পাচ্ছি সামন্ত মশাইয়ের কথাটা শুনলেই বোধহয় ভাল হত—বার বার করে আমাকে বলেছিলেন—সামন্ত মশাই এ নাটক করবেন না—অন্য নাটক দেখুন। কিন্তু কি যে মাথায় ভূত চাপল—সামন্ত মশাই নিজে তো গেলেনই—আমাকেও ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন—অগাধ জলে—

কুণ্ডুভবন থেকে সকলের বিদায় নিতে পরের দিন বেলা দশটা হয়ে গেল।

কিরীটী আগেই চলে গিয়েছিল।

মনীশ চক্রবর্তীও লাশ মর্গে ময়না-তদন্তের জন্য চালান করে দিয়ে এক সময় বিদায় নিলেন।

রাধারমণ পাল সকলকে নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলেন দশটায়।

বেলা এগারোটায় একটা কলকাতাগামী ট্রেন আছে সেটাই ধরবেন।

গৃহে পৌঁছাতে কৃষ্ণা বললে, একেবারে রাত কাবার করে এলে—ব্যাপার কি! যাত্রা শুনছিলে নাকি? খুব ভাল যাত্রা হয়েছে বুঝি?

যাত্রা আর শেষ হলো কোথায়? একটা সোফার 'পরে গা এলিয়ে দিতে দিতে কিরীটী বললে, শেষ হওয়ার আগেই যবনিকা পাত।

কি রকম?

সামন্ত মশাই—সেদিনের সে ভদ্রলোককে মনে আছে? প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন! শেষ পর্যন্ত তার আশঙ্কাটাই সত্য হলো—

মানে?

কিরীটী তখন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বিবৃত করে গেল।

সব শুনে কৃষ্ণা বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, বল কি! শেষ পর্যন্ত তাহলে সত্যি সত্যিই—

হ্যাঁ—বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু।

কে বিষ দিল?

সব তো তোমাকে বললাম—কে দিতে পারে বলে মনে হয়?

তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ?

একেবারে যে পারিনি তা নয়—তবে—

তবে? কৃষ্ণা সকৌতুক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

হত্যার একটা মোটিভ থাকাও দরকার—কিন্তু বর্তমানে হাতের কাছে যে মোটিভটা পাচ্ছি সেটা তেমন যেন খুব একটা জোরালো মনে হচ্ছে না।

আমার কি মনে হচ্ছে জান?

কি?

তোমার ঐ সুভদ্রা না কি যেন নাম বলছিলে মেয়েটির—

তুমি কি সুভদ্রাকেই—কিরীটীর কথাটা শেষ হলো না।

কৃষ্ণা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কোন মেয়েছেলে যখন ভালবাসা নিয়ে খেলায় মাতে

তখন তার কাছে নীতি বলে কিছুই থাকে না—আর—

আর কি?

মেয়েদের স্বার্থে ঘা লাগলে তখন তারা একজন পুরুষের চাইতে অনেক নীচে নামতে পারে।

নারী হয়ে তুমি একজন নারীর এতবড় অপযশ গাইছ কৃষ্ণা?

অপযশ গাইব কেন—সত্য যা তাই বলচি—তাছাড়া কোন পুরুষমানুষ কি কোন নারীর সত্যিকারের মূল্যায়ন করতে পারে নাকি?

পারে না বুঝি?

না।

কেন?

কেন কি—সেইটেই তো পুরুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা।

কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার যুক্তিটা কি? ঐ স্বার্থে ঘা লেগেছে বলেই কি—

আমার কথাই বা তুমি মেনে নেবে কেন?

আর একটু প্রাঞ্জল যদি হতে দেবী—

আমার মনে হয় সুভদ্রার অনেকখানি অভিনয় আছে।

সে যে একজন পাকা অভিনেত্রী সেটা অবিশ্যি আমি বুঝতে পেরেচি—কিন্তু....

একটা কথা ভুলো না!

কি?

তোমায় বলেচি একটু আগে সুভদ্রা অন্তঃসত্ত্বা।

কৃষ্ণা মৃদু হাসল।

বলল—বোস—চা নিয়ে আসি। কৃষ্ণা সোফা ছেড়ে উঠে লঘু পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটীর চিন্তাধারাটাকে কিন্তু কৃষ্ণা যেন অন্য এক খাতে বইয়ে দিয়ে গেল। তবে কি সে ভুল পথে চলেছে!

স্ত্রীলোকের মন বিচিত্র পথে আনাগোনা করে মিথ্যা নয়—এমনিতেই মেয়েদের সহজাত একটা অভিনয় প্রবৃত্তি থাকে—তার উপরে সুভদ্রা তো রীতিমত অনুশীলনের দ্বারা এত বছর ধরে সেই অভিনয় প্রতিভাকেই তার ঝালিয়ে তুলেছিল।

সামান্য ইস্পাত আজ ঘষায় ঘষায় ধারালো হয়ে উঠেছে।

একটু পরে কৃষ্ণা দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

একটা কাপ কিরীটীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্যটা নিজে নিয়ে মুখোমুখি বসল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কিরীটী বললে, কৃষ্ণা, আজ একবার বর্ধমান যাব।

হঠাৎ বর্ধমান?

একটু ঘুরে আসি।

সুভদ্রার মাসীর খোঁজ নিতে?

হ্যাঁ—বোনঝিটির পরিচয় পেলাম—মাসীটির সঙ্গে যদি পরিচয় করা যায়—

কখন যাবে?

দুপুরে।

রাত ন'টা নাগাত বর্ধমান থেকে ফিরে দেড়তলার ঘরে প্রবেশের মুখে দরজার গোড়ায় নজর পড়ল এক জোড়া ভারী জুতোর।

মনে হচ্ছে মনীশ চক্রবর্তীর আগমন হয়েছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই দেখল তার অনুমান মিথ্যা নয়—বাইরে মনীশ চক্রবর্তীর জুতোই সে দেখেছে।

মনীশ চক্রবর্তী একটা চেয়ারে বসেছিলেন—সামনে একটা খালি চায়ের কাপ।

মনীশবাবু যে—কতক্ষণ—

তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হবে—মল্লিক সাহেবকে আপনি ফোন করেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ।

তাকে বলেছেন কেসটার কথা?

কথায় কথায় বলেছিলাম।

আমি কি আপনাকে কোন অসম্মান করেছি বা কোনরকম অসহযোগিতা করেছি আপনার সঙ্গে?

না, না—সে কি কথা!

মল্লিক সাহেব মনে হলো যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।.

না, না—আমি ফোন করে দেব'খন—বরং আমি আপনার দক্ষতার প্রশংসাই করছিলাম তার কাছে—যাক, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা পেয়েচেন?

হ্যাঁ, সন্ধ্যায় পেয়েছি—এই যে দেখুন—আপনার অনুমানই ঠিক—a case of poisoning—stomach contents-এর মধ্যে লিকারের সঙ্গে মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষ ছিল। কেমিক্যাল এ্যানালিসিসের জন্য পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে স্টমাক কনটেন্টস—

খুব ভাল করেচেন—কাঁচের গ্লাস আর বোতলটাও পাঠিয়েছেন তো?

হ্যাঁ—তারপর একটু থেমে বললে, আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন কিরীটীবাবু?

কি বলুন তো?

ঐ দোলগোবিন্দ না কি যেন নাম—যে সে রাত্রে হঠাৎ গা ঢাকা দিয়েচে—এ তারই কীর্তি! নিশ্চয় তারই কীর্তি!

হতে পারে—তা হঠাৎ তারই উপরে সন্দেহটা পড়চে কেন বিশেষ করে?।

নচেৎ ব্যাটা হঠাৎ গা ঢাকা দিলে কেন? কিন্তু যাবে কোথায়! আমি লোক লাগিয়েছি—ঠিক ধরবই ব্যাটাকে।

ব্যাপারটা স্রেফ ভয় বা নার্ভাসনেসও তো হতে পারে মিঃ চক্রবর্তী!

না, না—কিরীটীবাবু, আপনি যাই বলুন—এতকাল খুনে ডাকাতদের নিয়ে কারবার করচি—ও মশাই সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে—আরো একটি লোককে আমার সন্দেহ হয়—ব্যাটা একটি বাস্তু ঘুঘু!

কার কথা বলচেন?

কার আবার—ঐ রাধারমণ পাল—দলের অধিকারী—কেমন ভিজে বেড়ালটির মত হাব-ভাব দেখাচ্ছিল!

ভদ্রলোক প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারেননি?

ওটা স্রেফ অভিনয়। বুঝতে পারলেন না—ও দুটোকেই আমি ভাবচি এ্যারেস্ট করব—এ্যারেস্ট করে থানায় এনে চাপ দিলেই দেখবেন স্বীকার করতে পথ পাবে না। হুঁ! বলে কত দেখলাম! মল্লিক সাহেবকে আমি বলে দিয়েচি দুটো দিন অপেক্ষা করুন স্যার—ও রহস্যের মীমাংসা আমি করে এনেচি প্রায়!

হুঁ! তাহলে শ্যামলকুমারের উপর থেকে সন্দেহটা আপনার গেছে? হঠাৎ কিরীটী বললো।

যায়নি একেবারে, তবে —

তবে?

অতটা আর নেই—তবু তার উপরে আমার চোখ আছে বৈকি!

কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ ধরনের হত্যার একটা মোটিভ—উদ্দেশ্য থাকে—আপনার মনে হয় এক্ষেত্রে মোটিভটা কি?

মোটিভ? বুঝতে পারলেন না—কথাটা বলে একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে মনীশ চক্রবর্তী কিরীটীর দিকে তাকালেন।

না—ঠিক বোধহয় এখনো বুঝিনি।

ওদের দু'জনেরই strong motive আছে।

যথা?

আজ সকালে দোলগোবিন্দর ছোটভাইকে থানায় ডেকে আনিয়েছিলাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সে কি বললে জানেন? দোলগোবিন্দ লোকটা নাকি যেমন মাতাল তেমনি একের নম্বরের জুয়াড়ি।

মাতাল জুয়াড়ি?

হ্যাঁ।

Rare combination বলতেই হবে—তবে পাল মশাইও যেন অমনিই কিছু বলছিলেন।

জানেন শনিবার শনিবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে সে যেত—আর সেই ব্যাপারেই হরিদাস সামন্তর কাছে তাকে হাত পাততে হত।

হরিদাস সামন্ত টাকা দিত?

দিত। হ্যাঁ, খেপে খেপে অনেক টাকা তাকে দিয়েছিল ধার সামন্ত, যার একটা পয়সাও নাকি শোধ করেনি আজ পর্যন্ত দোলগোবিন্দ।

টাকা ধার দিত? টাকা ফেরত পাবে না জেনেও টাকা ধার দিত, —আশ্চর্য!

তাই তো শুনলাম। পাল মশাইকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনিও তাই বললেন। এখন বুঝতে পারচেন—সেই টাকা যাতে কোনদিন দোলগোবিন্দকে শোধ না করতে হয় তাই কৌশলেই হয়তো সে হরিদাস সামন্তকে—and that was the motive.

সরিয়ে দিয়েচে বলতে চান?

ব্যাপারটা কি খুব অসম্ভব?

হুঁ! আর রাধারমণ পাল—তার কি স্বার্থ?

আমার কি মনে হয় জানেন?

কি?

লোকটার ঐ সুভদ্রা মেয়েটার 'পরে লোভ ছিল।

লোভ?

কেন, থাকতে পারে না? অমন ডবগা ছুঁড়ি—চেহারাখানা ভাবুন তো একবার!

মনে হচ্ছে আপনারও মনে যেন দোলা লাগিয়েছে সুভদ্রা—মৃদু হেসে কিরীটী সকৌতুকে বললে।

যাঃ, কি যে বলেন!

আহা—এতে লজ্জার কি আছে মিঃ চক্রবর্তী! ভাল জিনিস সকলের মনকেই আকর্ষণ করে।

মনীশ চক্রবর্তী সলজ্জ হাসি হাসে।

॥ নয় ॥

পরের দিন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পরেই কিরীটী চিৎপুরে রাধারমণ পালের যাত্রা পার্টির অফিসে গিয়ে হাজির হলো।

গ্রীষ্মের রাত আটটা—সন্ধ্যাও বলা চলে সবে।

ঐ অঞ্চলটা যেমন ঘিঞ্জি—তেমনি নোংরা—তেমনি মানুষের ভিড়। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-রিক্সা ও ঠেলাগাড়িতে যেন গিজ গিজ করছে।

গাড়ি থেকে নেমে কিরীটী হীরা সিংকে বলে, আশেপাশে কোথাও পার্ক করে রাখ।

এ অঞ্চলটা শহরের বোধহয় সবচাইতে বেশী পুরানো। সেকেলে ধরনের সব দোতলা তিনতলা বাড়ি—গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে।

মধ্যে মধ্যে সরু গলি।

গলির মোড়ে মোড়ে—চা ও পান-সিগারেটের দোকান।

রাস্তাটা যেমন সংকীর্ণ তেমনি নোংরা।

নবকেতন যাত্রা পার্টির অফিস খুঁজে পেতে বেশ একটু সময়ই লাগল।

তিনতলা একটা বাড়ি—তার মধ্যে অনেক ঘর। দোতলায় নবকেতন যাত্রা পার্টির অফিস। নীচের তলাটা অন্ধকার।

ভাঙা সরু সিঁড়ি—অন্ধকার।

বারোয়ারী সিঁড়িতে আলোর বলতে গেলে কোন ব্যবস্থাই নেই।

পকেট থেকে সরু পেনসিল টর্চটা বের করে তারই সাহায্যে কোনমতে কিরীটী দোতলায় উঠে গেল।

আরো দুটি যাত্রা পার্টির অফিস দোতলায়।

হৈ-চৈ করে গান বাজনা আর অভিনয়ের মহলা চলেছে।

সরু রেলিং-ঘেরা বারান্দা—বারান্দাটা দক্ষিণ উত্তর ঘুরে—পশ্চিম-উত্তরে চলে গিয়েছে।

দক্ষিণের শেষ দুটো ঘরেই নবকেতন যাত্রা পার্টির অফিস।

একটা ছোকরা একগাদা মাটির ভাঁড় ও একটি চায়ের কেৎলী নিয়ে বারান্দা দিয়ে আসছিল, তাকেই কিরীটী শুধালো, নবকেতন যাত্রা পার্টির অফিস্ কোন্টা?

ঐ যে স্যার—এগিয়ে যান না—

ছোকরাটি কিরীটীকে কথাটা বলে নিজের কাজে চলে গেল।

কিরীটী এগিয়ে গেল।

দরজা খোলাই ছিল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল।

দরজার পাশে দেওয়ালে টিনের সাইনবোর্ড লাগানো—নবকেতন যাত্রা পার্টি।

ভিতরে প্রবেশ করল কিরীটী।

ঘরের মধ্যে দুটি লোক ছিল।

চিনতে তাদের কষ্ট হয় না কিরীটীর—একজন অধিকারী রাধারমণ পাল মশাই আর একটি স্ত্রীলোক।

চন্দননগরে সে রাত্রে ঐ অভিনেত্রীটিকেও কিরীটী দেখেছিল—নাম কৃষ্ণভামিনী।

বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, মোটাসোটা গড়ন।

দু'জনে মুখোমুখি দুটি তক্তপোশের উপর বসে নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে যেন কি আলোচনা করছিল—কিরীটীর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

কিরীটীর আজ ছদ্মবেশ ছিল না।

তাই বোধহয় প্রথমটায় কিরীটীকে চিনতে পারেন না পালমশাই। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তাকালেন—কি চাই?

পাল মশাই—নমস্কার!

নমস্কার—কোথা থেকে আসচেন?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, চিনতে পারচেন না বোধহয়?

না।

আমি ধূর্জটি রায়।

আপনি—বিস্ময়ে পাল মশাইয়ের গলাটা যেন বাক্যরোধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, সেটা ছিল আমার ছদ্মবেশ।

ছদ্মবেশ!

হ্যাঁ, সামন্ত মশাইয়ের আমন্ত্রণেই ঐ ছদ্মবেশে সেদিন চন্দননগরে আমায় যেতে হয়েছিল।

বুঝলাম না ঠিক।

আমার আসল নামটা হয়ত শুনে থাকবেন—কিরীটী রায়!

রহস্যানুসন্ধানী কিরীটী রায়!

হ্যাঁ।

তা আপনি—

বললাম তো সামন্ত মশাইয়ের কেমন ধারণা হয়েছিল তার জীবন বিপন্ন, তাই তিনি আমার স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তথাপি রাধারমণ পালের নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল। কৃষ্ণভামিনীও চেয়েছিল কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী আবার বললে, সেদিন বলেছিলাম আসব এখানে—

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে। বসুন বসুন!

ঘরটি মাঝারি সাইজের—একধারে একটি তক্তপোষ পাতা সতরঞ্চি বিছানো, গোটাকয়েক তাকিয়া—মাঝখানে একটি টানাওয়ালা নীচু ডেস্ক।

অন্যপাশে একটি কাঠের আলমারী। খানকয়েক চেয়ার ও টুল।

দেওয়ালে দু'তিনটে ক্যালেণ্ডার—একটি গ্রুপ ফটো।

ঘরের মধ্যে বেশ একটি উজ্জ্বল শক্তির বাতি জ্বলছিল।

রাধারমণ পাল তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিমধ্যে। বললেন, বসুন রায় মশাই!

আপনার দলের আর সবাইকে দেখছি না!

সবাই আছে পাশের ঘরে—রাধারমণ পাল বললেন—ভামিনী, শঙ্করকে ডেকে চায়ের কথা বল।

ব্যস্ত হবেন না পাল মশাই—চায়ের এখন প্রয়োজন নেই—কিরীটী বললে।

দল বোধহয় উঠেই যাবে রায় মশাই—রাধারমণ বললেন এরপর।

কেন?

আর কেন—শ্যামল চলে যাচ্ছে—নোটিস দিয়েছে—সামন্ত মশাই নেই, বুঝতেই পারচেন শ্যামলও চলে গেলে—

সুভদ্রাও কি নোটিস দিয়েছে নাকি? কিরীটী শুধাল।

না—দেয়নি এখনো, তবে শ্যামল না থাকলে সুভদ্রাও যে থাকবে না সে তো জানা কথাই।

তা বটে—আর সুজিতবাবু?

না, ও বোধহয় যাবে না। হরিদাস চলে গেল—শ্যামল আর সুভদ্রা চলে গেলে কাকে নিয়ে আর পালা গাওয়াব?

ভাল কথা, দোলগোবিন্দবাবুর কোন সংবাদ পেলেন?

সে ফিরে এসেছে।

এসেছে—তা সেদিন রাত্রে হঠাৎ গা-ঢাকা দিয়েছিল কেন?

ভয়ে।

কিরীটী মৃদু হাসল।

সেই আলোচনাই করছিলাম ভামিনীর সঙ্গে বসে। একদিন আমি, হরিদাস আর ঐ কৃষ্ণভামিনী তিনজনে মিলে দল গড়েছিলাম। আমার আর হরিদাসের আধা-আধি বখরা—শেষ পর্যন্ত হরিদাস বখরা বেচে দিল আমাকে।

হরিদাসবাবুর মুখে সে-কথা শুনেছি।

শুনেছেন!

হ্যাঁ।

কি যে হলো, হঠাৎ বখরা বেচে দিল।

সবাইকে আজ এখানে উপস্থিত থাকতে বলেছিলাম—

সবাই এসেছে—সবাই পাশের ঘরে আছে—কার কার সঙ্গে আপনি কথা বলতে চান বলুন, আমি ডাকচি—না, সবাইকে ডাকব?

সবাইকে ডাকার একসঙ্গে প্রয়োজন নেই—সকলকে আমার প্রয়োজনও নেই। আচ্ছা, সে রাত্রে হরিদাসবাবুর সাজঘরের পাশের দুটি সাজঘরে কারা কারা ছিল বলতে পারেন?

হরিদাসের সাজঘরের ডান দিকের সাজঘরে ছিল সুজিত আর কৃষ্ণধন।

কৃষ্ণধন?

হ্যাঁ—কৃষ্ণধন চাটুজ্যে—ঐ যে লম্বা ঢ্যাঙা মত—নায়কের বন্ধুর রোল করেছিল নাটকে!

হ্যাঁ—মনে পড়েছে—আর বাঁ দিককার ঘরে?

সুভদ্রা আর এই কৃষ্ণভামিনীর সাজঘর ছিল। আর বাকী সব একটা বড় সাজঘরে ছিল। মধ্যবর্তী দরজা ছিল একটা দু'ঘরের মধ্যে।

কিরীটী কি যেন চিন্তা করে।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী—হরিদাস সামন্তর মৃত্যু হয়েছিল রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে—অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে। পালা শুরু হয়েছিল ঠিক রাত সাড়ে সাতটায়।

পাল মশাই?

আজ্ঞে!

রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত, আপনি কোথায় ছিলেন ঐ একঘন্টা সময়?

ঠিক মনে পড়ছে না।

তৃতীয় অঙ্ক শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টা কোথায় ছিলেন মনে করে দেখুন!

আমি প্রথম দিকে আসরেই ছিলাম—তারপর হঠাৎ মনে পড়ল হরিদাস একশো টাকা চেয়েছিল—সেই টাকাটা দেবার জন্য নিজের ঘরে চলে আসি।

সেই সময় সে ঘরে আর কে ছিল?

আমি আর দোলগোবিন্দ।

দোলগোবিন্দবাবু তার সাজঘরে না থেকে আপনার ঘরে ছিলেন কেন?

তার পার্ট হয়ে গিয়েছিল—তাই তার সাজঘরে না থেকে আমার ঘরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল বোধহয়।

ভাল কথা—পাল মশাই—

বলুন!

দোলগোবিন্দবাবুর রেস খেলা অভ্যাস আছে—তাই না?

হ্যাঁ—ঐ ঘোড়া রোগেই তো ওর সব খেয়েছে—হরিদাসের ছিল মদ আর মেয়েমানুষ—আর দোলগোবিন্দর মদ আর ঘোড়া—নচেৎ দু'জনারই অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা ছিল।

দু'জনার মধ্যে খুব সদ্ভাব—মানে সম্প্রীতি ছিল বুঝি?

তা তো ছিল বলেই মনে হয়।

দোলগোবিন্দবাবুকে হরিদাসবাবু প্রায়ই টাকা ধার দিতেন—তাই না?

দিত—কিন্তু শুনলেন কোথায়?

শুনেছি। এবং সে টাকা তিনি শোধ করতেন না?

রেস খেলে সব ওড়াত, টাকা শোধ করবে কোথা থেকে?

টাকা কখনো দোলগোবিন্দবাবু শোধ করতেন না, অথচ হরিদাসবাবু তাকে টাকা দিয়েই যেতেন?

কি জানি মশাই, তাই তো দিত—

আচ্ছা পাল মশাই—সুজিতবাবুর সঙ্গে দোলগোবিন্দবাবুর সম্প্রীতি কেমন ছিল?

দু'জনে বলতে পারেন সাপে নেউলের সম্পর্ক—ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত।

আর একটা কথা—বলতে বলতে কিরীটী পকেট থেকে কাগজের একটা ভাঁজ-করা টুকরো বের করল, আপনি তো হরিদাস সামন্তর অনেক দিনের পরিচিত—দেখুন তো এই লেখাটা—তারই হাতের লেখা কিনা?

দেখি—রাধারমণ পাল ভাঁজ-করা কাগজটা হাতে নিলেন—চোখে চশমা দিয়ে বেশ ভাল করে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—এটা কোথায় পেলেন?

মনে নেই। সে রাত্রে শ্যামলবাবু দিয়েছিলেন—এই সেই চিরকুট যেটা রাধা দেবী—শ্যামলের হাতে দেবার জন্য চাকর ভোলাকে দিয়েছিল।

হ্যাঁ—মনে পড়েচে—চিরকুটে লেখা—শ্যামল একবার দেখা করবে সময় পেলেই—জরুরী দরকার!

কি মনে হয় পাল মশাই—লেখাটা সামন্ত মশায়েরই তো?

সেই রকমই তো হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে!

ঠিক বলতে পারচেন না? আচ্ছা, হরিদাসবাবুর কোন হাতের লেখা আপনার কাছে আছে?

সে রকম কিছু নেই।

কোন চিঠি, বা—

দাঁড়ান—মনে পড়েচে—সুভদ্রা-হরণ নাটকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে মধ্যে হরিদাসের হাতে correction ও suggestion লেখা আছে—যা সে রিহার্সেলের সময় লিখেছিল।

দেখতে পারি একবার নাটকের পাণ্ডুলিপিটা?

নিশ্চয়ই! ভামিনী—আলমারী থেকে পাণ্ডুলিপিটা বার করে দাও তো—এই নাও চাবি।

পাল মশাই পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করে দিলেন।

কৃষ্ণভামিনী নিঃশব্দে উঠে গিয়ে চাবি দিয়ে আলমারী খুলে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা বের করে এনে দিল।

কিরীটী উল্টে-পাল্টে কিছুক্ষণ কয়েকটা পাতা দেখল, তারপর বললে—পাল মশাই!

বলুন!
পাণ্ডুলিপিটা আমি নিয়ে যাব?
নিয়ে যান ও অভিশপ্ত পাণ্ডুলিপি—ও এ ঘরে থাকলে হয়তো আরো অমঙ্গল হবে!
কৃষ্ণভামিনী দেবী!
কিরীটীর ডাকে মহিলাটি ওর মুখের দিকে তাকাল।
এক কাপ চা খাওয়ান।
কৃষ্ণভামিনী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
পাল মশাই?
আজ্ঞে!
আমার দুটো ঠিকানা চাই।
ঠিকানা?
হ্যাঁ—সুভদ্রা ও হরিদাসবাবু কোথায় থাকতেন সেই বাড়ির ঠিকানা, আর সুজিতবাবুর বাসার ঠিকানা।
সুভদ্রা আর হরিদাস পাল স্ট্রীটে থাকত—৩/২; আর সুজিত কালীঘাটে থাকে—মহিম হালদার স্ট্রীট।
খাতা দেখে অতঃপর সঠিক ঠিকানা দুটো বলে দিলেন রাধারমণ, কিরীটী টুকে নিল নোটবুকে।
আর একটা কথা!
বলুন?
সুজিতবাবুই তো একদিন সুভদ্রাকে আপনার দলে এনেছিলেন?
হ্যাঁ!
এবারে দোলগোবিন্দবাবুকে একবার ডাকুন।
আর কাউকে?
না।
রাধারমণ পাল ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং একটু পরে দোলগোবিন্দকে নিয়ে এসে ঢুকলেন।

॥ দশ ॥

রোগা প্যাঁকাটির মত চেহারা। তোবড়ানো গাল—কোটরগত চক্ষু—দীর্ঘ অত্যাচারের সাক্ষ্য দেয়।
দুই চোখে ভীত-সন্ত্রস্ত চাউনি।
আপনারই নাম দোলগোবিন্দ—কিরীটীর প্রশ্ন।
আজ্ঞে সিকদার!
আপনার সে রাত্রে লাস্ট সিনে চাকরের পার্টে প্রক্সি দেওয়ার কথা ছিল না?
আজ্ঞে!
তবে যাননি কেন?
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?
হ্যাঁ, মানে—ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল!
ঘুমোতে ঘুমোতেই বুঝি কোথাও চলে গিয়েছিলেন?
আজ্ঞে!
তবে—সে রাত্রে অত খুঁজেও আপনাকে পাওয়া গেল না কেন?
আজ্ঞে—পুকুরের পাড়ে—
পুকুরের পাড়ে?
হ্যাঁ—বড্ড গরম—তাই পুকুরের ধারে সিঁড়ির উপরে গিয়ে বসেছিলাম একটু। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—
তারপর ঘুম ভাঙল কখন?
পরের দিন সকালে।

তারপর কি করলেন?

তখন শুনলাম—হরিদাসদা খুন হয়েছেন—সেই শুনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

কার কাছে শুনলেন?

রাধার কাছে।

পাল মশাই—রাধা দেবীকে ডাকুন তো!

রাধারমণ কিরীটীর নির্দেশে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন আবার। ঠিক ঐ সময় কৃষ্ণভামিনী এক কাপ চা হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

চা—

রাখুন ওখানে।

কৃষ্ণভামিনী চায়ের কাপটা পাশের একটা টুলের উপরে নামিয়ে রাখল।

রাধারাণী এসে ঘরে ঢুকল রাধারমণ পালের সঙ্গে।

রাধারাণী দেবী আপনার নাম?

আজ্ঞে—

আপনি দোলগোবিন্দবাবুকে পরের দিন সকালবেলা দিঘির পাড়ে দেখেছিলেন?

কে বললে?

কেন, উনি বলেছেন!

ও মাগো, কোথা যাব গো—হ্যাঁরে হাড়-হাবাতে অলপ্পেয়ে অনামুখো—তোর সঙ্গে আমার দেখা হল পরের দিন সকালে কখন রে—

রাধা—মানে, তুই—

দোলগোবিন্দর মুখের কথাটা শেষ হতে পারল না।

রাধা চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল—বদমায়েসী করবার আর জায়গা পাওনি হতচ্ছাড়া ড্যাকরা? খেংড়ে বিষ ঝেড়ে দেব তোমার!

সে কি রাধা, তুমি আমায় বললে না—দেখুন স্যার, ও মিথ্যে বলচে, নচেৎ আমি জানব কি করে যে হরিদাসদা খুন হয়েচে!

রাধারাণী প্রায় তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দোলগোবিন্দর উপর—

কিরীটী বাধা দিল—থামুন—থামুন কি করচেন আপনারা—যান রাধারাণী দেবী, আপনি এ ঘর থেকে চলে যান।

রাধারাণী গজরাতে গজরাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দোলগোবিন্দবাবু—কিরীটী ডাকল।

কেঁদে ফেললে দোলগোবিন্দ—বিশ্বাস করুন স্যার, আমি কিছু জানি না—কিছু দেখিনি সে রাতে—ওসব খুনোখুনির মধ্যে আমি ছিলাম না।

আপনি সে রাতে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কোথায় ছিলেন দোলগোবিন্দবাবু—অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সময়?

ঠিক মনে পড়চে না। কাঁদতে কাঁদতে বললে দোলগোবিন্দ।

মনে পড়চে না!

আজ্ঞে না।

ঐ সময় হরিদাসবাবুর ঘরে গেছেন একবারও?

না তো!

কাউকে সে-ঘরে যেতে দেখেছেন?

কাকে দেখব?

কাউকে দেখেছেন কিনা তাই জিজ্ঞাসা করচি। মনে করে দেখুন না! কিংবা মনে করে দেখুন তো কেউ আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিল কিনা শ্যামলবাবুকে দিতে!

চিঠি?

হ্যাঁ, একটুকরো কাগজ!

কাগজ—শ্যামলকুমারকে দিতে?

হ্যাঁ—দিয়েছিল কেউ আপনাকে—তাই না?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে—আমাকে নয়—ভোলাকে—কে যেন একটা কি ভোলার হাতে দিয়ে বললে সেটা শ্যামলকুমারকে দিতে, হরিদাসদা দিয়েচেন।

কে সে?

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি—তাছাড়া আসরে তখন আমার যাবার কথা—আমার পার্ট ছিল।

মেয়েছেলে, না কোন পুরুষ?

মনে হচ্ছে মেয়েছেলে—

কে বলে মনে হয় সে আপনাদের দলের?

চিনতে পারিনি—ঠিক বুঝতে পারিনি।

রাধারমণবাবু?

আজ্ঞে!

আপনার দলে ক'জন স্ত্রীলোক আছেন?

চারজন। কৃষ্ণভামিনী, সুভদ্রা, রাধারাণী আর ফুল্লরা।

ফুল্লরা কে?

যে সে-রাত্রে নায়কের ছোট বোন সেজেছিল।

তাকে একবার ডাকবেন এ ঘরে?

রাধারমণ তখুনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

দোলগোবিন্দবাবু?

আজ্ঞে!

আপনার দেশ কোথায়?

বর্ধমানে।

টাউনে?

না, মেমারীতে—সুভদ্রার মাসী যেখানে থাকে।

সুভদ্রার মাসীকে আপনি চেনেন?

চিনব না কেন—একই পাড়ায় তো!

তাহলে সুভদ্রাকেও আপনি চেনেন?

ও যখন মেমারীতে ছিল তখন চিনতাম—তাছাড়া বাড়িতে তো আমি খুব একটা যাই না।

বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

কেউ নেই—এক বিধবা পিসি।

বিয়ে-থা করেননি?

করেছি—স্ত্রী এখানেই আমার সঙ্গে বেলেঘাটায় থাকে।

শেষ কবে সুভদ্রাকে আপনি মেমারীতে দেখেন?

তা বছর দশেক আগে হবে। ও বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে।

পালিয়ে?

হ্যাঁ, শুনেছিলাম তাই—

কার সঙ্গে—ওখানকারই কারো সঙ্গে কি?

তা জানি না, স্ত্রীর মুখে পরে আমি কথাটা শুনেছিলাম।

সুভদ্রাকে তারপর কবে আবার দেখলেন?

এখানেই—বছর তিনেক আগে এ দলে এসে।

এ দলে কতদিন আপনি আছেন?

তিন বছর।

তার আগে?

অন্য দলে অভিনয় করতাম।

সে দল ছেড়ে দিলেন কেন?

মিথ্যে বলব না হুজুর, আপনি পুলিশের লোক—চুরির দায়ে আমার চাকরি যায়।

চুরি?
হ্যাঁ—সব মিথ্যে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারলাম না।
রাধারমণ ঐ সময় ফুল্লরাকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।
ফুল্লরার বয়স বছর কুড়ি হবে।
বেশ ফরসা গায়ের রং—দোহারা চেহারা।
মুখটা গোল, চক্ষু দুটি চঞ্চল।
এরই নাম ফুল্লরা, রায় মশাই—রাধারমণ বললেন।
তোমার নাম ফুল্লরা?
আজ্ঞে! গলাটি মিহি ও মিষ্টি সুরেলা।
কিরীটীর মনে পড়ল মেয়েটি পালায় সে-রাত্রে চমৎকার গান গেয়েছিল।
তুমি সে রাত্রে শ্যামলবাবুর হাতে একটা চিঠি দিয়েছিলে?
কে বললে?
দিয়েছিলে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করচি—
না তো—
দোলগোবিন্দবাবু, দেখুন তো—সে রাত্রে ও-ই কি শ্যামলবাবুর হাতে চিঠিটা দিয়েছিল?
দোলগোবিন্দ তাকাল ফুল্লরার দিকে—ফুল্লরাও তাকিয়ে থাকে ভ্রূ কুঞ্চিত করে দোলগোবিন্দর দিকে—কয়েকটা মুহূর্ত—তারপর দোলগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে—আজ্ঞে না।
ফুল্লরার ভ্রূ যুগল সরল হয়ে আসে।
ঠিক আছে, তোমরা যেতে পার।
দোলগোবিন্দ আর ফুল্লরা ঘর ছেড়ে চলে গেল।
আর কাউকে ডাকব রায় মশাই? রাধারমণ শুধালেন।
না, থাক।
সবাই আছে ও ঘরে।
থাক। প্রয়োজন নেই।
চা-টা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল রায় মশাই। আর এক কাপ চা আনি?
না—না, এবারে আমি যাব—আচ্ছা চলি, নমস্কার!
কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দিন দুই পরে—
দ্বিপ্রহরে কিরীটী ও কৃষ্ণার মধ্যে কথা হচ্ছিল। গতকাল সকালে আবার কিরীটী বর্ধমানে মেমারীতে গিয়েছিল, ফিরেছে রাত্রে।
কৃষ্ণা সেই সম্পর্কেই কথা বলছিল—কাল হঠাৎ আবার বর্ধমানে গিয়েছিলে কেন বললে না তো!
আগের বার সুভদ্রার মাসীর খোঁজ পাইনি, তাই আবার গিয়েছিলাম যদি তার দেখা পাই!
দেখা হল?
না।
কেন, বাড়িতে ছিল না বুঝি?
বছর খানেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।
সে কি! তবে যে সুভদ্রা তোমাকে বলেছিল—
এখন দেখছি তোমার কথাই ঠিক কৃষ্ণা!
তোমাকে সেদিনই আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম না সুভদ্রাকেই আমার সন্দেহ হয়!
সন্দেহ যে আমারও হয় না তা নয়, তবে—
তবে আবার কি?
তার গর্ভের সন্তানই সব যেন কেমন এলোমেলো করে দিচ্ছে।
ঐ মেয়েটি একটি সাংঘাতিক চরিত্রের এ তুমি জেনে রেখো!

সেটা যে বুঝিনি তা নয় কৃষ্ণা, কিন্তু তার গর্ভের সন্তানই যে আমার সব হিসাব গোলমাল করে দিচ্ছে!

ওদের মত মেয়ের আবার সন্তান ধারণ—

তুমি যে দেখছি না বিইয়েই কানাইয়ের মা হয়ে বসলে!

ঠাট্টা করছ?

পাগল—যাও, গলাটা শুকিয়ে গিয়েচে, এক কাপ চা আন তো!

॥ এগার ॥

রাত তখন বোধ করি ন'টা হবে।

সারাটা দিন প্রচণ্ড গরম গিয়েছে—যেমন রৌদ্রের তাপ তেমনি গরম হাওয়া—গা যেন ঝলসে দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ হলো সবে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

খুঁজে খুঁজে কিরীটী শ্যামবাজারে পাল স্ট্রীটে রাধারমণ পালের দেওয়া ঠিকানা মত একটা সরু গলির মুখে এসে দাঁড়াল।

পাল স্ট্রীট থেকেই সরু গলিটা একটা গলির মত যেন বের হয়ে গিয়েছে। দু'পাশে গলিটার দোতলা তিনতলা বাড়ির ভিতরকারের অংশ।

গলি-পথে আলোর তেমন ভাল ব্যবস্থা নেই।

পকেট থেকে টর্চটা বের করে আলো ফেলে ফেলে নম্বরটা দেখে চতুর্থ বাড়ির দরজার কলিংবেলটা কিরীটী টিপল, বার দুই টেপবার পর ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ—অন্ধকার—

নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এলো অন্ধকারেই— এত তাড়াতাড়ি এলে—তোমার তো আসবার কথা—

সুভদ্রার কথা শেষ হলো না।

কিরীটী সাড়া দিয়ে বললে—সুভদ্রা দেবী, আমি কিরীটী রায়।

মুহূর্তের যেন একটা স্তব্ধতা, তারপরই চাপা সতর্ক কিছুটা শঙ্কিত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—কিরীটীবাবু?

হ্যাঁ, ভিতরে চলুন—আপনার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা আছে।

দরকারী কথা—কিন্তু আমি যে এখুনি একবার বেরুব কিরীটীবাবু!

বেশী সময় নেব না—দু চার মিনিট—চলুন না!

আসুন।

সরু একটা অন্ধকার প্যাসেজ—কিরীটী টর্চ হাতে সুভদ্রার পিছনে পিছনে এগুতে এগুতে বললে, প্যাসেজে বুঝি আলো নেই?

ছিল। ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

প্যাসেজের পরে একটা ছোট বারান্দা মত—তার একটার মধ্যে টিনের একটা শেড।

একটা ঘরের দরজা খোলা—আলো আসছিল খোলা দরজাপথে।

পাশাপাশি দুটো ঘর।

যে ঘরে আলো জ্বলছিল কিরীটীকে নিয়ে সুভদ্রা সেই ঘরেই এসে ঢুকল। ঘরটা বড় নয়—ছোটই আকার। কিন্তু ছিমছাম করে সাজানো।

একপাশে একটি খাটে পরিপাটি করে শয্যা বিছানো—পাশাপাশি দু'জোড়া মাথার বালিশ—বালিশের ওয়াড়ে ঝালর বসানো লেসের।

মধ্যখানে একটা পাশ-বালিশ।

মাথার কাছে একটা নীচু টেবিলের 'পরে একটা টেবিল-ফ্যান।

ফ্যানটা ঘূর্ণায়মান—তার পাশে একটা কাঁচের প্লেটে কিছু বেলফুল—একটি ধূপদানীতে ধূপকাঠি প্রজ্বলিত।

চন্দনধূপের মিষ্টি গন্ধ বেলফুলের সুগন্ধের সঙ্গে মেশামেশি হয়ে ঘরের বাতাস যেন স্নিগ্ধ করে রেখেছে।

অন্যদিকে আয়না বসানো একটি কাঠের আলমারি।

একটি মিটসেফ—সেফের উপরে গোটা দুই ইণ্ডিয়ান রামের বোতল—একটা কাঁচের জাগ জল ভর্তি—গোটা দুই গ্লাস।

খান দুই চেয়ারও ছিল ঘরে।

বসুন কিরীটীবাবু!

কিরীটীর দৃষ্টি তখন সুভদ্রার উপর ন্যস্ত।

চমৎকার করে খোঁপা বেঁধেছে সুভদ্রা—খোঁপায় একটি বেলফুলের মালা জড়ানো।

পরনে নীল রংয়ের লাল চওড়া পাড় দামী তাঁতের শাড়ি। হাতে দু'গাছি সোনার বালা।

কপালে কুমকুমের টিপ।

এই বাড়িতেই আপনি হরিদাস সামন্তর সঙ্গে থাকতেন?—কিরীটী শুধালো।

হ্যাঁ—এবারে ছেড়ে দিতে হবে।

ছেড়ে দেবেন কেন? শ্যামলবাবু বুঝি অন্য বাসা ঠিক করেছেন?

এখনো পায়নি—খুঁজছে বাসা।

হুঁ! তা আপনার মাসীর কোন সংবাদ পেলেন?

মাসী—

বলেছিলেন না সেদিন মাসী খুব অসুস্থ তাকে দেখতে যাবেন!

যাওয়া আর হলো কই—হঠাৎ যে ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল!

তা ঠিক। তা যাবেন না?

দেখি—চিঠি দিয়েছি।

সুভদ্রা দেবী—

বলুন!

মাসীর কাছ থেকে আপনি কতদিন হলো চলে এসেছেন?

তা বছর সাত-আট হবে।

মধ্যে মধ্যে যেতেন মাসীর কাছে—তাই না!

হ্যাঁ, আমি ছাড়া তো আর ওর কেউ নেই।

শেষ কবে গেছেন?

মাস দুই আগেও তো গিয়েছি।

কেমন ছিলেন তখন তিনি?

বিশেষ ভাল যাচ্ছে না মাসীর শরীরটা।

আপনার বিবাহ হয়েছিল বলেছিলেন সেদিন—আপনার স্বামীর নাম কি—কোথায় যেন দেশ-বাড়ি?

হুগলী জেলায়—নাম ছিল শ্যামাকান্ত—

শ্যামাকান্ত কি?

শ্যামাকান্ত ঘোষ।

বিয়ে বোধহয় আপনার মাসীই দিয়েছিল?

হ্যাঁ—তাছাড়া আর কে দেবে!

বিয়ে কোথায় হয়েছিল—মেমারীতে?

হঠাৎ যেন চমকে তাকাল সুভদ্রা কিরীটীর মুখের দিকে। তারপর একটা ঢোক গিলে বললে—হ্যাঁ।

বিয়ে হয়েছিল আপনাদের কি মতে—হিন্দু মতে না রেজিস্ট্রি করে?

হিন্দু মতে।

আপনি কিন্তু সত্যি বললেন না, কারণ আমি যতদূর দেখছি আপনি পালিয়ে এসেছিলেন মাসীর কাছ থেকে—তারপর হয়তো বিয়ে করেছিলেন কাউকে।

কে বললে আপনাকে আমি পালিয়ে এসেছিলাম?

যদি বলি আপনার মাসী—এবং—

কিন্তু কিরীটীর কথাটা শেষ হলো না—কলিংবেল ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠল।

কে এলো—আপনি একটু বসুন, দেখে আসি।

যান।

সুভদ্রা তড়িৎপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং কিরীটী শিকারী বিড়ালের মত সুভদ্রাকে অনুসরণ করে।

অন্ধকার প্যাসেজ।

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল—ফিস্ ফিস্ করে দুটো কথা—যাও, শিগগিরী যাও এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করার শব্দ।

কিরীটী চকিতে ঘরে এসে প্রবেশ করে।

একটু পরে সুভদ্রা এসে ঘরে ঢুকল।

কে এসেছিল?

কেউ না—ভুল নম্বর—অন্ধকারে অন্য বাড়িতে বেল টিপেছিলেন ভদ্রলোক।

আচ্ছা, সুভদ্রা দেবী—আজ তাহলে আমি চলি—

কিরীটী আর দাঁড়াল না—ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিজেই সদর দরজা খুলে গলির মধ্যে পড়ে—বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে পাশেই অল্প দূরে একটা ঝুল-বারান্দা দেখে তার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে রাস্তার এদিক-ওদিক নজর রাখতে লাগল।

প্রায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাদে দেখা গেল সুভদ্রা গলি থেকে বের হয়ে এলো।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে সুভদ্রাকে অনুসরণ করে।

সুভদ্রা এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ট্রাম রাস্তার সামনে যে 'নিউ স্টার' রেস্টুরেন্ট তার সামনে এসে দাঁড়াল।

এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর চট্ করে একসময় রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকে গেল সুভদ্রা।

কিরীটী চেয়ে থাকে।

রাস্তার অপর দিককার ফুটপাতে একটা খোলা জায়গায় মোটর রিপেয়ারিংয়ের কারখানা—লোকজন কারখানায় কাজ করছে—গোটা দুই গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে—তারই একটার আড়ালে কিরীটী নিজেকে গোপন করে উল্টো দিকের ফুটপাতে রেস্টুরেন্টের দিকে চেয়ে থাকে।

রেস্টুরেন্টের খোলা দরজা পথে এবং ভিতরে উজ্জ্বল আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট চোখে পড়ে কিরীটীর।

ভিতরে খরিদ্দারের বিশেষ একটা ভিড় দেখা যায় না।

জনা তিন-চার খদ্দের বসে আছে।

কিরীটী দেখতে পায় সুভদ্রা গিয়ে একটা কোণের টেবিলে চেয়ার টেনে বসল।

রেস্টুরেন্টের ছোকরাটা সামনে এসে দাঁড়াল—কি যেন তাকে বলল সুভদ্রা।

সুভদ্রা মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে।

সুভদ্রার দৃষ্টি কিন্তু রাস্তায়—ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে রাস্তার দিকে।

পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট প্রায় কাটতে চলেছে—সুভদ্রা কখন থেকে এক কাপ চা নিয়ে বসে আছে সেই কোণের টেবিলের চেয়ারটায়, হঠাৎ কিরীটীর দৃষ্টি সজাগ হয়ে উঠল।

একজন এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে রেস্টুরেন্টের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

এবং অল্পক্ষণ পরেই সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এলো।

সুভদ্রার সঙ্গের লোকটিকে চিনতে অন্য ফুটপাতে দাঁড়িয়েও রেস্টুরেন্টের উজ্জ্বল আলোয় কিরীটীর এতটুকু অসুবিধা হয় না।

চোখের তারা দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

একটা আরামের নিঃশ্বাস নেয় কিরীটী এতক্ষণে যেন, তাহলে অনুমান তার মিথ্যা নয়।

কিরীটীর প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

হীরা সিংকে বাগবাজারের মোড়ে পেট্রোল পাম্পটার সামনে গাড়ি পার্ক করে রাখতে বলে

এসেছিল, এগিয়ে গেল কিরীটী সেইদিকে।

গাড়িতে উঠে বসে কিরীটী বললে, চল হীরা সিং, কোঠি—

রাত প্রায় পৌনে এগোরোটায় কিরীটী তার গৃহে এসে পৌঁছাল।

কোথায় গিয়েছিলে? কৃষ্ণা শুধায়—এত রাত হল যে?

সোফার 'পরে আরাম করে বসতে বসতে কিরীটী বললে, দাঁড়াও, অনেকক্ষণ ধূমপান করিনি—বলতে বলতে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করল।

কফি খাবে?

মন্দ কি—

বোস, কফি আনি—

ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা মেশিন চলার দরুন ঘরটা ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক।

।। বার ।।

মিনিট দশেক পরে কফির শূন্য কাপটা কিরীটী নামিয়ে রাখতেই কৃষ্ণা আবার প্রশ্ন করল, কোথায় গিয়েছিলে?

বল তো কোথায়?

মনে হয়—সুভদ্রা নিকেতনে।

বাঃ, চমৎকার কৃষ্ণা—তোমার দেখছি তৃতীয় নয়নটি রীতিমত খুলে গিয়েচে—

বাঃ, এতবড় একজন রহস্যভেদীর সঙ্গে এতকাল বাস করছি—কথায় বলে সাধু-সঙ্গে স্বর্গবাস—

আর অসৎ সঙ্গে—বলতে বলতে কিরীটী হেসে ওঠে।

সত্যি বল না গো!

কি বলব?

আমার অনুমানটা কি মিথ্যে?

না—একেবারে মিথ্যে নয়—তবে—

তবে?

আর দুটো দিন অপেক্ষা কর দেবী—আশা করছি তার পরই হরিদাস সামন্ত হত্যা-রহস্যের 'পরে যবনিকা-পাত হয়ে যাবে—এখনো সামান্য বাকী—দুটি বা একটি দৃশ্য—

বিশ্বাস করি না—তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কে হত্যাকারী!

সত্যের অপলাপ করা কর্তব্য নয়—তা বুঝতে পেরেছি বোধহয়—

বোধ হয় না—

বুঝতে তুমি পেরেছ ঠিকই।

কিরীটী মৃদু হাসে।

উঃ—তোমার পেট থেকে কথা বের করা না—ঠিক আছে, বোল না। তবে আমিও বুঝতে পেরেছি হত্যাকারী কে!

বুঝতে যদি পেরে থাকো তবে আবার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ কেন, দেবী?

মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম—আমার অনুমান ঠিক কিনা!

ঠিক আছে—তাহলে এসো আমরা দুজনেই হত্যাকারীর নাম দুটো আলাদা আলাদা কাগজে লিখে আমার ড্রয়ারে রেখে দিই চাবি বন্ধ করে—তারপর চাবিটা—

ঐ সময় জংলী এসে ঘরে ঢোকে শূন্য কফির কাপ দুটো নিয়ে যেতে।

কিরীটী জংলীর দিকে তাকিয়ে বললে, ড্রয়ারের চাবিটা থাকবে শ্রীমান জংলীর হেপাজতে—পরশু রাত ঠিক এগারোটা দশ মিনিটে চাবি নিয়ে কাগজ খুলে মিলিয়ে দেখা যাবে—কার অনুমান সত্য! কেমন—রাজী?

রাজী।

জংলী হাঁ করে ওদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ পরে বলে, কি হলো মাঈজী—

কৃষ্ণা ততক্ষণে উঠে টেবিলের উপর থেকে দুটো কাগজ আর কলম এনে বললে, নাও, তুমি লেখো। আমিও লিখছি—

তথাস্তু দেবী।

জংলী তখনো বোকার মত ওদের দিকে তাকিয়ে।

দুজনের লেখা হলে—দুখানা কাগজ ভাঁজ করে চাবি দিয়ে ড্রয়র খুলে সে দুটো ড্রয়রের মধ্যে ফেলে—চাবি বন্ধ করে—ড্রয়ারের চাবিটা জংলীর হাতে দিয়ে কৃষ্ণা বললে, এই চাবিটা রাখ তোর কাছে জংলী।

কেন মাঈজী?

যা বলছি—রাখ। আমি চাইলেও দিবি না—বাবু চাইলেও দিবি না—বুঝলি? ঘুষ দিলেও নয় —

জংলী বুঝতে পারে কোন মজার ব্যাপার ঘটেছে। সে মিটিমিটি হাসতে হাসতে চাবিটা পকেটে রাখতে রাখতে বললে, ঠিক হ্যায়—কিসিকো এ কুঞ্জী নেহী দুংগা—

পরের দিন সকালে চা-পানের পর কিরীটী যেন কার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে ফোনে।

কৃষ্ণা পাশেই সোফায় বসে একটা স্কার্ফ বুনছিল, কিরীটীর ফোন শেষ হলে বললে, সুব্রতর খবর কি বল তো?

কিরীটী একটা সোফায় বসে সামনের সুদৃশ্য একটি কাশ্মিরী কৌটো থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে বললে, মাসখানেক প্রায় দেখা নেই, তাই না?

হ্যাঁ, ও যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

বিয়ে না করলে পুরুষ মানুষ এমনিই হয়ে যায়।

হঠাৎ ঐ সময় ঘরের ফোনটা বেজে উঠল।

কিরীটী উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

মল্লিকের ফোন।

মনীশ কি করেছে শুনেছো!

কি?—তাই নাকি—ভালই তো!

কিরীটী হাসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ফোন রেখে ফিরে এসে আবার বসল কৃষ্ণার মুখোমুখি।

হ্যাঁ, কি যে বলছিলে বিয়ে না করলে কি হয়ে যায়, কৃষ্ণা?

কিরীটীর কথা শেষ হলো না, ঐ সময় দরজা ঠেলে সুব্রত ঘরে ঢুকল—মুখে স্মিত হাসি।

আরে তুই—তোর পায়ের শব্দ পাইনি তো? কিরীটী বললে।

তাহলে দেখছি মনীশ চক্রবর্তী ঠিকই বলেছে—সুব্রত হাসতে হাসতে মুখোমুখি বসে বললে।

মনীশ চক্রবর্তী?

হ্যাঁ—চন্দননগর থানার ও. সি.—

তুই চিনিস নাকি ওকে?

আমরা যখন বাঁকুড়া কলেজে পড়তাম তখন ও বাঁকুড়া স্কুলে পড়ত—দুধর্ষ ফুটবল প্লেয়ার ছিল।

গোল-কীপার বুঝি? কিরীটী স্মিতহাস্যে বলল।

ঠিক বলেছিস, কিন্তু বুঝলি কি করে?—বলতে বলতে হেসে ওঠে সুব্রত।

হাসলি যে—

সুব্রত বললে, সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল তোর কথায়।

কোন্ দৃশ্য?

কলেজের মাঠে খেলা হচ্ছিল, ও ছিল গোল-কীপার—বরাবরই ওর চেহারাটা ছিল ঠিক কুমড়ো পটাসের মত—সেই চেহারা আর সাতটা গোল খেয়েছিল—তাইতেই মনে আছে ওকে—তারপর বহুকাল পরে কাল চন্দননগরে একটা সাহিত্য-সভায় ওর সঙ্গে পরিচয় হোল—এখন আবার একজন কবি।

ফুটবল থেকে কবিতা—অসাধারণ উত্তরণ—এ যে আরো দুর্ধর্ষ ব্যাপার।

তাই—তবে মাঝখানটা বাদ দিলি কেন? দারোগা—গত ষোল বছর—ভদ্রলোকের এক কথা এক কাজ—ঐ দারোগাগিরিতেই আটকে আছে, এক ধাপও অগ্রসর হয়নি—ভদ্রলোক দেখলাম তোর উপরে ভীষণ খাপ্পা—

কেন? আমি আবার কি করলাম?

কি একটা যাত্রাদলের লোকের খুনের ব্যাপারে নাকি তুই তার উপরওয়ালার সাহায্যে নাক গলিয়ে ব্যাপারটাকে প্রায় ভণ্ডুল করে দিতে বসেছিস?

কেন—সে তো এইমাত্র শুনলাম—

কি শুনলি?

ফোনে মল্লিক বললে—রাধারমণ পালকে নাকি সে এ্যারেস্ট করেছে—তার মতে সে-ই নাকি খুনী।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে—সুব্রতর কণ্ঠে আগ্রহের সুর।

আমি ততক্ষণে স্নান সেরে আসি, তুই কৃষ্ণার কাছে সব শোন।

কিরীটী উঠে গেল ঘর থেকে।

আধঘণ্টা পরে স্নান সেরে একেবারে বেরুবার পোশাকে সজ্জিত হয়ে কিরীটী ঘরে এলো।

কি রে, শুনলি?

শুনলাম—আর এও বুঝলাম মনীশ চক্রবর্তী আর একটা গোল খেয়ে বসে আছে।

বুঝলি কি করে—কৃষ্ণার সঙ্গে মত-বিনিময় হলো বুঝি? বলতে বলতে আড়চোখে কিরীটী স্ত্রীর দিকে তাকাল।

না—তোর গৃহিণী তো কবুল করল না কিছুতেই। সুব্রত হাসতে হাসতে বললে।

তাহলে তুই একটু বোস—আমি একটু ঘুরে আসি।

কতদূর যাবি?—সুব্রত শুধায়।

বেশি দূর না—কাছাকাছি।

ঐ সময়ে ঘরে টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়,—কিরীটী রায়।

আমি মনীশ চক্রবর্তী কথা বলছি।

কি খবর বলুন—য়্যাঁ, কেমিক্যাল এ্যানালিসিসের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে—বোতলে কিছু পাওয়া যায়নি—গ্লাসে এবং স্টমাক কনটেন্টে—বিষ পাওয়া গিয়েচে—কি বিষ—এ্যাট্রোপিন সালফেট? ঠিক আছে—হ্যাঁ, ভাল কথা—সন্ধ্যার দিকে একবার ফোন করবেন—কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিযে রেখে দিল।

সুব্রত শুধাল, কি? এ্যাট্রোপিন সালফেট্ বিষ পাওয়া গিয়েছে?

হ্যাঁ—এ্যাট্রোপিনের লিথাল ডোজটা বোধহয়—এক থেকে দুই গ্রেন—কৃষ্ণা, ঐ আলমারী থেকে ডাঃ ঘোষের ফারমাকোপিয়াটা বের কর তো—ঐ যে লাল মলাটের বইটা—একেবারে ডান দিকে শেষে, দ্বিতীয় থাকে।

কৃষ্ণা আলমারী থেকে বইটা বের করে এনে কিরীটীর হাতে দিল—কিছুক্ষণ ধরে পাতা উল্‌টে উল্‌টে—এক জায়গায় এসে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। পড়তে লাগল।

একটু পরে বইটা বন্ধ করে কৃষ্ণার হাতে দিতে দিতে বললে,—আশ্চর্য! লোকটা ঐ বিশেষ বিষটা যে এত দ্রুত এত অল্প ডোজে কার্যকরী—তা জানল কি করে?

কিরীটী পুনরায় বসে সোফার উপর—একটা সিগার ধরায়।

কৃষ্ণা, তোমাকে বলেছিলাম না দুদিন পরে মীমাংসা হবে—

হ্যাঁ।

তার আর দরকার হবে না বোধহয়—মিসিং লিঙ্কটা পেয়ে গিয়েচি।

সত্যি!

বোস সুব্রত তুই—যাসনে। ঘন্টা দেড়েক-দুয়েকের মধ্যে ঘুরে আসচি।

বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল,—চললাম।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

।। তের ।।

কলিংবেলের শব্দে দরজা খুলে দিয়ে সুভদ্রা যেন একটু অবাকই হয়,—কিরীটীবাবু—আপনি!

হ্যাঁ—একটা কথা গত সন্ধ্যায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি—চলুন না ভিতরে!

আসুন—অনাসক্ত গলায় সুভদ্রা কিরীটীকে যেন আহ্বান জানাল।

গত রাত্রের সেই ঘর।

শয্যাটা এলোমেলো হয়ে আছে এখনো।

তখনো গুছিয়ে পাট করা হয়নি শয্যাটা।

কিরীটী একবার আড়চোখে শয্যাটা দেখে নিলে।

শুনলাম শ্যামলবাবু যাত্রাদলের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন!—কিরীটী কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

তাই নাকি? শুনিনি তো—কে বললে?

শুনলাম! তাহলে আপনিও বোধহয় ঐ দল থেকে চলে যাবেন?

না—তা কেন যাব?

যাবেন না! শ্যামলবাবু চলে যাবেন—অথচ আপনি—

তার যদি না পোষায় তো সে চলে যাবে—আমি চাকরি ছাড়তে যাব কেন?

শ্যামলবাবু যদি আপত্তি করেন?

করবে না—আর করলেই বা!

তা আপনাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে?

বিয়ে?

হ্যাঁ—শ্যামলবাবুর আর আপনার?

হন্তদন্ত হয়ে ঐ সময় রাধারমণ পাল এসে ঘরে ঢুকলেন—সুভদ্রা, শুনেছ—

রাধারমণ পাল কিরীটীকে লক্ষ্য করেনি প্রথমটায়, কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ নজর পড়ে গেল কিরীটীকে।

একটু থেমে—যেন থতমত খেয়ে বললে, কিরীটীবাবু—আপনি?

কি হয়েছে পাল মশাই?—কিরীটী শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

সুজিতকে গতরাত্রে সে যখন বাড়ি ফিরছে—তার গলির মধ্যে কারা যেন পিছন থেকে ছোরা মেরেছে—

সেকি?—একটা ভয়ার্ত স্বর যেন বের হয়ে এলো সুভদ্রার কণ্ঠ থেকে।

রাতে কখন?—কিরীটী আবার শান্ত গলায় প্রশ্ন করল—মানে, রাত ক'টা হবে?

ও তো বলছে রাত প্রায় বারোটা সোয়া বারোটা হবে—

সুজিতবাবু এখন কোথায়?

বাঙ্গুর হাসপাতালে—কেবল একটু আগে হাসপাতাল থেকে আমাকে অফিসে ফোন করেছিল।

কে?

সুজিত।

আঘাতটা খুব বেশি হয়েছে?—কিরীটী পুনরায় শান্ত গলায় প্রশ্ন করে।

না—খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে—বাঁ দিককার ঠিক কাঁধের নীচে নাকি, হাতের উপর দিয়ে গিয়েছে।

এখন তিনি কোথায়?

তার বাসা কালীঘাটে—আমি তো সেখানে থেকেই আসছি—

প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই তো পাল মশাই?—সুভদ্রা এতক্ষণে প্রশ্ন করে।

নাঃ—খুব বেঁচে গিয়েছে এ যাত্রা—নেহাত বোধহয় পরমায়ু ছিল। কিন্তু আমি ভাবছি সুভদ্রা—কে এভাবে আমাদের সর্বনাশ করছে! সেদিন সামন্ত মশাই গেলেন—কাল আবার সুজিতের প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা—

পাল মশাই—

হঠাৎ কিরীটীর ডাকে রাধারমণ পাল ওর দিকে ফিরে তাকাল।

বলতে পারেন—হরিদাস সামন্তর কি চোখের অসুখ ছিল?

না তো—কেন?

না—আচ্ছা, আপনাদের দলের আর কেউ কি ইতিমধ্যে—চোখের ব্যাপারে ভুগছিলেন?

কেন, আমিই তো কিছুদিন থেকে কষ্ট পাচ্ছি—চোখের ডাক্তার দেখছেন আমার চোখ—চন্দননগরে

যেদিন পালা গাইতে যাই তার পরের দিনই বিকেলে ঔষধ লাগিয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে আমার যাবার কথা ছিল—

গিয়েছিলেন?

না—দেখছেন তো কি ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ক'টা দিন যাচ্ছে—

তা ঠিক, তা ডাক্তারটি কে?

ডাঃ চ্যাটার্জি—ধর্মতলার—আই স্পেশালিস্ট—

যে ঔষুধটা লাগাবার কথা ছিল সে ঔষধটা তৈরী করানো হয়েছিল?

হ্যাঁ—এখনো আমার অফিস ঘরেই বোধহয় রয়েছে—

ফিরে গিয়ে অফিস ঘরে ঔষধটা আছে কিনা আমাকে একবার জানাবেন—বাড়িতে আমায় ফোন করে আর ঘন্টা তিনেক বাদে।

বেশ।

ভুলবেন না যেন! আচ্ছা আসি, নমস্কার—

কিরীটী আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী গৃহে ফিরে এলো।

সুব্রত তখন কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছিল।

সোফায় বসতে বসতে কিরীটী বললে, মিলে গেছে দুয়ে দুয়ে চার।

হত্যাকারী তাহলে—

হ্যাঁ। সুব্রতর প্রশ্নের উত্তরে কিরীটী বললে, নিজের হাতেই নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিয়েচে আমার হাতে।

সুব্রত ও কৃষ্ণা দুজনেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না—কারণ, ওরা তো জানেই নিজে থেকে মুখ না খুললে ও মুখ খোলান যাবে না।

বিকেলের দিকে তিনটে নাগাত রাধারমণ পালের ফোন এলো কিরীটীর কাছে।

সংক্ষিপ্ত দু-চারটে কথা হলো।

তারপর কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

সুব্রত কিরীটীর বাড়িতে ছিল।

যায়নি—কৃষ্ণা যেতে তাকে দেয় নি।

কৃষ্ণা—আর এক প্রস্থ চা হলে মন্দ হত না—সুব্রত বললে।

সুব্রতর কথায় কৃষ্ণা উঠে গেল ঘর থেকে।

সুব্রত বললে, চা খেয়ে এবারে যাব—

বোস না—ব্যস্ত কি!

কিরীটী তাঁকে থাকবার অনুরোধটা জানাল বটে, কিন্তু সুব্রতর মনে হয় কিরীটী যেন একটু অন্যমনস্ক—কেমন যেন ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা।

সুব্রত জানে কোন রহস্যের শেষ পর্যায়ে এসে পৌছালে কিরীটী অমনি ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে।

কথা বলে কম এবং সংক্ষিপ্ত। বোঝা যায় ও যেন কথা বলতে চায় না।

কিরীটীর দিকে তাকাল সুব্রত—কিরীটী সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে। মুখে জলন্ত সিগার।

ধূমপান করছে কি করবে—বুঝবার উপায় নেই।

গ্রীষ্মের শেষ প্রহরের ম্লান আলো বাইরে।

জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে।

ওর বসবার ভঙ্গিতে—নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন একটা প্রতীক্ষার ইঙ্গিত।

কিরীটী কি কারো জন্যে অপেক্ষা করছে? কিংবা কোন সংবাদের জন্য কান পেতে আছে যেন?

কৃষ্ণা জংলীর হাতে ট্রেতে চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার ঘরের কোণে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

কিরীটী যেন একটু দ্রুত চঞ্চল পদবিক্ষেপেই এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল,—কিরীটী রায়—কে, সুশান্তবাবু? বলুন, তারপর, কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মারা গেছে অনেক দিন আগে—হুঁ!—ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল—ঠিক আছে—ঠিক আছে—ধন্যবাদ—

কিরীটীর কণ্ঠস্বর চোখে-মুখে যেন একটা চাপা উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

রিসিভারটা নামিয়েই আবার তুলে নিয়ে ডায়েল করে কিরীটী—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি কিরীটী রায়—হ্যাঁ—সব ব্যবস্থা করে রাখবেন—ঠিক রাত এগারোটায় যেমন বলেচি মিট্ করবেন—হ্যাঁ—যেখানে বলেচি সেখানেই—

আবার ফোন নামিয়ে ডায়েল করল কিরীটী কাকে যেন—আমি কিরীটী রায় কথা বলচি—যে দুটি ছেলেকে নজর রাখতে বলেছিলেন—তারা যেন এক মুহূর্তের জন্যও নজর না সরিয়ে নেয়—হ্যাঁ—ইনস্ট্রাকশন দিন—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাড়িতে ফোন করবে—আপনাকেও সংবাদটা দেবে।

কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পুনরায় এসে সোফায় গা ঢেলে দিল।

কিরীটীর চোখে-মুখে দুপুর থেকে যে দুশ্চিন্তাটা প্রকট হয়ে উঠেছিল সে যেন আর অবশিষ্ট নেই।

মনে হচ্ছে শেষ দাবার চালটি যেন দিলি!—সুব্রত বললে।

সূত্রগুলো সবই হাতের মধ্যে এসে গিয়েচে—একটা জায়গায় শুধু একটা ছোট্ট গিঁট—সেটা খুলতে পারলেই—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, আবার ফোন বেজে উঠল।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা হাতে তুলে নিল—কিরীটী রায়—কে, পাল মশাই—তবে কি আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন চন্দননগরে? নেন নি—আপনার অফিস ঘরেই ছিল? আমিও সেই রকমই অনুমান করেছিলাম। খুঁজে পাবেন না তাও জানতাম—কাল সকালে আসবেন।

কিরীটী রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল, তারপর কৃষ্ণার দিকে ফিরে বললে, কৃষ্ণা, আমি পাশের ল্যাবরেটরী ঘরে আছি। যে কোন সময় একটা ফোন আসতে পারে—এলে আমাকে ডেকো। সুব্রত, যাস্ না—হয়তো বেরুতে হতে পারে রাত্রে।

কিরীটী আর কোন কথা বললে না—ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

ফোন এলো রাত দশটার কিছু পরে।

কিরীটীকে ডাকতে হলো না।

সে সজাগ ছিল।

তাড়াতাড়ি ঘরে এসে রিসিভারটা তুলে নিল।

অন্যপক্ষ কি কথা বললে বোঝা গেল না ফোনের অপর প্রান্ত থেকে কেবল কিরীটীর একটি মাত্র জবাব শোনা গেল, ঠিক আছে—মল্লিক সাহেবকে ফোন করে দিন।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে যথাস্থানে কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—খাবার হয়েছে কৃষ্ণা?

হ্যাঁ—দেবে?

হ্যাঁ—আমাদের খাবার দিতে বল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আধঘন্টার মধ্যেই দুজনে বেরুল।

হীরা সিং—

জী সাব!

শ্যামবাজার চল।

শ্যামবাজারে সুভদ্রার গৃহে পৌঁছাতে আধঘন্টার বেশি লাগে না।

কিরীটী আর সুব্রত গলির মধ্যে ঢুকে দরজার কলিংবেলটা টিপল কিরীটী।

একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল।

সুভদ্রাই দরজা খুলে দিয়েছিল,—কিরীটীবাবু? এত রাত্রে, কি ব্যাপার?

চলুন ভিতরে—আপনাকে একটা সংবাদ দিতে এসেচি।

সুভদ্রা কিন্তু দরজা ছাড়ে না, কেমন যেন একটা ইতস্তত ভাব।

আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন কিরীটীবাবু।

জানি আপনি কি ব্যাপারে ব্যস্ত। আমার প্রয়োজনটা অনেক বেশি।

আপনি কাল আসবেন—বলতে বলতে সুভদ্রা কিরীটীর মুখের উপরই যেন দরজাটা বন্ধ করবার উপক্রম করে।

কিরীটী কিন্তু হাত দিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ঠেলে শান্ত গলায় বললে, কোন লাভ হবে না সুভদ্রা দেবী—আপনার যত কাজই থাক এখন, এবং আপনি যত ব্যস্তই থাকুন—আমাকে ঘরে যেতে দিতেই হবে—আমার কথাও আপনাকে শুনতেই হবে।

কিন্তু আপনি কি জোর-জবরদস্তি করবেন নাকি?

সে রকম করবার কোন ইচ্ছা, বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমার নেই—তবে আপনি যদি আমাকে বাধ্য করেন—

এটা আমার বাড়ি কিরীটীবাবু!

সুভদ্রার গলার স্বর তীক্ষ্ণ এবং কঠিন।

অবশ্যই, এবং সেটা না জানার তো কোন হেতু নেই। চলুন ভিতরে—

না—

সুভদ্রা দেবী, পুলিস আশেপাশেই আছে—আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না আশা করি—তাদের সাহায্য আমি নিই!

পুলিস—

হ্যাঁ—চলুন ভিতরে।

সহসা সুভদ্রার কণ্ঠস্বরের যেন পরিবর্তন ঘটল।

সে বললে, আপনি পুলিস নিয়ে এসেছেন? কিন্তু কেন—কি করেছি আমি?

ভিতরে চলুন—সব বলচি—

সুভদ্রা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে যেন কি ভাবল। তারপর বললে, বেশ! আসুন—

বসবার ঘরেই বসাতে যাচ্ছিল সুভদ্রা কিরীটীকে, কিন্তু কিরীটী বললে, না—আপনার শোবার ঘরে চলুন—

শোবার ঘরে?

হ্যাঁ, চলুন—

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখা গেল—সুভদ্রার শয্যার উপরে বসে আছে সুজিতকুমার—বুকে ও হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

নমস্কার সুজিতবাবু, চিনতে পারচেন?

হ্যাঁ—কিরীটীবাবু—সুজিত বললে।

ভালই হলো সুজিতবাবু—আপনাকে কয়েকটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করার ছিল—দেখা হয়ে গেল এখানেই—আপনার কালীঘাটের বাড়িতে আর ছুটতে হলো না—

হ্যাঁ—আজ দুপুরে গিয়ে সুভদ্রা এখানে আমায় নিয়ে এসেছে।

ভালই করেছেন উনি—ওখানে তো সেবা করার মত কেউ আপনার ছিল না—কিরীটী বললে।

বসুন না কিরীটীবাবু—দাঁড়িয়ে কেন? সুজিত বললে।

আপনি তো বসতে বলচেন—সুভদ্রা দেবী তো ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না বাড়িতে—

সেকি—কেন সুভদ্রা?—সুজিত প্রশ্নটা করে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

আপনার এ সময়ে এখানে উপস্থিতিটা হয়তো বাইরের লোক কেউ জানুক সুভদ্রা দেবীর ইচ্ছা ছিল না—তাই না কি সুভদ্রা দেবী?

কথাটা বলে আড়চোখে তাকাল কিরীটী সুভদ্রার দিকে।

সুভদ্রা চুপ। কোন কথা বলে না।

কিরীটী আবার বললে, যাক—এক পক্ষে ভালই হলো—দুজনের সঙ্গে একই জায়গায় দেখা হয়ে গেল—তারপর, কেমন আছেন? হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল?

হ্যাঁ—বললে ডাক্তাররা আঘাতটা অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে, ভাগ্যে নেহাত অপঘাতে মৃত্যু

ছিল না বলেই—হাসতে হাসতে বললে সুজিত।

হ্যাঁ—ভাগ্য নিশ্চয়ই বলতে হবে—তা কে পিছন থেকে আপনাকে আঘাত করল জানতেই পারলেন না? দেখতেও পেলেন না লোকটাকে সুজিতবাবু?

অন্ধকারে ছোরাটা মেরেই ছায়ার মত অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেল কিরীটীবাবু! তাছাড়া রক্তে তখন আমার সারা জামা ভিজে গিয়েছে—প্রায় ফেইন্ট হবার যোগাড়—ঐ অবস্থায় আততায়ীকে দেখবার মত অবস্থা কি থাকতে পারে?

তা সত্যি—

তা উনি—সুব্রতকে দেখিয়ে সুজিত বললে, ওঁকে তো চিনতে পারছি না!

উনি আমার এক ছোটবেলার বন্ধু—কৃষ্ণনগরে চাষাপাড়ায় ওর বাড়ি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ—আপনারও কৃষ্ণনগরে ঐ পাড়াতেই বাড়ি সুজিতবাবু, তাই না?—ভাল কথা, রঞ্জিৎ বিশ্বাসকে আপনি চেনেন?

রঞ্জিৎ বিশ্বাস! কে বলুন তো?

চিনতে পারচেন না—অথচ তিনি বলছিলেন—এক সঙ্গে এক বছর আপনারা আর্ট স্কুলে পড়েছিলেন!—কিরীটী বললে।

ও! হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তা তাকে আপনি চেনেন নাকি?

চিনতাম না, তবে—

তবে?

সেদিন চেনা পরিচয় হলো—তার কাছেই শুনছিলাম—

কি শুনেছেন?

আপনি ছোটবেলা থেকেই ভাল অভিনয় করতে পারতেন, শেষ পর্যন্ত তাই বোধ হয় আঁকার লাইন ছেড়ে অভিনয়ের লাইনটা বেছে নিলেন।

হ্যাঁ, ও হলো কমার্শিয়াল আর্টিস্ট আর আমি হলাম অভিনেতা।—তা রঞ্জিৎ বিশ্বাস এখন কোথায়? অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না।

এবারে হয়তো হবে—

কলকাতায় থাকলে হবে বৈকি—কিন্তু আপনি একটু আগে যেন বলছিলেন আমাকে আপনার কি জিজ্ঞাসা করবার আছে!

হ্যাঁ—দুটো কথা—

কি বলুন তো?

দুর্ঘটনার রাত্রে—অর্থাৎ যে রাত্রে হরিদাস সামন্তকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে—

বলেন কি—সত্যি নাকি—ব্যাপারটা?

॥ পনের ॥

হ্যাঁ, সুজিতবাবু—ব্যাপারটা নিষ্ঠুর সত্য এবং সেটা কি বিষ জানেন—শান্ত গলায় কথাটা বলে কিরীটী পর্যায়ক্রমে সুজিত ও সুভদ্রার দিকে তাকাল।

কি বিষ?—সুজিত প্রশ্ন করে।

কিরীটী পূর্ববৎ শান্ত গলায় বললে, এ্যাট্রোপিন সালফেট—যার থেকে দু গ্রেনেই অবধারিত মৃত্যু—একজন মানুষের।

বলেন কি—

তাই, এবং সে বিষ তাকে তার মদের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল—

কিন্তু কে? কে তাকে মদের সঙ্গে বিষ দিতে পারে—ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয় তো! Suicide—

না—শান্ত গলায় কঠিন 'না' শব্দটা যেন উচ্চারিত হলো কিরীটীর কণ্ঠ হতে—ব্যাপারটা আদৌ আত্মহত্যা নয়—

নয় কি করে জানলেন?

জেনেচি—এবং সে প্রমাণও আমার কাছে আছে। কথাটা বলে পুনরায় কিরীটী সুভদ্রার দিকে তাকাল।

সুভদ্রা যেন পাথর।

সে যেন কেমন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর দিকে।

সুভদ্রা দেবী—আপনি সম্ভবতঃ জানেন ব্যাপারটা—আপনিই বলুন না—হরিদাসবাবুকে মদের সঙ্গে বিষ কে দিতে পারে, বা কার পক্ষে সম্ভব ছিল সে রাত্রে?

আমি—আমি কি করে জানব?

কিন্তু আমার মনে হয় সুভদ্রা দেবী, ব্যাপারটা আপনি জানলেও জানতে পারেন।

আমি?

হ্যাঁ—বলুন সুভদ্রা দেবী, কে সে রাত্রে সামন্ত মশাইয়ের মদের সঙ্গে বিষ দিতে পারে? কিরীটীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ।

সুভদ্রা, সত্যি তুমি জান?—প্রশ্ন করলো এবার সুজিত।

না, না—

বলুন সুভদ্রা দেবী, বলুন—কারণ, রাত সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে, অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে সে রাত্রে আপনি হরিদাসবাবুর ঘরে দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন—

প্রমাণ—

হ্যাঁ—এই ভাঙা—বলতে বলতে পকেট থেকে সে রাত্রে সাজঘরে কুড়িয়ে পাওয়া কাচের আয়না বসানো চুড়ির টুকরোটা বের করে বললে,—চুড়ির টুকরোটাই সে প্রমাণ দেবে—দেখুন তো, চিনতে পারচেন কি না—এই ভাঙা টুকরোটা যে চুড়ির সেটা সে রাত্রে অভিনয়ের সময় আপনার হাতে ছিল—

সুভদ্রা বোবা।

এখন বলুন সুভদ্রা দেবী—দ্বিতীয়বার কেন আপনি আবার সে ঘরে গিয়েছিলেন?

আ—আমি যাইনি। বিশ্বাস করুন—

গিয়েছিলেন—শান্ত কঠিন গলা কিরীটীর। বিষ মেশানো মদের বোতলটা সরিয়ে আনবার জন্য, তাই না?

আমি কিছু জানি না—

জানেন। বলুন সে বোতলটা কোথায়?

আমি জানি না—কিছু জানি না।—বলতে বলতে সুভদ্রা সুজিতের দিকে তাকাল—

স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেন কি? আমার দিকে তাকিয়ে বলুন—কিরীটী অবার বললে।

কি বলছেন? উনি আমার স্বামী হতে যাবেন কেন?—সুভদ্রা বলে ওঠে।

নন বুঝি—কিরীটীর কণ্ঠে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গের স্বর—কি সুজিতবাবু, উনি আপনার স্ত্রী নন—অবিশ্যি এখনো জানি না বিবাহটা দশ বছর আগে আপনার কোন্ মতে হয়েছিল। হিন্দুমতে পুরুত ডেকে, না রেজেস্ট্রী করে, না শৈবমতে, না কেবল কালীঘাটে গিয়ে সিন্দুর ছুঁইয়ে—

কোন মতেই আমাদের বিবাহ হয়নি—কি সব পাগলের মত যা-তা বলছেন—সুজিত বলে ওঠে।

আমি পাগল, তাই না? এবারে বলুন সুভদ্রা দেবী—আপনার গলায় হীরের লকেটটা কোথায় গেল?—কিরীটী বললে।

লকেট! কিসের লকেট?

আপনার গলায় যে সরু হারটা আছে তার সঙ্গে একটা লকেট ছিল—লকেটটা কোথায়? সেই লকেটটা যে হরিদাসবাবুর হাতে গিয়ে পড়েছিল সেটা জানতে পেরেই বোধহয় মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন, যেহেতু বুঝেছিলেন আসল সত্যটা তার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে—তাই না?

এতদিনের অভিনয়টা আপনাদের ধরা পড়ে গেছে তাই ভেবে মরীয়া হয়ে—না, সুভদ্রা দেবী। উহুঁ! কোমরে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না—আমি জানি কোমরে দোক্তার কৌটোর মধ্যে দোক্তার সঙ্গে কি মেশান আছে—

সুভদ্রা হাতটা কোমর থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

সুব্রত—সুভদ্রা দেবীর কোমরে দোক্তার কৌটোটা গোঁজা আছে, ওটা নিয়ে নে।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রার কোমরে গোঁজা দোক্তার ছোট্ট কৌটোটা ছিনিয়ে নিল।

আমি জানি সুভদ্রা দেবী, অবশ্যই অনুমানে নির্ভর করে—সুজিতবাবু আজ যদি আপনার গর্ভের সন্তানকে স্বীকৃতি না দিতেন তাহলে আপনি শেষ পথটাই নিতেন।

হঠাৎ হাঃ হাঃ করে সুজিত হেসে উঠে বললে, চমৎকার একটা নাটক রচনা করেছেন তো কিরীটীবাবু।

সত্যিই নাটকটা চমৎকার সুজিতবাবু—আপনার ভিলেনের রোলটিও অপূর্ব হয়েচে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত—তবে জানেন তো সব নাটকেই ভিলেনের শেষ পরিণতি হয় জেল, নয় ফাঁসী?

কিরীটীর কথা শেষ হলো না—অকস্মাৎ যেন বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা ধারালো ছোরা কোমর থেকে টেনে নিয়ে সুজিত কিরীটীর উপরে।

কিন্তু কিরীটী অসতর্ক ছিল না—চকিতে সে সরে দাঁড়ায়।

সুজিত হুমড়ি খেয়ে দেওয়ালের উপর গিয়ে পড়ে গেল।

সুব্রত সেই সুযোগটা হেলায় হারায় না—লাফিয়ে পড়ে সুজিতের উপর।

সুজিতের সাধ্য ছিল না সুব্রতর শরীরিক বলের কাছে দাঁড়ায়। তাই সহজেই সুব্রত তাকে চিৎ করে ফেলে মাটিতে।

কিরীটী তার পকেটে যে বাঁশীটা ছিল তাতে সজোরে ফুঁ দিল।

মল্লিক সাহেব তার দলবল নিয়ে প্রস্তুতই ছিলেন কিরীটীর পূর্ব নির্দেশ মত বাড়ির সামনে—সকলে ছুটে এলো ঘরে।

॥ ষোল ॥

পরের দিন সকালে দুই প্রস্থ চা হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় প্রস্থের সঙ্গে কিরীটী—সুব্রত—মল্লিক সাহেব—মনীশ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণা—কিরীটীর বাড়ির বসবার ঘরে হরিদাস সামন্তর মৃত্যুর ব্যাপারেই আলোচনা চলছিল।

আলোচনা ঠিক নয়।

একজন বক্তা। সে কিরীটী। এবং অন্য সকলে শ্রোতা।

কিরীটী বলছিল ঃ ব্যাপারটা সত্যিই একটা রীতিমত নাটক। এবং নাটকের শুরু—নবকেতন যাত্রা পার্টিতে সুভদ্রার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং শেষ সুজিতের হাতে হাত-কড়া পড়ার সঙ্গে।

সুভদ্রা তার মাসীর আশ্রয় থেকে পালিয়ে যখন যায় তখনই সুজিতের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয়। সুজিত সুভদ্রাকে ঠিক মত আইনানুগভাবে কোনদিন বিবাহ করেছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু সুভদ্রার বোধহয় তা সত্ত্বেও সুজিতের 'পরে একটা দুর্বলতা ছিল—আর সে দুর্বলতাটুকুর সুযোগ নিয়েছিল শয়তান সুজিত।

সুজিতের চরিত্রে নানা দোষ ছিল—তার মধ্যে রেসের মাঠ ও জুয়া—অভিনয় সে ভালই করত, কিন্তু ঐ মারাত্মক নেশার দাস হওয়ায় তার সে প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটাও খারাপ হয়ে যায়—চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য। সে ক্রমশঃ পারফেক্ট ভিলেনে রূপান্তরিত হয়।

এদিকে সুভদ্রাও তাকে ছাড়বে না, সুজিতের পক্ষেও তার ভার বয়ে চলা সম্ভব নয়। তখন সুজিতই এক উপায় বের করল—সুভদ্রার অভিনয়ের নেশা ছিল—সে তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল পাল মশাইয়ের কাছে। বেশ চলছিল এবং চলতও হয়তো দুজনের, কিন্তু মাঝখানে প্রৌঢ় হরিদাস সামন্ত পড়ে সব গোলমাল করে দিল।

হরিদাস সামন্তর লোভ পড়ল সুভদ্রার যৌবনের প্রতি। সে আকৃষ্ট হলো এবং শয়তান সুজিত তখন দেখল ব্যাপারটায় তার লাভ বই ক্ষতি নয়। সে আর এক কৌশলে সুভদ্রাকে হরিদাস সামন্তর হাতে তুলে দিয়ে হরিদাসকে শোষণ শুরু করল।

হরিদাস টাকা জোগাতে লাগল—সুভদ্রার বোধহয় ব্যাপারটা আগাগোড়াই পছন্দ হয়নি—সে অনন্যোপায় হয়ে শয়তান সুজিতের শাসানীতে হরিদাসের রক্ষিতা হয়ে রইল।

কয়েক বছর বেশ ঐভাবেই হয়তো চলছিল—তারপরই ব্যাপারটা হরিদাসের কাছে ফাঁস হয়ে গেল।

কিন্তু কেমন করে ফাঁস হলো, সেটাও অবিশ্যি আমার অনুমান—হরিদাস সামন্ত হঠাৎ কোন

এক সময় সুভদ্রার গলার হারের লকেটটা বোধহয় পায়—সেই লকেটের মধ্যে ছিল সুভদ্রা ও সুজিতের যুগল ফটো। হরিদাস ব্যাপারটা বুঝতে পেরে (আমার অনুমান অবশ্য) সুভদ্রাকে তিরস্কার করে—এবং টাকা দেওয়া বন্ধ করে—কারণ, সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল সুভদ্রার হাত দিয়েই সুজিত তাঁকে শোষণ করে চলেছে।

সুজিত ব্যাপারটা জানতে পারল। এবং সে তখন হরিদাসকে নিশ্চয়ই শাসায়—প্রাণভয়ে ভীত হরিদাস তখন আমার কাছে ছুটে আসে। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে বলতে সাহস পায় না।

তবে সব কথা না বললেও স্পষ্ট করে আভাসে যেটুকু বলে তাতে আমার বুঝতে কষ্ট হয় না—তার বিপদ যাত্রাদলের মধ্যেই।

সন্দেহটা আমার আরো ঘনীভূত হয়—সুভদ্রা হরণ নাটকের বিষয়বস্তু শুনে—তবে একটা কথা এখানে অস্বীকার করবো না। শ্যামলকেই প্রথমে—নাটকের বিষয়বস্তু শোনার পর সন্দেহ করি, তাই আমি নাটকটা দেখতে যাই।

সুব্রত প্রশ্ন করে—কিন্তু সুজিতকে তুই সন্দেহ করলি কখন?

সুজিতকে ঠিক প্রথমটায় সন্দেহ করিনি—কিরীটী বলতে থাকে—এই মাত্রই তো বললাম আমার প্রথম সন্দেহ পড়ে শ্যামল ও সুভদ্রার 'পরে—তাদের উপরেই আমি নজর রেখেছিলাম। কিন্তু বিষ ও চুড়ির টুকরো আমার মনের চিন্তাধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে।

হরিদাস সামন্তকে মদের সঙ্গে বিষ দেওয়া হয়েছিল—শ্যামল মদ্যপান করে না—কিন্তু সুজিত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল—তাতেই মনে হয় আর যে-ই দিক না কেন, মদের সঙ্গে মিশিয়ে শ্যামল নয়—শ্যামল যদি বিষ না মিশিয়ে থাকে মদে তবে আর কে মেশাতে পারে—আর কে ঐ ব্যাপারে, অর্থাৎ হরিদাসকে পৃথিবী থেকে সরানোর ব্যাপারে interested থাকতে পারে।

প্রথমেই তারপর মনে হয়েছিল সুভদ্রার কথা—কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারলাম সুভদ্রা অন্তঃসত্ত্বা, তখুনি বুঝলাম সুভদ্রা তাকে বিষ দেয়নি—তার গর্ভের সন্তানের জন্মদাতাকে সে বিষ দেবে না।—

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল—হরিদাস সুজিতকে টাকা দেওয়া বন্ধ করায় হয়ত সুজিত তাকে চাপ দিচ্ছিল, অথচ নিজের জালে জড়িয়ে সুভদ্রারও আর টাকা দেবার জন্য হরিদাসকে অনুরোধ করবার উপায় ছিল না, এমন সময় হয়ত একটা কথা তার মনে হয়েছিল—হরিদাসকে যদি বোঝাতে পারে গর্ভের সন্তান হরিদাসেরই, তখন হয়ত হরিদাস আবার সুজিতকে টাকা দিতে পারে—সুভদ্রার প্রতি সন্দেহটা যেতে পারে—তাই আমার মনে হয়েছিল সুভদ্রা হরিদাসকে বিষ দেয়নি।

কাজেই সুভদ্রা যদি বিষ না দিয়ে থাকে তবে আর কে দিতে পারে! শ্যামলও নয়—তাছাড়া শ্যামল তো সুভদ্রার মন পেয়েছিলই, সে কেন তবে হরিদাসকে হত্যা করতে যাবে? তাহলে আর কে—হঠাৎ তখন মনে পড়ল সুজিতের কথা। সুজিতই সুভদ্রাকে যাত্রার দলে এনেছিল। Then why not সুজিত?

ঐ পথেই তখন চিন্তা শুরু করলাম। মনে আরো সন্দেহ জাগল সুজিত সম্পর্কে, কারণ—সে-ই বলেছিল সে রাত্রের জবানবন্দীতে—সে নাকি সুভদ্রা ও শ্যামলকে হরিদাসের সাজঘরে সে রাত্রে ঢুকতে দেখেছিল। মনে হলো তবে কি ওদের পরে সন্দেহ জাগানোর জন্যই সুজিত ওদের নাম করেছিল?

মনের মধ্যে কথাটা দানা বাঁধতে শুরু করল। তারপর ঐ চিরকুটটা—যেটা রাধারাণী ভোলাকে দিয়েছিল—শ্যামলকে দিতে।

নাটকের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় হরিদাসের হাতের নোটস্ ছিল, সে লেখার সঙ্গে চিরকুটের লেখা যখন মিলল না, তখন বুঝতে বাকী রইল না চিরকুটটা জাল এবং শ্যামলকে ফাঁসানোর সেটা আর একটা ষড়যন্ত্র।

কার লেখা তবে চিরকুটটা, কে লিখতে পারে—শ্যামল নয়, তবে আর কে— আমার মনে হলো, why not সুজিত?

সুজিতের উপরে সন্দেহটা আরো বেশি ঘনীভূত হওয়ায় তার সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করলাম—কৃষ্ণনগরে খোঁজ নিতেই বের হয়ে গেল সে এককালে একবছর আর্টস্কুলে পড়েছিল—বুঝলাম তখন সে-ই ঐ চিঠি লিখেচে— হরিদাসের হাতের লেখা নকল করে। কিন্তু কেন? What was his motive?

নজর রাখলাম সুভদ্রা ও সুজিতের উপর—দেখা গেল সুজিত যাতায়াত করে সুভদ্রার ঘরে—তার ঘরের শয্যাও সেই সাক্ষ্যই দিয়েছিল।

সুজিত তখন আর একটা চাল চালল—একটা self inflicted injury করে দেখাতে চাইল তাকে কেউ হত্যার চেষ্টা করেছে। হাসপাতালের attending ফিজিসিয়ানের রিপোর্ট থেকেই ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়ে গেল, কেউ তাকে ছুরি মারে নি—তাহলে ঐ ধরনের injury হতে পারে না।

যে কুয়াশাটা সুজিতকে ঘিরে ছিল সেটা এবার সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এদিকে ওদের দুজনের উপর থেকে নজর কিন্তু আমি সরাইনি।

সুভদ্রা অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে—সে বুঝতে পেরেছিল তাকে আমি সন্দেহ করেচি—সেটা অবিশ্যি তাকে আমি কিছুটা কথাযবার্তায় বুঝিয়েও দিয়েছিলাম—এবং অনুমান করেছিলাম ঐ কারণেই যে—সে এবারে নিশ্চয়ই ছুটে যাবে সুজিতের কাছে—

অনুমান যে আমার মিথ্যা নয়, প্রমাণিত হয়ে গেল—সে ছুটি গেল—যে মুহূর্তে সংবাদ পেলাম—আমরাও সুজিতের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। অবশ্যই সুজিত দুটো মারাত্মক ভুল করেছিল।

সুব্রত শুধায়, কি?

কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে কিরীটী বললে, প্রথমতঃ সে, অর্থাৎ সুজিত তার জবানবন্দীতে শ্যামলকুমার ও সুভদ্রার উপরে সকলের সন্দেহটা ফেলবার জন্য তাদের সে হরিদাস সামন্তর ঘরে ঢুকতে দেখেছিল কথাটা আমার কাছে বলে।

ব্যাপারটা আরো একটু স্পষ্ট করে বলি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দিকে, অর্থাৎ শুরুতে হরিদাস সামন্তর কিছুক্ষণ appearance ছিল বোধহয়, মিনিট কুড়ির। তারপরই সে চলে আসে এবং সে সময় সুজিতের নাটকে কোন appearance ছিল না।

হিসাব মত সেটা রাত সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা। এবং আমার অনুমান সেই কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যেই কোন এক সময় সুজিত সবার অলক্ষ্যে হরিদাসের সাজঘরে ঢুকে—যেহেতু everything was pre-arranged–পূর্ব-পরিকল্পিত—সে প্রস্তুতই ছিল—হরিদাসের মদের বোতলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে আসে।

সুব্রত শুধায়, সে বিষটা তাহলে—

কিরীটী বললে, ঐ সাজঘরের মধ্যেই ছিল—রাধারমণের চোখের অসুখের জন্য ডাক্তার যে eye drop দিয়েছিল তার মধ্যেই এ্যাট্রোপিন সালফেট মারাত্মক বিষ ছিল।

বিষের শিশির সবটাই সুজিত হয়তো মদের বোতলে ঢেলে শিশির মধ্যে তার বোতল থেকে মদ ঢেলে রাখে, যেটা পরে Chemical analysis-য়েও প্রমাণিত হয়েচে। আর সেই কারণেই সুজিতের বোতলে কোন এ্যাট্রোপিন বিষ পাওয়া যায়নি analysis-য়ে।

কিন্তু কথা হচ্ছে—ভুলটা কি? এবং কোথায়? সুভদ্রা নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে আসরেই ছিল—তাই তার পক্ষে বিষ মেশানো সম্ভবপর ছিল না—অথচ সুজিত সেটা হিসাবের মধ্যে গণ্য করেনি। সে শ্যামলকুমারের সঙ্গে সুভদ্রার নাম করে একই ঢিলে দুই পাখি মারবার ফন্দিতে সুভদ্রার নামটা করেছিল, এবং সে হয়তো জানত না—হরিদাস সুভদ্রাকে টাকা দেবার জন্য তৃতীয় অঙ্কে সে যখন free থাকবে তখন তাকে একবার তার সাজঘরে যেতে বলেছিল।

সুজিত যদি মারাত্মক ভুলটা না করত, অর্থাৎ শ্যামলকুমারের সঙ্গে সুভদ্রারও নামটা আমাকে না জানাত তাহলে হয়তো তার গিল্টি কনসান্সটা অত সহজে আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠত না। সন্দেহের তার প্রতি শুরু আমার সেখান থেকেই।

মনীশ চক্রবর্তী বললেন, তবে সুজিতই হরিদাস সামন্তকে বিষ দিয়েছিল?

হ্যাঁ—কিরীটী বললে,—সুজিত মিত্রই—তবে সুভদ্রা বোধহয় সুজিতকে হরিদাস সামন্তর সাজঘর থেকে বেরুবার সময় দেখে ফেলেছিল—যে কারণে তার মনে তার প্রতি সন্দেহ জাগে।

কৃষ্ণা বললে, তবে সুভদ্রা সে কথা তোমাকে জানায়নি কেন তার জবানবন্দীতে?

কিরীটী বললে, ভুল তো তোমার সেইখানেই হয়েচে কৃষ্ণা।

ভুল!—কৃষ্ণা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ—তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে, সুজিতকে সুভদ্রা প্রথমদিকে ভালবাসলেও—সুজিত যখন অর্থের লোভে অনায়াসেই তাকে হরিদাস সামন্তর মত এক প্রৌঢ় কামুকের হাতে তুলে দিল সে ভালবাসার

আর অবশিষ্ট মাত্রও ছিল না, থাকতে পারে না—নারীর মন সে ব্যাপারে বড় কঠিন। অথচ সুজিতের কবল থেকে মুক্তিরও তখন আর তার কোন উপায় ছিল না।

আশ্চর্য! একবারও আমার সে কথা মনে হয়নি।

কিরীটী বললে জানি—আর সেই ভুলেই তোমার কাগজে হয়তো লিখে রেখেচ হত্যাকারী সুভদ্রা—তাই না?

হ্যাঁ।

কিরীটী হাসল।

কিরীটী আবার বলতে শুরু করল, যাক্—যা বলছিলাম। সুজিত যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল সুভদ্রার মন শ্যামলকুমারের দিকে ঝুঁকেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসেচে—সুভদ্রার গর্ভে হরিদাসের সন্তান থাকা সত্ত্বেও—তখনই সে স্থির করে তার plan of action. একই সঙ্গে শ্যামল ও সুভদ্রাকে সরাতে হবে। কারণ, সে তো বুঝেছিলই—সুভদ্রা হরিদাসের কাছে না থাকলে তাকে দোহন আর চলবে না। শ্যামলকুমারকে দোহন করা সম্ভবপর হবে না।

মল্লিক সাহেব শুধালেন, তারপর—বলুন—থামলেন কেন মিঃ রায়?

কিরীটী আবার বলতে লাগল,—শ্যামল ও সুভদ্রা দুজনকেই একসঙ্গে কেমন করে ফাঁসানো যায়—ভাবতে ভাবতেই হয়তো সুজিত ঐ পথটি বেছে নিয়েছিল—and plan was successful—কেউ ধরতে পারত না তাকে অত সহজে, যদি না সে আগ বাড়িয়ে ওদের দুজনেব নাম করে বসত আমার কাছে।

আচ্ছা, একটা কথা—কৃষ্ণা বলে, সুভদ্রা কি কোনদিনই সুজিতকে ভালবাসেনি?

বাসেনি—তা তো বলিনি! তবে রমণীর মন তো—আর তার বদলের কারণও তো আগে কিছুটা বলেচি—এবং শেষে শ্যামলকুমারের আবির্ভাব রঙ্গমঞ্চে—যার প্রতি মন যে কোন নারীর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল।

আচ্ছা, তোমার কি ধারণা—কৃষ্ণা আবার প্রশ্ন করে—শ্যামল জানতে পেরেছিল সুভদ্রা মা হতে চলেচে?

সম্ভবতঃ জানতে পেরেছিল—বা হয়তো সুভদ্রা ধরা পড়ে গিয়েছিল—তবে সেটা তো ওদের মিলনের ব্যাপারে আজকালকার দিনে কলকাতা শহরে অসংখ্য ব্যবস্থা থাকায় এমন কোন অন্তরায় হত না। তখন ঐ ধরনের কাঁটা অনায়াসেই তারা পরে দূর করে নিতে পারত।

থাক সে কথা—এবারে সুজিতের দ্বিতীয় ভুলের কথায় আসা যাক্—what was his second mistake.

কিরীটী বলতে লাগল, সুজিত নিশ্চয়ই হরিদাসের সাজঘর থেকে বের হয়ে আসবার সময় সুভদ্রাকে লক্ষ্য করেছিল—কিন্তু সুভদ্রা যখন হরিদাসের ঘরে গিয়ে ঢোকে—হরিদাসের তখন already মৃত্যু হয়েচে—সে কথাটা সুজিত জানত—কারণ, হরিদাস অভিনয় করার সময় ঘন ঘন মদ্যপান করত, আর সে রাত্রে সুভদ্রার বর্ধমান চলে যাবার কথা শুনে আরো নিশ্চয়ই মনটা তার বিক্ষিপ্ত ছিল—তাই হরিদাস আসর থেকে এসেই মদ্যপান করবে যেমন সে জানত, তেমনি এও সে জানত সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হবে।

কাজেই সুভদ্রা যখন টাকার জন্য হরিদাসের সাজঘরে ঢুকেছিল তাকে follow করে, সে ব্যাপারটা জানতে পেরেচে নিঃসন্দেহে—সুজিতের ঐ সময় সাজঘরে ঢোকাটাই দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল।

দুজনে সাজঘরে মুখোমুখি হল—যা ছিল অস্পষ্ট—ধোঁয়াটে, সুভদ্রার মনে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঐ জন্যই পরে। তবে এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার বোধহয় ঘটেছিল—সুজিতকে বোধহয় সুভদ্রা কিছু বলে—ফলে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হয়—যে সময় সুভদ্রার হাতের চুড়ি একটা ভাঙা যায়। আর ঐ চুড়িরই ভগ্নাংশ প্রমাণ দেয় ঘরের মধ্যে মৃত্যুর ঠিক আগে বা পরে কোন এক সময়ে সুভদ্রা হরিদাসের ঘরে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করেছিল।

যা হোক, সুজিতেব প্রতি আমার সন্দেহটা ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠল—আমি তার উপরে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করলাম। তার প্রতিটি movement-এর উপরে দৃষ্টি রাখা হল—জানা গেল সুজিতই সে রাত্রে গিয়েছিল সুভদ্রার গৃহে হরিদাসের মৃত্যুর পর—শ্যামলকুমার নয়।

আর সুজিত যে যায় সেখানে, তার প্রমাণ সুভদ্রার ঘরে গিয়ে আমি স্বচক্ষে যাচাই করে এসেচি।

এদিকে শ্যামল দলে notice দিল সে দল ছেড়ে দেবে—বুঝলাম বা অনুমান করলাম শ্যামলকুমার ও সুভদ্রা ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবার ব্যবস্থা করেচে, সেই সঙ্গে এও মনে হল সুজিত নিশ্চয়ই তা হতে দেবে না—

হয়তো সুভদ্রাও সেটা বুঝতে পেরেছিল—আর তাইতেই সে বুঝতে পেরেছিল সুজিতের সঙ্গে তার একটা শেষ বোঝাপড়া করা দরকার। আর সেই বোঝাপড়ার জন্য তার তৃণে মোক্ষম তীরও রয়েচে—হরিদাসের সাজঘরে তার সে রাত্রে যাবার ব্যাপারটা।

জানতাম সুভদ্রাকে সুজিতের ওখানে যেতেই হবে—বিশেষ করে সুজিত যখন নিজেকে নিজে আঘাত করে বোঝাবার চেষ্টা করল সকলকে—তার life-এর 'পরেও attempt নেওয়া হয়েচে।

আমরা constant watch রাখলাম—সুভদ্রা গেল গত রাত্রে সুজিতের বাসায়—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জানতে পারলাম—সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল—আমরাও বের হয়ে পড়লাম। বোঝাপড়া ওদের মধ্যে কতদূর হয়েছিল জানি না—তবে দুজনেই অকস্মাৎ আমাদের আবির্ভাবে থতমত খেয়ে গেল—ওদের মুখের চেহারা—ওদের হাবভাব স্পষ্ট জানিয়ে দিলে দোষী কে।

খুনী কে আর একবার অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝলাম—আবারও আমার অনুমান মিথ্যা নয়।

তবে হ্যাঁ, এও বলব—সুজিত মিত্র একজন অতীব দক্ষ অভিনেতাই কেবল নয়—নার্ভও তেমনি শক্ত তার। এবং আমরা সেখানে ঐ সময়ে গিয়ে উপস্থিত না হলে সুজিতের কোমরে লুকানো ছোরার আঘাতেই সুভদ্রাকেও হয়তো সে রাত্রে প্রাণ দিতে হত শেষ পর্যন্ত।

এই হচ্ছে মোটামুটি কাহিনী।

কিরীটী থামল।

হাত বাড়িয়ে চুরোটের বাক্স থেকে একটা চুরোট ও লাইটারটা হাতে তুলে নিল।

সুব্রত বললে, কৃষ্ণা—চা.....

কৃষ্ণা উঠে গেল।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ওরা—সুভদ্রা ও শ্যামল স্থির করেছিল চলে যাবে এবং নাটকের শেষ দৃশ্যেও ছিল—সুভদ্রাকে হরণ করে নায়ক পালাবে, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না—সুভদ্রাকে আর হরণ করা হল না নায়কের, যেমন শ্যামলকুমারেরও আর সুভদ্রাকে নিয়ে চলে যাওয়া হল না। রূপক নাটক শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হল।

ক্যামেলিয়া

ক্যামেলিয়া।

বন্ধুবর ডাঃ তরুণ ঘোষ নামটা আবার পুনরুচ্চারণ করে ক্যামেলিয়া।

প্রশ্ন করলাম, ওর নাম ক্যামেলিয়া?

হ্যাঁ—সে ওকে ক্যামেলিয়া বলেই ডাকত।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বন্ধু বলে আবার, খুব আশ্চর্য লাগছে, না কবি?

না—আশ্চর্য নয়—

তবে?

মনের মধ্যে তখন ভেসে উঠছে কবিগুরুর সেই লাইন কটা ঃ

> জিগেস করলাম, 'নামটা কী।'
> সে বললে, 'ক্যামেলিয়া।'
> চমক লাগল—

বললাম, মনে আছে ডাক্তার?

কি? তরুণ শুধায়।

ছাত্র জীবনের সেই তোর কবিতাটার কথা?

কবিতা! কোন কবিতা?

সেই যে প্রায়ই তুই আবৃত্তি করতিস?

> জিগেস করলাম, 'নামটা কী।'
> সে বললে, 'ক্যামেলিয়া।'
> চমক লাগল—

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বলে ওঠে,

> আর একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে

দুজনে এবারে শেষটুকু এক সঙ্গেই বলে উঠি ঃ

> হেসে বললেন, 'ক্যামেলিয়া,
> সহজে বুঝি এর মন মেলে না?'

বললাম, আশ্চর্য নামটা ত?

হ্যাঁ—ওকে যে ছেলেটি ভালবাসত সেই ওকে ক্যামেলিয়া নামে ডাকত।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—আসলে কিন্তু ওর নাম হচ্ছে মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী!

হ্যাঁ—

পাগলা গারদের ডাক্তার বন্ধু তরুণ ঘোষ! ......তরুণের সঙ্গে সকাল বেলা পাগলা গারদটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

একটি নির্জন কটেজে তাকে দেখলাম!

কটেজের ঘরে খোলা জানালার শিক ধরে ও দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স কত হবে কে জানে—চোখ মুখ দেখে ধরবার উপায় নেই।

তা ছাড়া মাথার অজস্র এলানো কেশ একেবারে সাদা। পেকে সব নাকি রাতারাতি সাদা হয়ে গিয়েছিল।

সুদূরে নিবদ্ধ চোখের দৃষ্টি—সমগ্র মুখখানি জুড়ে কি এক করুণ বিষণ্ণতা।.......

তরুণ সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কেমন আছেন?

মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল তরুণের দিকে নিঃশব্দে। কোন সাড়া দেয় না।

এবারে তরুণ আরো একটু সামনে এগিয়ে যায়। আবার শুধায়, কেমন আছেন?

ভাল না—

কেন?

কানে কিছু শুনতে পাচ্ছি না—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না—

পাবেন—দেখতেও পাবেন, শুনতেও পাবেন।

পাব না। পার্থকে আবার দেখতে পাবো—তার ডাক আবার শুনতে পাবো—তাই কি হয়—

পাবেন বৈকি—

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলে, পাবো—পাবো বৈকি—সামনের ঐ পাহাড়টা—জানি ঐ পাহাড়টা কোনমতে ডিঙ্গুতে পারলেই তার দেখা পাবো—

আচ্ছা যুদ্ধ—যুদ্ধ থেমে গিয়েছে না?

হ্যাঁ—

আর চীনেরা—যারা জোর করে আমাদের সীমানার মধ্যে এসে হানা দিয়েছিল তাদের সব পণ্ডিতজী ফাঁসী দিয়ে দিয়েছেন না?

হ্যাঁ—সবার ফাঁসী হয়ে গিয়েছে—কিন্তু ঘরের টেবিলের 'পরে সব খাবার আপনার পড়ে আছে, খান নি কেন?

সে কথার কোন জবাব দিল না মেয়েটি। হঠাৎ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে শক্ত করে দুহাতে জানালার গরাদটা চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে ডাক্তারকে শুধায়, আচ্ছা ডক্টর—ক্যামেলিয়াকে চেনেন—তার—তার নিশ্চয়ই ফাঁসী হয়ে গিয়েছে না—

ক্যামেলিয়া!

হ্যাঁ—হ্যাঁ—She was a spy—গুপ্তচর—she has been shot dead—নিশ্চয়ই তাকে গুলি করে মেরেছে ফায়ারিং স্কোয়াড্—উঃ কি প্রচণ্ড সে শব্দ—বলতে বলতে দু হাত দিয়ে কান ঢেকে ধরে—সমস্ত মুখে অসহ্য যন্ত্রণার একটা চিহ্ন ফুটে ওঠে—দুটো চোখ বুজে যায়—সারা শরীর মেয়েটির কাঁপতে থাকে।

থর থর করে কাঁপতে থাকে।

আমাকে তরুণ চোখের ইংগিত করে—দুজনে তাড়াতাড়ি সরে আসি।

ফিরবার পথে শুধাই, মেয়েটির কি হয়েছে রে?

বলবো খন! বলে তরুণ—very sad! অত্যন্ত করুণ কাহিনী।

কি বলছিল যেন spy?

হ্যাঁ—she was a spy!

বলিস কি!

তাই—

সেই রাত্রে সবে আমরা ডাক্তারের হাসপাতালের কোয়ার্টারের ড্রয়িংরুমে মৌজ করে বসেছি—হাসপাতাল থেকে জরুরী কল বুক এলো—১১নং কেবিনের রোগীটির অবস্থা নাকি খুব খারাপ এক্ষুনি যেতে হবে—

উঠতে উঠতে এবং জামাটা গায়ে দিতে দিতে তরুণ বলে, একেই বলে অন্যের দাসত্ব—চল যাবি নাকি—

চল—

একা একা আর বসে থেকে কি করব—উঠে দাঁড়ালাম।

হাসপাতালে গিয়ে রোগীটিকে দেখবার পর দুজনে বাংলোর দিকে ফিরছি—সেই কটেজটা সামনে পড়ল।

থমকে দাঁড়ালাম।

কটেজের বারান্দায় হাতে একটি প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি নিয়ে সেই চাঁদের মা বুড়ির মত সাদা চুল মেয়েটি ধীর পদে এগিয়ে চলেছে।

মুখে মোমবাতির আলো পড়ে মৃদু মৃদু কাঁপছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে বন্ধুটি শুধায়, কি হলো—

দেখ তোর সেই মেয়েটি না।

হ্যাঁ—

হাতে মোমবাতি—

অন্ধকারে রাতে অমনি করে প্রজ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কেন!

চল—বাংলোয় চল—

ফিরে এলাম দুজনে বাংলোয়।

রাত বেশী নয় মাত্র সোয়া আটটা।

দুকাপ কফির অর্ডার দিয়ে ভৃত্যকে তরুণ ফিরে এলো। দুজনে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসলাম।

রাঁচী শহরে ডিসেম্বরের হাড় কাঁপান শীত।

ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেস জ্বলছে বটে কিন্তু তাতেও শীত যেন মানায় না।

ভৃত্য এসে কফি দিয়ে গেল—ধূমায়িত দুকাপ কফি।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ডাক্তার শুরু করে—কাহিনী আমার শোনা ঐ মেয়েটিরই এক বান্ধবীর কাছ থেকে—আর মিলিটারী রিপোর্ট থেকে যা জেনেছি তাই বলবো,—মেয়েটির ইতিহাস সত্যিই বড় করুণ—এইভাবে দিনের পর দিন জীবনমৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার চাইতে সেদিন যদি মেয়েটার মৃত্যু হতো—তারপরই একটু থেমে বলে, জানিস মেয়েটির বয়স ২৭।২৮-এর বেশী নয়—

বলিস কি!

হ্যাঁ—আর ঐ যে ওর মাথায় ঢেউ খেলানো চুল—সব রাতারাতি পেকে নাকি সাদা হয়ে গিয়েছিল

রাতারাতি!

হ্যাঁ—মেয়েটির নাম মীনাক্ষী কিন্তু যে ওকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল সে ওকে আদর করে যে নামে ডাকত আজো সেই নামটুকুই ও তাকেই কেবল ওর মনে আছে, বাকী সব বোধহয় মন থেকে মুছে গিয়েছে—

কি সে নাম?

ক্যামেলিয়া—

॥ ২ ॥

অত পা টিপে টিপে আসতে হবে না—টের পেয়ে গিয়েছি তুমি এসেছো—

না ফিরে এবং দরজার দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো মৃদু হেসে বলে পার্থপ্রতীম। এবং সত্যিই পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে যে মেয়েটি ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ভিতরে পা ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে যায়।

ওষ্ঠে মৃদু হাসির বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে মেয়েটির।

কিন্তু তার আগে, আবার পার্থপ্রতীমই বলে, ইলেকট্রিক ষ্টোভে বিরজু চায়ের জলটা চাপিয়ে রেখে গিয়েছে, সুইচটা অন্ করে দিয়ে এসো মীনা—চায়ের পিপাসাটা সত্যিই প্রবল হয়ে উঠেছে—

মীনা কিন্তু পাশের ঘরে যায় না বরং এগিয়ে আসে সামনের দিকে এবং এগিয়ে আসতে আসতে বলে, কিন্তু এটা ত তোমার চা খাবার সময় নয় পার্থ—ফলের রস খাওয়ার সময়—

ইজিচেয়ারের উপর শুয়ে শুয়ে কথা বলছিল পার্থপ্রতীম।

ছোট মাঝারী আকারের ঘরটি—ঘরের এক পাশে সিঙ্গল বেডে একটি এলোমেলো শয্যা।

মেঝেতে বিছানো একটি ফরাস—তার চাদরটা বহু ব্যবহারে মলিন। ফরাসের উপব হারমোনিয়াম-ডুগি তবলা, একটি এস্রাজ।

এক কোণে একটি রেডিও ও গ্রামোফন। তার পাশে টেবিল ও চেয়ার।

দেওয়ালে একটি আলনায় কিছু জামা-কাপড়।

পার্থর বয়স ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে। শীর্ণ চেহারা। লম্বাটে গড়ন।

মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো। গায়ের রঙ কালো।

প্রশস্ত ললাট---কিন্তু কেমন যেন ক্লিষ্ট পাণ্ডুর। খাড়া নাক---ধারালো চিবুক।

চশমার কাচের ভিতর দিয়ে চোখের মণি দুটো অস্বাভাবিক একটা দীপ্তিতে যেন চক্‌চক্ করছে। মুখে দু'দিনের না কামান দাড়ি।

পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী—পাঞ্জাবীর একটা বোতামও নেই—সব ছিঁড়ে গিয়েছে।

কোলের উপর একটা খাতা—তার এক পাতায় গান লেখা—অন্য পাতায় স্বরলিপি—এবং স্বরলিপির মধ্যে অজস্র কাটাকাটি।

মীনার এক হাতে ঠোঙ্গায় ফল ও অন্য হাতে কালো রংয়ের প্ল্যাষ্টিকের একটা হ্যাণ্ডব্যাগ।

মীনার বয়স চব্বিশ পঁচিশের মধ্যে।

গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, দোহারা গড়ন।

চোখে-মুখে একটা আলগা শ্রী আছে--আর দেহের যৌবন সুষমা যেন টলমল করছে ভাদ্রের ভরা দীঘির মত।

চোখে-মুখে প্রসাধনের খুব হালকা একটা প্রলেপ।

পরিধানে কালো পাড় শাদা মিলের শাড়ি—গায়ে সাধারণ একটা ক্যালিকো মিলের রঙিন ব্লাউজ।

হাতের ব্যাগ ও ঠোঙ্গাটা টেবিলের ওপরে রেখে এগিয়ে এলো মীনা পার্থর পার্শে ঃ কেমন আছো—আজ জ্বর আসেনি ত?

মৃদু শান্ত হাসি হাসে পার্থ।

কথাটা বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে মীনা পার্থর কপালের 'পরে চ্যুত রুক্ষ পশমের মত নরম চুলগুলো তুলে দিতে দিতে কথাটা শেষ করে, নাঃ কপাল ত ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছে—

পার্থ যেন সে কথায় কানই দেয় না।

অপন মনেই যেন অন্য কথা বলে, কিন্তু গানটার সুর কিছুতেই যেন খুঁজে পাচ্ছি না—চিরদিন পরের গানে সুর দিয়ে এলাম—তোমার লেখা প্রথম গান অথচ কিছুতেই সে গানের সুর খুঁজে পাচ্ছি না—মীনু—

পার্থর মাথার রুক্ষ চুলগুলো সরু সরু আঙ্গুল দিয়ে সস্নেহে বিলি করতে করতে মীনাক্ষী বলে, পাবে---ব্যস্ত হচ্ছো কেন! ও যখন আসবার ঠিক আসবে। সময় হলেই ঠিক আসবে—সারাটা দুপুর বুঝি ঐ করেছো?

সে কথার জবাব দেয় না পার্থ---অন্য কথা বলে ঃ আজ তোমার আসতে দেরি হয়েছে মীনু—কখন দিনের আলো নিভে গিয়েছে টের পাইনি। জানালাটা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সন্ধ্যার ধূসর আকাশে কখন উঠেছে জ্বলজ্বলে একটি তারা—সেই সন্ধ্যাতারাটির দিকে চেয়ে আছি হঠাৎ যেন মনের মধ্যে একটা সুর গুনগুনিয়ে উঠলো। গুন গুন করে সুরটাকে ধরবার চেষ্টা করচি—কিন্তু আসতে আসতেও যেন এলো না। পালিয়ে গেল। হারিয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে—

কি?

মৃদুকণ্ঠে শুধায় মীনাক্ষী।

জানালা পথে যে সন্ধ্যাতারাটি এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো একক---অনন্য—সলজ্জকোমল—দেখি সেই তারাটি আর একক নেই, তার আশেপাশে আরো তারা কখন দেখা দিয়েছে একটি দুটি করে।

আমি তোমার ফলের রসটা করে নিয়ে আসি—

দাঁড়াও---দাঁড়াও শোন---

কী?

সেই মুহূর্তে তোমার একটি নাম আমার মনে পড়ল---

আমার নাম!

হ্যাঁ—নতুন একটা নাম।

কি নাম?

বলত কি নাম?

মীনাক্ষী চুপ করে থাকে। পার্থ বলে, পারলে নাত—জানি পারবে না—এসো সামনে এসো কানে কানে বলি।

দাঁড়াও ফলের রসটা আগে করে নিয়ে আসি তারপর শুনব।

না—না—আগে শোন।

ধরে ফেলে পার্থ মীনাক্ষীর একটা হাত— শোন, কানে কানে বলে—ফিসফিস্ করে—ক্যামেলিয়া—

কি?

ক্যামেলিয়া। আজ থেকে—এই মুহূর্ত থেকে ঐ নামেই তোমাকে আমি ডাকব—

মীনাক্ষী হাসে।

হাসছো!

পাগল—

সে যাই বলো, আজ থেকে তুমি আমার ক্যামেলিয়া।

মীনা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

একটি মাঝারী সাইজের ও অন্যটি ছোট একটি ঘর। দোতলার 'পরে ঐ দুটি ঘর নিয়ে থাকে পার্থপ্রতীম—প্রায় বছর খানেক আছে।

পুবের দিকে রাস্তা এবং উত্তরে ছোট খোলা ছাতের মত আছে। সেখানে কিন্তু ফুলের টবে নানা ফুল গাছ। ছাতের প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যায় একটা পার্ক।

মীনাই পুতেছে ঐ গাছগুলো টবে।

এই দু-কামরাওয়ালা ছোট ফ্ল্যাটটা দু'জনে মিলে অনেক খুঁজে খুঁজে বের করেছিল। বিয়ে করে দু'জনে ঘর বাঁধবে বলে।

ছোট একটি নিরালা সুখের গৃহকোণ রচনা করতে চেয়েছিল দু'জনে কিন্তু আকস্মিক ঝড়ের একটা নিষ্ঠুর ঝাপটায় যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

নিভে গেল ঘরের বাতিটা যেন।

পার্থপ্রতীম চৌধুরী—গানে সুর দেয়—গান গায়। ছোটবেলা থেকে করে এসেচে সুরের সাধনা।

ছোটবেলায় মা-বাপ মারা গিয়েছে।

এক দূর সম্পর্কীয় কাকার কাছে মানুষ। কাকার কাছেই ছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন কাকা নোটিশ দিল।

বাড়িতে লোকজন বেড়ে গিয়েছে ঃ অর্থাৎ কাকার এক শ্যালক হঠাৎ দেশ থেকে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসে উপস্থিত—অতএব সিঁড়ির পাশে ছোট যে ঘরটা অধিকার করে গত একুশ বছর ছিল পার্থপ্রতীম, সেটা ছেড়ে দিয়ে আসতে হলো।

অবিশ্যি ছেড়ে দেবে ঘরটা শীঘ্র মনে মনে কল্পনাই ছিল কিন্তু সে ছাড়া যে এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে হবে সেইটে সে ভাবতে পারে নি যেন সেদিন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'জনে কিছুদিন ধরেই এদিকে ওদিকে ঘর খুঁজছিল কিন্তু হঠাৎ নোটিশটা এসে পড়ল ঃ অবিলম্বে ঘর ছাড়তে হবে।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পার্কে দেখা হতো দু'জনার মধ্যে।

পার্থ সেখানে গিয়ে বেঞ্চির উপর বসে অপেক্ষা করত—মীনাক্ষী আসত অফিস ফেরত।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন চারিদিক অস্পষ্ট।

পার্কের আলোগুলো জ্বলে ওঠে।

বেঞ্চটার পিছনেই একটা পাম গাছ। সন্ধ্যার মৃদমন্দ বাতাসে তার পাতাগুলো সির্ সির্ শিপ্ শিপ্ শব্দ করে

দূর থেকে দেখা যায় মীনাক্ষীকে।

কালো প্ল্যাষ্টিকের ব্যাগটা হাতে নিয়ে আসচে সে।

অফিসে চাকরি করে মীনাক্ষী । বিরাট মার্চেন্ট অফিস।

আশ্চর্য! কী অদ্ভুত মিল দুজনার জীবনের। সেও জীবনের প্রথম দিকেই পার্থর মত নিঃস্ব হয়ে

পড়েছিল এবং এক মাসীর কাছে মানুষ। তবে পার্থর কাকার মত সে তাকে পথ দেখায় নি।

লেখাপড়া শিখিয়েছে এবং বিয়ে দেওয়ারও একটা ইচ্ছে ছিল ভদ্রমহিলার কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে নি।

কাজেই মীনা একটা চাকরি খুঁজে নিয়েছিল।

দু'জনার আলাপের ব্যাপারটাও বিচিত্র।

প্রখ্যাতনামা শিল্পী পার্থপ্রতীমের গানের একজন বিশেষ ভক্ত ছিল মীনাক্ষী।

অত্যন্ত খেয়ালী শিল্পী পার্থপ্রতীম—দেড় বছর ও দু'বছরে একখানার বেশী কখন গান রেকর্ড করেনি—রেডিওতে বহুবার ডেকেছে কিন্তু গায় নি।

বলেছে আমার গান আমার একান্ত নিজস্ব—আমার নিজের মনের খুশি—নিজের মনের আনন্দ-হাটে বাজারে দশজনার মধ্যে বিকোবার জন্য ত নয়।

অথচ তেমন কবে চাহিদানুযায়ী গাইলে হয়ত টাকাই রোজগার করতে পারত পার্থ।

কাগজে পার্থপ্রতীমের ছবি দেখেছে মীনা এবং রেকর্ডে গান শুনেছে কিন্তু সামনা-সামনি চাক্ষুস কখন দেখেনি তাকে এবং কখনো সামনা-সামনি শোনেনি তার গানও।

অনেকদিনকার একটা গোপন বাসনা ছিল মনের মধ্যে মীনার সে সামনা-সামনি পার্থকে দেখে—তার গান শোনে।

কিন্তু সে দুলর্ভ সুযোগ আর আসেনি জীবনে। ভেবেছিল বুঝি আসবে না কোনদিনই, কিন্তু আকস্মিক এলো সে সুযোগ একদিন জীবনে।

হঠাৎ একদিন বান্ধবী শীলা এসে বললে কথায় কথায়, ওরে তোর সেই রূপকথার দেশের গায়ক পার্থপ্রতীম যে সামনের শনিবার সন্ধ্যা রবীনদার বাড়িতে আসছে—রবীনদার জন্মদিন—ওর বন্ধু ত—গাইবে।

সত্যি—আনন্দে যে ছল্‌কে ওঠে মীনাক্ষী।

সত্যি—

আমি যাবো। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

তাইত বললাম তোকে—

কিন্তু তোর—, সঙ্গে সঙ্গে থিতিয়ে যায় মীনাক্ষী।

কি?—

তোর রবীনদাকে ত আমি চিনি না ভাই—সেখানে তাঁর জন্মদিনের উৎসবে যাওয়াটা কি—হঠাৎ যেন মীনাক্ষী থেমে যায়।

তাতে কি, আর উৎসব মানে তো কোন বড় লোকের বাড়ির উৎসবের মত হৈ চৈ ব্যাপার একটা কিছু নয় রে। ছোট একটি ঘরোয়া মিলন—দু-চারজন একান্ত আপনার মানুষ আসবে ঐ দিনটিতে শুভকামনা জানাতে—

তবু মীনার যেন সংকোচ যায় না।

শীলার রবীনদাকে দেখেছে বটে ইতিপূর্বে কয়েকবার মীনাক্ষী দূর থেকে কিন্তু পরিচয় ত নেই। যার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই তার জন্মদিনে—

কিন্তু সে সংকোচটা আর রইলো না মীনাক্ষীর। বৃহস্পতিবার অফিস থেকে ফিরে ছোট একটা চিঠি ডাকে পেয়ে।

সুচরিতাসু,

শনিবার ১২ই আমার জন্মদিন—আপনি যদি আসেন খুশি হবো। এবং আরো খুশি হবো যদি ঐদিন একটি গান গেয়ে শোনান। ইতি

রবীন চক্রবর্তী।

॥ ৩॥

ফলের রসটা একটা কাচের গ্লাসে করে নিয়ে মীনাক্ষী এসে ঘরে ঢুকল।

সামনের খোলা জানালা পথে ছোট্ট একটুকরো আকাশ চোখে পড়ে।

সন্ধ্যা রাতের আকাশে সেই সন্ধ্যা তারাটি তখন দেখা দিয়েছে। ভীরু মিটি মিটি।

অন্যমনে খাতাটা কোলের উপর রেখে সেই তারাটির দিকেই তাকিয়ে ইজিচেয়াটার পরে গা এলিয়ে পড়েছিল পার্থপ্রতীম।

মীনাক্ষী সামনে এসে দাঁড়াল, নাও ফলের রসটা খেয়ে নাও—

কিন্তু—পার্থ ফিরে তাকাল মীনাক্ষীর মুখের দিকে, আমি চেয়েছিলাম এক কাপ চা—

এখন আর চা নয়, এই ফলের রসটুকু খেয়ে নাও, ধর। বলতে বলতে গ্লাসটা এগিয়ে ধরে একেবারে মুখের কাছে মীনাক্ষী পার্থর।

বেশ দাও, গ্লাসটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে রসটুকু খেল পার্থ, তারপর বলে কিন্তু ক্যামেলিয়া—এ রীতিমত আমার পৌরুষের অপমান—

সে আবার কি!

নয়—এই যে ঘরের মধ্যে দিনের পর দিন পক্ষকাটা বিহঙ্গের মত আমায় রেখে দিয়েছো—

সে আবার কি?

নয়—এই যে অকর্মণ্যতা—ঘন্টার পর ঘন্টা নিষ্ক্রিয়তা—পরমুখাপেক্ষীতা—

তা ডাঃ সর্বাধিকারী যে তোমায় বলেছেন Complete rest নিতে—

Rest—rest আর complete rest কিন্তু এ ভাবে বেঁচে লাভ কি বলতে পার ক্যামেলিয়া—

সত্যি—সত্যি—মীনাক্ষী পার্থর কথাটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, এবার থেকে ঐ নামেই আমাকে ডাকবে নাকি তুমি!

হ্যাঁ—তাই।

কিন্তু এ কি বিচিত্র খেয়াল তোমার!

খেয়াল কিনা জানি না তবে তুমি সত্যিই আমার মনের নিভৃতে একটি সুদুর্লভা ক্যামেলিয়া ফুল—

কিন্তু তাত নয়—হঠাৎ মৃদু হেসে বলে ওঠে মীনাক্ষী, ক্যামেলিয়া ত সত্যি সত্যিই নয়—নাম তার ছিল কমলা—

পার্থ তাড়াতাড়ি বলে, মনে নেই তার পরের কথাগুলো তোমার—

হেসে বললেম, 'ক্যামেলিয়া',
সহজে বুঝি এর মন মেলে না?'

তনুকা কী বুঝলে জানি নে—হঠাৎ লজ্জা পেলে, খুশিও হল॥

একটু বোস পার্থ, বলে, আমি জানি তুমিও খুশি হবে—খুশি যে তোমাকে হতেই হবে।

মৃদু কৌতুক হাসি মীনাক্ষির চোখে মুখে কিন্তু সেদিকে তাকায়ও না পার্থ—হাত বাড়িয়ে কেবল মীনাক্ষীর হাতটা নিজের হাতের মুঠটার মধ্যে ধরে—এবং আরো মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলে।

নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে,
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে,
মহিষ চরছে হরতুকি গাছের তলায়—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলের পিঠের উপরে।
বাসাবাড়ি কোথাও নেই—
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ
কেবল ছিল সেই ক্যামেলিয়া॥

কেন যেন সহসা মীনাক্ষীর চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে—নিঃশব্দে নিজের হাতটা পার্থর মুঠো ছাড়িয়ে সামনের অন্ধকার ছাতের পরে এসে দাঁড়ায়।

সব মনে পড়ে—সেই পার্থ।

চিঠিটা পেয়ে মীনাক্ষীও প্রথমে অবাক। বুঝতেই পারে না চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিছু। তারপর অবিশ্যি শীলার সঙ্গে দেখা হতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

শীলাই প্রথমে প্রশ্ন করে, কিরে এবারে যাবি ত?

ও—তোর কীর্তি তাহলে—

তা কি করি—

ছিঃ ছিঃ কি ভাবলেন বলত তোর রবীনদা—

কিছু ভাবেনি—যাক আসছিস ত?

দেখি—

দেখি নয় সুনিশ্চিত। আসবি—

প্রথমে ভেবেছিল ও যাবে না তারপর কি ভেবে শনিবার সন্ধ্যায় কয়েক গোছা রজনীগন্ধা ও রবীন্দ্রনাথের একটি 'জন্মদিন' নিয়ে কুণ্ঠিত পায়ে গিয়ে হাজির হলো রবীনের গৃহে।

কালীঘাট অঞ্চলে একটা সরু গলির মধ্যে অনেক কালের পুরানো একতলা একটা বাড়ি।

গলির মধ্যে যে গ্যাস বাতিটা জ্বলছে তার আলো এত সামান্য যে যতদূর দৃষ্টি চলে সরু গলিপথটার মধ্যে একটা আলোছায়ার লুকোচুরি চলেছে যেন, বাড়িটার কাছাকাছি যেতেই কানে এলো তার প্রিয় গায়কের গলার গান।

পার্থপ্রতীমের গান।

পার্থপ্রতীম গাইছে ঃ

কোন্ ভিখারি হায় রে এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
বুঝি সব ধন মন মম মাগিল রে ॥

দরজাটা সামান্য খোলা—ভিতর থেকে আলোর আভাস দেখা যায়। একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে মীনাক্ষী।

পার্থ গায় ঃ হৃদয় বুঝি তারে জানে,
কুসুম ফোটায় তারি গানে।
আজি মম অন্তর-মাঝে সেই পথিকেরই পদধ্বনি বাজে
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙ্গিল রে॥

আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে যেন পা টিপে টিপে দরজাটা আলতো ভাবে ঠেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকল মীনাক্ষী।

ছোট ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতা। মাঝখানে ছোট একটি জয়পুরী ভাসে কিছু পদ্মকলি ও রজনিগন্ধা, ধূপাধারে মল্লিকা ধূপ জ্বলছে—ফুলের গন্ধের সঙ্গে সেই মল্লিকা গন্ধ যেন মেশামেশি হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ঘরের মধ্যে বেশী লোকজন নেই। এক পাশে বসে রবীন যার জন্মদিন—আর তার দুটি বন্ধু—তাদের মীনাক্ষী আগে কখন দেখেনি আর আছে তার বান্ধবী শীলা ও শীলারই সমবয়সী একটি মেয়ে।

পরে জেনেছিল মীনাক্ষী সে রুবী—রবীনের বোন।

মাঝখানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে পার্থপ্রতীম।

এই সামনা-সামনি এবং এত কাছে প্রথম দেখল পার্থপ্রতীমকে মীনাক্ষী। পরনে পায়জামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবী।

মাথার চুল রুক্ষ।

প্রশস্ত ললাট—ললাটের'পরে কয়েক গাছি চূর্ণ কুন্তল।

গান সবে শেষ হয়েছে—মীনাও ঘরে পা দিয়েছে, শীলাই তাড়াতাড়ি দেখতে পেয়ে সাদর আহ্বান

জানায়, এই যে মীনা আয়—রবীনদা—মীনাক্ষী—

রবীনও হাত তুলে নমস্কার জানায়—আসুন, আসুন—

মীনাক্ষী সকলকে নমস্কার জানিয়ে রজনীগন্ধার গুচ্ছ বাড়িয়ে দেয় রবীনের দিকে, রবীন হাত পেতে নেয় ফুল ও বইটা, তারপর মৃদু স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলে, নিলাম দু'হাত পেতে মীনাক্ষী দেবী কিন্তু একটি গান—

পার্থপ্রতীম চোখ তুলে তাকায় মীনাক্ষীর দিকে।

দু'জনে চোখাচোখি হয়।

শীলা বলছিল আপনি নাকি চমৎকার গান গান, কিন্তু· বাঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন—আবার আহ্বান জানায় রবীন।

শীলাও বলে, আয় বোস—মীনা—

মীনাক্ষীকে বসতেই হয় এবং বসে বলে, শীলা আপনাকে যাই বলে থাকুক তার সবটুকু অকপট সত্য নয় কিন্তু—কারণ, আমার গান আর যেখানেই গাই না কেন এ আমার—বিশেষ করে একটু আগে যে গান শুনতে শুনতে পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম তারপর আর এখানে নিশ্চয়ই জানবেন সে গান শোনাবার মত ত নয়ই—শোনবার মতও নয়—

হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে কথাগুলো বের হয়ে গিয়েছিল মীনাক্ষীর। এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হচ্ছে তার কথার জবাব দিয়েছিল সেদিন পার্থপ্রতীম।

বলেছিল, যারা গান গায়—তাদের গান শোনবার মত ও শোনাবার মত হবে না তাই কি কখন হয় নাকি—নিন—গান একটা গান—বলতে বলতে হারমোনিয়ামটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল পার্থপ্রতীম।

ঠিক—ঠিক বলেছো পার্থ—সায় দেয় রবীন।

॥ ৪ ॥

পাশের ঘরে পার্থর জন্য ফলের রস ছাঁকতে ছাঁকতে সেই প্রথম দিনের কথাটাই যেন কেন মনে পড়ছিল মীনাক্ষীর।

কত দিন—প্রায় দু'বছর হতে চলল।

সেদিন সন্ধ্যায় রবীনদার বাসাতেই প্রথম দু'জনার আলাপ—পার্থরই গাওয়া—তারই সুরের একটি গানের ভিতর দিয়ে।

আর সে গানটির রচয়িতা ঐ রবীন চক্রবর্তী।

পার্থ হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দেবার পরও ও ইতস্ততঃ করছিল—তখন পার্থই আবার তাগিদ দেয়, কই—গান—

ভাল লাগবে না কিন্তু—

লাগবে, গান।

মীনক্ষী তখন গেয়েছিল ঃ

একটি সন্ধ্যাতারা
সেদিন সন্ধ্যা রাতে—
আমার গানের প্রথম কলি
সুরের একতারাতে।

মীনা কোন দিন কারো কাছে গান শেখেনি—সাধনাও কিছু তার ছিল না। গাইত সে আপন খেয়াল-খুশিতে। কিন্তু সেদিন সেই সন্ধ্যা রাত্রির আসরে তার কণ্ঠ যেন পরম এক বিস্ময়ের মত সুর বিস্তার করেছিল।

সুরে যেন আপনা হতেই ময়ূরের মত সাত রঙা প্যাখম মেলেছিল।

গান থেমে যাবার পরও যেন সুর আর গানের কথাগুলো ঘরের মধ্যে গুনগুনিয়ে ফেরে, কারো মুখে কোন কথা নেই।

কেবল নির্বাক একটি আনন্দের সুর যেন সবার মনকে স্পর্শ করে রয়েছে তখন। আশ্চর্য। আর কোন দিন তেমন করে গাইতে পারেনি মীনা।

সে গান আর আসেনি তার গলায়।

কিন্তু না আসুক সেই দিন যা সে গেয়েছিল সে যে তার চিন্তার অতীত।

ফেরার সময় রবীনই তার বন্ধু পার্থকে অনুরোধ করে, রাত অনেক হয়ে গিয়েছে—পার্থ তুই মীনাক্ষী দেবীকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাস—

নিশ্চয়ই যাবো—

পার্থ বলে।

রাত যে হয়েছিল মিথ্যে নয়।

একটার পর একটা গান—ওদের যেন সেদিন গানের নেশায় পেয়েছিল। গান গাওয়া ও শোনার শেষই হয় না যেন।

আসর যখন ভাঙ্গল রাত তখন সোয়া এগারটা।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেরুতে বেরুতে রাত পৌনে বারটা হয়ে যায়।

দু'জনে বেরুল।

গলিপথটা পার হয়ে বড় রাস্তা।

কিন্তু অত রাত্রে তখন বড় রাস্তাটাও প্রায় নির্জন। এক আধটা পানের দোকান ছাড়া সব বন্ধ।

বাস ট্রাম সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে—কেবল একটা আধটা রিকশার ক্লান্ত ঘন্টির আওয়াজ রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঠুং ঠুং ঠুং।

আপনার বাসা ত সেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে বললেন না? পার্থ শুধায়।

হ্যাঁ—জবাব দেয় মীনাক্ষী।

একটা রিকশা নিই—

কি দরকার—এটুকু পথ হেঁটেই যেতে পারব—

পার্থ আর কথা বাড়ায় না। দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলে।

আকাশে মেঘ করেছে। বেশ ঘন মেঘ।

শ্রাবণের শেষ—শহরে বর্ষাটা ঝিমিয়ে এসেছে বটে কিন্তু এখনো একেবারে থামেনি।

দূরে বোধহয় কোথাও বৃষ্টি হয়েছে ঃ একটা ঝিরঝিরে জলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

পার্থকে যেতে হবে মীর্জাপুর।

পাশাপাশি দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক সময় পার্থ বলে, এত সুন্দর আপনার গলা—এত সুন্দর আপনি গান অথচ আপনি গাইতে চাইছিলেন না—

বিশ্বাস করুন ব্যাপারটা আমার কাছেও সত্যিই আকস্মিক। মীনাক্ষী সংকোচভরা কণ্ঠে বলে।

আকস্মিক!

হ্যাঁ—তাছাড়া আরো একটা কথা জানেন?

কি?

সামনা-সামনি আপনার গান শুনবো আমার বহুদিনের আকাঙ্খা। কিন্তু সুযোগ হয় না—

কেন?

কেন কি? আপনি ত সহজে কোথায়ও গান না—তাই শীলা যখন এসে বলল আপনি রবীনবাবুর জন্মদিনে আসছেন—গান গাইবেন—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো—

কি—

রবীনবাবুকে ত আমি চিনি না—তাঁর জন্মদিনে কেমন করে তাহলে আমার যাওয়া হয়—

তারপর?

তারপর আর কি? শীলা বোধহয় বলেছিল রবীনবাবুকে, তিনি যাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণলিপি পাঠালেন। তাই বলছিলাম গান গাইতে ত নয়—আপনার গান শোনবার জন্যই যে আমার যাওয়া—আপনারই ফুল দিয়ে আপনাকে প্রণাম জানালাম। তারপরই একটু থেমে বলে, আচ্ছা একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি রাগ করবেন না?

না, না—রাগ করবো কেন?

আপনি এত কম রেকর্ড করেন কেন? বেতারেও গান না—

ভাল লাগে না—

আশ্চর্য! কেন?

কারণ ও আমার নিজস্ব আনন্দের জিনিষ বলে--

কিন্তু আমরা যে চাই আপনার গান।

আছে ত রেকর্ড—

সমুদ্রের পিপাসা কি এক গণ্ডুষ জলে মেটে—

এবার পূজোয় একটা রেকর্ড করছি—

সত্যি! কি গান?

রবীনের লেখা গান। জানেন—আমি যেমন খুব কম গান গাই—রবীনও তেমনি কদাচিৎ কখন গান লেখে। আজ পর্যন্ত গত চার-পাঁচ বছরে ও মাত্র চারটি গান লিখেছে।

আলাপের সূত্রপাত দু'জনার মধ্যে ঐদিন থেকেই।

ঐদিন সন্ধ্যার পর দিন দুই বাদে আর এক সন্ধ্যায়। অফিস থেকে ফিরছে মীনাক্ষী পায়ে হেঁটে।

রাস্তার ধারে ফুটপাতের উপরে একটা পুরাতন বইয়ের দোকান, দোকান ঠিক নয়—একটা লোক রাস্তার ধারে ফুটপাতের 'পরে বহু পুরাতন বই ছড়িয়ে নিয়ে বসে বিক্রী করছে।

সেখান দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মীনাক্ষীর নজরে পড়ল, পার্থ একটা বহু পুরাতন জীর্ণ বই হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে উল্টে উল্টে দেখছে।

পার্থকে এখানে দেখে মীনাই আগ্রহে এগিয়ে যায়, পার্থ বাবু—

কে! ও আপনি!

পুরানো বই দেখছেন বুঝি?

হ্যাঁ—সঙ্গীত শাস্ত্রের উপব একটা পুরানো বই—rare এবং অত্যন্ত মূল্যবান বই—কিন্তু আপনি এদিকে এ সময়ে—

রোজ অফিস থেকে ত এই রাস্তা ধরেই আমি বাড়ি ফিরি—

পার্থ তখন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে, কত নেবে বইটা।

সাত টাকা বাবু—

পার্থ দ্বিরুক্তি করে না। পকেট থেকে টাকা বের করে বইটা নিয়ে নেয়—তারপর মীনাক্ষীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, চলুন—

মীনাক্ষী বলে, ও সাত টাকা দাম বললো আর আপনি সাত টাকা দিয়ে দিলেন? দামও করলেন না—

দামী এবং মন যা চায় সে জিনিষের কি দর কষাকষি করে দাম ধার্য করতে হয়—

করতে হয় না বুঝি?

না। তা'হলে আর প্রাপ্তির—দুর্লভের আনন্দটা থাকল কোথায়? তাছাড়া আজ ত আমার পকেট ভর্তি—আজ ত বলতে পারেন আমি রাজা—

রাজা!

হ্যাঁ—নতুন রেকর্ডের—মানে পূজোর যে রেকর্ডটা বেরুচ্ছে তার disc-এর জন্য এক সঙ্গে চারশ টাকা পেয়েছি—

নতুন রেকর্ডটা বাজরে বেরিয়েছে নাকি?

না—এখনো বাজারে বের হয়নি তবে একটা রেকর্ড আমাকে Complementary দিয়েছে—

সত্যি!

হ্যাঁ—শুনবেন?

নিশ্চয়ই—

তাহ'লে যে কষ্ট করে একবার আমার বাড়ি যেতে হবে!

যাবো।

দাঁড়ান—তাহলে একটা ট্যাক্সি ডাকি।

ট্যাক্সিতে করে বাড়ির সামনে গিয়ে নেবে দু'জনে সিঁড়ির তলাব সেই প্রায় অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢোকে।

ঢুকতে গিয়ে পার্থ মীনাক্ষীকে সাবধান করে দেয়, আসুন - দেখবেন মাথা বাঁচিয়ে আসবেন—

পার্থ সেখানেই থাকে বটে তবে সেটাকে ঘর বলা চলে না।

আলো জ্বেলে পার্থ বলে, বসুন।

মীনাক্ষী চৌকীর 'পরে বসে এদিক ওদিক তাকায়।

বাড়িতে কেউ নেই আমি একা। সবাই মানে কাকা তাঁব ফ্যামিলি নিয়ে তাঁর শালার ছেলেব বিয়েতে ভাগলপুর গেছেন।

আপনি এইখানে থাকেন নাকি?

হ্যাঁ—কেন—ও কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন! কথাটা বলে কয়েকটা মুহূর্ত যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে পার্থ। তারপরই হঠাৎ হেসে ফেলে—

হাসলেন যে!

এই ঘরটা দেখেই বোধহয় কথাটা জিজ্ঞেস করলেন—এই ঘরে আমি থাকি কিনা? কিন্তু এতে বিস্ময়ের কি আছে! একটা মানুষের থাকবার জন্য আরো বেশী জায়গার কি সত্যই প্রয়োজন আছে মীনাক্ষী দেবী?

কিন্তু এ যে আলো নেই বাতাস নেই—

আছে—আছে—সব আছে! তাছাড়া কুড়ি বছর এই ঘরটার মধ্যে আমি আছি—

কুড়ি বছর! বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না মীনার।

হুঁ, কুড়ি বছর—কিন্তু যাক, কি খাবেন বলুন—চা আনাই আর গরম গরম সিঙ্গাড়া—

না, না—কিছুর দরকার নেই—

বাঃ তা কি হয়—প্রথম এলেন আপনি আমার ঘরে—

আপনার রেকর্ডটা শুনতে এসেছি, রেকর্ডটা শোনান—

সে ত শোনাবই—কিন্তু আগে একটু চা—তাছাড়া আপনি ত অফিস থেকে আসছেন—পিপাসা কি আর পায় নি! নিশ্চয় পেয়েছে—

বেশ—শুধু চা—আর কিছু না—

শুধু গান শোনা নয় তারপর সেদিন আরও আলাপ হয়েছিল দু'জনার মধ্যে।

এবং ফিরতে সেই প্রায় রাত নয়টা হয়ে গিয়েছিল মীনাক্ষীর সেদিন রাত্রে।

পথে নেমে পার্থই বলেছিল, আবার কবে দেখা হচ্ছে? কবে বলুন—

কবে?

হ্যাঁ—বলুন কবে?

কাল পরশু—

তাই হবে—এবং মনে থাকে যেন কাল পরশু। অনিশ্চিত নয়—নিশ্চিত কাল—

আগামী কাল—তবে একটা কথা আছে—

বলুন।

এখানে, মানে ঐ ঘরে নয় কিন্তু—

তবে কোথায়?

অন্য কোনখানে। তা সে যেখানেই হোক—

বেশ সামনের ঐ পার্কে—

তাই আসবো।

কখন?

অফিসের পর—কাল সন্ধ্যায়।

হ্যাঁ—আগামী কাল—আমি অপেক্ষা করবো।

॥ ৫ ॥

ঐ পার্কের মধ্যেই সন্ধ্যার পর দু'জনে পাশাপাশি বসে কথা বলে।

পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় করে জানতে পারে।

ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে পরস্পরের কাছে পরস্পর ওরা।

সেও কম নয় একটা বছরের ইতিহাস।

ইতিমধ্যে ওরা স্থির করে বিয়েটা করে ফেলা প্রয়োজন। বিয়ে করে ওরা কোথাও নিজেদের ছোট একটা নীড় বাঁধবে।

ছোট একটি নীড়। নিরালা গৃহকোণ!

পার্থ বলে, তা কবে?

কি কবে? মীনা দুষ্টুমি ভরা চোখে ওর মুখের দিকে তাকায়।

আমাদের বিয়েটা কবে?

সে ত যে কোনদিন হতে পারে কিন্তু তার আগে যে একটা বাড়ি চাই—

বাড়ি!

হ্যাঁ—নচেৎ উঠবো কোথায় গিয়ে আমরা?

সত্যিই ত। কথাটা ত একবারও মনে হয় নি—তাহলে?

কি তাহলে? বাড়ি একটা খুঁজে বের করব।

দু'জনে খুঁজতে শুরু করল বাড়ি—এবং প্রায় চার মাস বাদে এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটি পেল—কিন্তু ইতিমধ্যে পার্থর 'পরে ঘর ছাড়ার নোটিশ জারী হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক হলো সামনে দিন চারেক বাদে ইষ্টারের ছুটি আছে, সেই দিনই পার্থ চলে আসবে ফ্ল্যাটে।

এবারে বিয়েটাও সেরে ফেলতে হবে।

রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে দু'জনে নোটিশ দিয়ে এলো।

ইষ্টারের ছুটি এলো।

সকালে পার্থ ফ্ল্যাটে উঠে গেল—সারাটা দিন ধরে দু'জনে ঘর সাজাল। রাত আটটায় মীনা চলে গেল।

বলে গেল কাল খুব ভোরে আসবে। তারপর দু'জনে এক সঙ্গে চা খাবে।

কথামত খুব ভোরে এলো বটে মীনা কিন্তু দু'জনের আর এক সঙ্গে চা খাওয়া হলো না।

ঘরের দরজা বন্ধ।

মীনা ভেবেছিল দরজা খোলাই থাকবে—দরজার গোড়াতেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে পার্থ ওর জন্য।

ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

কিন্তু দেখলো দরজা বন্ধ।

বোধহয় এখন ঘুমই ভাঙ্গে নি পার্থর। মৃদু হেসে টোকা দিয়ে ফিস-ফিসিয়ে তখন ডাকে, পার্থ—পার্থ—

সাড়া নেই।

পার্থ—আমি এসেছি—দরজাটা খোল—

এবার দরজা খুলে গেল।

সমনেই দাঁড়িয়ে পার্থ।

কিন্তু পার্থর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন চমকে উঠে মীনা।

এ কি চেহারা পার্থর!

রাতারাতি এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন। সমস্ত মুখে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে।

কোটরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে একরাত্রের মধ্যেই যেন চোখ দুটো—অদ্ভুত দীপ্তিতে যেন ঝক্‌ঝক্ করচে।

মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো।

সহসা বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে ওঠে মীনার।

পার্থ!

পার্থ চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

কি হয়েচে পার্থ! কি হয়েছে?

পার্থ চুপ, বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তখনো শুধু মীনার মুখের দিকে, ওর চোখে চোখ রেখে।

কথা বলছো না কেন? কি হয়েছে—কি হলো? অমন করে চেয়ে আছো কেন, কথা বলছো না কেন! পার্থ—

মীনা—

বল—

তু—তুমি চলে যাও মীনা—

চলে যাবো!

হ্যাঁ—যাও—এখুনি এখান থেকে চলে যাও—পালিয়ে যাও এখান থেকে—দূরে—অনেক দূরে

পালিয়ে যাবো!

হ্যাঁ—হ্যাঁ—

পার্থ—এগিয়ে আসে মীনা বুঝি দু-পা।

হঠাৎ যেন ওর কাছ থেকে ছিট্‌কে দূরে সরে যায় পার্থ, না, না—এসো না। কাছে এসো না—কাছে এসো না আমার—

পার্থ! কি হয়েছে তোমার পার্থ! অমন করছো কেন?

গলা বুজে আসে মীনার—চোখ দুটো জলে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

পার্থ কোন জবাব দেয় না। এগিয়ে গিয়ে খাটের নীচ থেকে গতকাল সংসারের জন্য আবশ্যকীয় কেনা একটা কাচের বাটি এনে ওর সামনে তুলে ধরে।

বলে, এই দেখ—

এ কি—এ যে রক্ত! একটা আর্তনাদ যেন অস্ফুটে বের হয়ে আসে মীনার গলা চিরে—একটা চাপা অবরুদ্ধ কান্নার মত।

সত্যিই থক্ থক্ করছে বাটির মধ্যে লাল রক্ত। লাল—জমাট বেঁধে উঠতে পারেনি তখনো ভাল করে।

কাল—কাল কাসতে কাসতে গলা দিয়ে বের হয়েছে রক্ত—পার্থ কোন মতে বলে।

কার—কার গলা দিয়ে? তবু জিজ্ঞাসা করে মীনা।

আমার—আমার গলা দিয়ে—কথাটা বলে হাত থেকে কাচের বাটিটা নামিয়ে রাখে পুনর্বার পার্থ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মীনা ছুটে এসে দু'হাতে পার্থকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, না—না—গো, না, না—

মীনা ছেড়ে দাও—আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও—আমি জানি, এ কি ভয়ানক ব্যাধি—আমার মা—আমার ছোট ভাই এই ব্যাধিতেই মারা গিয়েছিল—

না, না—মীনা তখনো বলে চলেছে আর কাঁদছে পার্থর বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে।

নাগো—না—না—

পার্থ বলতে থাকে, আঠার বছর তারপর চলে গিয়েছে, ভেবেছিলাম এ ব্যাধি থেকে আমি বোধহয় মুক্তি পেলাম কিন্তু এখন বুঝতে পারছি মুক্তি আমি পাইনি—আমাকে মুক্তি সে দেয়নি—অলক্ষ্যে আমাকেও গ্রাস করেছে।

না, না—চুপ করো—ওগো লক্ষ্মীটি চুপ কর—আমি বলছি তোমার হয়নি—চল এক্ষুণি আমরা ডাক্তারের কাছে যাবো।

কোন লাভ হবে না মীনা, আমি বলছি সেই বিষাক্ত বীজাণুই আমার বুকের মধ্যেও বাসা বেঁধেছে—

না,—না, কিছুতেই না। সে হতে পারে না। ভগবান এত বড় নিষ্ঠুর হতে পারেন না—

ভগবান যে কত বড় নিষ্ঠুর তুমি তা জান না মীনা—কিন্তু আমি জানি ; আমি যে বার বার দু'বার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তাঁর পরিচয় পেয়েছি—

সেই দিনই সবচাইতে বড় যে ডাক্তার সে শহরে তার চেম্বারে নিয়ে গেল মীনা পার্থকে সঙ্গে করে। ডাঃ সর্বাধিকারী অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন—

কি দেখলেন ডাঃ সর্বাধিকারী—মীনা উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙ্গে পড়ে।

X'ray আর sputum-এর report না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না—বললেন বটে মুখে

কথাটা ডাক্তার কিন্তু ষ্টেথো বসিয়েই পার্থর বুকে তিনি টের পেয়েছিলেন ব্যাধি টি, বি, নিঃসন্দেহে এবং ডান দিক্কার ফুস্‌ফুস্‌ ভাল ভাবেই জখম করেছে।

কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও ডাঃ সর্বাধিকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা তার কেঁপে ওঠে কেন জানি।

ফিরে আসে দু'জনে ফ্ল্যাটে।

পার্থ বলে, চুপচাপ কেন মীনু—

কই—

মিথ্যেই তুমি স্বপ্ন দেখছো মীনু—আমি জানি—ঐ রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায় কি আছে—

ডাক্তার কি তাই বললেন নাকি?

আজ বলেন নি কিন্তু দু'দিন বাদে বলবেন—

তুমি ত সব জেনে বসে আছো—আমি বলছি দেখো কিছু হয়নি তোমার—

॥ ৬ ॥

এই পর্যন্ত বলে তরুণ থামল।

পাশেই সিগ্রেটের টিনটা ও দেয়াশালাই ছিল—টিন থেকে একটা সিগ্রেট বের করে নিয়ে—অগ্নিসংযোগ করল তরুণ।

কয়েকটা টান দিয়ে ধুমোদ্গারণ করে আবার বলতে থাকে, এলোমেলো সব ঘটনা—ছেঁড়া ছেঁড়া-আমিই সব গুছিয়ে জোড়া দিয়ে নিয়েছি—কাজেই সত্যির মধ্যে অনেক কল্পনাও আমার থেকে গিয়েছে কিন্তু কবি—

—থাক—তুই বলে যা।

তাগিদ দিলাম আমি।

—আরো একটা জিনিষ অবিশ্যি আমাকে ওর জীবন কাহিনী জানতে সাহায্য করেছে অনেকটা—

—কি!

—যে সময় ও spying করেছিল—সেই সময় মধ্যে মধ্যে ও ডাইরী রেখেছে—ডাইরী ঠিক নয় একটা বাঁধন খাতার মধ্যে মধ্যে খেয়াল খুশিতে বোধহয় নিজের কথা লিখত, সেই খাতাটা ওর কলকাতার বাড়ি সার্চ করে পাওয়া গিয়েছিল—সেটা পরে শীলা পুলিশের কাছ থেকে নেয় এবং শীলার কাছে পাই—

—শীলা মানে ওর সেই বান্ধবী—রবীনের বোন!

—হ্যাঁ—বর্তমানে আমার স্ত্রী—

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ—যাক—যা বলছিলাম—

মিথ্যে সান্ত্বনা।

এ কথা কি চাপা থাকে, না চাপা দেওয়া যায়।

ডাক্তার সর্বাধিকারীকেও সত্য কথাটা বলতে হলো এবং ওদের পরস্পরের কাছেও সত্যটা আর গোপন থাকল না।

সান্ত্বনার পর্দাটা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে সত্য প্রকট হয়ে পড়ল।

মীনা বলে, কিছু তুমি ভেবো না পার্থ—ডাক্তার সর্বাধিকারী ত বললেনই—এ রোগের আজকাল যে সব মোক্ষম ঔষধ বের হয়েছে—এ রোগে আজকাল আর কেউ তাই মরে না—

মৃদু হাসে পার্থ।

আমি তোমাকে ভাল করে তুলব পার্থ। নিশ্চয়ই ভাল করে তুলব—

কিন্তু যে সময় ধৈর্য ও অর্থের প্রয়োজন—

আমি সব জোগাড় করবো—

পার্থ আর কোন কথা বলে না। কোন জবাব দেয় না মীনার কথার। খোলা জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—পার্থ—

—উঁ—

—চুপ করে আছো কেন, কথা বল।

—মীনা—

—বল?

—কবিগুরুর সেই গানটা জান?

—কোন গানটা।

পার্থ গুনগুনিয়ে গায় ঃ

আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণায় রাগিনী যায় থামি যে।
গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহারা পথে ধায়
গহন তিমির গুহাতলে যাই নামি যে॥

মীনাক্ষী শক্ত করে পার্থর হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে।

প্রত্যহ নিয়ম করে আসে মীনা পার্থর ফ্ল্যাটে—তার সেবা করে—তার ঔষধ-পত্রের সব ব্যবস্থা করে।

উৎসাহ দেয়—আশা দেয়।

রাত-দিনের একটা চাকর রেখেছে মীনা—বিরজু।

রাত্রে যাবার আগে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই—সর্বক্ষণ হাসিমুখ মীনাক্ষীর। কিন্তু ওর ঐ সেবা—ওর ঐ হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে পার্থর বুকের মধ্যে যেন কেমন করে।

মনে হয় সে যেন অন্যায় করে মীনাকে লুণ্ঠন করছে। প্রাপ্যার চাইতেও অনেক বেশী যেন জোর করে আদায় করে নিচ্ছে। এ শুধু অন্যায় নয়, অনুচিত।

মীনাকে এমনি করে আটকে রাখবার তার কোন অধিকার নেই।

সেদিন মীনার আসতে একটু দেরিই হয় অফিস থেকে। হাতে ফলের ঠোঙ্গা—বিস্কুট ও মাখন।

ঘরে ঢুকে মীনা থমকে দাঁড়ায়।

ঘর অন্ধকার।

এ কি—আলো জ্বালোনি কেন এখনো—ঘর অন্ধকার। বিরজু কোথায়? বলতে বলতে নিজেই হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দেয়।

চুপটি করে বসেছিল ইজিচেয়ারটার উপরে পার্থ!

অমন করে বসে যে!

মীনা তাকায় পার্থর মুখের দিকে।

সামান্য একটু হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে পার্থর মলিন ওষ্ঠপ্রান্তে।

হরলিকস খেয়েছিলে?

না—

সে কি—বিরজু দেয় নি?

সে দুপুর বেলা ছুটি নিয়ে গিয়েছে এখনো ফেরেনি—

আশ্চর্য! সেই দুপুরে গেছে এখনো ফেরার নাম নেই—

মীনা তাড়াতাড়ি হরলিক্‌স্ বানিয়ে নিয়ে আসে। বিস্কুট দেয়, বলে, নাও—

এখন হরলিক্‌স্ খেতে ভাল লাগছে না মীনু—একটু চা কর। তুমিও খাও—আমাকেও দাও—

সে হবে'খন—হরলিক্‌সটা ত খেয়ে নাও—

হরলিক্‌সের কাপটা সামনে নামিয়ে রেখে চা তৈরী করতেই বোধ হয় চলে যায় মীনা পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে দু'কাপ চা দু'হাতে নিয়ে আবার ফিরে এলো ঐ ঘরে মীনা—

চা পান করতে করতেই দু'জনার মধ্যে কথা হয়।

পার্থ ডাকে, মীনু—

মীনা বলে, বল—

এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না—এ অন্যায়—

কি ঠিক হচ্ছে না—কি অন্যায়!

এমনি করে এখনো কেন তুমি আমার সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে রেখেছো?

পার্থ—

হ্যাঁ—সমস্ত জীবন তোমার সামনে। তুমি বলছিলে না—

কি?

তোমার মাসী তোমার জন্য একজন পাত্র ঠিক করেছেন—তাকেই তুমি বিয়ে কর না কেন?

তুমি খুব খুশি হও তাহলে, না?

হ্যাঁ—খুউব—

সে ত বুঝতেই পারছি।

একটা কথার জবাব দেবে পার্থ?

কি?

ধর আজ যদি তুমি আমি হতাম আর আমি তোমাকে ঐ কথাটা বলতাম—

মীনু—

যে মেয়ে স্বামী বর্তমান থাকতেও দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তাকে তোমরা কি বল নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি। আর আমাকে লোকে তাই বলুক নিশ্চয়ই তুমি তা চাও না—

কিন্তু মীনু—বলবার চেষ্টা করে পার্থ ঃ তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না—

বুঝতে পারছি বৈকি—

না—পারছো না। তুমিই বল এভাবে আর কতদিন তুমি চালাবে? আমার যা পুঁজি ছিল সে ত শেষ তলানীতে এসে পৌঁছেছে—

কিন্তু আমার পুঁজিত আজও তলানীতে এসে পৌঁছায় নি—তাছাড়া সুস্থ সবল শরীর আমার—আরো পাঁচ ঘন্টা অনায়াসেই আমি খাটতে পারি।

না, না—তা তুমি করো না মীনু। নিজেকে over strain করো না—বেশী কাজ করো না। এমনি ভাবে শুয়ে থাকার যে কি দুঃসহ ক্লেশ তুমি উপলব্ধি করতে পারবে না। বেঁচে থেকেও এই যে নিরুপায়তা—it is worse than death. মৃত্যুর চাইতেও মর্মান্তিক।

কেন তুমি ঐ সব কথা ভাব বলত? ডাঃ সর্বাধিকারী তো বলেছেন—দ্রুত তুমি improve করছো। শীঘ্রই তুমি আগের মত সুস্থ হয়ে উঠবে। আগের জীবনে ফিরে যাবে—

তোমার ডাক্তার যাই বলুন মীনু—আমি জানি তা আর হবার নয়।

ছিঃ, কি এসব তুমি বলছো

যা সত্যি—তাই বলছি। তুমি যাও—একে ত নিজের অসহায়ত্ব নিজেকে সর্বক্ষণ পীড়ন করছে তার উপরে যখন দেখি নিজের স্বার্থের জন্য তোমাকে কেবলই জড়িয়ে ফেলছি—নিজেকে কিছুতেই যেন আর আমি ক্ষমা করতে পারি না।

বেশ—আর বাধা দেব না। বল, যত খুশি তোমার বল। আমাকে ব্যথা দিয়ে যদি তুমি আনন্দ পাও—

মীনু—

তাই—তাই দাও—তাই দাও—মীনার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। আর শব্দ বের হয় না—কেবল দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে।

কেঁদ না মীনা, কেঁদ না—আমি হাঁপিয়ে উঠেছি—সত্যিই তুমি বিশ্বাস করো এই তিন মাসে আমি সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছি। নইলে তোমাকে আমি দুঃখ দিতে চাইনি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো—ক্ষমা করো।

আর কখন—কোন দিন ঐ সব কথা বলবে না বল।

না—

আমাকে ছুঁয়ে বল।

বলব না।

॥ ৭ ॥

পার্থপ্রতীম মিথ্যা বলে নি।

ঐ ভয়াবহ ব্যাধির সঙ্গে এক আধ দিনের ত নয় দীর্ঘ দিনের যে সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রাম করতে হলে সত্যিই অর্থের প্রয়োজন।

পার্থর জমানো টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল মাস তিনেকের মধ্যেই—তারপরই সমস্ত ভার পড়েছিল মীনার উপরে।

সে জন্য অবিশ্যি মীনার কোন দুঃখ ছিল না। হাসিমুখেই সে ভার সে তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধে।

পার্থকে সে কথা সে জানতেও দেয় নি।

কিন্তু গোলযোগ দেখা দিল অন্যদিক দিয়ে। সম্পূর্ণ অতর্কিতে।

মীনাক্ষীর মাসী বিমলা—মীনাকে এক প্রকার নিজের সন্তানের মত করেই মানুষ করেছিল।

অভাবের সংসারে তার নিজের তিনটি সন্তানের সঙ্গে আপন করে নিয়েছিল মীনাক্ষীকেও, মানুষ করেছে—লেখাপড়া শিখিয়েছে তাকে।

বিয়েরও চেষ্টা যা হোক একটা মেয়েটার জন্য করছিল মাসী এবং মেসো দু'জনাই।

কিন্তু হঠাৎ মীনাক্ষী এক মার্চেন্ট অফিসে চাকরি নিল।

মাসীর চাকরির ব্যাপারে খুব ইচ্ছে না থাকলেও বাধা দিল না। মনে মনে ভাবল, যাক—করুক চাকরি যে কটা দিন একটা ভাল পাত্র না খুঁজে পাওয়া যায়।

পাত্রর সন্ধান পেলে দেখা যাবে।

কাজেই পাত্রের সন্ধান পাওয়ায় এবং সেই পাত্র মীনাক্ষীকে পছন্দ করায়—কথাটা একদিন বিমলা তুলল বোনঝির কাছে।

বললে, ছেলেটি ভাল—মা আছে সংসারে আর কেউ নেই—রেলে চাকরি করে—তুই যদি ছেলেকে দেখতে চাস ত—

কোন প্রয়োজন নেই—জবাব দেয় মীনা।

প্রয়োজন নেই!

না।

কেন?

মীনার সঙ্গে তখন পার্থর মাস পাঁচেকের ঘনিষ্ঠতা চলেছে। দু'জনে পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করবে তাও তাদের মধ্যে স্থির হয়ে গিয়েছে।

এখন বিয়ে করবি না ত কবে আর করবি—বয়স কম হলো নাকি তোর? মাসী আবার বলে।

কেন ব্যস্ত হচ্ছো মাসী—সময় যখন হবে তখন আমিই তোমাকে জানাব—

ব্যাপারটা যেন শোকেসের সাজান পুতুল—তুমি বললেই আমি সংগ্রহ করে এনে দেবো—পাগলামি করিস না—মাসী ঝংকার দিয়ে ওঠে।

পাগলামি আমি করছি না—

পাগলামি ছাড়া আর কি এসব? ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না—পাত্রকে তুমি দেখ—আলাপ কর—যদি অপছন্দ হয় ত অন্য কথা, তবে অপছন্দ হবার মতো ছেলে সে নয় আমি বলছি।

মীনাক্ষীকে তখন অনন্যোপায় হয়েই পার্থর কথা জানাতে হয়েছিল। তবে নামটা সে বলে নি।

বলেছিল কেবল, আমি একজনকে কথা দিয়েছি মাসী—আর সেও আমাকে কথা দিয়েছে।

ক্ষণকাল অবাক হয়ে বোনঝির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিমলা বলে, কথা দিয়েছো!

হ্যাঁ—

কে সে? কোথায় থাকে—কি করে—

সময় হলেই সব—বলবো। জানতে পারবে তখন—

তার মানে?—

তার মানে এখনো সময় হয় নি—

হয়েও যেতো বিয়েটা ইতিমধ্যে কিন্তু সব যে ওলাট-পালোট হয়ে গেল পার্থ অসুস্থ হওয়ায়। শুধু তাই নয় তারপর প্রত্যহ অসুস্থ পার্থের ফ্ল্যাটে অফিসের পর যাওয়া এবং রাত করে প্রত্যহ বাসায় ফেরা—ক্রমেই ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে সবার।

প্রথম প্রথম মুখ ভার—তারপর ছোটখাটো কথায় বিরক্তি প্রকাশ—তারপর ক্রমশঃ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিমলা।

বলে, এসব কি শুরু করেছো?

মীনা জানত এ প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে একদিন হতেই হবে। এবং সে জন্য সে প্রস্তুতই ছিল।

বলে, কি শুরু করেছি?

কচি খুকীটি নও তুমি মীনা যে বুঝতে পারছো না আমার কথা—

বিমলার কণ্ঠস্বর গম্ভীর—থমথমে মুখ।

অফিসের পর কোথায় যাও—

কেন বলত?

না—তাই জিজ্ঞাসা করছি।

আমার একজন বিশেষ পরিচিত জন অসুস্থ—একা ফ্ল্যাটে থাকে সে—দেখা—শোনা করবার মত আপন জন কেউ নেই, তার কাছেই যাই—

তুমি বুঝি তার একমাত্র আপন জন—

বলতে পার তাই।

তা সে ছেলে না মেয়ে?

এত খবর যখন তুমি জান মাসী—এ খবরটুকু কি আর জান না যে সে ছেলে না মেয়ে? তবে মিথ্যে কেন জিজ্ঞেস করছো আবার। না আমার মুখ থেকেই স্বীকৃতিটা বের কবে নিতে চাও—

কথাটা বলে আর দাঁড়ায় নি মীনাক্ষী। অফিসের বেলা হয়ে গিয়েছিল— তাড়াতাড়ি না খেয়েই জামা-কাপড় পরে অফিসে চলে যায়।

কিন্তু মুখে না বললেও বুঝতে পারছিল মীনাক্ষী—মাসীর বাড়িতে অতঃপর আর থাকা চলবে না। অন্য একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে—

শহরে মেয়েদের হোস্টেল ও বোর্ডিং দু-একটা আছে—খোঁজ করতে লাগল মীনাক্ষী এবং গড়িয়াহাটার কাছে একটা মেয়েদের হোস্টেলে জায়গা পেয়ে গেল।

মাসীকে কেমন করে কথাটা বলবে ভাবছে এমন সময় সুযোগ আপনা হতেই এসে গেল।

মাসী নয়—মেসো অবনীমোহনই একদিন স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন, চাকরি তোমাকে ছাড়তে হবে মীনা আর—

আর—

বিয়েও করতে হবে।

কিন্তু আমার অসুবিধা আছে দুটো ব্যাপারেই—

বড় হয়েছো, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছো—তাহলে, আর এখানেই বা কেন? হঠাৎ বলে বসেন অবনীমোহন।

আমি কালই চলে যাবো মেসোমশাই—

হ্যাঁ তাই যেও—

মাসী কিন্তু পথ আগলে দাঁড়ায়, এসব কি হচ্ছে শুনি?

একটা ভাল লেডিজ হোস্টেলে জায়গা পেয়েছি মাসী সেখানেই যাচ্ছি।

মাসী বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি আর বলবে সে।

আর মীনাক্ষী চলে এসে হোস্টেলে ওঠে।

সেই দিন রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে, মীনা যাচ্ছে না—পার্থ শুধায়, রাত হলো বাড়ি যাবে না মীনু—

ন'টায় যাবো—

কিন্তু অত রাত্রে বাড়ি গেলে তোমার মাসী—

আমি ত কাল হোস্টেলে চলে এসেছি, মীনাক্ষী বলে।

সে কি!

হ্যাঁ—

মীনাক্ষী শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলে আর পার্থ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মীনু—

কি?

আমাকে সব খুলে বল।

কি বলব?

কেন তুমি হোস্টেলে উঠে এলে?

সত্যি কথা বলতে কি পার্থ, হোস্টেলে নয়, উঠে আসবার ইচ্ছে আমার এখানেই ছিল—আমাদের এই ঘরে কিন্তু জানিত তুমি কিছুতেই তা হতে দেবে না। চেঁচামেচি শুরু করবে, তাই অগত্যা হোস্টেলেই—

মাসী ও মেসোর সঙ্গে নিশ্চয়ই তুমি ঝগড়া করেছো!

করিনি তবে এরপরও থাকলে ঝগড়া হতো।

মীনু—

বল।

এ তুমি কি করলে—আমার জন্য—

তুমি চুপ কর, উত্তেজিত হয়ো না।

না, না—এ অন্যায়—এ—

চুপ কর। আজ রেড়িওতে এখুনি তোমার গানের রেকর্ড বাজাবে। নিরিবিলিতে এখানে তোমার পাশে বসে তোমার গান শুনবো বলে এখনো হোস্টেলে যাই নি—বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে রেডিওটা অন্ করে দিল মীনাক্ষী।

আকাশবাণী কলকাতা। এবারে পার্থপ্রতীম চৌধুরীর কয়েকখানি গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনান হচ্ছে ঃ

প্রথমটি রবীন্দ্র সংগীত—

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে।।
ফুলে ফুলে তারায় তারায় বলেছে সে কোন্ ইশারায়
দিবসরাতির মাঝকিনারায় ধূসর আলোয় অন্ধকারে।।

মাস আষ্টেক বাদে X-ray করে আবার ডাঃ সর্বাধিকারী মীনাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, He has improved wonderfully কিন্তু—

কি ডক্টর সর্বাধিকারী?

এবারে ওর একটা অপারেশনের দরকার—তাহলেই ও বাকী জীবনটা সুস্থ হয়ে কাটাতে পারবে—

অপারেশন!

হ্যাঁ—

আপনি করবেন?

না—ওকে তুমি ভেলোরে পাঠিয়ে দাও—আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো—

তাতে ত টাকা লাগবে!

তা লাগবে বৈকি!

কত?

তা হাজার তিনেক ত লাগবেই—

মাথাটা যেন কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে ওঠে মীনার। তিন হাজার! এই আট মাসে যা তার জমান ছিল সব গিয়েছে।

এখন একমাত্র সম্বল ওর প্রতি মাসের মাহিনাটা।

তাও কত আর, মাত্র একশ পঁচাত্তর টাকা।

হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে মীনাক্ষী।

সত্যিই ত—তীরে এসে প্রায় তরী ডুববে। এতখানি করে এসে সে শেষটুকু করতে পারবে না।

কিন্তু টাকা!

অতগুলো টাকাই বা সে কোথায় পাবে।

অবশ্য এক সঙ্গে নয় মাসে মাসে টাকাটার দরকার হবে।

পার্থ বলে, কি হয়েছে তোমার বলত মীনু!

কেন—

নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে। বল!

কি আবার হবে। কিছু না।

হয়েছে—গোপন করছো তুমি আমার কাছে।

গোপন করব কেন?

সত্যি বলছো।

মীনাক্ষী চুপ করে থাকে।

॥ ৮ ॥

এমন সময় একদিন অফিসে। কিন্তু তার আগে—

এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের অফিস। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অফিসের কারবার। বিরাট অফিস।

কয়দিন থেকেই মীনাক্ষী ভাবছিল চীফ্ বস মিঃ কুলকারনীকে বলবে, তার আরো কিছু টাকার প্রয়োজন—তাকে উনি আরো কিছু কাজ দিতে পারেন কিনা। অফিস আওয়ারের পরেও সে over time খাটতে রাজী আছে।

এবং চোখ-কান বুজে মিঃ কুলকারনীকে কথাটা একদিন বলেও ফেলে।

মিঃ কুলকারনী বলেন, ভেবে দেখবো—তুমি বরং একটা এ্যাপ্লিকেশন করে আমার কাছে দিও, যদি তেমন কোন সুযোগ দেখি ত—

মিঃ কুলকারনীর কথা ও আশ্বাস মত মীনাক্ষী একটা এ্যাপ্লিকেশন করে তাঁর হাতে দেয়।

সেদিন দ্বিপ্রহরে মিঃ কুলকারনীরই একটা অফিসের কাজে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে ঢুকে দেখে মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে বসে তিনি কি সব কথাবার্তা বলছেন।

মিঃ ফার্গুনসনকে এর আগেও মধ্যে মধ্যে এই অফিসে ও দেখেছে।

অফিসে মিঃ কুলকারনীর কাছে কি কারণে কেন আসে মিঃ ফার্গুসন, কিছুই জানে না মীনাক্ষী। জানবার চেষ্টাও সে করেনি কোন দিন।

কাণাঘুষায় কেবল সে সামান্য শুনেছিল মিঃ ফার্গুসন সম্পর্কে—কোন একটা বিদেশী বড় কম্পানীর ডাইরেকটার নাকি লোকটা।

লম্বা-চওড়া—সুশ্রী লোকটা।

দামী ঝক্‌ঝকে বেশভুষা—চোখে সর্বদা কালো কাচের চশমা পরা থাকে।

বিরাট একটা শাদা রঙের লাকসারী এ্যামেরিকান কারে করে অফিসে আসতেও একদিন দেখেছিল মীনাক্ষী মিঃ ফার্গুসনকে।

ও ঘরে ঢুকতেই মিঃ ফার্গুসন ওর দিকে একবার তাকায়।

হাতে একটা জ্বলন্ত সিগ্রেট।

মীনাক্ষী কুলকারনীর সঙ্গে কথা বলে কিন্তু ও বুঝতে পারে মিঃ ফার্গুসন কালো কাচের চশমার ওধার থেকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

এর আগেও দু' একবার লক্ষ্য করেছে মিঃ ফার্গুসনকে ওর দিকে অমনি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে কালো চশমার ভিতর থেকে।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে মীনাক্ষী।

কথা শেষ করে চলে যাবার আগে মীনাক্ষী কুলকারীনীকে বলে আমি যে এ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম তার কি হলো স্যার—

I could not find any suitable Job for you Yet Miss Roy- তবে I am on look out.পেলেই তোমাকে জানাব।

আমার একজন আত্মীয় বিশেষ পীড়িত—তার চিকিৎসার জন্যই—আজ কথাটা বলেই থেমে মীনাক্ষী সহসা।

বললাম ত তোমাকে মনে আছে আমার—and I would be rather glad if I could help you.

মীনাক্ষী অতঃপর বের হয়ে আসে মিঃ কুলকারনীর অফিস চেম্বার থেকে।

টাকা।

তার টাকার প্রয়োজন।

পার্থকে যেমন করে হোক ভেলোরে পাঠাতেই হবে।

অপারেশন করিয়ে তারপর যা করা প্রয়োজন সব করিয়ে পার্থকে সুস্থ করে তুলতেই হবে।

কিন্তু কিছুতেই ভেবে পায় না মীনাক্ষী কোথা থেকে টাকা আসবে।

কেমন করে কোথা থেকে টাকা সে পাবে।

অফিস থেকে বেরুতে সেদিন একটু দেরিই হয়ে যায়। অনেকগুলো ফাইল জমেছিল—তার চিঠিপত্র প্রস্তুত করে বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা হয়ে গিয়েছিল!

অফিস পাড়াটা তখন অনেকটা পাতলা হয়ে গিয়েছে।

মানুষের ভিড় কমতে শুরু করেছে। লিফ্‌ট দিয়ে নীচে নেমে ফুটপাতে পড়ে হাঁটতে শুরু করে মীনাক্ষী।

অফিস থেকে সাধারণত সে হেঁটেই পার্থর ফ্ল্যাটে যায় তারপর রাত্রে সেখান থেকে শেষ ট্রামে সেকেন্ড ক্লাশে হোস্টেলে ফেরে।

আজ দেরি হয়ে গেল— পার্থ হয়ত চিন্তা করছে—বাসে যেতে পারলেই ভাল হতো কিন্তু মাসের শেষ—হাত প্রায় খালি।

তা ছাড়া কাল আবার পার্থর কয়েকটা ঔষধ কেনা দরকার—ফুরিয়ে গিয়েছে।

অতএব হেঁটেই চলে ফুটপাত ধরে।

বিকেল থেকে মাথাটাও ধরে আছে। কপালের দু'পাশে রগ দুটো ব্যথায় টিপ্ টিপ করছে।

কুলকারনী—অর্থাৎ বস্ লোকটা ভাল।

বেশী বিরক্ত করতে সাহস হয় না। কিন্তু না বিরক্ত করেই বা তার উপায় কি! টাকার প্রয়োজন যে তার।

টাকা তার না হলে পার্থকে সে সুস্থ করে তুলতে পারবে না।

এ যে তার নিজের মনের কাছে চ্যালেঞ্জ। ভালবাসার চরম পরীক্ষা।

ক্যাচ্ করে একটা মৃদু শব্দ একেবারে পাশেই। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে তাকায় পাশে মীনাক্ষী। বিরাট সাদা রঙের এ্যামেরিকান লাকসারী কার একটা।

আরে—কি আশ্চর্য! মিঃ ফার্গুসনের সেই সাদা গাড়িটা না। হ্যাঁ মিঃ ফার্গুসনই। গাড়ির জানালা পথে মুখখানা বের হয়ে এল মিঃ ফার্গুসনের।

সেই কালো কাচের চশমা চোখে।

মিস রয়—

একটা অপরিচিত মৃদু কণ্ঠস্বর।

কে?

গাড়িটা একেবারে যেন মীনার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

মিস্ রয়, নিশ্চয়ই আপনি চিনতে পারছেন—আমি ফার্গুসন—বলতে বলতে মিঃ ফার্গুসন গাড়ি থেকে বের হয়ে মীনাক্ষীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ ফার্গুনসনই আবার বলে, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

আমার সঙ্গে?

কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয় কথাটা মীনার কণ্ঠ হতে।

হ্যাঁ—

কিন্তু—

আসুন আমার গাড়িতে—যেখানে আপনি নামতে চান I will drop you–

না, না—আমার—

It won't take more than five minutes– আসুন না— আপনি তখন মিঃ কুলকারনীকে চাকরির কথা বলছিলেন না—তিনি নিজেও আমাকে আজ request করলেন আপনার জন্য—সেই চাকরির ব্যাপারেই কথাটা--

চাকরি!

হ্যাঁ—আসুন—

তবু মীনক্ষী যেন ইতস্তত্ত করে।

মিঃ ফার্গুসন আবার বলে, মনে হচ্ছে আমার কথায় আপনি যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছেন না—ভয় নেই আসুন—

বাপের বয়েসী একটা লোক বার বার করে বলছে আর তার উপকার করতেই চাইছে—শেষ পর্যন্ত যেন এড়াতে পারে না মীনাক্ষী তাকে।

আস্তে আস্তে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

ফার্গুসন বলে, মনসুর চল—

মুসলমান ড্রাইভার মনসুর আলি গাড়ি ছেড়ে দেয়।

গাড়ি সন্ধ্যার জনবহুল আলোকিত পথ ধরে চলেছে।

বিরাট লাকসারী কারের আরামপ্রদ নরম ভেলভেটে মোড়া গদী।

গাড়ি চলেছে—মনে হয় যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে।

এক সময় আবার ফার্গুসনই কথা বলে ঃ

শুনুন একটা ভাল চাকরি আমার হাতে আছে—

চাকরি আপনার হাতে!

ফিরে তাকায় মীনাক্ষী মিঃ ফার্গুসনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ—মাইনে আপাততঃ চারশ টাকা—

কি—কি বললেন—

কথাটার আবার পুনরাবৃত্তির করে ফার্গুসন—হ্যাঁ চারশ টাকা— of course if You can prove your efficiency–আমি জানি এবং বিশ্বাস করি যা অবশ্যই আপনার মত একজন মেয়ে প্রুফ করতে পারবেন। —they will pay you more.

চারশ টাকা মাইনের চাকরি—

কানের মধ্যে তখনো যেন টাকার অঙ্কটা গুঞ্জন করে ফিরছে। একটা মধুর গুঞ্জনের মত যেন গুনগুন করে চলেছে ঃ চারশ টাকা। চারশ টাকা মাইনের চাকরি!

আড় চোখে ফার্গুসন একবার মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে নিল তারপর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট তা থেকে নিয়ে ধরাতে ধরাতে মৃদু কণ্ঠে বলে, কথাটা আমি বস্ কুলকারনীকে বলবো আজই ভেবেছিলাম কিন্তু পরে ভাবলাম তোমার ঐ চাকরিটা নিতে আপত্তি আছে কিনা আগে জানা দরকার। একটা কথা—এ চাকরির সঙ্গে কিন্তু এখন যে চাকরি বর্তমানে তুমি করছো তার কোন সম্পর্ক নেই—এটা সম্পূর্ণ একটা Part time চাকরি!

এতক্ষণে মীনাক্ষী কথা বলে। বলে, পার্টটাইম চাকরি!

হ্যাঁ—যে চাকরি তুমি বর্তমানে করছো তার সঙ্গে সঙ্গেই এ চাকরি অনায়াসেই করতে পারবে।। তোমার বস্‌ও বলছিল you are in need of money–টাকার নাকি তোমার দরকার—

টাকার দরকার।

হ্যাঁ—তার টাকার দরকার বৈকি। আজ তার মত টাকার দরকার আর কার।

পার্থ—পার্থকে ভেলোরে পাঠাতে হবে।

ডাঃ বলেছেন ভেলোর থেকে অপারেশন করে কিছু দিন কোন হিল স্টেশনে কাটিয়ে আসতে পারলেই পার্থর আর কোন ভয়ই থাকবে না।

ব্যবস্থা তাকে একটা যেমন করে হোক করতে হবেই।

আজ তার সমস্ত জীবন একদিকে—পার্থ একদিকে।

হঠাৎ আবার ফার্গুসনের প্রশ্নে চমকে ওঠে মীনাক্ষী, কি ভাবছেন মিস রয়?

য়্যাঁ—না— কিছু না—

তোমার টাকার দরকার যখন—এ চাকরিটা

চাকরি—

হ্যাঁ—আমি বলছিলাম রাজী হয়ে যাও।

আমি—

দেখো মিস রয়—সুযোগ কারো জীবনে হামেশাই আসে না—যখন আসে তখন তাকে কি উচিত নয় সাদরে গ্রহণ করা—

কিন্তু মিঃ ফার্গুসন—

সাহসা ফার্গুসন প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়, মীনাক্ষীকে বাধা দিচ্ছে যেন—

বলে, বলছিলাম কি তোমার যদি খুব তাড়াতাড়ি না থাকে—We can go somewhere & have some time–তুমি নিশ্চয়ই পিপাসার্ত—

না, না—সে আমি বাড়ি গিয়েই—

বিলক্ষণ। সে ত খাবেই এবং প্রত্যহই খাও। আজ না হয় আমার সঙ্গে— this old man-এর সঙ্গে বসে এক কাপ চা পান করলেই—

কিন্তু—

মনসুর—গ্রেট ইস্টার্ন চল—আদেশ দিল মি ফার্গুসন তার ড্রাইভারকে।

মনসুর গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের দিকে গাড়ি চালায়।

এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই হোটেলের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়।

আলোয় আলোয় ঝকঝক্ করছে একেবারে হোটেলের সামনেটা। বহু সুবেশা নরনারীর আনাগোনা।

উর্দি পরিহিত দরোয়ান সেলাম দেয় ওদের।

কাউন্টার রিসেপসনিষ্টরা কর্মব্যস্ত।

দুর থেকেই বরাবর মীনাক্ষী দেখেছে এ সব বিলাসের জায়গা—এই সব বিলাস-বহুল ভোজনাগার ও বাসস্থানগুলো ইতিপুর্বে।

কখনো এর ভিতরে ইতিপূর্বে পা দেয় নি।

একটা স্বপ্নের মত দূর থেকে মনে হয়েছে।

কি একটা বিচিত্র নেশায় যেন সবটা আচ্ছন্ন করে ফেলে।

লিফটে করে উঠে দু'জনে চাইনীজ রেস্তোরাঁয় গিয়ে প্রবেশ করে।

চারিদিকে ঝক্ঝকে টেবিল চেয়ার সাজান। আলোয় আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে।

উর্দি পরিহিত ওয়েটার। অনেকেই বসে চা পান করছিল।

অনেকের চাপা কণ্ঠস্বরের আলাপ একটা বিচিত্র গুঞ্জন তুলেছে।

একটা নির্জন কোণে একটা টেবিলে গিয়ে ওরা বসল।

মিঃ ফার্গুসন চায়ের অর্ডার দিলেন।

কি খাবে আর বল?

না, না— কিছু না শুধু চা—

কিছু অন্তত খাও—চিকেন। —স্যান্ডউইচ—

না—

পেষ্ট্রি—

না—

চা পান করতে করতেই আবার পুর্ব আলাপে ফিরে আসে মিঃ ফার্গুসন।

আগেই তোমাকে বলেছি— part time Job —খুব পরিশ্রমের ব্যাপার কিছু নয়—আর টাইম বেঁধে অনেকক্ষণ ধরে করবার মতও কিছু কাজ নয় আপাততঃ, কারণ যে অফিসের কথাটা তোমাকে বলেছি—সেটা মাত্র কয়েকমাস হলো ষ্টার্ট করেছি—মানে নতুন ব্রাঞ্চটা সবে ষ্টার্ট করা হয়েছে—তারপর একটু বস বলি, তাহলে অবিশ্যি— কাজটা গুরুত্বপুর্ণ আর তাই এমন একজনের সন্ধান আমরা করছিলাম—যাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে এবং যার পরে কাজটা দিয়ে নির্ভর করা যেতে পারে—

শুনেই যায় মীনাক্ষী—কোন জবাব দেয় না। চায়ের কাপটা সামনে—ধোঁয়া উঠছে।

মীনাক্ষী ভাবছিল ঃ চারশ টাকা মাইনার part time job–

কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে সে চেয়ে থাকে মিঃ ফার্গুসনের মুখের দিকে।

কিন্তু কাজটা কি নিশ্চয়ই তুমি ভাবছো তাই না মিস রয়—কাজটা হচ্ছে একজন করেসপনডেন্স ও ডেসপ্যাচ্ ক্লার্কের কাজ।

করেনপনডেন্স ও ডেসপ্যাচ ক্লার্ক?

হ্যাঁ, কাজটা যদিও বাইরে থেকে তেমন কিছু একটা মনে হয় না তাহলেও গুরুত্বপুর্ণ কারণ কেবল করেসপনডেন্স ও ডেসপ্যাচের কাজই নয়—ডেসপ্যাচ্ ও করেসপনডেন্স্ সব তোমাকেই তোমার বিচার বিবেচনা মত করতে হবে—চিঠিগুলো পড়ে নিজের বুদ্ধিমত কতকটা—মানে—

মীনাক্ষী কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে থাকে ফার্গুসনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ—মানে খুলেই তোমাকে তাহলে কথাটা বলি—একজন অফিসিয়াটিং ম্যানেজার যদিও আছে—চিঠি পত্রগুলো—অর্থাৎ করেস্পনডেন্স্ তোমাকেই প্রয়োজন মত করতে হবে—

কিন্তু আমি—

ভাবচো পারবে না! খুব পারবে। তাছাড়া তোমার বস্ মিঃ কুলকারনী তোমার সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ ত করেনই— আমিও কিছুদিন ধরে তোমার কাজকর্ম দেখে তবে তোমার কথা ভেবেছি মিস্ রয়—কারণ আমিও তাই ভাবি তোমার সম্পর্কে।

মীনাক্ষী চুপ করে থাকে।

সব সময়ত ঠিক মানুষটি পাওয়া যায় না। তাই অসুবিধাও হচ্ছিল—শোন তোমাকে সব কথাই খুলে বলা দরকার—আমাদের কম্পানী মানে রাদারফোর্ড মরিসন কম্পানীর কোন অফিস কলকাতাতে নেই; মিঃ ফার্গুসন বলে, ইন্ডিয়াতে দিল্লী আর বম্বেতে অফিস আছে অথচ কলকাতা শহরেও কম্পানীর অনেক কাজ—তাই এখানে মরিসন কম্পানী আপাততঃ একজন ডেঃ ম্যানেজার ও একজন করেসপনডেন্স্ ডেসপ্যাচ্ ক্লার্ক নিযুক্ত করতে মনস্থ করেছে। ডেঃ ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে গিয়েছে—দিন কয়েক হলো and he is one of the relatives of Mr. Kulkarni— Mr. Chadramadhav—চন্দ্র মাধব দোশানী। আমরা একজন ডেসপ্যাচ্ ক্লার্ক খুজঁছিলাম— dutiful, faithful এবং পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান হবে। মিঃ কুলকারনীর কাছে তোমরা কথা শুনে তোমার পরিচয় পেয়ে ও তোমায় দেখে মনে হলো— if you accept this job—তাহলে বোধহয় আমারা যেমনটি খুঁজছি তেমনটি হয়।

তোমাদের অফিস কোথায়? এতক্ষণে কথা বলে মীনাক্ষী।

দুরে নয় অফিসটা তোমাদেরই অফিসের পিছনে তিনতলার একটা ছোট ফ্ল্যাটে—তোমার অফিস আওয়ার্সের পরে—সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছয়টা দু'ঘন্টা ডিউটি—মাইনে প্রথমতই বলছি আপাততঃ চারশ টাকা—

আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও মিঃ ফার্গুর্সন—

ভাবতে চাও নিশ্চয়ই ভাবতে পার, তবে বেশী টাইম নিও না—কারণ আরো একজনকে আমরা দেখেছি—তুমি যদি না রাজী থাক ত তাকেই appointment দেবো আমরা—

বেশ—

এই ফোন নম্বরটা রাখ—আমার সঙ্গে হয়ত দেখা হবে না তোমার, কারণ কালই আমি বম্বে চলে যাচ্ছি কয়েদিনের জন্য—তুমি যদি রাজী থাকত ঐ ফোন নাম্বারে চন্দ্রমাধব ফোন করে দিলেই তোমার appointment হয়ে যাবে—

॥ ৯ ॥

তারপর—আমি জিজ্ঞসা করি, মেয়েটি কি করল? চাকরি নিশ্চয় নিল।
ডাঃ মৃদু হেসে বলে, তোমার কি মনে হয় কবি?
বলি, নেওয়াইত উচিৎ—
কেন!
সেটাই স্বাভাবিক বলে।
ডাঃ হাসে।

বিরাট সাদা গাড়িটা সরু রাস্তায় ত ঢুকবে না তাই বড় রাস্তার মোড়ে মীনাক্ষীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সে রাত্রে ফার্গুসন।

চারশ টাকা মাইনার চাকরি—মাত্র দু'ঘণ্টার কাজ।

এবং আগাগোড়া আজ সন্ধ্যার সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে এতবড় একটা সুবর্ণ সুযোগ তবু কেন জানি মনের মধ্যে কোন সাড়া পায় না মীনাক্ষী।

কোথায় যেন একটা সন্দেহ—কোথায় যেন একটা সংশয় ওর মনকে পীড়িত করতে থাকে কেবলই।

প্রথমতঃ নতুন এক কোম্পানী—

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ করেসপনডেন্স্ ডেসপ্যাচ ক্লার্কের চাকরি—

তৃতীয়তঃ চারশ টাকা মাইনা।

লোকের—অর্থাৎ প্রার্থীর অভাব হওয়া উচিত নয়—কেবল একটা বিজ্ঞাপন কাগজে। হাজার হাজার এ্যাপলিকেশন পড়বে সঙ্গে সঙ্গে। এডর্ভাটাইজমেন্টও দেয়নি—সোজা রিক্রুটমেন্ট। কিন্তু কেন?

মনটার মধ্যে নানা সন্দেহ ও সংশয় উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—তার টাকার দরকার। পার্থর জন্য তার টাকার দরকার।

এত কথা তার ভাববারই বা প্রয়োজনটা কি!

চাকরি ত সে চাইছিলই—পেয়েছে—সে নেবে।

অবিশ্যি এটা ঠিকই—হাজারটা এ্যাপলিকেশন পড়তো হয়ত কিন্তু ওদের প্রয়োজন হয়ত কাউকে বিশ্বাসী ও জানাশোনা—যা হয়ত ওরা পেত না।

কিম্বা হয়ত মিঃ কুলকারনীই তার সম্পর্কে রেকমেন্ড করেছেন।

একবার মনে হয় মিনাক্ষীর পার্থকে সব খুলে বলে—কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় কি প্রয়োজন পার্থকে জানাবার কথাটা।

সারাটা দিন অফিসের কাজ করার পর আবার কাজ করতে কিছুতেই তাকে সে মত দেবে না তা সে ভাল করেই জানে।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে পার্থর ঘরে এসে পা দেয় মীনাক্ষী।

অন্যান্য দিন ঐ সময়টা পার্থ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায় বা জানালার কাছে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে থাকে।

আজ দেখল বিছানায় শুয়ে পার্থ।

কি ব্যাপার—শুয়ে যে! মীনাক্ষী শুধায়।

মৃদু হেসে পার্থ বলে, এমনি—তোমার আজ দেরি হলো যে?

একটু কাজ ছিল—বলতে বলতে এগিয়ে এসে পার্থর কপাল স্পর্শ করতেই চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

বেশ জ্বর!

এ কি—জ্বর হলো আবার কখন?

দুপুর থেকে—

আবার জ্বরটা এলো কেন?

শুধু জ্বর নয় দেখা গেল সঙ্গে একটু কাশিও দুপুর থেকে দেখা দিয়েছে।

পরের দিন সকালেই ডাঃ সর্বাধিকারীকে ফোন করল মীনাক্ষী।

ডাঃ সর্বাধিকারী এলেন—এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন।

বললেন, বিশেষ কিছু নয়—ঔষধটা পাল্টে দিচ্ছি—

নীচে ডাঃ সর্বাধিকারীর সঙ্গে সঙ্গে নেমে যায় মীনাক্ষী।

ডাক্তার মুখে যাই বলুন মীনাক্ষীর মনের সংশয় যায় নি।

জিজ্ঞাসা করে, আবার জ্বরটা এলো কেন ডাঃ সর্বাধিকারী?

আপারেশনটা করা দরকার—তারপর কিছুদিন কোন পাহাড়ে থাকতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনাকে ত আমি বলেছি মিস্ রায়, সেই ব্যবস্থাই করুন যত শীঘ্র পারেন। তাছাড়া এখানে রেষ্ট্ হলেও পরিবেশটা ঠিক ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়—

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে ফিরে এল মীনাক্ষী উপরে।

কি বললে তোমায় ডাক্তার? ক্যামেলিয়া—।

বললেন যা শুনলে ত ও কিছু নয়—

করুণ হেসে বলে পার্থ, মিথ্যেই তুমি চেষ্টা করছো গো—

পার্থ—

হ্যাঁ—আমাদের সাধ্য কি যে আমরা এই ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করি—সামান্য আমাদের পুঁজি—সামান্য আমাদের ক্ষমতা—কথায় বলে রাজব্যাধি—

পার্থ—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে মীনাক্ষী।

শোন—কাছে এসে বোস—দেখ, সময় চলে যাচ্ছে—আর নিজেকে এমনি করে সর্বস্বান্ত করো না। কেন আমার জন্য মিথ্যা আর এমনি করে নিজেকে নিঃস্ব করছো! দেখছো না প্রতি মুহূর্তে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি—হেরে যাচ্ছি—

সহসা মীনক্ষী পার্থকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে না, না—গো না ও কথা বলো না। আমরা ব্যর্থ হইনি—আমরা হারবো না—কিছুতেই আমরা হারবো না। ঘর বাঁধবো—নিশ্চয়ই আমরা ঘর বাঁধবো—

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে পার্থ মীনাক্ষীর কথায়। শিউরে ওঠে যেন।

কামনার এমন উগ্র ছবি কখনো তার চোখে পড়েনি ইতিপূর্বে।

কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। বোবা হয়ে থাকে। পাথর হযে থাকে।

তারপর এক সময় রোগক্লিষ্ট শীর্ণ হাত দুটো দিয়ে মীনাক্ষীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি সামনে তুলে ধরে মৃদু গাঢ় কণ্ঠে ডাকে, ক্যামেলিয়া—

বল।

না—থাক—আর আমি কোন দিন কিছু বলবো না।

পার্থর সমস্ত শরীরটা তখন কাঁপছো। তাড়াতাড়ি পার্থকে ধরে শুইয়ে দেয় মীনাক্ষী, তুমি কাঁপছো শুয়ে পড়।

সে রাত্রে আবার অনেক দিন পরে শীত শীত করে ধুম জ্বর আসে পার্থর।

আর কোন সংশয় নেই মীনাক্ষীর।

আর কোন দ্বিধা নেই।

পরের দিন অফিস থেকে ফিরে পার্থর ওখানে এসে পার্থর জ্বর দেখে সে সংকল্প স্থির করে নেয়।

এবং পরের দিনই অফিসে গিয়ে যে ফোন নম্বরটা দিয়েছিল ফার্গুসন সেই ফোন নাম্বার ডায়াল করে ফোন করে।

কাকে চাই? প্রশ্ন ভেসে আসে ভারী পুরুষের গলায়।

মিঃ চন্দ্রমাধব দোশানী আছেন?

কথা বলছি—

আমি মীনাক্ষি রায়—

গুড আফটারনুন—কি খবর বলুন?

মিঃ ফার্গুসনকে বলবেন আমি চাকরি নেব।

খুব ভাল কথা। কবে থেকে জয়েন করবেন বলুন?

মিঃ ফার্গুসন কি আছেন?

না—নেই তবে আমাকে instruction দিয়ে গিয়েছেন আপনার সম্পর্কে। কবে চাকরিতে জয়েন করতে চান আপনি বলুন।

আপনি যে দিন বলবেন।

ধরুণ আজই যদি বলি আপত্তি আছে?

আজই!

হ্যাঁ—শুভ কাজে বিলম্বের প্রয়োজন কি? ও যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল নয় কি?

বেশ—

তাহলে আজ আসছেন অফিসের পরে?

আসবো।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে নতুন অফিসে ঢুকল মীনাক্ষী।

নামেই অফিস।

আসলে অফিস তাকে বলা যায় কি না সন্দেহ। অন্ততঃ মনে হয় না সেটা মীনাক্ষীর।

দোতলায় ছোট একখানি ঘর।

ঘরের মধ্যে কাঠের পার্টিশন।

পার্টিশনের এদিকে ম্যানেজার চন্দ্রমাধব বসে অন্য দিকে দুটি টেবিল ও দুটি চেয়ার। দেওয়ালে একটা চিনের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার।

একটি স্টীলের আলমারী ও একটা টাইপ রাইটিং মেসিন। খান দুই চেয়ার স্টীলের।

বেঁটে রোগা মত একটি লোক একটি টেবিল অধিকার করে একমনে মাথা নীচু করে কাগজের 'পরে কলম দিয়ে কি যেন লিখছে। লোকটার বয়স ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে হবে বলেই মনে হয়।

মাথার সামনের দিকটায় চক্‌চকে একটি টাক।

গোলাল মুখ—ঠোঁটের উপরে ছোট্ট একটি বাটারফ্লাই গোঁফ।

চোখে চশমা—চশমার ব্রিজটা নাকের মাঝামাঝি নেমে এসেছে। পরনে সুট।

বাইরে একটা টুলের উপর দরোয়ান বসেছিল। সেই নাম বলতে মীনাক্ষীকে ভিতরে প্রবেশ করতে বলেছিল।

বলেছিল, অন্দর যাইয়ে—।

মীনাক্ষী ভিতরে পা দেয় তারপর।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মরত ঠোঁট রোগা লোকটি চোখ তুলে তাকায়।

লোকটা তোতলা কথা বলতেই বুঝতে পারে ও এবং শুধু তোতলাই নয় কানেও একটু খাটো। কম শোনে।

আপনি—মা-মী-মী—

মীনাক্ষী রায়—লোকটা তোতলা বুঝতে পেরে নিজেই বলে মীনাক্ষী নামটা।

মিঃ দোশানী আছেন?

কি ব-বললেন রা-রাজেন—রাজেন ত এখানে—কে-কেউ নে-ই।

বুঝল মীনাক্ষী লোকটা শুধু তোতলাই নয় কানেও খাটো।

একটু উঁচু গলাতেই এবার বলে মীনাক্ষী, রাজেন নয়—মিঃ দোশানী কি আছেন?—

আ—আছেন—ঐ-যে ভিতরে যান।

ঘরের মধ্যে পার্টিশনের সুইংডোরটা দেখিয়ে দিল লোকটা মীনাক্ষীকে। সে গিয়ে দরজায় নক্ করে।

সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান আসে, কাম—ইন—

মীনাক্ষী সুইংডোর ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে।

এ ঘরটার মধ্যে বা ঐ অংশটার মধ্যেও আসবাবপত্রের কোন বাহুল্য নেই।

একটি সেক্রেটেরিয়েট টেবিল—একটা ফোন—কিছু ফাইলপত্র টেবিলের 'পরে।

পিছন দিকে একটা ছোট সাইজের স্টীলের আলামারী।

মোটা মত একটি লোক রিভলভিং চেয়ারটার উপর বসে ফোনে ইংরেজীতে যেন কার সঙ্গে কথা বলছিল।

ইংরেজী উচ্চারণটা যেন কেমন একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা—একটা বিদেশী টান যেন রয়েছে।

বয়স লোকটার পঞ্চাশের উপরেই হবে বলে মনে হয়।

মাথার মাঝখানে টাক—দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে। চোখমুখ অনেকটা যেন মংগোলিয়ান টাইপের।

ছোট ছোট গোল গোল চোখ—ভোঁতা নাক।

দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান।

গাত্রবর্ণ কেমন যেন একটু হরিদ্রাভ।

পরনে দামী সুট।

ও ঘরে প্রবেশ করতেই চোখের ইংগিতে বসতে বললে ওকে ভদ্রলোক ফোনে কথা বলতে বলতেই।

মিনিট দুই পরে ফোন শেষ করে লোকটা ওর মুখের দিকে তাকাল, we are glad যে আপনি চাকরিতে জয়েন করলেন, here is your appointment letter—

একটা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিল দোশানী।

ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলে।

মীনাক্ষী হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল।

কাজ অবিশ্যি আপাততঃ খুব একটা বেশী কিছু নেই—কারণ we have just started our office in Calcutta. ভাল কথা—you know type writing মিস্ রয়?

জানি—

আজকের থেকেই কাজ করবে কি?

করতে পারি।

কোন অসুবিধে হবে না?

না—

একটা ফাইল টেনে ওর সামনে ঠেলে দিল দোশানী, এই ফাইলের চিঠিগুলোর জবাব যাবে ১,২,৩, করে পাশে পাশে নোট করা আছে। গুছিয়ে চিঠিগুলো তৈরী করে টাইপ করে দাও—

ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষী।

স্টেনো মীনাক্ষী রায়কে ঐ ধরনের চিঠি হামেশাই তৈরী করে টাইপ করতে হয়—খুব একটা শক্ত কাজ কিছু নয় মীনাক্ষীর পক্ষে কাজটা।

মীনাক্ষী পার্টিশনের এদিকে এসে আগের সেই বেঁটে লোকটিকে শুধাল, ঐ মেসিনটা কি আমি ব্যবহার করতে পারি?

লোকটি বলে—নি—নিশ্চয়—ও—ওখানেই ত আ—আপনি কাজ করবেন—ব—বসুন না—

মীনাক্ষী গিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল টেবিলের সামনে। মেশিনের ঢাকনীটা তুলল—

খান তিনেক চিঠি ছিল ফাইলে।

প্রথমে মনোযোগ দিয়ে চিঠিগুলো আগাগোড়া বার দুই করে পড়ল মীনাক্ষী।

নানা ধরনের ব্যবসা মরিসন কম্পানীর।

চিঠিগুলো কম্পানীর এক্সপোর্ট সংক্রান্ত। আসামের কোন একটা চা বাগান থেকে চা বিদেশে চালান যাবে সেই সম্পর্কে চিঠি একটা—অন্য একটা চিঠি—আসামের তৈল শোধনাগারের কর্তৃপক্ষকে—আর একটা চিঠি একটা চায়না জাহাজ কম্পানীকে।

মনে মনে চিঠির জবাবগুলো মুসাবিদা করে টাইপ করতে শুরু করে মীনাক্ষী।

নোট অনুযায়ী চিঠিগুলো গুছিয়ে টাইপ করে তৈরী করতে ঘন্টাখানেক লাগে মীনাক্ষীর।

টাইপ হয়ে গেলে গুছিয়ে নিয়ে চিঠিগুলো ফাইল সমেত উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষী—প্রায় সাতটা

সন্ধ্যা তখন হাত ঘড়িতে তার।

সুইংডোর ঠেলে দোশানীর ঘরে ঢুকে চিঠিগুলো সামনের টেবিলের 'পরে রাখল মীনাক্ষী।

কি একটা ফাইল দেখছিল দোশানী—মুখ তুলে তাকাল।

Finished? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায় দোশানী।

হ্যাঁ—

দেখি—

টাইফ করা চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দোশানীর—good—very good—o. k. আজকের মত ছুটি—you can go.

যাবো?

Oh—yes—

কাল কখন আসতে হবে?

যে সময় এসেচো আজ সেই সময় আসলেই হবে—আর শোন একটা কথা, আমি হয়ত অফিসে সব সময় নাও থাকতে পারি—ঘনশ্যাম থাকবে—ওর কাছেই File রেখে যাবো—ভিতরে instruction থাকবে—বাইরে যে ক্লার্ক কাজ করছে ঐ ঘনশ্যাম বাগ—

মীনাক্ষী বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসছিল—দোশানী ডাকে আবার, এক সেকেণ্ড মিস রয়—

মীনাক্ষী ঘুরে দাঁড়াল।

মিঃ ফার্গুসন আমাকে instruction দিয়ে গিয়েছে—তোমাকে এক মাসের মাইনা advance দিতে—ইচ্ছা করলে তুমি আজ এখনই নিতে পার—

এক মাসের মাইনে—

হ্যাঁ তোমার নাকি টাকার দরকার—

So kind of Mr. Furguson—তাকে যে কি বলে আমি ধন্যবাদ জানাব—

না, না—এতে ধন্যবাদের কি আছে। তুমি আমাদের employee. তোমার সুখ-সুবিধা আমাদের দেখতে হবে বৈকি—here is your money—টাকা ও একটা পে ভাউচার এগিয়ে দেয় মিঃ দোশানী ওর দিকে।

মীনাক্ষীর দু' চোখে জল ভরে আসে।

ভাউচার সই করে টাকা নিয়ে মীনাক্ষী বের হয়ে আসে ঘর থেকে আর এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে।

পাশের ঘরটা তখন খালি—কেউ নেই—কখন যেন ঘনশ্যাম চলে গিয়েছে।

দরজা ঠেলে অফিস থেকে মীনাক্ষী বের হয়ে এলো—দরোয়ানকেও দেখতে পেল না টুলটার উপরে উপবিষ্ট বাইরে। সেও চলে গিয়েছে তখন।

লম্বা একটা প্যাসেজ—টিম্ টিম্ করে একটা কম পাওয়ারের আলো জলছে—তাতে করে অন্ধকার ত দূর হয়ই নি—উপরন্তু একটা রহস্যময় আলো আঁধারীর সৃষ্টি করেছে যেন।

একেবারে নির্জন খাঁ খাঁ করছে প্যাসেজটা যেন। কোন শব্দ নেই কোথাও।

প্যাসেজের গা দিয়ে যে সব ঘরের দরজা—সবই বন্ধ। এখানে কেউ থাকে বলেই মনে হয় না।

পায়ে পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় মীনাক্ষী।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে হঠাৎ কানে আসে একটা ভারী পদশব্দ। পদশব্দটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে।

কেউ আসছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে।

দাঁড়ায় মীনাক্ষী।

এক পাশে সরে দাঁড়ায়। চোখে পড়ে লম্বা ঢ্যাঙ্গা মত একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। লোকটার পরিধানে দামী সুট।

লম্বা টাইপের মুখ—ওষ্ঠের উপর ভারী এক জোড়া গোঁফ! দাড়িও আছে—নুর দাড়ি।

লোকটা কিন্তু মীনাক্ষীর দিকে একবার তাকালও না।

জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে করতে পাশ দিয়ে উঠে উপরে চলে গেল।

মীনাক্ষী আবার নামতে থাকে।

গা-টার মধ্যে অকারণেই কেন যেন কেমন ছমছম্‌ করতে থাকে।

সিঁড়ির শেষে একটা অফিসের উঠোন—তারপর সরু একটা অন্ধকার গলিপথ।

গলিপথ পার হলে বড় রাস্তা। কিন্তু তখন ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চল অনেকটা নির্জন হয়ে এসেছে

মানুষের ভিড় নেই, সমস্ত দিনের চঞ্চল কর্মব্যস্ততাও যেন আর নেই।

বিরাট বিরাট বাড়িগুলো যেন রাতের মত কর্মের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

কেন যেন হাঁটতে ভাল লাগে না মীনাক্ষীর।

একটু এগুতেই একটা খালি ট্যাক্সী পেয়ে তাতে উঠে বসল মীনাক্ষী।

আজ ত টাকায় ব্যাগ ভর্তি। আজ একটা দিন টাকার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন নাই বা করল সে।

তাছাড়া রাতও হয়ে গিয়েছে তখন।

এত রাতে ফিরতে কখনো ত হয় না।

চাকরি তাহলে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি নিল? শুধালাম আমি। ডাক্তার বন্ধু তার সিগ্রেটটা শেষ হওয়ায় নতুন একটা সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করছিল- জ্বলন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়া নিভিয়ে এ্যাসট্রেটার মধ্যে ফেলতে ফেলতে বলে, হ্যাঁ—পার্থকে সত্যিই সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল মেয়েটা- এত কষ্ট করে ছেলেটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে বলতে গেলে ফিরিয়ে এনে শেষের মুখে এসে সব নষ্ট হয়ে যাবে তাই বোধহয় আর কোন দিকেই সে তাকায় নি—নতুন চাকরির ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতেও চায় নি—যাক—শোন তারপব—

॥ ১০॥

পরের দিনই ডাঃ সর্বাধিকারীকে গিয়ে মীনাক্ষী বলে টাকার ব্যবস্থা সে যা হোক করে করবে, তিনি পার্থকে ভেলোরে পাঠাবার যেন ব্যবস্থা করেন।

ডাক্তার সর্বাধিকারী আশ্বাস দিলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি ব্যবস্থা করবেন।

ডাঃ একটু থেমে আবার বলে—ঐ সময়কার ডাইরীর পাতায় মনের মধ্যে যে বেচারীর সর্বক্ষণ একটা সংশয়ের পীড়ন চলছিল সেটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় তার কিছু কিছু লেখা থেকে।

হ্যাঁ—মনের মধ্যে একটা সংশয় যেন সর্বক্ষণ তাকে পীড়ন করে। নতুন চাকরিটার কথা পার্থকে জানাবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ করে কিন্তু কেন যেন কিছুতেই বলতে পারে না।

একটা সংকোচ, একটা দ্বিধা যেন কণ্ঠরোধ করে তার।

দিন দশেক বাদেই একদিন সন্ধ্যার দিকে অফিস ফেরতা ডাঃ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেই ডাক্তার বলেন, এই যে মিস্‌ রয় আসুন—ভেলোরের ব্যবস্থা আমি করেছি—সীট পাওয়া গিয়েছে।

পাওয়া গিয়েছে সীট?

হ্যাঁ—

কবে যেতে পারবে ও তাহলে?

যেদিন আপনি পাঠাতে পারবেন। তবে যত তাড়াতাড়ি পারেন ব্যবস্থা করতে, ততই ভাল—

ঠিক আছে এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি পাঠাবো—

এতদিন মীনাক্ষী কোন কথা বলে নি ভেলোর সম্পর্কে পার্থকে—কিন্তু ঠিক করেছিল আজ বলবে।

ফলের রসটা তৈরী করে পাশের ঘরে এসে ঢুকল মীনক্ষী।

এগিয়ে ধরে ফলের রসটা সমেত কাপটা পার্থব দিকে, নাও—

ফলের রস ভর্তি কাপটা হাতে নিয়ে তাকায় পার্থ মীনক্ষীর মুখের দিকে। তারপর রসটা পান করে শূন্য কাপটা পাশে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল কিন্তু মীনাক্ষী সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল।

পাশের ঘরে ভৃত্যের সাড়া পাওয়া গেল। সে ফিরেছে।

কাপটা ধুয়ে রেখে এসে পাশে দাঁড়ায় মীনাক্ষী পার্থর।

পার্থ—

বল।

আজ ডাঃ সর্বাধিকারী বলছিলেন—

কি?

ভেলোর পাঠাতে চান তিনি তোমাকে কি একটা অপারেশনের জন্য—

অপারেশন—

হ্যাঁ—সেটা হলে এবং তারপর যদি কিছু দিন কোন হিল ষ্টেশনে থাকতে পার ত একেবারে ঠিক আগের মতই সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি—a new life.

ডাঃ বলেছেন?

হ্যাঁ, তাই আমি ঠিক করেছি—

কি ঠিক করেছো ক্যামেলিয়া?

তোমাকে ভেলোরে পাঠাব আমি—

তুমি পাগল ক্যামেলিয়া—

মানে!

নয়ত কি—জান তার কত খরচ—

জানি!

জান!

জানি বৈকি—তা আর কি হবে—প্রয়োজন যখন, খরচের কথা ভাবলে চলবে কেন!

তারপর?

কি তারপর?

কিন্তু অত টাকা আসবে কোথা থেকে? পার্থ বলে।

আবার টাকার ভাবনা ভাবছো তুমি—আমি ত আছি—

ত আছো—তবে প্রত্যেক কিছুরই একটা সীমা আছে—

সীমা? মীনাক্ষী তাকায় পার্থর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—তুমি আমার জন্য আজ অবধি যা করেছো জানি না তার জন্য আমার কি পুণ্য জমা ছিল ক্যামেলিয়া—

পার্থ?

হ্যাঁ—কিন্তু আর তো অত্যাচার করতে পারব না তোমার উপর—তবে তুমি যখন চাও আমি যাই ভেলোরে, একটা কাজ করা যেতে পারে—

কি শুনি?

আমার যে গানগুলো রেকর্ড কম্পানীতে আছে—সেগুলোর কপি রাইট বিক্রী করে দেবো ভাবছি কম্পানীকে—

সে কি—কপিরাইট বিক্রী করবে কি তোমার গানের—না—তা হবে না—

কিন্তু তাছাড়া কত কষ্ট হবে তোমার টাকার জোগাড় করতে ভেবে দেখ—

মীনাক্ষী কি বলতে যায় কিন্তু তাকে বলতে দেয় না পার্থ। বলে, বাধা দিও না আমায় ক্যামেলিয়া—কোন ক্ষতি হবে না ওতে—ভাল যদি সত্যিই আবার কোন দিন হয়ে উঠি—আবার নতুন গান গাইব—

না—তা হতে পারে না—

কিন্তু ক্যামেলিয়া—

তোমাকে আমি একটা কথা বলিনি—আমি দিন কয়েক হলো একটা পার্টটাইম চাকরি নিয়েছি—মাইনা চারশ টাকা মাসে—

চারশ টাকা মাইনার পার্টটাইম চাকরি—বল কি! বিস্ময়ে যেন একেবারে অভিভূত পার্থ।

হ্যাঁ—অবিশ্যি আমার অফিসের বস্ মিঃ কুলকারনীর চেষ্টাতেই বোধহয় চাকরিটা পেয়েছি—

কারণ তাঁকে বলেছিলাম কথাটা—

কিন্তু চাকরিটা কি?

ডেসপ্যাচ বা করস্‌পন্‌ডেন্ট ক্লার্কের চাকরি বলতে পার—

সে জন্য চারশ টাকা মাইনা—

বিরাট এ্যামেরিকান ফার্ম। দিল্লী-বোম্বাইতে ওদের বিরাট অফিস আছে নাকি শুনেছি—এখানেও কলকাতাতে শীঘ্রই অফিস খুলবে—ভাল একটা বিল্ডিংয়ের সন্ধানে আছে ওরা—এবং সে অফিস খুললে আরো বেশী কাজ করতে হবে—

ঐ পর্যন্তই, আর বিশেষ কোন কথা হলো না ঐ সম্পর্কে।

তারপর কটা দিন মীনাক্ষী পার্থর ভেলোরে যাবার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে। অফিসের থেকে ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে হয় মীনাক্ষীকে, কারণ এক সঙ্গে অনেকগুলো টাকা দরকার। টুকটাক জিনিসপত্রও কেনাকাটা করতে হয়। সেই সঙ্গে কিছু জামা-কাপড়।

মীনাক্ষী স্থিরই করেছে ভেলোর থেকে ওকে কোন হিল ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেবে।

ডাঃ সর্বাধিকারী বলছিলেন নৈনিতালে তার এক মারোয়াড়ী পেসেন্টের বাড়ি আছে একেবারেই লেকের ধারে—সেখানেও সে গিয়ে থাকতে পারে, তবে খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। এবং মীনাক্ষীও ইচ্ছা করলে মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে।

মীনাক্ষী বলেছে ডাঃ সর্বাধিকারীকে তিনি যেন সেই ব্যবস্থাই করেন—কোন স্যানাটোরিয়াম হলে সে সুবিধা হবে না—তাছাড়া খরচ একটু বেশী পড়লেও সে এখন আর ততটা ভাবছে না, ভাল একটা চাকরি যখন পেয়ে গিয়েছে।

দেখতে-দেখতে যাওয়ার দিন এসে গেল।

সে দিনটা রবিবারও ছিল—কাজেই অফিসের তাড়া ছিল না।

বেলা আড়াইটায় ট্রেন। মাদ্রাজ মেল।

একটা ফার্ষ্টক্লাশ বার্থ রিজার্ভ করেছিল মীনাক্ষী পার্থর জন্য। বিছানা পেতে বার্থের 'পরে ভাল করে গুছিয়ে শুইয়ে দেয় পার্থকে মীনাক্ষী। ভৃত্য ত সঙ্গে যাচ্ছে—পরে ফিরে আসবে।

বেশী কিছু না—মীনাক্ষী বলে, বেশী কথা লিখতে হবে না শুধু এক ছত্র লিখবে ভাল আছি—ব্যস, সপ্তাহে অন্তত দু'খানা চিঠি দেবে।

পার্থ মৃদুমৃদু হাসে।

হাসছো কি—ভুল না কথাটা। নইলে আমি এখানে টিকতে পারব না—

জানি!

জানো?

জানি বৈ কি! তারপরই একটু থেমে পার্থ বলে, একটা কথা কয়দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে জান ক্যামেলিয়া?

কি—

ভাল হবো কিনা জীবনে আর জানি না—তবে—

আবার—আবার ঐ সব বাজে কথা! কৃত্রিম ধমক দিয়ে ওঠে মীনাক্ষী পার্থকে।

সত্যিই—বাধা দিও না আমাকে ক্যামেলিয়া আজ বলতে দাও—তোমার এই চেষ্টা সফল হোক আমিও মনে মনে কামনা করি—ভাল হয়ে উঠতে আবার আমিও চাই। এই পৃথিবীতে এই যে সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা এর মধ্যে নিজেকে মিশিযে দিয়ে এদেরই মত একজন হয়ে আমিও বাঁচতে চাই—কিন্তু তা যদি নাও হয়, তুমি বিশ্বাস করো কোন আক্ষেপ, কোন ক্ষোভই আমার থাকবে না। দু'হাত ভরে তুমি আমায় যা দিয়েছো ক্যামেলিয়া—সমস্ত বুক ভরে সেটা আমার থাকবে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। কি পেলাম আর কি পেলাম না সে হিসাবের অনেক ঊর্ধ্বে অন্তত সে সান্ত্বনাটুকু আমার থাকবে।

মীনাক্ষীর দু'চোখে জল ভরে আসে।

সে পার্থর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরেছিল। সেই হাত দুটো তেমনি করেই ধরে থেকে বলে, ডাঃ সর্বাধিকারী বলেছেন—অপারেশনের পব যদি পাঁচ-ছয়টা মাস তুমি কোন হিল ষ্টেশনে থাকতে পার আবার সুস্থ হয়ে উঠবে—। আমি বলছি তুমি দেখে নিও পার্থ নিশ্চয়ই

আমরা ঘর বাঁধবো—

ট্রেন ছাড়বার ঘন্টাধ্বনি পড়লো—

পার্থ বলে, ঘন্টা পড়লো—দেরি করো না, যাও—

প্রথম ঘন্টা—আরো দু'বার ঘন্টা পড়বে—শান্ত কণ্ঠে মীনাক্ষী বলে।

পাঁচ দিন পরে প্রথম চিঠি পেল পার্থর মীনাক্ষী।

ক্যামেলিয়া!

আমি মাদ্রাজ পৌঁছেছি। যে হোটেলটায় উঠেছি খুব ভাল হোটেল। নতুন হোটেল—হোটেলের নামটা আশোকা।

দুটো দিন এখানে বিশ্রাম নেবো—তারপর ভেলোর যাবো। বেশীদূর নয়—মাত্র আশি মাইল পথ।

বাসেও যাওয়া যায়—ট্রেনেও যাওয়া যায়। তবু ট্রেনেই যাবো। স্থির করেছি মনে।

এখানে কাল রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আজকের সকালটি বড় প্রসন্ন, বড় স্নিগ্ধ।

সেদিন তুমি চলে গেলে গাড়ি থেকে নেমে—গাড়ি ছাড়ল। জানালা দিয়ে দেখলাম একটু একটু করে প্ল্যাটফরমটা মিলিয়ে গেল ঃ প্ল্যাটফরমের 'পরে দণ্ডায়মান তোমার শাড়ির গেরুয়া রঙের অঞ্চল প্রান্তটি ক্রমশঃ একটু একটু করে মিলিয়ে গেল।

মনে হলো যেন জীবনের মধুর অধ্যায়টির 'পরে একটি ছেদ পড়লো।

একটু একটু করে ক্রমশঃ বেলা ঝিমিয়ে আসছে বাইরে দেখতে পাচ্ছি।

একটা দুটো করে অনেকগুলো ছোট বড় ষ্টেশন পার হয়ে এলাম।

বাইরে আলো স্বল্প হতে হতে ক্রমশঃ একেবারে মিলিয়ে গেল।

টেলিগ্রাফের পোষ্ট ও তার ক্রমশঃ ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে যায়—আর দেখা যায় না।

সন্ধ্যার আকাশে সেই তারাটি দেখা দিল—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হারিয়ে যাওয়া সেই সুর মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠলো।

মধুপের গুঞ্জন যেন গুন-গুন-গুন-গুন!

পেলাম—খুঁজে পেলাম তোমার সেই গানের সুর। তোমার সমস্ত গানটার সুর গুনগুন করে আমার কণ্ঠে এসে ধরা দিল।

তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম বের করে সুটকেশ থেকে লিখে ফেললাম স্বরলিপিটা।

অবিশ্যি সঙ্গে হারমোনিয়ামটা না থাকায় অসুবিধা হয়েছে কিন্তু তবু থামিনি।

শেষ করে তবে কলম থামিয়েছি।

ইতিমধ্যে কত ষ্টেশন পার হয়ে গিয়েছি—কতবার গাড়ি থেমেছে—জানতেও পারিনি যেন।

হঠাৎ যখন খেয়াল হলো তখন অনেক রাত, ট্রেন চলেছে অন্ধকারে।

মনে পড়লো কবিগুরুর সেই কবিতাটি, মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার কবিতাটা—কারণ তোমার মুখে কতবার শুনেছি কবিতাটা ঃ

এ প্রাণ রাতের রেল গাড়ি
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম!
অসীম আধারে
কালী-লেপা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয়-হারা দেশে।

এই পর্যন্ত—তারপর আর কিছুতেই মনে পড়ে না। একদম ভুলে গেছি যেন। সে কি মর্মান্তিক যাতনা মনে করবার জন্য কিন্তু মনে আর পড়ে না।

জানালা পথে বাইরে তাকলাম।

জানালার কাচটা তোমার কথামত পাছে ঠাণ্ডা লাগে বলে তুলে দিয়েছিলাম সেটা ফেলে দিলাম।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া চোখেমুখে এসে লাগল।

মনে হলো তুমি যেন এসে কানে কানে আমায় কি বলে গেলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বাকী লাইনগুলো ঃ

ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে বালি,
পার হয়ে যায় চলি,
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতি দূর তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি—
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ॥

আবার দেখছি বাইরে আকাশটার এখানে ওখানে মেঘ জমা হচ্ছে। হয়ত আবার বৃষ্টি নামবে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

আবার চিঠি দেবো তোমায় ভেলোরে পৌঁছে, কেমন?

কেমন আছো?

বেশী খেটো না কিন্তু পয়সার জন্য—সব সইতে পারবো কিন্তু তোমাকে হারানোর ব্যথা কিন্তু সইতে পারব না।

প্রচুর ভালাবাসা রইলো।

—পার্থপ্রতীম।

চিঠি পড়ে পড়ে যেন আশা মেটে না মীনাক্ষীর।

বার বার পড়ে আর পড়ে।

দিন পাঁচেক পরে ভেলোরে পৌঁছেও আবার চিঠি দেয় পার্থ।

ভেলোরে পৌঁছেই তোমার চিঠিটা পেলাম ক্যামেলি। আঃ যেন এক মুঠো আনন্দ।

কাল এখানকার মেডিকেল বোর্ড আমাকে প্রাথমিক পরীক্ষা করলেন—এক্স-রে, রক্ত ও স্পুটামের রিপোর্ট দেখলেন।

বুকের সব প্লেট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

রাত্রে সিস্টার ললিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, বোর্ড কি বললো সিস্টার আমার সম্পর্কে?

তারা খুব হোপ্‌ফুল, তুমি নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে লোবেকটমি করলেই। ললিতা বলল।

অপারেশনের দিন এবারে ধার্য হবে আরো কিছু পরীক্ষা, আবশ্যকীয় পরীক্ষার পর।

আমার কি আজ মনে হচ্ছে জান ক্যামেলিয়া—সুস্থ সত্যিই বোধহয় আমি হয়ে উঠবো। আমার ঘরের দরজায় নতুন আলো এসে পড়েছে। কি সুন্দর আকাশ—কি সুন্দর আলো—আলোর বন্যা—আর সেই আলোয় তোমার প্রফুল্ল সুন্দর মুখখানি দেখতে পাচ্ছি।

কি সৌভাগ্য ছিল আমার জীবনে যে তোমায় পেয়েছিলাম বল ত!

কি তপস্যা ছিল আমার বলত ক্যামেলি—যে তোমার ভালবাসা পেয়েছি আমি।

ক্যামেলি—ক্যামেলি—আমার ক্যামেলিয়া ঃ তোমার পার্থ।

চিঠি পড়ে আর মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানায় মীনাক্ষী।

ঠিক সময়ে বলতে গেলে একেবারে পার্টটাইম চাকরিটা তার জুটে গিয়েছে।

ঐ চাকরিটা যদি না হতো এই সময়—পার্থকে হয়ত ভেলোরে পাঠাতেই পারত না। কোথায় পেত অত টাকা।

মাসে মাসে যে টাকার এখন প্রয়োজন পার্থর চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য, কোথা থেকে পেত সেই টাকা এ সময় মীনাক্ষী।

ভগবানই মিলিয়ে দিয়েছেন মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে সেদিন অকস্মাৎ কুলকারনীর অফিস চেম্বারে।

পরে অবিশ্যি মীনাক্ষী একদিন মিঃ কুলকারনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

বলেছিল, আপনার সুপারিশ ও সৌজন্যতায়ই মিঃ ফারগুসনের অফিসে চাকরিটা আমি পেয়েছি।

মিঃ কুলকারনী বলেছিল, মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যাও—বিরাট কনসার্ণ ওদের—আর মিঃ ফার্গুসনের সু-দৃষ্টিতে যখন তুমি পড়েছো উন্নতির সম্ভবনাও তোমার প্রচুর—

অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে মিঃ ফার্গুসনের অফিসে মীনাক্ষী---কিন্তু কাজ ত বলতে গেলে কিছুই নয়।

দুটো-তিনটে বা বড় জোর কোন কোন দিন হয়ত চারটে কি পাঁচটা চিঠির নোট অনুযায়ী জবাবটা তৈরী করে টাইপ করে দেওয়া।

চিঠিগুলো পাঠাতেও তাকে হয় না।

ক্লার্ক ঘনশ্যামই সে সব চিঠি মিঃ দোশানীর সই করিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

প্রায় দেড় মাস হতে চলল চাকরি করছে মীনাক্ষী কিন্তু আজ পর্যন্ত আর ফার্গুসনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

মিঃ দোশানীর সঙ্গেও একদিন কি দু'দিন দেখা হয়েছে মাত্র।

দেখা হয়—এক ঘরে ঢুকতে দরোয়ান ধনবাহাদুরের সঙ্গে ও ভিতরে ঢুকে ঘনশ্যামের সঙ্গে।

আগে আগে প্রথম কয়েকদিন ঘনশ্যামের সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্তা হতো এখন আর তাও হয় না।

টেবিলের 'পরেই তার ফাইল থাকে—এবং ফাইলের মধ্যে থাকে ইনস্ট্রাকশন প্রয়োজনীয়—সেই ইনসট্রাকশন অনুযায়ীই সে কাজ করে যায়।

আরো একটা জিনিস তার যেন কেমন লাগে আজ পর্যন্ত—ঘন্যশ্যাম ব্যতীত আব কাউকে কোন দিন সে অফিসে দেখে নি।

অতবড় একটা বিরাট কনসার্ণের অফিস তা সে যতই ছোট হোক না কেন—তার মতো একজন করেসপনডেন্ট ক্লার্কেরই মাইনা চারশ টাকা কিন্তু সে রকম ত কিছুই তার চোখে পড়ে না।

একা একা বসে বসে সে কাজ করে যায়।

কারো কাছে কোন কৈফিয়ৎ নেই—কাজে প্রশংসাও নেই—অপ্রশংসাও নেই।

ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়েছিল মীনাক্ষী পার্থর অপারেশন হয়ে গিয়েছে।

এবং অপারেশন মোটামুটি সাকসেস্‌ফুলই হয়েছে।

পার্থ তার চিঠিতে লিখেছে :

ক্যামেলিয়া—

অপারেশন হয়ে গিয়েছে--যদিও শুয়েই আছি তবু মনে হচ্ছে যেন নতুন জীবন আবার ফিরে পেতে চলেছি।

নতুন জগতের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি।

আর এর সমস্তটুকু কৃতিত্ব তোমারই। বলতে পার গত জন্মে তুমি আমার কে ছিলে? নিশ্চয়ই এমনিই প্রিয়—এমনিই আপনার জন ছিলে।

তুমি আমার প্রাণদাত্রীই নও শুধু জীবনের নতুন আলোও—যে আলো আজ আমাকে বিধাতার আশীর্বাদের মত শতধারায় সিক্ত করছে।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা মেঘলা ছিল।

কেমন যেন বিষণ্ণ হয়েছিল। দুপুর থেকে টিপটিপ বৃষ্টি।

কাজ করবার মত মন বা মেজাজ কোনটাই ছিল না কিন্তু পরের দাসত্ব—উপায় ত নেই তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মীনাক্ষী জরুরী চিঠিগুলো টাইপ করে যখন শেষ করল তখন বেলা সাড়ে চারটে, তখনই চারদিকে যেন মনে হয় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

দু'হাতের আঙ্গুলগুলো একটানা টাইপ করে করে তখন টন টন করছে।

খোলা জানালা পথে চারতলার আকাশটার দিকে তাকাল। বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে, সমস্ত আকাশটাই মেঘাবৃত।

হয়ত সারা রাত বৃষ্টি পড়বে।

মনে হয় আজ ফার্গুসনের অফিসে না গেলে কেমন হয়।

সোজা বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

মনের মধ্যে ইচ্ছাটা গুন গুন করে ফিরতে থাকে।

চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে উঠে দাঁড়ায় মীনাক্ষী। আর ঠিক সেই সময় টেলিফোন অপারেটার তাকে ডাকে।

মিস রয়—

মুখ তুলে তাকাল মীনাক্ষী। দুটো টেবিল পরেই টেলিফোন অপারেটারের বসবার জায়গা।

তোমার ফোন—

॥ ১১ ॥

মীনাক্ষী কথাটা শুনে একটু যেন বিস্মিতই হয় ঃ তার ফোন! কে আবার তাকে ফোন করবে। তাকে ফোন করবার মত আছেই বা কে!

খানিকটা শৈথিল্যের সঙ্গেই গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নেয় মীনাক্ষী, হ্যালো—

মিঃ দোশানী স্পিকিং—আর ইউ মিস রয়?

ইয়েস—বলুন।

মিঃ ফার্গুসন বিশেষ কারণে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

কোথায়—অফিসে যাবো কি?

না—গ্রাণ্ডে এসো—

'গ্র্যাণ্ড হোটেলে?'

হ্যাঁ—১১৯ নং ঘর। এখন চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ—পাঁচটা থেকে পাঁচটা দশের মধ্যে তুমি গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না হোটেলে?

বোধহয় পারব—

Good.

সঙ্গে সঙ্গে ফোনের কানেকশন কেটে গেল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল মীনাক্ষী—টেবিলের 'পরে আগোছাল কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে ফেলল চটচট।

তারপরই অফিস থেকে বের হয়ে পড়ল।

ভেবেছিল অফিস থেকে বের হয়ে সোজা আজ হোস্টেলেই ফিরে যাবে।

যাবার সময় নিয়ে যাবে কিছু রজনীগন্ধা—পড়বে বসে সঞ্চয়িতা, কিন্তু তা আর হলো না।

পরের দাসত্ব—মনটা নিজের অজ্ঞাতেই একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় ঃ ছিঃ ছিঃ একি ভাবছে সে।

ফার্গুসন সাহেব দয়া করে চাকরিটা দিয়েছিল বলেই না পার্থকে সে ভেলোরে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে পেরেছে এবং সেখান থেকে আবার নৈনিতাল যাবে।

পার্থ আবার সুস্থ হয়ে উঠবে আগের মত।

তাই কি সে মনে প্রাণে চেয়েছিল না।

ফার্গুসন তাকে বাঁচিয়েছে—ঐ পার্টটাইম চাকরিটা সে তাকে না দিলে কি হতো!

অফিসের মাইনার উপর নির্ভর করেই থাকতে হতো।

মীনাক্ষী আস্তে আস্তে হেঁটে চলে।

রাস্তা বিশ্রী ভিজে প্যাচপ্যাচ—টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে—ইতিমধ্যেই চারিদিকে আসন্ন সন্ধ্যায় ও মেঘে মেঘে কেমন যেন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

অফিস ফেরতা সব যে যার বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত।

ট্রাম বাস—ট্যাক্সীতে অসম্ভব ভিড় রাস্তায়।

ফুটপাতেও ভিড়ের অন্ত নেই।

এ সময় ট্যাক্সী পাওয়া বা ট্রামে বাসে উঠতে পারা দুঃসাধ্য বললেও বুঝি অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গে ছাতাও নেই।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে ফুটপাত ধরে মীনাক্ষী।

অফিস থেকে গ্র্যাণ্ড অবিশ্যি খুব বেশী একটা দূর নয়। মিনিট কুড়ি পঁচিশের বেশী লাগা উচিত নয় হেঁটে গেলেও।

চোখেমুখে কপালে এসে বৃষ্টিকণাগুলো ঝিরঝির করে পড়ছে।

কেমন যেন শিরশির করে।

সন্তর্পণে চলতে হয়—পথ কর্দমাক্ত ও পিছল।

চলতে চলতেই হঠাৎ মনে পড়ে মাত্র আজ সকালেই ওখানকার চিঠি পেয়েছে মীনাক্ষী : পার্থর ষ্টিচ্ কেটে দেওয়া হয়েছে, খুব দ্রুততর ঘা শুকিয়ে উঠছে।

আর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে হাঁটাচলা করতে দেবে।

ডক্টর গিবসন জানিয়েছেন—তারা অত্যন্ত hopeful—operation has become successful. এবং চিঠির সর্বশেষ কথা হচ্ছে টাকা। এ মাসে যেন কিছু বেশী টাকা পাঠান হয়।

পার্থর কষ্ট যাতে কোন রকম না হয় সেই কারণেই মীনাক্ষী তার আপত্তি করা সত্ত্বেও ভাল কেবিনে ওর থাকবার ব্যবস্থা করেছে।

কেবিন ভাড়াটা অবিশ্যি একটু বেশী তা আর কি করা যাবে।

টাকা।

এ মাসে অনেকগুলো টাকা ধার শোধ করতে গিয়েছে আগের। হাত একেবারে খালি।

মিঃ ফার্গুসনেরে অফিসে মাইনা পেতেও এখনো দিন দশেক দেরি।

তাছাড়া এ মাস থেকে তার মাইনে থেকে ১০০ টাকা করে কেটে নেবার জন্য সে গত মাসেই বলেছিল মিঃ দোশানীকে।

কথাটা না বললেই হতো।

অগ্রিম মাহিনা নেওয়া সম্পর্কে তাঁরা ত কোন কথাই বলেননি—মিথ্যে কেন সে গায়ে পড়ে বলতে গেল কথাটা।

আরো একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে ইদানীং তার শুরু হয়েছে। পার্থর ব্যাপার নিয়ে হোষ্টেলে মাসীর সঙ্গে ঝগড়া করে উঠে আসবার পর থেকে হোষ্টেলের খরচাও একটা বাড়তি খরচা।

গত দু'মাসে হোষ্টেলের খরচও সে দিতে পারেনি—লাবণ্যদি হোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বলেছে এ মাসে দেবে—

আর বাইরের এখানে-ওখানে কিছু কিছু ধার আছে—তারও শোধ কিছু দিতে হবে—

হঠাৎ খানিকটা জলকাদা ওর শাড়িতে ছিটকে দিয়ে গেল পথের দ্রুত ধাবমান একটা ট্যাক্সী!

চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

কাপড়ের দিকে তাকাল—বিশ্রী করে দিয়ে গেল জলকাদার ছিটে পরনের শাড়ীটা।

কিন্তু উপায় কি—এই অবস্থায়ই যেতে হবে।

ঝলমল করছে আলোয়-আলোয় রাতের গ্র্যাণ্ড।

লম্বা কার্পেটে মোড়া প্যাসেজ—বহু নরনারীর আনাগোনা। রিসেপসনিষ্টদের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল মীনাক্ষী : ১১৯ নং ঘরটা কোথায় আমাকে একটু direction দিতে পার—

রিসেপসনিষ্ট একজন হোটেল-বয়কে ডেকে মীনাক্ষীকে ঘরটা দেখিয়ে দেবার জন্য বললেন।

মীনাক্ষী এগিয়ে যায় হোটেল-বয়ের সঙ্গে।

লিফটে করে দোতলা—তারপর সোজা চলে গিয়েছে করিডর—লম্বা টানা—অনেকটা গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে আবার।

প্রত্যেক ঘরের মাথায় মাথায় ঘরের নম্বর পিতলের লেটারিংয়ে লেখা।

১১৯ নং ঘর।

পিতলের ইংরেজী ১১৯ নম্বরটা দরজার মাথায় ঝক্‌ঝক্ করছে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই।

শূন্য খাঁ খাঁ করছে লম্বা টানা করিডরটা যতদূর দৃষ্টি পৌছায়।

দরজার গায়ে মৃদু নক্ করল মীনাক্ষী।

ভিতর থেকে আহ্বান এলো, yes—come in—

নিঃশব্দে ভারী দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে পা ফেলল মীনাক্ষী। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর।

মেঝেতে পুরু নরম কার্পেট বিছানো ঘরের সবটা জুড়ে।

একটি বড় কক্ষকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে মধ্যখানে একটা সূক্ষ্ম নেটের পর্দা ঝুলিয়ে, একধারে সোফা কোচ—মাঝখানে একটি গোলাকার টেবিল।

অন্যদিকে একটি সিংগল বেড—সুদৃশ্য বেডকভারে ঢাকা—মাথার কাছে ফোন।

ঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা হলো। একটা সোফার উপরে বসেছিল মিঃ ফার্গুসন।

ফার্গুসনের পাশে আর একজন।

দ্বিতীয় লোকটাকে চেনে না মীনাক্ষী। দুজনেরই 'পরিধানে দামী সুট।

ইংরেজীতেই কথাবার্তা হয়।

এসো—Good evening. ফার্গুসন আহ্বান জানায়।

Good evening—মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তরে বলে মীনাক্ষী।

বোস। Be seated please.

মীনাক্ষী বসল সামান্য ব্যবধানে মিঃ ফার্গুসনের মুখোমুখি।

তারপর তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে মিস রয়?

ভাল।

You are happy in our office?

হ্যাঁ—

Quite comfortable?

হ্যাঁ—

No grievance?

না—

Good—যাক আজ যে জন্য তোমাকে ডেকেছি—একটা কাজ করতে হবে তোমাকে—হ্যাঁ ভাল কথা—হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় ফার্গুসন, তোমার পার্থপ্রতীম কেমন আছে?

Thanks—so kind of you—সে ভালই আছে—খুব rapid improve করছে—

তা হলে ত সত্যিই খুব সুখবর—কবে যাচ্ছো তাকে দেখতে—

সামনে পূজোর সময় যাবো ভাবছি—

মৃদু হেসে মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মিঃ ফার্গুসন প্রশ্ন করে—খুব ভালবাস তাকে তুমি মিস্ রয়, না?

মীনাক্ষী মাথা নীচু করে। মুখটা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে।

মৃদু হাসে মিঃ ফার্গুসন তারপর বলে, শোন মিস্ রয়—তোমার কাজে আমরা অত্যন্ত খুসি। এখন দেখছি তোমাকে চিনতে সেদিন আমি ভুল করি নি—এও তোমাকে বলে রাখছি—আমাদের দ্বারা যদি কোন সাহয্য তোমার হয়—

So kind of you মৃদুকণ্ঠে মীনাক্ষী বলে।

যাক শোন, আজ একটা বিশেষ কাজের জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি—একটু আগে যা বলছিলাম—

মীনাক্ষী মুখ তুলে তাকাল ফার্গুসনের দিকে।

একবার তোমাকে বম্বে যেতে হবে অফিসের একটা জরুরী কাজে—

বোম্বাই?—

হ্যাঁ—প্লেনে যাবে—অবশ্য সেখানে থাকতে হবে না—next return প্লেনেই তুমি কলকাতায় আবার ফিরে আসবে—পারবে না—

আমি—মানে—

কথাটা তাহ'লে তোমাকে খুলেই বলি কাজটার জন্য যাকে আমাদের পাঠাবার কথা ছিল হঠাৎ সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারপর আমরা ভেবেছিলাম মিঃ দোশানীকেই পাঠাবো কিন্তু সে অন্য একটা কাজে অফিসে আটকা পড়েছে—তাই মনে হলো তোমার কথা। দোশানীও অবিশ্যি তোমাকেই রেকমেণ্ড করল—পারবে কি বল, অবিশ্যি nothing so difficult—

॥ ১২ ॥

মীনাক্ষী মিঃ ফার্গুসনের প্রস্তাবে কেমন হঠাৎ একটু থমমত খেয়ে গিয়েছে।

ঠিক কি জবাব দেবে—হ্যাঁ—না—না যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

মিঃ ফার্গুসন আবার বলে, তোমাকে যেন চিন্তায় ফেললাম মনে হচ্ছে—শোন মিস রয় এ কাজের জন্য অবিশ্যি তোমাকে একটা স্পেশাল এলাউন্স দেওয়া হবে। এবং তুমি যদি ইচ্ছে কর ত সেটা অগ্রিমই নিতে পার—

মিঃ ফার্গুসনের পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যাক্তিটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারে ফিস্‌ফিস্ করে চাপা গলায় মিঃ ফার্গুসনকে যেন কি বলল।

মিঃ ফার্গুসন আবার বলে, তুমি কাজটা না পারলে হয়ত আমাদের একটু অসুবিধাতেই পড়তে হবে মিস রয়—এবং অন্য কারও কথা ভাবতে হবে বাধ্য হয়ে তবে ভেবেছিলাম তুমি হয়ত রাজী হবে—

কি করতে হবে আমাকে?

এতক্ষণে আস্তে আস্তে বলে মীনাক্ষী।

খুব একটা কঠিন কাজ কিছু নয় মিস্ রয়—একটা জরুরী এবং বিশেষ important চিঠি—

চিঠি'

হ্যাঁ—একটা জরুরী improtant চিঠি আমরা ডাকে বা এয়ার মেলে—

মীনাক্ষী চেয়ে থাকে ফার্গুসনের মুখের দিকে।

ফার্গুসন বলে, পাঠাতে চাই না—সেটা তোমায় বম্বে এয়ারপোর্টে লোক থাকবে তার হাতে পৌঁছে দিতে হবে মাত্র—

বেশ—কবে যেতে হবে?

কবে কি—to-day মানে to night—এখন পৌনে সাতটা—say রাত নটায় প্লেন, তুমি—

নটায় প্লেন!

হ্যাঁ—বাসায় যাওয়ার কথা ভাবছো কিন্তু তার কোন প্রয়োজনই নেই—তুমি এখান থেকেই সোজা রওনা হবে। অবিশ্যি ইচ্ছে করলে তুমি যেখানে থাক—তোমার সেই হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টকে জানাতে পার—ফোনে।

কিন্তু আমি—

শোন মিস রয়—We have no time to loose—you must get ready yourself—

কিন্তু একবার হোস্টেলে না গেলে—

কিন্তু তারও সময় নেই—

কিন্তু আমার এই পোশকটা অন্ততঃ—

সে জন্য তুমি ভেবো না। পোশাক তোমাকে এখান থেকেই সাপ্লাই করা হবে—

এখান থেকে—

হ্যাঁ শোন, এর মধ্যে আর একটু কথা আছে—একটু আগে তোমাকে বলছিলাম না যাকে দিয়ে আমরা চিঠিটা পাঠাব ভেবেছিলাম সে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে—সে একজন আমাদের বিশেষ পরিচিত এয়ার হোসটেস্—মিস লায়লাবানু—এখন যার হাতে চিঠিটা দিতে হবে—সেও জানে লায়লাবানুই তাকে চিঠিটা delivery দেবে।

কিন্তু—

বুঝতে পারচি তুমি কি ভাবচো—না—তিনি ইতিপূর্বে লায়লাকে দেখেছেন যদিও একবার, তবু তোমাকে তিনি কোন রকম সন্দেহ করবেন না।

তোমার কথাটা ঠিক আমি বুঝতে পারচি না মিঃ ফার্গুসন—

কি জান মিস্ রয়—আমরা চাই লায়লার পরিচয়েই তুমি বম্বে এয়ার পোর্টে গিয়ে চিঠিটা delivery দেবে—

কিন্তু তিনি ত বললেন লায়লাকে দেখেছেন—

হ্যাঁ—

তাহলে—

ফাগুর্সন মৃদু হাসে।

তাছাড়া আমি আর একজনের ছদ্ম পরিচয়ে যাবোই বা কেন। Why—

বললাম ত চিঠিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অফিসের একটা বিশেষ ব্যাপার—যে কারণে এ কাজের ভারটা চট্ করে অন্য কাউকে দিতে পারছি না আমরা—তাছাড়া লায়লাকে চিনলেও তোমায় সন্দেহ করবেন না—

মানে—কি বলছেন আপনি—

চিঠিটা politically পরে বলছি কেন—তার আগে জেনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের গুপ্তচরেরা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে; যদি তারা কোনক্রমে ব্যাপারটা জানতে পারলে বিশেষ ক্ষতি হবে—শুধু আমাদের দেশের নয় তোমাদের দেশেরও—

সে ভদ্রলোকের দেশের কথা ছাড়াও অন্য কেউ যদি আমায় চিনে ফেলে যে আমি সত্যিই লয়লাবানু নই—

চিনতে পারবে না—কারণ you look exactly like লায়লা বানু—

What do you mean–?

Here you are–দেখ—মিলিয়ে নাও—বলতে বলতে মিঃ ফার্গুসন একটা আইডেনটিটি কার্ড মীনাক্ষীর দিকে এগিয়ে ধরল।

কেমন যেন বিহ্বল, কেমন যেন হতচকিত মীনাক্ষী।

অবশ হাতে আইডেনটিটি কার্ডটা সামনে খুলে ধরল এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে ওঠে।

আশ্চর্য!

এও কখনো সম্ভব! হুবহু সে—অবিকল সে। অন্যে ত দুরে থাক— সে নিজেই ত আইডেনটিটি কার্ডের মধ্যস্থিত ফটোর সঙ্গে তার নিজের এতটুকু পার্থক্য কোথায়ও খুঁজে পাচ্ছে না।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে মীনাক্ষী—

মিঃ ফার্গুসন আবার বলে, আশা করি বুঝতে পারছো এখন সব ব্যাপারটা—নাও আর দেরি করো না—আমাদের হাতে খুব কম সময় আর আছে—পাশের ঘরে যাও—লায়লার একসেট্ পোষাক ও ঘরে আছে চট্ পট্ পরে নাও। Get yourself dressed up–quick—যাও—

ঘরের মধ্যে নজরে পড়ল মীনাক্ষীর ইলেকট্রিক ক্লক্টা। কাঁটাটা তার নিঃশব্দে সময়ের ঘরগুলো যে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে।

সাতটা বেজে পাঁচ।

যাও—পাশের ঘরে যাও, ভাল কথা—just a minute–এই নাও তোমার স্পেশাল এলাউন্সটা—এই খামের মধ্যে পুরো টাকাটাই আছে and this your air ticket.

অবশ শিথিল হাতে সেই নোটভর্তি খামটা ও এয়ার টিকিট এবং পাশপোর্টটা নিয়ে শিথিল গতিতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল মীনাক্ষী।

ছোট একটা এন্টিরুম।

সামনেই একটা প্রমাণ সাইজের আয়না ফিট করা ড্রেসিং টেবিল।

একশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে—তারই আলোয় ছোট ঘরটা যেন ঝলমল করছে। পাশেই একটা চেয়ারের উপরে কিছু জামাকাপড় রাখা।

উঃ কি প্রচন্ড পিপাসা পেয়েছে মীনাক্ষীর। গলা থেকে বুক পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ নজরে পড়লো—ড্রেসিং টেবিলের উপরে এক গ্লাস জল কাচের সুদৃশ্য একটা ঢাকনী দিয়ে ঢাকা রয়েছে।

এক মুহূর্ত সেই জলভরা গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলে নিয়ে মুখে দিল—চোঁ চোঁ করে এক টানে জলটা বেশ খানিকটা পান করবার পর যেন মনে হলো জলটার আস্বাদ কেমন একটু টক্ টক্—মিষ্টি মিষ্টি—

একবার মনে হলো এমন আস্বাদ কেন! কিন্তু সে বুঝি মুহুর্তের জন্য—পরক্ষণেই পিপাসার্ত মীনাক্ষী গ্লাসের সমস্ত জলটা নিঃশেষ করে ফেলে।

আঃ!

পরের চাকরি—যা বলবে তা করতেই হবে। তাছাড়া মন্দ কি—যদি সামান্য একটু কাজের জন্য অতগুলো টাকা উপরন্তু পাওয়া যায়।

টাকা—অনেক টাকার দরকার তার।

আজই ত সে অফিসে বসে বসে ভাবছিল টাকার কথা। কোথা থেকে টাকার জোগাড় করবে। কেমন করে করবে।

পার্থকে টাকা পাঠাতে হবে হাসপাতালে, এদিককার দেনা মিটাতে হবে—তাছাড়া মন্দ কি একটা প্লেনট্রিপও দেওয়া হবে। জীবনে এমন করে প্লেনে চড়ার সুযোগ আসবে কখনো সে কি কল্পনাতেও ভেবেছিল?

নাঃ আর ভাববে না।

শরীরটা বেশ লাগছে। বেশ ঝরঝরে—বেশ একটা খুশি খুশি ভাব!

কিন্তু ড্রেস পরতে গিয়ে আবার একবার যেন থম্‌কে যায়। এয়ারহোস্টেসের ড্রেস—

এই পরতে হবে নাকি তাকে!

হ্যাঁ—তাই হয়ত—সে ত আর মীনাক্ষী রায় হয়ে যাচ্ছে না—যাচ্ছে লায়লা বানু হয়ে, এয়ার হোসটেস্, মিস্ লায়লাবানুর পরিচয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য—অবিকল তারই মত দেখতে।

হঠাৎ মনের মধ্যে মীনাক্ষী বেশ একটা রোমাঞ্চ—একটা উত্তেজনা বোধ করে এ যেন রীতিমত একটা অ্যাডভেঞ্চার—

মৃদু হেসে পোশাক তুলে নেয়।

বদলে গেল—একেবারে সম্পূর্ণ যেন পাল্টে গেল চেহারায় মীনাক্ষী নূতন পোশাকে। এয়ার হোস্‌টেস্ একজন সে এখন।

আয়নায় নিজেকে দেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

দরজার ওপাশ থেকে মিঃ ফার্গুসনের তাগিদ শোনা যায় আবার, মিস রয় হলো? We are in hurry–

এই যে আসছি—

মীনাক্ষী বের হয়ে এলো।

মীনাক্ষী নয় এয়ার হোসটেস্ লায়লা বানু।

মিঃ ফার্গুসন ওর দিকে বারেক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠে—Ah! that's very nice–fine–now no more delay–চল নীচে—our car is ready–

১৯৯ নং ঘর থেকে বের হয়ে অতঃপব লম্বা করিডরটা পার হয়ে লিফটে করে মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে নীচে চলে এলো মীনাক্ষী।

মিঃ ফার্গুসনের সেই গাড়িটা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। সেই সাদা রঙের এ্যামেরিকান লাকসারী কারটা।

হোটেলের উর্দী পরা দরোয়ানই সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

Get in–মিঃ ফার্গুসন বলে।

মীনাক্ষী গাড়ীতে ওঠে।

Here is your bag—মীনাক্ষীর ব্যাগটা এগিয়ে দেয় মিঃ ফারর্গুসন: এটা টেবিলের' পরে ফেলে এসেছিলে।

সত্যিই তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছিল মীনাক্ষী—মনেও নেই।

তাহলে— good night ও তোমাকে পৌঁছে দেবে airportএ—

আর চিঠিটা মিঃ দোশানী will handover you in the airport–এয়ারপোর্টেই তুমি পাবে—

গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

Good night.

গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়—মিঃ ফার্গুসনের কণ্ঠস্বরটা শেষ বারের মত শোনা যায়।

আলোকোজ্জ্বল অভিসারিণী যেন কলকাতা মহানগরী।

লাল নীল সবুজ—নানা রঙের আলোয় আলোয় যেন স্বপ্নের রামধনু রচনা করে চলেছে। বিচিত্র যানবাহন ও পথিকজনের ভিড়।

বহু বিচিত্র শব্দতরঙ্গের ভিতর দিয়ে দামী এ্যামেরিকান লাকসারী কারটা নিঃশব্দে যেন হাওয়ার বেগে দমদম্ এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলে।

সুদক্ষ চালক মনসুর।

অতি কৌশলে হাওয়ার বেগে গাড়ি সে ড্রাইভ করছে।

আঃ মাথাটা যে অসম্ভব হালকা।

কেমন একটা ঘুম-ঘুম আসে চোখের পাতায়। মাথাটা হেলিয়ে দেয় মীনাক্ষী গাড়ির নরম ব্যাকে।

সামনেই গাড়ির ড্যাস্‌বোর্ডে সবুজ আলোটা যেন একখণ্ড পান্নার মত জ্বলজ্বল করছে, পান্না নয় যেন কার একটি চোখ বুঝি।

চেয়ে আছে মীনাক্ষীর দিকে।

মীনাক্ষীর ঘুম পাচ্ছে।

॥ ১৩ ॥

ঘুম এসে গিয়েছিল।

একটা মৃদু ঝাকুনী—গাড়িটা এয়ারপোর্টে ঢুকছে দেখতে পেল মীনাক্ষী। সোজা হয়ে ও বসে।

এয়ারপোর্ট তাহলে পৌঁছে গিয়েছে।

একটা আলোর সংকেত অন্ধকার রাতের আকাশে এদিক থেকে ওদিক থেকে থেকে ঘুরছে।

গাড়ি এসে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের সামনে দাঁড়াল।

মীনাক্ষী নামল।

আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই ওর কানে মাইকের ঘোষণা এলো ঃ Attention please—this is Indian Air-lines corporation. Attention please. মিস্ লায়লা বানু—এয়ার হোসেটেস্ তাকে রেস্তোরাঁর মধ্যে জনাব গুলাম আলি ডাকছেন—

মীনাক্ষীর প্রথমটায় কথাটা যেন ঠিক মর্মে প্রবেশ করেনি। সে যে এয়ার হোস্‌টেস লায়লা বানুর ছদ্ম পরিচয়ে এখানে এসেছে বম্বের যাত্রী হয়—সে যে মীনাক্ষী রায় এখন আর নয়, কথাটা যেন তার মস্তিষ্কে ঠিক থিতোয় না হঠাৎ।

কিন্তু আরো দু'বার ঐ একই ঘোষণাটা শোনবার পর হঠাৎ যেন ব্যাপারটা তার মনে পড়ে যায়।

মনে পড়ে যায় ঃ সে এই মুহূর্তে মীনাক্ষী রায় নয়—লায়লা বানু!...সে বম্বে চলেছে অফিসের বিশেষ একটা কাজে এয়ার হোসটেস্ লায়লা বানুর পরিচয়ে।

লায়লা বানুর পরিচয় আইডেনটিটি কার্ড তার কাছে।

লাউঞ্জের এদিকে ওদিকে সব নানা দিকের যাত্রীরা ছড়িয়ে রয়েছে। কেউ বসে. কেউ দাঁড়িয়ে—কেউ বা ঘুরছে।

কেউ গল্প করছে, কেউ কিছু পড়ছে—সবাই যে যার নিজেকে নিজে নিয়ে ব্যস্ত। কারোদিকে নজর নেই—দেবার মত ফুরসুৎও নেই।

কিন্তু রেস্তারাঁটা কোথায়!

এয়ারপোর্টেরই ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসারকে শুধাল মীনাক্ষী, রেস্তারাঁটা কোথায়?

অফিসারটি দেখিয়ে দিলেন।

এগিয়ে চলে মীনাক্ষী রেস্তরাঁর দিকে।

কিন্তু জনাব গুলাম আলিকে ত চেনে না মীনাক্ষী। জীবনেও ত তাকে সে দেখেনি। লম্বা না বেঁটে—রোগা না মোটা—ফর্সা না কালো কে জানে! তাছাড়া মিঃ দোসানীর চিঠিটা দেবার কথা—তিনিই বা কোথায়—

রেস্তারাঁর মধ্যে সুইংডোরটা ঠেলে প্রবেশ করল মীনাক্ষী।

বহু নরনারী রেস্তারাঁয় কেউ আহার করছে, কেউ চা বা কফি পান করছে—ওয়েটারবা চারিদিকে কর্মব্যস্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফ্যালফ্যাল্ করে এদিক ওদিক তাকায় মীনাক্ষী।

এনাকোয়ারীতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসবে নাকি! ...হঠাৎ একজন বৃদ্ধ বেঁটে মত লোক পাশে এসে দাঁড়াল।

দামী সুট পরিধানে —মাথায় ফেল্ট্ ক্যাপ।

মুখে পাইপ।

কানের কাছে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলে, মিস্ লায়লা—

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের দিকে চমকে ফিরে তাকাল মীনাক্ষী।

হ্যাঁ—আপনি—

গুলাম আলি—আপনার চিঠিটা—বলতে বলতে একটা পেঙ্গুইন সিরিজের ক্রাইম নভেল এগিয়ে দিল লোকটা।

হাত বাড়িয়ে বইটা নেয়। চিঠির বদলে বই—কিন্তু কিসের চিঠি—কার চিঠি ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হয় না মীনাক্ষীর এবং সেই কথাটাই বোধ করি বলবার জন্য মুখ তুলে সামনে তাকায়।

কিন্তু সে ভদ্রলোককে কোথায়ও আশেপাশে দেখতে পায় না।

হাওয়ায় যেন উবে গিয়েছে আগন্তুক।

আশ্চর্য! গেল কোথায় লোকটা। কিন্তু সে কথাটাও ভাববার সময় পায় না মীনাক্ষী।

মাইকে তখন এনাউন্স করছে—৭০৭ বোরিংয়ের প্যাসেঞ্জারদের কাষ্টমসের দিকে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি টিকিট চেকিং কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়।

টিকিটটা চেকিং হয়।

এক সময় একে একে গিয়ে সব প্লেনে ওঠে।

৭০৭ বোয়িং বিরাট আকাশপাখী ঝাপসা আলোছায়ায় মধ্যে ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

এয়ার হোস্টেস্ দরজা খুলে একে একে যাত্রীদের স্বাগত জানায়।

সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা এক এক করে বিরাট সেই আকাশপাখী ৭০৭ বোরিংয়ের গহ্বরে প্রবেশ করে।

যথা সময়ে দরজা বন্ধ হলো।

ইঞ্জিন চালু হলো।

তারপর নড়ে উঠলো আকাশপাখী।

আকাশ মরাল ডানা মেলল মেঘলোকে।

এয়ার হোস্টেসের গলা শোনা যাচ্ছে Ladies & gentlemen ৭০৭ বোয়িং আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে এই আকাশ যাত্রায়—

কাচের জানালা পথে নীচের দিকে তাকাল।

রাতের কলকাতা শহর ক্রমশঃ বিলীয়মান। আর অসংখ্য যেন মাটির প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলছে।

মহানগরীতে যেন দীপান্বিতার উৎসব।

এতক্ষণ হাতের বইটা ধরাই ছিল —মনেও ছিল না যেন মীনাক্ষীর বইটার কথা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বইটার কথা।

বইটার পাতা উল্টাতেই পেল একখানা মুখ আঁটা খাম। কিন্তু খামের' পরে যে নাম ঠিকানা টাইপ করা সে ত অত্যন্ত পরিচিত।

মাত্র একদিন আগে ভিতরের চিঠিটা ও খামটা টাইপ করে সেই ত মিঃ দোশানীর টেবিলের'পরে রেখে এসেছিল।

পিকিংয়ের সঙ্গে একটা বিজনেস করেসপনডেন্স।

আসাম টি গার্ডেনস্ থেকে চা যাবে পিকিংয়ের একটা বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে, তারই সব প্রয়োজনীয় কথাবার্তা।

এ চিঠিটা এমন কি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপুর্ণ যে তাকে এভাবে পাঠানো হলো চিঠিটা পৌঁছে দেবার জন্য!

অনায়াসে যে চিঠিটা ডাকে আসতে পারত— সে চিঠিটার জন্য তাকে রাতারাতি স্পেশাল এলাউন্স্ দিয়ে অন্যের পরিচয়ে প্লেনে পাঠাবার এমন কি প্রয়োজন ছিল।

॥ ১৪ ॥

কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় মীনাক্ষী।

সে মীনাক্ষী রায়—লায়লা বানুর পরিচয় নিয়ে বম্বে চলেছে।

ব্যাগ থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করল মীনাক্ষী।

আশ্চর্য!

লায়লা বানু যেন অবিকল সে। লায়লা বানু ও মীনাক্ষী রায় যেন যমজ দুটি বোন। এমনটা কেমন করে হয়—কেমন করে সম্ভব!

অন্যমনস্কভাবে টাকার খামটা খোলে —নতুন আনকোরা একেবারে একশ টাকার নোট—কি খেয়াল হয় নোটগুলো গুণতে গিয়ে রেখে যা দেবার কথা ছিল তাত নয়—তার চাইতে যে অনেক বেশী টাকা।

হাজার টাকা। কড়কড়ে হাজার টাকার নোট, একশ টাকার দশখানা নোট।

মীনাক্ষীর গুণতে ভুল হয় নি ত?

আবার সে গুণল—বার বার তিনবার গুণল—নাঃ ভুল হয় নি—পুরো হাজার টাকাই আছে।

কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে মীনাক্ষীর।

কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কোথা থেকে একটা সংশয় আর সন্দেহের ধোঁয়া যেন মনের মধ্যে ক্রমশঃ জমাট বেঁধে উঠছে।

আগাগোড়া আজ গত দুমাসের সমস্ত ব্যাপারগুলো যেন একটার পর একটা মনের পাতায় ভেসে উঠতে থাকে।

চারশোটাকা মাইনের পার্টটাইম চাকরি—তাও যেন কতকটা সেধেই তাকে দেওয়া হয়েছে—

তারপর সেই ছোট কলকাতার অফিসটা—বিচিত্র ঘনশ্যাম—চন্দ্রকান্ত—এবং মিঃ ফার্গুসন লোকটা—এবং সর্বশেষে আজকে আর একজনের পরিচয়ে এয়ার হোসটেস্ সেজে একটা বিচিত্র চিঠি নিয়ে delivery দেবার ব্যাপার, যেজন্য তাকে কড়কড়ে নগদ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

কেমন যেন এতক্ষণে ভয় ভয় করতে থাকে মীনাক্ষীর।

অজ্ঞাতে একটা ভয় যেন মাকড়শার মত রোমশ পা ফেলে ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে যেন গ্রাস করতে উদ্যত। চোখ দুটো বোজে মীনাক্ষী, আর এক সময় আবার ভয়ে ভয়ে চোখ খোলে।

চারিদিকে একবার চোখ বোলাল মীনাক্ষী—সব প্যাসেঞ্জারই প্রায় যে যার আসনে নিজেকে ঘুমের মধ্যে এলিয়ে দিয়েছে।

ঘুম নেমে এসেছে প্লেনের মধ্যে।

মীনাক্ষীর চোখে কিন্তু ঘুম আসে না।

মাথার মধ্যে একটা চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে। একটা দুঃশ্চিন্তার ঝড়। একটা ভয়ের ঝড়।

রাত প্রায় পৌনে বারটায় বিমান এসে বোম্বাই বিমান ঘাঁটিতে ল্যান্ড করল।

দেড় ঘন্টা বাদে আবার বিমান উড়বে।

সব যাত্রীই নামে—মীনাক্ষীও নামে।

বিমান ঘাঁটির লাউঞ্জে—যাত্রীরা সব এসে জড়ো হয়—তারপর যে যার টিকিট নিয়ে টিফিনের জন্য রেস্তোরাঁয় গিয়ে প্রবেশ করে।

মীনাক্ষী কি করবে বুঝতে পারে না।

এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে—একজন বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল ঃ মিস্ লায়লা বানু—

Yes—

চমকে মুখ তুলে তাকাল মীনাক্ষী লোকটার দিকে।

May I have a look in your book–

বোকার মতই যেন মীনাক্ষী হাতের পেঙ্গুইন ক্রাইম নভেলটা চিঠিটা সমেত বৃদ্ধের হাতে তুলে দেয়।

Thanks

বৃদ্ধ বইটা হাতে করে রেস্তারার দিকে চলে গেল।

দূরে সেই সময় একটা ক্যামেরার ফ্ল্যাস বালব জ্বলে উঠল ক্লিক্ করে।

যেমন কথা ছিল—ঠিক তেমনি শেষ রাত্রের দিকে আবার ভাইকাউন্টে মীনাক্ষী কলকাতায় ফিরে এলো বোম্বাই এয়ারপোর্ট থেকে।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ঢুকতেই ড্রাইভার মনসুরের সঙ্গে দেখা।

মেমসাব গাড়ি এনেছি—

মীনাক্ষী মুহূর্তকাল কি যেন ভাবে। তারপর এগিয়ে ফার্গুসনের সাদা গাড়িটায় উঠে বসে।

গাড়ির পিছনে ঝিম্ দিয়ে বসেছিল মীনাক্ষী।

মনসুর নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিল।

মেম্ সাব—সাহেব আপনাকে সোজা হোটেলে যেতে বলেছে—মনসুর এক সময় মৃদু কণ্ঠে বলে।

মীনাক্ষীর একবার ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করে কেন? কিন্তু কি ভেবে জিজ্ঞেস করে না কথাটা—চুপচাপ বসে থাকে।

তাছাড়া এই বিচিত্র বেশও তাকে ছাড়তে হবে।

তার শাড়ি হোটেলেই রয়েছে। হোটেলে একবার যেতে হবেই। তাছাড়া কতকগুলো কথা স্পষ্টাস্পষ্টি তার আজ মিঃ ফার্গুসনকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন।

যে অজ্ঞাত আশংকাটা বুকের মধ্যে কাল রাত থেকে ছায়া ফেলেছে—সেটারও একটা মীমাংসা হওয়া আশু প্রয়োজন।

টাকার অঙ্কটারও মীমাংসা করা দরকার।

সব চাইতে বড় কথা—এই চাকরির ব্যাপারটাই যেন গতকাল থেকে মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ও আশঙ্কার কালোছায়া ফেলেছে।

যদিও সে বুদ্ধি ও সহজ বিবেচনায় চাকরির মধ্যে দোষনীয় কিছু খুঁজে পাচ্ছে না, তবু এই চিঠি নিয়ে অন্যের ছদ্ম পরিচয়ে—মিথ্যে আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে বোম্বাই এয়ারপোর্ট যাওয়ার ব্যাপারটা যেন গতকাল থেকেই মনের মধ্যে বিশ্রী খচ্‌খচ্ করে একটা কাঁটার মত বিঁধছে।

ভাল লাগছে না। মোটেই ভাল লাগছে না।

সোজা গাড়ি হোটেলের সামনেই এসে দাঁড়াল এবং মীনাক্ষী গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে গিয়ে প্রবেশ করে।

সেই ১১৯ নং ঘর।

নক্ করতেই দরজায়—গত রাত্রির মতো আহ্বান এলো Come in—

মীনাক্ষী ঘরের মধ্যে পা দেয়—

একাকী মিঃ ফার্গুসন ঘরের মধ্যে বসেছিল—আহ্বান জানায়— Good afternoon Miss Ray, you look tired– এক কাজ কর have an wash first-- যাও বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও—আমি তোমার জন্য কিছু tiffin ও চায়ের কথা বলে—

না মিঃ ফার্গুসন চায়ের বা tiffin-এর দরকার নেই—তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে— সোজা একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল মীনাক্ষী ফার্গুসনের।

কথা!

হ্যাঁ—

প্রথমেই ব্যাগ থেকে টাকা সমেত খামটা বের করল মীনাক্ষী এবং খামটা ফার্গুসনের সামনে ধরে বললে, এর মধ্যে হাজার টাকা আছে—

হ্যাঁ—

তাহলে তুমি জানতে?

নিশ্চয়ই। আমিই ত টাকাটা রেখেছি ওর মধ্যে—

কিন্তু হাজার টাকা কেন?

তোমার প্রয়োজন আছে আমি জানি, তাই টাকাটা দিয়েছি—

কিন্তু—

শোন মিস রয়। Dont't get excited—তাছাড়া আমি জানি তোমার মনের মধ্যে এই মুহূর্তে কি হচ্ছে, বোস—be seated please.

মিঃ ফার্গুসন—

মিস্ রয়—একটা বিশেষ কথা যা তোমাকে আমি বলতে চাই sentimentয়ের দাম আছে নিশ্চয়ই কিন্তু বাস্তব জীবনে ঐ sentiment সময় সময় যে আমাদের কত বড় ক্ষতি করে—

বাধা দিল মীনাক্ষী। বললে, শুনুন মিঃ ফার্গুসন—আমারও আজ একটা কথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে—

কি মনে হচ্ছে—

আমার চাকরির ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন অস্পষ্ট—ধোঁয়াটে—সামান্য পার্টটাইম করেসপণ্ডেন্ট ক্লার্ক—তার জন্য চারশ টাকা করে মাইনা—তারপর এই ভাবে একটা মিথ্যা personification-এ একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য এতগুলো টাকা—no excuse me মিঃ ফারগুসন—আমি ঠিক—

বুঝে উঠতে পারছো না ত!

হ্যাঁ—

কিন্তু এতে না বোঝার কি আছে—better we should be frank to each other now—দু'জনার কাছেই দু'জনার আমাদের বোধ হয় আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার। অবিশ্যি you are right—তোমার মনে দ্বিধা সন্দেহ জাগতে পারে, খুব natural। আর সেটাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কথাটা তোমাকে তাহলে খুলেই বলি শোন—

মীনাক্ষী মিঃ ফারগুসনের মুখের দিকে তাকায়।

॥ ১৫ ॥

মিঃ ফার্গুসন বলতে থাকে ঃ

বাইরে থেকে আমাদের কাজটা মানে আমাদের অফিসের কাজ খুব সহজ simple মনে হলেও ব্যাপারটা অত কিন্তু সহজ বা simple নয়—ভিতরে অনেকটা গুরুত্ব আছে—তাই আমরা আমাদের চিঠিপত্রের জবাব ও করেসপনডেনসের ব্যাপারে এমন একজনকে খুঁজেছিলাম—যার 'পরে আমরা rely করতে পারি—বিশ্বাস করতে পারি—সে জন্য মাইনাও এক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশী দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সে রকম কাউকে কিছুতেই পাচ্ছিলাম না—তারপর একদিন মিঃ কুলকারনীর অফিসে তোমাকে আমি দেখি—and you impressed me. মিঃ কুলকারনীকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করি—he had highly spoken about you. তোমার সম্পর্কে দেখলাম তার খুব উঁচু ধারণা—

মিঃ ফারগুসন একটু থেমে আবার বলতে লাগল ঃ

তবু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমি select করিনি—I kept an eye on you—দেখলাম যখন তোমার 'পরে আমরা নির্ভর করতে পারি তখনই তোমাকে আমরা মনোনীত করেছি। বুঝতেই পারছো ঐ মাইনায় অনেক ছেলে বা মেয়েই আমি পেতে পারতাম আর পেয়েছিলামও কিন্তু তার মধ্যে থেকে মনে হলো তুমিই উপযুক্ত—তাই তোমাকেই আমি বেছে নিলাম। একথাও নিঃসংকোচে বলব তোমাকে বেছে আমি ঠকিনি। বিশেষ করে কালকের কাজটা তুমি যে ভাবে করে এসেছো—তাতে করে বুঝেছি আমার মনোনয়ন ভুল হয়নি—তোমার 'পরে আমরা অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতে পারব—

মনের মধ্যে এতক্ষণ যে বিরূপ ভাবটা মীনাক্ষীর জমাট বেঁধে উঠেছিল সেটা ফার্গুসনের কথায় একটু একটু করে লোপ পেতে থাকে।

—কিন্তু, আমি—তবু যেন সংশয়ের পীড়নটা মন থেকে যায় না মীনাক্ষীর একেবারে মুছে।

মিঃ ফার্গুসন বলেন, তবু বোধহয় তোমার মনে একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে তাই না—মৃদু হেসে ফার্গুসন বলে আবার—

Well my child—আমার পরে তুমি বিশ্বাস রাখ—তোমার ক্ষতি হয় এমন নিশ্চয়ই আমি কিছু হতে দেব না—যাও—আজ—আর নয়। আজ তুমি ক্লান্ত—তাছাড়া কিছুটা excited ও—

মীনাক্ষীকে যেন কতকটা জোর করেই মিঃ ফার্গুসন হস্টেলে পাঠিয়ে দেয়।

কিন্তু তারপর দুটো দিনও গেল না—মনটা তখনো মীনাক্ষীর শান্ত হয় নি—সংশয়ের পীড়নটা তখনো মনের মধ্যে চলেছে।

আবার ডাক এলো এক সন্ধ্যায় হোটেলের ১১৯ নং ঘর থেকে।

সেই ১১৯নং ঘর।

আজও মিঃ ফার্গুসন একাই ঘরে ছিল! ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, বোস—কথা আছে—আগে বল তোমার পার্থর খবর কি?

ভাল, rapidly improving.

Good. Any drink?

No thanks.

তারপরেই মিঃ ফার্গুসন বলে ঃ

শোন—মিস্ রয়, আমরা তোমাকে দু-একদিনের মধ্যেই দিল্লী পাঠাচ্ছি—

দিল্লী—যেন চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

হ্যাঁ—

কিন্তু —আমার চাকরি—

ও চাকরিতে তুমি resign দাও—

Resign দেবো!

হ্যাঁ—তোমাকে আমরা এবার থেকে হাজার টাকা মাইনা ও ফার্নিসড় কোয়ার্টার দেবো—

বলে কি—হাজার টাকা মাইনা—ফার্নিসড় কোয়ার্টার—

ভাবছো হয়ত কি আমি বলছি মিস্ রয়—তাই না? শোন—দিল্লীর গভর্নমেন্ট হাইসার্কেলের সঙ্গে যাতে তোমার যোগাযোগ ঘটে—সেই ব্যবস্থা আমরা করব—

কিন্তু কেন?

বুঝতেই পারছো business market-এ আজকাল কি দারুণ compitition. তাই এ দেশে business-এ prosper করতে হলে হাইসার্কেলের সমস্ত সংবাদের ব্যাপারে আমাদের সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। We must be upto-date. আর সেটা সম্ভব হবে তুমি যদি ওদের সঙ্গে freely মিশবার সুযোগ পাও। অবিশ্যি সে সুযোগ আমরাই তোমাকে করে দেবো—

তবু যেন মীনাক্ষীর মনে হয় ব্যাপারটা ধোঁয়াটে।

কেমন ঝাপসা—হাজার টাকা মাইনা—ফ্রি ফার্নিসড় কোয়ার্টার—দিল্লীতে অবস্থান—Government high circle-এ মেলামেশা—একটা দ্বিধা একটা সন্দেহ যেন মনের কোথায় অদৃশ্য একটা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে বিঁধতে থাকে মীনাক্ষীর।

মন যেন সহজ ভাবে সায় দেয় না।

আমাকে দুটো দিন ভাবতে দাও মিঃ ফার্গুসন—ক্ষীণকণ্ঠে কোনমতে বলে মীনাক্ষী।

ভাবতে চাও ভাবতে পার—কিন্তু ভাবনার কিছুই নেই জেনো—listen মিস রয়—সুযোগ মানুষের জীবনে হামেশাই যখন তখন আসে না। এবং সেই সুযোগ আসা সত্ত্বেও যারা তাকে avail করতে পারে না তাদের আমি বোকাই বলব—fools—nothing but fools. Just think—ভেবে দেখো তোমার মত একজন মেয়ের জীবনে এটা সামান্য সুযোগ নয়—rather you could say a golden chance. তাছাড়া তুমি জীবনে বড় হতে চাও না—prosperity—money—comforts চাও না তুমি?

মীনাক্ষী চুপ করে থাকে।

কথা বলতে বলতে ফার্গুসন উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। মীনাক্ষী বসে থাকে।

ফার্গুসন বলতে থাকে, তাছাড়া আমি ত জানি তোমার অনেক টাকার দরকার—for yourself এবং তোমার পার্থপ্রতীমের জন্য—

পার্থপ্রতীম—

হ্যাঁ—পার্থপ্রতীমের জন্য—তার অপারেশন successfull হয়েছে—কিছুদিনের মধ্যেই তাকে তুমি hill station বা sea side-এ পাঠাতে চাও না?

হ্যাঁ—চাই কিন্তু আপনি আপনি এসব কথা জানলেন কি করে—

I know— আমি সব জানি! তুমি তাকে কি রকম ভালবাস—সে তোমাকে কি রকম ভালবাসে—কেমন করে তুমি তাকে দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তুলেছো—তোমার বুকভরা ভালবাসা দিয়ে অর্থ দিয়ে— I know everything—I Know your dreams my child—আমি—জানি তোমার স্বপ্ন আর এও জানি টাকার জন্য তুমি কি ভাবে জড়িয়ে পড়েছো—তাই বলছিলাম—আজ এমন একটা সুযোগ পেয়ে যদি তাকে তুমি ছেড়ে দাও— তোমাকে আমি বোকাই বলব—যাক্ গে—তুমি সময় চাইছিলে—ভেবেই দেখ তুমি দুটো দিন না হয়—দু'দিন ভেবেই না হয় জবাব দিও—but not more than two days— দু'দিনের বেশী নয়—দু'দিন you can go to day— আজ যেতে পারো—

হোটেল থেকে বের হয়ে এলো মীনাক্ষী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই—চারিদিকে শহরের আলো জ্বলে উঠেছে। হাঁটতে শুরু করে কিন্তু হাঁটতেও ভাল লাগে না—একটা ট্যাক্সী ডেকে তাতেই উঠে বসে।

হোস্টেলে এসে দুটো চিঠি পেল মীনাক্ষী।

একটা তার সহকর্মী ও বান্ধবী সরমা লিখেছে ঃ

পার্থকে ভেলোরে পাঠাবার সময় সে সাড়ে তিনশ টাকা ধার নিয়েছিল সরমার কাছ থেকে। সরমার বাবা অসুস্থ—অতএব তার টাকাটা এখন বিশেষ প্রয়োজন—যদি সে টাকাটা দেয় ত বড় উপকার হয় তার—

দ্বিতীয় চিঠিটা পার্থর।

পার্থ লিখেছে ঃ

আমার ষ্টিচ্ কেটে দিয়েছে ক্যামেলিয়া—একটু একটু করে আবার হাঁটছি। ওজনেও বেড়েছি—তুমি হয়ত দেখলে আমায় চিনতেই পারবে না আজ।

এখন মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি—আর যেন দেরি সইছে না। মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি হিল স্টেশান যাবো তত তাড়াতাড়ি যেন সেরে উঠবো। সুস্থ হয়ে উঠবো আর তত তাড়াতাড়ি তোমাকে পাবো।

নৈনিতাল যাবার কথা বলেছিলে—তাইত ঠিক না?

সত্যি কথাটা ভাবতেও যে কি আনন্দ হচ্ছে!

আমি যখন সেখানে থাকবো তুমি নিশ্চয়ই আসবে—দু'জনে লেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৌকায় ভাসব, কেমন?

তোমার লেখা গানটায় যেটায় আমি সুর দিয়েছি তুমি গাইবে—কেমন—

॥ ১৬ ॥

অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিটা পড়তে পড়তে বাইরের দিকে তাকাল খোলা জানালা পথে মীনাক্ষী।

আকাশটা চমৎকার নির্মেঘ।

শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্র আসছে—তার মানেই আশ্বিন—আশ্বিনেই ত এবারের পুজো।

পুজোর আগেই মনে মনে স্থির করে রেখেছে মীনাক্ষী পার্থকে নৈনিতাল পাঠিয়ে দেবে এবং পুজোর ছুটিটা সেখানে গিয়ে সে কাটাবে।

মুহূর্তের জন্য যেন সব ভুলে যায়—মন থেকে সব মুছে যায় মীনাক্ষীর।

মীনাক্ষী স্বপ্ন দেখে।

অখণ্ড আনন্দ—

সেই আনন্দেরই যেন আগমনী সুর আকাশে বাতাসে।

হ্যাঁ—পার্থকে বাঁচতে হবে—আবার তাকে নীরোগ সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠতে হবে।

দু'জনে তারা আনন্দের একটি ঘর বাঁধবে।

সেখানে আর কেউ নয় শুধু সে আর পার্থ। পার্থ আর সে।

এবং সেজন্য প্রয়োজন অর্থের।

টাকা তার চাই—

টাকা না হলে সে বাঁচতে পারবে না। সে বাঁচতো পারবে না—পার্থকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না।

অতএব আর কোন দ্বিধা নেই—চাকরি সে নেবে।

কেন নেবে না চাকরিটা! কোন অন্যায় ত করছে না সে—কোন পাপও করছে না, তবে কেন চাকরিটা নেবে না।

মনটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে যায় মীনাক্ষীর।

কাপড়-জামা ছেড়ে স্নান করতে চলল সে বাথরুমে। পথে হোস্টেলের লেডি সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা।

এই যে মীনাক্ষী—এ মাসও ত শেষ হতে চলল—হোস্টেলের ডিউসটা এবারে দেবার ব্যবস্থা কর। বুঝতেই ত পারছো গভর্ণমেন্ট হোস্টেল—তিনমাস অন্তর একাউন্টস্ অডিট হয়—

আমি আজই আমার সব dues মিটিয়ে দেবো লাবণ্যদি। আপনি যান আপনার ঘরে আমি আসছি, মীনাক্ষী বলে ফেলে।

ভাল খুব ভাল—বুঝতেই ত পারছো আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে—

টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে আসে সর্বাগ্রে।

তারপর স্নান করে এসে এক কাপ চা পান করে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নেয় মীনাক্ষী এবং ঘন্টা দুই একটা টানা ঘুম দিয়ে যখন উঠে বসল বেশ রাত হয়েছে—আকাশে মেঘ—শ্রাবণ আকাশ বিষণ্ণ।

সব ধার—যেখানে যা আছে সব শোধ করে দেবে মীনাক্ষী।

ব্যাগ থেকে টাকার খামটা বের করল।

কড়কড়ে হোটেলের দেনা মিটিয়েও এখনো ব্যাগের মধ্যে আটশ টাকা আছে।

মনে মনে হিসাব করে মীনাক্ষী কোথায় তার আর কত ধার আছে।

কিন্তু সব ধার শোধ দিতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তা না থাকুক—সে যখন মনে মনে স্থির করে ফেলেছে মিঃ ফার্গুসনের প্রস্তাবটাই গ্রহণ করছে তখন আর চিন্তা কি।

দিল্লীতে মোটা মাইনা।

পরের দিন অফিসের পরে মরিসন অফিসে যেতেই দোশানীর ঘর থেকে ডাক এলো। এবং মীনাক্ষী কোন কথা বলবার আগে দোশানীই কথাটা তুলল, দু-একটা কাজের কথার পর—শুনলাম মিস্ রয়, মিঃ ফার্গুসন তোমাকে better offer দিয়েছে—

হ্যাঁ—

তা তুমি কিছু স্থির করলে নাকি?

হ্যাঁ—ঠিক করেছি—

কি?—দোশানী মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকায় তার দু'চোখে যেন জ্বলন্ত আগ্রহ।

তার offer accept করবো—

Very good—

মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে তোমার দেখা হলে কথাটা আমার জানিয়ে দিও মিঃ দোশানী—

নিশ্চয়ই—

পরের দিনই মিঃ দোশানী মীনাক্ষীকে অফিসে ডেকে বললে, মিঃ ফার্গুসন হঠাৎ বম্বে চলে গেল—তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তোমার সম্পর্কে। তুমি তাঁর offer-টা accept করেছো বলে সে অত্যন্ত খুশি হয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে আজ থেকেই তোমার নতুন চাকরিতে join করতে পার—

আজ থেকেই—

Why not—

কিন্তু অফিসে জানাতে হবে ত আমাকে—

সে জন্য এখন তোমাকে ভাবতে হবে না। মিঃ ফার্গুসন বলেছে আমাকে যেমন তুমি কাজ করছো এখন আপাততঃ তেমনি কাজ করে যাও সেখানে—ইতিমধ্যে দিল্লীর সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে তুমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেও শুধু ইতিমধ্যে এক মাসের নোটিশ দিয়ে রাখ তাদের—

মীনাক্ষী ঘাড় নেড়ে বলে, তাই হবে।

দোশানীর পরামর্শ মত পরের দিনই অফিসে গিয়ে একমাসের নোটিশ দিয়ে দিল মীনাক্ষী। এবং ধারও যেখানে যা ছিল শোধ করে দিল। হাত অবিশ্যি খালি হয়ে গেল আপাততঃ, তা হোক। এখন ত আর টাকার ভাবনা নেই—।

এক মাস দেখতে দেখতে চলে গেল।

ওদিকে পার্থকেও ভেলোর থেকে ছুটি দিয়েছে - সেও ডাঃ সর্বাধিকারীর ব্যবস্থা মত নৈনিতালে চলে যায়।

ডাক্তার বলে, মীনাক্ষীর ঐ সময়কার ডাইরীটা পড়লে বোঝা যায় ওর মনের মধ্যে তখন বিচিত্র একটা দ্বন্দ্ব চলেছে।

একদিকে পার্থ আর একদিকে তার স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি। একদিকে ভালবাসা, কর্তব্য পার্থর প্রতি, অন্য দিকে একটা সংশয়ের নিরন্তন পীড়ন।

মেয়েটা যেন সত্যিই একটা দোটানায় পড়েছিল।

॥ ১৭ ॥

সত্যিই তাই—মীনাক্ষীর ইচ্ছে করে সব কথা খুলে লেখে পার্থকে কিন্তু আবার কি ভেবে কোন কথাই লেখে না।

মনে ভাবে—না এখন না। যখন দেখা হবে তখন surprise দেবে। চমকে দেবে পার্থকে তাছাড়া এত তাড়া হুড়াই বা কি আছে—পার্থ নৈনিতালে গিয়েছে সেখানে মাস তিন চার থাকতে পারলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

তবে ইতিমধ্যে তাদের বিয়েটা এবার সেরে ফেলতে হবে।

সত্যিই ত বয়স ত কম হলো না তাদের—আর কবেই বা তারা বিয়ে করবে!

চাকরির ব্যাপারে দিল্লীতে যদি একান্তই থাকতে হয় ত থাকতেই হবে—উপায় কি। নচেৎ এখানে থাকলে কলকাতার বাইরে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নেবে।

ছোট বাড়ি—সামনে একটু বাগান।

শহরের ব্যস্ততা, গোলমাল, ধুলোবালি নেই—বরং খানিকটা গ্রাম্য শান্ত পরিবেশ।

পার্থকে কাজ করতে দেবে না সে।

আর কি হবেই বা পার্থকে কাজ করতে দিয়ে—সেই ত কাজ করছে—মোটা মাইনা পাচ্ছে—তাদের প্রয়োজনের চাইতেও ত অনেক বেশী—

দু'জন তারা—

আরো একজনকে অবিশ্যি কামনা করে মীনাক্ষী।

একটি শিশু।

টুলটুলে ফুলের মত শিশু। চাঁদের মত মুখখানি। মাখনে গড়া গোল গোল নরম তুলতুলে হাত-পা।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াবে।

হোস্টেলে নিজের ঘরে বসে আপন মনেই স্বপ্নজাল রচনা করে চলেছিল মীনাক্ষী—হোস্টেলের ভৃত্য নন্দন এসে বললে, দিদিমণি আপনার ফোন—ট্রাঙ্ক-কল—

ট্রাঙ্ক-কল! কোথা থেকে? মীনাক্ষী রীতিমত বিস্মিত হয় যেন।

তা ত জানি না, তবে বড়দি বললেন—

চল—আসছি—

মীনাক্ষী দোতলায় গিয়ে ফোন ধরল। কে আবার তাকে ট্র্যাঙ্ক-কল করতে পারে!

হ্যালো—

কে—মিস মীনাক্ষী রায়?

গলাটা যেন চেনা চেনা—অথচ ঠিক চিনে উঠতে পারে না মীনাক্ষী।

বলে হ্যাঁ—

তারপরই শোনা গেল, ক্যামেলিয়া—আমি—

কে?—চমকে ওঠে মীনাক্ষী—পার্থ—

হ্যাঁ—কি করছো?

কিন্তু তুমি, তুমি-এসময় কোথা থেকে?

কেন নৈনিতাল থেকে—

তোমার ওখানে কি ফোন আছে নাকি?

না—

তবে?

এখানকার এক হোটেলে বেড়াতে এসেছিলাম—তোমার কথা হঠাৎ মনে পড়তে লাগলো হোটেলের খোলা বারান্দায় বসে লেকের দিকে চেয়ে চেয়ে। মনে হলো এখন ত তুমি হোস্টেলেই আছো—তোমায় একটা ফোন করি না কেন—কী করছো ক্যামেলিয়া—

স্বপ্ন দেখছিলাম—

স্বপ্ন দেখছিলে!

হ্যাঁ গো—মিষ্টি করে বলে মীনাক্ষী।

কি স্বপ্ন দেখছিলে ক্যামেলি?

বলব না তো।

বলবে না?

না—

কেন?

স্বপ্নের কথা বুঝি বলে কেউ এমনি করে ফোনে?

তবে—কেমন করে বলে?

পাশাপাশি বসে কাঁধে কাঁধ রেখে, দুটি চোখ বুজে কানে কানে—

সত্যি—

সত্যি—সত্যি—

কিন্তু তুমি আসছো না কেন? কতদিন তোমাকে দেখি না বলত?

কতদিন দেখ না?

অনেক—অনেক দিন—যেন একটা যুগ—কবে আসছো বলো—

শিগ্‌গিরী যাবো—

পরের দিন অফিসে মীনাক্ষী মিঃ দোশানীকে বলে, সে কিছুদিনের ছুটি চায়—

দোশানী বলে, নিশ্চয়ই—কবে থেকে ছুটি চাও বল?

কাল থেকে—

নৈনিতাল যাবে বুঝি?

হ্যাঁ—

কিন্তু টিকিটের ব্যবস্থা করেছো? রিজার্ভেশন কি পাবে?

না পাই থার্ড ক্লাশে যাবো।

তা কি হয়—ঠিক আছে—You don't worry—get yourself ready—তোমার টিকিট ও রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা অফিসই করবে।

পরের দিন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে সত্যি সত্যিই দেখলো মীনাক্ষী একটা ফাষ্ট-ক্লাশ বার্থ তার নামে রিজার্ভ করা রয়েছে।

ঘনশ্যাম তার আগেই এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিল—ওকে দেখে এক গাল হেসে একটা মুখবন্ধ খাম ওর হাতে তুলে দেয়—আ—আপনার টি—টিকেট—

খামটা হাতে নিয়ে মীনাক্ষী গাড়িতে উঠে বসে, খুব কম সময়ই ছিল—একটু বাদে গাড়ি ছাড়ল।

চারটি বার্থের নীচের দুটি বার্থে দু'জনে সে ও একজন মহিলা—উপরের দুটি বার্থে কলেজের ছাত্রী।

তারা লক্ষ্ণৌ যাবে।

খামটার ভিতর থেকে টিকিট বের করতে গিয়ে মীনাক্ষী দেখে—শুধু টিকিটই নয়—সেই সঙ্গে শ পাঁচেক টাকাও আছে।

আর আছে মিঃ দোশানীর একটা চিঠি ঃ ছোট্ট চিঠি।

॥ ১৮ ॥

দোশানী লিখেছে :

মিঃ ফার্গুসনের নির্দেশানুযায়ী তোমাকে সামনের মাসের মাইনার কিছু এ্যাড্‌ভান্স এই সঙ্গে দেওয়া হলো। তোমার যদি টাকার দরকার হয়, ছুটি উপভোগ করতে যাচ্ছো—টাকার প্রয়োজন হতে পারে। তোমার ছুটি আনন্দময় হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি—

—দোশানী।

আজকাল অফিসের ব্যাপারটা যেন অনেকটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে মীনাক্ষীর। আজকাল মনের মধ্যে আর খুঁত খুঁত করে না।

নানা কথাও মনে হয় না।

মন যেন অনেকটা মেনে নিয়েছে।

অনেকটা পথ—সুটকেশের মধ্যে খামটা রেখে দিয়ে জানালার ধারে এসে বসল মীনাক্ষী।

অনেকটা পথ।

লক্ষ্ণৌ—তারপর কাঠগুদাম—সেখান থেকে বাসে নৈনিতাল।

কাঠগুদাম থেকে নৈনিতাল যেতে বাসে সমস্ত পথটা যেন একটা বিচিত্র আনন্দ অনুভব করে মীনাক্ষী।

একটা ছোটোখাটো পাহাড়ের উপরে নৈনিতালে ডাঃ সর্বাধিকারীর মক্কেলের বাড়িটা।

আশ্বিনের রৌদ্র ঝলমল আকাশ।

চারিদিকে পাহাড় ও তার গায়ে সবুজের সমারোহ—বাড়ির জানালা থেকে লেকটা দেখা যায়।

সামনের বারান্দায় একটা আরাম চেয়ারের উপর মিষ্টি রোদে গা এলিয়ে বসেছিল পার্থ।

নৈনিতালে এসে দিন পঁচিশের মধ্যেই তার চেহারা ও স্বাস্থ্যের যেন অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে।

পার্থ দূর থেকে মীনাক্ষীকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ায়।

চড়াই পথটা বেয়ে উঠে আসছে মীনাক্ষী।

ক্যামেলিয়া—চিৎকার করে ডাকে পার্থ।

পার্থ--

সামনে এসে মীনাক্ষী দাঁড়াতেই দু'বাহু বাড়িয়ে পার্থ মীনাক্ষীকে বুকে টেনে নেয়—ক্যামেলি—আমার ক্যামেলিয়া—

পার্থর বুকে মাথাটা ঘষতে ঘষতে বলে মীনাক্ষী. কী কবছো—এবারে ছেড়ে দাও, দেখছো না পিছনে কুলীটা কেমন হাঁ করে চেয়ে আছে—

উঃ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে—

বার বার কেবল ঐ কথাটাই বলতে থাকে পার্থ।

আর আমার হচ্ছে না বুঝি—কিন্তু কুলীটা যে রয়েছে—

থাকুক—

সত্যি please লক্ষ্মীটি—

পার্থ ছেড়ে দেয় অতঃপর মীনাক্ষীকে।

মীনাক্ষী কুলীকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বিদায় করে।

তারপর ওর পাশে এসে বসে।

দুজনা দুজনার মুখের দিকে তাকায়।

তৃপ্তির-আনন্দের হাসি দুজনার মুখে।

কি মনে হচ্ছে জান ক্যামেলিয়া?

কি?

এই মুহূর্তটির যেন শেষ না হয়—let it be eternal—

তারপর কটা দিন সে এক নিবিড় ঘন আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়।

ঘুমের মধ্যে যেন একটা মধুর স্বপ্ন।

কখনো পাহাড়ে পাহাড়ে, কখনো লেকের জলে নৌকোয়—দিনে দুপুরে—রাত্রে—যেন এক অখণ্ড আনন্দের সুর ওদের দু'জনকে ঘিরে গুন গুন করতে থাকে।

দশটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল কেউ জানতেও পারে না। এবং দশদিন পরে হঠাৎ মীনাক্ষীর কাছে এক জরুরী তার।

অফিসের তারবর্তা ঃ অবিলম্বে চলে এসো—

পার্থ শুধায়, কি হলো, কিসের তার?

অফিসের—

কি লিখেছে?

আজই রওনা হতে হবে—

আজই!

হ্যাঁ—

না—তুমি যেতে পারবে না ক্যামেলি—

সে কি!

হ্যাঁ—যাওয়া তোমার হবে না।

যাওয়া হবে না কি গো!

কি আবার চাকরি ছেড়ে দাও—রেজিগনেশন পাঠিয়ে দাও।

চাকরি ছেড়ে দেবো!

হ্যাঁ—

পাগল নাকি—

ওসব বুঝি না ক্যামেলি, চাকরি ছেড়ে দাও—যে চাকরি এমনি করে আমার কাছ থেকে আমার ক্যামেলিয়াকে কেড়ে নেয় সে চাকরি তোমাকে আমি করতে দেবো না।

তারপর?

তারপর আবার কি?

চলবে কেমন করে? তোমার এখানকার খরচ—আমার ওখানকার খরচ তাছাড়া এখনো এখানে তোমাকে মাস তিনেক অন্ততঃ থাকতে হবে—

তার কি প্রয়োজন আর। আমি তো সুস্থ হয়ে উঠেছি—

তা হয় না পার্থ! ডাক্তাররা যা বলেছেন সেই ভাবেই আমাদের চলতে হবে।

॥ ১৯ ॥

মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে পার্থর।

পার্থর পাশে এসে বসে মীনাক্ষী। ওর পশমের মত মসৃণ চুলে গভীর স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, অবুঝের মত কথা বলো না—তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ ঠিকই কিন্তু এখনো তোমার এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় আরো অন্ততঃ দু-তিন মাসের বিশ্রামের দরকার—

কিন্তু তুমি বুঝছো না ক্যামেলিয়া—

বুঝেছি—আর বুঝতে পারছি বলেই ত বলছি।

মুখে না বললেও আজ আর চাকরি ছাড়ার কথা ভাবতেই বুঝি পারে না মীনাক্ষী।

বিশেষ করে এখানে আসবার পর—রোগহীন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল উৎফুল্ল পার্থর মুখখানা দেখবার পর আজ আর তার পক্ষে চাকরি ছাড়বার কথা-আসতেই পারে না।

ভাবতেই পারে না কথাটা মীনাক্ষী।

জীবনের যে আনন্দ—জীবনেরও যে একটা অর্থ আছে—জীবনের শাখায় শাখায় যে মুকুল ফুটে উঠতে পারে এমনি করে এর আগে সে কোন দিনই ভাবতে পেরেছিল কি।

দারিদ্র্য, অভাব—টানাটানির সংসারের সঙ্গেই তার এ যাবৎকাল পরিচয়। এমনি করে জীবনের পাত্রকে সে ত উপচে পড়তে কোন দিনই দেখেনি।

সেই সুযোগ যখন এসেছে—বিধাতার অকৃপণ আশীর্বাদের মত কেন সে তাকে হেলায় হারাবে। না—সে ভোগ করবে।

প্রাণ ঐশ্বর্যের পেয়ালাকে চুমুক দিয়ে দিয়ে নিঃশেষ করবে।

এই ত জীবন।

এই স্বাচ্ছন্দ্য—এই আরাম—এই নিশ্চয়তা—এই আনন্দ—এই ত সত্যকার জীবন। কেন সে এ জীবন ত্যাগ করবে।

না।

কি ভাবছো ক্যামেলি—

কিছু না—বলছিলাম আর ২।৩ মাস সময় ত—দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তারপর থেকে শুধু আমরা—আমাদের আর কেউ আলাদা করতে পারবে না—

পার্থ কোন জবাব দেয় না—দূর রৌদ্রোজ্জ্বল লেকের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকে।

পার্থ!

উঁ!

কি ভাবছো?

কিছু না—

না তুমি ভাবছো—বল কি ভাবছো?

কেন জানি না ক্যামেলি—আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে—

কেমন যেন একটু শংকিত দৃষ্টিতেই প্রশ্নটা করে মীনাক্ষী পার্থর মুখের দিকে তাকায়।

ওর মনের কথাটা বুঝি মীনাক্ষী বুঝবার চেষ্টা করে।

কি বলতে চায় ও।

কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করে না। বরং স্মিতভাবেই বলে ভয় করছে কেন গো—

হ্যাঁ—

পাগল। কিছু ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে—

ঐ কথাটা বলে মীনাক্ষী আশ্বাস কি নিজেকেও নিজে দেয়!

সেই দিনই বিকেলে কলকাতার দিকে আবার রওনা হয় মীনাক্ষী।

কলকাতা পৌঁছবার আগে বর্ধমানেই একটা তার পেল সে ঃ হাওড়া স্টেশনে মনসুর গাড়ি নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবে। সে যেন স্টেশন থেকে সোজা গ্র্যাণ্ডে চলে আসে, মিঃ ফার্গুসন তার জন্য হোটেলে তার রুমে অপেক্ষা করবে।

মীনাক্ষী ঠিক যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

এত তাড়াহুড়া কিসের বুঝতে পারে না।

যা হোক হাওড়াতে নেমে তারের নির্দেশ মত সে ফার্গুসনের সেই অপেক্ষমান শাদা গাড়িতেই উঠে বসে।

সেই ১১৯ নং ঘর।

পরিচিত ঘর।

দরজায় নক্ করতেই ভিতর থেকে আহ্বান এলো, yes—come in. ভিতরে এসো—

মীনাক্ষী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল ঘরের মধ্যে একাকী মিঃ ফার্গুসন একটা সোফার মধ্যে বসে আছে।

এসো মিস রায়---বোস—you had a long journey—দীর্ঘ পথশ্রমে নিশ্চয় তুমি ক্লান্ত কিন্তু ব্যাপারটা বিশেষ জরুরী তাই সোজা ষ্টেশন থেকে তোমাকে এখানে চলে আসবার জন্য জরুরী তার করেছিলাম—কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন, বোস—

মীনাক্ষী সামনের সোফাটায় আস্তে আস্তে বসল।

কিন্তু তোমার ত আরো আগে এসে পৌঁছাবার কথা—এত দেরি হলো! তোমার ট্রেনটা কি লেট ছিল?

হ্যাঁ—প্রায় আড়াই ঘন্টা লেট।

যাক শোন, যে জন্য তোমাকে জরুরী তার করে কলকাতায় এত তাড়াতাড়ি ডেকে আনিয়েছি, তোমার নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী এবারে কাজ শুরু করতে হবে—সব তোমাকে কি করতে হবে না হবে details যে বলবো কিন্তু তার আগে পরিশ্রান্ত তুমি তোমার বিশ্রামের দরকার—তুমি ববং কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে নাও।

তবে আমি এখন হস্টেলে—

না, তার দরকার নেই এই হোটেলেই ১২০ নং ঘরটা তোমার জন্য বুক করা হয়েছে।

এই হোটেলে ১২০ নং ঘর?

হ্যাঁ-

কিন্তু—

শোন, এখন বেলা প্রায় দেড়টা বাজে—সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তুমি রেষ্ট নিতে পারবে।

রেষ্ট আমি পরে নেবো—আগে আপনি আমাকে কাজের কথাটা বলুন—

এখুনি শুনতে চাও?

হ্যাঁ—বলুন।

বেশ তবে শোন---আমাদের কাজের কথায় আসার আগে তোমাকে একটা ফটো দেখাতে চাই—

ফটো!

হ্যাঁ—এই যে দেখ—

বলতে বলতে মিঃ ফার্গুসন একটা খাম থেকে একটা ফটো বের করে সামনের টেবিলের ওপরে রাখল ওর সামনে।

মীনাক্ষী চেয়ে দেখলো ফটোটা একটি মধ্য বয়সী পুরুষের। বেশ মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা—গোলাল ভাবী মুখ। দাঁড়ি গোফ নিখুঁত ভাবে কামান।

পরিধানে সুট।

চেনো ওকে? দেখেছো কখনো?

না--

চিনে রাখ ভাল করে—ওই ফটোটা হচ্ছে মিঃ লোহিয়ার—যাক শোন—

মীনাক্ষী চেয়ে থাকে ফার্গুসনের মুখের দিকে।

মিঃ আর, লোম্যান—ইনডিয়ান ক্রিশ্চান—অত্যন্ত influential M.P—

কেমন যেন বোবা—বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মীনাক্ষী ফার্গুসনের মুখের দিকে। বলছেন M.P. লোম্যানের কথা—অথচ লোহিয়ার ফটো তাকে দেখান হচ্ছে কেন কিছুই মাথামুণ্ড যেন বুঝে উঠতে পারছে না মীনাক্ষী।

ফার্গুসন বলতে থাকে, ওরই পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে পার্টি, মানে আজ একটা ডিনার আছে। অনেক ফরেন ডিপ্লোম্যাটস আসবে ঐ ডিনারে—আর আসবেন defence minister-এর ডেঃ সেক্রেটারী মিঃ লোহিয়া। ঐ ফটো যাঁর—I hope you understand me—

না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ ফার্গুসন তোমার কথা—

মিঃ ফার্গুসন প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলো, তারপর বললে বুঝতে পারছো না—না—শোন ঐ ডিনারে ড্রিংকের ব্যবস্থা ত আছেই আর আছে—কিছু নাচগানের—আমি জানি you sing very well—তুমি চমৎকার গান গাইতে পারো—

আমি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি—তোমাকে গান গাইতে হবে ঐ ডিনার পার্টিতে অবিশ্যি শুধু sweet voiceয়ের উপর তোমার আমি depend করছি না—I know Mr. Lohia—তাকে ত চিনি সৌন্দর্যের সে একজন real admirer—and you have a charming beauty—

এসব তুমি কি বলছো মিঃ ফার্গুসন—অত্যন্ত আপত্তিকর কথা—বলতে বলতে উত্তেজনায় প্রায় উঠে দাঁড়ায় মীনাক্ষী, মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে মীনাক্ষীর তখন।

ফার্গুসন বাধা দিয়ে বলে, বোস—বোস—dont' get excited—অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই—

মিঃ ফার্গুসনের গলাটা যেন হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা ও কঠিন মনে হয় মীনাক্ষীর।

চমকে ওঠে মীনাক্ষী যেন সে গলার স্বরে—হঠাৎ একটু থিতিয়েও বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই যায়—কিন্তু পরক্ষণেই বলে, আমি পারব না—

না।

কি পারবে না?

যা তুমি বলছো—

কিন্তু তুমি ত এখনো আমার কথা যা বলতে চাই সব শোনই নি—

কিন্তু—

শোন, ব্যাপারটা তুমি যা ভাবছো ঠিক তা নয়—আমি মানে আমাদের ফার্ম কতকগুলি আমাদের ব্যবসার পক্ষে প্রয়োজনীয় খবর ঐ লোহিয়ার কাছ থেকে জানতে চায়।

খবর!

হ্যাঁ—কিছু প্রয়োজনীয় খবর—

কথাটা পরিষ্কার করে বল!

পরিষ্কার করেই বলচি শোন, বলছিলাম আমাদের বিজনেসের সুবিধার জন্য—ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা—বিশেষ করে সীমান্ত প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যতটা সম্ভব news—মানে সংবাদ তোমাকে ঐ মিঃ লোহিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনতে হবে। কারণ বুঝতেই পারছো সীমান্ত প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যদি ভারতবর্ষ strong না হয় তাহলেই নানা গোলমাল দেখা দেবে ও ব্যবসারও মন্দা পড়বে—

কিন্তু?

হ্যাঁ শোন, আমি জানি ব্যাপারটা তুমি ম্যানেজ করতে পারবে, I mean তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে ব্যাপারটা কষ্টসাধ্য হবে না—

কিন্তু এসব তুমি কি বলছো মিঃ ফার্গুসন, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—আমি কেন ঐ সব কাজ করতে যাবো—আমি তোমাদের করেসপনডেন্স ক্লার্ক মাত্র—

তাই তুমি জান বটে কিন্তু আসলে কি তাই—

তবে কি?

অফিসের সব সিক্রেটইত তোমার হাত দিয়ে পাস্ করে—তাছাড়া—

তাছাড়া কি?

ভেবে দেখ তোমাকে যে মাইনা দেওয়া হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই কোন দেশে কোন অফিসেই একজন করেসপনডেন্স্ ক্লার্ককে দেওয়া হয় না—

কিন্তু—

তোমাকে অতগুলো করে টাকা আমরা মাস মাস দিচ্ছি—সে নিশ্চয়ই কতকগুলো চিঠি draft ও type করবার জন্য যে নয় সেটা আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো অনেক আগেই। আর যদি না পেরে থাকো তাহলে বলবো তোমার মত একজন বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে কথাটা বোঝা উচিত ছিল অন্তত—

মীনাক্ষী যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছে, কি বলবে বুঝতে পারে না। অতঃপর?

সব কিছু যেন হঠাৎ কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে।

শোন—Don't be sentimental—and don't be a fool! কোন অভাব তোমার থাকবে না—

পার্থকে বিয়ে করে যাতে তোমাদের happy ও easy going life হয় সে ব্যবস্থাও আমরা করবো। অবিশ্যি আমার কথা মত যদি তুমি চল। অবিশ্যি এও অস্বীকার করবো না শুধু efficiency-রই-প্রয়োজন নয় তোমার কাজে riskও আছে—কিন্তু সে জন্য তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই—আমরা আছি—

মাথার মধ্যে তখন ঘুরছে মীনাক্ষীর।

সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

এসব কি সে শুনছে।

না—না—এ অসম্ভব—এ সে পারবে না—উঠে দাঁড়ায় মীনাক্ষী, ক্ষমা কর তুমি আমাকে মিঃ ফার্গুসন—এ কাজ আমার দ্বারা হবে না—

হবে না!

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় ফার্গুসন মীনাক্ষীর চোখের দিকে।

না। আমি resignation দিচ্ছি—

Don't be a fool মিস্ রয়—

বললাম তো আমি পারবো না—আমাকে ক্ষমা করো—

কিন্তু তোমাকে যে পারতেই হবে—

না, না—

মিস্ রয়—চাপা অথচ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে ফার্গুসন।

পারবো না—আমি পারবো না! Accept my resignation—

পারতে তোমাকে হবেই—

মিঃ ফার্গুসন- -

Yes! পারতে তোমাকে হবেই। আর না পারলে we will hand over you to the police-বল—now tell me—what do you prefer—কি তুমি চাও—আমি যা বলছি তাই করবে, না পুলিশে যেতে চাও—

পুলিশ।

হ্যাঁ—পুলিশ—

কিন্তু আমি—আমি কি করেছি?

কি করেছো? সহসা যেন ফার্গুসনের মুখের 'পর থেকে মুখোশটা খুলে যায়।

একটা নিষ্ঠুর হিংস্র কঠিন মুখ প্রকাশ পায়।

দু' চোখের দৃষ্টিতে মমতাহীন নিষ্ঠুর একটা জিঘাংসা যেন।

॥ ২০ ॥

বাঘের থাবার মধ্যে যেন আটকা পড়েছে মীনাক্ষী—পায়ের নীচে মাটিটা যেন সরে যাচ্ছে—একটা নিরালম্ব শূন্যতা—ফার্গুসন বলে চলেছে তখন :

মনে আছে ৭ই জুলাই ৭০৭ বোয়িং এ তুমি বম্বে গিয়েছিলে—

আমি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ তুমি—not লায়লা বানু—লায়লা বানু বলে কেউ কোনদিন ছিল না, আজও নেই—ওটা তোমারই ফটো পাশপোর্টে—লায়লা বানু পরিচয়টা তোমার একটা মিথ্যে—

কিন্তু তোমরাই ত—

বম্বে এয়ারপোর্টে যার সঙ্গে তুমি দেখা করেছিলে সে পিকিং গভর্নমেন্টের লোক—মিঃ সানতার হাতে যখন তুমি চিঠিটা তুলে দাও সে ফটো আমাদের আছে। আশা করি দুটো চার্জই যথেষ্ট হবে। ১নং মিথ্যা পরিচয়ে এয়ার ট্রাভল করা—২নং মিঃ সানের সঙ্গে যোগাযোগ বোম্বাই এয়ারপোর্টে একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে—যাবজ্জীবন না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড আশা করি এতেই হবে তোমার—

না, না—হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়ে মীনাক্ষী, এ তুমি করতে পার না—You can't—you can't do it—আমি এসব কিছু জানি না—সব—সব তোমাদের হীন জঘন্য ষড়যন্ত্র—আমাকে তোমরা

হাতের পুতুল করে—

থামো—dont be so loud my dear—এতে করে কোন ফল হবে না। তুমি কচি খুকী নও—রীতিমত লেখপড়া জানা একটি যুবতী। কেউ তোমার ও-কথা বিশ্বাস করবে না।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মীনাক্ষী।

কান্নায় ভেঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢেকে সোফাটার উপর একেবারে বসে পড়ে, না—না—এ ভাবে তোমরা আমাকে মের না—আমাকে ছেড়ে দাও—মুক্তি দাও—

কেঁদে কোন ফল হবে না মিস্ রয়। হয় তুমি আমাদের প্রস্তাব মেনে নেবে নচেৎ—এই মুহূর্তে আমি পুলিশে ফোন করব—

দু' চোখে প্রবহমান অশ্রুধারা—সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষী,—বেশ— তবে তাই হোক—পুলিশেই আমাকে ধরিয়ে দাও—আমার পাপের—অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব—যাও—যাও— ফোন কর পুলিশকে—

Then you have decided—তাই স্থির—

হ্যাঁ—তাই—তাই হোক—

অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় ফার্গুসন বলতে থাকে ঃ

অবিশ্যি তুমি তাই চাইলে তাই হবে বৈকি! কাল সকালেই সংবাদপত্রে তোমার photo দিয়ে যখন head line-যে news ছাপা হবে—সারা দেশ—তোমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে—এবং পার্থপ্রতীমও জানবে—মীনাক্ষী রায়ের সত্যকারের পরিচয়টা কি—একটা ঘৃণ্য গুপ্তচর—spy—

অকস্মাৎ একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে ওঠে মীনাক্ষী।

অলক্ষ্যেই—তার গলা থেকে যেন চিৎকারটা বরে হয়ে আসে।

হ্যাঁ, জানবে—একটা— spy-spy ছাড়া আর কি, যা করছো তুমি সেত একজন spyয়েরই কাজ এবং যার ফলে তোমার এতদিনকার স্বপ্ন—তোমার ভালবাসা—তোমার পার্থপ্রতীম—ঘৃণায় লজ্জায় হয়ত শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করবে—

না, না—না—চুপ কর—চুপ কর—

বানবিদ্ধ একটা পশুর মতই যেন আর্তনাদ করে ওঠে মীনাক্ষী।

কিন্তু ফার্গুসনের যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই—তেমনি নিরাসক্ত ঠান্ডা গলায় মীনাক্ষীর ভীত ত্রস্ত চোখের উপর চোখ রেখে বলতে থাকে ঃ

সে যখন জানবে একটা ঘৃণ্য spy এর অর্থে সে আজ সুস্থ হয়ে উঠেছে—সমস্ত দেশের ধিক্কারের—লজ্জার হাত থেকে তখন নিজেকে বাঁচাতে আত্মহত্যা ছাড়া আর কি পথ থাকবে সে বেচাবার। যে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন—তার ভালবাসা—তার প্রেম—একটা ঘৃণ্য—গুপ্তচরকে ঘিরে—

Will you stop—stop—stop

চিৎকার করে উঠে মীনাক্ষী। আর্তনাদ করে ওঠে।

না, না—সে তা পারবে না। এমনি করে সমস্ত দেশের কাছে —সমস্ত মানুষের কাছে- -বিশেষ করে পার্থর কাছে সে ছোট হয়ে যেতে পারবে না।

ঘৃণায় সবাই তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দেবে।

বোস—বোস—তুমি কাঁপছো মিস্ রয়—হাত ধরে বসিয়ে দিল ফার্গুসন মীনাক্ষীকে সোফাটার 'পরে। মীনাক্ষী সোফাটার পরে বসে দুহাতে মুখ ঢাকে। কাঁপছে তার সর্বশরীর তখন—থর থর করে কাঁপছে।

একটা মর্মন্তুদ হাহাকার যেন সমস্ত বুকখানাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এ সে কি করল। মীনাক্ষী একি করল—সত্যিই তাহলে সে একটা spy—ঘৃণ্য গুপ্তচর— ঘৃণ্য দেশদ্রোহী—

হায় ভগবান একি হলো।

ঘরের ভিতরে গিয়ে ফার্গুসন ইতিমধ্যে সোফা থেকে উঠে একটা গ্লাসে করে খানিকটা ব্রান্ডি নিয়ে এল।

Take this--

হাত থেকে ফার্গুসনের গ্লাসটা নিয়ে চোঁ চোঁ করে এক টানে সমস্ত ব্রান্ডিটুকু পান করে

ফেলে মীনাক্ষী।

একটা তরল অগ্নিপ্রবাহ যেন গলা থেকে জ্বালা করতে করতে বুক দিয়ে নেমে যায়।

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ওঠে।

সমস্ত কিছু যেন ছায়াছবির মতই চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে মীনাক্ষীর।

তিল তিল করে প্রায় এই চার মাসে যা সে গড়ে তুলেছিল—তার স্বপ্নের প্রাসাদ—প্রচন্ড একটা ভূমিকম্পে যেন সব ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে।

তার মুখের একটি ছোট্ট 'না' মানেই সব কিছুরই সমাপ্তি।

তার এতদিনকার ভালবাসা—তার পার্থ—তার প্রেম—এইখানে এই মুহূর্তেই শেষ।

সারা দেশই যে তাকে ঘৃণা করবে—চরম ধিক্কার দেবে তাই নয়—পার্থ—তার পার্থ কি আর এত আঘাতের পর বাঁচবে!

সত্যিই এই চরম অপমান আর লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য হয়ত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে।

মৃত্যুর কারণ হবে সে পার্থর।

না, না—পার্থ—তুমি আমায় ঘৃণা করবে—আমার কারণে তুমি প্রাণ দেবে—সে আমি হতে দেবো না।

পারব না।

তুমি বেঁচে থাক—সুস্থ থাক—আমার লজ্জা নিয়ে আমিই তোমার কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে সরে যাবো।

আমার লজ্জা—আমার ঘৃণা—আমার অপমান—আমার দুঃখ আমারই থাক।

দু'চোখ ভরে আবার জল আসে মীনাক্ষীর।

নিঃশব্দে সেই প্রবহমান অশ্রুধারা তার গন্ড ও চিবুককে প্লাবিত করতে থাকে।

মিঃ ফার্গুসন কোন কথা বলে না—ওকে কাঁদতে দেয়, কাঁদুক—

বেশ কিছুক্ষণ পরে মৃদু কণ্ঠে ডাকে, মিস রয়—

মীনাক্ষী মুখ তুলে তাকাল।

দু'চোখে ভাষাহীন দৃষ্টি—কোণায় কোণায় অশ্রু টলমল করছে।

Then what you have decided? কি ঠিক করলে?

আমি প্রস্তুত মিঃ ফার্গুসন—

That's like a good girl! তুমি তাহলে তোমার ঘরে যাও। স্নান কর, বিশ্রাম কর We will meet again at five— সন্ধ্যা পাঁচটায়—

মীনাক্ষী উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ২১ ॥

কিন্তু ১২০ নং ঘরে এসে স্নানও করল না খেলোও না কিছু। একটা সোফার'পরে ঝিম দিয়ে বসে রইল।

সমস্ত যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

একটা নিরালম্ব শূন্যতা—একটা দীর্ণ হাহাকার যেন ওর সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করেছে। ওর সমস্ত অস্তিত্ব সমস্ত চেতনাকে যেন একটা সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে লুপ্ত করে দিয়েছে।

ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটায় ঘরের দরজায় নক পড়ল।

হোটেলের একজন বয় এসে বললে, ১১৯ নং ঘরের সাহেব তাকে সেলাম জানিয়েছে।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

পাঁচটা। পাঁচটায় মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা করবার কথা।

তুমি যাও—বলগে আসছি—

একটা নির্জীব পুতুলের মত কোন মতে হেঁটে মীনাক্ষী ১১৯ নং ঘরে এসে প্রবেশ করে। বসে ছিল একটা সোফায় ফার্গুসন, পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফার্গুসন যেন চমকে ওঠে।

What's the matter my girl! কি হয়েছে— মুখটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে—একি তুমি পোশাক বদল করনি—স্নানও কর নি দেখছি—

আমাকে কি করতে হবে মিঃ ফার্গুসন? নিরাসক্ত ঠান্ডা নিস্তেজ গলায় প্রশ্নটা করে মীনাক্ষী।

সে সব হবে—আগে যাও তুমি তোমার ঘরে—স্নান করে জামাকাপড় বদলে fresh হয়ে এসো—যাও—

আমি ঠিক আছি—বল তুমি কি করতে হবে আমায়?

না কোন কথা নয় যাও। ওঠো—

মীনাক্ষী আবার উঠে দাঁড়াল।

ফিরে এলো আবার নিজের ঘরে।

গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে—শরীরটার মধ্যে যেন একটা আগুনের তাপ।

স্নান করার এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না তবু স্নান করল মীনাক্ষী।

কাপড় বদলাল—তারপর আবার এসে ঢুকল ১১৯ নং ঘরে।

এই যে এসো, now you look a bit fresh—বোস।

মীনাক্ষী বসল।

Why you are getting so nervous. শান্ত হও— কাজটা এমন কিছুই একটা কঠিন নয়—

থাক মিঃ ফার্গুসন, তোমার যা বলবার বল।

মিঃ লোম্যানের গেস্ট হয়ে তুমি আজকের ডিনারে যাবে। তোমার নাম হবে—লায়লা বানু—

লায়লা বানু!

হ্যাঁ—গান গাইবে তুমি— মিঃ লোহিয়াই সাগ্রহে আমি জানি তোমার সঙ্গে আলাপ করবে—He is fifty five—তবু আমি জানি মেয়েদের ব্যাপারে He is a greedy wolf—excuse me my tongueমিস রায়—well–তোমাকে আর কি বলব—আমার তোমার 'পরে যথেষ্ট বিশ্বাস আছে—I want some important news—ঐ সময় বেয়ারা এসে বলল, মেহেবুব এসেছে—

ঘরে পাঠিয়ে দাও। ফার্গুসন বলে।

একটু পরে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকে সেলাম দিল।

এই যে মেহেবুব তুমি এসেছো—শোন—আমার এই পাশের ঘরে তোমার প্রয়োজনীয় সব মেক-আপ সামগ্রী ও ড্রেস প্রস্তুত আছে—লায়লাকে তুমি মেকআপ দিয়ে সাজিয়ে দাও। যাও লায়লা—ওর সঙ্গে যাও।

চেতনাহীন অসাড় দেহটা নিয়ে কোন মতে যেন মেহেবুবের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে মীনাক্ষী প্রবেশ করল।

বসুন এই চেয়ারটায়—মেহেবুব বলে।

সিনেমা ও থিয়েটার জগতের বিখ্যাত মেক-আপম্যান মেহেবুব খান।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে মেক-আপ দিয়ে সাজগোজ করিয়ে মীনাক্ষীকে যখন ঘরের আর্সীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল মেহেবুব—তখন আর্সীর মসৃণ গাত্রে প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে মীনাক্ষী নিজেই যেন, বোবা হয়ে যায়।

কে ঐ আর্সীর গাত্রে প্রতিফলিত, ইন্দ্রাণী নারী!

কিবা বংকিম ভ্রূ—কিবা কাজল টানা দুটি আঁখি—বাঁধুলী পুষ্পের মত রক্তাভ দুটি ওষ্ঠ।

মিঃ ফার্গুসন দেখে বলে চমৎকার! ঠিক আছে মেহেবুব তুমি যেতে পার—

মেহেবুব সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

ফার্গুসন নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, Now it is quarter past seven— ঠিক আটটায় গাড়ি আসবে—মনে আছে ত কি করতে হবে তোমার।

মীনাক্ষী নীরব।

বসে থাকে যেন পাষাণ প্রতিমা।

Now মিস রায়—হঠাৎ গলাটা একটু নীচু করে বলে ফার্গুসন, জীবনে অর্থ—প্রতিষ্ঠা—সুখ—বৈভব—সব তোমাকে আমি দেবো। বেশী দিন নয় মাস চারেক তোমাকে আমার প্রয়োজন। এই চার মাসে আমার কাজগুলো তুমি করে দাও তারপর তোমার ছুটি—মুক্তি তোমার।

মীনাক্ষী এতক্ষণে চোখ তুলে তাকাল ফার্গুসনের দিকে।

yes–তারপরই তোমার মুক্তি ইচ্ছে করলে তুমি আবার মিঃ কুলকারনীর ওখানে চাকরি পেতে পারো কিন্তু তার আর কোন প্রয়োজন হবে না, যে অর্থ তোমাকে দেবো বাকী জীবনটা হেসে খেলে কেটে যাবে।

মীনাক্ষী তথাপি নীরব।

মিঃ লোম্যানের বাড়ির ডিনার পার্টিতে গান গেয়ে এবং তার রূপের আগুনে সে রাত্রে লায়লা বানু যেন আগুন জ্বেলে দেয়।

মিথ্যা বলেনি মিঃ ফার্গুসন—নারী সম্পর্কে সত্যিই একটা দুর্বলতা আছে লোহিয়ার।

লায়লার আশেপাশে যেন আঠাঁর মত এঁটে থাকে লোহিয়া।

ডিনারের চাইতেও মদের ব্যাপারটাই সেদিন লোম্যানের ডিনার পার্টিতে বেশী ছিল। পেগের পর পেগ সব উড়াতে থাকে।

হঠাৎ মীনাক্ষীর নজরে পড়ে মিঃ ফার্গুসনও পার্টিতে আছে এবং সর্বক্ষণ তার শ্যেন দৃষ্টি যেন তাকে লেহন করছে চারদিক থেকে।

নিজের অজ্ঞাতেই শিউরে ওঠে মীনাক্ষী।

লোহিয়া একসময় ঘরের এক কোণে মীনাক্ষীকে টেনে নিয়ে যায়।

সামনেই খোলা বারান্দাটা চোখে পড়ে, দরজা পথে ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে।

লায়লা, you didn't drink at all–এক ফোঁটা পান কর নি তুমি—

আমি ত ড্রিংক করি না—

আজকের দিনে কেউ ড্রিংক করে না তাই হয় নাকি! you must— একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি—উঠে গেল লোহিয়া এবং একটু পরে দুটো গ্লাসে দু'পেগ হুইস্‌কী নিয়ে এসে হাজির হল।

নাও—ধর—

কিন্তু মিঃ লোহিয়া—

Oh–don't be silly ধর hold it–

নজর পড়ল মীনাক্ষীর ঐ মুহূর্তে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ফার্গুসন—তার সাপের চোখের মত দু'চোখের স্থির দৃষ্টি তারই পরে নিবদ্ধ।

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল মীনাক্ষী।

To night is ours. ভাল কথা তোমার ঠিকানাটা জানা হয়নি লায়লা—কোথায় তুমি থাক?

গ্রান্ডে—

হোটেলে কেন?

শিগ্‌গিরী আমাকে দিল্লী যেতে হবে—

Really? how fine it would be–কি চমৎকারই না হবে। কবে আসছো দিল্লী—

শিগ্‌গিরী—

আমি আরো দু'দিন আছি—কাল আবার নিশ্চয় দেখা হবে।

কেন হবে না! আমার room number হচ্ছে ১২০।

জপমালা হয়ে রইলো নম্বরটা—

সেই রাত্রেই মীনাক্ষী রায়ের মৃত্যু হলো। মীনাক্ষীর শবদেহে জন্ম নিল লায়লা বানু।

সংগীতপটিয়সী লায়লা বানু।

একটু সংবাদ চেয়েছিল ফার্গুসন—অনেক বেশী সংবাদই সে লায়লার দৌলতে পেল।

দু'দিন বাদে লোহিয়া চলে গেল এবং তার দিন পনের বাদই এক রাত্রে ভাইকাউন্টে চেপে

দিল্লী যাত্রা করল মীনাক্ষী।
মীনাক্ষী নয় লায়লা বানু।

॥ ২২ ॥

তারপর দুটো মাস যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে গিয়েছে লায়লার জীবনের ওপর দিয়ে।

বিচিত্র সব কাজে তাকে আজ মাদ্রাজ—কাল কলকাতা—পরশু বোম্বাই—নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

বিচিত্র বেশ সব নিতে হয়েছে।

কখনো চীনে পোষাক—কখনো জাপানী—কখনো বর্মী—কখনো পাঞ্জাবী—কখনো ইউ. পি—বিচিত্র রূপে তাকে দেখা গিয়েছে নানা জায়গায়।

আর দিল্লী ও কলকাতা একটি নাম শোনা গিয়েছে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরেদের মুখে-মুখে—লায়লা বানু।

লায়লা বানু অনন্যা—অসামান্যা—এক নারী।

সুধাকণ্ঠী লায়লার গান শুনলে যেন পাগল হয়ে যেতে হয়।

মীনাক্ষী রায় হারিয়ে গিয়েছে—মুছে গিয়েছে যেন পৃথিবীর বুক থেকে মীনাক্ষী রায় নামটা।

অবিশ্যি মীনাক্ষী রায় নামটার মধ্যে কিইবা ছিল।

মধ্যবিত্ত ঘরের অতি সাধারণ একটি মেয়ে। যে মেয়েটি অক্লান্ত চেষ্টায় ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে।

অতি নগণ্য একটি মেয়ে—যে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল।

ভালবেসে বাঁচতে চেয়েছিল—ঘর—একটি ছোট ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

সে যদি হঠাৎ একদিন হারিয়ে যায়ই পৃথিবীর জনারণ্যের মধ্যে কার তাতে কতটুকু কি এসে যাবে?

চিঠি আসে পার্থর কাছ থেকে—

কি হয়েছে তোমার ক্যামেলি বল ত! কেন মনে হচ্ছে তুমি বদলে গিয়েছো। একেবারে বদলে গিয়েছো।

তোমার চিঠির মধ্যে সে সুরটা আর পাই না।

আমি ত এখন একেবারেই সুস্থ হয়ে গিয়েছি—একটা দিনও আর এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না।

তাছাড়া কতদিন তোমাকে দেখি না।

পার্থর চিঠিগুলো যখন আসে হাতে নিয়ে পাথরের মতই যেন বসে থাকে মীনাক্ষী।

পাথরের চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে শুধু।

ইচ্ছে হয় পার্থকে লেখে।

ক্যামেলিয়া তোমার মরে গেছে পার্থ।

সে অনেক দিন হলো মরে গিয়েছে।

তার খোঁজ আর কারো না। ভুলে যাও তোমার ক্যামেলিয়াকে।

হঠাৎ ঐ সময় পার্থর একটা চিঠি এলো।

আমি কলকাতায় ফিরছি। হাওড়া স্টেশনে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে কিন্তু—

তোমার পার্থ।

চিঠিটা পড়ে মীনাক্ষীর মাথায় যেন আজ বাজ ভেঙ্গে পড়ে।

সর্বনাশ—এখন কি উপায় হবে। কি করবে এখন মীনাক্ষী। পার্থ কলকাতায় এসে পড়লে আর ত তার কাছ থেকে সে নিজেকে দূরে আড়াল করে রাখতে পারবে না। এতদিনকার মিথ্যেটা এবার ধরা পড়বে।

মুখোশটা তার খুলে পড়বে।

মীনাক্ষীর আড়াল থেকে লায়লা বের হয়ে আসবে। কি করবে— কি করবে মীনাক্ষী।

মাঝখানে আর মাত্র তিনটে দিন।

সেই ফ্ল্যাটটা মীনাক্ষী ছেড়েছিল না। বিরাজ দেশে—তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেয় ও টি, এম্ ও করে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয় অবিলম্বে ফিরে আসবার জন্য, জানিয়ে দেয়—তার মনিব পার্থ ফিরে আসছে।

একদিনেই তারপর ফ্ল্যাটটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলে।

পার্থ তার নিজের ফ্ল্যাটেই এসে উঠুক। তাছাড়া উঠবেই বা কোথায়—ঐ ফ্ল্যাটের সঙ্গে কত স্মৃতি তাদের জড়ানো।

কত কথা—কত হাসি—কত গান—তারপর কত ব্যথা—কত দুঃখ।

পার্থ ঐ খানেই এসে উঠুক।

মীনাক্ষী এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশ নেয়।

পায়জামা পাঞ্জাবী—মাথায় পাগড়ি—মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি—চোখে কালো কাচের চশমা। একটু নুয়ে যেন হাঁটে।

ট্রেন থেকে নেমে পার্থ সতৃষ্ণ নয়নে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—কোথায়—কোথায় তার ক্যামেলিয়া—

প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ধীর পায়ে এগিয়ে আসে—নমস্তে বাবুজী—

নমস্তে—একটু যেন চমকেই তাকায় পার্থ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের দিকে।

হঠাৎ যেন চমকে উঠেছিল—হঠাৎ যেন মনে হয়েছিল গলাটা চেনা-চেনা—

নমস্তে—

আপ নৈনিতাল সে আ রহে হে—

হ্যাঁ—

আপ কো নাম পারথ প্রতীম—

হ্যাঁ—কিন্তু আ—আপনি কে আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না—

নেহি বাবুজী—মুঝে আপ পয়ছানে গে নেহি—চিনতে পারবেন না আপনি আমাকে— আমার নাম গুলজারী সিং—আপনি নিশ্চয়ই মিস রায়কে খুঁজছেন—

হ্যাঁ—মানে—

কিন্তু তিনি ত কালকাতায় নেই—

কলকাতায় নেই!

না—

হঠাৎ অফিসের জরুরী কাজে হংকং যেতে হয়েছে—তারপর সিংগাপুর—মালয় হয়ে ফিরবেন— আপনার নামে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছেন আমার হাতে, এই নিন—

পকেট থেকে চিঠিটা প্রৌঢ় বের করে পার্থর হাতে তুলে দিল।

আচ্ছা বাবুজী—আমি আসি—নমস্তে—

প্রৌঢ় ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে।

পার্থ চিঠিটা খুলে পড়ল ঃ

পার্থ,

হঠাৎ অফিসের জরুরী কাজে হংকং যাচ্ছি—সেখান থেকে সিংগাপুর—মালয়—রেঙ্গুন ঘুরতে হবে। আমাদের সেই পুরাতন ফ্ল্যাটেই তোমার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। বিরজুকেও সংবাদ দিয়েছি আসবার জন্য।

তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

তোমার ক্যামেলি।

পার্থ চিঠিটা পকেটে রেখে কুলীকে বললে, চলরে—একটা ট্যাক্সী ধরতে হবে।

চোখের জল চাপতে চাপতে ফিরে এলো মীনাক্ষী তার পার্ক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে।

লায়লা বানু এখন পার্ক ষ্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাটে থাকে।

মনে মনে কেবল বলতে থাকে মীনাক্ষী—ক্ষমা করো পার্থ, ক্ষমা করো। আমার প্রতারণার জন্য আমার মিথ্যার জন্য ক্ষমা করো—

সেই সকাল থেকে স্নান করে নি—একটা দানা পর্যন্ত দাঁতে কাটেনি মীনাক্ষী।

নিজের ফ্ল্যাটে—শয়ন কক্ষে শয্যার'পর উপুড় হয়ে পড়েছিল।

আয়া ঝুমকি এসে বললে, মেমসাহেব—ফার্গুসন সাহেব এসেছে—

কেন—কি চায়—এখন দেখা করতে পারব না বলে দে—

মিস্ রায়—

দরজার উপরে একেবারে ফার্গুসনের গলা শোনা গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছে।

একি আলো জ্বালাও নি— what's the matter ? ফার্গুসনই সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিল।

পার্থ এসেছে শুনলাম।

হ্যাঁ—তারপরই হঠাৎ বলে মীনাক্ষী, আমাকে এবার তোমরা মুক্তি দাও—

মুক্তি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি আর পারছি না— it has completely shattered my nerves— মুক্তি দাও— Let me go—

নিশ্চয়ই—মুক্তি তুমি পাবে বৈকি— যে রকম expect করছি—আর হয়ত মাসখানেকের মধ্যেই—

না, না, না, —আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে মীনাক্ষী, একটা দিনও আর আমি পারছি না—একটা মুহূর্তেও নয়—

Don't be sentimental—

না, না,—আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও—

তাই কি হয়— when we are practically— আমাদের object— আমাদের destinationএ পৌঁছুতে চলেছি—সে সময় কি তোমাকে ছাড়তে পারি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ ছাড়তেই হবে— হয় তোমরা আমায় ছাড়ো—নচেৎ আমি—আমিই police এ গিয়ে Surrender করবো—

সারেন্ডার করবে—

yes—করবো—

রাগে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছে ততক্ষণে মীনাক্ষী—

জানো তার শাস্তি—হয় ফাঁসী না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—

তাই—তাই হোক—তবু যাবো—

আর তোমার পার্থ—যাকে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছো আজ—তাকেও তাহলে তুমি মারতে চাও—You want to kill him

না, না—পার্থ—পার্থ—পার্থর চোখে সে ছোট হতে পারবে না—মৃত্যুতে তার দুঃখ নেই—কিন্তু তার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে হয় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে পার্থ না হয় থুতু ছিটিয়ে দেবে—না, না—তা সে পারবে না। তারপর হয়ত সে ঘৃণায় লজ্জায় আত্মহত্যা করবে—উঃ মাগো—দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে মীনাক্ষী।

কান্নায় গুড়িয়ে যায়।

ফার্গুসন মৃদু হেসে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

দিন তিনেক বাদে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ হবে।

পার্থ তার ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসেছিল। গ্রামোফন কম্পানীর লোকরা আজ তার কাছে এসেছিল।

অনেকদিন তার কোন গান রেকর্ড হয় না—এবারে তারা একটা পার্থর গান রেকর্ড করতে চায়।

পার্থ বলেছে করবে।

দামসস্তুর হয়ে গিয়েছে।

তার ক্যামেলিয়ার লেখা গানটাই সে গাইবে—

তার ক্যামেলিয়ার লেখা গান—তার দেওয়া সুর—তার কণ্ঠ।

টুক্ টুক্—দরজায় মৃদু আঘাত।

কে?

বাবুজী—আমি গুলজারী সিং—

আইয়ে—আইয়ে সিংজী—

পার্থ উঠে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালাতে যাচ্ছিল গুলজারী সিং বাধা দেয়, না বাবুজী আলো থাক—আলো চোখে আমার বড় লাগে—

চোখের অসুখ বুঝি?

হ্যাঁ বাবুজী—প্রায় অন্ধ হয়ে এসেছি—

অন্ধ—

হ্যাঁ—আর হয়ত বেশী দিন দেখতে পাবো না এ দুনিয়া। সমস্ত আলো চোখ থেকে মুছে যাবে—

ডাক্তার দেখান না কেন?

ডাক্তার কি করবে! ডাক্তারের সাধ্যেব বাইরে এ রোগ—

তারপরই কিছুক্ষণ চুপচাপ দু'জনাই।

তারপর পার্থ মৃদু কণ্ঠে বলে, আশ্চর্য—

কি আশ্চর্য বাবুজী—

গুলজারী সিং যেন চমকে ওঠে।

॥ ২৩ ॥

তোমার গলাটা সিংজী—পার্থ বলে।

আমার গলা!

হ্যাঁ—যেন ঠিক আমার অতি প্রিয়জনের গলার মত, প্রথম দিন ষ্টেশনে তোমার গলা শুনে ত আমি চমকেই উঠেছিলাম—

বুকটার মধ্যে একটা অবরুদ্ধ হাহাকার—একটা চাপা কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উপরের দিকে উঠতে থাকে মীনাক্ষীর।

অতি প্রিয়জন বললে, কে সে তোমার বাবুজী?

আমার ক্যামেলিয়া—মানে আমার ভাবী স্ত্রী—

ওঃ আচ্ছা বাবুজী—

কি সিংজী—

সেই লেড়কীকে তুমি বুঝি খুব ভালবাস?

হ্যাঁ—

খুব!

হ্যাঁ—সে যে আমার কতখানি সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না সিংজী—

খুব বিশ্বাসও কর তাকে, তাই না—

করি নিশ্চয়ই—

কিন্তু ধর বাবুজী—যদি কখনো শোন—

কি—

তার সব মিথ্যা—ফাঁকি—

সিংজী—গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দেয় পার্থ গুলজারীকে।

হ্যাঁ—যদি শোন—সে তোমার বিশ্বাসেরও যোগ্য নয়—সে অতি সাধারণ—অতি নগণ্য—অতি—

থামুন—থামুন আপনি—

বাবুজী এই দুনিয়া বড় বিচিত্র—তার চাইতেও বিচিত্র বুঝি মানুষ,—মানুষের মন—

আপনি কি ঐ সব কথাই বলতে এসেছেন এখানে। তাই যদি এসে থাকেন ত—অনুগ্রহ করে এখুনি আপনি এখান থেকে চলে গেলে আমি খুশি হবো—

I am sory. বাবুজী আচ্ছা আমি যাচ্ছি—নমস্তে—

পার্থ এত চটে গিয়েছিল যে প্রতি নমস্কারটুকুও জানায় না।

গুলজারী ঘর থেকে টলতে টলতে বের হয়ে যায়।

আর বের হয়েই মীনাক্ষী গলিপথটা অতিক্রম কবে বড় রাস্তায় অপেক্ষমাণ তার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে।

গাড়ি ট্রাম রাস্তার কাছাকাছি এসেছে ঃ হঠাৎ তার কানে এলো।

টেলিগ্রাফ বাবু—টেলিগ্রাফ্—লড়াই শুরু হো গিয়া।

লড়াই শুরু হো গিয়া।

হঠাৎ যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে সমস্ত দেহটা অসাড় হয়ে যায় মীনাক্ষীর।

প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে হকারটা।

বহু লোক চারপাশে তাব যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

লড়াই! আবার লড়াই!

আবার সেই ১৯৩৯ সাল!

আবার যুদ্ধ—আবার বোমা—আবার সেই সাইরেন—

ড্রাইভারকে দিয়ে মীনাক্ষী একটা টেলিগ্রাফ আনিয়ে গাড়ির মধ্যে বসেই পড়তে লাগল ঃ চীনেদের সৎ ইচ্ছার অবসান ঘটেছে।

পঞ্চশীল চুক্তি তারা ভঙ্গ করেছে।

চীনাদের পঞ্চাশ ডিভিশন সৈন্য অকস্মাৎ বিনা নোটিশে রাতারাতি ভারতবর্ষের বর্ডার গার্ড—সীমান্ত রক্ষীদের উপর বেয়োনেট গোলাগুলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

নেফা—লাদাক—ভারতের পূর্ব-পশ্চিম সীমান্তের সবগুলো জায়গায় চায়না সহসা আক্রমণ করেছে।

সর্বনাশ!

এ যে একেবারে ঘরেব দরজায় যুদ্ধ।

আসাম—নেফা থেকে আসামে আসতে কতক্ষণ—কটাই বা পাহাড় মাঝখানে।

পাহাড়গুলো পেবিয়ে আসাম—তারপরই তেজপুর—অর্থাৎ তার পরই একেবারে বাংলা দেশের সদর দরজা।

ঘরে ঢুকতেই দেখে ফার্গুসন ঘরের মধ্যে একটা সোফায় বসে।

মিঃ ফার্গুসন—

Who are you—সঙ্গে সঙ্গে ফার্গুসন উঠে দাঁড়ায়।

মুখের কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ খুলতে খুলতে ভ্রুকুটি করে মীনাক্ষী বলে, তুমি কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ—তা প্রায় ঘন্টাখানেক হবে। তারপরই একটু থেমে প্রশ্ন করে ঃ

কিন্তু এ বেশ কেন!

প্রয়োজন ছিল—কিন্তু তুমি কেন এসেছো?

বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি—

কি শুনি—

জরুরী এবং ভাল খবর আছে—

ভাল খবর!

হ্যাঁ, শোননি তুমি—

কি?

যুদ্ধ বেধে গিয়েছে—China attack করেছে—এবারে আমাদের আসল কাজ—এতদিন ছিল প্রস্তুতি—now action.

বোবা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মীনাক্ষী লোকটার মুখের দিকে।

ফার্গুসনের মুখের দিকে।

লোকটাকে এতদিনে এ্যামেরিকান বলে মনে হয়েছে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা ত নয়—লোকটার মুখটা যেন অনেকটা মঙ্গোলিয়ান টাইপের।

ছাড়ান চৌক চোয়াল—ভোঁতা নাক—ছোট ছোট চোখ ঃ অবিকল যেন মনে হচ্ছে একটা চীমাম্যান—

যে চীন আজ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে অকস্মাৎ পঞ্চাশ ডিভিসন সৈন্য নিয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষীদের 'পর রক্তলোলুপ নেকড়ের মত নখ বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সেই চীনেরই একজন ঐ লোকটা।

We must be always prepared—ready—ফ্ল্যাট থেকে এক মুহূর্তও তুমি কোথাও বেব হয়ো না মিস রায়—আর একটা কথা—police কিছুদিন থেকে তোমার 'পরে নজর রেখেছে—

চ্যাপ্টামুখো চীনাম্যানটা যেন হলদে একসারি দাঁত বের করে হায়নার মত কুৎসিত হাসি হাসছে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে।

ও যেন পরিচিত ফার্গুসন নয় একটা হিংস্র জন্তু।

আচ্ছা চলি—খুব সাবধানে থাকবে। হাওয়া ভীষণ গরম—

মিঃ ফার্গুসন নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মীনাক্ষী পাথরের মত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু—জওহরলালজী দিল্লী থেকে বক্তৃতা দিলেন ঃ What the chinese may have in mind is any body's guess. We are at the cross roads of history and are facing great historical problems on which depends our future. We have to be big in mind, big in vision, and big in determination—

॥ ২৪ ॥

ঘুম হয় না মীনাক্ষীর।

দু'চোখের পাতা থেকে ঘুম যেন একেবারে উবে গিয়েছে।

একটা অনুশোচনা—একটা ভয়াবহ অন্যায় বোধ—একটা বিষাক্ত অর্ন্তজ্বালা যেন ওর সমস্ত অনুভূতি সমস্ত চেতনাকে নির্মম ভাবে যন্ত্রণা দেয়।

এই কয় মাসে কী করেছে মীনাক্ষী—

একটা ঘৃণ্য গুপ্তচর—ভারতেব এক নাগবিক হয়ে ভারতের বিরুদ্ধেই সে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে, অর্থের লোভে—স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে নিজেকে বিক্রী করেছে।

এ কি করল সে—এ কি করল মীনাক্ষী।

ভারত আজ বিপদের সম্মুখীন—ভারতের দরজায় শত্রু হামলা দিয়ে পড়েছে।

চীন-ভারত ভাই ভাই নয়—চীন আজ মুখোশ খুলে ফেলেছে।

বেয়োনেট উঁচিয়ে ধরেছে।

সমস্ত দেশের টনক নড়ে ওঠে।

যুদ্ধ। যুদ্ধ—

আত্মরক্ষা করতে হবে—শুধু আত্মরক্ষাই নয়—দেশকে বাঁচাতে হবে—শত্রু আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে হবে।

we must fight, we must fight our enemies—

স্বেচ্ছাসেবিকার ডাক পড়ে—সৈনাদলে ডাক পড়ে—দাও টাকা দাও—যার যা আছে দাও—দু'হাতে দাও—রক্ত দাও—খাদ্য দাও—অর্থ দাও।

শিল্পীরা পর্যন্ত বসে থাকে না—তারাও দেশের যুদ্ধে প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য জলসা করে—অভিনয় করে—রাস্তায় মাঠে মঞ্চ বেঁধে গান করে ঃ দেশবাসী দাও—তোমার নিজের দেশমাতৃকার

ইজ্জত—মা-বোনের ইজ্জত—বাপ-ভাইয়ের ইজ্জত আজ অতর্কিত চীনা আক্রমণে বিঘ্নিত।

চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়।

সকাল বেলা রেডিও খুললে গান শোনা যায় ঃ

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

হঠাৎ সেদিন রাত্রে—

নিজের ঘরের মধ্যে অন্ধকারে চুপ চাপ রেডিওটা খুলে বসেছিল। আজ তার কাছে আর কোন সংবাদ নেই, কেবল যুদ্ধের সংবাদ।

শত্রু সৈন্য কতদূর এগুল।

যুদ্ধের আগুন কতদূর ছড়ালো।

হঠাৎ ঘোষণা শুনে চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

ঘোষক বলে ঃ আকাশবানী কলকাতা, এবারে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনাচ্ছেন কণ্ঠ-সংগীতের জাদুকর শিল্পী পার্থপ্রতীম চৌধুরী।

পার্থ গায় ঃ

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীবা হুঁশিয়ার।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল কাণ্ডারী হুঁশিয়ার॥

নিজের অজ্ঞাতে কখন যেন উঠে আসে মীনাক্ষী অন্ধকারে—যে টেবিলটার'পরে রেডিওটা ছিল তার সামনে হাটু গেড়ে বসে রেডিওটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা কর—

পার্থ গাইছে ঃ

আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল কাণ্ডারী হুঁশিয়ার॥

হতভাগিনী, এ তুই কি করলি, কি করলি—এর চাইতে তুই বিষ খেয়ে মরলি না কেন—

পার্লামেন্ট হাউসে রেজিলিউশন পাশ করা হলো ঃ The House notes with deep gratitude this mightly upsurge amongst all sections of our people for harnessing all our resources towards this organisation of an all out effort to meet this great national emergency.

প্রতিরক্ষা ফণ্ডে মুঠো মুঠো টাকা আসছে—মা-বোনেরা গা থেকে গহনা খুলে দিচ্ছে—জোয়ানরা আর্মীতে যোগ দিচ্ছে—গায়ের রক্ত দিচ্ছে।

সব-সব কিছু, জামা-কাপড় টাকা কড়ি সব কিছু পাঠিয়ে দিল মীনাক্ষী প্রতিরক্ষা তহবিলে। তারপর ছুটে গেল মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্কে বললে, রক্ত নিন-আমি রক্ত দেবো—

ডাক্তার পরীক্ষা করে রক্ত নিলেন দেহ থেকে টেনে।

মীনাক্ষী বলে, অতটুকু নিলেন কেন-নিন—আরো নিন—

ডাক্তার বলেন, কিছু দিন পরে আবার আসবেন—

কেন এখনই নেওয়া যায় না!

না—একসঙ্গে ওর চাইতে বেশী রক্ত কারো শরীর থেকে নেওয়া যায় না।

কিন্তু আমি পারব—আপনি নিন না—

না।

ফিরে এলো মীনাক্ষী। কিন্তু কি করে এখন সে! পার্থকে কি সব কথা লিখে জানাবে?

না, না—তা আজ আর সম্ভব নয়—পার্থ তাকে বিশ্বাস করবে না। করতে পারে না। বলবে, তুমি—লোভী—তুমি নীচ—তুমি ভ্রষ্টা—দেশদ্রোহী—

গভীর রাত্রি।

একটা দুঃস্বপ্নের মত—একটা প্রেতের মত নিদ্রাহীন চোখে ঘরর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মীনাক্ষী।

বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু নক্ পড়ল—টুক্—টুক্—

কে?

Friend—দরজাটা খোল লায়লা—

মীনাক্ষী দরজা খুলে দিল। আর দরজা খুলে দিতেই মিঃ ফার্গুসন ঘরে এসে ঢুকল।

চিনতে পারে না অন্ধকারে ফার্গুসনকে—দুপা পেঁছিয়ে আসে মীনাক্ষী।

কে?

আলোটা জ্বালাতে যায় মীনাক্ষী। বাধা দেয় ফার্গুসন, না আলো জ্বেলো না—

ফার্গুসন—তুমি—

হ্যাঁ আমি—

What—what do you want ? কি চাও তুমি—আর কি চাও তোমরা আমার কাছে—What more you want—

আস্তে চেঁচিও না—দেওয়ালেরও কান আছে—শোন—Front line-এ তোমাকে যেতে হবে—

Front line !

Yes—চুসুল ফ্রন্টে যেতে হবে—কাল রাত্রে ট্রেন। তুমি যাবে একজন মিলিটারী নার্স হয়ে সেখানকার ফ্রন্টের অস্থায়ী হাসপাতালে—

কিন্তু আমি—আমি নার্সিংয়ের কিছুইত জানি না—তাছাড়া—

কিছু জানতে হবে না তোমাকে—তাছাড়া মেয়েদের নার্সিং শিখতে হয় নাকি—এই নাও তোমার আইডেনটিটি কার্ড—hold it—

একটা খাম এগিয়ে দিল ফার্গুসন—

শিথিল হাতে ধরল খামটা মীনাক্ষী।

ফার্গুসন আর দাঁড়াল না—

ঠিক চোরের মতই মধ্যরাত্রির অন্ধকারে এসেছিল ফার্গুসন, আবার চোরের মতই যেন নিঃশব্দে বের হয়ে গেল মীনাক্ষীর ফ্ল্যাট থেকে।

মিঃ ফার্গুসনের সাবধানী রবার সোল দেওয়া জুতোর শব্দটা নিঃশব্দে যেন ঘরের বাইরে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাইরে রাস্তায় শাদা রঙের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল।

ফার্গুসন এসে গাড়িতে উঠে বসল।

একটা গোঁ গোঁ শব্দ—অনেক উপরে মাথার 'পরে অন্ধকার আকাশে সাঁতরে চলেছে একটা প্লেন। তার ডানার দু'পাশে লাল নীল আলো দুটো জ্বলছে আর নিভছে।

অনেকক্ষণ—আরো অনেকক্ষণ পরে মীনাক্ষীর পাথরের মত দেহটা যেন অন্ধকারে নাড়াচাড়া করে।

আবার—আবার সেই খাম—মিথ্যা পরিচয়—কিন্তু এইত সুযোগ—হঠাৎ মনে হয় অনায়াসেই সে ত এই মুহূর্তে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে।

কিন্তু তারপর—

কে তার কথা বিশ্বাস করবে। তার চাইতে সে যাবে সেখানে। এই সুযোগ।

এমন সুযোগ আর মিলবে না।

যে অন্যায় করেছে—যে পাপ করেছে—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবারে যদি ফ্রন্ট লাইনে গিযে করতে পারে।

অনায়াসেই সে ফ্রন্ট লাইনে শত্রুপক্ষের শিবিরে হানা দিতে পারবে।

তার কাছে শত্রুপক্ষের সাংকেতিক চিহ্ন আছে।

সেই চিহ্নই তার পথ পরিষ্কার করে দেবে।

কিন্তু তার আগে—তার শেষ কর্তব্যটুকু—হ্যাঁ শেষ কর্তব্যটুকু পালন করতে হবে বৈকি।

আর দ্বিধা নয়—আর সংকোচ নয়—পার্থকে সব কথা এবারে জানিয়ে যেতেই হবে—

আর—আর শেষ বারের মত পার্থর সঙ্গে একবার দেখা। হ্যাঁ একবার দেখা করতে হবে।

একটিবার দূর থেকেও অন্তত তাকে না দেখে কেমন করে যাবে সে—

মীনাক্ষী সুইচ্ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালাল।

তারপর কাগজ নিয়ে বসল—লিখতে হবে—চিঠি—শেষ চিঠি

পার্থ, এই তোমাকে আমার শেষ চিঠি—কারণ এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি লিখবার সমস্ত প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেল।

ভেবেছিলাম—আমার দুঃখের কথা—আমার কলঙ্কের কথা—সব তোমায় জানিয়ে যাবো কিন্তু ভেবে দেখলাম তাতে আর কিই বা প্রয়োজন! যা গিয়েছে তাত আর আসবে না—আর ত ফিরে পাব না।

ফিরে পাবার সমস্ত পথই যে আমি নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছি—তাছাড়া তোমার কাছ থেকে ঘৃণা সে আমি কেমন করে নেবো—যার কাছ থেকে শুধু ভালবাসাই পেয়েছি, তার কাছ থেকে ঘৃণা—না নো না—তার চাইতে এই ভালো—মুখ বুজে আমি চলে গেলাম ; আমার দুঃখ, আমার লজ্জা—আমারই বুকের মধ্যে করে নিয়ে চলে গেলাম।

হ্যাঁ—আমি চললাম। আর একটা কথা ঃ আমার আগের চিঠিতে তোমায় জানিয়ে ছিলাম আমি হংকং গিয়েছি—সেটা মিথ্যা—তোমার সঙ্গে দেখা করার মত সাহস সেদিন ছিল না বলেই দেখা করতে পারিনি। সেদিনকার সে মিথ্যার জন্যও ক্ষমা করো আমায়। বিদায় প্রিয়তম—

ভাগো আমার ঘর নেই, তাই চলে যাচ্ছি।

জীবনে আর দেখা হবে না।

কিন্তু কোন দিন যদি শোন তোমার ক্যামেলিয়ার মৃত্যু হয়েছে—জেনো জীবনে সে তার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে লাভ করলো।

এবং সেই মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে যদি অন্তত এক ফোঁটা চোখের জল সেদিন ফেল, ত জানবে সেই হবে তোমার ক্যামেলিয়ার অক্ষয় স্বর্গ।

তার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হলো।

ইতি, তোমার ক্যামেলিয়া।

একটা খামের মধ্যে চিঠিটা ভরে খামটার মুখ বন্ধ করল ভাল করে।

রাত তখন ভোর হয়ে এসেছে।

॥ ২৫ ॥

পরের দিন পার্থকে এসে একজন জানাল, মীনাক্ষী দেবীর এক বান্ধবী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—আজই সিঙ্গাপুর থেকে তিনি এসেছেন—আজই আবার রাত্রে ট্রেনে চলে যাবেন।

উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে পার্থ, কোথায়—কোথায় তিনি?

তিনি মিলিটারী নার্স—আজ রাত্রের কনভয়তে তিনি ট্রেনে আসাম যাবেন। সাড়ে বারটায় পার্ক ষ্ট্রীট ও ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন—সেখানে দেখা হবে—

রাত সাড়ে বারটা—

হ্যাঁ—সময় তো নেই—তাই যাবার পথে রাস্তায় দেখা করে যাবেন—

কেন ষ্টেশনে তো আমি যেতে পারি—

পারেন—কিন্তু সেখানে মিলিটারী পুলিশ কর্ডন থাকবে আপনাকে তো প্রবেশ করতে দেবে না সেখানে ঐ সময়—দেখাও করতে দেবে না—

বেশ—তাই যাবো তবে। তাকে বলবেন।

রাত ঠিক সাড়ে বারটা।

শীতের রাত ঃ গত রাত থেকে কনকনে শীত পড়েছে।

নির্জন পার্ক ষ্ট্রীট, এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত শুধু রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে।

কোথায়ও একটি জনপ্রাণী বা যানবাহনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

গায়ে একটা ওভার কোট—মাথায় টুপি—নির্দিষ্ট জায়গায় মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পার্থ।

উদ্‌গ্রীব চক্ষু তার একবার এদিক ওদিক রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা যতদূর দৃষ্টি চলে তাকাচ্ছে।

কেউ নেই কোথাও।

সত্যিই ক্যামেলিয়ার বান্ধবী তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, না বাজে ধাপ্পা—

ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায় পার্থ।

অন্ধকারে এক জোড়া জোরালো হেড লাইটের আলো অনেক দূরে দেখা গেল।

আলোটা আসছে, এগিয়ে আসছে।

পার্থ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

বিরাট একটা পাইথনের মত শাদা গাড়িটা যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে রাস্তার আলো পর্যাপ্ত না পড়ায় আবছা আবছা একটা আলো-আঁধারী।

পার্থ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে কে যেন বসে।

পার্থ বাবু?—

আবার সেই কণ্ঠস্বরে চম্‌কে ওঠে

কে?

পার্থ বাবু—এই চিঠিটা মীনাক্ষী আপনাকে দেবার জন্য আমাকে দিয়ে গেছেন বলতে বলতে জানালা পথে একটা হাত বের হয়ে এলো—একটা শাদা খাম।

কেমন যেন বোকার মতই খামটা হাত বাড়িয়ে নেয় পার্থ।

গাড়িটা ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে—

ছুটতে ছুটতে গাড়ির সঙ্গে চলে পার্থ, শুনুন—শুনুন—সে—মীনাক্ষী কবে আসবে—

সে-ই আপনাকে চিঠিতে জানাবে। যান, ঠাণ্ডা লাগাবেন না আর—

গাড়িটা অতঃপর স্পীড দেয়—সোঁ করে যেন এগিয়ে যায়। আর চকিতে সেই সময় সেই মুহূর্তে যেন কি মনে হয় পার্থর। সে চিৎকার করে ওঠে—ক্যামেলি—ক্যামেলিয়া—

গাড়ির পিছনের লাল আলো দুটো বহুদূরে অন্ধকারে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে গেল।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে পার্থ।

শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে রাত সোয়া একটা—মিলিটারী স্পেশাল ছাড়ছে—

নিঃশব্দে সৈন্যরা—নওজোয়ানেরা মার্চ করে মিলিটারী স্পেশাল ট্রেনে উঠছে।

পরনে বটলগ্রীন মিলিটারী ড্রেস—ব্যাটল সুট্—মাথায় লোহার হেলমেট—পিঠে হ্যাভার স্যাক—কাঁধে ছুঁচালো বেয়োনেট রাইফেল।

পায়ে ভারী এ্যামুনিশন বুট।

চল জোয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে—অনেক দুঃখের—অনেক অশ্রু—অনেক বেদনার স্বাধীনতা আমাদের, তাকে কি আমরা হারাতে পারি?

কদম কদম বাড়ায়ে যা।

খুশি কি গীত গায়ে যা—

চল—চলরে নওজোয়ান।

আর চলেছে একটা হসপিটাল ইউনিট—সেই ইউনিটের মধ্যে সিস্টার মার্গারেট—সিস্টার মার্গারেটের পরিচয়ে মীনাক্ষী।

পরনে তারও মিলিটারী ইউনিফর্ম।

এক সময় ট্রেন ছাড়ল।

চায়নীজ আর্মী আসছে। এগিয়ে আসছে আরো-আরো কাছে।

ওয়ালং, বমডিলা, তেজপুর।

বমডিলার পতন হয়েছে।

প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীত—পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় শাদা তুষারের কিরীট। তারই মধ্যে নওজোয়ানরা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে।

তেজপুর এভাকুয়েশনের অর্ডার হয়ে গিয়েছে।.......

...ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আতংক। তারা ক্রমশঃ হটে চলেছে।

চায়নীজ সোলজারদের দুর্ধর্ষ আক্রমণে তারা পর্যুদস্ত।

ভারতীয় সৈন্যদের মরাল রাখা চাই। তাদের সাহস উদ্দীপনা আনন্দ দিতে হবে।

একদল শিল্পী চলেছে ফ্রন্ট লাইনে—গান গেয়ে কৌতুক করে সৈনিকদের উৎসাহ দিতে হবে—সাহস দিতে হবে

পার্থপ্রতীম সেই দলে নাম লেখাল।

সেও যাবে ফ্রন্টে।

সে রাত্রে গৃহে ফিরে এসে প্রথমেই খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা পড়ে পার্থ।

কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না চিঠিটা পড়ে। চিঠির ঐ সব কথার অর্থ কি!

ঐ সব কথা ক্যামেলিয়া চিঠিতে তাকে কেন লিখেছে। কিসের তার কলঙ্ক—কিসের জন্যই বা লজ্জা—আর কেনই বা সে এমন একটা অদ্ভুত চিঠি লিখে তাকে চলে গেল এমনি করে।

মনে পড়ে ইদানীং কেমন যেন চিঠির ভাষা সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল ক্যামেলিয়ার—একটা দুটোর বেশী কথা নয়।

সেও নেহাৎ কর্তব্যের কথা।

কোন প্রাণের সাড়া তার মধ্যে নেই যেন।

তারপর এই যে এতদিন পরে সে ফিরে এলো অথচ সে তার সঙ্গে একটিবার দেখা পর্যন্ত করল না, এখানেও যেন সংশয়—

এতদিন যে সংশয়টা দেখা দেয় নি আজ গত কয়েক মাসের অনেক ছোটখাটো ঘটনা মনের পাতায় ভেসে ওঠে পার্থর।

একটা সংশয়—একটা সন্দেহ—স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটা বিশ্রী সন্দেহের কাঁটা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে কেবলই বিঁধছে যেন।

কেবলই মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে।

কিন্তু ভেবে কিছুই কুলকিনারা করতে পারছে না পার্থ।

বার বার চিঠিটা পড়ে কিন্তু তবু কিছুই যেন আস্পষ্ট হয় না।

কটা দিন ঐ ভাবেই একটা চিন্তার মধ্যে কেটে গেল।

এমন সময় এলো আনন্দ পরিবেশনের জন্য শিল্পীদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির থেকে ডাক।

পার্থ এগিয়ে গেল।

সে গাইবে।

দেশের চারণ কবি গাইবে সে।

বলবে ভয় নেই—তোমরা অবশ্যই জিতবে। দেশ জননীর মুখোজ্জ্বল তোমরা নিশ্চয়ই করবে।

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার

একেবারে ফ্রন্ট্ লাইন থেকে কিছু দূরে সি, সি, এস· —ক্যাসুলটি ক্লিয়ারিং ষ্টেশান বা অস্থায়ী হাসপাতাল।

শহরের সীমানা দূরে।

পাকা বাড়ি নয় তাবু খাটিয়ে হাসপাতাল।

ট্রেনে উঠেই মীনাক্ষী তার আইডেনটিটি কার্ডটা খাম থেকে বের করে দেখতে গিয়ে খামের ভিতরে তার পোস্টিং অর্ডারটা পায়।

আর্মী হেডকোয়ার্টার থেকে পোস্টিং অর্ডার—১৯নং সি. সি. এস য়ে।

কবে তার ইন্টারভিউ হলো—কবেই বা সিলেকশন হলো আর কোথাই বা তার নার্সিংয়ের ট্রেনিং হলো।

আশ্চর্য লোকগুলোর কেরামতী—সব কেমন সুন্দর গুছিয়ে করেছে—নিখুঁত ভাবে করেছে। সে এখন একজন পাকাপোক্ত মিলিটারী নার্স।

মিস্ লায়লাবানু।

দুটো দিন ধরে ট্রেনে—স্টীমারে—ট্রাকে কেমন করে যে সে এসে নির্দিষ্ট হাসপাতালে পৌঁছাল নিজেই তা জানে না।

একটা স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যেন সব কিছু ঘটে গেল।

সে রাত্রে পার্থর সেই ডাকটা যেন এখনো কানে এসে বাজে।

নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছিল তাকে সে। নচেৎ 'ক্যামেলিয়া' নামে অমন চিৎকার করে পিছু থেকে ডাকত না তাকে।

ক্যামেলিয়া।

ক্যামেলিয়ার মৃত্যু হয়েছে পার্থ। তোমার ক্যামেলিয়ার মৃত্যু হয়েছে।

সেবা কোন দিন করে নি মীণাক্ষী—কিন্তু মেয়ে ত সে—মেয়ে জাতকে কি সেবা শেখাতে হয়, সেবা যে তার রক্তের মধ্যে।

তাছাড়া সেবার হাতে খড়ি ত তার আগেই হয়ে গিয়েছে। সেই পার্থকে যখন সে সেবা করত।

ঠাট্টা করে পার্থ বলেছিল একদিন, তুমি নার্সিংয়ের ট্রেনিং কখনো নিয়ে ছিলে নাকি ক্যামেলি—

কেন বলত!

নইলে এমন করে সেবা কর কি করে?

তুমি একটি নীরেট—

কেন!

তা নয়ত কি—মেয়েদের সেবার ট্রেনিং আবার কখন নিতে হয় নাকি!

হয় না বুঝি!

না গো না—

আজ আহতদের সেবা করতে করতে সেই কথাটাই বুঝি বার বার মনে হয় মীনাক্ষীর।

তবু ভাল তাকে এখানে এনে ওরা স্পাইংয়ের কাজে ঠেলে না দিয়ে সেবার মধ্যে নিযুক্ত করেছে।

সারাটা রাত ঘুমায় না মীনাক্ষী।

আহতের বেডে বেডে ঘুরে বেড়ায়।

কি হলো ঘুম হচ্ছে না বুঝি!

না!

চোখটা বোজো—আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই—

মাথায় হাত বুলাতে থাকে মীনাক্ষী।

রোগীর দু চোখে ঘুম নামে।

কারো পা গেছে—কারবা হাত গেছে—কিন্তু আশ্চর্য, কারো যেন কোন দুঃখ নেই, স্বাধীন দেশের সৈনিক—

তাদের সেই গর্ব যেন দৈহিক সমস্ত যাতনাকে সুস্থতা দিয়েছে।

মাঝখানে একদিন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজী এলেন—

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—পণ্ডিতজী জিন্দাবাদ—

পণ্ডিতজী বলেন, না ভাইয়ো, বলো জয় হিন্দ্—

জয় হিন্দ্—

॥ ২৬ ॥

সেদিন নিজের তাবুতে সবে এসে প্রবেশ করেছে কাজ শেষে মীনাক্ষী—ধরা চূড়াগুলো তখনো গা হতে নামায় নি—নজরে পড়ল, একটা চিঠির খাম পড়ে আছে সামনের টেবিলে।

কে চিঠি দিল—

পার্থ—না পার্থ জানবে কি করে তার ঠিকানা।

তবে কে!

তবে কি—কম্পিত হাতে খামটা ছিড়ে ফেলল মীনাক্ষী—হ্যাঁ—যা ভেবেছিল তাই—সংক্ষিপ্ত চিঠি—সামনের বুধবার রাত্রে—দশটার পর ২৮নং ক্যাম্পে যাবে—পেরিমিটার থেকে এক মাইল দূরে। পাস ওয়ার্ড—ইয়াংসিকিয়াং—রাস্তার ম্যাপ—নীচে আঁকা রইল।

সংবাদ চাই—

ব্যাস্ আর কিছু না।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ চিঠিটা হাতে করে যেন পাথরের মত বসে থাকে মীনাক্ষী।

যেতে হবে—যেতে হবে বৈকি।

যাবে সে।

বুধবার মানে—কাল বাদে পরশুই ত।

রাত দশটার পর!

আশ্চর্য—সেদিন মীনাক্ষীর অফ ডিউটি।

মনে মনে তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ছকে ফেলে মীনাক্ষী। কি করবে অতঃপর স্থির করে ফেলে।

আর দ্বিধা নয়—আর সংকোচ নয়।

যে পাপ সে করেছে—যে অপরাধ সে করেছে তার কিছুটা অন্তত যদি মূল্য শোধ করে যেতে পারে সে—

হে ভগবান—শক্তি দাও।

সাহস দাও।

অন্ধকার রাত—

তবু একটা কালো কম্বলে আপাদ-মস্তক আবৃত করে বের হলো মীনাক্ষী তার তাঁবু থেকে।

পাশেই জঙ্গল।

সেই দিকে এগিয়ে চলে।

হিমেল বাতাস পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তুষারের কণা মেখে নিয়ে যেন চাবুক হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গলের গা ঘেঁষে পাহাড়।

পাহাড়ের মধ্যে সরু গিরিবর্ত্ম।

দু'পাশে খাড়া উঁচু পাহাড়, আর ঘন জংগল।

তার মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছে মীনাক্ষী—চীনাদের শিবিরে সে গত রাত্রে গিয়েছিল, অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছে—ফিরে গিয়ে ইন্‌ডিয়ান আর্মীর কমাণ্ডেন্ট—মেজর জেনারেলকে দিতে হবে।

তারপর তার ছুটি।

প্রশ্ন উঠবেই কেমন করে সে চীনা যুদ্ধ শিবির থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনল—অকপটে তখন সে সব কথা স্বীকার করবে।

বলবে—অপরাধী—দেশদ্রোহিনী আমি—আমার প্রাণদণ্ড দাও—

হাত পা ছিঁড়ে গিয়েছে—ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। আর বুঝি পারে না মীনাক্ষী।

ভারতীয় সীমানা শিবির আর কতদূর—

পারবে নাকি—মীনাক্ষী পৌঁছাতে পারবে নাকি সেখানে?

পারবে—পারতে তাকে যে হবেই।

যুদ্ধ-শিবিরে গানের আসরের শেষে এখন কৌতুক পরিবেশনের পালা শুরু হয়েছে।

ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটেছিল।

হাসপাতালের ইউনিটের একটা গ্রুপ্ ছবি ফৌজী সংবাদ পত্রে বের হয়েছিল—

তার মধ্যে—মিলিটারী নার্সের বেশে মীনাক্ষীকে দেখে চম্‌কে ওঠে পার্থ।

মীনাক্ষী—নিশ্চয়ই সেই।

একবার মনে হয়েছিল মীনাক্ষী মিলিটারী নার্স কি করে হবে—কিন্তু ফটোর আশ্চর্য সাদৃশ্য—সেই সাদৃশ্যই মনের কৌতূহলকে তার তীব্র করে তোলে। এ সন্দেহের অবসানের দরকার।

এবং তখনই সে মনে মনে স্থির করে অগ্রগামী কিছু দূর অবস্থিত ক্যাসুলটি ক্লিয়ারিং সেন্টার হাসপাতালে সে একবার যেমন করে হোক যাবেই।

কয়দিন ধরে সেই সুযোগের আশায় ছিল পার্থ এখানে আসা অবধি কিন্তু সুযোগ পায় নি।

সামনের দিকে—ফ্রন্ট্ লাইনের দিকে যাওয়াও একেবারে নিষেধ—

কড়া পাহাড়া—

কিন্তু আজ সেই সুযোগ মিলে গেল যেন পার্থর।

সবাই আমোদের আসরে ব্যস্ত—

সেই ফাঁকে পার্থ বের হয়ে পড়ল শিবির থেকে সবার অলক্ষ্যে।

সামনের ক্যাসুলটি ক্লিয়ারিং হাসপাতালে সে আজ হানা দেবেই স্থির করেছে।

খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিল—বেশী দূরের পথ নয়—মাত্র মাইল তিনেক পথ।

পার্থর স্থির ধারণা সেই হাসপাতালে গেলেই মীনাক্ষীর সন্ধান পাবে সে।

কারণ—গ্রুপ ফটোর মধ্যে সেই নার্স—আর কেউ নয়—মীনাক্ষীই। নচেৎ অমন আশ্চর্য মিল চেহারার হয় কি করে। তার চোখে আর সে ধুলো দিতে পারবে না।

কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলল অন্ধকারে পার্থ।

পাহাড় জংগলা পথে ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকারে অন্য পথে গিয়ে পড়ল।

উঃ কি অন্ধকার—আর কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

ভুল পথে এগুতে এগুতে চাইনীজ পেরিমিটার পার হয়ে পার্থ চায়নীজ এক রেকি পার্টির মুখোমুখি পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চাইনীজ রেকি পার্টি গুলী চালায়।

গুলিবিদ্ধ পার্থ একটা আর্ত যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট শব্দ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে

ইনডিয়ান পেরিমিটারে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা পায় মীনাক্ষী অন্য প্রান্তে।

সেন্ট্রী চ্যালেঞ্জ করে, হল্ট—

ফ্রেণ্ডস্—থমকে দাঁড়ায় মীনাক্ষী।

সেন্ট্রী এগিয়ে আসে রাইফেল নিয়ে—মীনাক্ষীর পরনে পুরুষ সিভিলিয়ান পোশাক।

সেন্ট্রীর সন্দেহ হয় সে তাকে সোজা নিয়ে গিয়ে কম্পানী কমাণ্ডারের তাবুতে হাজির করে।

কর্ণেল চোপরা বের হয়ে এলো, কি ব্যাপার শুক্রমুখ—

এই—এই জেনানা পুরুষের বেশে আমাদের পেরিমিটারে ঢুকছিল—

তাঁবুর আলোটা বাড়িয়ে দেয় কমাণ্ডার চোপরা।

পুরুষের বেশ—মাথায় পাগড়ি খসে পড়ায় কখন ঘন চুল সারা পিঠ ছড়িয়ে পড়েছে।

মীনাক্ষী ধরা পড়েছে।

who are you—কে তুমি—

বাইরে তখন অল্পে অল্পে রাতের অন্ধকার শেষে ভোরের আলো ফুটে উঠছে।

॥ ২৭ ॥

কে তুমি বল—জবাব দাও—speak out.

কঠিন কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে কর্ণেল চোপরা।

আমি—আমার পরিচয় দেবো তার আগে একটা সংবাদ তোমাকে দিতে চাই কর্ণেল—আমি শত্রু শিবিরে গিয়েছিলাম—

what—

হ্যাঁ—world situation-এর জন্য তারা আর এখন অগ্রসর হবে না—

তুমি—তুমি কেমন করে জানলে—

জেনেছি—জেনারেলের সঙ্গে—জেনারেল সানয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় জেনেছি—

then—then you are a spy—

হ্যাঁ—আমি হ্যাঁ—তাছাড়া আর কি—হ্যাঁ—তাই—

তুমি—

আমি বাংগালী—আমার নাম মীনাক্ষী রায়—অনেকদিন দেশে থেকে শত্রুর দলে আমি সংবাদ বেচা-কেনা করেছি—আমি জানি দেশদ্রোহিণী আমার শাস্তি প্রাণদণ্ড—তাই দাও—আমি প্রস্তুত—

তু—তুমি স্পাইং করেছো—কিন্তু কেন—কেন তুমি একাজ করলে মীনাক্ষী—

জানি না কেন করলাম—কি করে কারলাম তাও জানি না। তবে করেছি—

বাইরে ঐ সময় একটা গোলমাল অস্পষ্ট শোনা যায়। সজ্ঞানে করেছো? আবার প্রশ্ন।

হ্যাঁ—কিন্তু বিশ্বাস করো—করতে আমি চাইনি—এই জঘন্য হীন কাজ করতে আমি চাইনি—আমি সাধারণ একটি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মেয়ের মতই ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম। স্বামী পুত্র-নিয়ে একটি সুখের সংসার গড়তে চেয়েছিলাম—

and you did it—

হ্যাঁ—একটি মানুষকে ভালবেসেছিলাম—সেও আমায় ভালবেসেছিল। দু'জনে ঘর বাঁধব এমন সময় হলো তার টি, বি—তার গলা দিয়ে রক্ত পড়লো—

May I come in sir—

বাইরে থেকে জমাদার পাণ্ডের গলা শোনা গেল।

Yes—আইয়ে জমাদার সাব্—

জমাদার পাণ্ডে ভিতরে প্রবেশ করে জুতোর ক্লিক্ করে কর্ণেলকে স্যালুট দিল।

কেয়া হ্যায় জামাদার সাব্—

এক বাংগালীবাবু কর্ণেল সাব্।

বাংগালী বাবু—you mean civilian !

হ্যাঁ—আমাদের পেরিমিটারের বাইরে তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—সম্ভবতঃ চীনা রেকি পার্টির গুলীতে সে নিহত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের ঢালু পথে আমাদের পেরিমিটারের মধ্যে এসে পড়ে—

কোথায় সে—

ডেড বডি বাইরে ষ্ট্রেচারে আছে—

কই চলত দেখি—না থাক তাঁবুর মধ্যেই নিয়ে এসো।

ষ্ট্রেচারটা তাঁবুর মধ্যে আনা হলো।

রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ।

লাইটটা তুলে ধরে জমাদার পাণ্ডে—বুকের মাঝখানে ঠিক গুলি লেগেছে।

আলোটা মৃতের মুখের সামনে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীক্ষ্ম আর্ত চিৎকার করে ওঠে মীনাক্ষী—

পার্থ—

চমকে কর্ণেল ফিরে তাকায় মীনাক্ষীর দিকে।

মীনাক্ষীর সর্বশরীর তখন থরথর করে কাঁপছে—সে অস্ফুটে বলে, না—না, না—না—না—

তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় মাটিতে।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁবুর মধ্যে এসে ঢোকে।

॥ ২৮ ॥

মিলিটারী কোর্ট মর্শাল।

এসপিয়নেজ—স্পায়িং—দেশের বিরুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতাই।

অতএব চরম দণ্ড।

বিচার চললো--দণ্ডাদেশও ঘোষিত হলো।

কিন্তু মীনাক্ষী সেই যে মুখ বন্ধ করেছে আর মুখ খোলেনি।

যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

মিলিটারী ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে বন্দিনীকে নিয়ে যাবে তেজপুরে—

কোয়ার্টার গার্ডে এসে ঢুকল কর্ণেল চোপরা।

একটা খাটিয়ার উপর বসে কে ও।

জীর্ণ শীর্ণ।

সমস্ত মাথার চুল শ্বেত শুভ্র।

ঐ কি মাত্র কুড়ি দিন আগেকার সেই যুবতী নারী মীনাক্ষী?

মীনাক্ষী রায়।

মিলিটারী গার্ড বললে, ওঠো—চল—

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায় মীনাক্ষী—শূন্য অসহায় দৃষ্টি।

চলো—

অশীতিপর এক বৃদ্ধা যেন ক্লান্ত শ্লথ পায়ে এগিয়ে চলে অদূরে দণ্ডায়মান কালো মিলিটারী ভ্যানটার দিকে।

দু'পাশে হেঁটে চলে দু'জন রাইফেলধারী প্রহরী।

তাদের ভারী এ্যমুনিশন বুটের আওয়াজে শোনা যায় মচ্- মচ্—মচ্--

দিনের শেষ আলোটুকু নেফার আকাশ থেকে একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আর একটু পরেই দেখা দেবে সন্ধ্যাতারাটি আকাশের প্রান্তে।

একক নিঃসঙ্গ করুণ বিষণ্ণ সন্ধ্যাতারাটি।

সৈন্য শিবিরে বিউগল বাজছে।

—তারপর? ওঠালাম আমি—

কিন্তু কারাগারে নিয়ে যাওয়া আর হলো না তাকে, ডাক্তার বক্সী বলে।

কেন?

কারণ তখন সে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ---ডাক্তারদের পরামর্শে তাকে এখানেই পাঠিয়ে দিল সরকার। সেই থেকে ও এখানেই আছে--। তিন মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় ওর মুখে কথা ফুটল—এবং প্রথম কথাটি ফুটলো—

কি!

ও বললে, ওর নাম ক্যামেলিয়া---

চম্পাবাঈ

শহর কলকাতার বিশিষ্ট পল্লী।

কিড্ স্টীট অঞ্চল।

কিড্ স্ট্রীট ধরে কিছুটা উত্তরমুখী এগুলে একেবারে বড় রাস্তার উপরেই বাড়িটা।

পুরাতন আমলের স্ট্রাকচার—বনেদী কলকাতার ধনীর গৃহ। লাল রংয়ের তিনতলা বাড়ি।

ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হলে, তা সে গাড়িতেই হোক বা পদব্রজেই হোক, বাড়িটা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

বিরাট দোপাল্লার লোহার গেট।

গেটের দুই পাল্লার ঠিক মধ্যস্থলে হৃদ্‌পিণ্ডের মত গোলাকৃতি ঝকঝকে পিতলের ফলকে এক দিকে ব্রোঞ্জের অক্ষরে ইংরেজী 'এন' অন্য দিকে বাংলা অক্ষরে 'নী' লেখা।

অর্থাৎ নীলাদ্রি চৌধুরীর নামের আদ্যক্ষর ইংরেজী ও বাংলার 'এন' বা 'নী'।

অবিশ্যি গেটের গায়ে দু'পাশে নেমপ্লেটে ইংরেজি ও বাংলায় সম্পূর্ণ পরিচয় লেখা আছে। ইংরেজিতে এন. চৌধুরী এম. এ (অক্সন) বার-অ্যাট-ল ও বাংলায় নীলাদ্রি চৌধুরী কেবল।

গেট দিয়ে ঢুকেই নুড়িঢালা চওড়া রাস্তা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে গোলকৃতিভাবে একটা ফোয়ারাকে বেষ্টন করে যেন দু'বাহু বাড়িয়ে পোর্টিকোতে গিয়ে মিশেছে।

এক পাশে প্রশস্ত সবুজ মখমলের মত লন, অন্য দিকে শীতের মৌসুমী ফুলের অজস্র রঙিন সমারোহ।

পোর্টিকোতে খান দুই বড় বড় গাড়ি পাশাপাশি পার্ক করতে পারে অনায়াসেই।

পোর্টিকোর সামনে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের মধ্যস্থলে সম্পূর্ণ নগ্ন যৌবনোচ্ছল এক শ্বেত পাথরের নারীমূর্তি।

পোর্টিকো থেকে অন্দরে পা দিলেই প্রশস্ত আধুনিক আসবাবে সজ্জিত একটি হলঘর।

হলঘরের এক দিকে লাইব্রেরী—

অন্য দিকে পাশাপাশি দুটো ঘরে একটায় নীলাদ্রি চৌধুরীর অফিস, অন্যটা তার বিশেষ পরামর্শ বা বিশ্রাম ঘর।

গেটে নেমপ্লেটে নীলাদ্রী চৌধুরীর পরিচয় বার-অ্যাট-ল থাকলেও তার আরো অন্য পরিচয় আছে শহরে, অন্যতম ধনী বিরাট ব্যবসায়ী—ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট একজন।

ব্যারিস্টার নীলাদ্রি চৌধুরী যে শহরে একজন নামকরা বাঘা বাঘা ব্যারিস্টার ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট তাই নয়—তার অন্য পরিচয়ও একটা আরো আছে। শহরের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবীও বটে। বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেমন সে জড়িত তেমনি সমাজের উঁচু মহলে রীতিমত প্রতিপত্তি তার।

এককথায় শহরে অন্যতম বিশিষ্ট একজন ধনী ব্যক্তি হিসাবে ধনিক সমাজেও শহরের সে একজন চিহ্নিত ব্যক্তি।

আট-দশটা বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মালিক বা অধিকর্তা—নিজের ব্যবসা কোল মাইন্‌স ও টি এসটেট্ ছাড়াও নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে নানাভাবে জড়িত, চেয়ারম্যান-ডাইরেকটার ইত্যাদি।

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি থাকলে যা হয়। নানা ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের পেট্রন, প্রেসিডেন্ট ও মেম্বার।

লোকটার দান-ধ্যানও কম নয়।

মানুষটার সর্ব ব্যাপারে যেন একটা প্রতিষ্ঠার, আত্মপ্রত্যয়ের, আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ।

অর্থাৎ নীলাদ্রি চৌধুরী আজকের সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ এক চিহ্নিত ব্যক্তি।

বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। কিন্তু আজো অবিবাহিত।

দোহারা চেহারা।

ব্যায়ামপুষ্ট সুঠাম দেহ। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির বেশী নয়।

রংটা যদিও একটু চাপা—কপালটা সামান্য চওড়া—নাকটা একটু ছড়ানো—ঠোঁট দুটি সামান্য মোটা, তাহলেও তার ঈষৎ কটা চুল, বেশভুষা, হাঁটা, চলা, কথাবার্তা এমন কি দাঁড়ানো ও সর্বক্ষণ চাপা হাসিটির মধ্যে বিশেষ একটা আভিজাত্য, একটা ব্যাক্তিত্ব সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে বের হয়।

কপালের দু'পাশে রগের চুলে তো রূপালী ছোঁয়া লেগেছেই, মাথার অন্যান্য অংশের কেশেও অনেক জায়গায় রূপালী দাগ পড়েছে।

তবু—তবু যেন দেহের মধ্যে একটা সুসংহত যৌবন টলমল করছে, সর্বক্ষণ মনে হয়।

ইলেকশন সন্নিকটে।

লোকসভার অন্যতম প্রার্থী হিসাবেই যে শুধু নীলাদ্রি চৌধুরী দাঁড়িয়েছে, তাই নয়, সকলেই জানে, আসন্ন নির্বাচনযুদ্ধে তার জয় সুনিশ্চিত।

বোধ হয় ঐ কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে বিশিষ্ট এক সংবাদপত্রের রিপোর্টার পরাশর মিত্র হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে নীলাদ্রি চৌধুরীর বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

আজকাল আসন্ন ইলেকশনের ব্যাপারে সর্বক্ষণই প্রায় নীলাদ্রি চৌধুরীর বাড়ির গেট খোলা থাকে—মানুষজন ও গাড়ির যাতায়াত ঘন ঘন চলে সকাল থেকে রাত আটটা-দশটা পর্যন্ত।

পরাশর মিত্র লোকটির বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে। বেশ গোলগাল চেহারা—বেঁটে।

মাথার সামনের দিকটা সবটাই টাক—চকচক করে।

পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী।

পায়ে চপ্পল।

হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ।

একবার একটু যেন ইতস্তত করে পরাশর মিত্র তারপর গেট দিয়ে ভিতরে অগ্রসর হয়—

দরোয়ান বাধা দেয় না—

আজকাল তো গেট খোলাই থাকে—সর্বক্ষণই লোকজন আসছে আর যাচ্ছে।

পরাশর মিত্র এগিয়ে চলে—

পোর্টিকো থেকে সামনের হলঘরে ঢোকে খোলা দরজাপথে।

জনা কুড়ি-পঁচিশ লোক হলঘরে—নানাবয়সী—আসন্ন ইলেকশন ক্যামপেনের ব্যাপারেই বোধহয় আলোচনা চলেছে।

বেয়ারা ঘন ঘন চা দিচ্ছে কাপে কাপে আর প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট।

সিগারেটের ধোঁয়ায় হল ঘরটা যেন একটা ধোঁয়া-ঘর হয়ে উঠেছে।

পরাশর মিত্র বার কয়েক এদিক ওদিক তাকাল।

একজন বেয়ারাকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকল।

বেয়ারা জিজ্ঞাসা করে, কি চাই বাবু?

এই কার্ডটা—

বেয়ারা শিবদাস প্রশ্ন করে, সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন? অ্যাপায়েন্টমেন্ট আছে?

না—মানে—

তাহলে তো সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না—অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখা হয়েছে সেক্রেটারী দিদিমণির সঙ্গে।

তুমি নিয়ে যাও না কার্ডটা সাহেবের কাছে একবার—না দেখা হলে চলে যাবো।

অযথা চেষ্টা করছেন বাবু—সাহেব দেখা করবেন না—

যাও না একবার কার্ডটা নিয়ে—

বেশ দিন—বেয়ারা শিবদাস কার্ডটা হাতে নিল বটে, কিন্তু মুখটা প্রসন্ন মনে হলো না।

অফিসঘরের মধ্যে তখন নীলাদ্রি চৌধুরী তার পার্সোনাল স্টেনোকে একটা জরুরী চিঠি ডিকটেট করছিল।

পরনে পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন। সকাল আটটা হলেও বোঝা যায়, ইতিমধ্যেই নীলাদ্রির স্নান হয়ে গিয়েছে।

অদূরে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে কতকগুলো চেক লিখছিল একটি তরুণী—বয়স তার ত্রিশের নীচেই।

রোগা পাতলা চেহারা এবং রংটা উজ্জ্বল শ্যাম হলেও চেহারার মধ্যে যেন একটা পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য আছে তরুণীটির।

তরুণীটির চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত বুদ্ধির দীপ্তি যেন স্পষ্ট। সাদামাটা পোশাক। সাধারণ একখানি তাঁতের শাড়ি, ফুল স্লিভের ব্লাউজ। এক হাতে মোটা একটা সোনার বালা, অন্য হাতে ছোট একটা সোনার ঘড়ি।

নাম তনিমা ব্যানার্জী—ইংরাজি সাহিত্যে এম.এ।

নীলাদ্রীর সেক্রেটারী যদিও তনিমা ব্যানার্জী, কিন্তু কিছুদিন থেকেই নানা মহলে একটা কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই নাকি তনিমাকে বিয়ে করবে নীলাদ্রি।

চিঠিটা ডিকটেট করতে করতে নীলাদ্রি মধ্যে মধ্যে সামনেই টেবিলের উপরে রাখা অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গে ঐদিনকার বিশেষ দৈনিক 'সমাজদর্পণ'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই নীলাদ্রি চৌধুরীকে নিয়ে যে মুখরোচক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে বিশেষ সংবাদদাতা অগ্নি মিত্র কতৃক, সেটার দিকে তাকাচ্ছিল আর বলছিল : as per our correspondence ref, no 699/c.etc.... your tender has been accepted–so we would request you to do accordingly etc.– চিঠিটা তাড়াতাড়ি type করে আনো—আজই ডাকে যাওয়া চাই—

স্টেনো তার খাতাপত্র নিয়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তনিমা ব্যানার্জী ঐ সময় প্রশ্ন করে, হীতেন্দ্রনারায়ণ কে. জি-র ডোনেসনটা কি এই মাস থেকে বাড়ানো হবে—

হ্যাঁ—নীলাদ্রি জবাব দেয়, আরো দুশো বাড়িয়ে দাও—

অবলা আশ্রমের ডোনেসনটা—

হ্যাঁ, ওখানে হাজার টাকা বাড়িয়ে দাও—ওদের ঘরগুলো সব মেরামত করা দরকার—

বেয়ারা শিবদাস ঐ সময় এসে পরাশর মিত্রর কার্ডটা একটা প্লেটে করে সামনে ধরল নীলাদ্রির।

কার্ডটার দিকে তাকিয়েই নীলাদ্রির ভ্রু দুটো যেন কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

তনিমা—

কিছু বলছেন?

মানুষটার ধৃষ্টতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

কার কথা বলছেন?

পরাশর মিত্র—সমাজদর্পণের রিপোর্টার—অর্থাৎ ইন্দ্র মিত্র ছদ্মনামধারী।

তনিমা ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

লোকটা কিছু দিন যাবৎ নীলাদ্রির ছিদ্রান্বেষণে যেন অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে। এবং তার লক্ষ্যটা যে কি, তাও বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়।

আসন্ন ইলেকশনের প্রার্থী নীলাদ্রি চৌধুরীকে জনগণের সামনে প্রার্থী হিসাবে একজন অনুপপযুক্ত ব্যাক্তি প্রতিপন্ন করা।

ব্যাপারটা নিয়ে দু'জনার মধ্যে কিছু আলোচনাও হয়েছিল ইতিপুর্বে। কিন্তু নীলাদ্রি যে ব্যাপারটায় তেমন কিছু একটা গুরুত্ব দিয়েছে তাও নয়, কারণ সে ভাল করেই জানে, যে মাটিতে সে দাঁড়িয়ে আছে, সেটায় ফাটল ধরার কোন আশংকাই নেই।

আজকের সংবাদপত্রেই লোকটা যে ভাবে তার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছে, তারপরও এখানে এসে দাঁড়াতে পারে, নীলাদ্রি ভাবতেই পারেনি।

॥ ২ ॥

শিবদাস—নীলাদ্রি ডাকে।

সাহেব—

বলে দে, দেখা হবে না—

শিবদাস ফিরে যাচ্ছিল, নীলাদ্রি আরো বলে, বলে দিবি, কখনও যেন না আসে আর এখানে—

কিন্তু বাধা দিল তনিমা, শিবদাস দাঁড়াও—

শিবদাস দাঁড়াল আবার ঘুরে।

আমার মনে হয়, লোকটা যখন এসেছে, একবার দেখা করাই ভাল আপনার।

কিন্তু—

জানি, লোকটা নোংরা ইতর—কিন্তু সামনে আপনার ইলেকশন—

নীলাদ্রি মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে—বুঝি তনিমার কথাটা অযৌক্তিক নয়, ভেবেই ইতস্তত করে—

দরজা ঠেলে ঐ সময় নীলাদ্রির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু তুষারশুভ্র সেন ঘরে এসে প্রবেশ করল।

খাঁটি দেশসেবী—এককালে বিপ্লবী দলে ছিল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়—এখন একজন নাম করা সোস্যাল ওয়ার্কার।

এবং নিজে ছোটখাটো একটা সাবানের ফ্যাকট্রি খুলেছে।

এসো, তুষারশুভ্রকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। তারপর ভৃত্য শিবদাসের দিকে ফিরে বলে, একটু পরে বাবুকে পাঠিয়ে দিস।

শিবদাস ঘাড় হেলিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

না হে নীলাদ্রি, আমার জন্যে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। কোন জরুরী ব্যাপারে কেউ এসে থাকলে—

তুষারশুভ্রকে বাধা দেয় নীলাদ্রি, জরুরী আবার কি, একটা ছুঁচো—

ছুঁচো—

ইলেকশনে নেমেছি তাই আমার আশেপাশে সর্বক্ষণ ছুঁকছুঁক করে বেড়াচ্ছে। যদি কোন ছিদ্র পায় তো বা আমার জীবনের এমন কোন যদি পাতা থাকে তো সেটা মসীলিপ্ত করে দশজনের চোখের সামনে মেলে ধরতে পারে—

তাই বুঝি?

আর কি?

কিন্তু বেচারা জানে না যে আমার মধ্যে লুকোছাপা কিছু যেমন নেই, তেমনি কে আমার এমনকি জানতে পারল, তা নিয়েও মাথব্যথা নেই—

তুষারশুভ্র হাসে।

হাসছো কি! জীবনটা চিরদিন ষোল আনা উপভোগ করে এসেছি আজ পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতে যতদিন বাঁচবো, করে যাবো।

এবারেও তুষারশুভ্র নিঃশব্দে হাসে।

Morality আর ঐ bogus vanity আমার নেই। হাসছো কি! তোমারও অজানা নয়, তোমাদের ঐ সব কিছুতে যিনি আমায় ঐশ্বর্য ও মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স এবং অটুট স্বাস্থ্য ও সম্ভোগশক্তি দিয়েছেন—তারপর একটু স্রাগ করে বলে, well if I don't know how to utilise the same that would be none of his fault.

নীলাদ্রি চৌধুরী বরাবরই অমন স্পষ্ট খোলাখুলি কথা বলে—যা করে বা বলে তার জন্য তার এতটুকু সংকোচ বোধ আছে, অতি বড় শত্রুতেও সে দোষ তাকে কোন দিন দিতে পারেনি।

কিন্তু তবু তুষারশুভ্র তনিমার সামনে কেমন যেন একটু নিজেকে বিব্রত বোধ করে। কারণ তনিমা তখন ঘরের মধ্যেই তার চেয়ারে বসে একটা ফাইল গুছিয়ে রাখছিল।

নীলাদ্রিকে বাধা দিয়ে তুষারশুভ্র বলে, আঃ নীলাদ্রি থাম তো। তুমি দেখছি চিরদিন একই রকম রইলে—

হাঃ হাঃ করে নীলাদ্রি হেসে ওঠে, মিস ব্যানার্জীর কথা ভাবছো—গত দু' বছরে ও আমাকে যদি যথেষ্ট চিনতে না পেরে থাকে তাহলে সেটা জানবো ওরই দুর্ভাগ্য।

যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো নীলাদ্রি বললে, সে কিন্তু পূর্ববৎ কাজের মধ্যেই মগ্ন আছে দেখা গেল—মনে হলো তার কানে যেন কোন কথাই প্রবেশ করেনি।

নীলাদ্রি বলে চলে to enjoy a life is not a crime—flesh and blood got its physiological

hunger. যাকগে—কেন এসেছো বল।

একটা কথা বলতে এসেছিলাম—

কি বল তো?

মানে ঐ সমাজদর্পণের নিউজ রিপোর্টার অগ্নি মিত্র সম্পর্কে—

You mean ঐ ছুঁচো—পরাশর মিত্র—

হ্যাঁ—লোকটাকে তুমি চেনো না, কিন্তু আমি চিনি। যেমন নোংরা তেমনি জঘন্য চরিত্রের—ওর সম্পর্কে একটু সাবধান হওয়াই বোধ-হয় ভাল—সামনে election তোমার।

আজ সকালে সমাজদর্পণের প্রকাশিত আমার সম্পর্কে নিউজটা পড়ে বুঝতে পারছি, তুমি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছো শুভ্র—

হ্যাঁ—মানে—

আরে বাবা সত্যি কথা বলতে কি, মিথ্যা তো কিছু বলেনি। নামে বেনামে দশ-বারটা ব্যবসাও আছে নীলাদ্রি চৌধুরীর এবং নারী সম্পর্কে তার দুর্বলতাটাও কারো জানতে বাকী নেই—আরে ওসব তো আজকালকার অঙ্গের ভূষণ।

কিন্তু ঐ অভিনেত্রী মিতালী মানে কে, বুঝতে পেরেছো?

কেন পারবো না! Don't worry my dear brother— নীলাদ্রি চৌধুরীর metal কে ঐ ছুঁচো মিত্র জানে না—

লোকটা আবার তোমার বাইরের ঘরে বসে আছে, দেখে এলাম—

হ্যাঁ দর্শন প্রার্থী।

দেখা করবে—

বাড়িতে এসেছে যখন দেখা করতে হবে বৈকি—তাছাড়া মিস্ ব্যানার্জীরও তাই ইচ্ছা—

গালাগালি দিও না যেন আবার—

না, না—আমি তো আর পাগল হইনি—

আবার শুভ্র হেসে বলে, যাক শোন—এম. পি. শঙ্করনারায়ণের সঙ্গে কথা বলেছিলে?

হ্যাঁ কালই হোটেলে রাত্রে দেখা হয়েছিল—বলেছি তোমার ফ্যাকট্রির কথা—

কি বুঝলে!

তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছে।

দেখা করে কোন লাভ হবে?

মনে হয়—দেখা তো করো, তারপর আবার অমি বলবো।

তাহলে এখন চলি হে।

এসো—

তুষারশুভ্র বের হয়ে গেল অতঃপর।

পরক্ষণেই প্রায় পরাশর মিত্র ঘরে এসে ঢোকে।

নমস্কার স্যার—

কি খাবেন বলুন—চা কোকো কফি—নীলাদ্রি চৌধুরী বলে ওঠে পরাশরকে সম্বোধন করে তার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে।

না, না,—ওসব কিছুর প্রয়োজন নেই এখন—আমি এসেছিলাম একটু কাজে স্যার—বিগলিতভাবে পরাশর মিত্র বলে।

কাজ?

হ্যাঁ—মানে আপনার life-এর important ঘটনাগুলো—মানে বুঝতেই তো পারছেন জনগণের প্রতিভূ হতে চলেছেন আপনি লোকসভায়—এ সময়—

কেন আজকের সমাজদর্পণে যা দিয়েছেন তা বুঝি ঠিক তেমন মুখরোচক হয়ে উঠল না।

ছি ছি, স্যার কি যে বলেন—তাছাড়া ওসব তো—ঠিক আমার অ্যাসিট্যান্টের লেখা—তাই সত্যি কথা জানাবো বলে—

কেন, সে খুব মিথ্যে বলেছে নাকি—কিন্তু শিরোনামায় লেখকের নামটা আপনারই আছে—

তাই তো আসা—

Rectify করবেন?

কি জানেন, আসলে বলতে কি, ওগুলো হচ্ছে স্রেফ আপনাদের মত বহু পরিচিত ব্যাক্তি সম্পর্কে নিউজ পেপার স্টান্ট্—

তাই বুঝি?

তা ছাড়া ও সবের একটা negative value'ও আছে জানবেন স্যার—

তাই কিছু positive value-র সংবাদ এবার পরিবেশন করতে চান? কিন্তু আমি একটা কথা বলছিলাম—

বলুন!

বলছিলাম, পন্ডশ্রম আর নাইবা করলেন। শুনুন মিত্র মশাই—হুল কলমে আপনার আছে হয়ত, কিন্তু নীলাদ্রি চৌধুরীর গায়ে যদি সে হুল ফোটাবেন ভেবে থাকেন, তো বলবো, ভুলই করেছেন—he knows very well how to throw a piece of flesh to a barking pup and to put his feet on its head—in time.

আপনি স্যার দেখছি সত্যি সতিই অত্যন্ত চটেছেন—

Not the least—বরং সকালবেলা উঠে কফি পান করতে করতে আপনাদের নিউজটা পড়তে পড়তে rather I enjoyed a lot—amused-আচ্ছা আপনি তাহলে এখন আসতে পারেন—কথাটা বলে নীলাদ্রি চৌধুরী ঘুরে তাকাল তনিমার দিকে, মিস ব্যানার্জী--

আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই এসেছিলাম স্যার—

নীলাদ্রি পরাশরকে কথাটা শেষ করতে দেয় না। বলে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি করতে, তাই না মিত্র মশাই—

যদি বলেন, তাই—

বলি না—তাই। কিন্তু কিছুদিন আগে হলেও বা সম্ভব ছিল—আজ আর সম্ভব নয়।

মিস ব্যানার্জী—নীলাদ্রি আবার বলে।

বলুন—

আজকের appoinment listটা একবার দেখ.তো—

পরাশর মিত্র বুঝতে পারে, অতঃপর আর ঘরে থাকা উচিত হবে না। সে নমস্কার জানিয়ে দরজা ঠেলে বের হয়ে যায়—দরজাটা ধীরে ধীরে আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়।

নীলাদ্রি ঐদিকেই আবার ঘুরে তাকিয়েছিল—মৃদুকণ্ঠে বলে, মিস ব্যানার্জী—

বলুন—

সামনের শনিবার আফগান হোটেলে যে ককটেল পার্টি দিচ্ছি, তার একটা কার্ড ঐ পরাশর মিত্রকে পাঠিয়ে দিও তো।

কিন্তু স্যার—সেখানে—

পাঠিয়ে দিও—শুনেছি, পরাশর নাকি দশ পেগেও ডাউন হয় না—

কেবল কি মজা দেখবার জন্যই পরাশর মিত্রকে পার্টিতে ডাকছেন? না মদ খাইয়ে লোকটাকে হাত করতে চান?

দুটোর কোনটাই না—

তবে?

ওকে আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চাই আমাকে উদ্দেশ্য করে যে চোখা চোখা বাণগুলো আজকের কাগজে ও ছুঁড়েছে, সেগুলো একটাও আমার গায়ে বেঁধেনি—কিন্তু—

জবাবে নীলাদ্রি যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলো না। ফোনটা বেজে উঠলো, তনিমাই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যাঁ—আছেন just hold on please, ব্যারিস্টার সেন—

তনিমা রিসিভারটা এগিয়ে দিতে দিতে নীলাদ্রির দিকে কথাটা শেষ করলো।

নীলাদ্রি রিসিভারটা নিল, কে—অনিল—হ্যাঁ—না হে তোমার কেসের সব কাগজগুলো এখনো দেখে উঠতে পারিনি, তবে যেটুকু দেখলাম, আসামী স্বীকার করুক বা না করুক—যে সব evidence কোর্ট যোগাড় করছে, তাতে করে তোমার খুব একটা সুবিধে হবে বলেও মনে হচ্ছে না—হ্যাঁ—হ্যাঁ যাবো—জাস্টিস্ মুখার্জীর ঘরে আমার একটা 'কেসের হিয়ারিং আছে বারটা নাগাদ—হ্যাঁ,

হাইকোর্টেই দেখা হবে। নীলাদ্রি রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

ব্যারিস্টার সেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর সেই মার্ডার কেসটা হাতে নিয়েছেন না? তনিমা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—বদ্রীদাস আগরওয়ালার মার্ডার কেস।

সংবাদপত্রে পড়ছিলাম সেদিন কেসটার কথা। তনিমা বলে, লোয়ার কোর্ট তো মেয়েটিকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দিয়েছে—

ভৃত্য শিবদাস এসে ঘরে ঢুকল, বাবুরা সব ও-ঘরে অপেক্ষা করছেন—

এখন আর দেখা করতে পারব না। পুলকবাবুকে বলে দে, সন্ধ্যায় কোর্ট থেকে ফিরে দেখা করবো—

তনিমা বলে, কিন্তু সন্ধ্যার পর তো আপনার এনগেজমেন্ট আছে।

কোথায় বল তো?

সন্ধ্যায় স্যর বি. চক্রবর্তীর ছেলের ম্যারেজের পার্টি আছে পোলক স্ট্রীটে—

আর কিছু—

না—আজ আর কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখা হয় নি—

ঠিক আছে—

শিবদাস ইতিমধ্যে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল।

এই চেকগুলো সই করে দিতে হবে, মিঃ চৌধুরী—

নীলাদ্রি চৌধুরী আর দাঁড়াল না—দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

॥ ৩ ॥

হাইকোর্ট।

শহরের সর্বোচ্চ আদালত।

বিচিত্র এক হত্যা মামলা।

মামলা অবিশ্যি অত্যন্ত স্পষ্ট। মোটিভ নিয়েই ড্রিংকের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে এক হতভাগ্যকে হত্যা করা হয়েছে।

জুরির বেঞ্চ নয়জন জুরি নিয়ে গঠিত। সবাই শহরের বিশিষ্ট নাগরিক।

জুরি-বেঞ্চ থেকে তাকিয়ে দেখছিল অপরাধিনীকে জুরীরা।

অপরাধিনী এক নারী।

চম্পাবাঈ নামেই শহরে নারীটি পরিচিত এক বারবনিতা।

বয়স খুব বেশী হবে না।

ত্রিশের নীচেই হবে বয়স। রোগা পাতলা চেহারা। গায়ের রঙও যেন কেমন ফ্যাকাশে রুগ্‌ন বলে মনে হয়।

অপরাধিনী অসুস্থ বলে কাঠগড়ায় নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে আছে, হাত দু'টি কোলের ওপর রাখা। মুখটা দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট।

অপর্যাপ্ত রুক্ষ চুলের কিছুটা বুকের উপর এসে পড়েছে।

নিম্ন আদালতের বিচারের পর সেসনে চালান হয়েছে কেস, শেষ বিচারের জন্য।

মামলার মোটমুটি বিবরণ হচ্ছে—

মাসখানেক আগে আসানসোল অঞ্চলের এক কোলিয়ারীর মালিক ধনী বদ্রীপ্রসাদ আগরওয়ালা তার অফিস স্টাফের মাইনে দেবার জন্য প্রায় প্রতিমাসেই যেমন কলকাতায় নিজে এসে ব্যাংক থেকে নগদ টাকা তুলে নিয়ে যেতো, তেমনি এসেছিল।

কিন্তু টাকাটা তুলে আর সেদিন ফিরে যেতে পারেনি—অন্যান্য কয়েকটা জরুরী কাজ ছিল, সেগুলো সারতে সারতে রাত হয়ে যায়।

হোটেলেই রাতটা কাটিয়ে পরদিন ফিরে যাবে স্থির করে।

রাত আটটা নাগাদ এক বন্ধু আসে—সমীরণ দত্ত।

রাতটা একটু স্ফূর্তি করে কাটানোর জন্য তার সঙ্গে বের হয়—সঙ্গে প্রায় নগদ পনের হাজার টাকা—অতগুলো টাকা হোটেলে রেখে যেতে সাহস পায়নি—সঙ্গে করে একটা ফোলিওর মধ্যে

টাকাগুলো নিয়েই বের হয়েছিল বদ্রীপ্রসাদ।

বন্ধু তাকে বিখ্যাত গায়িকা নৃত্যপটীয়সী চম্পাবাঈয়ের বাসায় নিয়ে যায়—গান শোনাবার জন্য।

সেখানে নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু মদ্যপান শুরু করে—রাত এগারোটা নাগাদ সমীরণ দত্ত চলে যায় কিন্তু বদ্রীপ্রসাদ যায়নি।

সে থেকে গিয়েছিল।

তারপর চম্পাবাঈয়ের ভৃত্য হারাধনের জবানবন্দি থেকে যা জানা যায়, তা হচ্ছে—রাত তখন প্রায় বারটা তখন অত্যধিক মদ্যপানে বদ্রীপ্রসাদ রীতিমত বেসামাল হয়ে পড়েছে অথচ তখনো সমানে মদ্যপান করে চলেছে দেখে চম্পা হারাধনকে ডাকে—

হারু—

মা—

এ লোকটা দেখছি বেহেড মাতাল হয়ে পড়েছে। আমাকে এখান থেকে উঠতেই দিচ্ছে না. লোকটার সঙ্গে অনেকগুলো টাকা আছে।

হারাধন প্রশ্ন করে, টাকা!

হ্যাঁ অনেকগুলো টাকা। তাই তো ওকে এখান থেকে বের করে দিতে পারছি না ঐ মাতাল অবস্থায়।

তা থাকলেই বা—বের করে দিই না—পাঁজাকোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসি।

না রে হারু—সেটা অন্যায় হবে—

তবে কি করবে মা?

আমার ঘুমের ওষুধগুলো ড্রয়ারে ছিল, দেখছি সব ফুরিয়ে গিয়েছে—তুই চট করে একবার আমাদের ডাক্তারবাবুর কাছে যা, তাঁর কাছ থেকে প্রেসক্রিপসন লিখিয়ে কটা পুরিয়া নিয়ে আয়। মদের সঙ্গে একটা পুরিয়া মিশিয়ে দিলে ঘুমিয়ে পড়বে'খন

হারাধন চলে যায়।

এবং ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঘুমের ওষুধ নিয়ে এসে চম্পার হাতে দেয়।

হারাধনের আনীত ঘুমের ওষুধের চারটে পুরিয়া থেকেই একটা পুরিয়া মদের সঙ্গে মিশিয়ে চম্পা বদ্রীপ্রসাদকে খাইয়ে দেয়।

বদ্রীপ্রসাদ ঘুমিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই। রাত তখন প্রায় দেড়টা—

অতঃপর চম্পা তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

এবং পরের দিন হারাধনের ডাকাডাকিতে বেলা সাতটা নাগাদ চম্পার ঘুম ভাঙে।

মা— সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে; হারাধন বলে।

কি হয়েছে হারাধন?

লোকটা তো মারা গেছে মা—

সেকি!

হ্যাঁ—মরে একেবারে কাঠ। দেখবে চল—কি হবে মা!

চম্পা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে দেখে, সত্যিই বদ্রীপ্রসাদ মৃত। তারপর যা হয়—পুলিশ আসে। এসে এনকোয়ারী করে এবং ঐ সময়ই কথায় কথায় চম্পাই বলেছিল পুলিশকে, লোকটার সঙ্গে নাকি একটা চামড়ার ফোলিওর মধ্যে অনেকগুলো নোটের বাণ্ডিল ছিল—

পুলিস অফিসার প্রশ্ন করেন, কি করে জানলেন, ফোলিওর মধ্যে অনেকগুলো নোটের বাণ্ডিল ছিল?

চম্পা জবাব দেয়, কাল রাত্রে নেশার ঘোরে লোকটা আমাকে বলেছে কথাটা।

কি বলেছে? পুলিসের প্রশ্ন।

বহুৎ রূপিয়া হ্যায় হামারা পাশ, লোকটা বলে, রূপিয়াকে লিয়ে ফিকার মাত করো—একবার ব্যাগ খুলে দেখিয়েও ছিল। তখনই দেখেছিলাম, ফোলিওর মধ্যে টাকা নোটের বাণ্ডিল।

তা সে ফোলিওটা কোথায় গেল?

দেখছি না।

কাল রাত্রে যখন এ-ঘর ছেড়ে যান, ফোলিওটা ছিল?

হ্যাঁ—ওঁর পাশেই ছিল।

লোকটা যখন টাকার কথা বলে বা ব্যাগ খুলে টাকা দেখায়, তখন এ ঘরে আর কেউ ছিল

আপনি ছাড়া?

—না, আমি একাই ছিলাম।

চম্পার বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও ফোলিওটা পাওয়া যায় না। হারাধন ও ঝি রাসমণি কেউ টাকা সম্পর্কে কোন হদিস দিতে পারে না।

তখন সকলকেই পুলিস অফিসার অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যান, পরের দিন ঐ বাড়িতে প্রহারারত একজন পুলিসের নজর পড়ে, সামনের বাড়িতে পিছন দিককার জঞ্জালপূর্ণ ছোট গলিটার মধ্যে একটা শূন্য ফোলিও ব্যাগ পড়ে আছে। ব্যাগে আগরওয়ালার নাম এনগ্রেভ করা ছিল।

চম্পা, হারাধন, চম্পার দরোয়ান, কিষেণলাল ও ঝি রাসমণি—সকলকেই গ্রেপ্তার করে চালান দিয়েছিল পুলিস।

ময়না তদন্তে মৃতের পাকস্থলীতে তীব্র বিষ পাওয়া যায়। অ্যাট্রোপিন বিষ।

এবং শুধু তাও নয়, মদের গ্লাসে যে শেষ তলানিটুকু পড়ে ছিল, তাও কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে অ্যাট্রোপিন বিষ পাওয়া গিয়েছে।

অথচ হারাধন আনীত আর তিনটে যে পুরিয়া বসবার ঘরে টেবিলের উপরে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো অ্যানালিসিস করে কিন্তু দেখা গেছে, সেগুলো ঘুমের ওষুধই, তার মধ্যে অ্যাট্রোপিনের নামগন্ধও নেই।

হারাধনও বলেছে তার জবানবন্দিতে, সে চারটে মাত্র ঘুমের ওষুধের পুরিয়া এনেছিল—

পুলিসের ধারণা, ঐ পুরিয়ার ঘুমের ওষুধের প্যাকেট দেয়নি চম্পা। সে-রাত্রে অর্থের লোভে চম্পাবাঈ বদ্রীদাসকে অ্যাট্রোপিন মিশিয়ে সেই অ্যাট্রোপিনযুক্ত মদ খাইয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে, টাকাগুলো তারপর ফোলিও থেকে বের করে নিয়ে পাশের জঞ্জালপূর্ণ গলিটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

যদিও প্রমাণ হয়নি, শেষ পর্যন্ত অ্যাট্রোপিন কোথা থেকে পেয়েছিল চম্পা, তাহলেও সেই পুরিয়া মদের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার পর এবং বদ্রীদাস সেই মদ পান করবার সঙ্গে সঙ্গেই যখন ঘুমিয়ে পড়ে ও আর ওঠে না—এবং মদের গ্লাসের তলানী ও পাকস্থলীতেও যখন অ্যাট্রোপিন পাওয়া গিয়েছে, পুলিসের ধারণা এবং স্থির বিশ্বাস চম্পাই পুরিয়ার সঙ্গে অ্যাট্রোপিন মদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিল তাকে হত্যা করে টাকাগুলো হাতাবার মতলবে।

আর সেই কারণেই অর্থাৎ টাকাগুলো নেবার জন্যই হারাধন যখন বদ্রীদাসকে বাড়ির বাইরে রেখে আসবার কথা বলে, চম্পা স্বীকৃত হয়নি।

হারাধন ও রাসমণি বা দরোয়ান ঐ বাড়িতে সে-রাত্রে আর যারা ছিল তারা টাকার কথা ঘুণাক্ষরেও জানত না, জবানবন্দিতে বলেছে।

একমাত্র জানত চম্পাই—স্বীকারও করলে সে-কথাটা।

অতএব নিম্ন আদালতের জজ—চম্পাবাঈ-ই একমাত্র হত্যা করতে পারে—এভিডেন্সেও তাই বলে—সেই বিচারে চম্পাবাঈকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দিয়েছেন ও হারাধন, রাসমণি এবং দরোয়ানকে মুক্তি দিয়েছেন।

চম্পা কিন্তু তার জবানবন্দিতে বলেছে, সে হত্যা করেনি—দুর্ঘটনার দিন দুপুর থেকেই তার শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না। মধ্যে মধ্যে তার একটা কলিক হতো, সেই কলিকটা ঐদিনই সকলবেলা উঠেছিল বলে শরীরটা ভাল ছিল না। কিন্তু বদ্রীপ্রসাদের বন্ধু সমীরণ দত্ত—যে তাকে তার গৃহে দুর্ঘটনার রাত্রে নিয়ে এসেছিল সে চম্পার দীর্ঘদিনের পরিচিত।

তার অনুরোধেই শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়েছিল, অসুস্থ শরীর নিয়েই নাচগান করতে। তাছাড়া তার ঐ সময় অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য টাকারও প্রয়োজন ছিল—বদ্রীপ্রসাদ মোটা টাকা দেবে বলেছিল—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বদ্রীপ্রসাদ অত্যন্ত মাতাল হয়ে পড়ে যখন বাড়াবাড়ি শুরু করে তখন বাধ্য হয়ে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সে মদের সঙ্গে ঘুমের পাউডার মিশিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিল। অন্য কোন বিষ তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়নি।

টাকাগুলো কি হয়েছে, সে জানে না। যদিও মত্ত অবস্থায় বদ্রীপ্রসাদ অনেকবার নোটের তাড়াগুলো দেখিয়েছে, ঘর থেকে যখন সে বের হয়ে যায়, তখনো ফোলিওটা টাকা সমেত বদ্রীপ্রসাদের পাশেই

পড়েছিল, সে দেখেছিল।

বলাই বাহুল্য, চম্পার জবানবন্দি কেউ বিশ্বাস করেনি।

পুলিসের ধারণা—টাকার জন্যই সে হত্যা করেছে মদের সঙ্গে বিষ দিয়ে সে-রাত্রে বদ্রীপ্রসাদকে। তারপর টাকাগুলো রাতারাতি সরিয়ে ফেলেছে।

॥ ৪ ॥

প্রসিকিউশন কাউনসেল মিঃ সান্যাল জেরা করছিলেন ভৃত্য হারাধনকে।

এক নম্বর সাক্ষী।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হারাধন। বয়স চল্লিশের নীচে হবে না। রোগা পাকানো চেহারা। মাথায় বাহারে টেরি।

কি নাম তোমার?

আজ্ঞে হারাধন ঘোষ।

বাড়ি?

বাগনান।

চম্পাবাঈয়ের কাছে কতদিন কাজ করছো?

তা প্রায় সাত বছর।

চম্পাবাঈয়ের প্রায়ই লোকজন আসে, তাই না?

হ্যাঁ—

আচ্ছা, তারা কি কেবল গানবাজনাই শুনতো বা নাচ দেখতো—

আজ্ঞে—

বলছি, তারা কি কেবল নাচ গানেই খুশী হয়ে চলে যেত?

তা কি করে বলবো বাবু, তবে কেউ কেউ তো সারারাতও থাকতো।

আচ্ছা, চম্পাবাঈয়ের আর কেউ আছে কিনা বা কোন আত্মীয় তার কাছে ঐ সাত বছর কখনও কেউ এসেছে কিনা, জান?

আজ্ঞে, কাউকে আসতে দেখিনি।

সে-রাত্রে ঘুমের পাউডার তুমি এনে দিয়েছিলে?

আজ্ঞে—চম্পাবাঈ বললো, বাবু বড় বিরক্ত করছে, তাকে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াব—

পাউডারটা মদের সঙ্গে মেশাতে দেখেছিলে তুমি?

হ্যাঁ—দেখেছি বইকি—খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো বাবু শুয়ে পড়ল—তখন কি জানি একেবারেই শেষ হয়ে যাবে।

তোমার আনা ঘুমের পাউডারই কি সেটা ছিল, যেটা চম্পাবাঈ মদের সঙ্গে মিশিয়েছিল?

আজ্ঞে তা জানি না, আমি পাউডারগুলো চম্পাবাঈয়ের হাতে দিয়ে তার শোবার ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম।

পুরিয়াটা কি হাতে নিয়ে শোবার ঘর থেকে চম্পাবাঈ ঐ ঘরে আসে?

আজ্ঞে তাও দেখিনি।

বদ্রীপ্রসাদের ব্যাগটার মধ্যে টাকা ছিল, দেখেছিলে তুমি?

আজ্ঞে না, টাকার কথা কিছু জানি না।

তুমি সকালে এসে ঐ ঘরে যখন বাবুকে মরে গেছে দেখলে, তখন সেখানে ব্যাগটা ছিল?

না—

আচ্ছা—সে-রাত্রে কখন ঘুমের ওষুধ এনে দাও তুমি চম্পাবাঈকে?

অনেক রাত হবে—

জবানবন্দিতে তুমি বলেছো—রাত প্রায় দেড়টা, তাই কি?

ঐ রকমই হবে।

ওষুধ এনে দিয়ে তুমি কি করলে?

চম্পাবাঈকে বলে শুতে যাবো তাই তার জলসাঘরে গিয়েছিলাম। তখনই তো দেখি, তাকে মদের সঙ্গে একটা পুরিয়া ঢেলে মেশাতে।

তারপর—

আজ্ঞে তারপর—

হ্যাঁ—তারপর কি করলে?

বড্ড ঘুম পেয়েছিল—নীচের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় সাক্ষী চম্পাবাঈয়ের দাসী রাসমণি।

রাসমণির বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না। কালো মোটা-সোটা গোলগাল চেহারা। দেহে স্বাস্থ্য ও যৌবন যেন টলমল করছে।

পরনে ফরাসডাঙ্গার দামী একটা তাঁতের চওড়া কালোপাড় শাড়ি—গায়ে সেমিজ—হাতে একগাছি করে সরু সোনার বালা।

চোখে-মুখে একটা অস্থির চটুলতা যেন।

দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা উল্কি।

সর্বক্ষণ পান চিবুচ্ছে।

তোমার মনিবের কাছে কত দিন কাজ করছিলে?

তা বাবু মিথ্যে বলবোকনি—বছরখানেক হবেক বটে—

তোমার বাড়ি?

আজ্ঞে শুসনিয়া—বাঁক্ড়ো জিলা।

তুমি সে রাত্রে কোথায় ছিলে, যখন চম্পাবাঈ মদের গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মেশায়?

সে তো কতবার বললাম গো—ধরেন ক্যান এক্কেবারে পাশেই—

পাশেই—

হ্যাঁ—দরজার পাশেই—স্পষ্ট দেখাই গেল, কি সব পুরিয়া গেলাসে ঢালা করলেক, খাওয়াইলেক

তারপর কি হলো?

আহা তখন তো বুঝবার পারিনি গো বাবু, বাবুটি খাবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন নেতায় পড়লে। আমরা ভাবনু ঘুমায় পড়লো বুঝি—তখন কি জানি, বাবুটি এক্কেবারে শেষ ঘুম ঘুমাইছে—মরণ ঘুম।

তারপর তুমি কি করলে?

মাও শুতে চলে গেল—আমরাও গেলাম।

তোমরা?

হুঁ—হারাধন আর আমি—

হারাধনের ঘরেই বুঝি তুমি শুতে গেলে—

ইটা কেমন কথা বললেক গো—হারাধন আমার কে বটে গো— পরপুরুষ—

ওঃ তা তো ঠিকই—

অতঃপর ডাক পড়লো দরোয়ান কিষেণলালের—

সাক্ষী—তিন নম্বর—দরোয়ন কিষেণলাল।

কিষেণলাল এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল—

কি নাম তোমার?

প্রসিকিউশন কাউনসেলের প্রশ্ন—

বাবুজী হামার নাম কিষেণলাল চৌবে আছে—

কোন্ জিলায় ঘর?

ছাপরা জিলা।

চম্পাবাঈয়ের কাছে কতদিন কাজ করছো চৌবে?

মহারাজ, কমসে কম পাঁচ সাল তো হোবেই।

আচ্ছা চৌবেজী—

বোলিয়ে হুজুর—

তুমি বলতে পার, ঐ রাত্রে হারাধন কখন ওষুধ আনতে গিয়েছিল, আর কখন ফিরে আসে?

ও ঠিক হামার মালুম নেহি হ্যায়—

মালুম নেহি হ্যায়?

নেহি হুজুর—

কেন?

কিউকি—হামি তো নিদ যাচ্ছিল বাবুজী হামার ঘরে—হারাধন এসে বললে, ও মাঈজীর দাবাই আনতে বাহার, ডাক্তারখানামে যাবে—হামি দরোয়াজা খুলে দিলাম। লেকেন কিতনী রাত থি মুঝে ঠিক ইয়াদ নেহি—

রাত বারো বা সাড়ে বারোটা হতে পারে?

হো সেকতা—

কতক্ষণ বাদে ফিরল?

সায়েদ কোই এক ঘন্টা কি সোয়া ঘন্টা বাদ।

ওর হাতে ঐ সময় কিছু ছিল?

দেখা নেহি হাম।

তারপর তুমি দরজায় আবার তালা দিয়ে দিয়েছিলে?

জরুর।

দরজার তালার চাবি তোমার কাছেই তো থাকত?

হাঁ বাবুজী—লেকিন মাজীকো পাশভি একঠো কুঞ্জী থি—

ঐ সময় নীলাদ্রি সে আদালত-কক্ষে প্রবেশ করল।

ব্যারিস্টার অনিল সেন নীলাদ্রিকে দেখে ইশারায় তাকে ডাকে—নীলাদ্রি এগিয়ে গিয়ে ব্যারিস্টার অনিল সেনের পাশে বসল।

কাঠগড়ায় উপবিষ্ট আসামীর দিকেও একবার তাকাল।

আসামী চম্পাবাঈ মাথা নীচু করে বসে।

ইতিমধ্যে একবারও সে মুখ তোলেনি।

প্রসিকিউশান কাউনসেল একবার আসামীর কাঠগড়ায় উপবিষ্টা চম্পাবাঈয়ের দিকে তাকালেন এবং প্রশ্ন করেন, চম্পাবাঈ—তোমার কাছে একটা চাবি তাহলে থাকত গেটের?

চম্পাবাঈ যেন অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল।

কৃশা—কৃশ—

দাঁড়াতে মনে হলো যেন খুব অসুস্থ চম্পাবাঈ।

মুখটা দেখা যাচ্ছে না—চুলে ঢাকা পড়েছে।

প্রসিকিউশান কাউনসেল আবার প্রশ্ন করেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও চম্পাবাঈ।

মুখ না তুলেই দাঁড়িয়ে থাকে চম্পাবাঈ কাঠগড়ায়।

আর একটা চাবি তোমার কাছে থাকত?

মাথা নীচু করেই জবাব দেয়, হ্যাঁ—

হুঁ।—That's all—চতুর্থ সাক্ষী—সমীরণ দত্ত—

অর্ডালী হাঁক পাড়লো, সাক্ষী সমীরণ দত্ত হাজির—

চম্পাবাঈ দাঁড়িয়েই থাকে মাথাটা নীচু করে।

মথার চুলে মুখটা ঢাকা পড়েছে—মুখটা দেখা যায় না, ঐ সময় অনিল সেন যেন মৃদু গলায় নীলাদ্রিকে কি বলছিল। নীলাদ্রি মৃদু মৃদু হাসছিল।

॥ ৫ ॥

কিছুক্ষণের জন্য একটা স্তব্ধতা আদালত কক্ষে।

চতুর্থ সাক্ষী সমীরণ দত্ত—নিহত বদ্রীপ্রসাদের বন্ধু—যে তাকে সে রাত্রে চম্পাবাঈয়ের গৃহে নিয়ে গিয়েছিল।

সাক্ষী সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

বছর-ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মত বয়স হবে সমীরণ দত্তর। পরনে দামী গরম পাঞ্জাবি, কাঁচির ধুতি ও শাল।

আপনার নাম?

সমীরণ দত্ত।

কি করা হয়?

ব্যবসাপত্র আছে।

ভাল আয় নিশ্চয়?

তা ভালই।

ঐ যে মেয়েটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে—ওকে চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই—

তা চিনতে পরছি বৈকি—চম্পাবাঈ

আপনার সঙ্গে কতদিনের আলাপ চম্পাবাঈয়ের?

তা বছর চার-পাঁচ তো হবেই—

প্রসিকিউশন কাউনসেল এবারে চম্পাবাঈযের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, চম্পাবাঈ—

সাড়া নেই—

যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে চম্পাবাঈ।

চম্পাবাঈ।

চম্পাবাঈ—মুখ তোল—তাকাও—

তবু সাড়া নেই—

চম্পাবাঈ—শুনতে পাচ্ছো না? মুখ তোল—তাকাও—

ধীরে ধীরে এবারে মুখ তুলল চম্পাবাঈ।

কী শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ!

কে বলবে ঐ মেয়েটি একজনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে।

কোন ভাবের বৈলক্ষণ্যই যেন কোথাও এতটুকু নেই। ভাসা ভাসা দুটি চোখ—ছোট সুচারু কপাল—কয়েকটি রুক্ষ চূর্ণকুন্তল কপালের ওপর এসে পড়েছে।

মুখ তো নয়, যেন দেবীপ্রতিমার মুখখানি একেবারে বসানো।

আবার মনে হয়—ঐ স্ত্রীলোক হত্যা করেছে!

নীলাদ্রি স্পষ্ট দেখতে পায় এতক্ষণে কাঠগড়ায় দন্ডযমান অপরাধিনীর মুখটা।

চেয়ে দেখো—ঐ ভদ্রলোককে তুমি চেনো?

চিনি।

কে?

সমীরণবাবু।

কতদিনের আলাপ তোমাদের?

অনেকদিনের।

পাঁচ দশ বিশ বছর?

বছর পাঁচেক হবে।

নীলাদ্রি চৌধুরী তখনো চেয়ে ছিল অপরাধিনীর মুখের দিকে নির্নিমেষে। কেন তা সে হয়ত নিজেই জানে না—তবু চেয়ে ছিল।

মুখটার সঙ্গে কি তার কোন পরিচিত জনের মুখের আদল আছে? মনে মনে ভাবছিল—মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল।

কিন্তু কার—

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নিজের মনে বার বার প্রশ্ন করে নীলাদ্রি চৌধুরী।

বাম গালের উপরে ঐ কালো তিলটা—

প্রসিকিউসন কাউনসেল আবার প্রশ্ন করেন, উনি মধ্যে মধ্যে তোমার কাছে স্ফূর্তি করতে আসতেন?

উনি আসতেন।

রাত কাটাতেন না?

না—

কখনো কাটাননি রাত?

না—

যদি বলি মিথ্যা বলছো?

মিথ্যা কেন বলবো?

চম্পাবাঈ আবার মাথা নীচু করে।

ঐ দিনকার মত আদালতের কাজ স্থগিত হলো।

চম্পাবাঈ তখনো মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়েছিল কাঠগড়ায়।

জজসাহেব ভিতরে চলে গেলেন তাঁর কামরায়—জুরিরাও উঠে গেল সকলে। প্রহরীরা এসে আসামী চম্পাবাঈকেও কাঠগড়া থেকে নিয়ে গেল।

অনিল—

কিছু বলছিলেন মিঃ চৌধুরী? ব্যারিস্টার অনিল সেন নীলাদ্রি চৌধুরীর দিকে তাকালেন।

আপনার কেসের কাগজগুলো আর একবার দেবেন তো—আর একবার পড়ে দেখবো।

আজই আপনার সঙ্গে দিয়ে দেবো।

তাই দিন।

নীলাদ্রি চৌধুরী আদালত থেকে বের হয়ে আসে। নীলাদ্রি চৌধুরী লক্ষ্য করে না, এতক্ষণ আদালতের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল পরাশর মিত্র—সে নীলাদ্রি চৌধুরীকেই অনুসরণ করে চলে দূর থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে এসে উঠে বসল নীলাদ্রি চৌধুরী-

অন্যমনস্ক নীলাদ্রি।

ড্রাইভার জিজ্ঞসা করে, বাড়ি যাবো তো সাহেব?

না।

তবে কোন্ দিকে যাবো?

ময়দানের দিকে চলো।

শীতের বেলা ছোট।

চারটে বাজতে না বাজতেই রোদ পড়ে যায়—ক্রমশঃ আলো অস্পষ্ট হতে শুরু করে একটু একটু করে।

এক জায়গায় এসে গাড়ি থামাতে বলে নীলাদ্রি ড্রাইভারকে।

ড্রাইভার গাড়ি থামাল ময়দানের ধার ঘেঁষে। গাড়ি থেকে নামল নীলাদ্রি।

মনের মধ্যে অনেক দিন আগেকার একটা গানের সুর আর গোটা দুই কলি যেন গুনগুনিয়ে উঠছে

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই—
(আমি) তোমার প্রেমের কিবা জানি—

দিনশেষের ম্লান অবসন্ন আলোর ময়দানে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে গানের ঐ কলি দুটো যেন স্মৃতির বন্ধ দুয়ারে এসে একটা পাখীর মত ডানা ঝাপটাতে থাকে কেবলই—

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই—

স্মৃতির বন্ধ দরজাটা বুঝি সহসা এক সময় ঈষৎ খুলে যায়—

মনের পাতায় কেবলই যেন থেকে থেকে ভেসে ওঠে সেই মুখখানা—অপরাধিনী হত্যাকারিণীর সেই মুখটা—সেই বাম গালের উপর তিলটা—

কি হলো নীলাদ্রির আজ!

শহরের একজন গণ্যমান্য অন্যতম ধনী নাগরিক প্রখ্যাতনামা একজন আইনজীবী—আসন্ন

ইলেকশনে লোকসভার প্রার্থীরূপে সে দাঁড়িয়েছে—

তাদের দল যদি জেতে তো সেন্ট্রালে ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীও সে হবে।

এক ডাকে সারা শহরের লোক তাকে চেনে—

সে কিনা তখন থেকে একটা নর্তকী বারবনিতা হত্যাকারিণীর মুখটাই মনের মধ্যে ভাবছে!

পরিচয়হীনা অজ্ঞাত অখ্যাত—সমাজের নীচু স্তরের একটা সামান্য স্ত্রীলোক—

রীতিমত যেন বিরক্তি বোধ করে সহসা নীলাদ্রি নিজের উপরই নিজে।

পকেট থেকে সিগ্রেট কেসটা বের করে একটা সিগ্রেট ধরায় লাইটারের সাহায্যে অন্যমনস্কভাবে।

বেশ চারিদিক ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঝাপসা ঝাপসা দেখা যায়।

চৌরঙ্গী আলোকমালার লাল নীল সবুজে ঝলমল করছে দূরে যেন স্বপ্নের মত।

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরে বেড়াল নীলাদ্রি অন্ধকার ময়দানে। তারপর আবার একসময় গাড়িতে এসে উঠে বসল, নীলাদ্রি পূর্ববৎ অন্যমনস্ক।

কোঠি চল—

দামী লাক্সারী কার এগিয়ে চলে রেড রোড দিয়ে। গৃহে এসে পৌছায় এক সময় গাড়ি, কিন্তু নীলাদ্রি অন্যমনস্ক—কোন খেয়ালই নেই।

ড্রাইভার বলে, সাব কোঠি আ গিয়া—

হাঁ—

নীলাদ্রি গাড়ি থেকে নামল।

দোতলায় উঠতেই ল্যাণ্ডিংয়ে সেক্রেটারী তনিমা ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—সে কাকে যেন ফোন করছিল।

পদশব্দে ফিরে নীলাদ্রিকে দেখে ফোনটা রেখে দিল তনিমা—

সামনেই ঘড়িতে তখন পৌনে আটটা বাজে, দেখা যায়।

এত দেরি হলো আপনার?

একটু মাঠে বেড়াচ্ছিলাম। মৃদু কণ্ঠে বলে নীলাদ্রি এবং বলতে বলতে নিজের শয়নকক্ষের দিকে এগোয়।

তনিমা কথাটা শুনে যেন একটু বিস্মিত হয়। মাঠে বেড়াচ্ছিল নীলাদ্রি চৌধুরী—যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রুটিনে বাঁধা—ডাইরীর পাতায় যার একটা মুহূর্ত নিজস্ব নেই! সে কিনা ময়দানে বেড়াচ্ছিল!

স্যর চক্রবর্তী বার দুই রিং করেছিলেন—কেমন যেন একটু বিব্রত ভাবেই তনিমা বলে।

স্যর চক্রবর্তী—

হ্যাঁ—আজ তাঁর ছেলের ম্যারেজ পার্টি ছিল—

নীলাদ্রি কোন জবাব দেয় না। অন্যমনস্ক—কি যেন ভাবছে।

রিং করে বলে দেবো যে আপনি কাজে আটকা পড়েছিলেন। একটু পরে আসছেন—

না, না—আজ আর কোথাও বেরুব না মিস ব্যানার্জী—feeling a bit tired.

নীলাদ্রি চৌধুরী তার শয়নঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

তনিমা চেয়ে থাকে নীলাদ্রির গমনপথের দিকে।

দুই বছরের বেশী সে নীলাদ্রির কাছে চাকরি করছে।

বেশীর ভাগ সময়ই বলতে গেলে লোকটার সঙ্গে থাকে সে। নীলাদ্রির সর্বব্যাপারে দেখাশোনা করে। এবং ক্রমশঃ দুজনার মধ্যে সম্পর্কটাও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—কিছুদিন ধরে যে কারণে অনেকেরই ধারণা হয়েছে, তাদের দুজনার সম্পর্কটা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে শীঘ্রই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে—

নীলাদ্রি ঘরে ঢুকবার পরই খাস বেয়ারের ভৃত্য শিবদাস ছুটে এলো।

চা দেবো, সাহেব?

না—

শিবদাস দাঁড়িয়ে থাকে যদি আর কোন নির্দেশ থাকে প্রভুর।

যা তুই—

শিবদাস চলে গেল।

জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল নীলাদ্রি।

ঝকঝক করছে বাথরুম—দেওয়ালে ইটালিয়ান গ্লেজ টাইলস বসানো। মেঝেতে হোয়াইট মারবেল—বিরাট বাথটব—হট অ্যান্ড কোল্ড শাওয়ার—দেওয়ালে দু'দিকে প্রমাণ আরশি বসানো।

বাথটবের পাশে একটা স্ট্যান্ডের উপরে একটা ফোন।

সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বাথটবের মধ্যে নামল নীলাদ্রি।

অন্যমনস্ক—চিন্তিত—

হাত দিয়ে বাথটবের জল ছলকাতে থাকে—ঢেউ ওঠে—

ঢেউ—একটা দুটো তিনটে—একটার পর একটা জলের বুকে ছড়িয়ে পড়ে ঢেউগুলো বড় হতে হতে—

অকস্মৎ স্মৃতির পটে যেন আলোর ঝলকানি—কালো আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিমিলি।

* * পুকুরে নাইতে নেমেছে নীলাদ্রি—সিঁড়িতে এসে বসে পা দিয়ে জল নাচাচ্ছে, আজকের নীলাদ্রি নয়, দীর্ঘ আট বছর আগেকার নীলাদ্রি।

টলমল উদ্ধত যৌবন!

পায়ের কাছে ঢেউ উঠছে—উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ কানে এলো নারীকণ্ঠে গানের সুর—

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই—
(আমি) তোমার প্রেমের কি বা জানি—

সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলায় এদিক ওদিক চাইতে চাইতে নীলাদ্রি—

রাখালিয়া মতি কি জানি পিরিতি
প্রেমের পসরা তুই—

নীলাদ্রির চোখের ওপর যেন ভাসছে—ফেলে আসা জীবনের একটা ছেঁড়া পাতা যেন সহসা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা বাগান—নানাপ্রকারের গাছ-গাছালী—

তারই মধ্যে কাকচক্ষু জল, এক দীঘি।

বাঁধানো সিঁড়ি—

শিউলী—

নীলাদ্রি উচ্চকণ্ঠে ডাকে।

নারীকণ্ঠে জবাব ভেসে আসে কোন এক ঝোপের অন্তরাল থেকে—

নেই—ই—

শিউলী—

নেই—ই—

নীলাদ্রি ঝোপটার দিকে এগিয়ে যায়—ডাকে আবার, শিউলী—

নেই—ই—

তারপরই খিলখিল হাসির একটা মিষ্টি ঝরনা যেন ছড়িয়ে যায়।

বাথটবের টেলিফোনটা বেজে ওঠে, ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

নীলাদ্রির স্বপ্ন মিলিয়ে যায়।

হাত বাড়িয়ে বিরক্তচিত্তে ফোনের রিসিভারটা তুলে নেয়।

নীলাদ্রি চৌধুরী স্পীকিং—

নীচের ঘর থেকে ফোনে তনিমার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, তনিমা কথা বলছি, মিঃ চৌধুরী—

বল! নীলাদ্রি ফোনে বলে।

নীচের বসবার ঘর থেকে কথা বলছে তনিমা।

কাল শ্যাম স্কোয়ারে যে বক্তৃতা দেবার কথা আছে আপনার—আপনি আর সন্তোষবাবুই তো বলবেন—

হ্যাঁ—

আর কেউ বক্তৃতা দেবেন না?

তুষারশুভ্রও দেবে।

আপনি এখন কি নীচে নামবেন?

না।

ছেলেরা আপনার সঙ্গে ইলেকশন ক্যাম্পেন সম্পর্কে কি সব কথা বলতে চায়—তারা হলঘরে অপেক্ষা করছে—

আজ আর আমি নীচে নামব না—কাল সকালে সাড়ে সাতটায় আসতে বল ওদের।

ঠিক আছে—

তনিমা ফোন নামিয়ে রাখল।

পাশেই সাধন সরকার দাঁড়িয়ে ছিল—ইলেকশনে যারা খাটছে, তাদের অন্যতম পাণ্ডা।

সে জিজ্ঞসা করে, মিঃ চৌধুরী কি বললেন?

কাল আপনাদের সঙ্গে সকাল সাড়ে সাতটায় মিট করবেন।

তাহলে ওদের তাই বলে দিই—

বলে দিন।

সাধন সরকার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তনিমাও ঘর থেকে বের হয়ে উপরে তার ঘরের দিকে চলে গেল।

দোতলায় একটা ঘর এ-বাড়িতে তনিমার জন্য নির্দিষ্ট আছে, যতক্ষণ এখানে থাকে, সে কাজকর্মের সময়টুকু বাদে ঐ ঘরেই বিশ্রাম নেয়।

ঘরটি সুন্দর ভাবে সাজানো।

একটি বেড—একপাশে ছোট একটি রাইটিং টেবিল—একটা বুকশেল্ফ্—তার উপরে ফোন।

ফোনের পাশে তার নিজের একটি ফটো ফ্রেমে—

একটা রকিং চেয়ার।

আজ আর যেন বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা করছে না তনিমার, কিন্তু না গেলেও চলবে না—মা ভাববেন।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল তনিমা—রাত সাড়ে আটটা-নটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।

তনিমা এসে রকিং চেয়ারটার উপর বসল। হাত তুলে আলস্য ভাঙল। চোখ বুজল।

আবার একটু পরে উঠল—ঘরের জানালাটা গিয়ে খুলে দিল—কোথায় দূরে কোন বিয়েবাড়িতে বোধহয় সানাই বাজছে।

সানাইয়ে বেহাগের সুর ভেসে আসে।

কতকগুলো জরুরী চিঠিপত্র যা ঐ দিনের দুপুরের ডাকে এসেছে—সেগুলো নিয়ে বসল।

চিঠিগুলো একে একে খুলে প্রয়োজনমত দাগ দিয়ে সাজিয়ে রেখে তনিমা যখন উঠে দাঁড়াল রাত তখন সোয়া নটা।

ঘরের আলো নিভিয়ে বের হয়ে এলো তনিমা। রাত্রে বাড়ি যাবার আগে নীলাদ্রি থাকলে তার সঙ্গে দেখা করে বলে যায়—একবার তাই নীলাদ্রির ঘরের দিকে গেল—কিন্তু দরজা বন্ধ ঘরের।

তনিমা কি ভেবে শিবদাসকে ডেকে সে যাচ্ছে বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ড্রাইভার নীচেই অপেক্ষা করছিল—রাত্রে প্রতিদিন নীলাদ্রির গাড়িই তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

গাড়িতে উঠে বসতেই ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

বাড়িতে এসে যখন পৌঁছিল তখন রাত পৌনে দশটা।

কলিংবেল টিপতেই মা সুবালা এসে দরজা খুলে দিলেন।

তিনখানা ঘর নিয়ে ছোট একটি ছিমছাম ফ্লাট। লোকজনের মধ্যে মা-মেয়ে ও একজন ঝি এবং একজন বৃদ্ধ ভৃত্য দাসু।

তনিমা জিজ্ঞসা করে, দাসু কোথায়? তুমি দরজা খুলে দিলে!

তার জ্বর—বিকেল থেকে—সুবালা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

এ চাকরিতে তনিমা জয়েন করে সুবালার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করছিল তনিমা—বছর দুই হলো নীলাদ্রির সেক্রেটারী হয়ে কাজ করছে—মোটা মাহিনা পায়।

মেয়েকে সেক্রেটারীর কাজ নিতে নিষেধও করেছিলেন সুবালা, কিন্তু সুবালার কথা শোনেনি মেয়ে।

তনিমা নিজের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে সাধারণ একটা শাড়ি পরে বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলো।

দাসী এসে শুধায়, টেবিলে খাবার দেবো দিদিমণি?

না—খাবো না, খিদে নেই—মা খেয়েছেন তো?

হ্যাঁ—

কি করছেন মা?

শুয়ে পড়েছে।

দাসী চলে গেল।

তনিমা এসে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়াল।

তনিমা বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টেবিলের কাছে ফিরে এলো—

ড্রয়ার টেনে একটা অ্যালবাম বের করল।

পাতা উল্টে চলে অ্যালবামের। প্রথম দিকে তার নিজেরই নানা বেশের নানা ভঙ্গির ফটো-—তারপরই এলো একটা ফটো—নীলাদ্রির।

ফটোয় নীলাদ্রি হাসছে।

অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ফটোটার দিকে তনিমা।

তন্ময় হয়ে যায় যেন তনিমা।

খুট্ করে একটা শব্দ হতেই ও চমকে জানালার দিতে তাকায়—একটা কাবুলি বিড়াল, নাদুসনুদুস।

হেসে ফেলে বিড়ালটির দিকে চেয়ে তনিমা, ওরে দুষ্টু, তুই—

এগিয়ে গিয়ে বিড়ালটাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলে, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি— অমন করে চমকে দিতে হয় বুঝি—

বিড়ালটাকে বুকে নিয়ে, অ্যালবামটা হাতে করে শয্যার উপর এসে গা ঢেলে দেয় তনিমা—

বিড়ালটা লাফিয়ে নেমে যায় শয্যা থেকে।

তনিমা অ্যালবামের পাতার উপর গালটা রাখে।

চোখ বোজে।

॥ ৬ ॥

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই তনিমা তাড়াতাড়ি উঠে প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে পড়ে। নীলাদ্রির গৃহে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতেই শিবদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। শিবদাস দু'হাতে চায়ের ট্রে-টা ধরে নীলাদ্রির শয়নঘরের দিকে চলেছে।

শিবদাস—একি এত বেলা হয়ে গিয়েছে, সাহেবকে তুমি এখনো মর্নিং-টি দাওনি—

বার চারেক চা নিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলেছি ভোর পাঁচটা থেকে—ভিতর থেকে দরজা বন্ধ—

বন্ধ?

হ্যাঁ—সাহেব বোধহয় এখনও ঘুমোচ্ছেন—

ঘুমোচ্ছেন—সেকি—আজ রাইডিংয়ে যাননি মিঃ চৌধুরী?

না—আবদুল তো ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করে করে ফিরে গিয়েছে।

এখনো ওঠেননি—শরীর খারাপ হয়নি তো? কাল পার্টিতে গেলেন না —কখনো কোন ফরমালিটিজ তাঁর বাদ যায় না কোন দিন—কথাগুলো মৃদকণ্ঠে স্বগতোক্তির মত বলতে বলতে নীলাদ্রির শয়নঘরের দিকে এগিয়ে যায় তনিমা।

দরজা বন্ধ ভিতর থেকে তখনো।

এক মুহূর্তে যেন কি ভাবে তনিমা। তারপর বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু টোকা দেয়।

কোন সাড়া নেই।

আবার টোকা দেয় একটু থেমে তনিমা।

মিঃ চৌধুরী, মৃদুকণ্ঠে ডাকে তনিমা।

ল্যান্ডিংয়ের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সকাল সাতটা বাজল।

দরজাটা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি।

পরনে পায়জামা ও স্লীপিং গাউন। মাথার চুল এলোমেলো। ক্লান্ত চোখের তারায় এবং চোখের কোলে রাত জাগার চিহ্ন।

এসো---

তনিমা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ল---সামনের টেবিলটার উপরে অজস্র সিগ্রেটের টুকরো---অ্যাশট্রেটা উপছে পড়ছে---

ঘরের বাতাসে উগ্র একটা সিগ্রেটের গন্ধ।

আপনি কি কাল ঘুমাননি? তনিমা জিজ্ঞাসা করে নীলাদ্রিকে।

না---ঘুম এলো না কিছুতেই---

নীলাদ্রি যেন অত্যন্ত ক্লান্ত---বিষণ্ণ গলার স্বর। একটা সোফার উপরে বসল নীলাদ্রি।

সত্যিই সে সারাটা রাত জেগেই কাটিয়েছে।

পায়চারি করেছে আর একটার পর একটা সিগ্রেট শেষ করেছে।

নীলাদ্রির চরিত্রের যা সম্পূর্ণ বিপরীত। গত দু বছর তনিমা ঘনিষ্ঠভাবে চিনেছে, কিন্তু এমন তো কখনো হয়নি--

শরীর ভাল আছে তো? তনিমা প্রশ্ন করে।

শিবদাসটশ এখনো চা দিয়ে গেল না কেন, দেখ তো তনিমা---

শিবদাস চা নিয়ে বার চারেক এসে দরজা বন্ধ দেখে আপনি হয়ত ঘুমোচ্ছেন ভেবে ফিরে গিয়েছে---

শিবদাস ঐ সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

গর্দভ---ডাকিসনি কেন আমাকে---নীলাদ্রি বলে।

তনিমা এগিয়ে এসে কাপে দুধ চিনি দিয়ে চা তৈরী করতে থাকে।

শিবদাস বলে বাবুরা অনেকক্ষণ থেকে এসে নীচে বসে আছে।

চা-বিস্কুট-সিগ্রেট দিয়েছিস বাবুদের?

তনিমার হাত থেকে ধূমায়িত চায়ের কাপটা নিতে নিতে বলে নীলাদ্রি শিবদাসের মুখের দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ, দুবার চা হয়ে গিয়াছে---

ঠিক আছে, তুই যা নীচে---দেখিস, বাবুদের কোন কিছুর দরকার হলে দিবি।

শিবদাস ঘর থেকে চলে যায়।

তনিমা---

বলুন?

আজ আর আমি নীচে যাবো না---

শরীরটা কি আপনার ভাল নেই, মিঃ চৌধুরী?

না, না---I am quite fit. নীচে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি ওদের সঙ্গে গিয়ে কথা বল---

যাচ্ছি, তারপর একটু থেমে বলে তনিমা, আজ কোর্টে না হয় নাই গেলেন---rest নিন--।

না, না---যেতে হবে, একবার ড্রাইভারকে বলে দিও, সাড়ে দশটায় হাইকোর্ট যাবো।

গতকালের চিঠিপত্রগুলো নিয়ে আসবো? তনিমা জিজ্ঞসা করল।

না থাক---অন্য এক সময় দেখবো।

তনিমার মনে হলো নীলাদ্রির যেন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না, কি ভেবে তনিমা নীলাদ্রিকে আর বিরক্ত করে না---উঠে পড়ে।

নীলাদ্রি সোফার উপর বসেই থাকে।

গতকালের দেখা সেই মুখটা যেন কিছুতেই মনের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারছে না নীলাদ্রি। কিন্তু কেন—কেন?

আশ্চর্য রকমের মিল। বিশেষ করে সেই তিলটা।

কিন্তু কেমন করে তা হবে!

সেই শিউলী—কেমন করে শহরের এক জঘন্য বারবনিতা—খুনী চম্পাবাঈ হতে পারে।

অমন শান্ত সরল—না, না—অসম্ভব।

কিন্তু আশ্চর্য মিল।

কাল রাত্রে কিছুক্ষণ চেষ্টা করেছিল কেসের ফাইলটা পড়তে নীলাদ্রি কিন্তু পারেনি।

বারবার কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে।

আজ আবার আদালতে সেই মামলার শুনানী।

কিসের একটা অন্ধ আকর্ষণ যেন টানতে থাকে আদালত-গৃহের দিকে নীলাদ্রিকে। তার নিজের কোন কেস ছিল না ঐদিন আদালতে, তবু প্রস্তুত হয়ে দশটার মধ্যেই বের হয়ে পড়লো নীলাদ্রি হাইকোর্টের দিকে।

॥ ৭ ॥

সেই আদালত-গৃহ পূর্ব দিনের।

নীলাদ্রি শুনানী শুরু হবার আগেই এসে ঘরে ঢোকে অনিল সেনের সঙ্গে এবং তার পাশে বসে।

একটু পরে আসামীকে নিয়ে এসে দাঁড় করানো হলো আসামীর কাঠগড়ায়।

কালকের সেই মেয়েটি।

মুখের উপরে আজ আর চুলের গোছা নেই। গালের সেই তিলটি স্পষ্ট।

মুখটা স্পষ্টই দেখা যায়।

অবিকল—ঠিক সেই মুখ।

না ভুল নেই কোন। স্মৃতির পৃষ্ঠায় যা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল আজ তা প্রখর দিনের আলোর মতই স্পষ্ট—

বর্তমান মামলার অন্যতম ও পঞ্চম সাক্ষী সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন তখন।

ডাঃ মণি অধিকারী।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে—তা প্রায় বছর পঞ্চাশের উপরেই হবে!

রোগা লম্বা চেহারা—মাথার চুল প্রায় অর্ধেক পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

প্রসিকিউশন কাউনসেল প্রশ্ন করছেন, ডাঃ অধিকারী, আপনি কতদিন প্র্যাকটিস করছেন?

উনত্রিশ বছর—

বরাবর এই শহরেই?

হ্যাঁ—

চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

বছর পাঁচেক হবে।

চম্পাবাঈকে আপনি ঘুমের ওষুধ দিতেন?

হ্যাঁ—

কতদিন থেকে চম্পাবাঈ ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করছে?

গত বছর তিনেক হবে—

চম্পাবাঈ regular ঘুমের ওষুধ খেতো কি?

হ্যাঁ—গত বছর তিনেক থেকে ওর শরীরটা ভাল থাকছে না—

কি অসুখ—

অনেক দিন ইনটেসটাইন্যাল টি. বি.-তে ভুগেছে—ইদানীং আবার গল ব্লাডার কলিক—মাসের মধ্যে পনের দিন তো অসুস্থই থাকে, যে কারণে আমি জানি, নাচ-গান সে করতে পারতও না নিয়মিত—রোজগারপাতিও ইদানীং তাই তেমন ছিল না—

কিন্তু ঘুমের পাউডার দিতেন কেন ওকে?

প্রথম প্রথম ঘুম হতো না বলে দিয়েছি---পরে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে পাউডার না খেলে ও রাত্রে ঘুমাতেই পারত না।

কোন নেশা করত না চম্পাবাঈ?

আমি যতদূর জানি, ও কখনো কোন নেশার দ্রব্য স্পর্শ করেনি।

নাচ-গান ছাড়া অন্য কোন ভাবে চম্পাবাঈ অর্থোপার্জন করত না?

আগে করতো কিনা জানি না, তবে ইদানীং করছে বলে মনে হয় না—

কেন?

দীর্ঘদিন ধরে ইনটেসটাইন্যাল টি. বি.-তে ভুগে ভুগে ওর শরীরের যা অবস্থা, তাতে কোন অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতা ওর শরীরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না---আর যতদূর আমার মনে হয়, নাচ-গানের দ্বারা অর্থোপার্জন করলেও ঠিক যা আপনি মীন করছেন, সে শ্রেণীর মেয়ে ও না।

That's all—প্রসিকিউশন কাউনসেল বললেন।

প্রসিকিউশন কাউনসেলের জেরা ও ডাঃ অধিকারীর জবাব শুনতে শুনতে মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিল নীলাদ্রি অপরাধিনীর মুখের দিকে।

এবং গতকাল অপরাধিনী সম্পর্কে যে সন্দেহ নীলাদ্রির মনে জেগেছিল আজ যেন আরো সেটা দৃঢ়মূল হয়।

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হত্যাপরাধে অপরাধিনী ঐ চম্পাবাঈকে নীলাদ্রি।

কিন্তু চম্পাবাঈ নামটা তো তার পরিচিত নয়।

নীলাদ্রি কি যেন অনিল সেনকে ঐ সময় মৃদু কণ্ঠে বললো—অনিল সেন উঠে দাঁড়ালেন প্রশ্ন করবার জন্য।

তোমার নাম চম্পাবাঈ?

সঙ্গে সঙ্গে চম্পাবাঈ মুখ তুলে প্রশ্নকারী বারিস্টার অনিল সেনের দিকে তাকাল।

শান্ত ভাবলেশহীন চোখের দৃষ্টি।

হ্যাঁ—মৃদু কণ্ঠে চম্পাবাঈ জাবাব দেয়।

আর কোন নাম নেই তোমার?

না তো—

এক এক জনের তো কত সময় দুটো-তিনটেও নাম থাকে— ডাক নাম---পোশাকী---আদরের নাম—

চম্পাই আমার নাম। আর কোন নাম নেই---

তোমার বাড়ি কোথায়?

জানি না!

বাড়ি কোথায় তোমার, তুমি জান না---চিরদিন কি কলকাতায় আছো?

হ্যাঁ—

মা-বাবা তোমার—

ছোটবেলায় মারা গেছে, শুনেছি—

কার কাছে শুনেছো?

মনে নেই।

নাচ-গান তুমি কতদিন থেকে করছো?

ছোটবেলা থেকেই নাচতে গাইতে পারতাম---বড় হয়ে তাই নাচ-গান করেই কাটাতে শুরু করি--

বিয়ে থা কখনো হয়নি?

দেহ পসারিণী নর্তকী আমি—বিয়ে আমরা করি না—কিন্তু এ সব প্রশ্ন কেন আপনি আমাকে করছেন? সামান্য এক নর্তকী বাঈজীর জন্মবৃত্তান্ত জেনে কি হবে আপনার?

অনেকে তো ভাল ঘরে জন্মায়—তারপর হয়ত ঘটনাচক্রে এই পথে এসে পড়ে বা আসতে বাধ্য হয়—

চম্পাবাঈ কোন জবাব দেয় না, অনিল সেনের প্রশ্নের।

আমার কথার তুমি জবাব দাও নি, চম্পাবাঈ—

কিছু জবাব দেবার নেই—

মাথা নীচু করেই কথাগুলো বলে চম্পা।

পরের দিন।

প্রসিকিউশন কাউনসেল চম্পাবাঈকে প্রশ্ন করছিলেন।

তুমি তোমার জবানবন্দিতে বলেছো, ঘুমের ওষুধ তোমার ফুরিয়ে গিয়েছিল—হারাধনকে দিয়ে তুমি সে-রাত্রে আবার ঘুমের ওষুধ আনিয়েছিলে—

হ্যাঁ—

কটা পাউডার এনে দিয়েছিল সে-রাত্রে হারাধন তোমাকে?

চারটে—

তুমি বলেছো, তারই একটা তুমি বদ্রীপ্রসাদের মদেব গেলাসে মিশিয়ে দিয়েছিলে—

হ্যাঁ—

আহা, তুমি তো সে-রাত্রে ঘুমের পাউডার খাওনি?

না—

কেন?

এমনিতেই বড় ক্লান্ত ছিলাম—ঘুমও আসছিল, তাই আর পাউডার খাবার কথা মনে হয়নি।

তুমি তাহলে ঘুমের পাউডার সে-রাত্রে খাওনি?

না—

আচ্ছা তুমি তো তোমার জবানবন্দীতে বলেছো, ঘুমের পাউডার তোমার ফুরিয়ে গিয়েছিল—তারপর হারাধন সে-রাত্রে ডাক্তারখানা থেকে যে চারটে পাউডার এনে দিয়েছিল, তা থেকেই একটা তুমি বদ্রীপ্রসাদকে খাইয়েছিলে—

হ্যাঁ—

কিন্তু তোমার ঘরের টেবিলেব উপরে যে বাকী তিনটে ঘুমের পাউডারে পুরিয়া পুলিস পরের দিন সার্চ করতে গিয়ে পেয়েছিল, তার মধ্যে অ্যানালিসিস করে কোন অ্যাট্রোপিন পাওয়া যায়নি—অথচ যে গ্লাসে সে রাত্রে বদ্রীপ্রসাদ আগরওয়ালা মদ্যপান করেছিল তার শেষ তলানীটুকু Chemical analysis করে ও মৃতদেহের পাকস্থলীর জীর্ণ খাদ্যদ্রব্য analaysis করে অ্যাট্রোপিন পাওয়া গিয়েছে, নিশ্চয়ই শুনেছো?

হ্যাঁ—

কোথা থেকে ঐ বিষ অ্যাট্রোপিন এলো?

জানি না।

তোমার চোখের ব্যবহারের জন্য কোন অ্যাট্রোপিন লোশন কি তোমার ঘরে ছিল?

না।

যে মদ বদ্রীপ্রসাদ খেয়েছিল, সে কোথা থেকে এসেছিল?

আমার বাড়িতে থাকত বোতল। খদ্দেরদের জন্য রাখতে হতো, সেই বোতল থেকেই মদ্যপান করেছিল সে।

বদ্রীপ্রসাদকে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলে কেন?

বড্ড বিরক্ত করছিল, তাই—

তাহলে তুমি বলতে চাও—বদ্রীপ্রসাদকে ঘুমের পাউডার ছাড়া তার মদের গ্লাসে অন্য কিছুই তুমি মিশিয়ে দাও নি?

না। হারাধনের আনা পাউডারই একটা মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা ঐ একই প্রশ্ন বার বার করছেন কেন—আমি তো বলেছিই, তাকে ঘুম পাড়াবার জন্য ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম, কোন বিষ আমি আগরওয়ালাকে দিইনি।

তাই যদি না হবে তা সেই পাউডার খেয়ে তার মৃত্যু হবে কেন আর মৃতের পাকস্থলীতেই বা বিষ পাওয়া যাবে কেন এবং গ্লাসের তলানীতেই বা বিষ পাওয়া যাবে কেন?

জানি না। নিম্ন আদালতও আমার কথা বিশ্বাস করেনি—আপনারাও করবেন না, জানি—মিথ্যে

তবে এভাবে আমাকে বিরক্ত করছেন কেন—আপনারা তো প্রমাণ পেয়েছেনই, আমি তাকে বিষ দিয়ে মেরেছি—আমার ফাঁসির হুকুম দিয়ে দিলেই তো সব চুকে যায়—

কথাগুলো যেন একটা বিরক্তির সঙ্গেই বলে চম্পাবাঈ মাথা নিচু করে আবার।

ঐ সময় ডিফেন্স কাউনসেল অনিল সেন বলেন, ডাঃ অধিকারীকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

জজসাহেব অনুমতি দিলেন।

ডাঃ অধিকারী সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন আবার।

ডাঃ অধিকারী, অনিল সেন প্রশ্ন করেন, কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—

বলুন।

সে-রাত্রে হারাধন কখন আপনার কাছে চম্পাবাঈয়ের জন্য ঘুমের ওষুধের কথা বলতে যায়? মানে রাত্রি তখন কটা?

ঘুমোচ্ছিলাম—চাকার এসে ঘুম থেকে তোলে—ঠিক বলতে পারি না—মানে সময়টা ঠিক দেখিনি—

আপনি প্রেসক্রিপসন করে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ—

ঘুমের চোখে প্রেসক্রিপসন লিখতে কোন ভুল হয়নি তো?

ডাক্তারদের তা হয় না—

আমি জানি তা, তবু অনেক সময় তো বড় বড় ডাক্তারদের—

ও রকম ভুল হয় না—

আচ্ছা, আপনি তো বলছেন, অনেকদিন ধরেই চম্পাবাঈ নিয়মিত ঘুমের ওষধ খেতো—যে ডাক্তারখানা থেকে চম্পাবাঈ ওষুধ নিত সে তো নিশ্চয়ই আপনি জানতেন—হারাধনকে তো সেখানেই যেতে বলতে পারতেন—

তা আমি করতাম না আর করা উচিতও নয়। তা ছাড়া সাধারণত অনেকদিন ধরে চম্পাবাঈ ঘুমের ওষুধ খাচ্ছিল সত্যি—তাই মধ্যে মধ্যে আমি প্রেসক্রিপসন বদলে দিতাম, যাতে করে ঘুমের কোন একটা বিশেষ ড্রাগে সে অ্যাডিকটেড না হয়ে পড়ে—

কিন্তু একজনের দীর্ঘদিন নিয়মিত ঘুমের ওষুধ কি খাওয়া উচিত—মানে আপনার ডাক্তাররা কি সেটা সাপোর্ট করেন?

না করি না—তবে একটা কথা কি জানেন, যারা কোন একটা ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ সেবন করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাদের সেই অভ্যাসটা তখন দেখা গিয়েছে শারীরিক প্রয়োজনের চাইতে মানসিক প্রয়োজনটা হয় বেশী—মানে আমি বলতে চাই, প্রয়োজনটা তখন মানসিকে গিয়ে দাঁড়ায়—

আচ্ছা আদালতে চার নম্বর এফিডেবিট হিসাবে যে প্রেসক্রিপসনটা দেখানো হয়েছে এ মামলায়, সেটা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন—

হ্যাঁ দেখেছি—।

সেটা আপনারই প্রেসক্রিপসন তো?

হ্যাঁ—

আচ্ছা, আপনি যে ঘুমের জন্য সেদিন পাউডার করে দিয়েছিলেন, সেটা বেশী পরিমাণে খেয়ে কি মৃত্যু ঘটতে পারে কারো?

না—তবে অনেকক্ষণ ঘুমাতে পারে দুটো বা তিনটে পাউডার একসঙ্গে খেলে—

অনিল সেন ডাঃ অধিকারীকে প্রশ্ন করছে যখন, নীলাদ্রির হঠাৎ একসময় নজরে পড়ে, চম্পাবাঈ তার দিকে যেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই চম্পাবাঈ দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

ঐ দিনই সন্ধ্যায়—

শ্যাম স্কোয়ারে ইলেকশনের বক্তৃতা দিতে উঠে নীলাদ্রিকে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হয়। বক্তা হিসাবে বরাবরই তার সুনাম—চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে সে, কিন্তু সেদিন বক্তৃতামঞ্চে

উঠে বক্তৃতা দিতে দিতে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হয় তাকে— থেমে থেমে যায় বার বার।

ডায়াসের একপাশে তনিমা বসে ছিল—

নীলাদ্রিকে ঐভাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে থেমে থেমে যেতে দেখে ও একটু যেন বিস্মিতই হয়—

শুধু তাই নয়, গত দুদিন থেকেই তনিমার মনে হচ্ছে যেন নীলাদ্রি কেমন অন্যমনস্ক—সর্বক্ষণ কি যেন একটা ভাবছে।

বিশেষ করে সেদিন হাইকোর্ট থেকে আসার পর থেকেই পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে। আরো পরে সে ড্রাইভারের মুখে শুনেছিল, হাইকোর্ট থেকে বের হয়ে নীলাদ্রি নাকি সোজা ময়দানে চলে গিয়েছিল—

তনিমা জিজ্ঞাসা করেছিল ড্রাইভারকে রীতিমত বিস্মিত হয়েই, ময়দানে গিয়েছিল সাহেব?

হ্যাঁ দিদিমণি— গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে কতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন— আমার তো কেমন যেন ভয়ই করছিল।

শিবদাসও বলেছিল—সে রাত্রে নাকি নীলাদ্রি ডাইনিং টেবিলেই যায় নি।

বাবুর্চী বসে থেকে থেকে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তারপর সকালের ব্যাপারটা তো সে ঘরে ঢুকে নিজের চোখেই দেখেছে—অ্যাসট্রে উপছে পড়ছে পোড়া সিগ্রেটের টুকরোয় আর ছাইয়ে।

আজ আবার অসংলগ্নভাবে থেমে থেমে বক্তৃতা।

শ্যাম স্কোয়ারের বক্তৃতাপর্ব শেষ হবার পর রেইনবো ক্লাবে একটা পার্টি ছিল—কিন্তু নীলাদ্রি গাড়িতে উঠে বললে, বাড়ি চল—

তনিমা পাশেই বসে ছিল।

সে জিজ্ঞাসা করে, রেইনবো ক্লাবে যাবেন না? যোগজীবনবাবুর কক্‌টেল পার্টি আছে—

না—বাড়ি চল—

না গেলে যোগজীবনবাবু অসন্তুষ্ট হবেন না?

হঠাৎ যেন নীলাদ্রি অনাবশ্যক রূঢ় হয়ে ওঠে—তিক্ত কণ্ঠে বলে what can I do–I am tired–কেন তুমি বুঝতে পারছো না তনিমা, extremely tired আমি।

বিস্মিত থতমত খেয়ে তনিমা তাকায় নীলাদ্রির মুখের দিকে, কিন্তু চলমান গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে নীলাদ্রির মুখটা ভাল করে দেখতে পায় না তনিমা।

শরীরটা কি ভাল লাগছে না?

Please–Please তনিমা—ভাল লাগছে না—আমার কিছু ভাল লাছে না, বাড়ি চল।

॥ ৮ ॥

বাড়িতে পৌঁছে নীলাদ্রি সোজা তার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

তনিমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

শিবদাস প্রভুকে দেখে ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তনিমা চোখ ইশারায় তাকে ঘরে যেতে নিষেধ করে।

শিবদাস একটু যেন বিস্মিত হয়েই তনিমার দিকে তাকায়।

বলে, সাহেবের ঘরে যাবো না, দিদিমণি?

না। এখন যেও না—

তনিমা কথাটা বলে ঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরে এসে কয়েকটা কাগজপত্র নিল তনিমা—আবার নীচে অফিসঘরে নেমে গেল।

ইলেকশনের দিন প্রায় এসে গেল—

মাত্র মাস দেড়েক হাতে আছে। এই সময়ই ইলেকশনের কাজটা জোরদার করা দরকার।

নীলাদ্রি চৌধুরীর প্রতিপক্ষকে যদিও নীলাদ্রির কোন ভয় নেই তথাপি জনগণের মতিগতির ব্যাপার বলা যায় না।

এদের কখন যে কি মতিগতি হয়—কোন দিকে যে ওরা কখন ঢলে পড়ে, কাকে কখন মাথায় তুলবে আবার কাকে কখন ধুলোয় টেনে বসিয়ে দেবে, বিধাতাও বুঝি তা জানেন না।

কাজেই ভাল করে ইলেকশনের কাজ করে যেতে হবে।

ইলেকশনের ক্যাম্পেনের ব্যাপারে কিছু কাগজপত্র জমা হয়েছে গত দুদিন ধরে—সেগুলো গুছিয়ে যেমন করেই হোক কাল সকালে কোন এক সময় নীলাদ্রির কাছে পেশ করতে হবে।

তনিমা টেবিলের সামনে বসল।

কাজ করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল তনিমা। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

মিঃ নীলাদ্রি চৌধুরীর সেক্রেটারী স্পীকিং—

মিস ব্যানার্জী—গুড ইভনিং—ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, আমি পরাশর মিত্র কথা বলছি—

ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায় তনিমার পরাশর মিত্র নামটা শুনেই।

মিঃ চৌধুরী এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন—তনিমা একটু যেন বিরক্তি কণ্ঠেই বলে।

মিঃ নীলাদ্রি চৌধুরী নয়। আমি আপনাকে খোঁজ করছিলাম বিশেষ করে—

আমাকে?

হ্যাঁ— কারণ আজ মিস ব্যানার্জী হলেও দুদিন বাদেই তো হচ্ছেন মিসেস নীলাদ্রি চৌধুরী!

তনিমার মুখটা সহসা যেন অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বলে, তা ওটা তো অত্যন্ত পুরনো খবর—

জানেন না, পুরনো চালই তো ভাতে বাড়ে—

দেখুন মিঃ মিত্র, আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন—বলে ফোনটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল কিন্তু ওপাশ থেকে বাধা এলো আবার।

আহা শুনুন শুনুন—ব্যস্ত আজকের দিনে তো আমরা সবাই। তবুও ফরম্যালিটিজ বজায় রাখতেই হয়—

দেখুন ভণিতা রেখে কাজের কথাটা বলুন তো!

কোনটা যে কাজ আর কোন্‌টা অকাজ সেটা আমরা সব সময়ই কি বুঝতে পারি ঠিক ঠিক, মিস ব্যানার্জী—

দেখুন মিঃ মিত্র, এই মাত্র আপনাকে আমি বললাম যে আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি এখন একটু—

যাই বলুন—সত্যি একেই বলে বোধ হয় বরাত—মানে ভাগ্য—কোথায় কোন্ অফিসে সামান্য মাইনের একজন কেরানী ছিলেন, ছোট একতলা বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে মাথা খুঁড়ে মরছিলেন আর এখন একেবারে সাজানো ফ্ল্যাটে—দুগ্ধফেননিভ শয্যা— রাজকীয় খাদ্য--

শুনুন মিঃ মিত্র—আপনি হয়ত জানেন না—

কি জানি না বলুন তো!

আমার নামে কুৎসা রটালে আমি তাকে ককটেল পার্টিতে ইনভাইট করি না R. S. V. P. লিখে করেন না বুঝি—

না—আমি তার জবাব দিই আমার যে হাঙর মাছের সরু চাবুকটা সর্বদা আমার হাতের হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে থাকে সেটা দিয়ে— কিংবা পায়ের চপ্পল দিয়ে—

ঐ দেখুন, আপনি চটেছেন দেখছি—আপনার সৌভাগ্যে সামান্য একটু আনন্দ প্রকাশ করেছি মাত্র— nothing more nothing less যাকগে শুনুন—যে জন্য ফোন করছিলাম—মিঃ চৌধুরীকে সত্যি কেন বলুন তো একটু upset দেখছি ক'দিন ধরে। বিশেষ করে আদালতে সেদিন হঠাৎ জাস্টিস মুখার্জীর ঘরে যাবার পর থেকেই—তারপর আজ শ্যাম স্কোয়ারের বক্তৃতাটাও যেন কেমন পানসে পানসে লাগল—

ওঁর শরীরটা ভাল নেই—

কেন বলুন তো?

আপনি ডাক্তার হলে বলতাম, হয়ত পরামর্শও নিতাম কিন্তু আপনি যখন তা নন--আচ্ছা good night.

তনিমা ঠক করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল এবং শুধু নামিয়ে রাখাই নয় শকেট থেকে ফোনের কানেকশনটা খুলে দিল।

মিঃ চৌধুরী ঠিকই বলেছিলেন—একটা ছুঁচোই।

হঠাৎ ঐ সময় দেয়ালে ঘড়িটার দিকে নজর পড়ল—রাত প্রায় দশটা।

উঃ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে—উঠতে যাবে—শিবদাস এসে ঘরে ঢুকল।

দিদিমণি—

কি শিবদাস—

সাহেব তো এখনো ডাইনিং টেবিলে এলেন না—

আসেননি?

না—দরজার ফুটো দিয়ে দেখলাম, ঘরে আলো জ্বলছে—

দরজায় নক করেছিলে?

না—

আচ্ছা চলো—

দরজার eye দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল তনিমা—

সত্যিই ঘরে আলো জ্বলছে।

আর নীলাদ্রি চৌধুরী ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। এক মুহূর্ত তনিমা কি যেন ভাবল, একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর দরজার গায়ে নক করল—

কে?

আমি—তনিমা জবাব দেয়।

আজ আর কোন কাজ নেই—তুমি যেতে পারো—

শিবদাস বসে আছে—

বলে দাও, রাত্রে কিছু খাবো না—

শিবদাস পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে সবই শুনতে পায়।

শিবদাস বলে, কি হয়েছে সাহেবের বলুন তো দিদিমণি—আজ দুদিন থেকে ভাল করে খাচ্ছেন না, কারো সঙ্গে কথা বলছেন না—

শিবদাস দীর্ঘদিন নীলাদ্রির কাছে আছে।

ভৃত্য হলেও তনিমা জানে সেই একপ্রকার অভিভাবক নীলাদ্রির।

তাছাড়া শিবদাস অত্যন্ত স্নেহও করে নীলাদ্রিকে।

শিবদাস আবার কতটা যেন খেদোক্তির মতই বলে, রাজার ঐশ্বর্য—এত লেখাপড়া শিখলেন—এত নাম যশ— অথচ একটা বিয়ে থা করলেন না—যে বয়েসের যা—

শিবদাস, তোমরা খেয়ে নাওগে—আমি চলি—তনিমা বলে।

তনিমা কিন্তু সে-রাত্রে বাড়ি গেল না শেষ পর্যন্ত কি ভেবে।

তার ঘরে ঢুকে বাড়িতে তার মা সুবালাকে একটা ফোন করে দিল, ইলেকশনের জরুরী কাজে সে আটকা পড়েছে, আজ রাত্রে আর সে বাড়ি যাবে না।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে সুবালা কিছুই বললেন না। মেয়ের ব্যাপারে তিনি একেবারেই ইদানিং চুপ করে গিয়েছিলেন।

ফোন রেখে দিয়ে তনিমা চেয়ারটায় এসে বসল। একটা জরুরী চিঠির ফাইল টেনে নিল।

শিবদাস ঐ সময় আবার এসে ঢোকে, দিদিমণি—

কি শিবদাস?

আপনার কি যেতে দেরি হবে, ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করছে—

আজ আর যাবো না বাড়িতে শিবদাস।

যাবেন না!

না—কিছু জরুরী কাজ আছে।

তাহলে কিছু খেয়ে নিন—

আমার ক্ষিধে নেই—

কিছুই খাবেন না?

আমাকে বরং তুমি এক গ্লাস দুধ পাঠিয়ে দিও ঘরে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল তনিমা।

॥ ৯ ॥

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল—বাইরে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘন্টাধ্বনি হলো।

রাত দুটো।

সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন তনিমার নীলাদ্রির কথা মনে পড়ল।

নীলাদ্রি কি এখনো জেগে—সে রাত্রের মতো সিগ্রেট খাচ্ছে আর পায়চারি করছে!

তনিমা শয্যা থেকে উঠে পড়ল।

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নাইটির উপরে— ঘাসের চপ্পল জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে বেড়রুম থেকে বের হয়ে এলো তনিমা।

সমস্ত বাড়িটা একেবারে স্তব্ধ।

শুধু সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ রাত্রির স্তব্ধতায় একটা শব্দের প্রাণস্পন্দন তুলে চলেছে যেন।

নীলাদ্রির ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়—দরজার eye দিয়ে ভিতরে উঁকি দেয়—

ঘরে আলো জ্বলছে।

নীলাদ্রিকে দেখা যাচ্ছে না—

কিন্তু মৃদুকণ্ঠে একটা আবৃত্তি শোনা যায়।

Our sincerest laughter
        with some pain is fraught
Our sweetest songs are those that tell of
                saddest thought.

তনিমা বন্ধ দরজার গায়ে নক করলে—

মিঃ চৌধুরী—

কে?

আমি তনিমা—

দরজা খুলে গেল—সামনেই দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি—হাতে তার রঙিন তরল পদার্থপুর্ণ একটি দামী ইটালিয়ান কাট্ গ্লাসের পানপাত্র—

একি তুমি বাড়ি যাওনি!

না।

চোখ দুটো যেন নীলাদ্রির বুজে আসতে চাইছে।

মাথার চুল সামান্য বিস্রস্ত—

শীতের রাত্রেও মুখটা যেন ঘামে চকচক করছে। মৃদু মৃদু টলছে যেন নীলাদ্রি।

গায়ের ড্রেসিং গাউনের দড়িটা ঝুলে পড়েছে কোমর থেকে।

এসো—নীলাদ্রি মৃদু গলায় তনিমাকে আহ্বান জানায়।

তনিমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

সামনেই কাচের সেন্টার টেবিলের উপরে একটা প্রায় শূন্য হুইসকির বোতল—অ্যাসট্রে ভর্তি পোড়া সিগ্রেট—

নীলাদ্রির দিকে তাকাল তনিমা।

তনিমা—

বলুন।

আচ্ছা ঐ কবিতাটি জানো?

কোন্‌টা?

ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা,
স্বর্গ, মর্ত্য আরাধ্যা, তুমি হে চিরবরেণ্যা—

হাতের গ্লাসটায় আবার একটা চুমুক দিল নীলাদ্রি।

হঠাৎ তনিমা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ করে—নীলাদ্রির হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিতে নিতে বলে, no–no more–you had enough–চলুন। শুতে চলুন—চলুন—

Don't worry my dear—am drinking since am eighteen only–

চলুন, শোবেন—

কিন্তু ঘুম তো আমার আসবে না—

আসবে, চলুন—

শয্যার দিকে যেতে যেতে কতকটা যেন আপনমনেই বলে নীলাদ্রি, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো তনিমা—বিলেত থেকে তিন বছর পর ফিরে এসে সত্যিই আমি গিয়েছিলাম—কেন যেন মনে হয়েছিল, হঠাৎ হয়ত আজো আমার জন্য সে অপেক্ষা করছে—

কার কথা বলছেন?

শিউলী—

শিউলি! কে সে?

একটি মেয়ে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর তনিমা—আমি শুনেছিলাম।

কি শুনেছিলেন?

একটা চাকরের সঙ্গে সে নাকি সেখান থেকে চলে আসার মাস তিনেক পরই এক রাত্রে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। তারপর আর আমার কি করবার থাকতে পারে বল? Obviously I then completely washed off my hands. I forgot her—আমার জীবনের পাতা থেকে সে অধ্যায়টা মুছে গেল—তারপর হঠাৎ আজ এত বছর পরে—I don't known how off my many years after—

শয্যার কাছে নিয়ে এসে তনিমা নীলাদ্রিকে বলে, শুয়ে পড়ুন তো এবার—

কিন্তু আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান তনিমা—আজ যে অপরাধের জন্য ওকে এসে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে—আজ যে ওর হাত দুটোয় হত্যার রক্তে কলঙ্কিত হয়েছে তার সবটুকু দায়িত্বই বুঝি ওর নয়—।

কই শুয়ে পড়ুন। রাত অনেক হয়েছে।

এবং আমার মনে হচ্ছে কেবলই ওকে চেনবার পর থেকে আজকের পর এই পরিণতির জন্য কি আমিও equally responsible নই; একটা নিষ্পাপ innocent মেয়ে তাকে যদি সেদিন আমি ঐভাবে নষ্ট না করতাম—বোস তনিমা— I must tell you everything—

না—আজ আর কোন কথা নয়—now you must sleep.

তনিমা কোন কথাই আর শোনে না নীলাদ্রির—তাকে একপ্রকার যেন জোর করেই শয্যায় শুইয়ে দেয়—

গায়ে লেপটা টেনে দেয় আলোটা ঘরের নিভিয়ে দেয়।

ঘুমোন।

কিন্তু আমার যে তোমাকে সব কথা বলা হলো না, তমিনা—

কাল বলবেন, শুনবো—

কাল?

হ্যাঁ—

বেশ। তাই ভাল। কালই বলবো—

নীলাদ্রি চোখ বুজল। তনিমা কিন্তু গেল না। মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল তারপর হাত বাড়িয়ে শায়িত নীলাদ্রির মাথার এলোমেলো চুলগুলোতে আঙুল চালাতে লাগল।

অনেক্ষণ পরে এক সময় যখন তনিমার মনে হলো নীলাদ্রি ঘুমিয়ে পড়েছে—তার লেপটা গায়ে টেনে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল—

১০॥

পরের দিন রাত্রে—

নীলাদ্রি তার শোবার ঘরে পায়চারি করছিল, তনিমা এসে ঘরে ঢুকল।

এসো তনিমা—আজ সব বলব তোমাকে—

আপনি আগে কিছু খেয়ে নিন। তারপর শুনবো আপনার কথা।

No appetite—

ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটা অর্ধপূর্ণ হুইস্কির গ্লাস---পাশে একটা Old Smuggler-এর বেঁটে মোটা বোতল। সোডা সাইফন। তার পাশে একটা ক্যারাভ্যান-এর সিগ্রেট টিন।

হাতে জ্বলন্ত একটা সিগ্রেট।

বোস তুমি।

তনিমা একটা সোফায় বসল।

I don't know from where I should start. তারপর একটু থেমে গ্লাসটা তুলে একটা চুমুক দিল আবার নীলাদ্রি।

ঠিক আছে, কোর্ট থেকেই শুরু করি—

তনিমা চেয়ে থাকে নীলাদ্রির মুখের দিকে।

তুমি সেদিন যে কেসটার কথা বলছিলে না।

কোন্ কেসটা?

ঐ যে আমার জুনিয়র অনিল সেন যে কেসটা হাতে নিয়েছে—

মানে ঐ বদ্রীপ্রসাদ আগরওয়ালার মার্ডার কেসটার কথা বলছেন?

হ্যাঁ—

কি হয়েছে সে কেসটার?

সেই মামলার আসামী—?

হ্যাঁ এক রূপোপজীবিনী—বারবনিতা শুনেছি-

ঐ চম্পাবাঈকে আমি চিনি—মানে চিনতে পেরেছি---

চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ— তবে চম্পাবাঈ হিসাবে নয়— because I never met her since she became চম্পাবাঈ! তার অনেক আগে থাকতেই ওকে আমি চিনি—

কি করে চিনলেন?

তনিমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলতে থাকে নীলাদ্রি, সেদিন ও চম্পাবাঈ ছিল না—একটি নিষ্পাপ সরল মেয়ে—তারপর একটু যেন থেমে বলে নীলাদ্রি, হয়ত চম্পাবাঈ না হলে ওকে কোন দিনই এমন করে হত্যার অপরাধে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হতো না আর হয়ত ওকে আজ চম্পাবাঈও হতে হতো না যদি না সেদিন এক যুবকের লালসার আগুনে ওকে দগ্ধ হতে হতো।

তনিমা নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নীলাদ্রি বলে চলে, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যদিও আজ সব কিছুই ওর বিরুদ্ধে—নিম্ন আদালত থেকেও চরম দণ্ডের প্রতি আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাহলেও আমার strong conviction বদ্রীপ্রসাদকে ও হত্যা করেনি—করতে পারে না—আর আমাকে তাই চেষ্টা করতে হবে ওকে বাঁচাবার-yes-I must save her—

আপনার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারিছি না, মিঃ চৌধুরী।আপনিই তো সেদিন বলেছিলেন, ওর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে করে বাঁচানো আজ সত্যিই দুঃসাধ্য—

ঠিক। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আজ, ও হত্যা করতে পারে না অমন ভাবে কাউকে। সবটাই তো হয়ত ওর বিরুদ্ধে সাজানো হয়েছে কিংবা বলতে পারা যায়, ওকে চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

কিন্তু—

আমার দীর্ঘ দিনের আইন ও আদালতের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি আর দেখেছি, কত সময় সত্যিকারের অপরাধী না হয়েও তাকে অপরাধী হতে হয় প্রমাণের আইনের নাগপাশে পড়ে। তাই আমি স্থির করেছি, জান।

কি?

কেসটা আমি হাতে নেবো। আমাকে প্রমাণ করতেই হবে, ও হত্যাকারিণী নয়। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে যেমন করেই হোক—

কি জানতে চান?

ওর এই কয় বছরের অতীত ইতিহাসটা, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না, তা কেমন করে সম্ভব হবে। এই কয়দিন কেবলই কথাটা ভাবছি কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাইনি। কিন্তু একটু আগে পথ একটা আছে, মনে হলো

পথ।

হ্যাঁ—ওর সঙ্গে দেখা করব—

কি বলছেন আপনি! একটা ফাঁসীর আসামী—কেবল তাই নয় রূপোপজীবিনী বারবনিতা, তার সঙ্গে গিয়ে জেলে আপনি দেখা করবেন!

করতেই হবে।

আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

মাথা খারাপ?

নিশ্চয়ই—আপনি ভুলে যাবেন না—আপনি বর্তমানে কি আর ও কে। কি ওর পরিচয়—কোন এক সুদূর অতীতে ওর সঙ্গে আপনার কোন রকম আলাপ বা পরিচয় থাকলে সে কথা আজ আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে হবে—

ভুলে যেতে হবে?

হ্যাঁ—ভুলে যাবেন না, তার পরিচয় আজ একজন দেহ-পসারিণী—নর্তকী—বাঈজী—শুধু তাই নয়, চরম ঘৃণ্য হত্যার অপরাধে সে আজ বিচারের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর আপনি—

আমি—

আপনি সমাজের একজন সর্বজনপরিচিত অভিজাত ব্যাক্তি—বিশিষ্ট পরিচয়ের একজন নাগরিক—কেবল তাই নয়, আসন্নবর্তী লোকসভার ইলেকশনের আপনি একজন প্রার্থী—

জানি—সব জানি—তবু—

আপনার আসন্নবর্তী ইলেকশনে জয় যে সুনিশ্চিত, এটা আপনার যেন জানা, আমরাও তা জানি—তারপর হয়ত সেন্ট্রাল ক্যাবিনেটের একজন মিনিস্টার—

তোমার কোন যুক্তিই আমি অস্বীকার করছি না তনিমা— কিন্তু ওকেও তো আমি অস্বীকার করতে পারছি না—

করতে হবেই অস্বীকার। তাছাড়া মানুষের প্রথম জীবনে কত সময় কত কি ঘটে—সে সব কে মনে রাখে—বিশেষ করে আপনাদের মত মানুষের পক্ষে তো—সেটা উচিতও নয়—

কিন্তু আমার বিবেক কি বলছে জান? এ শুধু অন্যায় নয়, পাপ। তাছাড়া আমি যে বুঝতে পারছি, আজ ওর আপনার বলতে দুনিয়ায় আর কেউই নেই—না, না—আজ ওর পাশে আমাকে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে—

কিন্তু আপনার ভুলও তো হতে পারে।—এবার যেন কতকটা নিরুপায়ের মতই তনিমা বলে।

ভুল?

হ্যাঁ—বলছেন সেও তো অনেক বছর আগেকার কথা। হয়তো এ সে আদৌ নয়—ঐ মেয়েটি অন্য কেউ। আপনার চেনা মেয়েটি নয়।

না—ভুল আমার হয়নি— আমি চিনেছি ওকে ঠিকই—ও সেই-ই—

মানলাম হয়তো সেই! তবু আজ আপনি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। আপনার সেই sympathy-কে জানবেন, আজকের যারা আপনার চারপাশে রয়েছে তারা কেউ ক্ষমার চোখে দেখবে না—

নীলাদ্রি অস্থির চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে আর অসহিষ্ণুভাবে নিজের মাথার চুলগুলো টানতে থাকে।

কেন, কেন দেখবে না—কেন বুঝতে চাইবে না আমিও দোষে গুণে একটা মানুষ—সবারই মত একজন মানুষ—

না তারা তা একবারও ভাববে না—

কিন্তু কেন? কেন বলতে পারো—

কারণ সেটাই স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক!

হ্যাঁ—কারণ, কোন একজন মানুষকে যখন সকলে মিলে বিশেষ একটা পরিচয় দিয়ে দাঁড় করায় যেন তার নিজস্ব বলে আর কিছু থাকে না, থাকতে পারে না।

তার চাইতে আপনি তার কেসটার ব্যাপারে সাহায্য করতে চান, ব্যারিস্টার সেনকেই করুন—নিজের হাতে কেসটা আপনি নিতে চান, নিন—কিন্তু তার সঙ্গে কিছুতেই আপনি দেখা করতে পারবেন না জেলে গিয়ে—

অসহায় দৃষ্টিতে নীলাদ্রি তনিমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—

কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো একটা কথা—আইনের দৃষ্টি দিয়ে আমি বুঝতে পারছি, যেভাবে মেয়েটির দুর্ভাগ্য ওকে চারপাশ থেকে টেনে ধরেছে—যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আজ ওর বিরুদ্ধে সংগৃহীত হয়েছে, কোন আইনজ্ঞের সাধ্য নেই, চরম দণ্ডের হাত থেকে আজ তাকে ফিরিয়ে আনে। She is doomed —কিন্তু আমার মন বলেছে, তা সত্য নয়—আর এটা যে সত্য নয় সেটা প্রমাণ করতে হলে আমাকে নিজেকেই দাঁড়াতে হবে, আমাকে জানতেও হবে ওর এই কবছরের অতীত ইতিহাসটা। জানতে পারলে তার মধ্যেই এমন কিছু সূত্র আমি পাবো, যার দ্বারা ওকে আজ চরম দণ্ডের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে—

বুঝতে পারছেন না কেন সহজ কথাটা, আপনার মত একজন নামকরা বড় ব্যারিস্টার বিনি পয়সায় আজকে ওই কেসটা হাতে নিলে কেউ সেটা মনে করবে না, নিছক সেটা দরদের বা সহানুভূতির ব্যাপার—ভাববে, কোথাও কোন একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

তা হয়ত ভাববে—

শুধু তাই নয়—তারপর জেলে গিয়ে যদি ওর সঙ্গে আপনি দেখা করেন, সেটা আপনার শত্রুরা এই ইলেকশনের মুখে ফলাও করে প্রচার করবে নানা ইঙ্গিত দিয়ে—না, না—নিজের ভবিষ্যৎকে আজ আপনি ধ্বংস করতে পারেন না। It is nothing but suicide.

কিন্তু গণিকা—নর্তকী—বাঈজী আজ সে কার জন্য—হয়ত—হয়ত সে আমারই জন্য—

আপনার জন্য?

হ্যাঁ—হয়ত আমারই জন্য!

আমি আপনার কথা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না—ঐ চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

সম্পর্ক আমার সঙ্গে, তাই না?— Then I must go back to my past—when I was a young man— Just fresh from University—

তনিমা চেয়ে থাকে নীলাদ্রির মুখের দিকে।

হ্যাঁ তনিমা—তুমি তো জান, বিরাট ধনী পিতার একমাত্র সন্তান আমি—ছোটবেলা মাকে হারাই—আমার বাবাই ছিলেন একধারে মা ও বাবা। যখন ম্যাট্রিক দেবো, বাবাও মারা গেলেন। বড়লোকের ছেলে—অজস্র পয়সা—রূপ-যৌবন—ভেবেছি তখন দুনিয়াটা আমারই—হাতের মুঠোর মধ্যে। আর তাতেই হয়ে উঠেছিলাম উচ্ছৃঙ্খল একান্তই স্বেচ্ছাচারী। সেই উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছারিতার যে সব চাইতে বড় vice সেই Woman স্ত্রীলোকের তখন পরিচয় আমার কাছে একটি মাত্রই—তারা হচ্ছে ভোগের সামগ্রী— beauty and youth of woman is only for enjoyment —ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে এলো আমার জীবনে। নীলাদ্রি চৌধুরী একটু থামল যেন, নিজেকে একটু গুছিয়ে নিল—তারপর আবার বলতে শুরু করে, চম্পা নয়, সে হচ্ছে শিউলী! ফুলের মত সুন্দর সারাটা দেহে কমনীয় যৌবন যেন উথলে উঠেছে—দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে আমার যেন আগুন জ্বলে উঠল—

॥ ১১॥

সবে এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে নীলাদ্রি।

সামনে কয়েক মাসের অবসর—

বিলেতে পড়তে যাবার তোড়জোড় চলছে। ঐ সময় এলো তার পিসিমার কাছ থেকে সাদর আমন্ত্রণ—

জমিদারী প্রথা তখনো বিলুপ্ত হয়নি—জমিদারদের তখনো প্রচন্ড প্রতাপ—তাদের রাজ্যে তারাই একমাত্র অধীশ্বর—দন্ডমুন্ডের কর্তা।

পিসিমা বিধবা—বয়স হয়েছে—পিসেমশাইয়ের অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছিল। পিসিমার কোন সন্তানাদি ছিল না।

একটা রাত্রির পথ।

স্টেশন থেকে নেমে মাইল দুই গাড়িতে যেতে হয়। জায়গাটায় পাহাড় অরণ্য সবই আছে—মনোরাম স্বাস্থ্যকর পরিবেশ!

নীলাদ্রি ভাবল, মন্দ কি—একটা মাস পিসিমার ওখানে কাটিয়ে আসা যাক। সে পিসিমাকে চিঠি লিখে দিল—শনিবার শেষ রাত্রে পৌঁছচ্ছি, স্টেশনে গাড়ি পাঠিও।

সময়টা যদিও প্রায় শীতের শেষ।

শেষ রাত্রের দিকে একটু শীত-শীত তবু বোধ হয়। ঘোর-ঘোর অন্ধকারে ট্রেনটা এসে থামল স্টেশনে।

গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন বৃদ্ধ সরকার মশাই প্রফুল্লবাবু।

সৌদামিনী দেবী—নীলাদ্রির পিসিমার বিষয়-সম্পত্তি প্রফুল্লবাবুই দেখাশোনা করেন তার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এখনও।

দীর্ঘদিন স্টেটে আছেন—সৌদামিনী দেবীর স্বামীর আমল থেকেই—

সাদা ঘোড়ার জুড়ি-গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন প্রফুল্লবাবু।

নীলাদ্রি খুব ছোটবেলায় একবার তার সঙ্গে পিসিমার ওখানে এসেছিল দিন দশেকের জন্য।

তারপর দীর্ঘ ক'বছর পরে এই দ্বিতীয়বার আগমন।

তাহলেও প্রফুল্লবাবুকে সে চিনতে পারে।

গাড়ির বুড়ো কোচোয়ান তখন নেই—নতুন কোচোয়ান ইদ্রিস। সে সেলাম দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

ওরা দুজনে উঠে বসে।

দু-আড়াই মাইল পথ—আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যায়।

বিরাট জায়গা জুড়ে প্রাসাদতুল্য বাড়ি। চারপাশে বাগান ও দীঘি—চাকরদের থাকবার আস্তানা।

জুড়ি-গাড়ি যখন গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করল, ভোরের আলো তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিরাট হলঘরের মত একটা ঘর—তার পরই চওড়া শ্বেতপাথরের সিঁড়ি—সেকেলে সব বনিয়াদী আসবাবপত্র।

বড় বড় অয়েল-পেনটিং—বেশীর ভাগই নগ্ন নারীমূর্তির।

মাথার উপরে ঝাড়লণ্ঠন।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই পিসিমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বয়েস হলেও এখনো স্বাস্থ্য অটুট—

এককালে যে নামকরা রূপসী ছিলেন, প্রৌঢ়া বয়েসেও তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

পরনে ধবধবে গরদের থান।

নিরাভরণা—

তবু যেন দেখলে আপনা থেকেই মাথা নুয়ে আসে।

মহিলা যেমন রাশভারী তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না।

নত হয়ে পিসিমার পায়ের ধুলো নিতেই পিসিমা মাথায় হাত রেখে আশীবাদ করেন, বেঁচে থাক বাবা—রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি তো—

কষ্ট আবার কি—ভারী তো জার্নি—

পিসিমা ডাকেন, কেষ্ট—অ কেষ্ট—

বেঁটেখাটো কালো কুচকুচে গাত্রবর্ণ ষণ্ডাগণ্ডা একটা লোক এসে দাঁড়াল—ডাকছেন রাণীমা—

মাথার চুল ঘন কুঞ্চিত—পুরু ঠোঁট—চোখ দুটো গোল গোল রক্তবর্ণ।

হ্যাঁ—দাদাবাবুর থাকবার জন্যে যে দোতলার দক্ষিণের বড় ঘরটা ঠিক করে রেখেছি, সেখানে নিয়ে যা—আর শিউলীকে বল, ওকে চা করে দিয়ে আসতে—কলকাতার বাবু, এখুনিই তো চায়ের তেষ্টা পাবে।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না তো পিসিমা—নীলাদ্রি বলে।

না—ব্যস্ত হইনি—তুই যা, চা খেয়ে বিশ্রাম কর—আমি পূজোটা সেরে আসি।

পিসিমা চলে গেলেন।

কেষ্ট বলে, চলুন দাদাবাবু—

চল।

দুজনে বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে দক্ষিণের মহলে নীলাদ্রির জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে।

লম্বা টানা বারান্দা—

মধ্যে মধ্যে দেওয়ালগিরি।

গোল গোল বিরাট থাম—উপরে চমৎকার পঙ্খের কাজ করা।

অদ্ভুত স্তব্ধ যেন বাড়িটা।

স্তব্ধ—শান্ত।

দক্ষিণ মহল অর্থাৎ বাড়ির পশ্চাৎদিক—বেশ বড় সাইজের ঘর—যে ঘরে নীলাদ্রির থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ভাইপো শহরে থাকে, তাই পিসিমা তার আরামের সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন।

নীলাদ্রি ঘরে ঢুকে প্রথমেই ঘরের সমস্ত জানলাগুলো খুলে দিল, দক্ষিণ দিকেই উদ্যান ও কাক-চক্ষু জল এক বিরাট দীঘি চোখে পড়ল।

সবুজ-প্রাচুর্যে নীলাদ্রির চোখের দৃষ্টি যেন স্নিগ্ধ হয়ে যায়—প্রসন্নতায় মনটা ভরে ওঠে।

একজন ভৃত্য এসে নীলাদ্রির সুটকেস দুটো ঘরে রেখে গেল।

নীলাদ্রি জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে।

আপনার চা—

কথা নয়, হঠাৎ যেন পিছনে কে গানের সুরে গেয়ে উঠল।

ফিরে তাকাল নীলাদ্রি।

চোখের দৃষ্টি যেন তার আর ফেরে না। শুধু সুন্দরই নয়, অপূর্ব।

পনের ষোল বছরের একটি তরুণী। সরু পাতলা চেহারা, কিন্তু সদ্য-আসা যৌবন যেন সারা দেহে টলমল করছে।

কাঁচা সোনার মত রং।

ছোট কপাল, নাক চিবুক পাতলা, দুটি ঠোঁট যেন কোন দক্ষ শিল্পীর তুলির টানে আঁকা হয়েছে।

পরনে একটা নীলাম্বরী শাড়ি—বুকের উপর দিয়ে ঘেব দিয়ে কোমরে জড়ানো।

মাখনে গড়া দুটি মণিবন্ধে দুটি সোনার বালা।

কানে দুটি লাল পাথরের দুল।

টাইট করে টেনে চুল খোঁপা করে বাঁধা।

গায়ের হাফহাতা জামা থেকে পীনোন্নত বক্ষ যৌবনকে যেন এঁটে রাখতে পারছে না।

নীলাদ্রি যেমন অপলক মুগ্ধ বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও তেমনি চেয়ে ছিল পলকহারা দৃষ্টিতে নীলাদ্রির দিকে।

হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ।

নীলাদ্রির যেন চমক ভাঙে—সে দু পা এগিয়ে মেয়েটির হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে গিয়ে

ইচ্ছা করেই মেয়েটির চাঁপার কলির মত আঙুলের স্পর্শ চুরি করে নেয়—

সারা দেহে যেন একটা পুলকের বিদ্যুৎশিহরণ খেলে যায়।

মেয়েটিও যেন নীলাদ্রির স্পর্শে কেঁপে ওঠে।

মেয়েটি ফিরে যাচ্ছিল, নীলাদ্রি ডাকল, কি নাম তোমার?

শিউলী—

চোখ নামায় শিউলী।

শিউলী আবার যাবার জন্য পা বাড়ায়। নীলাদ্রি আবার বাধা দেয়, দাঁড়াও না—

আবার দাঁড়াল শিউলী।

এখানেই বুঝি থাক তুমি?

হ্যাঁ—

পিসিমার কাছে?

হুঁ।

কতোদিন আছো?

খুব ছোটবলোয় মা-বাবা মারা যাবার পরই মা আমাকে এখানে নিয়ে এসে তাঁর কাছে রেখেছেন।

কি নামটা যেন বললে তোমার—

শিউলী—

সুন্দর নাম। আমি কে জান?

ও ঘাড় হেলিয়ে জানায়, সে জানে।

আমার নাম জান?

ও মাথা নাড়ল, জানে না—

নীলাদ্রি।

আমি যাই—

দাঁড়াও না—ব্যস্ত কি?

মার পূজো হয়ে গেছে বোধহয়, তাঁর সঙ্গে এবারে আমাকে বেরুতে হবে—

বেরুতে হবে—কোথায়?

মা বেড়াতে বেরুবেন—তাঁর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে—

রোজ বুঝি এই সময় পিসিমার সঙ্গে যাও—

হুঁ।

আর কি করতে হয় তোমাকে এখানে?

সন্ধ্যার দিকে মাকে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাতে হয়—তাঁর চিঠিপত্র থাকলে সেগুলো পড়ে মার হয়ে জবাব দিতে হয়—

নীলাদ্রি কৌতুকভরা কণ্ঠে বলে, পিসিমার প্রাইভেট সেক্রেটারী তাহলে একরকম বল তুমি।

ও মৃদু হাসে।

মাথাটা সলজ্জ ভঙ্গিতে নীচু করে।

নীলাদ্রির মনে পড়ে পিসিমা সৌদামিনী দেবীর খুব ছোট বয়সে বিবাহ হয়েছিল. প্রকৃতপক্ষে যখন তাঁর খেলাঘরের খেলাই বুঝি শেষ হয়নি।

যদিও পিসেমশাই ছিলেন ধনীর একমাত্র ছেলে, তা সত্ত্বেও লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন বরাবরই। তাছাড়া তাঁর গান বাজনা ছবি আঁকারও নেশা ছিল—পিসিমাকে হয়ত নিজের মত করেই গড়ে নিয়েছিলেন বিবাহের পর।

শিউলী বলে, আমি এবারে যাই—

কি জানি কেন, নীলাদ্রির শিউলীকে কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না, অথচ আটকে রাখবেই বা কি করে।

তাই মৃদু হেসে বলে—কিন্তু আমার যে আর এক কাপ চায়ের দরকার—

আর এক কাপ—

হ্যাঁ—পিপাসাই তো মিটল না।

এনে দিচ্ছি—

খুব জলদি চাই কিন্তু—নচেৎ আমি গিয়ে ঠিক তোমার রন্ধনশালায় হাজির হবো, জেনো।

আমি এখুনি আনছি চা করে—

শিউলী ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিরাট একটা সেকেলে আরামকেদারা ছিল ঘরের মধ্যে, নীলাদ্রি সেটার উপর গা ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে গুণগুন করে গান ধরে—

একটু পরে সৌদামিনী দেবী এসে ঘরে ঢোকেন—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে শিউলী।

নীলু—

কে—পিসিমা—

এত চা খাস কেন বল তো, ঐ জন্যেই তো তোদের ক্ষিদে হয় না—

শিউলী চায়ের কাপটা নীলাদ্রির হাতে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নীলাদ্রি বলে, ভয় নেই তোমার পিসিমা—খাবো যখন দেখবে—কিন্তু চায়ের তৃষ্ণা শিউলী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আর নীলাদ্রির ছিল না।

গোটা দুই চুমুক দিয়ে পুরো কাপটাই একপাশে নামিয়ে রাখে নীলাদ্রি।

ঐ মেয়েটি কে পিসিমা—আগেরবার যখন এখানে এসেছিলাম, ওকে কই দেখিনি তো—

না—ও তো এই বছর আষ্টেক হলো আমার কাছে আছে—সঞ্জীব বোস আমাদের এক প্রজা ছিল—লোকটা যেমন মাতাল তেমনি অকমর্ণ্য ও চরিত্রহীন—ও তারই মেয়ে—

ওর মা-বাবা বুঝি বেঁচে নেই—

না—সে এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার—

কি রকম?

নিজে মাতাল চরিত্রহীন ছিল অথচ নিরীহ বৌটাকে সর্বদা সন্দেহ করত। শেষটায় একদিন কি হয়েছিল, কে জানে, বৌটাকে গলা টিপে মেরে নিজে পালায়—

বল কি! তারপর—।

কিন্তু পালাতে পারে না, শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে ধরা পড়ে—বিচারে ফাঁসি হয়—মেয়েটাকে দেখবার কেউ নেই—বাচ্চা সাত-আট বছরের মেয়ে ও তখন—আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল তারাও মুখ ফেরাল—কোথায় যায় মেয়েটা—আমিই নিয়ে এলাম আমার কাছে। সেই থেকে আমার কাছেই আছে। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম কিন্তু কিছুদুর পড়ে আর পড়ল না। ভাবছি, মেয়েটার একটা বিয়েথা দিয়ে সংসার পাতিয়ে দেবো। এখানে তো ওর বাপের পরিচয়ের জন্যে কেউ বিয়ে করবে না ওকে—তা হ্যাঁরে—তোদের কলকাতায় কত ছেলে আছে শুনি, তেমন কোন ছেলের সন্ধান মানে সদ্‌বংশের লেখাপড়া জানা কোন গরীবের ঘরের ছেলের সন্ধান করতে পারলে আমায় জানাস তো বাবা।

বেশ তো—জানাবো।

হ্যাঁ—দেখিস—মেয়েটাকে এই বাড়িতে আর রাখতে ভরসা হয় না—রাক্ষুসীর যত দিন যাচ্ছে, রূপ আর যৌবন যেন ফেটে বেরুচ্ছে—

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে।

বাড়ির পিছনে যে বাগানটা— নীলাদ্রি একা একা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

পিসিমা দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। বাড়ির দাসদাসীরাও সব যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে নীলাদ্রি।

কোথা থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসে।

কে যেন গাইছে—

গানের প্রথম লাইনটা তার কানে আসে।

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই—

কে— কে গান গায়—এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নীলাদ্রির নজরে পড়ে বাগানের

বিরাট একটা পেয়ারা গাছের ডালে দোলনা বাঁধা—সেই দোলনায় দোল খেতে খেতে আপনমনে গাইছে শিউলী—

নীলাদ্রি এগিয়ে যায়—

শিউলী গায়—

(আমি) তোমার প্রেমের কিই বা জানি।
কিবা রাখালিয়া মতি
কি জানি পিরিতি
প্রেমের পসরা তুই—

সহসা গান শেষ হতেই শিউলীর নজর পড়ে নীলাদ্রির উপরে। কিছুদূরে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি ওর দিকেই তাকিয়ে। নীলাদ্রি যেন দু চোখ মেলে ওকে দেখছে।

লজ্জা পেয়ে যায় শিউলী। ঝুপ করে দোলনা থেকে লাফিয়ে পড়ে নীলাদ্রির পাশ কাটিয়ে ছুটে পালাতে যাবে অকস্মাৎ দু হাত বাড়িয়ে নীলাদ্রি ওর পলায়নপর দেহটা ধরে ফেলে।

না না—ছাড়ুন ছাড়ুন—নীলাদ্রির হাতের বাঁধন খুলে যাবার চেষ্টা করতে থাকে শিউলী।

না, ছাড়বো না—

আঃ—ছাড়ুন ছাড়ুন—

নীলাদ্রি ছেড়ে দেয় শিউলকে। সঙ্গে সঙ্গে ও ছুটে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নীলাদ্রি বলতে থাকে, আজ মিথ্যা বলবো না তোমাকে তনিমা, তখন পর্যন্ত মেয়েছেলে আমার কাছে ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শিউলীর সেই রূপ আর উদ্ভিন্ন যৌবন যেন বুকের মধ্যে আমার আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি যেন শিউলীকে পাওয়ার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠলাম। কিন্তু শিউলী বোধহয় ব্যাপারটা সবটা না জানলেও কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল। সে আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগল। সামনে এলেও আমার সরাসরি—নাগালের অনেক দূরে দূরে থাকত।

॥ ১২ ॥

নীলাদ্রি বলতে থাকে, যেন শিউলী সেদিন বুকের মধ্যে তৃষ্ণার আগুন জ্বেলে দিয়েছিল—আমার—যত সে আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল ততই যেন তাকে পাওয়ার জন্য ছটফট করছিলাম।

সত্যিই নীলাদ্রির বুকের মধ্যে তখন আগুন জ্বলছে।

অথচ চার-পাঁচদিন নীলাদ্রি শিউলির আর যেন ছায়াও দেখতে পায় না।

চাও দিতে আসে না শিউলী আর তাকে।

চা নিয়ে আসে কেষ্ট।

ছটফট করে নীলাদ্রি কিন্তু না পারে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে কিছু, না পারে শিউলীকে ডাকতে।

আর ঐ কেষ্টটার দিকে তাকালেই কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে নীলাদ্রির।

নীলাদ্রি শুনেছিল—শিউলী সন্ধ্যার দিকে পিসিমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনায়—

একদিন নীলাদ্রি সেই আসরেই গিয়ে হাজির হলো অবশেষে।

পিসিমার শয়নঘরে।

বিরাট একটা পালঙ্কের উপর শুয়ে আছেন সৌদামিনী আর শেজবাতির আলোয় মেঝেতে মাদুর পেতে রামায়ণটা খুলে পড়ছে শিউলী।

সুর করে সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ পাঠ করছে শিউলী।

নীলাদ্রিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সৌদামিনী ওর দিকে তাকান।

শিউলী কিন্তু দেখতে পায়নি নীলাদ্রিকে, সে যেমন পড়ছিল, পড়ে চলে।

পিসিমা বলেন, নীলু—আয় বোস। বেড়াতে যাসনি আজ?

গিয়েছিলাম—

নীলাদ্রি পালঙ্কের উপরই পিসিমার পায়ের কাছে বসল।

নীলাদ্রির গলার সাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শিউলী বন্ধ করে দিয়েছিল রামায়ণ পাঠ। মাথা নিচু

করে বসে ছিল। গায়ের কাপড়টা একটু টেনে দেয় ভাল করে।

শিউলীর দিকে তাকিয়ে সৌদামিনী বলল, আজ থাক—তুই এখন যা—

শিউলী রামায়ণটা বন্ধ করে সেটা তাকের উপর তুলে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে যায় নিঃশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রিরও তার পিসিমার সঙ্গে কথা বলার সমস্ত উৎসাহ যেন নির্বাপিত হয়ে যায়।

তারও ইচ্ছা করে উঠে যেতে, কিন্তু পারে না।

পিসিমা শুধান, কতদূর বেড়াতে গিয়েছিলি রে?

সেই পাহাড়টা পর্যন্ত—

উপরে উঠেছিলি?

না—

উপরে একটা মন্দির আছে— একদিন যাস—উপরে উঠলে চারদিক ভারি চমৎকার দেখায়।

তুমি বুঝি উঠেছিলে?

হ্যাঁ—তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে একদিন উঠেছিলাম। অনেক বছর আগে—

আমি উঠি পিসিমা—হেঁটে এসে বড় ক্লান্ত লাগছে—

যা তাহলে বিশ্রাম করগে—

নীলাদ্রি যেন উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

বাইরে চাঁদ উঠেছে—চাঁদের আলো দোতলার বারান্দায় এসে পড়েছে।

এদিকে ওদিকে তাকায়, যদি শিউলীকে দেখতে পায়, কিন্তু কোথায়ও তাকে দেখতে পায় না। মনে মনে রাগই হয় যেন নীলাদ্রির—মেয়েটা ভাবছে কি।

নীলাদ্রি নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে আবার অকস্মাৎ দীঘির ঘাটে নীলাদ্রি শিউলীর দেখা পায়।

ঘুরে বেড়াচ্ছিল নীলাদ্রি বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ছায়ায়—

কোথায় একটা কোকিল ডেকে ওঠে কু-কু-কু—

সঙ্গে সঙ্গে কোমল নারীকণ্ঠে অনুকরণ ভেসে আসে, কু-কু-কু—

এদিক ওদিক তাকায় নীলাদ্রি।

তারপরই নজরে পড়ে দীঘির জলে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে কোকিল-টাকে ভেঙাচ্ছে শিউলী।

কু-কু-কু—

মৃণালের মত দুটি বাহু দিয়ে জলে ঢেউ তুলছে শিউলী আপন খেয়াল-খুশিতে।

পিসিমা সেদিন গৃহে ছিলেন না। নীলাদ্রি জানত—মাইল দশেক দূরে কোথায় এক জাগ্রত মূর্তি আছে তার পূজা দিতে গিয়েছেন।

নীলাদ্রি একবার থামল—একটু ইতস্তত করল, তারপর এগিয়ে যায় সোজা দীঘির রানার দিকে।

শিউলির স্নান হয়ে গিয়েছিল—সে উঠে আসছে, ভিজে শাড়ি সর্বাঙ্গে লেপটে রয়েছে—যৌবনপুষ্ট দেহের প্রতিটি ভাঁজ প্রতিটি রেখা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এলো চুল—

নীলাদ্রির চোখের দৃষ্টি যেন আর ফেরে না।

সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে আচমকা শিউলীর নজরে পড়ে গেল সামনে তার নীলাদ্রি—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সে।

কয়েকটা মুহূর্ত।

তারপরই যথাসম্ভব নিজের দেহকে সংকুচিত করে শিউলী বলে, যেতে দিন—

আস না কেন আমার কাছে?

শিউলী নীরব।

আমার কথার জবাব না দিলে যেতে দেবো না—

শিউলী নীরব তবু। বোঝা যায় সে বিরক্ত হচ্ছে।

ক'দিন দেখতে পাইনি কেন? আস না কেন আমার কাছে?

ও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তখনো।

মাথাটা যথাসম্ভব নীচু করে দাঁড়িয়ে শিউলী। ভিজে শাড়ি থেকে টুপটুপ করে দীঘির রানার উপরে জল ঝরে পড়ছে।

যেতে দিন—

যতক্ষণ না আমার কথার জবাব দিচ্ছ, ততক্ষণ নয়—

অকস্মাৎ ওর দুচোখের কোল জলে ঝাপসা হয়ে যায়—জলে ভেজা অসহায় দুটি চোখের দৃষ্টি নীলাদ্রির দিকে তুলে কান্না-ঝরা গলায় বলে, কেন আপনি আমার সঙ্গে এমন করছেন—

কি করলাম আমি তোমার সঙ্গে—

আমি গরীব—আপনার পিসিমার আশ্রিত বলেই কি আমার কোন সম্ভ্রম নেই—ইজ্জত নেই—

সহসা যেন একটা চাবুক এসে পড়ল নীলাদ্রির মুখের উপরে। কয়দিন ধরে শিউলীর অদর্শনে মনের মধ্যে যে তৃষ্ণাটা জেগে উঠেছিল তারই অন্ধ আবেগে শিউলীর পথ রোধ করে সে দাঁড়িয়েছিল—

শিউলীর কথায় সমস্ত পরিস্থিতির নির্লজ্জতাটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি শিউলীর পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলে, যাও—তুমি—

শিউলী আর দাঁড়ায় না—চলে যায়।

দুটো দিন তারপরে নীলাদ্রি আর শিউলীর ছায়াও দেখতে পায় না। মনের মধ্যে সে ছটফট করতে থাকে।

দিন তিনেক পরে—দুপুর বেলা আড়াইটে নাগাদ চা খাওয়া নীলাদ্রির বরাবরের অভ্যাস।

গত কয়েক দিন কেষ্টই চা দিয়ে যাচ্ছিল।

নীলাদ্রি ঘরের মধ্যে আরাম-চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল, এমন সময় শিউলী এক কাপ চা হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল শিউলী—নীলাদ্রি ডাকে শিউলী।

শিউলী মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

নীলাদ্রি কেদারা থেকে উঠে ওর সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়।

শিউলী।

শিউলী কোন সাড়া দেয় না।

নীলাদ্রি ওর দুই কাঁধের উপর দুটো হাত রাখে, শিউলী।

শিউলী, মাথা নীচু করেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

শিউলী, মুখ তোল। তাকাও আমার দিকে, কই তাকাও—

শিউলী মুখ তুলল।

দু চোখে তার জল টলটল করছে।

সেদিনকার আমার ব্যবহারের জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা করো শিউলী। বিশ্বাস করো—ইচ্ছা করে তোমায় সেদিন আমি কোন রকম অপমান করিনি। তুমি বিশ্বাস করো, প্রথম যেদিন তোমায় আমি দেখি আমার দু'চোখ যেন ভরে গেল—মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি আমি। আমি—আমি তোমাকে ভালবেসেছি শিউলী—সত্যিই তোমাকে আমি ভালবেসেছি। এ কয়দিন একটিবারও তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমি কি যে কষ্ট পেয়েছি তুমি যদি জানতে—

আপনাদের আশ্রিত আমি—কেউ নেই আমার—যা খুশি তাই আপনি বলতে পারেন—সেদিনও ঐ কথা বলেছেন, আজো বলছেন।

কেন তুমি বার বার ঐ কথা বলছো শিউলী, কেন—কোন তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না—বিশ্বাস করো, সেদিনও তোমাকে আমি অপমান করতে চাইনি বা কোন রকম বে-ইজ্জত করতে চাইনি—আর আজও চাই না—

শিউলীর দুচোখের কোণ বেয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

নীলাদ্রি ওর কাঁধের উপর থেকে হাত নামিয়ে নেয়, বলে জানি না তুমি কি হলে বিশ্বাস করবে—ঠিক আছে আর তোমাকে আমি কখনো কিছু বলবো না, যাও তুমি—

নীলাদ্রি সরে দাঁড়াল।

শিউলী ধীরে ধীরে নীলাদ্রির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

নীলাদ্রি হঠাৎ বলে, ঠিক আছে তুমি যখন মনে করেছো কেবলই যে তোমাকে আমি পীড়ন করছি, কালই আমি চলে যাবো—

শিউল থমকে দাঁড়ায়, ভীতত্রস্ত দৃষ্টিতে নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, না—না আপনি যাবেন না—মা—হয়ত ভাববেন—

পিসিমা ভাবলেই বা কি করবো, যেতে আমাকে হবেই—

না, না—

তাহলে, বল, আমার কাছ থেকে তুমি আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে না—

বেড়াবো না।

ঠিক তো?

হ্যাঁ—

শিউলী অতঃপর ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়।

নীলাদ্রি চিৎকার করে বলে অপসৃত শিউলীকে সম্বোধন করে, আজ বিকেলের দিকে দীঘির ঘাটে আমি অপেক্ষা করবো, তুমি এসো—আমি অপেক্ষা করবো।

কোন সাড়া দিল না শিউলী।

বিকেল।

সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হবার পর শিউলী এলো দীঘির ঘাটে—যখন প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ফিরে যাওয়ার জন্য নীলাদ্রি—তখন।

বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল। চাঁদের আলোয় আকাশ ও প্রকৃতি তখন যেন ভেসে যাচ্ছে।

এসেছো—এসো—নীলাদ্রি সামনে এগিয়ে যায়।

ও নীলাদ্রির আহ্বানে কোন সাড়া দেয় না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলাদ্রি এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে—শিউলীর দেহটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল।

নীলাদ্রি ওর হাতটা ধরে এনে দীঘির রানার ওপর বসাল ওকে, বোস—

নিজেও পাশে বসল—

ঘড়িতে রাত সোয়া আটটা। ভাবছিলাম, তুমি বোধ হয় আর এলে না।

শিউলী চুপচাপ বসে থাকে।

কি হলো, কথা বলছো না যে?

শিউলী তবু নীরব।

কথা বলছো না তো?

কি বলবো!

যা খুশি তোমার বল—শুধু কথা বল!

কেন ডেকেছেন আমাকে?

কেন ডেকেছি, বুঝতে পারছো না! শিউলী—নীলাদ্রি ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।

বললে নীলাদ্রি, শিউলী, সত্যিই কি তুমি আমাকে এখনো বিশ্বাস করতে পারছো না?

যা অসম্ভব তা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না—মৃদু গলায় শিউলী জবাব দেয়।

কি অসম্ভব—তোমাকে আমার ভালবাসা?

হ্যাঁ—

কেন—

কে আমি—কি আমার পরিচয়! স্ত্রী-হত্যাকারী এক খুনী বাপের মেয়ে আমি—পরের দয়ায় বেঁচে আছি—তা ছাড়া কি আছে আমার—কোন পরিচয় নেই, শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নেই—আর আপনি—

কি আমি—

কত বড় বংশের ছেলে—কত নাম—কত লেখাপড়া করেছেন—শিক্ষায়, দীক্ষায়, অর্থে, আভিজাত্যে—

নীলাদ্রী বুঝতে পারে, এ তো কোন বোকা মেয়ের কথা নয়, রীতিমত বুদ্ধি রেখে প্রতিটি কথা বলছে—

নীলাদ্রি বলে, সেটাই কি আমার তোমাকে ভালাবাসার পক্ষে অযোগ্যতা—

হ্যাঁ—কেউ আপনার ঐ অনুগ্রহকে সত্যি হলেও মিথ্যা বলেই ধরবে—ক্ষমার চোখে দেখবে না—

এত কথাই যখন তুমি আমার সম্পর্কে জান—নিশ্চয়ই এও জান, আমিই আমার অভিভাবক—

॥ ১৩ ॥

নীলাদ্রি বলতে থাকে—

আমার নিজের ইচ্ছের ওপরে কারো কথা বলবার যেমন কোন অধিকার নেই তেমনি বললেও শুনবো না আমি—শুনিওনি কখনও আজ পর্যন্ত।

তবু যা হয় না—

কি হয় না—

আপনি যা বলছেন।

হয় না! কেন?

আমি জানি, মা—মানে আপনার পিসিমা কখনোই রাজী হবেন না।

কিন্তু বিয়ে তো করব আমি—পিসিমা নন—তাছাড়া সব কিছু আমার উপরই না হয় তুমি ছেড়ে দিলে, শিউলী। তবে তোমার দিক থেকে সত্যি সত্যিই যদি কোন আপত্তি থাকে তো—

আমার দিক থেকে?

হ্যাঁ— বল শিউলী। নীলাদ্রি শিউলীর একটা হাত চেপে ধরে।

শিউলী কোন জবাব দেয় না।

কি, জবাব দিচ্ছ না যে, বল! জবাব দাও—

আমি—

বল—

আমি এখনো ভাবতেই পারছি না—

কি ভাবতে পারছো না?

এমন কি আপনি আমার মধ্যে দেখেছেন যা—

ও—এই কথা—কি দেখেছি জান?

কি?

সহসা নীলাদ্রি শিউলীকে দু হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে বলে, শিউলী, তুমি আমার স্বপ্ন—

কিন্তু—

উহুঁ। আর কোন কথা নয়। আমাদের শেষ কথা বলা হয়ে গিয়েছে—

শিউলী নীলাদ্রির বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে দেয়।

আর এক রাত্রে—

বাগানের মধ্যে অন্ধকারে নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে ছিল শিউলীর প্রতিক্ষায়।

ও আসতেই নীলাদ্রি ওকে বুকের মাঝে টেনে নেয়, এত দেরি করলে যে?

কি করি, মা না ঘুমোলে তো আসতে পারি না—

মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার না—

তুমি বুঝি ঘুমের মন্ত্র জান?

জানি—

বেশ, শিখিয়ে দিও আমায়। কিন্তু আমার বড় ভয় করে—

ভয় কিসের—

তোমার পিসিমা হয়ত—

চুপ করে থাক না কটা দিন—কলকাতায় ফিরে বিলেত যাবার আগে একদিন এসে তোমাকে বিয়ে করে যাবো—সঙ্গে করে একেবারে পুরোহিত নিয়ে আসবো।

সত্যি—বল, তিন সত্যি—

সত্যি সত্যি সত্যি—এবারে খুশী তো? নীলাদ্রি দুবাহুর নিবিড় বন্ধনে শিউলীকে টেনে নেয়।

শিউলী—

উঁ—

এবারে তোমার ভয় গেছে তো—

হুঁ—

হ্যাঁ—লক্ষ্মী মেয়ে সোনা মেয়ে শিউলী আমার—

হঠাৎ এক সময় শিউলী বলে, কাল এক জায়গায় যাবে?

কোথায়? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শিউলীর মুখের দিকে নীলাদ্রি।

জান এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে জঙ্গলের মধ্যে এক পুরাতন বহু দিনের শিবমন্দির আছে—

তাই নাকি, তা সেখানে কেন?

সেই মন্দিরের যে শিব ঠাকুর না—

কি?

খুবই জাগ্রত।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—তাঁর কাছে যা চাওয়া যায় মনে মনে, তাই পাওয়া যায়। চল না, যাবে?

বেশ, যাবো। কিন্তু তুমি বুঝি কিছু চাইবে?

জানি না, যাও—

আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, যাওয়া যাবেখন।

পরের দিন দুজনে বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সেই মন্দিরে গিয়ে হাজির হলো।

শিউলী বলে, চল ভিতরে—

না—তুমি যাও—

তুমি যাবে না?

না।

কেন?

আমার যা চাইবার ছিল,তা তো পেয়েই গিয়েছি—আমার তো কিছু চাইবার নেই—তুমি যাও।

অগত্যা শিউলী একাই যায় মন্দিরের ভিতরে।

কিছুক্ষণ পরে যখন শিউলী মন্দিরের ভিতব থেকে বাইরে এলো, মৃদু হেসে নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করে, চাইলে?

হুঁ।

কি চাইলে তোমার জাগ্রত শিব ঠাকুরের কাছে?

তোমার তিনি মঙ্গল করুন—

ব্যস্। আর কিছু না! আর কিছুই চাইলে না?

আর কি চাইব!

সত্যি আর কিছু চাওনি?

না তো!

ফিরতে রাত হয়ে গেল।

দুজন দুই পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। নীলাদ্রি যায় সদর আর খিড়কি দিয়ে যায় শিউলী।

বাড়িতে পৌঁছে দেখে নীলাদ্রি—সৌদামিনী শিউলীর খোঁজ করছেন।

কোথাও তো যায় না মেয়েটা—গেল কোথায়!

সৌদামিনীর ঘরে ঢুকতেই তিনি বলেন, শিউলীকে দেখেছিস নীলু?

না তো।

আশ্চর্য! মেয়েটা গেল কোথায়, এত রাত হয়ে গেল—

কোথায় আর যাবে। হয়ত বাগানে বা ছাদে আছে—নীলাদ্রি বলে।

সৌদামিনী বলেন, তোর একটা চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে।

চিঠি! কোথায়!

সৌদামিনী সেল্‌ফের উপর থেকে একটা খাম পেড়ে দেন নীলাদ্রির হাতে।

নীলাদ্রি আলোর সামনে চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করে।

কার চিঠি রে?

আমার সরকার যোগজীবনবাবুর।

কি লিখেছেন?

পাসপোর্ট-ভিসা রেডি হয়ে গিয়েছে—জাহাজেও প্যাসেজ বুক করা হয়ে গিয়েছে—

ও—তা কবে যাবি?

সামনের মাসেই—

সামনের মাসে কবে?

শেষাশেষি—কালই আমি যাবো, ভাবছি—

কালই যাবি!

হ্যাঁ—অনেক কিছু কাজ আছে—সব ব্যবস্থা করতে হবে—

শিউলী এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকল—

আমাকে ডাকছিলে, মা?

কোথায় গিয়েছিলি?

আমি তো দীঘির ধারে বসে ছিলাম—

তবে যে ওবা বলছিল, দীঘির ধারে খুঁজে তোকে পায়নি—

মাথাটা বড্ড ধরেছিল, তাই ঠান্ডা হাওয়ায় বসেছিলাম, মা—

ঠিক আছে, যা—

নীলাদ্রি আগেই ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল—শিউলী সৌদামিনীর ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা দিয়ে ঘরের দিকে যাচ্ছিল। অন্ধকারে একটা থামের আড়াল থেকে নীলাদ্রি বের হয়ে আসে।

নীলাদ্রি ডাকল, শিউলী—

শিউলী এগিয়ে এলো নীলাদ্রির সামনে, জিজ্ঞাসা করল, তুমি কালই চলে যাচ্ছো?

তুমি কার কাছে শুনলে?

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনলাম, তুমি মাকে বলেছিলে।

আজ রাত্রে একবার আমার ঘরে আসবে?

রাত্রে!

হ্যাঁ—এসো লক্ষ্মীটি—কথা আছে—

কিন্তু—

এসো—আমি অপেক্ষা করবো—কথাটা বলে নীলাদ্রি আর দাঁড়াল না—চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

অনেক রাত তখন।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

নীলাদ্রি অপেক্ষা করে কবে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে যায়।

ঘরের মোমবাতির আলোয়—মৃদু একটা আলো-ছায়া ঘরে।

কে?

আমি—

শিউলী?

নীলাদ্রি উঠে বসে—

কেন আসতে বলেছিলে?

নীলাদ্রি দু হাতে শিউলীকে বুকের মাঝখানে টেনে নেয়। তারপর ফুঁ দিয়ে ঘরের মোমবাতির আলোটা নিভিয়ে দেয়।

শিউলী।

উঁ!

ভোর হয়ে এসেছে।

জানালা পথে ভোরের আবছা আলোর আভাস।

নীলাদ্রির বুকের উপরে শিউলী মাথা রেখে বসে আছে—

আজই তুমি যাচ্ছো? শিউলী শুধায়।

হ্যাঁ—

আবার কবে আসবে?

শীগগির, শিউলী—

উঁ---

তুমি কিন্তু আমি নিজে থেকে না সবাইকে বলা পর্যন্ত আমাদের কথা কাউকে বলবে না—

ছিঃ—আমি বলতে পারি নাকি।

জানি, তুমি বলবে না—তবু—বললাম কথাটা।

ঐ দিনই দুপুরের গাড়িতে চলে গেল নীলাদ্রি কলকাতায়।

পরের মাসেই নীলাদ্রির বিলেত রওনা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার পরও আরো—মাস দুই।

তারপর?

তনিমা স্বপ্নাচ্ছন্ন মতই যেন জিজ্ঞাসা করে নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে।

নীলাদ্রি বলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আমার বিলেত যাওয়া হয়নি কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসবার পর আবার সেই শহরের জীবন শুরু, হঠাৎ তখন—

তনিমা প্রশ্ন করে, শিউলীর সঙ্গে আর আপনার দেখা হয়নি?

না—

যাননি আর তাহলে সত্যিই সেখানে, বিলেত যাবার আগে?

না—সত্যি কথা বলতে কি—তার কথা আমার আর মনেও ছিল না। না, একবার মনেও আসেনি—

একেবারে ভুলে গেলাম তাকে।

বলতে পারো তাই।

তনিমা কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে চুপ করে থাকে।

কখন যে ইতিমধ্যে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দুজনার একজনাও জানতে পারেনি।

তনিমা প্রশ্ন করে, তারপর?

তারপর?

॥ ১৪ ॥

নীলাদ্রি বলতে থাকে— কলকাতায় ফিরে এলাম—আবার সেই পূর্বের জীবন—নিত্য নতুন ফুলেব সন্ধান করে বেড়াই আর ওদিকে ক্রমশঃ বিলেত যাবার দিন এগিয়ে আসতে থাকে।

শিউলীর কথা কি কখনো কোনও সময়ের জন্যই আপনার মনে হতো না?

না—

শিউলী—শিউলীর প্রয়োজন তখন আমার ফুরিয়ে গিয়েছে—শিউলী-পর্ব জীবনে আমার তখন শেষ হয়ে গিয়েছে—I wanted to enjoy her and I did it.

কেমন যেন বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নীলাদ্রির মুখের দিকে তনিমা।

নীলাদ্রি একটা সিগ্রেট ধরায়, আজ কোন কিছুই অস্বীকার করবো না। তার দেহ, তার যৌবনই

সেদিন আমাকে আকর্ষণ করেছিল। তাই সেটুকু পুরোপুরি পাওয়ার পর তার প্রয়োজনও বোধহয় চিরদিনের মতই আমার কাছে শেষ হয়ে গিয়েছিল—তাই তখন তার নামটাও আর মনে ছিল না—তাছাড়া সেদিনকার নীলাদ্রির পক্ষে মনে রাখাও সম্ভবপর ছিল না শিউলীর মত একটা গেঁয়ো অশিক্ষিত মেয়েকে—তাছাড়া কি জানো?

নীলাদ্রি আবার একটি সিগ্রেট ধরায়।

সত্যিই তাকে আপনি ভুলে গেলেন?

আগেই তো বলেছি তোমাকে—যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, হাত বাড়িয়ে নিয়েছি—বিশেষ করে নারীর ব্যাপারে, তার জন্যে কোন sentiment বা সংস্কার বা কোন দ্বিধা দুর্বলতা কোন দিনই মনকে আমার কখনো পীড়া দেয়নি।

তাই আর কোন সংবাদই নিলেন না শিউলীর?

না তখন নিইনি—তার কথা মনেও পড়েনি আমার, কিন্তু পরে মনে পড়েছিল।

মনে পড়েছিল?

হ্যাঁ—

কার?

দীর্ঘ তিন বছর পরে বিলেত থেকে যখন ফিরে এলাম—তখন আশ্চর্য কি জান তনিমা—শিউলীর কথা আমার কেন যেন হঠাৎ মনে পড়ল—পিসিমা তখন আর বেঁচে নেই, পিসিমার সমস্ত সম্পত্তি আমিই পেয়েছিলাম—একদিন গেলাম সেখানে। কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল সেখানে—

তারপর?

কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন প্রফুল্লবাবুর মুখে শুনলাম, সে এক রাত্রে সেই কুৎসিতদর্শন কেষ্টা চাকরটার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে, আমি সেখান থেকে আসার মাস তিনেক পরে মনে মনে যেন স্বস্তি পেলাম একটা—সেই সঙ্গে এও মনে হলো, মেয়েটা এতটা নামল কি করে—আমার সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এত বড় রুচির বিকৃতি তার হলো কি করে—so I washed off my hands, শিউলীপর্ব চিরদিনের মত জীবনের আমার একটা closed chapter হয়ে গেল—

আচ্ছা, আপনি যদি সেদিন তার দেখা পেতেন আবার—

বলতে পারি না—সেই দুর্বল মুহূর্তে আমি সেদিন তাকে বিয়েও হয়ত করতে পারতাম, কিংবা হয়ত মোটা টাকা সাহায্য দিয়ে তাকে—

টাকা দিতেন তাকে?

বোধহয় তাই দিতাম—কিন্তু সে তো অতীত—সেদিনকার নীলাদ্রি চৌধুরী কয়েক দিন আগে পর্যন্ত—মানে শিউলীকে হঠাৎ কোর্টে দেখবার আগে পর্যন্ত সেই নীলাদ্রি চৌধুরীই ছিল। কিন্তু চম্পাবাঈ যেন নীলাদ্রি চৌধুরীকে প্রচন্ড একটা আঘাত দিয়ে তার সব কিছু ওলোটপালোট করে দিয়েছে—

একটু থেমে একটু দম নিয়ে নীলাদ্রি আবার বলতে থাকে, জান তনিমা, এই মুহূর্তে যে নীলাদ্রি চৌধুরী তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে, he is altogether a different person—পর্যুদস্ত—ক্লান্ত—

তনিমা নিঃশব্দে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নীলাদ্রি চৌধুরী বলে, আজ মনে হচ্ছে, আমার এতদিনকার নীতি, আমার conviction সব মিথ্যা—একটা প্রকান্ড মিথ্যার উপরে সব কিছু দাঁড়িয়ে ছিল এতকাল। দায়িত্বহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও পাশবিক লালসাটা তার মধ্যে আত্মতৃপ্তি ও শ্লাঘার উন্মাদনা যতই থাক না কেন, সেটা একটা বেলোয়ারী পাত্রের মতই ঠুনকো—একদিন সেটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবেই—সে সত্যকে সে অবশ্যম্ভাবীকে কেউ রোধ করতে পারে না, আজ পর্যন্ত পারেওনি—আমিও বোধহয় তাই পারলাম না। মুখ থুবড়ে হোঁচট খেয়ে তাই পড়লাম। বলতে বলতে নীলাদ্রি থামল—যেন একটু দম নিল।

তারপর আবার বলতে লাগল, আর তারই প্রায়শ্চিত্ত আমার চলেছে। কিন্তু এ-প্রায়শ্চিত্ত তো সম্পূর্ণ হবে না তনিমা, যতদিন যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি জানতে পারছি, চম্পাবাঈয়ের আজকের এই পরিণতির জন্য আমি কতটা দায়ী—

কিন্তু আপনি যা বললেন তার মধ্যে আপনার দায়িত্বের কথা আসছে কোথা থেকে—

কি বলছো তুমি! দায়িত্ব আমার নেই?

না। নেই—যে যেমন করেছে পরবর্তী কালে তারই ফলভোগ তাকে করতে হয়েছে—আর আজও করতে হবে—

না, না—সেদিন যদি সে প্রতারিত না হতো—

প্রতারিত! কে প্রতারণার করেছে তার সঙ্গে? প্রতারিত যদি সে হয়েই থাকে তো নিজেকেই নিজে সে প্রতারণা করেছে—কোন দায়িত্বই নেই আপনার।

তুমি বুঝতে পারছো না তনিমা—

বুঝতে পারছি বৈকি—সে তো তার নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছিল—এবং যে পথে সে গিয়েছিল এটাই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—ওর কথা আজ আপনি ভুলে যান।

না, না তনিমা, সব কিছুর মীমাংসা এত সহজে হতে পারে না—আমাকে জানতেই হবে যেমন করেই হোক তার এই কয় বছরের জীবনটা, আমি বুঝতে পারছি, আজ তার ঐ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। তাই তার সব কথা—

কি আর নতুন করে জানবেন, ঐ পথে একবার কোন মেয়ে পা ফেললে তার যা হয় তাই হয়েছে—মিথ্যে আপনি নিজেকে বিব্রত বোধ করছেন—ভুলে যান তার কথা।

না—তা সম্ভব নয়—অনেক চেষ্টা করেছি এ কয়দিন, কিন্তু পারিনি—আর তা পারবোও না জানি—তাই বলছিলাম—তুমি আমাকে যদি একটু সাহায্য কর তনিমা—

আমি! আমি কি সাহায্য করবো আপনাকে?

দেখো, আমি এ দুদিন অনেক ভেবেছি। প্রথমতঃ আমার স্থির ধারণা—আমি যখন তাকে আদালতে দেখে চিনতে পেরেছি, সেও পেরেছে আমায় চিনতে। তাই আজ যদি আমি তার কাছে যাই সে হয়ত মুখই খুলবে না—তাছাড়া—

কি?

তার চোখের দৃষ্টিতে আমার প্রতি যে ঘৃণা দেখেছি—

ঘৃণা!

হ্যাঁ—যতবার তার সঙ্গে আমার আদালতে চোখাচোখি হয়েছে, মনে হয়েছে, তার দৃষ্টি থেকে যেন দুঃসহ ঘৃণা ঝরে পড়ছে—তাছাড়া যা বলেছিলাম—দ্বিতীয়তঃ আমি জানতে দিতে চাই না আপাততঃ কাউকে যে তার ব্যাপারে আমি interested. তাই বলছিলাম, তুমি যদি জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর—

আমি—আমি তার সঙ্গে দেখা করব—কি বলছেন আপনি!

শুধু দেখা করাই নয় তার কাছ থেকে যেমন করে হোক তার এই কয় বছরের সব কথা তোমাকে জেনে আসতে হবে—

না, না ক্ষমা করুন আমায়, এ আমি পারব না—

তনিমা—পারবে না—এটুকু তুমি আমার জন্যে করতে পারবে না? দেখো, আমার স্থির বিশ্বাস ও মিথ্যে বলছে না। সত্যিই ও বদ্রীপ্রসাদকে হত্যা করেনি—ওকে আমাকে বাঁচাতেই হবে—আর বাঁচাতে হলে সর্বাগ্রে ওর সব কথা আমার জানা দরকার—

না, না—এ আমি ভাবতেই পারছি না, মিঃ চৌধুরী।

তনিমা, আমি জানি, ঐ কাজ যদি কেউ পারে তো একমাত্র তুমিই পারবে—আমাকে—আমাকে তুমি সাহায্য কর তনিমা—একটা নির্দোষ মেয়েকে বাঁচতে দাও আর সেই সঙ্গে যদিও আমি জানি, আমি যা করেছি তার কোন প্রায়শ্চিত্তই নেই—তবু—তবু যদি এই নিদারুণ বিবেকের দংশন থেকে একটু নিষ্কৃতি পাই—

তনিমা নিঃশব্দে বসে থাকে।

কোন জবাবই দিতে পারে না।

এ যে কি যন্ত্রণা আমাকে সর্বক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছে, নীলাদ্রি আবার বলতে থাকে, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না—প্রতিদিন আদালতে যাই—প্রতিদিন ওর মুখের দিকে তাকাই আর মনে হয় আমার, ওর ঐ নীরবতা—নীরবতা নয় দু চোখের দৃষ্টিতে যেন নীরব অভিযোগ আমার প্রতি—ও যেন বলছে, আমি শুনতে পাই—তুমি—তুমি—তুমিই আজ আমাকে এখানে টেনে এনেছো। তুমিই আমার এ অবস্থার জন্য দায়ী।

তনিমা তবু নিঃশব্দ।

তনিমা, আমাকে—আমাকে তুমি বাঁচাও—নীলাদ্রি কথা বলতে বলতে সহসা তনিমার হাত দুটো চেপে ধরে আবেগভরে।

কিন্তু আমি—

শুধু আমার কথা নয় তনিমা—ঐ হতভাগিনী মেয়েটার কথাও ভাবো।

ঠিক আছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে চেষ্টা করবো—জেনানা ফাটকে দেখা করবার ব্যবস্থা করুন। তনিমা ধীরে ধীরে বলে।

॥ ১৫ ॥

নীলাদ্রির মত একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন মানুষের পক্ষে তনিমার জেলে গিয়ে চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি সংগ্রহ করে দিতে বেশী বেগ পেতে হলো না, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই অনুমতি এসে গেল।

কিন্তু নীলাদ্রির কথায় জেনানা ফাটকে গিয়ে চম্পাবাঈয়ের মত একটা নিম্নশ্রেণীর বিশেষ করে একজন হত্যাকারিণীর সঙ্গে দেখা করতে তার এতদিনকার রুচি-শিক্ষা-প্রবৃত্তি সব কিছুই যেন বাধা দিচ্ছিল।

তাছাড়া নীলাদ্রি যতই বলুক না কেন, চম্পা নির্দোষ—তার মত এক চরিত্রহীনা—অতি নিম্নস্তরের রূপোপজীবিনীকে কিছুতেই যেন মন থেকে ক্ষমা করতে পারছিল না, তনিমা।

ঐ ধরনের স্ত্রীলোকদের অসাধ্য কিছুই নেই—তাই—সে যতই বলুক যে বদ্রীপ্রসাদকে মদের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করেনি, তনিমা যেন মন থেকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা।

নারী যখন নীচে নেমে যায় তখন যে সে কত বড় নির্লজ্জ ও কত বড় নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা হতে পারে নীলাদ্রি হয়ত জানে না।

সামান্য একটা নর্তকী বাঈজী বারবনিতা চম্পা—যতই বলুক সে যে কেবল নৃত্য-গীতের দ্বারাই জীবিকা অর্জন করত, তনিমা বিশ্বাস করে না।

তাই বোধকরি জেনানা ফাটকে গিয়ে চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথাটা ভাবতেও তনিমার সমস্ত গা ঘিনঘিন করছিল প্রথমটায়।

কিন্তু নীলাদ্রির অনুরোধও সে ফেলতে পারল না।

একান্ত অনিচ্ছা ও অপ্রবৃত্তি নিয়েই সেদিন সে জেনানা ফাটকের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা যাচ্ছিল—চম্পাবাঈয়ের প্রতি একটা ঘৃণা ও আক্রোশে মনে মনে সে যেন ফুঁসছিল।

জেলার বললেন, বসুন মিস্ ব্যানার্জী, আমি সংবাদ পাঠাচ্ছি—বলে জেলার সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন ভিতরে।

চম্পাবাঈয়ের কথাই এ কয়দিন সে বার বার শুনেছে কিন্তু এখনো তাকে তনিমা চোখে দেখেনি।

অনিচ্ছার একটা প্রতিক্রিয়া অনুক্ষণ মনের মধ্যে চললেও একটা কৌতূহলও পাশাপাশি বুঝি তার ছিল চম্পাবাঈকে সামনাসামনি দেখবার একটিবার।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জেনানা ফাটকের যে মেট-মেয়েটিকে চম্পাকে ডেকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সে একাই যখন ফিরে এলো তনিমা বুঝি একটু বিস্মিতই হয়।

জেলার জিজ্ঞাসা করলেন, কই নিতে এলে না চম্পাবাঈকে?

না হুজুর, সে এলো না। মেট বললে।

এলো না?

বিস্মিত হয়ে জেলার প্রশ্নটা করেন।

না—বললে তার কেউ এ-দুনিয়ায় পরিচিত জন বা আপনার জন নেই—কারো সঙ্গে সে দেখা করবে না।

দেখা করবে না?

না—

তনিমা যেন আরো একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেল।

জেলার জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে কি করবেন মিস্ ব্যানার্জী?

কি আর করবো, দেখা যখন করবে না, ফিরে যাচ্ছি—

জেলখানা থেকে বের হয়ে এলো বটে তনিমা কিন্তু জেলখানায় যাবার সময় মনের মধ্যে তার যে প্রতিক্রিয়া কাজ করছিল এখন যেন সেটা অন্য এক বিপরীত খাদে বইতে শুরু করে তার অজ্ঞাতেই।

স্ত্রীলোকটির প্রতি যে তুচ্ছতা তাকে বিরূপ করে রেখেছিল এই কটা দিন, সেই তুচ্ছতাই ঐ মুহূর্তে তার মনের মধ্যে কোথাও যেন আর শিকড় খুঁজে পাচ্ছে না।

যতই কথাটা ভাবে তনিমা, ততই যেন তার আশ্চর্য লাগে। একটা সামান্য চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের মত ও কথাগুলো শোনাল না।

তনিমা ফিরে এলো—

অধীর আগ্রহে নীলাদ্রি তনিমার প্রতীক্ষা করছিল।

তনিমা ঘরে ঢুকতেই সে প্রশ্ন করে, কি হলো, দেখা হলো? কিছু জানতে পারলে?

না—

জানতে পারলে না—বললে না বুঝি কিছু?

দেখাই তো করল না?

দেখাই করল না?

না।

কেন?

বললে, তার কেউ এ-দুনিয়ায় এমন কোন পরিচিত জন বা আপনার জন নেই—তার সঙ্গে দেখা করতে আসার, তাই কারো সঙ্গেই সে দেখা করবে না—

তাহলে?

আপনিই বলুন, এখন কি করবেন?

ঘরের মধ্যে নীলাদ্রি পায়চারি করছিল। একসময় দাঁড়াল।

বললে, You will have to try again. আবার যেতে হবে তোমায়—

কিন্তু সে তো দেখা করবে না—

করবে—করতেই হবে। যেমন করে যে ভাবে হোক তোমার তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে—তার এ কয় বছরের ইতিহাসটা আমায় জানতেই হবে—

কিন্তু—

বলেছি তো তোমায়, সে আমায় চিনতে পেরেছে, তাই হয়ত তুমি আমারই কেউ ভেবে দেখা করতে রাজী হয়নি—আবার তুমি যাও, আমার মনে হচ্ছে, সে দেখা করবে—

তনিমা উঠে দাঁড়ায়। বললে, বেশ, যাবো—

তনিমা আবার গেল।

একদিন নয়, দুদিন নয়, পর পর চারদিন—কিন্তু চম্পাবাঈয়ের সেই একই জবাব, সে দেখা করবে না।

তনিমারও যেন অবশেষে কেমন একটা জিদ চেপে যায় বারবারের ব্যর্থতায়, মনে মনে স্থির করে দেখা সে করবেই—

জেলারকে সে অনুরোধ জানায়, মিঃ চক্রবর্তী আপনি একবার চেষ্টা করুন—

প্রৌঢ় জেলার মিঃ চক্রবর্তী বলেন, দেখুন মিস ব্যানার্জী মেটের কাছে মেয়েটির সম্পর্কে যে পরিচয় পেয়েছি তাতে করে আমার মনে হয় মিথ্যেই চেষ্টা করা হবে। তবু আপনি যখন বলছেন একবার চেষ্টা করবো আমি—কাল এই সময় আপনি আসবেন—

পরের দিন তনিমা আবার গেল—এবং তনিমাকে বসতে বলে জেলার মিঃ চক্রবর্তী জেনানা ফাটকে গিয়ে ঢুকলেন—

হত্যার অপরাধে বিচার চলছে ধর্মাধিকরণে—তাছাড়া মেয়েটি অসুস্থ। আলাদা একটা সেলে রাখা

হয়েছিল চম্পাবাঈকে ডাক্তারের নির্দেশে।

একটা টুলের উপরে চুপচাপ বসেছিল চম্পাবাঈ। চক্রবর্তী এসে সামনে দাঁড়ালেন।

চম্পাবাঈ—

বিষণ্ণ ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে তাকাল চম্পাবাঈ।

জীবনে অনেক কয়েদী দেখেছেন মিঃ চক্রবর্তী। কিন্তু কেন যেন চম্পাবাঈকে দেখা অবধি তাঁর মনে হয়েছে, যে গুরু অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে ঐ মেয়েটি আজ তার শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তার সবটা দায়িত্বই হয়ত ওর নয়। এমনও হতে পারে, হয়ত ঘটনাচক্রে ঐ নৃশংস হত্যাকান্ডের সঙ্গে ঐ হতভাগিনী মেয়েটি না জেনেই জড়িয়ে পড়েছে।

চম্পাবাঈ—ডাকলেন মিঃ চক্রবর্তী আবার।

আপনি তো এখানকার জেলার—কর্তা—

হ্যাঁ—

বলতে পারেন—ওরা কেন আমাকে এখনো আদালতে রোজ রোজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—

বিচার না শেষ হওয়া পর্যন্ত যেতে তো হবেই—

কিসের বিচার—আমি তো বলেছিই, আমি হত্যা করেছি তাকে—তবে—

কি তবে?

তবে কেন ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছে না?

চম্পা—

আপনি একটু দয়া করে বলে দেবেন ওদের, আদালতে আর আমি যেতে চাই না—

বলবো—তোমাকে একটা কথা বলছিলাম—

কি?

একজন ভদ্রমহিলা দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, দেখা একটিবার করো না তার সঙ্গে—

না।

একটিবার দেখা করলে ক্ষতি কি?

আমার কেউ নেই যে আমার সঙ্গে এই জেলে দেখা করতে আসতে পারে—

নাই বা তেমন আপনার জন কেউ থাকল। তাহলে উনি যখন একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন—কে বলতে পারে, হয়ত ওঁর দ্বারা তোমার কোন উপকারও হতে পারে—তোমার ভালই হতে পারে—

আমার উপকার—ভাল—কথাটা বলে মৃদু হাসল চম্পাবাঈ। যেমন বিষণ্ণ, তেমনি করুণ সে হাসি।

চল—একবার দেখা করবে চল—

না—

হয়ত তুমি জাননা। উনি হয়ত তোমার কোন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়াও হতে পারেন—

আমি জানি—দূর নিকট কোন আত্মীয়ই এ-জগতে আমার নেই—তারপরই হঠাৎ একটু চুপ করে থেকে চম্পা বলে, বেশ—চলুন—আপনি যখন বলছেন সাহেব, দেখা আমি করবো—

॥ ১৬ ॥

দেখা হলো দুজনার জেলের মধ্যেই।

কি চান আপনি? রীতিমত রুক্ষ মেজাজেই সম্ভাষণ করে চম্পাবাঈ তনিমাকে।

তনিমা ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কেন এভাবে বার বার এসে জেলের মধ্যে আমাকে বিরক্ত করছেন—আবার বলে চম্পা।

ইতিপূর্বে চম্পাবাঈকে তনিমা দেখেনি। এই প্রথম দেখল।

রুগ্ন-কৃশ, মাথার চুল রুক্ষ, বিষণ্ণ ক্লান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি।

মেয়েটিকে এককালে যে দেখতে সত্যিই সুন্দর ছিল, তনিমার সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু আজ তার সর্ব অবয়বে যেন একটা দীর্ঘ দিনের অত্যাচারের চিহ্ন স্পষ্ট।

বোস—তনিমা বলে।

না—কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাই বলুন।

কেন যেন তনিমার মনটার মধ্যে একটা অনুকম্পা জেগে ওঠে ঐ মুহূর্তে—সে মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি তোমার শত্রু নই, চম্পা।

শত্রু বা মিত্র কেউই আমার নেই—কেন দেখা করতে চান, তাই বলুন।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল চম্পাবাঈ—

আমার সঙ্গে—

হ্যাঁ—

আমার সঙ্গে আবার আপনার কি কথা থাকতে পারে, আপনাকে চিনি না আমি—জীবনে কখনো আপনাকে দেখিওনি—

চেনো না আমাকে তুমি ঠিকই—দেখোওনি কখনো, তাহলেও তোমার সঙ্গে কি আমি দুটো কথা বলতে পারি না? মৃদু হেসে তনিমা বলে।

দেখে বেশভূষার চেহারায় আপনাকে তো কোন বিশিষ্ট ভদ্রঘরের একজন মহিলা বলেই মনে হচ্ছে—আমার মত একজন নিকৃষ্টশ্রেণীর স্ত্রীলোক—যার আদালতে খুনের দায়ে বিচার চলেছে, তার সঙ্গে আপনার কি এমন কথা থাকতে পারে, বলুন তো?

আমি তোমার সব কথা জানতে চাই, শুনতে চাই—

আমার সব কথা! হঠাৎ যেন কথাটা বলতে গিয়ে থমকে যায় চম্পা।

হ্যাঁ—তোমার সব কথা।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে চম্পাবাঈ।

তনিমা চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

হাসি থামিয়ে এক সময় আবার বলে চম্পা, কিন্তু কি জানতে চান আপনি আমার সম্পর্কে বলুন তো?

তুমি কে, কি তোমার পরিচয় সত্যিকারের?

আমি কে!

হ্যাঁ।

তা জেনে, আপনার কি হবে?

আমার প্রয়োজন বলেই জানতে চাইছি—

কি প্রয়োজন বলুন তো?

থাকতে পারে কোন প্রয়োজন।

বুঝেছি এবার—আপনি বুঝি গল্প-টল্প লেখেন?

গল্প!

হ্যাঁ—আমার গল্পটা বুঝি লিখতে চান।

ধর, যদি তাই হয়—

তাহলে জেনে রাখুন—একজন নর্তকী বাঈজী, যাদের আপনারা বেশ্যা বলেন, ঠিক তেমনিই একজন আমি—নতুন কিছু নেই আমার মধ্যে—

আছে বৈকি, শান্ত গলায় তনিমা বলে, বেশীর ভাগই তো এপথে মেয়েরা বাধ্য হয়ে আসে—ঘটনাচক্রে বা পাপচক্রে বাধ্য হয়ে—

কি করে বুঝলেন—আপনি তো একজন ভদ্রঘরের মেয়ে—

না—তাহলেও ভুলে যাচ্ছো কেন, আমিও তো তোমারই মত একজন মেয়েমানুষ—আমাদেরও বুকে যেমন দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা আছে, তেমনি তোমারও আছে—

না, না—ওসব আমার কিছু নেই—একটা বাঈজী—বেশ্যা—

আমি জানি, আজ তুমি যাই হও না কেন, নিশ্চয়ই একদিন তা তুমি ছিলে না।

হঠাৎ চম্পাবাঈ আবার খিলখিল করে হেসে বলে, এখন বুঝতে পারছি, আমার সন্দেহটা মিথ্যা নয়, সত্যিই আপনি বই-টই লেখেন—

বই পড়ো তুমি—

না—

কেন?

যত সব মিথ্যে কথা—কল্পনা—অবস্তাব—

কে বললে তোমাকে, বইতে যা লেখা হয়, সবই অসম্ভব—মিথ্যা—

জানি আমি—সত্যি কি বোকা ছিলাম আমি একদিন। রামায়ণ মহাভারতের সব কথা ভাবতাম সত্যি বলে—হঠাৎ একটু থেমে কতকটা আত্মগতভাবেই যেন বলে আবার চম্পা।

সত্যি হলে বুঝি এমনটা হয়—না—সব মিথ্যা—বানানো গল্প—

আচ্ছা চম্পা, তোমার কে আছে?

কেউ নেই—

মা-বাপ-ভাই-বোন-স্বামী-সন্তান—

না, না—কেউ নেই, কেউ নেই—সন্তান—না, না—ছিঃ বাঈজীর আবার সন্তান—না, না—আপনি যান—হঠাৎ যেন বিচলিত হয়ে ওঠে চম্পাবাঈ।

আর একটি কথাও বলল না সেদিন চম্পা।

তনিমা ফিরে এলো বিচিত্র একটা মনের অবস্থা নিয়ে। জিদটা মনের মধ্যে তার তখন আরো দৃঢ় হয়েছে। চম্পার সব কথা তাকে জানতেই হবে, যেমন করেই হোক—একটা কৌতূহলও তাকে পীড়ন করে ঐ সঙ্গে।

অবার এক দিন পরে জেলে গেল তনিমা।

সেদিন চম্পাকে ডাকতেই সে এল, আবার এসেছেন কেন? দেখ চম্পা, আমি বিশ্বাস করি, তুমি কাউকে হত্যা করোনি—

কি করে বুঝলেন, করিনি?

বুঝতে পেরেছি—

ছাই বুঝেছেন—কিছু আপনি বোঝেন না।

সে তুমি যতই বল—আমি বিশ্বাস করি না, তুমি কাউকে হত্যা করতে পারো।

চম্পা যেন হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়—একটুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর হেসে ফেলে।

হাসছো যে?

হাসছি, আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি এসে যায়—যাঁরা আমার বিচার করতে বসেছেন, তাঁরা স্থিরনিশ্চিত যে আমি হত্যা করেছি, আর সত্যিই তো—পরে আমিও ভেবে দেখেছি, হয়ত আমিই হত্যা করেছি বদ্রীপ্রসাদবাবুকে, নচেৎ সে আমার দেওয়া পাউডার মদের সঙ্গে পান করে মারা গেলে কি করে—কত বুদ্ধি কত জ্ঞান জজবাবুদের—তারা কি এতবড় ভুল করতে পারেন—

পারেন, আর ভুলও হয়—তুমি আমাকে তোমার সব কথা বলো চম্পা—আমি—আমি চেষ্টা করবো—

কি চেষ্টা করবেন?

কেন? তোমাকে বাঁচাতে।

বাঁচতে তো আমি চাই না—

সেকি! বাঁচতে চাও না তুমি?

না।

ও তোমার অভিমানের কথা—

ওমা—সে কি কথা, অভিমান আবার আমি কার উপরে করতে যাবো—কে আছে আমার—আর কেনই বা করতে যাবো অভিমান—

হয়ত তুমি জান না—সত্যিই তোমার আপন জন কেউ আছে। তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে।

আছে?

হ্যাঁ আছে—আমি জানি, যে সর্বক্ষণ তোমারই কথা ভাবছে আজ—এমন একজন আছে, জেনো,

হঠাৎ বলে ফেলে কথাটা তনিমা।

খিলখিল করে আবার হেসে ওঠে চম্পা।

বলে, এবারই ভাল বলেছেন, আমার জন্য একজন সর্বক্ষণ ভাবছে। জানেন, আমার কাছে লোক এসেছে স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে নয়—টাকার তোড়া নিয়ে আমার গান, নাচ আর আমার দেহটা ভোগ করবার জন্যে—এক রাত্রি দু রাত্রির অতিথিরা সব—

তনিমা চেয়ে থাকে চম্পার মুখের দিকে।

মনে হয় যেন বুকজোড়া একটা বিতৃষ্ণায় মেয়েটা ছটফট করেছে রাত্রিদিন।

চম্পা আবার বলে, অবিশ্যি সেজন্য আমারও কোন দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না কোন দিন। আর থাকবেই বা কেন—আপনিই বলুন না, বাঈজী নর্তকী আমি, আমার কাছে মানুষ-জন আসবে ভালবাসতে তো নয়—আমার নাচ-গান উপভোগ করতে—আমার দেহটা ভোগ করতে। তারা আমায় টাকা দিয়েছে, আমিও তাদের সব দিয়েছি—

কিন্তু সবাই কি—তাই—

সব—সব—সবাই—একটু থেমে বলতে থাকে, জানেন না হয়ত আপনি ঐ পুরুষগুলোকে—ওদের কাছে মেয়েমানুষের একটা মাত্র প্রয়োজনই আছে—মেয়েমানুষের এই দেহটা, আর আশ্চর্য কি জানেন? সেটা হাতের মুঠোর মধ্যে পেলেই তাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়।

শেষের কথাগুলো বলার সময় চম্পার চোখের দৃষ্টি যেন কেমন সক্রোধে ও ঘৃণায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

চম্পা—

অথচ মেয়েগুলো কি বোকা—পুরুষদের ঐ সব কথাগুলো কেমন বিশ্বাস করে নেয়—

চম্পা, আবার ডাকে তনিমা।

বিশ্বাস করে সব তাদের হাতে তুলে দেয়—

কি বোকা—

কিছুক্ষণ পর তনিমা আবার প্রশ্ন করে—

আচ্ছা চম্পা, ঐ চম্পা ছাড়া তোমার আর কোন নাম নেই? অনেকের তো অনেক সময় দুটো তিনটেও নাম থাকে—

না, আমার আর কোন নাম নেই। কিন্তু ওসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন তো—কি হবে আপনার জেনে, যদি থাকেই আমার অন্য কোন নাম?

আমি তো তোমাকে প্রথম দিনই বলেছি, আমি তোমার সব কথা জানতে চাই চম্পা—সব কথা— কোথায় তুমি ছিলে—কে তোমার মা বাবা—কোথায় দেশ তোমার—কে তোমার আছে বা ছিল—কি করে তুমি এ-পথে এলে—কেন এলে—

হঠাৎ যেন থমকে গিয়েছে চম্পা।

তারপর বলে, সত্যি কথা বলুন তো, কে আপনি! কেন আসেন রোজ রোজ আমার কাছে—সত্যি সত্যিই কি আপনি চান?

॥ ১৭ ॥

মনে করো না কেন, আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী?

আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবেন?

কি বল?

সত্যি বলুন, আপনাকে কি কেউ আমার কাছে পাঠিয়েছে?

চমকে ওঠে তনিমা, কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বলে, না, না—কে আবার আমাকে পাঠাবে—আমি নিজেই এসেছি—

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ—কাগজে তোমার কথা পড়ে কেমন কৌতূহল হলো—

কাগজে বুঝি বের হয়েছে আমার সব কথা—

হ্যাঁ—

কি লিখেছে? আমি একটা বেশ্যা—আমি একজনকে খুন করেছি—

আমি জানি, তা সত্যি নয়—

সত্যি যদি নাই হয়—তাতে কার কি এসে গেল।

কেন তুমি মিথ্যে অপবাদকে মাথা পেতে নেবে? কেন?

উপায়ই বা কি? কেউ তো বিশ্বাস করেনি—জানি করবেও না।

করবে—করবে চম্পা। করতে নিশ্চয়ই হবে সবাইকে।

চম্পা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, জানি না—জেনে আপনার কি লাভ হবে? তাছাড়া আমিই বা বলতে যাব কেন আপনাকে—কে আপনি, কি আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক?

রক্তের সম্পর্কটাই কি একমাত্র সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের, চম্পা—তা তো নয়—তাহলে তো মানুষের ঘরের মধ্যে দম আটকে মরতে হতো—সংকীর্ণতায় আত্মঘাতী হতে হতো—এমন করে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির বন্ধন একটা গড়ে উঠতো না। এই আমার কথাই ধর না—তোমার প্রতি একটা টান মমতা না থাকলে কি তোমার কাছে এমনি করে ছুটে ছুটে আসতাম জেলের মধ্যে দেখা করবার জন্য, বার বার তুমি ফিরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও—

জানি না—আপনার কথা বুঝি না—

তোমার সব কথা আমাকে জানতে দাও—

চম্পা চুপ করে থাকে।

আমি মেয়েলোকের মন দিয়ে বুঝতে পারি, তনিমা বলে, নিশ্চয়ই কোথাও কারো কাছে তুমি একদিন নিদারুণ আঘাত পেয়েছো—আর সে-আঘাতেই তোমাকে হয়ত একদিন এই পথে ঠেলে দিয়েছিল—অসহায় নিরুপায় তুমি যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে চরম হতাশায় হয়ত একদিন—

সে আপনি বুঝবেন না, হঠাৎ বলে ওঠে চম্পা, একটা অসহায় মেয়ে যার সমস্ত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিক্ষা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, যার এমন কেউ নেই পাশে, তাকে যে একটা সান্ত্বনার কথা বলে—

জানি আমি—তাহলে হয়ত সেদিন তোমাকে হতাশায় ভেঙে পড়তে হতো না—

জানেন না, কিছুই আপনি জানেন না—কল্পনাও করতে পারবেন না—

স্মৃতির পট থেকে যেন এতদিনকার কালো পর্দাটা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়।

চম্পাবাঈয়ের দুচোখের কোল বেয়ে জল ঝরতে থাকে।

তার গন্ড ও চিবুক প্লাবিত করে অশ্রু ঝরতে থাকে।

জানেন, আমিও একদিন আপনার মতই সব বিশ্বাস করতাম। এই পৃথিবীটা মনে হতো কত সুন্দর—কিন্তু সব স্বপ্ন আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল—

তনিমা চুপ করে থাকে।

সত্যি— কি বোকাই ছিলাম আমি। কি বোকা—

যেন স্বপ্নের ঘোরে অতঃপর বলতে থাকে চম্পা—

সে এলো—প্রথম তাকে দেখলাম। মা বলায় চায়ের কাপ হাতে যখন গিয়ে ঘরে ঢুকে বললাম, আপনার চা—জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল পিছন ফিরে, ঘুরে আমার দিকে—সে এগিয়ে এলো—আমার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে গিয়ে তার স্পর্শ প্রথম পেলাম।

।। ১৮ ।।

নীলাদ্রি তার আইনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, চম্পার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এমন কঠিন যে মামলায় তার নিষ্কৃতি কিছুতেই মিলবে না।

কনভিকশন তার হবেই।

অথচ চম্পা বদ্রীপ্রসাদকে হত্যা করেছে, এ-কথাটাও যেন তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কিন্তু বিশ্বাস না হলেই বা কি? প্রমাণ কোথায় যে সে হত্যা করেনি—

প্রমাণ ছাড়া তো চম্পাকে বাঁচানো যাবে না।

সর্বাপেক্ষা বড় ও মোক্ষম প্রমাণ তার বিরুদ্ধে, তার জবানবন্দিতে সে বলেছে—নিজের হাতে সে কি একটা পাউডার বদ্রীপ্রসাদের মদের গ্লাসে মিশিয়ে দিয়েছিল তাকে ঘুম পাড়াবার জন্য, যার ফলে তার নিদ্রাই নয় কেবল, চিরনিদ্রা হয়েছে।

এবং সেই পাউডারটার মধ্যে বিষ ছিল না, চম্পা বললেও সে-রাত্রে বদ্রীপ্রসাদের ব্যবহৃত মদের পাত্র ও মৃতের পাকস্থলী খাদ্যবস্তু কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে অ্যাট্রোপিন বিষ পাওয়া গিয়েছে।

কোথা থেকে এলো—ঐ বিষ?

কেমন করে এলো?

চম্পা জেনে শুনে বিষ দেয়নি সুনিশ্চিত। অথচ যে পাউডারটা সে-রাত্রে সে বদ্রীপ্রসাদকে ঘুম পাড়াবার জন্য তার মদের পাত্রে মিশিয়ে দিয়েছিল—তার মধ্যেই হয়ত বিষ ছিল, যে কথাটা সে জানত না বা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি।

মদের পাত্রের তলানীতে ও মৃতের পাকস্থলীতে যখন বিষ পাওয়া গিয়েছে কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে তখন সুনিশ্চিত, বদ্রীপ্রসাদকে সে-রাত্রে বিষ দেওয়া হয়েছিল।

তবে চম্পা দেয়নি সে বিষ, তাও ঠিক—এবং সত্যিই যদি সে না দিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ মদের পাত্রে অ্যাট্রোপিন বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল সে রাত্রে—এবং চম্পা যদি না জেনে দিয়ে থাকে তো কে দিতে পারে সে-বিষ।

মাত্র দুই গ্রেন অ্যাট্রোপিনই নাকি একজনের পক্ষে লিথ্যাল ডোজ—অনায়াসেই একজনের মৃত্যু ঘটাতে পারে—ডাক্তার বলছিল।

কে দিতে পারে—কে আনতে পারে ঐ বিষ? কোথা থেকে আসতে পারে—

ভাবতে ভাবতে নীলাদ্রির এক সময় মনে হয়, চম্পা না দিয়ে থাকলে সে রাত্রে আর কে-বা কার পক্ষে সম্ভব ছিল বিষ দেওয়া বদ্রীপ্রসাদকে—

চম্পার দাসী—রাসমণি—চম্পার ভৃত্য হারাধন, ঝি রাসমণি হয়ত নয়—

তবে কি হারাধন?

হারাধন—

মনে পড়ে নীলাদ্রির, চম্পার ভৃত্য হারাধনই এনেছিল ঘুমের পাউডার সেই রাত্রে ডিসপেনসারিতে গিয়ে অবিশ্যি চম্পারই নির্দেশে।

ঠিক হারাধন সম্পর্কে খোঁজখবর একটা নেওয়া প্রয়োজন।

বিচারে নিম্ন আদালত থেকে খালাস পাবার পর হারাধন বেলগাছিয়ার একটা বস্তিতে ঘর ভাড়া করে আছে, খবর নিয়ে জেনেছিল নীলাদ্রি।

কথাটা যত চিন্তা করে, ততই যেন নীলাদ্রির হারাধনের উপরে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে।

হারাধনকে একবার ভাল করে যাচাই করে দেখা দরকার।

দু-এক দিনের পরে হারাধন সম্পর্কে একটা মতলব নীলাদ্রির মাথার মধ্যে আসে।

এমনিতে হারাধনের সঙ্গে সে গিয়ে দেখা করতে চাইলে বা ডেকে পাঠালে হারাধন হয়ত দেখাও করবে না, আসবেও না।

তার মনে সন্দেহ দেখা দেবে, সত্যিই যদি সে দোষী হয়।

অথচ এ-ব্যাপারে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করা যায় না।

যেতে হলে নিজেরই যেতে হয়।

কিন্তু নীলাদ্রি হয়ে নয়—

অন্য কোন পরিচয় এবং যে পরিচয়টা হঠাৎ হারাধন সন্দেহ করতে পারবে না।

কয়েকদিনে হারাধনের সব সংবাদ আরো ভালো করে সংগ্রহ করলো নীলাদ্রি।

হারাধন বর্তমানে আর চাকরি করে না—অথচ দেশেও ফিরে যায়নি। থাকে বর্তমানে বেলগাছিয়ায় একটা ঘর নিয়ে আলাদা ভাবে—এবং ভাল ভাবেই থাকে।

মেক-আপ সম্পর্কে নীলাদ্রির কিছুটা জ্ঞান ছিল।

সেদিন সন্ধ্যারাত্রে নিঃশব্দে পশ্চাতের দ্বারপথ দিয়ে নীলাদ্রির বাড়ি থেকে কে একজন বেরুল।

বাড়ির পশ্চাৎদিকে সরু একটি গলিপথ।

গলিপথে একটি মাত্র আলো—তাই আলোর পর্যাপ্তি না থাকায় একটা আলো-ছায়ার রহস্য যেন।

নীলাদ্রির গৃহের পশ্চাতের দ্বারপথ দিয়ে বের হয়ে লোকটা এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে

তাকাতে গলির মধ্যে লাইটপোস্টটার নীচে এসে দাঁড়াল।

লোকটার বেশ ও চেহারা ভৃত্য শ্রেণীর।

মুখে পুরুষ্টু গোঁফ—সামান্য খোঁচা খোঁচা দাড়ি—মাঝখানে সিঁথি—তেল-চকচক করছে।

ডান গালে একটা আঁচিল।

চওড়া কালো বাবুপাড় ধুতি পরনে ও গায়ে হাফহাতা ইষৎ ময়লা ডোরাকাটা একটা শার্ট।

পায়ে পুরাতন এক জোড়া স্যান্ডেল।

পকেট থেকে একটা বিড়ির বাক্স বের করে তা থেকে একটা বিড়ি বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল লোকটা।

তারপর বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

পথে তখনও যথেষ্ট যানবাহন ও পথচারীর ভীড়। ট্রাম চলছে। রাস্তায় পৌঁছে লোকটা একটা উত্তরমুখী ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে বসল।

ঢং ঢং করে ট্রাম চলছে।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ লোকটা হারাধনের বেলগাছিয়ার বস্তির ঘবের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

ইলেকট্রিক আলো।

॥ ১৯॥

হারুবাবু আছেন—হারুবাবু—লোকটা ডাকে।

কে?

দয়া করে একবার বাইরে আসবেন?

হারাধন বের হয়ে এলো, কে?

আপনি তো হারুবাবু—

'হারুবাবু'—জীবনে এই প্রথম হারাধন ঐ সম্ভাষণ শুনছে। ঐ বাবু ডাকটার মধ্যে যে এমন একটা পুলকানুভূতি আছে, হারাধন কি আগে জানত—না কখনো এর আগে অনুভব করেছে!

হ্যাঁ—হারাধন জবাব দেয়, আপনি?

আমায় আপনি চিনতে পারবেন না—আমার নাম পেহ্লাদ—মানে পেহ্লাদ প্রামাণিক।

কোথা থেকে আসছেন—আমার কাছে আপনার দরকারটা কি বলুন তো!

দরকার একটু ছিল, প্রহ্লাদ বলে, কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা—

ওঃ আচ্ছা আসুন ভেতরে—

প্রহ্লাদ হারাধনের আহ্বানে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

বস্তির ঘর হলে কি হবে, বেশ ছিমছাম—সুন্দর একটি শয্যা সুজনী দিয়ে ঢাকা—গোটা চারেক ছোটবড় দামী দামী সুটকেস এক কোণে—অন্য ধারে একটি টেবিল—টেবিলের উপর ছোট একটি রেডিও সেট, একটি টেবিল ক্লক—একটা কাচের জাগ ও কাচের গ্লাস—

একটা আলনায় কিছু নতুন কোট-শার্ট-ধুতি হ্যাঙারে ঝুলছে।

খান দুই নতুন চেয়ারও ঘরে ছিল।

বসুন—হারাধন বলল।

চেয়ারের উপর বসে পকেট থেকে একটা সবুজ রঙের সিল্কের রুমাল বের করে প্রহ্লাদ—ভরভর করে তীব্র একটা সেন্টের গন্ধ বের হয়।

মুখটা মোছে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে প্রহ্লাদ।

হারাধনবাবু, আমি কিন্তু একটা বিশেষ প্রার্থনা নিয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি—

বিশেষ প্রার্থনা—

হ্যাঁ—প্রার্থনাই—বলতে বলতে পকেট থেকে বিড়ির বাক্সটা প্রহ্লাদ বের করে—

কিন্তু তার আগেই হারাধন একটা সিগ্রেটের প্যাকেট পকেট থেকে বের করে প্যাকেটটা এগিয়ে দেয়—নিন—

প্রহ্লাদ কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে, হেঃ হেঃ তা দিন আপনারটাই নিই—

একটা সিগ্রেট নিল প্রহ্লাদ। সিগ্রেটে বেশ আরাম করে গোটা দুই টান দিয়ে প্রহ্লাদ বলে হারুবাবু, প্রার্থনার কথা বলছিলাম না—আমার একটি ভগ্নী আছে—

ভগ্নী—

হ্যাঁ, অর্থাভাবে আজো তার বিয়ে দিতে পারিনি—অথচ ভগ্নীটি আমার দেখতে ভালই—রান্নাবান্না কাজকর্মে একেবারে চৌখস।

তা আপনি আমার কাছে কি চান প্রহ্লাদবাবু?

যোগীনকে চেনেন তো?

কোন্ যোগীন?

আপনাদের গাঁয়েই বাড়ি—তার কাছেই তো শুনলাম আপনার কথাটা। আপনার প্রথমা স্ত্রীটির নাকি অনেকদিন হলো মৃত্যু হয়েছে—

হ্যাঁ—

আপনি আবার বিবাহ করবেন, বিবেচনা করছেন—

না, না, —কে বললে?

আহা করবেনই বা না কেন—আপনার বয়সটিই বা কি—এখনো তো একেবারে ছেলেমানুষটি দেখতে—

না, না—কি যে বলেন—।

তা লেহ্য কথা বলবো বৈকি! যদি বলি, প্রথম পক্ষ, তা তো কেউ না বলতে পারবে না আপনার।

কি যে বলেন—

না হারুবাবু, অনেকখানি আশা নিয়ে এয়েছি— না, করতে পারবেন না—ভগ্নীটিকে চরণে আপনার স্থান দিতেই হবে—

না, না—এ বয়সে আবার বিয়ে—

আবার মানে, এখনো দুবার বিয়ে আপনি করতে পারেন। তাছাড়া ভগ্নীটি আমার অপছন্দেরও নয় কিছু—এই দেখুন না ছবি—বলতে বলতে পকেট থেকে একটি লাস্যময়ী তরুণীর ফটো বের করে সামনে ধরে, দেখুন না—দেখুন—

ফটোটার দিকে তাকিয়ে হারাধনের চোখের তারা দুটো চকচক করে ওঠে!

বুঝলেন হারুবাবু, আপনাকে কষ্ট করে যেতেও হবে না—আমিই নিয়ে আসবো এখানে—এখন বলুন, ফটো দেখে পছন্দ হয় কিনা—

তা মন্দ কি—ভালই তো দেখতে পেহ্লাদবাবু আপনার ভগ্নীটি, তা বয়স কত—

এই ধরুন ষোল সতের—মিথ্যে বলব না—

আপনি সত্যিই আমায় বড় বিপদে ফেললেন, দেখছি—

বিপদ—সে আবার কি!

নিশ্চয়ই, এ বয়সে আবাব বিয়ে—

রাখুন তো মশাই, পুরুষের আবার বয়স কি—বলেছে পুরুষ পরেশ—

কিন্তু—

না বললে আমি ছাড়বই না—এ-সুযোগ যখন ভগবান আমায় মিলিয়ে দিয়েছেন—বলুন, আমায় নিরাশ করবেন না—

ফটোটা রেখে যান, ভেবে দেখি—

বেশ, তবে কবে আসব, বলেন?

দিন দুই বাদে আসবেন।

এইখানেই তো?

হ্যাঁ—তাই আসবেন।

প্রহ্লাদ উঠে দাঁড়ায়, তবে আজ আজ্ঞা হোক হারুবাবু, চলি—

আহা যাবেনখন—বসুন, মিষ্টি মুখ করুন।

না, না,—মিষ্টিমুখ আবার কি—

তা কি হয়—ধরুন আত্মীয়তা যদি হয়ই—

হবে হবে—বেশ—আনুন মিষ্টি—

আপনি একটু বসুন—চট্ করে আমি ঘুরে আসি—

হারাধন বের হয়ে গেল।

প্রহ্লাদ একটু অপেক্ষা করে। তারপর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে সুটকেসগুলো একটা একটা করে খুলে ফেলে হারাধনের চাবি দিয়ে—চাবিটা সে হারাধনের বালিশের নীচেই পেয়েছিল।

তৃতীয় সুটকেসে কি যেন একটা পায় প্রহ্লাদ—চট্ করে সেটা তুলে পকেটে ভরে ফেলে। তারপর আবার সুটকেসগুলো বন্ধ করে বসে থাকে হারাধনের অপেক্ষায়—

একটু পরে হারাধন মিষ্টি নিয়ে এলো—মিষ্টি খেয়ে বিদায় নিল প্রহ্লাদ।

॥ ২০ ॥

কেবল হারাধনই নয়—আরো দুজনের খোঁজ-খবরের প্রয়োজন আছে—নীলাদ্রি ভাবে।

রাসমণি ও দরোয়ান কিষেণলাল।

চম্পার দাসী ও দরোয়ান।

তাদের কাছে গেলে হয়ত আরও কিছু জানা যাবে।

দিন দুই পরে এক সন্ধ্যারাত্রে—

আবার দেখা গেল নীলাদ্রি চৌধুরীর বাড়ির পশ্চাৎদিকের সেই দ্বারপথ দিয়ে গলিপথে একজন বের হয়ে এলো।

সম্পূর্ণ অন্য বেশ—

বিহারী বেশভূষা। পাকানো সরু গোঁফ—মোম দেওয়া। মাথায় টুপি, হাতে একটা ব্যাগ—

ট্রামে করে আজ লোকটা ধর্মতলায় এসে নামল, তারপর হেঁটে এক ম্যানসনের সামনে এসে দাঁড়াল।

নীচের একটা ঘরে কয়েকজন দরোয়ানশ্রেণীর লোক আড্ডা দিচ্ছিল—একজন রোটি পাকাচ্ছিল—

একজন প্রৌঢ় মত দরোয়ানকে শুধায় সে, কিষেনলালাজী হ্যায়—

হ্যাঁ—লেকেন কৌন হো তুম?

মুঝে তো আপ পয়ছানগে নেহি জী—উ হামারা দেশওয়ালী হ্যায়—

আরে ও কিষেন ভাইয়া—লোকটা চিৎকার করে ডাকে।

কিষেনলাল সিদ্ধির নেশায় একটা খাটিয়ার উপর চিত হয়ে পড়ে ছিল, সাড়া দেয়—

ক্যেয়া-রে, রোটি তৈয়ারী হো গেয়ি কি নেহি—

আরে দেখো তো তুমহারা কৌন দেশওয়ালী আদমী আয়া—

কৌন রে—

এগিয়ে আসে লোকটা।

নমস্তে কিষেণলালজী—

নমস্তে—কৌন হো তুম—

ম্যায় ছেদীলাল হু—

ছেদীলাল কৌন—মিশিবকো ভাতিজা?

হাঁ, হাঁ—

আরে তুম দিল্লীমে নোকরি লেকর গিয়া থা না?

হাঁ চাচাজী—

তব্?

ও নোকরি ছোড় দি মুঝে।

ছোড়দি—কিউ রে?

কা করি চাচাজী, নোকরি ও আচ্ছাই থা, লেকেন মুঝে দিল নেহি লাগা হুয়া—

তা তুমহারা চাচাজী—রোশনকা তবিয়ৎ কেইসা হ্যায়—

আচ্ছাই হ্যায়। একঠো বাত থা আপকো সাথ চাচাজী—

কহো বেটা—

থোড়া বাহারমে আইয়ে—

কিউ—

চলিয়ে না—সব কোইকো সামনামে উ বাত নেহি হো সেকতা—জরুরী বাত হ্যায়।

আচ্ছা, চলো উধার—

অন্ধকার কোর্ট ইয়ার্ডের একপাশে এসে দুজনে দাঁড়ায়। কহো বেটা কেয়া বাত হ্যায়।

চাচাজী, হাম কুছ দিনতক পুলিসকা বড়াসাবকো কোঠিমে নোকরি করতা হ্যায়—

আচ্ছা—

হাঁ— উহাঁ এক বাত শুনকর জলদি চলা আয়া—

কেয়া বাত, বেটা—

চম্পাবাঈকো আপ জানতেথে না—

হাঁ—উসিকো পাশ ম্যায়নে তো কহি সাল নোকরি কিয়া—বেচারী এক খুনকে মামলামে ফাঁস গিয়া—

শুনিয়ে চাচাজী, ওহি মামলাকে বারেমে ম্যায় আপকো পাশ আয়া—

কেয়া বাত হ্যায় বেটা—

মামলা ইসবকৎ হাইকোর্টমে চল রহা হ্যায় না—

হাঁ—

শুনিয়ে চাচাজী, পুলিশ হারাধনকো দো চার রোজমেই গ্রেপ্তার করেগা—

কিউ, ও তো বেগুনাহ হ্যায়—

লেকেন পুলিসকো উস্‌কো বাবেমে এইসা কুছ মিল গিয়া কি ফিব উস্‌কো গ্রেপ্তার কিয়া যায়গা—

গ্রেপ্তার কিয়া যায়গা? লেকন কিউ?

আভি বোলানা এইসা কুছ্ মিলা—

লেকেন কেয়া মিলা—

রূপেয়া—

রূপেয়া!

হাঁ—নম্বরী নোট—যো নোট ওহি বদ্রীপ্রসাদকো রাতমে খোয়া গিয়া—

কিষেনলাল হঠাৎ চুপ করে যায়—

পুলিস আপকো বারে ভি—

কেয়া—

হাঁ—উলোগন বলনে চাতা হ্যায় কি, আপ দুনো মিল ঝুলকে ওহি রাতমে—

নেহি বেটা নেহি—রূপেয়াকে বারেমে ম্যায় কুছ নেহি জানতা হ্যায়—

লেকেন পুলিস বিশোয়াস নেহি করেগা—

তব্ কেয়া হোগা বেটা—

আপকো কেতনা মিলা সাচ্ কহিয়ে—বড়াসাব হামকো বহুত পেয়ার করতা হ্যায়—উসকো গোড় পাকাড়কে ম্যায় আপকো লিয়ে মাফি মাঙেগা—

বেটা মুঝে বাচাও—কিষণলাল এবার কেঁদে ফেলে।

ফিকর না করিয়ে—ম্যায় সামাল লেগা—লেকেন আপকো সব সাচ্ সাচ্ বাতানে পড়েগা—

হাঁ বাতায় গা—

তব্ আভি চলিয়ে হামারা সাথ—

কিধার—

আগর হারাধনকো মালুম পড় যায়গা তো উ আপকো ফাসায়গে—উসি লিয়ে হামারা কোঠিমে আপ চলিয়ে—উধারই রহেগা—

লেকেন বেটা—

ডরিয়ে মাত। হামারা সাব বহুৎ আচ্ছা আদমী হ্যায়—চলিয়ে—

আভি?

হাঁ—ইসিওয়কৎ—

কিষেনলাল তার লটবহর নিয়ে ছেদীলালের সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে উঠে বসে তখুনি।

শালা হারুই হামকো ফাসায়া—কিষেণলাল ট্যাক্সিতে বসে বলে।

আর ঐ দিন রাত্রে ঐ সময়—

হারাধনের বস্তির ঘরে হারাধন ও রাসমণির মধ্যে বচসা হচ্ছিল—

হারামজাদী, মিথ্যে বলবি তো গলা টিপে শেষ করে দেবো তোকে—হারাধন খিঁচিয়ে ওঠে হিংস্র কণ্ঠে।

ও—গলা অমনি টিপলেই হলো—তোমাকে আমি রেহাই দেবো তাহলে ভেবেছো—অলপ্পেয়ে অনামুখো মিন্‌সে।

তুই আমার টাকা নিয়েছিস—বল কোথায় রেখেছিস—

না—আমি তোমার টাকা নিইনি—

তুই নিসনি তো ভূতে নিয়ে গেল—তুই ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, টাকা কোথায় ছিল—কাল রাত্রে এখানে এসে চলে যাবার সময় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, ঐ ফাঁকে হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছিস—

আ মরণ মিন্‌সের—হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছিস! যেই বিয়ের কথা তুলেছি অমনি বুঝি বাহানা তুলেছিস!

বিয়ে—তোকে অমি বিয়ে করবো—একটা ঝি—বেশ্যা—

কি বললি—আমি ঝি—বেশ্যা—ও তাই এই ফটোক—বলতে বলতে রাসমণি গত রাত্রে হারাধনকে দেওয়া প্রহ্লাদের সেই ফটোটা আঁচলের তলা থেকে বের করে, বল, এ মাগী কে বল—

অ্যাঁই অ্যাঁই—আমার ফটো দে বলছি, রাসু—

না, দেবো না—

দে বলছি, নইলে খুন করে ফেলবো। হারাধন রাসমমণির উপর সহসা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দুজনায় মারামারি খিমচাখিমচি শুরু হয়।

রাসমণিও কম শক্তি গায়ে ধরে না। হারাধন প্রথমটায় তাকে চিত করে গলা টিপে ধরলেও পরক্ষণেই রাসমণি তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চেপে বসে।

বেশ-বাস বিশৃঙ্খল—বাঁধা খোপা খুলে যায়—চোখে মুখে হিংস্র-দৃষ্টি রাসমণির।

কিন্তু হাজার হলেও রাসমণি এক জোয়ান পুরুষের সঙ্গে পারবে কেন—হারাধন একটু পরেই তাকে আবার ফেলে দেয়।

ঐ সময় রাসমণি হারাধনের হাতে প্রচন্ড এক কামড় বসিয়ে দেয়—ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে।

এলোপাথাড়ি চড় ঘুষি মারতে থাকে রাসমণির চোখে মুখে হারাধন, অনেক কষ্টে এক সময় হারাধনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে পড়ে রাসমণি।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আচ্ছা অলপ্পেয়ে মিন্‌সে—ডানা গজিয়েছে তোমার—আমিও রাসু গয়লানী—তোমার আমি দেখবো—

যা যা—দেখবি—তুই করবি আমার কচুটা—

রাসমণি ঝড়ের বেগে বের হয়ে যায়।

॥ ২১ ॥

রাসমণির ঘরে পরের দিন রাত্রে—

চেতলায় একটা বস্তি—

তারই মধ্যে একটা ঘর নিয়ে ইদানীং ছিল রাসমণি।

রাসমণি তার ঘরের মধ্যে একটা টিনের বাক্স খুলে সব জামা কাপড় গোছাচ্ছিল। বাইরে থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল—

ওলো রাসু একটি বাবু তোকে খুঁজছে রে--

বাবু—কে আবার এলো—

দেখ না—যান বাবু ভিতরে যান—এই ঘর।

ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি ও কাঁচির কোঁচানো লোটানো ধুতি পরনে—হাতে একটা সোনাবাঁধানো ছড়ি, চোখে সোনার শৌখিন চশমা—কোঁকড়ান চুলে টেরি কাটা—সরু পাঁকানো গোঁফওলা এক ভদ্রলোক এসে রাসমণির ঘরে ঢুকল।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় রাসমণি সসম্ভ্রমে, কে আপনি—

ব্যস্ত হয়ো না রাসমণি—আমি তোমার কাছেই এসেছি—

আমার কাছে?

হ্যাঁ—হাটখোলার বসুদের নাম শুনেচো, সে-বাড়ির মেজবাবু আমি—তা আমাকে বসতে দেবে না রাসমণি—

রাসমণি যেন কেমন বিস্ময়ে থতমত খেয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে তার কোন শব্দই বের হয় না।

তার মাঠ-কোঠার ঘরে কে এলো!

কে উনি!

ভদ্রলোকটি আবার বলেন, কি হলো—চিনতে পারছো না! আমায় তুমি তো—

আজ্ঞে—

বসতে দেবে তো—

আজ্ঞে—

তাড়াতাড়ি রাসমণি একটা টুল এগিয়ে দেয়।

রাসমণি—বাবু বলেন, আমি বাপু স্পষ্ট কথার মানুষ—আদালতে চম্পাবাঈয়ের মামলা শুনতে গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোমায় প্রথম দেখেই আমি আর তোমাকে ভুলতে পারিনি—

ও শুধু অচিন্ত্যনীয়ই নয়, স্বপ্নাতীত বুঝি রাসমণির কাছে।

হাটখোলার মেজবাবু—তার রূপে মুগ্ধ। তার ঘরে এসে উপস্থিত—

রাসমণি যেন বোবা হয়ে গিয়েছে—

কিন্তু এখানে তো তোমার আর থাকা চলবে না—বালিগঞ্জে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে, সেখানে তোমাকে নিয়ে গিয়ে রাখব— কি বল, আপত্তি নেই তো—

রাসমণি কেঁদে ফেলে, বাবু—

ওকি, কাঁদছো কেন—ছিঃ কাঁদে না—

জেলখানার মধ্যে সেই ছোট্ট ঘরটিতে একটা চেয়ারে বসে তনিমা আর সামনে মেঝেতে বসে চম্পাবাঈ।

চম্পা তার কথা বলে যাচ্ছিল। আর নির্বিষ্ট মনে শুনছিল সেই কাহিনী তনিমা।

চম্পা বলছিল—

যে মেয়েটির কথা শুনবার আপনার এত আগ্রহ, সেই হতভাগিনী মেয়েটির নাম শিউলী।

তনিমা চেয়ে থাকে, শিউলী—চম্পাবাঈয়ের মুখের দিকে।

চম্পা বলে, কে নাম রেখেছিল আমার শিউলী, জানি না। তবে জ্ঞান হওয়া অবধি ঐ নামেই সবাই আমায় ডেকে এসেছে—

হঠাৎ প্রশ্ন করে তনিমা—

আর তার নাম?

জানি না।

শোননি কখনো?

না।

শিউলী মাথা নীচু করে।

তারপর?

একটা মাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, জানতেও পারলাম না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় চিঠি এলো—তাকে কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য। যাবার সময় ও বলে গেল এক মাসেব মধ্যে সে পুরুত নিয়ে এসে আমাকে বিয়ে করবে—বলতে বলতে হেসে ফেলে চম্পাবাঈ।

বিয়ে—ভাবতে গেলে আজও আমার হাসি পায়। কি বোকাই ছিলাম—না হলে ভাবি, আসবে সে—

আসেনি সে?

না—কিন্তু তখনও বোকা ঐ শিউলী মেয়েটা বোঝেনি, কোন দিনই সে আর আসবে না - কোন দিনই আর আসবে না।

শিউলী আবার থামল।

তারপর শিউলি?

—না,না—ও নামে আমাকে আর ডাকবেন না। শিউলী কবেই মবে গিয়েছে—

না শিউলী, তুমি মবোনি—

শিউলী করুণ হাসি হাসে, না, সে মরে গেছে। তবে আজও শিউলীব সেই ভূতটা বোধ হয মরেনি, তাই মধ্যে মধ্যে এখনো—

কি?

না, কিছু না।

তা তুমি, সে যখন এলো না, তখন তাকে একটা চিঠি লিখলে না কেন, লেখাপডা তো তুমি জানতে।

লিখেছিলাম।

লিখেছিলে!

হ্যাঁ—নামটাও জানতাম না কেবল শুনেছিলাম ঠিকানাটা—চার পাঁচটা চিঠি তাব কলকাতার সেই ঠিকানায় লিখেছি কিন্তু একটারও জবাব পাইনি—এদিকে তখন আমার শিয়রে শমন—যাব বাড়া সর্বনাশ মেয়ে মানুষের আর নেই। সেই সর্বনাশ আমার দেহে দেখা দিয়েছে—উঃ সে যে আমার কি অবস্থা—

॥ ২২ ॥

এদিকে শিউলী প্রথম যেদিন বুঝতে পারল, সে মা হতে চলেছে, অকস্মাৎ বুকের ভিতরটা তাব যেন কেঁপে উঠল।

দুই মাস এদিকে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, নীলাদ্রি কলকাতায় চলে গিয়েছে—

এবং শিউলীর দেহের পবিবর্তনটা আর কারো চোখে না পড়লেও সৌদামিনীর তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

তিনি একদিন সন্ধিৎসু কণ্ঠে প্রশ্ন কবেন, কি হয়েছে তোর?

কিছুই হয়নি তো মা—

তবু যেন সৌদামিনী দেবীর মন থেকে সন্দেহটা যায় না।

তিনি কেবলই তাকান ওর চোখ-মুখের দিকে।

অথচ স্পষ্টাস্পষ্টি করে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পাবেন না—

এমন সময় এলো নীলাদ্রিব চিঠিটা—

চিঠি পড়ে শোনায় সৌদামিনী দেবীকে শিউলীই—

নীলাদ্রি লিখেছে :

পিসিমা,

আগামী শনিবার এখান থেকে ট্রেনে বোম্বাই রওনা হচ্ছি—বোম্বাই থেকে সোমবাব জাহাজে উঠবো। ইচ্ছা ছিল খুব, যাবার আগে তোমাদের ওখানে একটিবাব ঘুরে যাবো কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। বিলেত থেকে ফিবে এসে আবার দেখা হবে। আমাব প্রণাম নিও।

তোমার স্নেহেব নীলু—

চিঠিটা পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন শিউলীর মাথাটার মধ্যে কেমন করে ওঠে।

সে তাহলে সত্যি সত্যিই এলো না আর—

কিন্তু এদিকে যে তার সঙ্গীন অবস্থা—আর তো চেপে রাখা যাবে না। সৌদামিনীর চোখে পড়েছে—সন্দেহও নিশ্চয়ই তাঁর হয়েছে।

এখন কি হবে?

মাথাটা ঘুরে যায় হঠাৎ যেন শিউলীর—অকস্মাৎ সব যেন অন্ধকার হয়ে যায়—মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়।

সৌদামিনী চেঁচিয়ে ওঠেন, একি—কি হলো—কি হলো—

তাড়াতাড়ি সৌদামিনী অচেতন শিউলীর মাথাটা কোলে তুলে চোখে-মুখে জল দেন, মাথায় বাতাস করতে থাকেন আর কেষ্টকে বলেন, ছুটে ডাক্তারবাবুকে গিয়ে ডেকে আন কেষ্ট—বলবি, মা বলেছেন এখুনি চলে আসতে।

কেষ্ট ছুটে যায়।

একটু পরে জ্ঞান ফিরে আসে শিউলীর। চোখ মেলে তাকায়, মা—

কেমন আছিস এখন—

ভাল—

উঠে বসবার চেষ্টা করে শিউলী কিন্তু সৌদামিনী দেবী বাধা দেন, না, না—এখন শুয়ে থাক—

আমার কিছু হয়নি, মা—

শুয়ে থাক—উঠতে দেন না সৌদামিনী শিউলীকে।

একটু পরে ডাক্তার এলেন, কার অসুখ—

আসুন ডাক্তারবাবু, দেখুন তো মেয়েটাকে—কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে—মুখ শুকিয়ে গেছে—চোখের কোলে কালি—

বৃদ্ধ ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর সৌদামিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন মা পাশের ঘরে, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—

সৌদামিনী ডাক্তারকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন।

মা—

বলুন!

মেয়েটি তো দেখছি অন্তঃসত্ত্বা।

সেকি!

হ্যাঁ মা—অন্য কোন রোগ নেই।

সৌদামিনীর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে, এ কি সর্বনেশে কথা! শিউলী মা হতে চলেছে—

আপনার ভুল হয়নি তো ডাক্তারবাবু।

না বড়-মা—ডাক্তার মৃদু হাসলেন।

একটু পরে ডক্তারকে বিদায় দিয়ে সৌদামিনী পাশের ঘরে ঢুকে প্রথমেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন।

শিউলী ইতিমধ্যে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পদশব্দে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

শিউলী—

মা—

বল—সত্যি কথা বল আমাকে—

ও মাথা নীচু করে।

বল হারামজাদী শীগগির, কে এ-কাজ করেছে—

নীরব। যেন পাথর শিউলী।

বল্—

তথাপি নীরব ও।

হারামজাদী তুই আমার স্নেহের এত বড় অপমান করলি। এমনি করে আমার মুখে চুন-কালি

মাখিয়ে দিলি, এই জন্যই কি তোকে নিজের কাছে এনে খাইয়ে পরিয়ে বড় করে তুলেছিলাম—বল শীগগির—বল কে সে—

শিউলী তথাপি চুপ। যেন বোবা।

ওরে বল—যেমন করেই হোক তার সঙ্গে তোর আমি বিয়ে দেবো। কোন ভয় নেই, তুই বল—

কোন কথাই বলে না শিউলী।

তর্জনগর্জন মিনতি সৌদামিনীর সব ব্যর্থ হয়।

তখন অনুনয় করেন, লক্ষ্মী মা বল—কে সে? আমার কাছে বল।

অকস্মাৎ যেন ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লেন সৌদামিনী—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, বল্—চুপ করে থাকলে আমি ছাড়বো না।

তথাপি নিরুত্তর শিউলী।

বলতে তোকে হবেই—

নিজের ঘরের মধ্যে আটকে রাখলেন সৌদামিনী শিউলীকে।

ঘরের মধ্যে একাকী বসে ছিল শিউলী।

রাত হয়েছে তখন—সৌদামিনী উপরে পূজোর ঘরে গিয়েছেন একটু আগে—

শিউলী ভাবছিল—আজই তো শনিবার—আজই তো মাঝরাত্রে যে ট্রেনটা এখান দিয়ে চলে যাবে, সেই ট্রেনেই চলে যাচ্ছে নীলাদ্রি বোম্বাই।

তারপর বিলেত।

যেমন করে হোক তার সঙ্গে একটিবার দেখা করতেই হবে। তাকে যে সব জানাতেই হবে। বলতে হবে, ওগো তোমার সন্তান যে আমার গর্ভে—আমি এখন কি করবো, বলে যাও—তুমি তো চললে—

সন্ধ্যা থেকেই আকাশে মেঘ করেছিল—

রাত নটার পর শুরু হয়েছিল ঝড় বৃষ্টি—তখনো সমানে বৃষ্টি ঝরছে।

সৌদামিনী দেবী উপরে ঠাকুরঘরে।

ঘর থেকে বের হয়ে এলো একসময় শিউলী পা টিপে টিপে—দরজাটা টেনে দিল ঘরের।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে খিড়কীর পথ দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

তারপর সেই বৃষ্টির মধ্যে পাগলের মত স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে মধ্যরাত্রে যখন সে স্টেশনে এসে পৌঁছল বৃষ্টির মধ্যে, নীলাদ্রির ট্রেনটা তখন স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বৃষ্টির জন্য সমস্ত কামরার শার্সি নামানো—শিউলী ট্রেনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটতে থাকে আর চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে বার বার, নীলাদ্রি—নীলাদ্রি—

হঠাৎ একটা আলোকিত কামরার মধ্যে তার দৃষ্টি পড়ে, ভিতরে উজ্জ্বল আলো।

ফার্স্ট ক্লাস কামরা—চারজন লোক বসে বসে তাস খেলছে আর হাসাহাসি করছে—ঐ—ঐ তো নীলাদ্রি—এক হাতে তার তাস, অন্য হাতে গ্লাসে তরল পদার্থ।

নীলাদ্রি—কিন্তু গলা দিয়ে তার স্বর বের হয় না।

ইতিমধ্যে সবুজ আলো দুলিয়ে সিটি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

ধীরে ধীরে গাড়িটা চলে গেল—

আর সেই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল শিউলী।

॥ ২৩ ॥

নীলাদ্রি তাহলে চলে গেল।

কিন্তু কই তার মুখে তো কোন উদ্বেগ কোন চিন্তার ছায়াই দেখল না সে। পরম আনন্দে বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলতে খেলতে চলেছে।

তবে সেই বা কেন ছুটতে ছুটতে এসেছিল—এতদূর—এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে!

নীলাদ্রি তাকে ভুলে গিয়েছে—

বোকা নির্বোধ সে, তাই স্বপ্ন দেখেছিল—সত্যিই তো নীলাদ্রি রাজার ছেলে আর সে কি—কি তার পরিচয়—

দুটো দিন তাকে নিয়ে স্ফূর্তি করেছে।

প্রয়োজন ফুরিয়েছে—সম্পর্কও শেষ হয়েছে।

কেমন করে যে ফিরে এলো আবার গৃহে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শেষরাত্রে, শিউলী নিজেও জানে না।

সিঁড়িতে তখনো আলো জ্বলছে—

ও কে—সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সৌদামিনী—

কেষ্টা—

মা—

সত্যিই সৌদামিনী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দুচোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরছিল।

চিৎকার করে উঠলেন সৌদামিনী, কেষ্টা—

অল্প দূরেই কেষ্টা বোধহয় ছিল, সৌদামিনীর ডাকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে, মা—

কেষ্টারও ঐ সময় নজর পনে, সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে শিউলী।

ভিজে শাড়িটা সারা শরীরে লেপ্‌টে আছে—

জলে-কাদায় নোংরা শাড়িটা।

মাথার চুল বিপর্যস্ত।

সৌদামিনী কেষ্টার দিকে তাকিয়ে বললেন—যা ওকে নীচে গুদামঘরে নিয়ে যা, আমি আসছি—

সৌদমিনি তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

কেষ্টা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

কেষ্ট শিউলীকে ধরে টানতে টানতে গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। একটু পবেই সৌদামিনী দেবী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

হাতে তাঁর একটা চামড়ার চাবুক।

চাবুকটা ছিল তাঁর স্বামীর—অবাধ্য চাকরবাকরদের তিনি ঐ চাবুক দিয়ে নিজের হাতে শায়েস্তা করতেন।

ঐ জানালাটার সঙ্গে বাঁধ ওকে—

কেষ্ট যেন আজ মৌকা পেয়েছে—অনেক দিনের আক্রোশ তার শিউলীর প্রতি। একটা হ্যাঁচকা টানে শিউলীকে টেনে নিয়ে গিয়ে জানালার গরাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলল শক্ত করে।

সৌদামিনী আরো সামনে এসে দাঁড়ালেন—চোখ দুটো তাঁর জ্বলছিল যেন। বললেন, বল কোথায় গিয়েছিল—

ও নীরব দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

জবাব দে, নইলে এই চাবুক দিয়ে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেবো আজ আমি। বল, কোথায় গিয়েছিলি—জাবাব দে—

শিউলী যেন পাথর।

বল এখনো—কে? কোন্ নাগরের কাছে গিয়েছিলি—কোথায় সাবাটা রাত ছিলি?

শিউলীর সে-রাত্রে একবার ইচ্ছে হয়েছিল ঐ সময় চিৎকার করে সে বলে, সে আর কেউ নয় তোমারই আদরের ভাইপো—তোমারই বংশধর গর্ভে আমার—

কিন্তু কোন কথাই সে বলে না।

বলবি না—তবু চুপ করে থাকবি—কেষ্টা, এই চাবুক নে—ওর পিঠের চামড়া তুলে দে—

কেষ্ট চাবুকটা হাতে নেয়।

মার চাবুক—চেঁচিয়ে ওঠেন যেন ক্ষিপ্তের মত সৌদামিনী।

হুইস্ করে শব্দ উঠল চাবুকটা আন্দোলিত হয়ে বাতাসে।

আছড়ে পড়ল শিউলীর গায়ে—যেন একটা সাপ ছোবল হানল।

মার—যতক্ষণ না ও বলছে, মার—আরো মার—মেরে ফেল ওকে—সৌদামিনী যেন পাগল

হয়ে গিয়েছেন। পাগলের মত চেঁচাচ্ছেন।

চাবুকের পর চাবুক সপাং সপাং করে ওর সবাঙ্গে পড়তে থাকে—দাগা দাগা হয়ে কেটে ফুলে ওঠে শরীর তার। তবু একটা কথা বলে না শিউলী—একটা শব্দ বের হয় না তার মুখ দিয়ে।

সৌদামিনী মেয়েটার জিদ দেখে আরো ক্ষেপে যান।

কেষ্টকে বলেন, মার—আরো মার—হারামজাদীকে মেরে ফেল—এত বড় নষ্ট মেয়েমানুষ—

শেষটায় জ্ঞান হারাল শিউলী একসময় প্রহারের যন্ত্রণায়।

মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের কাছে ওর অসহায়ের মত।

থাক—দে, বাঁধন খুলে দে—হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন সৌদামিনী।

পড়ে গেল মেঝেতে ধুলোর মধ্যে শিউলীর অচৈতন্য প্রহারজর্জরিত রক্তাক্ত দেহটা, বাঁধন খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন।

থাক হারামজাদী এখানে পড়ে—

ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সৌদামিনী কেষ্টকে নিয়ে—তালা দিয়ে দিলেন গুদামঘরের দরজায়—চাবিটা হাতে নিয়ে উপরে চলে গেলেন!

অন্ধকার বদ্ধ-বায়ু ঘরের ধূলির মধ্যে চাবুকে চাবুকে জর্জরিত রক্তাক্ত অচৈতন্য দেহটা পড়ে রইল শিউলীর।

হঠাৎ কথার মাঝখানে চেঁচিয়ে ওঠে তনিমা, উঃ—কি অমানুষিক inhuman torture— কেন তুমি সেদিন নামটা বলে দিলে না, চম্পা—

ছিঃ—দু চোখে আজো চম্পার জল ভরে আসে। বলে, তাই কি পারি—তার এতবড় বিশ্বাসের অমর্যদা কি করতে পারি—

বিশ্বাস—

তাই, সে যাবার আগে আমার হাত দুটো ধরে বলে গিয়েছিল, বিয়ে তোমার আমার হয়ে গিয়েছে অনেকদিন, শুধু মন্ত্রটা পড়া লৌকিকতাটুকু সমাজের স্বীকৃতিটুকুর জন্য—তবু সেটা যতদিন না হয়, এ-কথা কিন্তু বলো না। কেউ যেন জানতে না পারে—বলেছিলাম, না গো না, ভয় নেই, বলবো না—আর বলতেই বা যাবো কেন—বলবার দায়িত্ব কি আমার— সে তো তোমার।

তারপর একটু থেমে আবার চম্পা বলে, তাছাড়া আমি কে—কি আমার পরিচয়—কে-ই বা আমায় চেনে—আমার নামের কলঙ্কের মূল্যই বা কি—কিন্তু সে—কত নাম কত যশ কত বড় ঘরের ছেলে সে—তাকে কি ছোট করতে পারি—তার গায়ে কি ধুলো-কাদা মাখাতে পারি—

আচ্ছা চম্পা—

বলুন!

তার কথা তুমি আজো ভুলতে পারনি তাই না?

চম্পা কোন জাবাব দেয় না—

॥ ২৪ ॥

মিথ্যা নয়—নীলাদ্রি যখন প্রথম তনিমাকে শিউলীর কাছে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল, তনিমার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীলাদ্রির অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে যেতে হয়েছিল তাকে এবং সবের মধ্যে তার ইচ্ছার লেশমাত্র ছিল না।

তার আদৌ ভাল লাগেনি, রুচিতেও বেঁধেছে জেনানা ফাটকে গিয়ে একটা নিম্নশ্রেণীর হত্যাকারিণী রূপোপজীবিনীর সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু সেই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকটিই যখন তাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিতে লাগল, বিস্ময়ের সঙ্গে কেমন একটা কৌতূহলও যেন তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

তার একান্ত অনাগ্রহটাই শেষ পর্যন্ত যেন একান্ত আগ্রহে পরিণত হয়—সে দেখা করবেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে স্থির করে—আর তাই জেলার সাহেবকে অনুরোধ জানায়।

তারপর দেখা হবার পর শিউলীর মুখ থেকে যখন সে তার সব কাহিনী শুনলো, একজন স্ত্রীলোক হিসাবে শিউলীর প্রতি মনটা তার মমতায় ও শ্রদ্ধায় তো ভরে ওঠেই, সেই সঙ্গে তার

সকল দুর্ভাগ্যের কারণ ঐ নীলাদ্রিই, নিঃসংশয়ে জানতে পেরে তার প্রতি মনটা তার বুঝি বিরূপ হয়ে ওঠে।

শেষ দিন জেনানা ফাটক থেকে বের হয়ে তনিমা তাই সোজা তার নিজ গৃহে চলে যায়। দুটো দিন গৃহের বাইরে পর্যন্ত যায় না।

চতুর্থ দিনে নীলাদ্রিই এলো তনিমার সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে, তনিমার গৃহে ঐ তার প্রথম আগমন।

সুবালাই দরজা খুলে দিয়েছিলেন, কে আপনি।

আমি নীলাদ্রি চৌধুরী—তনিমা আছে?

আছে—

সে কি অসুস্থ?

বলতে পারি না।

তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—

তার ঘরেই সে আছে—যান—ঐ যে ঐ ঘরে—কথাটা বলে সুবালা সরে গেলেন।

তনিমা চুপচাপ একটা চেয়ারের উপর বসেছিল।

নীলাদ্রি এসে ঘরে ঢুকল, তনিমা।

কে—একি আপনি—তনিমা উঠে দাঁড়ায়।

দুদিন তুমি যাও নি—কি ব্যাপার তাই জানতে এলাম—

আমার রেজিগনেশন লেটার তো পাঠিয়ে দিয়েছি কাল—পাননি!

না—কিন্তু রেজিগনেশন কেন?

ইচ্ছে নেই আর কাজ করবার—

তোমার বাড়িতে প্রথম এলাম—বসতেও বলবে না?

বসুন।

নীলাদ্রি বসল একটা চেয়ারে। কিছুক্ষণ অতঃপর উভয়েই চুপচাপ।

তনিমা!

বলুন।

শিউলীর সব কথা জানতে পেরেছো?

পেরেছি—

কথাটা বলে তনিমা আবার চুপ করে যায়।

সে-সম্পর্কে কিছু তোমার বলার নেই। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নীলাদ্রিই আবার কথা বলে।

না—

কিন্তু আমার যে জানা প্রয়োজন।

কি জানতে চান?

সে হঠাৎ অমন করে সেখান থেকে কেষ্টার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল কেন?

পালায়নি সে—

তবে ?

সত্যি শুনতে চান আপনি সে-কথা?

শুনবো বলেই তো এসেছি—

তবে শুনুন—সে আপনাকেই লজ্জা, অপমান ও কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচবার জনাই সেদিন নিজের মাথায় সব অপরাধের বোঝা তুলে নিয়েছিল—

তনিমা—

আপনাকে সে কথা দিয়েছিল, মুখ খুলবে না, তাই আজও মুখ বুজে আছে—মৃত্যু পর্যন্ত থাকবেও, জানবেন—

দোহাই তোমার আমাকে সব কথা জানতে দাও—

কি জানতে চান আর?

সব-কথা—

তবে শুনুন, আপনি যেদিন বিলেত যান—সে-রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে সে ছুটে গিয়েছিল স্টেশনে—ব্যাকুল হয়ে কিন্তু কেন জানেন—আপনার সন্তান তখন তার গর্ভে ছিল বলে।

তনিমা—অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নীলাদ্রি।

হ্যাঁ—এবং ফিরে এলো যখন, আপনার পিসিমা তাকে দুশ্চরিত্রা সন্দেহ করে নির্মম বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেন, তবু সে মুখ খোলেনি—তারপর সেই রাত্রেই কেষ্টার প্রচেষ্টায়, সে তাকে আপনার কাছেই পৌঁছে দেবে এই অশ্বাসে আপনার পিসিমার আশ্রয় থেকে নিয়ে পালায় কিন্তু কেষ্টার আসল রূপটা যখন খুলে গেল—তার লোভের হাত বাড়ল তার দিকে, আবাব পালাতে হলো আত্মরক্ষার জন্য—

তারপর—

তারপব ভাগ্যের নিষ্ঠুর খেলায় হতে হলো একদিন তাকে চম্পাবাঈ—

আর তার সন্তান! তার কি হলো?

জানি না—

জানো না—

না—কিন্তু আর সে-সব কথা আজ আপনার জেনেই বা লাভ কি? পারবেন না তো আজ আর তার সেই অতীত কলঙ্ককে মুছে দিতে। চম্পাবাঈয়ের নামটা মুছে দিতে—শিউলী তো অনেকদিন আগেই মরে গিয়েছে।

আমি উঠি তনিমা—

নীলাদ্রি সহসা উঠে দাঁড়াল। তারপর শ্লথ পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং সোজা গেল লালবাজারে তার পরিচিত পুলিসের বড় একজন অফিসার মিঃ দে-র সঙ্গে দেখা করতে। অনেক কাথা হলো তাঁর মিঃ দে-র সঙ্গে।

দিন দুই পরে এক রাত্রে।

দি মর্ডান ফার্মেসি।

রাত তখন বোধকরি এগারটা হবে। মডার্ন ফার্মেসির কম্পাউন্ডার দ্বিজেন পাড়ুই দরজা বন্ধ করে ডিস্‌পেনসারির কাউন্টারের উপরে শয্যাটি বিছিয়ে তার উপরে বসে শয়নের পূর্বে বেশ আয়েস করে একটি বিড়ি ধরিয়ে সবে গোটা দুই টান দিয়েছে, বন্ধ দরজার গায়ে টুক্ টুক্ শব্দ হলো।

আঃ, এ-সময় আবার কে জ্বালাতে এলো রে বাবা।

উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতেই একজন পুলিস অফিসার ও নীলাদ্রি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, নীলাদ্রির চোখে কালো গগলস্। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি— কেয়ারিকরা গোঁফ।

থমমত খেয়ে যায় দ্বিজেন, কি—কি চান স্যর—আপনারা—।

আপনার নাম দ্বিজেন? পুলিস অফিসারই প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে পাড়ুই—

কম্পাউন্ডার?

হ্যাঁ—

আপানার প্রেসক্রিপশন ও বিষের রেকর্ডের খাতা দুটো দেখতে চাই—

দ্বিজেন তাড়াতাড়ি একটা বড় ও একটা ছোট খাতা এগিয়ে দেয়—প্রথমে প্রেসক্রিপশন খাতা তার পরে বিষের খাতাটা খুলে পাতা ওলটাতে থাকে—এক এক করে—বিশেষ একটা তারিখে এসে পুলিস অফিসার তন্নতন্ন করে দেখতে থাকে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখের তারা দুটো যেন পুলিস অফিসারের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকায়।

গত আঠারই নভেম্বর আপনি ডিস্‌পেনসারিতে ছিলেন?—প্রশ্ন করেন অফিসার এবারে।

গত চার মাস কোথায়ও আমি যাইনি স্যর—আর সে-রাত্রে—ছিলাম বৈকি—

রাতটা আপনাকে আমি মনে করিয়ে দিই, এ সেই রাত পাড়ুই মশাই— যে-রাত্রে চম্পাবাঈ বদ্রীপ্রসাদ নামে এক ভদ্রলোককে মদের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যর মনে আছে—সে রাত্রে আমি ডিস্‌পেনসারিতেই ছিলাম আর আমিই ঘুমের ওষুধ

সেই পাউডার তৈরি করে দিই হারাধনকে—

হারাধনকে আপনি চিনতেন?

চিনব না কেন, ভাল করেই চিনতাম—সে তো প্রায়ই এসে চম্পাবাঈয়ের জন্য এখান থেকে ওষুধ নিয়ে যেতো—

ডাঃ অধিকারীকেও আপনি চেনেন?

চিনি—

নীলাদ্রিই এবারে প্রশ্ন করে, তুমি কটা পুরিয়া ঘুমের দিয়েছিলে সে-রাত্রে হারাধনকে?

আজ্ঞে স্যর—চার পুরিয়া—দ্বিজেন বললে।

খাতায় যে প্রেসক্রিপশন লেখা আছে, ঠিক সেই ওষুধ দিয়েই পুরিয়া তৈরী করে দিয়েছিলে?

নিশ্চয়ই।

অন্য কোন ওষুধ মেশাওনি?

নিশ্চয়ই না, স্যর।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যখন ওষুধ তৈরী করছিলে, হারাধন তখন কোথায় ছিল?

এইখানে বাইরে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

কতক্ষণ লেগেছিল তোমার ওষুধ তৈরী করতে?

তা মিনিট কুড়ি তো হবেই।

সামনের ঐটিতেই তো সব Poisonous drugs থাকে?

আজ্ঞে—

ওর সব রেকর্ড রাখা হয় নিশ্চয়ই—

হ্যাঁ স্যার, ঐ খাতাতেই পাবেন।

অ্যাট্রোপিনের শিশিটা দেখি।

দ্বিজেন আলমারি খুলে 'অ্যাট্রোপিনে'র শিশিটা বের করে আনল।

এতে কতটুকু ওষুধ আছে?

ঐ Poisonous drugs-এর খাতাতেই আছে স্যর সব।

ওজন করে দেখ তো কতটা ওষুধ আছে?

দ্বিজেন নীলাদ্রির নির্দেশে ওজন করল—কিন্তু দেখা গেল, শিশির ওষুধের পরিমাণের সঙ্গে খাতার পাতায় লেখা ওষুধের পরিমাণের মিল হচ্ছে না—প্রায় কুড়ি গ্রেণ মত কম।

খাতার সঙ্গে তো মিলছে না, দ্বিজেন?

তাইত দেখছি স্যর—আশ্চর্য!

যখনই শিশি থেকে যতটুকু খরচ হয় খাতাতেই তো রেকর্ড রাখা হয়, তাই না?

হ্যাঁ—

তবে?

ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যর। গত চার মাসের মধ্যে তো ঐ শিশি থেকে অট্রোপিন ব্যবহার করা হয়নি।

নীলাদ্রি পুলিস অফিসারের মুখের দিকে তাকাল।

চোখে চোখে তাদের যেন কি ইশারা হয়ে গেল।

অতঃপর পুলিস অফিসার বললেন, এই শিশি আর খাতাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি—

কিন্তু স্যর, ঐ দুটো—

আমাদের একটু দরকার আছে—কাল-পরশুর মধ্যেই ফিরে পাবে এগুলো, পুলিস অফিসার বললে।

আচ্ছা স্যর—

নীলাদ্রি ও পুলিস অফিসার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আবার দিন দুই পরে—

ঘরের মধ্যে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি তার ছদ্মবেশটা বদলাচ্ছিল। ঘরের দরজায় টোকা পড়ল।

শিবদাস—আয় ঘরে আয়—

শিবদাস ঘরে এসে ঢুকল—হাতে কফির ট্রে।

দিদিমণি আজো আসেননি?

আজ্ঞে না—

ঠিক আছে, তুই যা—

শিবদাস চলে গেল।

তনিমা ঐ সময় ময়দানে অন্ধকারে এক জায়গায় বসে ছিল—সে হতভাগিনী চম্পার কথাই ভাবছিল।

সত্যিই কি দুর্ভাগ্য মেয়েটার।

অথচ কি আশ্চর্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। অত অত্যাচারেও মুখ খুলল না।

নীলাদ্রিকে তনিমা সত্যিই ভালবেসেছিল।

চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেই কেন যেন প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষটাকে ভাল লেগেছিল।

মানুষটার চরিত্রের মধ্যে একটা যেন উদ্ধত পৌরুষ ও দুর্জয় প্রতিজ্ঞা আছে। তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথাবার্তা—হাঁটা চলা সব কিছুই যেন আকৃষ্ট করেছিল তনিমাকে, তখনো অবিশ্যি নীলাদ্রি সম্পর্কে কোন কথাই শোনেনি তনিমা।

চাকরি নেবার পর ক্রমে ক্রমে নীলাদ্রি সম্পর্কে অনেক কথাই তার কানে আসে। লোকটা উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া এবং নারী জাতি সম্পর্কে নাকি একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে।

কিন্তু দিনের পর দিন নিকট সাহচর্যও কোন দিন এতটুকু অসৌজন্য প্রকাশ পায়নি তার প্রতি নীলাদ্রির ব্যবহারে।

ধীরে ধীরে তনিমার মন নীলাদ্রির প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। ক্রমশঃ সেই আকর্ষণ আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন—দুজনে পরস্পরের কাছাকাছি—ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

তাছাড়াও নীলাদ্রির চরিত্রের মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠতা ও আভিজাত্য ছিল, যেটা মুগ্ধ করেছিল তনিমাকে।

কিন্তু শিউলীর কাহিনী তার মুখ থেকে শোনবার পর নীলাদ্রির প্রতি তার সেই তীব্র আকর্ষণটা যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা নিয়েছে।

দুই নীলাদ্রিকে যেন তনিমা কিছুতেই মেলাতে পারছে না।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে এলো তনিমা।

সুবালা জেগেই ছিল—

দরজা খুলে দেন।

॥ ২৫ ॥

একটা ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলার একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢালা-ফরাসের উপর বসেছিল নীলাদ্রি হাটখোলার মেজবাবুর বেশে—পাশে বসে রাসমণি—

তাহলে তুমি ভালবাসতে হারাধনকে, রাসমণি—

ও-হারামজাদার কথা আর বলবেন না—ছোটলোক—

কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে একদিন, সে তোমাকে ভালবেসেছিল—

মুখে আগুন অমন ভালবাসার—খ্যাংরা মারি হাজারটা! স্বার্থ—বুঝলেন বাবু স্বার্থ—তখন তো বুঝিনি, মতলব করে সোহাগ জানাচ্ছে।

মতলব! কার—

নয়ত কি—ফাঁসিয়ে দিতে পারি না—সারাটা জীবন জেলের ঘানি টানাতে পারি এখনো হারামজাদাকে, বুঝলেন বাবু—

যাঃ, কি যে বলো—

মাইরি বলছি বাবু—এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—

আহা, থাক থাক—শোন, আজ আমি উঠবো—এই দুশো টাকা রাখ—দু-চার দিন হয়ত আসতে

পারব না—

হাটখোলার মেজবাবু উঠে দাঁড়ায় যাবার জন্য।

এখনি উঠবেন—

হ্যাঁ—কাজ আছে একটু—

আসেন আর চলে যান বাবু—একটা রাতও তো আজ পর্যন্ত কাটালেন না এখানে—

কাটাবো কাটাবো—বলতে বলতে আদর করে রাসমণির থুতনিটা নেড়ে দেয়। একটা রাত কেন, রাতের পর রাত কাটাবো—চলি আজ।

হাটখোলার মেজবাবু ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তনিমা শয্যায় শুয়ে ভাবছিল শিউলীর কথাই।

শিউলী বলেছিল—

কতক্ষণ ঐ অবস্থায় অন্ধকার গুদামঘরটার মধ্যে ধূলিভরা মেঝের উপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, জানে না শিউলী—

একসময় জ্ঞান ফিরে এলো। অন্ধকার—

অসহ্য বেদনায় যেন শরীরটা একেবারে অসাড়, অবশ—

আবার চোখ বুজল—

কখন সকাল হলো—কখন দিন ফুরিয়ে গেল বাইরে, শিউলী জানতেও পারল না। কখন রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে এলো, তাও জানল না।

পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো যখন, ধীরে ধীরে উঠে বসে শিউলী, অন্ধকারেই মেঝের উপর।

অন্ধকারে একটা শব্দ—

দরজা খোলার শব্দ যেন।

চোখ তুলে তাকাল শিউলী—এক হাতে একটা হ্যারিকেন, অন্য হাতে একটা খাবারের থালা। কেষ্ট এসে ঘরে ঢুকল।

বাঃ এই যে উঠে বসেছিস দেখছি—নে খেয়ে নে—

তুই করে কথা বলল আজ কেষ্ট—অথচ এতদিন তুমি দিদিমণি ছাড়া তাকে সম্বোধন করবার সাহস ছিল না—

কেষ্ট বলে, আমি কি আর ইচ্ছে করে তোকে মেরেছি রে—গিন্নি-মার হুকুম—জানিস তো—বুক আমার ভেঙে গেছে রে তোকে মারতে—

কেষ্টর কথার কোন জবাব দেয় না শিউলী।

খেয়ে নে না—ক্ষিদে পায়নি?

জাবাব নেই শিউলীর।

এখানে আর থাকবি কি করে—গিন্নীমা যেরকম চটে গেছেন, হয়ত আবার বেত মারবেন। তার চাইতে এক কাজ করবি?

কি?

আমি তোকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারি—

পার—পার কেষ্ট, আমাকে এখান থেকে বের করে দিতে—আগ্রহভরে প্রশ্ন করে শিউলী।

পারি—কিন্তু আমি যা চাইবো, দিতে হবে—

কেষ্টর চোখ দুটো অন্ধকারে চকচক করে ওঠে।

পারি—

কিন্তু স্বল্প আলোয় কেষ্টর চোখের দিকে তাকিয়ে শিউলী যেন কেমন গুটিয়ে যায়—

কি বল, যাবি?

না—

কেন রে? শোন আমি তোকে দাদাবাবুর কলকাতার বাসায় পৌঁছে দেবো—

দেবে—সত্যি দেবে, বলছো?

দেবো।

তবে আমি যাবো—

ঠিক তো?

ঠিক।

ঠিক আছে—জেগে থাকিস রাত্রে, আমি আসবো—

কেষ্ট চলে গেল।

বসেই ছিল অন্ধকারে শিউলী।

একসময় আবার ঘরের তালা খুলে গেল—অন্ধকারে কেষ্টর গলা শোনা গেল, আয় বের হয়ে আয়—

বের হয়ে এলো শিউলী গুদামঘর থেকে দু রাত পরে।

সেখান থেকে স্টেশনে—সেই রাত্রেই গাড়িতে উঠে বসল ওরা।

শেষরাত্রের দিকে ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছে—কেষ্ট ওকে বলল, চল, এখানে নামব—

এখানে কেন, কলকাতায় যাবে না?

যা বলছি, শোন—

হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিল কেষ্ট শিউলীকে। ঐ জায়গা থেকেই মাইল দুই দূরে কেষ্টর বাড়ি।

কেষ্ট শিউলীকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তুলল।

তারপর কটা রাত কি অকথ্য অত্যাচার—কোনমতে এক রাত্রে শিউলী পালাল সেখান থেকে। রাস্তায় বেঁধে হয়ে ছুটতে লাগল।

সরাটা রাত ধরে ছোটে।

রাত শেষ হয়ে আসে। একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। কিন্তু ও জানত না যে ইতিমধ্যে কেষ্ট ওর পালানোর কথা জানতে পেরে ওকে অনুসরণ করে আসছিল—পিছন পিছন—

হঠাৎ দূরে শিউলী কেষ্টকে দেখতে পায়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দেয়, দরজাটা খুলুন না—কে আছেন, দরজাটা খুলুন না দয়া করে—আমার বড় বিপদ—

খুলে গেল দরজা—হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে আটকে দিতেই একটি মহিলাকে শিউলী দেখতে পেল। মহিলার বয়স হয়েছে।

কে তুমি—মহিলা শুধান।

আমাকে বাঁচান—একটা শয়তান আমার পিছু নিয়েছে—

কোন ভয় নেই—তুমি বোস।

ভদ্রমহিলা একজন নার্স। মিস দাশ—

মিস দাশই ওকে আশ্রয় দিলেন। এবং যথাসময়ে একদিন একটি মেয়ে-সন্তানের জন্ম দিল শিউলী।

শিউলী বলে, একে নিয়ে এখন আমি কি করি, দিদি—কি পরিচয় দেবো ওকে?

তুমি অত ভাবছো কেন? একটা ব্যবস্থা হবেই।

একটা ব্যবস্থা হবে মিস দাস বললেও শিউলী যেন ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারাই দেখতে পায় না—

মেয়ে একটু একটু বড় হয়—হামা দেয়—হাঁটে—

কিন্তু মানুষ করতে হবে মেয়েকে—আর সবচাইতে বড় কথা—তার মত দুর্ভাগ্যের বোঝা যেন জীবন-ভোর ওকে টেনে বেড়াতে না হয়।

মন স্থির করে ফেলল শিউলী—মেয়েকে মানুষ করে তুলতে হলে অর্থেরও প্রয়োজন। মিস দাশের হাতে চিরদিনের মত সন্তানকে তুলে দিয়ে এক রাত্রে শিউলী কলকাতায় চলে এলো।

দিদি, যতদিন না আমি টাকা রোজগার করে পাঠাতে পারি, তুমি ওর সব কিছু চালিয়ে নিও—টাকা আমি রোজগার করবই—রোজগার হলেই পাঠিয়ে দেবো—বলেছিল শিউলী।

কিন্তু রোজগারের জন্যে কলকাতায় যাবার কি দরকার ছিল রে—এখানে থেকেও তো—

না, দিদি—ওর সঙ্গে তো কোন সম্পর্ক আজ থেকে আর আমার রইলো না।

সে কি রে—

হ্যাঁ—আমার সম্পর্কে ওকে কি আমি কলঙ্কিত হতে দিতে পারি—আমার দুর্ভাগ্যের জন্য ও তো দায়ী নয়—

কিন্তু একদিন ও যদি জানতে চায়, কে ওর মা, কে ওর বাপ—

বলো—বলো তোমারই সন্তান ও—তুমি-ই ওর মা। তবে যদি কোন দিন তেমন প্রয়োজন হয় আমার মৃত্যুর পর ওকে জানাতে পার ইচ্ছে করলে ওর দুর্ভাগিনী মায়ের কথা।

শিউলী ভাবছিল কলকাতায় পৌছতে পারলে, সে কি একটা পথ খুঁজে পাবে না—নিশ্চয়ই পাবে

কিন্তু কলকাতা শহরে পা দেবার পরই শিউলি বুঝতে পারে, শহরটা যতই বড় হোক যতই ঘর বাড়ি ও মানুষ জন থাক না কেন, এখানে তার মত এক যুবতী নিরাশ্রয় মেয়ের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার কোন একটা উপায় খুঁজে পাওয়াই বুছি দুঃসাধ্য।

বিশেষ করে তার দেহের ভরা যৌবন আর রূপটাই বুঝি তার বাঁচবার পথে সব চাইতে বড় কাঁটা।

পথ চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে যেন প্রতিটি মানুষের চোখের দৃষ্টি তাকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, কেবলই মনে হয় তার, এ কোথায় এলো সে। পথে পথে হেঁটেই চার-পাঁচটা দিন কেটে গেল শিউলীর।

ঝিয়ের কাজের বিনিময়েও কোথায়ও সে একটু আশ্রয় পায় নি। ক্রমশঃ হাতের পয়সা ফুরিয়ে আসে। ফুটপাথে বসে বসেই বিশ্রাম নেয়—চোখ বুজতেও বুঝি সাহস হয় না প্রথম রাত্রির এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর।

ক্লান্ত-অবসন্ন শিউলী ঘুমিয়ে পড়েছিল একটা গাছের তলায় প্রথম রাত্রে—কোথাও কারো গৃহে কোন আশ্রয় না পেয়ে—হঠাৎ মাঝরাত্রে একটা বিজাতীয় স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল।

একটা জোয়ান মদ্দ কুলী শ্রেণীর লোক তাকে প্রায় বুকের মধ্যে চেপে ধরেছে—শিউলী জানত না, লোকটা দুপুর থেকে তাকে অনুসরণ করছে—এবং কেমন করে যেন জানতে পেরেছিল তার নিরাশ্রয় অবস্থার কথাটা।

ধড়মড় করে উঠে লোকটাকে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালায় শিউলী—লোকটাও তার পিছু নেয়—ভাগ্যি একটা পুলিসকে পেয়েছিল রাস্তায়—কোনমতে রক্ষা পেয়েছিল তারপর।

তারপর থেকে রাত্রে আর ঘুমতে সাহস হয়নি।

শ্রান্ত-ক্লান্ত শিউলী বিকেলের দিকে চার দিনের দিন গঙ্গার ঘাটে এসে বসেছিল—এক প্রৌঢ় গঙ্গার স্নান করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছে, ও জানতেও পায়নি—

স্নানের পর প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার সামনে এসে দাঁড়ায়, তুমি কে গা? কাদের বাড়ির মেয়ে? তখন থেকে দেখছি, বসে আছো, এখানে কোথায় থাক?

শহরে আমি নতুন এসেছি—

প্রৌঢ়ের কথায় কেমন আকৃষ্ট হয়েই জবাব দেয় শিউলী।

এখানে কে আছে তোমার?

কেউ নেই—

কোন আত্মীয় স্বজন, কেউ নেই?

না।

বিয়ে থা হয়নি, মনে হচ্ছে।

না।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছো নাকি?

বাড়ি আমার নেই —

আচ্ছা, তাহলে কি করবে?

জানি না।

আমার বাড়িতে যাবে, কাছেই কালীঘাটে আমি থাকি।

আমায় চাকরি দেবেন একটা?

কি কাজ জান?

রান্নাবান্না—ঝিয়ের সব কাজ জানি, চাকরি দেবেন?

চল তাহলে—আমার বাড়িতেই কাজ দেবো।

শিউলী উঠে দাঁড়াল।

ছোট্ট সংসার ভদ্রলোকের। স্ত্রী গত হয়েছে—একটি মেয়ে, দুটি ছেলে আর নিজে।

বড় ছেলেটি বাইরে বিদেশে কোথায় চাকরি করে—ছোটটি কাছেই থাকে, বয়স ছাব্বিশ সাতাশ—কোন একটা কারখানায় চাকরি করে।

মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, শ্বশুরবাড়ি কৃষ্ণনগর।

কটা দিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেল, কিন্তু এক রাত্রে ঘুমভেঙে গেল, আবার বিজাতীয় স্পর্শে।

প্রৌঢ় ঐ দিন সকালে মেয়ের বাড়িতে কৃষ্ণনগর গিয়েছে—বাড়িতে ছিল মাত্র ছোট ছেলে ও সে।

আস্তে উঠে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু পাবে না—

প্রৌঢ়ের ছোট ছেলে রতন—

চুপ—চেঁচাবি তো খুন করে ফেলবো—

রতন ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর—আবার সেই রাত্রেই পথে গিয়ে নামল শিউলী—

তার পরই দিন কয়েক বাদে আশ্চর্য রকম ভাবে বাঈজী সরস্বতী বাঈয়ের সঙ্গে দেখা হলো—বাঈজী তাকে গৃহে আশ্রয় দিল।

তার কাছেই গান-বাজনা শিখল শিউলী—কিন্তু সরস্বতীবাঈও তাকে নিষ্কৃতি দিল না—কৌশলে ঐ গানবাজনার সঙ্গে টেনে নিয়ে দাঁড় করাল বেশ্যাবৃত্তির মধ্যে।

শিউলী যে হাঁপিয়ে ওঠে। মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্‌ করে।

ঐ সময়ে এলো তার জীবনে এক ধনী জমিদার পুত্র, তাকে আশ্রয় করেই শিউলী নতুন ঘর বাঁধল অন্যত্র একদিন।

বছর দুই পরে লোকটা মারা যখন গেল, শিউলী নিজের পায়ে নিজে তখন দাঁড়িয়েছে।

শিউলী মরে গেল। জন্ম নিল চম্পাবাঈ।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐ সময় দেহে নানা ব্যাধি দেখা দেয়—অসুস্থ হয়ে পড়ে শিউলী। তবুও অর্থের প্রয়োজন—বিশেষ করে মেয়ে রাণুর জন্য। তাই অসুস্থ অবস্থাতেও নাচ-গান করতে হতো তাকে।

এইভাবেই যখন চলছে, তখন এক রাত্রে এলো দুর্ভাগ্যের চরম আঘাত।

বদ্রীপ্রসাদের হত্যাপরাধে তাকে পুলিস গ্রেপ্তার করলো।

নীলাদ্রি সব শুনেছিল তনিমার মুখ থেকে—আগাগোড়া সমস্ত কথা।

তনিমা বলছিল, আশ্চর্য ভালবাসা—আশ্চর্য শ্রদ্ধা—শুধু আপনার জন্যেই সে মুখ খোলেনি—সমস্ত দুর্ভাগ্য ও চরম লজ্জাকে নিঃশব্দে মাথা পেতে নিয়েছে।

॥ ২৬ ॥

আবার আদালত গৃহ।

প্রসিকিউশন কাউন্‌সেল সাম আপ করছিলেন, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা এইটাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে it's a case of deliberate murder —অর্থের জন্য বাঈজী চম্পা হতভাগ্য বদ্রীপ্রসাদকে সে-রাত্রে তীব্র বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। মহামান্য বিচারপতি ও মাননীয় জুরি মহোদয়গণকে আমার অনুরোধ যে সর্বদিক ভালভাবে বিবেচনা করে এই মামলায় যেন তাঁরা তাঁদের সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন।

প্রসিকউসন্ কাউন্‌সেল বসবার পরই আসামীর পক্ষের ব্যারিস্টার অনিল সেন উঠে দাঁড়াল—মি লর্ড! চম্পাবাঈয়ের কেসের ব্যাপারে আমার আরো কিছু বলবার আছে—

বলুন—জজ বললেন।

আমার সিনিয়র ব্যারিস্টার নীলাদ্রি চৌধুরী এই মামলার সমস্ত স্বাক্ষীদের আরো কিছু প্রশ্ন করতে চান—

কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন ও জেরাইত শেষ হয়ে গিয়েছে—প্রসিকিউসন্ কাউন্‌সেল বলেন।

আমার বন্ধু লার্নেড্ প্রসিকিউসন কাউন্‌সেলের কথা আমি অস্বীকার করছি না—কিন্তু ইতিমধ্যে

পুলিস আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছে, যার দ্বারা আমরা আশা করছি, প্রমাণ করতে পারবো, চম্পাবাঈ সম্পূর্ণ নির্দোষ! এই আমাদের পিটিশন—

জজ সাহেব পিটিশনটা পড়ে ব্যারিস্টার সেনের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

আদালত সেদিনকার মত স্থগিত থাকলো।

কিন্তু মুশকিল বাধল নীলাদ্রির ওকালতনামা নিয়ে।

জেলে গিয়ে পরের দিন অনিল সেন যখন চম্পাবাঈকে সেই ওকালতনামায় সই করতে বললেন, চম্পা সই করতে অস্বীকৃত হলো।

বললে,—কোন প্রয়োজন নেই আমার—

এ তুমি কি বলছো চম্পাবাঈ—তুমি কি বাঁচতে চাও না?

না। এ-সব আর আমার ভাল লাগছে না।

পাগলামী করো না চম্পা আমরা প্রমাণ করবো, তুমি নির্দোষ—

আমি নির্দোষ নই—তাছাড়া কারো করুণা আমি চাই না—

করুণা—

নয় তো কি! অত বড় ব্যারিস্টার চৌধুরী সাহেবকে দেবার মত পয়সা তো আমার নেই—

তিনি তো কিছু চান না—বিনা পারিশ্রমিকে তিনি তোমার কেস defend করবেন, বলেছেন—

কিন্তু, কেন বলুন তো।

একজন নিরপরাধিনীর ফাঁসী হবে, হয়ত তাই তিনি—

তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন, কোন প্রয়োজন নেই আমার—

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন অনিল সেন।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করে, কি হলো, সেন!

না। সে সই করলো না। বললে, কারো দয়া সে চায় না।

তাহলে—

বুঝতে পারছি না, মিঃ চৌধুরী—কি করা যায়—

ঠিক আছে, আজকের রাতটা আমি ভেবে দেখি—

সেই রাত্রেই নীলাদ্রি তনিমাকে ফোন করল। তনিমা আর আসেনি এ পর্যন্ত তারপর।

তনিমা, একটিবার আসবে—তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

কি প্রয়োজন—

চম্পার ব্যাপারে—

তার ব্যাপারে তো সব শেষ হয়ে গিয়েছে—

না তনিমা, এখনো শেষ হয় নি—এখনো আমার শেষ কাজটুকু বাকী আছে—

আমি পারবো না।

Please —একটিবার এসো।

এলো তনিমা।

কেন ডেকেছিলেন?

বোস।

না, বলুন।

শিউলীকে যেমন করে হোক ফাঁসীর দড়ি থেকে আমায় বাঁচাতেই হবে—আর সে-ব্যাপারে একমাত্র তুমিই আমাকে আজ সাহায্য করতে পার—

আমি!

হ্যাঁ—

ওকালতনামার ব্যাপারটা খুলে বললে অতঃপর নীলাদ্রি তনিমাকে—যেমন করে হোক আমাকে তার সইটা ওকালতনামায় করিয়ে আনতেই হবে—নচেৎ আমার সব শ্রম ব্যর্থ হবে—

কিন্তু আমি—

আমি জানি, তোমাকে সে ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু আপনি কি বুঝতে পরছেন না, আজ তার defend নিয়ে আদালতে গিয়ে দাঁড়ালে আপনার

কত বড় ক্ষতি হবে—

কোন ক্ষতিই আজ আমার কাছে ক্ষতি নয়, তনিমা—বলবো, আমি বলবো প্রয়োজন হলে কি সম্পর্ক আমার এ চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে, কে আজ তার চরম দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী।

তনিমা বললে, না, না—এ অসম্ভব—এ কিছুতেই করতে দেবো না।

শান্ত সুন্দর হাসির একটা আভাস ফুটে ওঠে নীলাদ্রির ওষ্ঠপ্রান্তে। এবং শান্তকণ্ঠে সে বলে, তুমিও না একজন নারী, তনিমা—একথাটা তুমি বলতে পারলে কেমন করে! আর কেউ না জানুক, তুমি তো ওর সব জেনেছো—

তবু—তবু এ হতে পারে না—এভাবে আপনাকে আমি আজ সবার সামনে ধুলো-কাদার মধ্যে এসে দাঁড়াতে দেবো না। আপনার ভবিষ্যৎ এমনি করে নষ্ট হয়ে যেতে দেবো না—না কিছুতেই না—

তনিমা—

না, না—তা আপনি পারেন না— আপনাকে এ কাজ আমি করতে দেবো না—দুহাতে মুখ ঢাকল তনিমা।

তনিমা যেন আর দাঁড়াতে পারে না।

সোফাটার উপর বসে পড়ে দু হাতে মুখ ঢাকে।

আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

একস্মাৎ যে একটা প্রচন্ড বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে নীলাদ্রি, কয়েকটা মুহূর্ত তার গলা দিয়ে কোন স্বরই বের হয় না।

সে অবনতমুখী ক্রন্দনরতা তনিমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তনিমার কাছে দাঁড়ায়। ওর মাথায় একখানি হাত রেখে বলে, আশ্চর্য—এ যে আমি কোন দিন ভাবতেও পারিনি—

তনিমা তখনো দু হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

নিলাদ্রি আবার বলে, কিন্তু তনিমা, যে-গিঁট একদিন আমারই জন্যে পড়েছে, সে-গিঁট যে আজ আমাকেই খুলতে হবে।

না, না—

তাছাড়া আমার অন্যায়ের, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি না করলে আর কে করবে, বল! আর কেবল প্রায়শ্চিত্তই তো নয়—ও যে আজ নীলাদ্রি চৌধুরীর বিবেকের শেষ জবাব—শেষ বিচার—

অশ্রুভেজা দুটি চোখ তুলে তনিমা তাকাল নীলাদ্রির দিকে—

হ্যাঁ—তনিমা, কয়েকটা মন্ত্রপাঠ ও খানিকটা অনুষ্ঠানই তো বিবাহবন্ধনের একমাত্র ও শেষ কথা নয়— তা যদি হতো, সেদিন অমন করে নিরঙ্কুশ চিত্তে কি শিউলী তার সর্বস্ব আমার হাতে তুলে দিতে পারত, না এমনি করে এই দীর্ঘ বার বৎসর ধরে আমার সমস্ত অন্যায় ও অপরাধের বোঝাটা নিঃশব্দে ও ওর বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারত!

আপনি—কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না তনিমা।

নীলাদ্রি তখনো বলছে, ও তো আজ চম্পাবাঈ নয়—শিউলীও নয়—নীলাদ্রি চৌধুরীর সন্তানের জননী—

বলতে থাকে নীলাদ্রি, কি যন্ত্রণা যে এই কয়দিন সহ্য করেছি তনিমা—যদি জানতে— তারপর আমার যখন শেষ মীমাংসায় পৌঁছালাম—সমস্ত যন্ত্রণার যেন অবসান হলো।

গেল তনিমা আবার সেই জেনানা ফাটকে।

চম্পাবাঈ এসে সামনে দাঁড়াল।

কি চাই! আবার কেন এসেছেন?

এই ওকালতনামাটায় তুমি সই করে দাও, চম্পা—

না—

চম্পা—

না, না—কেন বিরক্ত করছেন এসে বার বার আমাকে আপনারা। আমি তো বলেই দিয়েছি,

সই আমি করবো না। মুক্তি আমি চাই না---প্রয়োজন নেই আমার—

ভুল একটা যদি সে করেই থাকে চম্পা, তার কি কোন ক্ষমা নেই?

ভুল। ভুল আবার কিসের---ভুল করতে যাবেন কেন তিনি, ভুল যদি কেউ করে থাকে, সে তো আমি—

শিউলী---জান না তুমি, সে আজ কত অনুতপ্ত---

অনুতাপ---অনুতাপ আবার কিসের—আর কেনই বা অনুতাপ। তাকে বলবেন---তার প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। কোন নালিশ নেই।

শিউলী—

অনুতাপ। আজ বুঝি অনুতাপের কথা মনে হয়েছে দীর্ঘ বার বছর পরে। কোথায় ছিল তার এই অনুতাপ এতদিন! কোথায় ছিল তার বিবেক-- সেদিন এক সরল বোকা গ্রাম্য মেয়ের ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তার সর্বস্ব হরণ করে চলে এসেছিলেন—আপনি বলতে চান, আজ তাঁরই কাছে গিয়ে আমি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দাঁড়াবো। না---কিছুতেই না—

কিন্তু শিউলী, তোমার সন্তান---

সন্তান—

হ্যাঁ, তোমার সন্তান—তুমি কি চাও না, সে তার জন্মদাতার পরিচয় পাক—

শিউলী যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

চাও না কি তুমি, সে সমাজের দশজনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াক; আজ সে ছোট, কিন্তু একদিন সে বড় হয়ে জানতে চাইবে যখন, সে তার সত্যিকারের জন্মদাতা বাপের পরিচয়টা—

নাই বা জানল সে-কথা—

কেন—কেন জানবে না। কোন্ অধিকারে তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে তুমি শিউলী, বলতে পার!

আমি—

হ্যাঁ, শিউলী---আজ কেবল তোমারই বাঁচার প্রশ্ন নয়---তার চাইতেও বড় তোমার সন্তানের প্রশ্ন তোমার সামনে। অভিমান তোমার যতই থাক, সেই অভিমানে তোমার সন্তানের এত বড় অনিষ্ট তুমি করতে পারো না---

করবো—আমি সই করবো--দিন—

শিউলি ওকালতনামায় সই করে দিলে।

॥ ২৭ ॥

সমস্ত আদালত গৃহ যেন আজ স্তব্ধ।

দর্শকের গ্যালারিতে লোক ঠাসাঠাসি। নতুন করে আজ চম্পাবাঈয়ের মামলা শুরু।

অপরাধীর কাঠগড়ায় চম্পাবাঈ।

কয়েকদিন হলো, সে যেন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ব্যারিস্টার নীলাদ্রি চৌধুরী সাক্ষীকে জেরা করছিল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হারাধন---

তোমার নাম হারাধন---

আজ্ঞে---

আচ্ছা হারাধন, তুমি আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছো, রাত প্রায় বারটায় তোমাকে চম্পাবাই ডেকে ঘুমের ঔষধ আনতে বলে---

আজ্ঞে--

ওষুধ নিয়ে তুমি ফিরে আস রাত দেড়টায়---

ঐ রকমই হবে---

কোন্ ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনেছিলে---মডার্ন ফার্মেসি তো--

হ্যাঁ---

ডাক্তাবাবুর বাড়ির কাছেই তো মর্ডান ফার্মেসি—

আজ্ঞে---

তা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে চারটে পাউডার মর্ডান ফার্মেসি থেকে আনতে দেড় ঘন্টা সময় লাগল—

তা লাগবে বইকি—

না—তা লাগতে পারে না—বড় জোর ঘন্টাখানেক—এখন বল ঐ বাকী সময়টা তুমি কি করছিলে? কোথায় ছিলে?

আমি তাহলে ডিস্‌পেনসারিতেই ছিলাম।

না ছিলে না—আমি বলছি, তুমি কি করেছিলে—কম্পাউন্ডার বাবু মিনিট পনের কুড়ির মধ্যেই পাউডার করে দেয়, তুমি বেরিয়ে আস—রাত সাড়ে বারটা।

আজ্ঞে কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি—তুমি ডিস্‌পেনসারি থেকে বের হয়ে আস যদি রাত সাড়ে বারটায়, তা রাত দেড়টা তোমার হলো কেন চম্পাবাঈকে পাউডারগুলো এনে দিতে—

আমি ডিস্‌পেনসারি থেকে বের হয়ে সোজা মার কাছেই চলে আসি—দেরি করিনি—

তুমি যে সোজা ডিস্‌পেনসারি থেকে চম্পাবাঈয়ের কাছে আসনি, তার প্রমাণ আছে—এবার আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও, হারাধন— কাম্পাউন্ডারবাবু যখন ভিতরে ওষুধ তৈরী করছিলেন, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

আজ্ঞে, কাউন্টারের ভিতরে—একটা টুলে বসেছিলাম—ওষুধ না নিয়ে তো আসতে পারি না—

ঘরের মধ্যে অন্যান্য ওষুধের আলমারির মধ্যে ছোট একটা আলমারিতে সব বিষ ঔষুধ ছিল, জান তুমি। তুমি তো আগেও অনেকবার ঐ ডাক্তারখানায় গিয়েছো, নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্য করেছো—কারণ আলমারির গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী ও বাংলায় 'বিষ' কথাটা লেখা ছিল—

তা দেখেছি বইকি।

দেখেছো তাহলে।

দেখেছি—

কম্পাউন্ডারবাবু সে-রাত্রে ঘুমের ওষুধ তৈরী করবার আগে ঐ আলমারি থেকে দুটো শিশি নিয়ে যাবার পর আলমারিটা খোলাই ছিল, তাই না?

মনে নেই—

আচ্ছা এই শিশিটা চেনা? চিনতে পারছো—কাগজে মোড়া একটা অ্যাট্রোপিনের শিশি বের করে দেখাল নীলাদ্রি হারাধনকে।

কিসের শিশি ওটা? হারাধন জিজ্ঞাসা করে।

এটার মধ্যে যে বিষ আছে, সেই বিষই আগরওয়ালাকে মদের সঙ্গে সে-রাত্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে তার মৃত্যু হয়। আর এই শিশিটা তুমি সে-রাত্রে কম্পাউন্ডারবাবু যখন ভিতরে ওষুধ তৈরী করতে ব্যস্ত, এর থেকে খানিকটা বিষাক্ত ওষুধ ঢেলে নিয়েছিলে—

কি যা-তা বলছেন, আজ্ঞে।

তুমি যে এই শিশিটায় হাত দিয়েছিলে, তার প্রমাণ আছে—নীলাদ্রি বলে।

প্রমাণ! কি প্রমাণ—হারাধন এতক্ষণে যেন কেমন একটু বিব্রত—গলার স্বরে দ্বিধা।

প্রমাণ এই শিশির গায়ে তোমার হাতের আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে—কেবল তাই নয়, বিষের খাতার রেকর্ডে এর মধ্যে যতটুকু ওষুধ থাকা উচিত, তাও নেই—গ্রেণ কুড়ি কম আছে—

আজ্ঞে ও-সব আমি কিছু জানি না।

মিঃ লর্ড—লোকটা যে মিথ্যে বলছে, তার প্রমাণ দেবে আদালাত আমি সে সব exhibit দাখিল করেছি, তার মধ্যে poisonous drugs এর record. ঐ শিশি ১নং ও ২নং exhibit আর পুলিসের সংগৃহীত finger print report অর্থাৎ আমার ৩নং exhibit.

নীলাদ্রি একটু থেমে আবার বলতে থাকে, মিঃ লর্ড। আমার ধারণা, সে-রাত্রে এ শিশি থেকে অ্যাট্রোপিন চুরি করে আরো চারটে পুরিয়া তৈরী করে হারাধন এবং সেই চারটে পুরিয়াই আসলে দিয়ে ছিল হারাধন চম্পাবাঈয়ের হাতে গিয়ে—এবং হারাধনকে কোথাও গিয়ে ঐ বিষ দিয়ে চারটে পাউডার তৈরী করতে হয়েছিল বলেই ওষুধ নিয়ে আসতে ওর অত দেরি হয়েছিল।

না, না—এসব মিথ্যে—বানানো কথা—চেঁচিয়ে ওঠে হারাধন।

না—মিথ্যে নয়—তাই সত্যি—আর চম্পাবাঈ বিষ দিয়েছিল, সেইটা প্রমাণ করবার জন্য পরে চম্পাবাঈ ঘুমোবার পর বিষের পাউডারগুলো সরিয়ে তিনটে ঘুমের পাউডার রেখে আসা হয়, তার দেরাজের উপরে—

না—না—না—দোহাই ধর্মাবতার, এসব মিথ্যে—মিথ্যে— হারাধন আবার চেঁচিয়ে ওঠে।

এবার আমি আবার আমার দ্বিতীয় সাক্ষী ডাঃ অধিকারীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসতে বলছি—

ডাঃ অধিকারী—

বলুন!

অ্যাট্রোপিনের লিথ্যাল ডোজ কত হতে পারে?

দু'গ্রেন থেকে আড়াই গ্রেন—

That's all! It is to be noted, Me Lord!

আদালত কক্ষে রীতিমত যেন একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়। হারাধনকে পুলিস কাস্টডিতে রাখা হয় নীলাদ্রির ইচ্ছাক্রমে জজসাহেবের নির্দেশে। পরের দিন আবার জেরা শুরু হয় আদালতে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দ্বিজেন পাড়ুই কমপাউন্ডার।

পাড়ুই, ঐ হারাধনকে কতদিন তুমি চিনতে?

তা অনেকদিন—একই গ্রামে বাড়ি আমাদের।

হারাধন কতদূর লেখাপড়া জানে?

আজ্ঞে, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল—

চম্পাবাঈয়ের ওখানে কাজ করার আগে ও কোথায় কাজ করত, জান কিছু?

আজ্ঞে, জানি বইকি—ওই মডার্ন ফার্মেসিতেই কাজ করতো—প্রায় বছর খানেক—

সে-চাকরি ও ছেড়ে দিয়েছিল?

না—মর্ডান ফার্মেসির কর্তা ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন।

কেন—

ওষুধ চুরি করে বিক্রি করতো তাই।

Thats all-এবার আমার চতুর্থ সাক্ষী রাসমণিকে কাঠগড়ায় আনা হোক।

তোমার নাম রাসমণি?

আজ্ঞে হুজুর।

ঐ হারাধনকে তুমি চেন?

চিনব না—অলপ্পেয়ে হাড়হাভাতে শয়তান মিন্‌সে।

হারাধনের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ—সত্যি কথা বল, এবং কতদিনের ঘনিষ্ঠতা?

ঐ বাড়িতে কাজ করতে এসে—বছর তিনেক হবে—

হারাধনকে আগে তুমি চিনতে না?

চিনতাম।

চিনতে? কি করে চিনলে?

এক গাঁয়ে বাড়ি যে আমাদের।

যে রাত্রে লোকটা মারা যায়, সে রাত্রে কখন হারাধন গিয়েছিল ওষুধ নিয়ে?

তা ঘন্টা দেড়েক হবে।

কে ওষুধ দেয় চম্পাবাঈকে, তুমি না হারাধন—

ঐ মিন্‌সে—

রাত্রে চম্পাবাঈ শোবার পর তুমি কি করলে?

নীচে গিয়ে শুয়ে পড়লাম—

তারপর?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধহয়, হঠাৎ হারাধনের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। ও আমার হাতে তিনটে পুরিয়া দিয়ে বলে—সেই পুরিয়াগুলো বাঈজীর ঘরে রেখে বাঈজীর ঘরের পুরিয়াগুলো চটপট নিয়ে আসতে—

এনেছিল তুমি?

হ্যাঁ—

Me Lord! that point is to be noted!

আচ্ছা রাসমণি—এবার আদালতকে বল—সে-রাত্রে আগরওয়ালার টাকার ব্যাগটা হারাধনের হাতে কি তুমি দেখেছিলে?

হ্যাঁ হুজুর—

হারাধন চেঁচিয়ে ওঠে—ও হারামজাদী মাগী মিথ্যে বলছে হুজুর—

মিথ্যে, রাসমণি চেঁচিয়ে ওঠে, অনামুখো মিন্‌সে মিথ্যে বলছি—ভাব, জানি না কিছু—দেখিনি তোমায় আমি ব্যাগটা ছুরি দিয়ে কেটে সব বের করে নিতে—

হারামজাদী শয়তানী—তোকে আমি খুন করবো—হারাধন আবার চেঁচিয়ে ওঠে—

খুন করবি—আয় না খুন কর—

একটা গোলমাল শোনা যায় আদালতে। জজ সাহেব বলে ওঠেন—

Order! order!

প্রসিকিউশন কাউন্‌সেল ঐ সময় বলে ওঠে, এসব কথা তুমি আগে আদালতে জানওনি কেন?

ওই মিন্‌সে তাহলে আমায় খুন করবে বলেছিল—তাছাড়া ও বলেছিল, আমায় বিয়ে করে ঘর বাঁধবে।

আদালতে একটা হাসির রোল ওঠে।

রাসমণি বলতে থাকে, তখন কি জানি—ও মিন্‌সে দমবাজ—মিথ্যুক অলপ্পেয়ে ড্যাকরা—

নীলাদ্রি বলতে থাকে, Me Lord এটা ঠিকই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে সে-রাত্রে অসুস্থ, ক্লান্ত চম্পাবাঈ মাতাল বদ্রীপ্রসাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ঘুমের ওষুধ তার মদের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিল—এবং ঘুমের ওষুধ হাতের কাছে না থাকায় হারাধনকে বলে ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসতে—ডিস্‌পেনসারি থেকে হারাধন তাকে যে পুরিয়াগুলো এনে দেয় তারই একটা পুরিয়া মদের সঙ্গে সে মিশিয়ে দেয়—এবং সে পুরিয়ার ওষুধ মেশানো মদ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বদ্রীপ্রসাদের মৃত্যু হয়—কিন্তু সে বিষ হতভাগিনী চম্পাবাঈ বদ্রীপ্রসাদের মদের গ্লাসে মিশিয়ে দিলেও সেটা যে তীব্র বিষ, তা না জেনেই সে দিয়েছিল—এবং আদালতে এও প্রমাণ হয়েছে রাসমণির সাক্ষ্য ও অন্যান্য exhibits থেকে যে সে বিষ সংগ্রহ করেছিল হারাধনই সে-রাত্রে—বদ্রীপ্রসাদের ঐ টাকাগুলো হাতাবার লোভে।

প্রসিকিউশন কাউন্‌সেল ঐ সময় বলেন, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যে চম্পাবাঈয়ের মত এক জঘন্য চরিত্রের বারনারীর আদৌ হাত ছিল না, তারই বা প্রমাণ কি?

আমার মাননীয় বন্ধুকে সে প্রমাণও অবশ্যই আমি দেবো বৈকি—কিন্তু তার আগে ঐ চম্পাবাঈ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই—দুর্ভাগ্য মানুষকে এক এক সময় কোথায় যে কোন্ অন্ধকার অতলে টেনে নিয়ে যায়—তার সব কিছুকে গ্রাস করে—তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ঐ চম্পাবাঈ। আসামীর কাঠগড়ায় হত্যাপরাধে ঐ যে দাঁড়িয়ে মেয়েটি—

আদালত যেন একেবারে স্তব্ধ!

ছুঁচপতনের শব্দটুকুও বুঝি শোনা যাবে কান পাতলে।

নীলাদ্রি বলতে থাকে—

চম্পাবাঈ—ওর আসল নাম শিউলী—ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে ও সৌদামিনী দেবী নামে এক সহৃদয়া ভদ্রমহিলার আশ্রয়ে মানুষ হয়। When she was an innocent girl of seventeen or eighteen only, সেই সময় একটি উচ্ছৃঙ্খল ধনী ঘরের যুবক ওর জীবনের পথে এসে দাঁড়ায়, and who convinced her that he loved her and would marry her.

হঠাৎ অপরাধীর কাঠগড়া থেকে চেঁচিয়ে ওঠে চম্পাবাঈ, না, না—সব মিথ্যা, সব মিথ্যা—আমার নাম কোন দিনও শিউলী ছিল না— আমার নাম চম্পাবাঈ—নর্তকী বাঈজী বেশ্যা আমি, চম্পা—

না—তোমার আসল ও সত্যি নাম শিউলী—শিউলী চৌধুরী—প্রতিবাদ জানায় নীলাদ্রি এবং এও সত্যি, yes Me Lord, সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের প্রতারণা ও নীচতাই একদিন ঐ হতভাগিনীকে ওর এই বর্তমান জীবনে টেনে এনেছে—

না, না, না—আমি জন্ম থেকেই নর্তকী বাঈজী—কাউকে আমি চিনি না—কারো সঙ্গে কোন দিন আমার পরিচয় ছিল না—সব—সব—মিথ্যা—

॥ ২৮ ॥

নীলাদ্রি বলতে থাকে—

মি লর্ড, আমি প্রমাণ করবো, ছিল—this poor girl is still trying to save that man—যে ওর জীবনের সমস্ত সর্বনাশ লজ্জা ও অপমানের কারণ—এবং আমি তাকে চিনি—যাই হোক যা বলছিলাম—সেই যুবক বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওকে ভোগ করবার পর ওকে একদিন ফেলে পালায় তার তৃষ্ণা মিটে যেতেই—তারপর দীর্ঘ বার বছর কোন সংবাদই সে আর রাখেনি—রাখবার প্রয়োজন অবিশ্যি বোধ করিনি। আর ইহজীবনেও বোধহয় সে করতোও না, যদি না চম্পাবাঈকে আজ হত্যার অপরাধে ঐ কাঠগড়ায় এসে বার বছর পরে দাঁড়াতে সে দেখতে পেত।

জজ বাধা দিলেন, If you have got anything relevant to say about that girl in connection with this case. সেই কথাই বলুন।

সেই কথাই বলবো এবারে। চম্পাবাঈ লোকের চোখে, সমাজের চোখে নর্তকী ও বাঈজী হলেও সে ঠিক ঐ শ্রেণীর নয়—এবং জীবন ধারণের জন্য নেহাত অনন্যোপায় হয়েই ওকে নাচ-গান করতে হয়েছে—কোন দিনই তার পক্ষে একজন নিরীহ ব্যক্তিকে বিষ দিয়ে হত্যা করা—সম্ভব নয়—ঘটনাচক্রে সে হত্যার মামলায় জড়িয়ে পড়েছে—দুর্ভাগ্য ওর। তবে তারও আগে আদালতকে জানাতে চাই আমি, সে রাত্রে কি হয়েছিল। তাই আমার ২নং সাক্ষী এবারে দরোয়ান কিষেণলালকে ডাকা হোক—

কিষেণলাল কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়াল কাঠগড়ায়।

কিষেণলাল তোমার নাম? নীলাদ্রি শুধোয়।

জী!

দেখো, ইয়ে আদালত হ্যায়—আদালতকা সামনামে সাচ্ সাচ্ বাতাও—ওহি বাতমে কিতনি বাজে হারাধন ফির ওয়াপস আয়া দাবাই লেকর—

জী সাড়ে বারা বাজে করিবন—

আতেহি উসনে উপর চলা গিয়া—

নেহি—বগলওয়ালা কামরা মে ঘুসা—দশ পনরো মিনিট বাদ উপর গিয়া।

কিষেণলাল, আভি বাতাও—ঐহি রাত মে—তুমি আউর কুছ্ দেখা থা? নীলাদ্রি প্রশ্ন করে।

জী—

কেয়া দেখা তুমনে!

রাত উসবখত দো সোয়া দো হোগী—বগলওয়ালা কামরামে—যিসমে হারাধন রতা থা—রাসমণি ভি ওহি কামরামে আয়ি—হারাধন আউ রাসমণিকে রূপায়াকো বারে মায় নে বাত্ চিৎ শুনা—হাম বগলওয়ালা কামরামে চুপচাপ শো গিয়া—

উস্‌কি বাদ!

হামনে দেখা বহুৎ রুপেয়াকা নোট—হারাধন একঠো গাটরি মে বাঁধতা আর রাসমণি সামনামে খাড়ি হ্যায়—হ্যাম ত শ্রিফ্ তাজ্জব বন্‌গিয়া—ওৎনা রূপেয়া উসকো কিধার সে মিলা—হাম কামরামে ঘুস্ গিয়া—উয়ো দোনে হামে দেখ্‌কার চমক উঠি—

উস্‌কি বাদ?

হারাধন হামকো চারশো রূপেয়া দিয়া আউর বোলা—কোই কিসিকো রূপেয়াকো বারেমে বাতানে সে উয়ো হামে জানসে মার ডালেগা—সরকার ইস্‌মে হামারা কোই কসুর নেহি হ্যায়—শ্রিফ্ জানকি ডরসে—হাম চুপচাপ হো গিয়া—

That's all, my Lord! এবারে আমি সে-রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল, ঘটনার যে চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল সেই রাসমণিকে আবার আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আদলতকে—

রাসমণি আদালতের নির্দেশে আবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

রাসমণি এবারে তুমি আদালতে সকলের সামনে বল সে-রাত্রে কি হয়েছিল।

হুজুর—দোহাই ধর্মের। আজ আমি সব সত্যি বলবো। রাত তখন প্রায় পৌনে এগারটা হবে বদ্রীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে যে বাবুটি এসেছিলেন তিনি চলে গেলেন—কিন্তু বদ্রীপ্রসাদ গেল না।

বদ্রীপ্রসাদ সে-রাত্রে খুব মদ খেয়েছিল তাই না! নীলাদ্রি প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ হুজুর—বাঈজীর দেহটা ইদানীং আদপেই ভাল যেত না—পেটের ব্যথায় প্রায়ই কাতরাতো—বিছানায় শুয়ে থাকত। আগের দিনও পেটের ব্যথায় সারাটি দিন বিছানায় শুয়ে ছিল।

তারপর?

সে-রাত্রে বদ্রীপ্রসাদের বন্ধু সমীরণবাবু চলে যাবার পর একসময় রাসমণির নজরে পড়ে, হারাধন দরজার ফাঁক দিয়ে কি যেন দেখছে চম্পাবাঈয়ের ঘরে, রাসমণিও অন্য একটা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখছিল।

চম্পাবাঈ গাইছিল—

বদ্রীপ্রদাস ব্যাগটা খুলে দেখায়—দেখো পিয়ারী, বহুৎ বহুৎ রূপেয়া হ্যায় হামারা পাস—মেরে জান, মেরে লায়লী, সব কুছ্ তেরে লিয়ে—নাচো গাও—

গান শেষ হতে পরিশ্রান্ত চম্পা বলে, বহুৎ পরেশম হ্যায় বাবুজী—মেরা তবিয়ৎ ভি আচ্ছা নেহি হ্যায়—আজ মুঝে ছোড় দিজিয়ে—

নেহি নেহি—

বদ্রীপ্রসাদ বার বার বলতে থাকে, গাও—গাও—

রাত বহুৎ হো গেয়ি বাবুজী—

যানে দো—ইয়ে রাত ফির না আয়েগী চম্পাবাঈ—গাও—নাচো—

থোড়া বৈঠিয়ে, আভি ম্যায় আতি হুঁ—

চম্পা উঠে পড়ে—

হারাধন চট্ করে সরে যায় চম্পা ঘরে ঢুকে ঘুমের ওষুধ খোঁজে, নেই—তখন সে হারাধনকে ডেকে বলে, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে আনতে। হারাধনকে পাঠিয়ে দিয়ে চম্পাবাঈ আবার ঘরে ফিরে যায়।

ফের গান শুরু করে-

তারপর? নীলাদ্রি শুধায়।

রাসমণি বলতে থাকে, হারাধন এক সময় ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো।

তুমি তখন কোথায় ছিলে?

উপরের বারান্দায়।

তারপর কি হলো?

আমাকে হারাধন বললে বাঈজীকে ডেকে আনতে। আমি গিয়ে ঘরে ঢুকে বাঈজীকে ইশারায় ডেকে নিয়ে এলাম।

বাঈজী হারাধনকে শুধায়, ফিরে এলেছিস?

হ্যাঁ মা—এই যে!

হারাধন চারটে পুরিয়া চম্পাবাঈজীর হাতে দেয়।

তারপর—

বাঈজী হারাধনকে বিদায় দিয়ে পুরিয়া থেকে একটা নিয়ে বাকী তিনটে পুরিয়া শোবার ঘরে দেরাজের উপরে একটা কৌটোর মধ্যে রেখে পাশের ঘরে ফিরে গেল।

তারপর?

আমি আর হারাধন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকি।

বলে যাও—

চম্পাবাঈ ঘরে ফিরে আবার গান শুরু করে। লোকটা তখন বেহেড মাতাল।

গান গাইতে গাইতেই এক ফাঁকে কৌশলে চম্পাবাঈ হাতের পুরিয়াটার সব ওষুধ গ্লাসে ঢেলে দেয়—একটু পরেই সেই গ্লাস থেকে মদ খেয়ে লোকটা শুয়ে পড়ে শয্যায়—

শুয়ে পড়ল?

হ্যাঁ, বাঈজী তখন লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে গান বন্ধ করে ঘর থেকে উঠে আসে নিজের

শোয়ার ঘরে।

তারপর—

তারপর আমাকে ডেকে বলে, লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে, আমারও ভীষণ ঘুম পেয়েছে—তোরা শুতে যা। চলে গেলাম আমি নিজের ঘরে।

কিন্তু ঘুম এলো না আমার চোখে।

কেন?

হারুর চোখে আমি যেন সে-রাত্রে কেমন দৃষ্টি দেখেছিলাম। মনের মধ্যে একটা সন্দেহের কাঁটা খচ্‌খচ্ করছিল—এক সময় উঠে পড়ে উপরে গেলাম, সেই ঘরে ঢুকে দেখি হারু ঝুঁকে পড়ে ঘুমন্ত বাবুটিকে পরীক্ষা করছে—হাতে তার সেই লোকটার টাকার ব্যাগটা।

হারাধন আবার চেঁচিয়ে ওঠে, মিথ্যে। হুজুর, সব মিথ্যে—ও আমাকে ফাঁসাবার মতলবে ঐ সব বলছে—

রাসমণি বলে ওঠে, না হুজুর এক বর্ণোও মিথ্যে নয়।

নীলাদ্রি বলে, বল, তারপর তুমি কি করলে?

আমি ডাকলাম, হারু—

হারাধন চম্‌কে ওঠে—কে?

কি করছিস? রাসমণি বলে।

চুপ! কথা বলসি না। চল এ-ঘর থেকে।

কোথায়?

নীচে।

ব্যাগটা নিচ্ছিস কেন?

অনেক টাকা আছে এতে। চল তাড়াতাড়ি।

কিন্তু কাল সকালে লোকটা যখন টাকার ব্যাগ খোঁজ করবে—তোকে আর আমাকেই লোকে সন্দেহ করবে—

কচু করবে—আর চাইবে কে। ও তো মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

সে কি?

হ্যাঁ—

কি করে মরল?

বিষে—কাল এসে পুলিসের লোক আমাদের ধরবে না—ধরবে বাঈজীকে। তারা ধারণা করবে, টাকার লোভে বাঈজী ওকে বিষ দিয়ে মেরেছে—চল—নীচে চল—শীগ্‌গিরি—চল, নীচে চল।

তারপর? নীলাদ্রি শুধায়।

দু'জনে নীচে গেলাম—রাসমণি বলতে থাকে—ব্যাগ কেটে টাকা বের করে হারু যখন গুনছে, দরোয়ান এসে ঘরে ঢোকে। তখন হঠাৎ হারু দরোয়ানকে কিছু টাকা দিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়ে বিদায় করে।

দরোয়ানটা ভীতু মানুষ—হারাধনের কাছ থেকে টাকা পেয়ে ভয়ে সুড়সুড় করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তারপর হারাধন কি করল?

হারাধন তখন পকেট থেকে তিনটে পুরিয়া বের করে আমাকে বলে, যা—চট্‌পট্ উপরে চলে যা—বাঈজী ঘুমোচ্ছে—বাঈজীর দেরাজের উপর যে-তিনটে পুরিয়া আছে—সে-তিনটে নিয়ে আয় এই তিনটে রেখে। হুজুর ধর্মবতার যেমন যেমন ও বলেছে, আমি করেছি—তখন কি জানি, অলপ্পেয়ে মিন্‌সে বাঈজীর হাতে চারটে বিষের পুরিয়া দিয়েছিল। হুজুর ঐ শয়তানটার নিশ্চয়ই বাঈজীকেও মারবার ইচ্ছা ছিল সে-রাত্রে—ভাগ্যে বাঈজী সে-রাত্রে ঘুমের ওষুধ খায়নি—ধর্মবতার, ঐ মিন্‌সেই বাবুটিকে বিষ দিয়ে টাকার জন্য খুন করেছিল—বাঈজী কিছু জানে না—সে নির্দোষ—

সমস্ত আদালত একেবারে স্তব্ধ।

নীলাদ্রি এবার বলতে শুরু করে—

Me Lord and gentlemen of the jury, গত কয়দিনের রাসমণি, কিষেণলাল, কম্পাউন্ডার

প্রভৃতির সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে how tactfully হারাধন বদ্রীপ্রসাদের টাকাগুলো সে-রাত্রে আত্মসাৎ করবার জন্যে poor চম্পাবাঈয়ের হাতে ঘুমের ওষুধের বদলে বিষের পুরিয়াগুলো তুলে দিয়েছিল এবং মদের সঙ্গে সেই বিষ পান করে কিভাবে বদ্রীপ্রসাদের মৃত্যু হয—এবং ঘটনাচক্রে হত্যার অপরাধ কি করে ঐ সম্পূর্ণ নির্দোষ চম্পাবাঈয়ের উপরে এসে পড়ে--এবং ওকে ঐ কাঠগডায এসে দাঁড়াতে হয়। একটু থামল নীলাদ্রি—

Really it is irony of fate—একদিন যার কোন উচ্চবংশের ঘরণী হবার কথা, আজ সে কিনা হত্যার অপরাধে ঐ কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে--কিন্তু কেন এমনটা ঘটল—

আদালত নির্বাক।

নীলাদ্রি আবার বলে, ও যে এমনি করে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কলঙ্কের সঙ্গে লজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল তাব মূলে কে, জানেন—প্রথমেই আদালতকে বলেছি, আমি তার মূলে—এক ধনী যুবক এক অপরিণামদর্শী ধনী দুলাল who brutally seduced her, spoiled her—আর সেই সে-দিনকাব শিউলীই আমাদেব ঐ চম্পাবাঈ—

But—who—who was that young man— প্রসিকিউশন কাউন্‌সেল বলেন, আমার মাননীয় বন্ধু defence কাউন্‌সেল মিঃ চৌধুবী বলবেন কি—কেমন কবে ওই চম্পাবাঈয়ের ইতিহাস তিনি জানতে পারলেন, না—চম্পাবাঈযের নির্দোষিতা প্রমাণ করবাব জন্য ওর সম্পর্কে একটি মনোহর কাহিনী রচনা করে—

No my Lord, নীলাদ্রি বলল, মনোহর কাহিনী নয়—It's a fact, truth—কারণ সেদিনকার সে যুবক আর কেউ নয়—yes—আপনাদের সকলেব সামনে দাঁডিয়ে আজকের ব্যারিস্টাব এই নীলাদ্রি চৌধুরী—yes I—I am the man নির্দোষ—সম্পূর্ণ নির্দোষ ঐ চম্পাবাঈ নয়, শিউলী চৌধুরী। Yes—she is my married and legal wife-

হঠাৎ একটা শব্দ হলো—টুল থেকে পড়ে গিয়েছে চম্পাবাঈ অজ্ঞান হয়ে।

ছুটে গেল সবাই কাঠগড়ায—একটু পরেই অ্যামবুলেন্স ডেকে শিউলীকে পুলিস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

॥ ২৯ ॥

জ্ঞান ফিবে এলো বটে শিউলীর কিন্তু সে বড় দুর্বল—ক্ষীণ—

নীলাদ্রি হাসপাতালে টেলিফোন করে দিয়েছিল, যেন তার স্ত্রীর চিকিৎসাব কোন ত্রুটি না হয়। যা অর্থ লাগে, সে দেবে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা নীলাদ্রি হাসপাতালে এল। অন্য এক মানুষ।

নিঃশব্দে এসে শিউলীর কেবিনে ঢুকে তার শয্যাব পাশটিতে দাঁড়ায়, শিউলী—

কে আপনি?

চিনতে পারছো না আমায শিউলী- -আমি— আমি —নীলাদ্রি —নীলাদ্রি--

হ্যাঁ—

কেন এসেছেন আপনি—কি চান—

আমায় ক্ষমা কর, শিউলী—

ক্ষমা—ক্ষমা কিসের—আপনি কি অপরাধ করলেন যে ক্ষমা চাইছেন

করেছি—অপরিসীম অপরাধ করেছি—

না, আপনি কিছু করেননি—আপনি দয়া করে এখান থেকে যান--

আমি আমাব স্ত্রীকে—আমার সন্তানকে যে নিয়ে যেতে এসেছি—

আপনার স্ত্রী—আপনাব সন্তান-

হ্যাঁ আমার স্ত্রী—আমার সন্তান—কোথায়, কোথায় সে বল?

আপনার সন্তান কোথায়, তা আমি কি করে জানব?

তোমাব আমার সন্তান —বল বল সে কোথায়?

আপনার কোন সন্তান থাকলেও আমি কিছু জানি না।

জান তুমি—শিউলী, বল, বল--কোথায় সে?

জানি না—

শিউলী।

না, না—যান এখান থেকে—যান বলছি—আপনাকে আমি চিনি না, জানি না—উত্তেজিত হয়ে ওঠে শিউলী, হাঁপাতে থাকে।

ডাক্তার ইশারা করেন নীলাদ্রিকে, চলে যেতে—

কিন্তু পরের দিন আবার যায় নীলাদ্রি—

শিউলী, বল—বল আমার সন্তান কোথায়—নীলাদ্রি অনুরোধ জানায় আবার।

কেন—কেন আবার এসেছেন—বলেছি তো, আমি কিছু জানি না—আপনাকে আমি চিনি না।

দয়া করো শিউলী, বল—

না—না—

শিউলী, জানি আমার অপরাধের সীমা নেই—ক্ষমা নেই—তবু—তবু ক্ষমা চাইছি—বল, আমার সন্তান কোথায়—

আজ সন্তানের খোঁজ নিতে তুমি এসেছো—কিন্তু সেদিন—যখন আসবো বলে আশ্বাস দিয়ে এক অভাগিনী নারীর সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে চলে গিয়েছিলে, তখন তো সে-সম্ভবনার কথা একবারও মনে হয়নি তোমার—

শিউলী, বিশ্বাস করো, আজ তারই অনুতাপের আগুন সর্বক্ষণ আমাকে পুড়িয়ে মারছে—

অনুতাপ—অনুতাপের আগুন, কিন্তু কেন বল তো—অনুতাপ বলে যদি কিছু থাকে, সে তো আমাদের মত সর্বহারা লাঞ্ছিতাদের জন্যে—তোমরা অনুতাপ করতে যাবে কেন?

সবই আমার প্রাপ্য—কিছুই বলবার নেই আমার—দয়া করে শুধু বল, কোথায় আমার সেই সন্তান—

সন্তান—আজ তোমার সন্তানের জন্যে ছুটে এসেছো তুমি—অথচ সেদিন যখন সেই কথাটাই একটিবার তোমায় জানবার জন্যে একজন ঝড়-জল-বৃষ্টি মাথায় করে পাগলের মত দীর্ঘ আড়াই মাইল পথ ছুটে গিয়েছিল তখন তো কামরার মধ্যে বসে পরম নিশ্চিন্তে বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলছিলে—বার বার তোমায় চিৎকার করে ডেকেছিল সে কিন্তু কানে তোমার সে চিৎকার পৌঁছাল না—

সে-অবহেলা, সে-অপরাধে ক্ষমা নেই, আমি জানি—কিন্তু সেদিন যে নীলাদ্রিকে তুমি জানতে, আর আজ যে নীলাদ্রি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, বিশ্বাস করো, তারা এক নয়—আজ তোমার কাছে এসেছে তোমার সন্তানের জন্মদাতা—

না, না—তোমার সন্তান নয়, তোমার সন্তান নেই—কোন দিন হয়নি, কোন দিন ছিলও না—

শিউলী—বল শিউলী, কোথায় সে—

বলবো না—কিছুতেই বলবো না। সে তোমার কেউ নয়—তুমি তার কেউ নও—সে জানে, তার বাপ নেই, মৃত—তুমি তার কাছে মৃত, মৃত—

উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে ভেঙে পড়ে শিউলী জ্ঞান হারায়।

নীলাদ্রি চিৎকার করে ওঠে—বাইরে গিয়ে।

ডাক্তার, শীগ্‌গির আসুন—patient unconscious হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার ছুটে আসেন নীলাদ্রির ডাকে।

তাড়াতাড়ি একটা ইনিজেকশন দেন শিউলীকে।

ডাক্তার নীলাদ্রিকে চলে যেতে বলেন।

নীলাদ্রি ক্লান্ত শিথিল পায়ে শিউলীর কেবিন থেকে বের হয়ে আসে।

কেবিনের দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল পরাশর মিত্র—

মিঃ চৌধুরী—

কে! পরাশরবাবু—আপনি আমার নিশ্চয়ই এ ক'দিন অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু আমি জানি, আমার সব কথা আপনি এখনো জানতে পারেননি—Come to my house to-night. সব বলবো—সব জানতে পারবেন আমার কথা। আজকের নীলাদ্রি চৌধুরীর মুখোশটা খুলে দিতে পারবেন—

যাবো আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-জন্য নয়—কোন খবরের জন্য নয়—

তবে কেন যাবেন।

আপনাকে আমার নমস্কার জানাতে—

কেন! নমস্কার কেন! বোকার মতই যেন তাকায় নীলাদ্রি পরাশরের মুখের দিকে?

নিশ্চয়ই, আপনার মত মানুষকে যদি নমস্কার না জানাতে পারি আজ, তবে এতদিন কী সংবাদপত্রের রিপোর্টারী করলাম—

আমার সব কথা আপনি এখনো কাগজে আপনার লেখননি!

না লিখিনি এখনো,তবে লিখবো—আজ রাত জেগে লিখতে হবে সব কথা যাতে কাল সকালের কাগজে সবাই পড়তে পারে—

আচ্ছা আসি—Good night!

পরাশর চলে গেল। নীলাদ্রি দাঁড়িয়েই থাকে তেমনি।

তনিমা কখন এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি।

তনিমা ডাকে, নীলাদ্রিবাবু!

কে! ও তনিমা—

চলুন—বাড়ি যাবেন না।

বাড়ি!

হ্যাঁ—

চল—

দু'জনে এসে গাড়িতেই উঠে বসল। নীলাদ্রিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তনিমা বললে, আপনার গাড়িটা নিয়ে আমি একটু বেরুচ্ছি—

কোথায়?

পরে বলব।

নীলাদ্রি আর কোন কথা বলে না। তনিমা গাড়ি নিয়ে চলে যায়।

॥ ৩০ ॥

চারিদকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

ড্রাইভার শুধায়, কোথায় যাবো দিদিমণি?

গাড়িতে পেট্রল আছে?

আছে।

চল, কৃষ্ণনগর।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়।

রাত সোয়া নটা নাগাদ কৃষ্ণনগর পৌঁছে অনুসন্ধান নিয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়।

বাড়ির গেটে নেমপ্লেট- নার্স -মিসেস মালতী বসু।

কড়া নাড়তেই ছোট ন দশ বছরের একটি বালিকা এসে দরজা খুলে দেয়, কাকে চান?

এটা নার্স মিসেস বসুর বাড়ি?

হ্যাঁ—

তুমি কে?

আমি তার মেয়ে।

কি নাম তোমার?

রাণু বসু—

বাঃ সুন্দর নাম। মা আছেন তোমার?

হ্যাঁ, মার জ্বর আজ দু'দিন থেকে—বিছানায় শুয়ে আছেন—

তাকে একটু বলবে রাণু কলকাতা থেকে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কে রে রাণু, ভিতর থেকে ঐ সময় সাড়া আসে মহিলাকণ্ঠে।

একজন কলকাতা থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মা।

ভিতরে নিয়ে এসো—

রাণু বললে, আসুন ভিতরে—

মাঝারী গোছের একটি শোবার ঘর। পাশাপাশি দু'টি খাটে শয্যা বিছানো। একটিতে এক মধ্যবয়সী মহিলা শুয়ে।

নমস্কার—তনিমা বলে।

বসুন—নমস্কার—কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনতে পারলাম না।

না চিনবেন না—আমি—আসছি শিউলীর কাছ থেকে—বুঝতে পারছেন বোধ হয়, তার কাছ থেকেই আপনার সব কথা ও ঠিকানা আমি জেনেছি।

ও—তার বিচারের কি হলো, জানেন কিছু—

সে মুক্তি পেয়েছে—

সত্যি!

হ্যাঁ—তবে সে খুব অসুস্থ—হাসপাতালে। আপনার সঙ্গে নিভৃতে কিছু আমার অত্যন্ত জরুরী কথা ছিল—

মালতী দেবী রাণুকে পাশের ঘরে যেতে বলেন, রাণু চলে যায়—

বলুন, কি বলছিলেন—মালতী বললে।

তনিমা নীলাদ্রি ও শিউলীর কথা আদ্যোপান্ত বলে যায়। স্তব্ধ হয়ে শোনেন মালতী দেবী।

আশ্চর্য!

সত্যিই আশ্চর্য—তনিমা বলে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, ঐ রাণুই বোধ হয় শিউলীর সেই সন্তান।

হ্যাঁ—

রাণুকে আমি নিয়ে যেতে চাই—

রাণু এখনো তার মা-বাবার কথা কিছুই জানে না।

কিন্তু আপনি তো বুঝতে পারছেন, নীলাদ্রি তার সন্তানকে চায়—তার সত্য পরিচয়ে।

মালতী দেবী কি ভেবে মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, রাণু—

রানু ঘরে এলো, ডাকছিলে মা?

হ্যাঁ—তোমার বাবা কে, তুমি অনেক দিন জিজ্ঞাসা করেছ তাই না?

কোথায় আমার বাবা?

তোমার বাবাকে দেখবে?

হ্যাঁ—

কলকাতায় আছেন তোমার বাবা—তাহলে তুমি ওঁর সঙ্গে যাও—

কার সঙ্গে?

তনিমাকে দেখিয়ে মালতী বলে, ওঁর সঙ্গে।

কখন যাবো, এখুনি?

এখুনি। কিন্তু তোমার যে জ্বর—

আমার জন্য তুমি ভেবো না—জ্বর ভাল হলেই কলকাতায় গিয়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

তনিমা সেই রাত্রেই আবার রাণুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

সারাটা রাত নীলাদ্রি তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায়—

ভোর হতেই ডাক্তারকে নাসিং হোমে ফোন করে, শিউলী কেমন আছে জানবার জন্য।

ডাক্তার বলেন, এখন অনেকটা ভাল—তবে খুব দুর্বল। Condition অত্যন্ত low—

আমি কি একবার বিকেলে যেতে পারি—

আসতে পারেন—তবে কোন রকম excitement রোগিনীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, মনে রাখবেন।

সারাটা দিন নীলাদ্রি মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। অতঃপর একবার ভাবে, সে যাবে। আবার ভাবে না, যদি শিউলীর অবস্থা আরও অবনতি হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। বেব হয়ে পড়ে—

নার্সিং হোমে পৌঁছে ধীরে ধীরে এক সময় শিউলীর কেবিনে প্রবেশ করে।

শিউলী চোখ বুজে পড়ে ছিল বেডে।

নীলাদ্রি কোন কথা বলে না, শয্যার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময় শিউলী চোখ খোলে—সামনেই নীলাদ্রিকে দেখে সে আবার চোখ বুজে ফেলে।

শিউলী—নীলাদ্রি মৃদুকণ্ঠে ডাকে।

শিউলী কোন সাড়া দেয় না।

তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো তবু এসেছি—একবার বল—আমার সন্তান কোথায়?

শিউলী নীরব। জবাব দেবে না, শিউলী।

কেন বার বার বিরক্ত করছো—বলছি তো, তোমার কোন সন্তান জন্মায়নি—

ঠিক ঐ সময় তনিমা এসে ঘরে ঢুকল রানুর হাত ধরে।

তনিমা ডাকল, শিউলী—

শিউলী চোখ মেলে তাকাল।

এই দেখো, কাকে এনেছি—

শিউলী চেয়ে থাকে রানুর দিকে। চোখের দৃষ্টি তার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে।

রাণু—ঐ তোমার মা—তনিমা শিউলীকে দেখিয়ে দেয়।

আমার মা—

হ্যাঁ—যাও, ওর কাছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় রাণু বেডের কাছে। মা—রাণু ডাকে।

শিউলী দু'হাত বাড়ায়—

রানু আরো এগিয়ে যেতেই শীর্ণ কম্পিত দু'টি হাতে বুকে নেয় রানুকে, রাণু—

মা—

রাণু—

শিউলী নীলাদ্রিকে দেখিয়ে বলে, যাও—রাণু, ওর কাছে যাও—

উনি কে, মা—

নীলাদ্রি দু হাতে রাণুকে বুকে টেনে নিয়ে অবেগকম্পিত স্বরে বলে, আমি তোমার বাবা, রাণু—

বাবা—

হ্যাঁ—তোমার বাবা। নীলাদ্রি বলে।

হঠাৎ ঐ সময় শিউলীর মাথাটা বালিশের পাশে গড়িয়ে পড়ে—

তনিমা চেঁচিয়ে ডাকে, শিউলী—

নীলাদ্রি চেঁচিয়ে ডাকে, শিউলী—

শিউলীর কোন সাড়া পাওয়া যায় না—শুধু চেয়ে থাকে সে নীলাদ্রির মুখের দিকে।

নীলাদ্রি দু হাতে শিউলীর মাথাটা তুলে ধরে, শিউলী—শিউলী—

নী-লা-দ্রি—

রাগললিত

হঠাৎ যেন ঝড়ের মতই জগন্নাথ দত্ত ঘরটার মধ্যে এসে ঢুকল।

দুদিন জ্বরটা ছিল—আজই সকালের দিকে ছেড়েছে। কিন্তু সমস্ত শরীরটা দুর্বল অবসন্ন।

শুয়ে থাকতে থাকতেই মনের মধ্যে নতুন সুরটা গুনগুনিয়ে উঠেছিল। এলোমেলো শয্যার উপর উঠে বসে কৌশিক পাশ থেকে বেহালাটা তুলে নিয়েছিল। আপন মনে তারের উপর ছড় টেনে টেনে সুরটা তুলবার চেষ্টা করছিল কৌশিক।

ঘরের দরজাটা ভেজানই ছিল—ভেজান দরজাটা দড়াম্ করে খুলে জগন্নাথ দত্ত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

জগন্নাথ দত্তকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করে বেহালাটা হাতের মধ্যেই ধরে কৌশিক—

আসুন জগন্নাথবাবু—আমি—

কিন্তু কৌশিক তার মুখের কথা শেষ করতে পারল না—তার আগেই অকস্মাৎ যেন একটা হিংস্র জন্তুর মত সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অগোছাল—এলোমেলো জিনিসগুলো যা হাতের সামনে পেল তুলে ঘরের খোলা দরজা-পথে যেন পাগলের মতই বাইরের গলি-পথে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল জগন্নাথ দত্ত।

জামা কাপড়—থালা—গেলাস—বই—খাতা—

একি—একি—এ কি করছেন দত্তমশাই—ভীত ত্রস্ত কৌশিক বাধা দেবার জন্য এগিয়ে যায়।

যারা সহজে বাড়ি ছেড়ে দেয় না—তাদের এমনি করেই তাড়াতে হয়—ক্ষিপ্ত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে যেন জগন্নাথ দত্ত।

তারপর একটা ধাক্কা দিয়েই জগন্নাথ দত্ত এক পাশে ঠেলে দেয় কৌশিককে।

কৌশিক টলে পড়ে যায়।

একটার পর একটা জিনিস যা হাতের কাছে পায় ঘরের ভিতর থেকে তুলে তুলে ফেলে দিতে লাগল জগন্নাথ দত্ত বাড়ির সামনে অপ্রশস্ত রাস্তাটার উপরে।

একটা হিংস্র আক্রোশে যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল জগন্নাথ দত্ত রাস্তায় জিনিসপত্রগুলো।

আরো যারা ঐ বাড়িটার ঘরে ঘরে ভাড়াটে ছিল একখানা বা দেড়খানা ঘর নিয়ে তাদের মধ্যে অনেকেই এবং আশপাশের বাড়ি থেকেও ছেলে বুড়ো নানাবয়েসী অনেকে জগন্নাথ দত্তের চাঁছাছোলা গলার চীৎকার ও জিনিসপত্র রাস্তার উপর পড়ার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বের হয়ে এসে অপ্রশস্ত রাস্তাটার উপর তৎক্ষণে ভিড় করেছে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য।

মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়োয় কম হবে না—কিন্তু কেউ একটি কথা বলছে না বা প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। সবাই যেন মজা দেখছে মনে হয়।

প্রতিবাদ হয়ত জানাতে পারত ঐ বাড়িব ভাড়াটেরা কিন্তু সকলেই জগন্নাথ দত্তকে ভয় করে।

বাড়িওয়ালা বা বাড়ির আসল মালিককে কেউ আজ পর্যন্ত কখনো চোখেও দেখেনি—তাদের যা কিছু পরিচয় ঐ সরকার জগন্নাথ দত্ত লোকটার সঙ্গেই।

বেঁটেখাটো একটা সাক্ষাৎ শয়তানের মত দেখতে যেন লোকটা।

পরণে একটা মোটা ধুতি—গায়ে একটা আলপাকার কালো গলাবন্ধ কোট—হাতে একটা ছাতা।

মাথাজোড়া চকচকে টাক।

মুড়ো ঝাঁটার কাঠির মত কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা গোঁফ—মুখ অনুরূপ দাড়িতে ভরা।

তিন চার দিন অন্তর দাড়ি কামানোর ফলে সর্বদাই প্রায় একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকতো মুখে জগন্নাথ দত্তর।

পান আর বিড়িতে দাঁতগুলো মিশকালো।

কথা বললেই মনে হতো যেন লোকটা মুখ খিঁচুচ্ছে। ভেংচাচ্ছে।

লোকটাকে দেখলেই যেন ভয় করে।

তাছাড়া ঐ বাড়ির ভাড়াটেরা সবাই নিম্ন-মধ্যবিত্ত দলের।

ঘরে ঘরে প্রত্যেকেরই অভাব-অনটন।

উদয়-অস্ত খেটে যা রোজগার করে আনে তাতে কোনমতে চলে যায়।

উদ্বৃত্তের কথা ওরা কেউ ভাবতেই পারে না যেন।

কাজেই কৌশিকের মত অবস্থা ওদের যে কারোরই একদিন হতে পারে তখন ত ঐ জগন্নাথ দত্তর হাতে পায়েই ধরতে হবে।

কাজেই নিরুপায় সবাই। ওর বিরাগভাজন হতে চায় না হয়ত সত্যিই কেউ।

নিরুপায় হয়েই সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল।

বেলা তখন খুব বেশী হবে না, সাত কি সোয়া সাতটা হবে।

জিনিসপত্রই বা এমন কি – একটা ছেঁড়া ময়লা বিছানা—গোটাকয়েক বাসন—একটা চায়ের কেটলি—একটা জনতা স্টোভ।

গোটা দুই ছেঁড়া সুটকেশ।

একটা ভাঙা কাঠের বাক্স।

দড়ির আলনায় ঝোলানো কিছু জামা কাপড়—দু জোড়া ছেঁড়া জুতো। আর গানের স্বরলিপির খাতা ও খোলা পাতাগুলো।

একটার পর একটা জিনিসগুলো তুলে তুলে ঘর থেকে দরজা পথে বাইরে ফেলে দিচ্ছিল জগন্নাথ দত্ত আর সঙ্গে সঙ্গে চিলের মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করছিল— বেরও বেরও তিন মাস হয়ে গেল বাড়িভাড়া দেবার নাম নেই—এটা শ্বশুরবাড়ি পেয়েছো?

কেউ প্রতিবাদ জানাচ্ছে না কেউ এগিয়ে আসছে না একটুকু বাধা দিতে।

রাস্তা জুড়ে সব জিনিসপত্র ও স্বরলিপির পাতাগুলো এদিক ওদিক হাওয়ায় উড়ছে – উড়ে উড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে পাথরের মত একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল কৌশিক।

বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী হবে না।

রোগা পাতলা চেহারা।

পরনে একটা ঢোলা ময়লা পায়জামা ও অনুরূপ একটা পাঞ্জাবি।

একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

কয়েকদিন ধরেই সন্ধ্যার দিকে জ্বর আসছে রোজই বলতে গেলে প্রায়।

সারাটা রাত জ্বর থাকে।

শেষ রাত্রের দিকে যখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে তখন এত দুর্বল লাগে যে সর্বাঙ্গ যেন ঝিমঝিম করতে থাকে, চোখ খুলতেই পারে না মাথা তুলতে পারে না।

তাছাড়া আজ এক সপ্তাহ প্রায় পেট ভরে খাওয়াই ত জুটছে না পয়সার অভাবে।

অনাহারের দুর্বলতাও আছে।

ইচ্ছা থাকলেও তাই বেরুতে পারে না —বের হয়নি দশ বার দিন প্রায়।

হঠাৎ শয্যার একপাশে রাখা কৌশিকের বেহালাটা তুলে নেয় জগন্নাথ দত্ত হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎস্পর্শে সংবিৎ ফিরে পায় কৌশিক।

এতক্ষণ পরে আবার একটা চাপা আর্তনাদ বের হয়ে আসে কৌশিকের কণ্ঠ থেকে।

না না, দত্তমশাই, আমার বেহালাটা –

দু হাত বাড়িয়ে যেন ঝাঁপিয়েই এসে পড়ে বেহালাটা চেপে ধরে কৌশিক।

উন্মত্ত জগন্নাথ দত্ত হ্যাঁচকা টান দিয়ে বেহালাটা কৌশিকের হাত থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

প্রাণপণ শক্তিতে জগন্নাথ দত্তর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেহালাটা পরম স্নেহে কৌশিক বুকের

মাঝখানটিতে চেপে ধরে রাখে।

জগন্নাথ দত্ত টানাটানি করতে থাকে বেহালাটা কৌশিকের হাত থেকে আবার ছিনিয়ে নেবার জন্য।

দুজনে সেইভাবে টানাহেঁচড়া করতে করতে দরজার বাইরে এসে পড়ে একসময়।

দত্তমশাই, আর কটা দিন আমায় সময় দিন—সব ভাড়া আপনার মিটিয়ে দেবো। করুণ মিনতি জানাতে থাকে কৌশিক, থাকবার জায়গা থাকলে আমি নিজেই চলে যেতাম।

কিন্তু জগন্নাথ দত্ত যেন ক্ষেপে গিয়েছে।

সবাই পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—বোবা দর্শক।

সেই ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে কানু।

সকালবেলা যেমন প্রত্যহ কানু বের হয়ে আসে হোটেল থেকে তেমনি আজও বের হয়ে এসেছিল এবং হাঁটতে হাঁটতে কখন একসময় এই দিকে চলে এসেছে।

গলির মুখে এসে অত লোকজনের ভিড় দেখে একান্ত কৌতুহলের বশেই দাঁড়িয়ে গিয়ে উঁকি দিয়েছিল।

পরনে একটা হাফ প্যান্ট আর শার্ট তাও কতদিন কাচা হয়নি, পরিষ্কার করা হয়নি।

ময়লা ছেঁড়া।

মাথাভরতি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

হাতে একটা গুলতি।

ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে গুলতিটা ধরে সামনের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে ঘোরাচ্ছিল কানু।

ভাসা ভাসা দুটো চোখ।

দু চোখে যেন রাজ্যের দুষ্টুমি। বয়স দশ এগারর বেশী হবে না। পায়ে একটা ছেঁড়া স্যাণ্ডেল।

হঠাৎ কানুর নজরে পড়ল ব্যাপারটা।

দুজনে টানাহেচড়া করতে করতে বের হয়ে এসেছে ততক্ষণে দরজাপথে রাস্তার উপরে প্রায়। বেঁটে কালো টেকো জগন্নাথ দত্ত ও রোগা পাতলা কৌশিক।

কৌশিকের বুকের মাঝখানে আঁকড়ে ধরা তার বেহালাটা।

আর জগন্নাথ যেন হিংস্র আক্রোশে সেই বেহালাটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

জগন্নাথবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি এটা নষ্ট করবেন না—এটা নষ্ট হলে আমি মরে যাব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আর কটা দিন আমাকে দয়া করে সময় দিন—আপনার সব বাড়িভাড়া আমি শোধ করে দেবো—না হলে নিশ্চয়ই আমি ঘর ছেড়ে দেবো।

বিশ্রী কুৎসিত গলায় যেন চেঁচিয়ে ওঠে জগন্নাথ দত্ত, হ্যাঁ—শোধ করে দেবে—ভাবী শ্বশুরের লাখ টাকার সম্পত্তি পেয়ে যাবে—সব শোধ হয়ে যাবে।

জগন্নাথ দত্ত সঙ্গে সঙ্গে আবার কৌশিকের হাত থেকে তার বেহালাটা জোর করে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটে গেল।

ভিড়ের মধ্যেই একপাশে দণ্ডায়মান কানু তার হাতের গুলতিটা দিয়ে পকেট থেকে একটা পাথরের নুড়ি নিয়ে তাক করে সা করে সেটা ছুঁড়ে দিল জগন্নাথ দত্তকে লক্ষ্য করে।

অব্যর্থ হাতের নিশানা তার—নুড়িটা গিয়ে ঠং করে জগন্নাথ দত্তর মাথাজোড়া টাকে আঘাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা জন্তুর মত চীৎকার করে ওঠে যন্ত্রণায় জগন্নাথ দত্ত।

ওরে বাবা রে—মেরে ফেললে রে—গেছি—গেছি—

জগন্নাথের হাতের মুঠি শিথিল হয়ে যায় চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই আপনা হতে।

নুড়ির আঘাতে জগন্নাথ দত্তের মাথাটা খানিকটা কেটে ফুলে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

কাটা জায়গা থেকে রক্ত বের হয়ে পড়ে।

মাথায় হাত দিয়ে সেই রক্ত দেখে জগন্নাথ দত্ত দ্বিগুণ চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে বাবা রক্ত—মরে গেছি আমি মরে গেছি—

সকলেই প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিল—ব্যাপারটা ঠিক কি হলো বুঝতে পারেনি।

ইতিমধ্যে আবার গুলতি ছোঁড়ার জন্য আর একটা নুড়ি পকেট থেকে নিয়ে গুলতিতে চেপে ধরে কানু—দ্বিতীয়বার তাক করছিল জগন্নাথ দত্তের দিকে।

দু চার জনের সেদিকে নজর পড়ে যায়—তারা হৈ হৈ করে ওঠে।

সেই শব্দে জগন্নাথ দত্তরও কানুর উপরে নজর পড়ে—

ধর ধর—শয়তানটাকে ধর—হারামজাদা—

ক্ষিপ্তের মত চেঁচিয়ে ওঠে জগন্নাথ দত্ত।

কিন্তু কানুর হাতে গুলতি দেখে কেউ এগুতে সাহস পায় না।

কানুর হাতের গুলতি থেকে নিক্ষিপ্ত আর একটা নুড়ি তীরবেগে ছুটে এসে ততক্ষণে আবার জগন্নাথ দত্তর কপালের 'পরে ঠং করে লাগে।

যন্ত্রণায় একটা জন্তুর মত আবার চেঁচিয়ে ওঠে জগন্নাথ দত্ত—খুন করল রে খুন করল—

কানু আবার গুলতি তুলে ধরে আর একটা নুড়ি নিয়ে জগন্নাথ দত্তকে লক্ষ্য করে।

জগন্নাথ দত্ত আর দাঁড়ায় না।

চারিদিকে ছড়ানো জিনিসপত্রের মধ্যে উলটো পথে দৌড় দেয়।

কানু খিলখিল করে হেসে ওঠে।

এবং এতক্ষণে রাস্তার উপর নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে যারা চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যেও কেউ কেউ যেন ব্যাপারটা উপভোগ করে কানুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেসে ওঠে।

তারপর মজা শেষ হয়ে গিয়েছে যখন আর সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে—তাছাড়া ইতিমধ্যে কলকারখানা ও অফিসকাছারিরও সময় হয়ে গিয়েছিল—একজন দুজন করে সবে পড়তে শুরু করে।

ভিড়টা দেখতে দেখতে যেন পাতলা হয়ে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে যায়।

কেবল দাঁড়িয়ে থাকে ছড়ানো জিনিসপত্রের মধ্যে বুকের কাছে বেহালাটা চেপে ধরে বোবা হয়ে তখনো কৌশিক।

আর অল্পদূরে গুলতি হাতে কানু। সে যায়নি।

দুজনে দুজনার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর কানুই এগিয়ে আসে প্রথম পায়ে পায়ে কৌশিকের দিকে।

তুমি—

আমার নাম কানু।

কানু জবাব দেয়।

তারপর আস্তে আস্তে বলে, ঐ লোকটা কে?

কার কথা বলছো?

ঐযে যে আপনার এই সব জিনিসপত্র এমন করে রাস্তায় ফেলে দিল।

জগন্নাথ দত্ত।

যা গুলি খেয়েছে—আর চট্ করে এখন এদিকে আসবে না—মৃদু হেসে কানু বলে।

॥ ২ ॥

রাস্তার সামনেই তিনতলা পুরাতন স্ট্রাকচারের বাড়িটা। কত দিনের কে জানে।

একটিমাত্র যাতায়াতের পথ।

কুড়ি পঁচিশটা ঘর।

ঘরে ঘরে সব ভাড়াটে।

সামনের একটা ঘর নিয়েই কৌশিক থাকে।

ঘরের দরজাটা তখনো খোলা হা-হা করছে।

সেই খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে কানু আবার প্রশ্ন করে, ঐ ঘরে বুঝি আপনি থাকেন?

হ্যাঁ।

তারপর একটু থেমে বলে কৌশিক, আজই ভাবছি ঘরটা ছেড়ে দেবো।

কেন?

তিন মাস ভাড়া দিতে পারছি না।

ঐ লোকটা বুঝি বাড়িওয়ালা?

না—বাড়িওয়ালার সরকার জগন্নাথ দত্ত—সত্যিই ত ওর দোষ কি—মাত্র পনের টাকা ভাড়া—তাও দিতে পারছি না তিন মাস।

কথাগুলো বলতে বলতে কৌশিক এবারে নীচু হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্বরলিপির লেখা পাতাগুলো কুড়াতে শুরু করে একটা একটা করে।

কানুও তাড়াতাড়ি কৌশিককে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসে।

সেও স্বরলিপির পাতাগুলো একটা দুটো করে রাস্তার উপর থেকে কুড়াতে শুরু করে।

এগুলো কাগজে সব কি লেখা? কৌতূহলী কানু শুধায় এক সময়।

সুরের—গানের স্বরলিপি। পাতাগুলো কুড়াতে কুড়াতে জবাব দেয় কৌশিক।

অন্যান্য সব কিছু পড়ে আছে— সেদিকে যেন নজরও নেই কৌশিকের—ঐ হাতে-লেখা স্বরলিপির পাতাগুলোই যেন তার জীবনের একমাত্র অমূল্য সম্পদ।

পরম যত্নে সেগুলোই কৌশিক একটা একটা করে কুড়াতে থাকে সবার আগে।

আপনি বুঝি গান গান? কানু প্রশ্ন করে।

না—

গান না?

না আমি গাইতে পারি না।

কথাটা বলে আবো কয়েকটা স্বরলিপির পাতা তুলে ঘুরে তাকাল কানুর দিকে কৌশিক এবং প্রশ্ন করল, তুমি গান গাইতে পারো?

কানু ইতিমধ্যে কয়েকটা স্বরলিপির পাতা তুলে হাতের মধ্যে ধরেছিল।

কৌশিকের প্রশ্নে একবার তাকাল মাত্র তার মুখের দিকে তার ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ তুলে কিন্তু কোন জবাব দিল না।

ইতিমধ্যে দু একজন লোক রাস্তা ধরে আবার যাতায়াত করতে শুরু করেছিল।

কানু তাড়াতাড়ি কাগজগুলো একের পর এক কুড়িয়ে জড় করে।

দুজনে অতঃপর কোনমতে রাস্তার উপর ছড়ানো জিনিসগুলো তুলে এনে ঘরের মধ্যে রাখে একটা একটা করে।

ছোট ঘরটা।

একদিকটা একেবারে চাপা—একটা মাত্র দরজা আছে—সেটা বন্ধ।

উত্তর দিকে ঐ রাস্তাটা।

সেই দিকে ছোট ছোট দুটো জানালা আর একটা দরজা।

মাস পাঁচেক হলো মাসিক পনের টাকায় এই ঘরটা এসে ভাড়া নিয়েছে কৌশিক।

ঘরের ভাড়াটা সে নিয়মিত দিয়েও আসছিল কিন্তু গত মাস তিনেক ধরে কেবলই ঘুরে ধুরে জ্বর হয়।

আর সেই সঙ্গে শরীরটাও যেন কেমন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।

স্থানীয় একটা নাট্যশালায় অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজাত কৌশিক—মাসে একশ টাকা পেত—আর ছিল ঠিকে-কাজ টুকটাক এদিকে ওদিকে—তাতেও শখানেক টাকা মাসে হতো।

কিন্তু প্রায়ই অসুস্থতার জন্য কামাই করায় অর্কেস্ট্রার পরিচালক হরিদাস পাল তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে মাস চারেক হলো। এবং টুকটাক কাজও বিশেষ আজকাল আর পায় না কৌশিক।

যা রোজগার করত তাতে করে তার ভালভাবেই চলে যেত— কোন অভাব ছিল না কৌশিকের।

চেষ্টা করলে যে ওর চাইতেও বেশী রোজগার করতে পারত না কৌশিক তা নয়—কিন্তু ঐ বাঁধাধরা জীবন—ঐভাবে অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজিয়ে পেট ভরলেও মনটা যেন ভরত না। ভরতে চাইত না।

কেবলমাত্র অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজিয়ে ঐভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্যই ত সংগীতশিল্পকে জীবনের সব কিছু বলে সে আঁকড়ে ধরেনি।

সব ছেড়ে বেহালাটা হাতে তুলে নেয়নি।

তার মনের মধ্যে যে অনেক স্বপ্ন অনেক আশা।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় পেয়েছে বিশেষ করে রাত্রে সে বেহালাটা নিয়ে সুরের সাধনায় ডুবে গিয়েছে।

রাতের পর রাত।

নতুন সুরের সন্ধানে।

যে সুর জন্ম নেবে তার কল্পনা সাধনা থেকে।

সবাই শুনবে—কান পেতে শুনবে।

যার মৃত্যু নেই—যা কোনদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে না।

সেই সব সুরের স্বরলিপি পাতার পর পাতা লেখা হয়েছে।

রাতের পর রাতের সাধনা কৌশিকের।

তাই নিয়মিত থিয়েটারে বা এখানে ওখানে অর্কেস্ট্রায় বাজাতে গিয়ে সুরে সুর মিলিয়ে মনটা থেকে থেকে প্রথমটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সুর হারিয়ে ফেলেছে কৌশিক।

অনেক সময় গান রেকর্ডিংয়ের সময় ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক সেই গানের সুরের সঙ্গে বাজাতে মনে হয়েছে সেই একঘেয়েমি—ক্লান্তিকর সেই একই সুরের পুনরাবৃত্তি।

বেশীর ভাগ মিউজিক ডাইরেক্টারের একটু নাম পরিচয় হবার পরই গতানুগতিকতার মধ্যে কোনমতে গা ভাসিয়ে চলার প্রয়াস কৌশিকের মনকে ক্লান্ত করে তুলেছে।

কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে অর্থের প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজনটা যে কি নিষ্ঠুর তা কৌশিকের চাইতে আর কে বেশী জানে।

বি. এস-সি পড়তে পড়তে যেদিন পড়াশুনায় ইতি টেনে দিল।

বেহালাটা হাতে তুলে নিল।

এবং যে কথা জানতে পেরে মামা অবিনাশ গুপ্ত অগ্নিশর্মা হয়ে বলেছিল বেহালা বাজাবে—আর্টিস্ট হবে—ওসব করতে হলে জেনো আমার বাড়িতে তোমার জায়গা হবে না।

ছোটবয়েসে মা বাপকে হারিয়ে কৌশিক ঐ মামা অবিনাশ গুপ্তের কাছেই মানুষ।

কথাটা বলে সেদিন অবিনাশ গুপ্ত আর দাঁড়ায়নি।

চটিজুতার ফট্‌ফট্‌ শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কৌশিক বুঝতে পেরেছিল মামার আশ্রয়ে থেকে তার স্বপ্ন কোনদিনই সফল হবে না।

কাজেই সেই রাত্রেই—একটা চামড়ার সুটকেশে নিজের জিনিসপত্র ভরে নিয়ে কৌশিক মামার গৃহ ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এখন কোথায় যাবে সে?

একটা আশ্রয় চাই ত।

আশ্রয়।

হঠাৎ মনে পড়েছিল বন্ধু মণিরামের কথা।

মণিরাম আর সে একই গুরুর কাছে শিক্ষা করেছিল। গুরু রামশংকর যোশী।

মণিরাম এখানে ওখানে অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজিয়ে মন্দ উপায় করে না। থাকে বেণেটোলার এক মেসে।

রাত তখন এগারটা।

সুটকেশটা হাতে নিয়ে কৌশিক গিয়ে হাজির হলো সোজা একেবারে হাঁটতে হাঁটতে মণিরামের মেসে।

সেদিন থিয়েটারে শো ছিল।

শো শেষ হবার পর ফিরতে একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল সেদিন মণিরামের।

খাওয়াদাওয়ার পর একটা চৌকির উপর বসে মণিরাম একটা সিগ্রেট ধরিয়ে টানছিল—সুটকেশ হাতে অত রাত্রে কৌশিককে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে শুধু মুখের দিকে তাকায়।

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আরে কৌশিক—কি খবর!

মণিরাম—

আরে বোস বোস।

বসছি কিন্তু একটা কথা ছিল। তোমার এখানে আমার একটু থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পার?

মানে এখানে—এই মেসে থাকবে তুমি!

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার বল ত! তুমি ত তোমার মামার বাসায় ছিলে?

ছিলাম। কিন্তু চিরকালই একজায়গায় থাকতে হবে নাকি?

না তা নয় তবে—

এখানে থাকবার কোন অসুবিধা আছে নাকি?

না না—ঘরও বোধহয় খালি আছে, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।

যত কম ভাড়া হয় দেখো—তারপরই একটু থেমে বলে, মণিরাম, আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পার কোথাও?

কাজ বোধহয় এখুনি পেতে পার তুমি!

পেতে পারি—কোথায়?

উৎসাহিত হয়ে ওঠে কৌশিক।

আমার এক বন্ধু নটরাজ থিয়েটারে অর্কেস্ট্রায় সেতার বাজায়—তারা একজন ভায়োলিনিস্ট খুঁজছে বলছিল।

সত্যি—দেখ না যদি কাজটা পেয়ে যাই।

কাল সকালেই নিয়ে যাবো বিমলের কাছে।

কলুটোলার দিকে গলির মধ্যে একটা বাড়িতে বিমল থাকে। মণিরাম পরদিন সকালে কৌশিককে নিয়ে বিমলের সঙ্গে দেখা করল।

বিমল সব শুনে বললে, তাদের মিউজিক কনডাকটর হরিদাস তাকে বিশেষ ভালবাসে—ভাল যদি বাজাতে পারে কৌশিক ত কাজ হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার সময় বিমল কৌশিককে সোজা একেবারে থিয়েটারে যেতে বলে দিল। সেখানেই দেখা হবে।

হরিদাস পাল কৌশিকের বাজনা শুনে তখুনি তাকে দলে নিয়ে নিল।

মাইনে ঠিক হলো সত্তর টাকা আপাততঃ—তারপর দু মাস বাদে মাইনে বাড়ানো হবে।

কৌশিক চাকরিটা পেয়ে যেন বেঁচে যায়।

মণিরামের মেসেই আপাততঃ থেকে গেল কৌশিক।

কিন্তু দু তিন মাস যেতে না যেতেই একঘেয়েমির ক্লান্তিতে যেন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে কৌশিক আবার।

শিল্পীর মনের সেই অতৃপ্তি, ভাল লাগে না—প্রত্যহ একই সুরের পুনরাবৃত্তি যেন ভাল লাগে না।

কোন স্পন্দন নেই—কোন বৈচিত্র্য নেই।

এইজন্যই কি সে মিউজিককে জীবনের পাথেয় হিসাবে বেছে নিয়েছিল!

সংসার থেকে দূরে সরে এসেছিল।

বিমলকে বলে, বিমল, এই একঘেয়েমি তোমার ভাল লাগে?

একঘেয়েমি—

নয় ত কি—সেই এক সুর এক বাজানো।

তা আর কি করা যাবে—যেখানকার যা।

বিমলের মধ্যে কোন অতৃপ্তি নেই, কোন ক্লান্তির বিষণ্ণতা নেই, সে ঐ জীবনেই সন্তুষ্ট।

মধ্যে মধ্যে অবিশ্যি সিনেমার মিউজিক টেকিংয়ে ওর অর্কেস্ট্রার ডাক পড়ে কিন্তু তার মধ্যেও যেন তেমন কোন বৈচিত্র খুঁজে পায় না কৌশিক।

॥ ৩ ॥

হঠাৎ কানু বলে, এবারে আমি যাই।
কথাটা বলেই কানু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়।
খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যায়।
শোন শোন কানু।
কৌশিকের ডাকে কানু ঘুরে দাঁড়ায়।
ডাকছেন?
হুঁ—
তুমি কোথায় থাক? এ পাড়াতেই থাক নাকি? কখনও ত তোমাকে আগে দেখিনি?
না—এ পাড়ায় ত আমি থাকি না।
তবে কোথায় থাক?
কোথায় আবার থাকব—রাস্তায় পার্কে ফুটপাথে বেঞ্চে—
কেন—তোমার বাড়ি নেই?
হঠাৎ কানুর মুখটা যেন কঠিন হয়ে ওঠে। কয়েকটা মুহূর্ত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলে, না।
কি' কর?
কি আবার করব।
কোন কাজটাজ করো না?
না।
কেন যেন মিথ্যেই বলে কানু। হোটেলে চাকরের কাজটা বলবার মত নয় বলেই হয়ত মিথ্যা বলে।
কে তোমার আছে? কৌশিক আবার প্রশ্ন করে।
কে আবার থাকবে!
কানু যাবার জন্যে বুঝি আবার পা বাড়ায়।
শোন না—তোমার মা বাবা ভাই বোন কেউ নেই?
না।
কেউ নেই?
না—কেউ নেই।
কথাটা বলে কানু আর দাঁড়ায় না।
গুলতিটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।
বেলা দশটা বেজে গিয়েছে।
আজ হাঁটতে হাঁটতে হোটেল থেকে অনেক দূরের পথ চলে এসেছে—চলে এসেছে একেবারে শ্যামবাজারে।
অন্নপূর্ণা হোটেলের মালিক গুরুদাস পাল এতক্ষণে হয়ত চেঁচামেচি শুরু করেছে।
এই সময়টা হোটেলে একটু ভিড় হয়। সেই কোন সকালে বের হয়ে এসেছে।
পাইস হোটেলে অনেকেই খেতে আসে।
অফিসমুখো বাবুর দল অনেকেই।
শিয়ালদহ স্টেশনের কাছেই একটা গলির মধ্যে হোটেলটা।
ঐ হোটেলেই এঁটো বাসনপত্র থালা গ্লাসগুলো ধুয়ে দেয় কানু—বিনিময়ে দশটি করে টাকা ও দুবেলা খেতে পায়।
কিন্তু কানু সব সময় হোটেলে থাকে না।
একজায়গায় বেশীক্ষণ থাকতে তার ভাল লাগে না।
মনটা ছটফট করে ওঠে। যেন হাঁপ ধরে।
পালমশাইও বিশেষ কিছু বলে না—কারণ সামান্য ঐ দশ টাকা মাইনা ও দুবেলা খাওয়া দিয়ে

কোথায় চাকর পাওয়া যাবে।

চাকর ত নয় এখন যেন সব এক একজন লাটসাহেব।

কানুর আগে যারা এসেছে কেউই এতদিন থাকেনি।

মাইনে দিয়েছে তাদের কুড়ি টাকা—দুবেলা খাওয়া তবু টেঁকেনি তারা—দু চার মাস বাদই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

কেউ কিছু বলেনি।

স্রেফ ডুব দিয়েছে।

কেবল কানুই আজ মাস আষ্টেক টিকে আছে।

তাও মাত্র ঐ দশ টাকা মাইনেতেই!

তবে ইতিমধ্যে বার দুই দুটো হাফ প্যান্ট ও দুটো ছিটের হাফ সার্ট কিনে দিতে হয়েছে কানুকে।

তা সেই বা কত দাম।

রাস্তার ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে দিয়েছে গুরুদাস পাল।

আর তাইতেই যখন তখন চলে গেলেও কানুকে বিশেষ কিছু বলে না পালমশাই। একটু চেঁচামেচি করে—বাস ঐ পর্যন্তই।

কি জানি যদি আবার কেটে পড়ে ছেলেটা।

মাস আষ্টেক আগে একদিন—

বেলা তখন গোটা বার হবে।

হোটেলের ভিড় আর তখন নেই—তা ছাড়া সেদিন কেন যেন ভিড়টা একটু কমই ছিল।

সকাল থেকে মাত্র জনা দশেক খরিদ্দার জুটেছে।

দু দিন থেকে আবার চাকরটা নেই।

নতুন একটা হিন্দুস্থানী চাকর পাওয়া গিয়েছে—কিছু কাজ জানে না—তার সঙ্গে চেঁচাতে চেঁচাতে গলা চিরে যাবার যোগাড়।

তাও আবার মাইনা পঁচিশ টাকা এবং খায় দুবেলা চারজন লোকের ভাত।

পালমশাই বাইরের টুলটার উপর বসে গরমে কুলকুল করে ঘামছে আর বিরাট মেদবহুল কালো বপুতে অসংখ্য ঘামাচি হাতের পাখার বাঁট দিয়ে মধ্যে মধ্যে চুলকাচ্ছে আর মাছি তাড়াচ্ছে।

হোটেলের সামনে কানু এসে দাঁড়াল।

হাতে তার রবারের গুলতিটা। ঘোরাচ্ছে সেটা আঙ্গুলে ধরে—মুখটা শুকনো শুকনো।

পরনে অত্যন্ত ময়লা একটা প্যান্ট ও সার্ট।

এই, কি চাস?

সন্দিগ্ধভাবেই যেন কতকটা প্রশ্নটা ছুড়ে দেয় পালমশাই।

কানু চুপ করে থাকে। পিটপিট করে তাকায়।

যা যা—এখান থেকে ভাগ—ভিক্ষেটিক্ষে হবে না।

পালমশাই আবার খিঁচিয়ে ওঠে যেন।

কানু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, ভিক্ষে আমি চেয়েছি তোমার কাছে?

তবে কি চাস? ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

খিদে পেয়েছে।

খিদে পেয়েছে—খাবি—পয়সা আছে?

না।

হঠাৎ কথাটা মনে উদয় হয় বুঝি পালমশাইয়ের। বলে, কাজ করবি?

কি কাজ?

এই হোটেলের কাজ করবি—তবে খেতে পাবি মাইনা পাবি।

কাজ করব।

কাজ করবি?

পালমশাই এবারে যেন একটু উৎসাহী হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ—করব।

আগে কখনো কোথায়ও কাজ করেছিস?

না।

কাজ করিসনি?

না।

তবে কাজ করবি কি করে?

কেন—কাজ করব তা পারব না কেন!

বাসনটাসন ধুতে পারবি—ঘর ঝাড়ু দিতে পারবি?

হুঁ—খুব পারব।

পারবি?

হুঁ।

কত মাইনা চাস?

মাইনা—

হুঁ—বল কত চাস।

কত আপনি দেবেন?

আগে তোর কাজ দেখি তারপর ঠিক হবে—আয় ভিতরে।

কানু পায়ে পায়ে এসে ভিতরে ঢোকে।

ঠাকুর—এই ঠাকুর—

ঠাকুর গোবিন্দ এসে সামনে দাঁড়ায়।

ডাকছিলেন বাবু?

হ্যাঁ—এই ছোকরাটাকে দিয়ে বাসনগুলো মাজাও ত—রামধানিয়া কোথায়?

রামধানিয়া নতুন ভৃত্য।

গোবিন্দ বলে, তার বলে বহুৎ বুখার এসেছে।

বুখার—

হ্যাঁ—চাদর মুড়ি দিয়ে ত শুয়ে আছে।

বেটাচ্ছেলের 'বুখার' আমি দেখাচ্ছি—দেখ ত এই ছোকরা কাজকর্ম করতে পারে কি না—এই যা ওর সঙ্গে। ঠাকুর আগে ওকে কিছু খেতে দাও—ওর খিদে পেয়েছে।

কানুর দিকে তাকিয়ে পালমশাই বলে, যা ওর সঙ্গে যা—এই ছোকরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন—যা।

কানু এতক্ষণ পালমশাইয়ের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

বলে, ছোকরা ছোকরা করছেন কেন?

কি বললি?

আমার নাম কানু।

কানু—

হ্যাঁ—আমাকে কানু বলে ডাকবেন—বলতে বলতে হাতের গুলতিটা ঘোরাতে থাকে কানু।

কেন, ছোকরা বললে মান যায় বুঝি?

কানু সে কথার কোন জবাব দেয় না। ঐ সময় একটা কাক হোটেলের সামনে এসে কা কা করে চেঁচাচ্ছিল—হঠাৎ পকেট থেকে একটা নুড়ি বের করে গুলতির সাহায্যে নুড়িটা নিক্ষেপ করে কানু কাকটাকে লক্ষ্য করে।

একটা বুলেটের মতই যেন সাঁ করে গিয়ে নুড়িটা কাকটার গায়ে লাগে—কাকটা কা কা করে উড়ে পালায় ঝটপট করতে করতে যন্ত্রণায়।

পালমশাই হঠাৎ যেন চুপ করে যায়।

কানু কিন্তু আর তাকায়ও না পালমশাইয়ের দিকে।

গোবিন্দও একটু যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। সে কেবল একবার তার মনিবের মুখের দিকে তাকায়।

তার মুখেও কোন কথা নেই।

কানুই বলে, চল—কি কাজ করতে হবে?

গোবিন্দ তবু ইতস্তত করছে দেখে পালমশাই বলে, যাও ঠাকুর ওকে নিয়ে যাও।

গলার স্বরটা বেশ মোলায়েম বেশ নরম যেন এবারে।

বাসনের স্তূপ দেখিয়ে গোবিন্দ বলে, ঐ বাসনগুলো মাজতে পারবি?

কেন পারব না—খুব পারব—কানু এগিয়ে যায় পরম উৎসাহে।

অপটু আনাড়ী হাত—তা ছাড়া কানু কি জীবনে ঐসব কাজ কখনো করেছে।

সব কেমন এলোমেলা ছড়িয়ে নোংরা করে ফেলে।

গোবিন্দর কেন যেন ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে মায়া হয়েছে—সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানুকে কাজ দেখিয়ে দেয়।

আরে না না—ঐ ছাই দিয়ে আগে থালা বাটি গেলাসগুলো মেজে ফেল, তারপর কলের জলে ধুয়ে নে একটা একটা করে।

ঐ কাজ জীবনে না করলেও কানু কোনমতে কাজগুলো শেষ করে।

প্রথমটা গাটা একটু ঘিনঘিন করেছিল কিন্তু মার সেই কথা—কোন কাজই ছোট কাজ নয় সংসারে মনে রেখো কানু—মনে পড়তেই জোরে জোরে হাত চালায়।

কানু হাত ধুচ্ছে কলে।

গোবিন্দ বলে, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নে।

কানু সাবান দিয়ে হাত ধোয়।

তোর নাম ত কানু, তাই না?

হ্যাঁ।

খিদে পেয়েছিল তোর বলছিলি না?

পেয়েছে ত—দুদিন কিছু খাইনি।

চল খেয়ে নিবি।

গোবিন্দ যত্ন করে কানুকে খাওয়ায় বসিয়ে—এটা ওটা দেয়—মাছ ডিম সব দেয়।

পালমশাই জিজ্ঞাসা করে গোবিন্দকে, কি, পারল কাজ?

কখনো কাজ করেনি বলে মনে হচ্ছে।

তবে—

গোবিন্দ বলে, ও ঠিক হয়ে যাবে—আমি দেখিয়ে দেবো—তবে আমার মনে হচ্ছে বাবু—

কি?

ও কোন ভদ্র ঘরের ছেলে—বাড়ি থেকে চলেটলে এসেছে বলেই মনে হয়।

মরুকগে—তাতে আমাদের কি? আমরা ত আর ওকে ভুলিয়ে ঘর থেকে বের করে আনিনি।

তা বটে।

ওর ব্যাপার ওই বুঝবে।

॥ ৪ ॥

কানু গুরুদাস পালের অন্নপূর্ণা হোটেলেই থেকে গেল।

মাথা গোঁজবার তবু একটা ঠাঁই পাওয়া গেল—দুবেলা খাবারও জুটছে।

নিশ্চিন্ত—কানুর যেন আর কোন ভাবনাই নেই।

পরের দিন পালমশাই চেঁচিয়ে ডাকে, এই এই—কোথায় গেলি রে—এই ছেলেটা—

রান্নাঘরে ঠাকুর গোবিন্দর পাশে কানু তখন সিদ্ধ আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল পরম উৎসাহে।

কানুরও গোবিন্দকে বেশ ভাল লেগেছে।

গোবিন্দ বলে, কানু, বাবু ডাকছে—যা শুনে আয়।

কানু গোবিন্দকে গোবিন্দদা বলে ডাকে। বলে, তোমার ঐ বাবুটা একটুও ভাল নয় গোবিন্দদা।

গোবিন্দ হেসে ফেলে—বলে, কেন রে?

একদিন গুলতি খাবে আমার কাছে।

এই না না—খবরদার কানু।
কানু হাসতে হাসতে বলে, আমি বলে রাখলাম তুমি দেখে নিও।
বলতে বলতে কানু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় পালমশাইয়ের সামনে।
ডাকছিলেন কেন? আমার নাম ত কানু—কানু বলে ডাকতে পারেন না?
গুরুদাস পাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় কানুর দিকে।
কানুর হাতের গুলতিটা ঘুরছে।
ইচ্ছা করে পালমশাইয়ের একটা চড় বসিয়ে দেয় ছেলেটার গালে। কিন্তু কি জানি কেন তার সেই সদিচ্ছাটা রোধ করে নেয় প্রাণপণে।
- কাজ ত তুই কিছুই করতে পারিস না শুনলাম।
কানু কোন জবাব দেয় না।
পালমশাই বলে চলে, তা যাকগে মরুকগে—রেখেছি যখন একবার থেকে যা—কত মাইনা চাস?
মাইনা—
হ্যাঁ—কত চাস বল।
কানু কোন জবাব দেয় না।
নিঃশব্দে হাতের গুলতিটা কেবল ঘোরাতে থাকে।
পালমশাই আবার বলে, খাওয়া দুবেলা ত কম নয় আর কাজ ত কিছুই নয়—পাঁচ টাকা পাবি।
পাঁচ টাকা!
হ্যাঁ, কেন পছন্দ হলো না বুঝি? কাজ ত কিছুই জানিস না— বলতে গেলে বসে বসে মাইনা আর খাওয়া।
কানু চুপ করেই থাকে।
এখন ঐ মাইনা পাবি। দু মাস পরে দেখা যাবে—যা—ভাল করে কাজ করবি!
কানু কোন কথা বললে না এবারেও।
চলে গেল।
ভিতরে গিয়ে গোবিন্দর সামনে দাঁড়াল।
গোবিন্দদা—
কি রে—বাবু কেন ডেকেছিল রে?
বললেন মাইনা পাঁচ টাকা করে দেবেন।
গোবিন্দ অবাক হয়ে যায়।
শুধায়, কি বললি—পাঁচ টাকা?
হুঁ।
তুই কি বললি?
কি আবার বলবো।
তুই রাজি হয়ে গেলি?
কানু চুপ করে থাকে।
কানু যেন কেমন অন্যমনস্ক।
তারপর একসময় বলে, গোবিন্দদা—
কি রে!
আমি একটু ঘুরে আসছি।
কোথায় যাবি?
কোথায় আবার, স্টেশনে—
কানু আর দাঁড়াল না। চলে গেল হাতের গুলতিটা ঘুরাতে ঘুরাতে।
গোবিন্দ বুঝতে পারে ও আর ফিরবে না—চলে গেল।
কানু পিছনের দরজটা দিয়ে সরু গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তখন।
গোবিন্দ পালমশাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল, বাবু—
পালমশাই একটা মোটা খাতায় হিসাব তুলছিল, মুখ তুলে তাকাল, কিছু বলছিলে ঠাকুর?

ওকে কত মাইনা বলেছেন?

[illegible]

গোবিন্দ তবু ইতস্তত করছে দেখে পালমশাই বলে, [illegible]

গলার স্বরটা বেশ মোলায়েম বেশ নরম যেন এবারে।

বাসনের স্তূপ দেখিয়ে গোবিন্দ বলে, ঐ বাসনগুলো মাজতে পারবি?

কেন পারব না—খুব পারব—কানু এগিয়ে যায় পরম উৎসাহে।

অপটু আনাড়ী হাত—তা ছাড়া কানু কি জীবনে ঐসব কাজ কখনো করেছে।

সব কেমন এলোমেলো ছড়িয়ে নোংরা করে ফেলে।

গোবিন্দর কেন যেন ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে মায়া হয়েছে—সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানুকে কাজ দেখিয়ে দেয়।

আরে না না—ঐ ছাই দিয়ে আগে থালা বাটি গেলাসগুলো মেজে ফেল, তারপর কলের জলে ধুয়ে নে একটা একটা করে।

ঐ কাজ জীবনে না করলেও কানু কোনমতে কাজগুলো শেষ করে।

প্রথমটা গাটা একটু ঘিনঘিন করেছিল কিন্তু মার সেই কথা—কোন কাজই ছোট কাজ নয় সংসারে মনে রেখো কানু—মনে পড়তেই জোরে জোরে হাত চালায়।

কানু হাত ধুচ্ছে কলে।

গোবিন্দ বলে, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নে।

কানু সাবান দিয়ে হাত ধোয়।

তখন।

গোবিন্দদা-

কে রে—কানু!

হুঁ।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ঐ স্টেশনের দিকে।

খাবি না—আয় বোস।

কানু খেতে বসে যায়।

কানুকে খেতে বসিয়ে গোবিন্দ বাইরের ঘরে পালমশাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। গায়ের ঘামাচি পাখার বাঁট দিয়ে মারতে মারতে একটা বিড়ি টানছিল ছোট টুলটার উপরে বসে।

বাবু—

কি ঠাকুর?

ও ফিরে এসেছে!

এসেছে!

পালমশাইয়ের চোখের তারা দুটো চকচক করে ওঠে।

কিন্তু মাইনা ওকে দশই দেওয়া হবে বলেছি।

দশ—

হ্যাঁ।

কি জানি কেন পালমশাই আর আপত্তি করে না।

কানুর মাসে দশ টাকা মাইনাই ঠিক হয়ে গেল।

কানু থেকে গেল অন্নপূর্ণা পাইস হোটেলেই। কাজকর্ম টুকটাক করে—ঠাকুর গোবিন্দকে সাহায্য করে এটা ওটা।

তবে ঐ এক রোগ কানুর—কাজ করতে করতে কখন হুট্ করে হোটেল থেকে বের হয়ে যায়।

এক ঘণ্টা দু ঘণ্টাও কোন কোন সময় কোথায় ঘুরে বেড়ায় কে জানে—তারপর আবার ফিরে আসে।

আবার কাজকর্ম করে।

৫ ॥

যায় কিন্তু কানু শিয়ালদহ স্টেশনেই।

ঠিক হাওড়া স্টেশনের মতই স্টেশনটা। হাঁটতে হাঁটতে যে স্টেশনে একদিন ও এসে হাজির

...তাকে ডাকে। ঘুরে ঘুরে তাই কানু ঐ রেল লাইনের কাছেই যায়।

হেঁটে হেঁটে চলে ঐ রেল লাইন ধরে।

সে আর ফিরে যাবে না।

সেই ছোট বড় পাহাড়—উঁচুনীচু পীচঢালা পথ।

আর সেই লোহার ফটকটা—পাঁচিলঘেরা লন—ফুলের বাগান।

মাঝখানে সেই সাদা দুধের মত ধবধবে দোতলা বাড়িটা।

পোর্টিকোর পাশে সেই স্বর্ণ-চাঁপার গাছটা। গ্রীষ্মকালে সেই গাছটায় সোনালী রঙের ফুল ফুটত সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে—চট্ করে চোখে পড়ত না কিন্তু তার দোতলার শোবার ঘরে জানালাপথে বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে ভেসে আসত।

ঐ জানালাপথেই দেখা যেত গেটের দুপাশে দেবদারু গাছ দুটো।

আর পোর্টিকোর সামনে লতিয়ে ওঠা মাধবীলতার গাছটা—সঙ্গে সঙ্গে লাল ও কমলালেবু রঙের বোগানভিলার ফুলগুলো।

সেই গাছেই ছিল একটা টুনটুনি পাখীর বাসা।

লাল ঠোঁট—ডানায় গায়ে ছিট ছিট—ভারী সুন্দর পাখী দুটো।

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরও বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ঐ পাখী দুটোর ডাকাডাকি শুনত আর অপেক্ষা করে থাকত কখন সেই ঠাণ্ডা কোমল হাতটা তার কপাল স্পর্শ করবে।

সোনার চুড়ির মিষ্টি একটা রিনঝিন শব্দ।

সেই মিষ্টি ডাকটি, খোকন—

সাড়া দিত না কানু—চোখ বুজেই পড়ে থাকত।

সেই নরম কোমল হাতের আঙুলগুলো কপালের 'পরে তার চুলগুলো সরিয়ে দিতে থাকত— আবার ডাক আসত, খোকন—

মা তাকে কখনো কনকেন্দু বা কানু বলে ডাকত না—ডাকত খোকন বলেই কেবল।

খোকন—আমার সোনা—ওঠো—মুখ হাত ধুতে হবে ত—একটু পরেই মাস্টারমশাই আসবেন তারপর স্কুল।

উহুঁ—আজ ত রবিবার

উহুঁ—আজ মাত্র বুধবার।

বুধবার।

হুঁ।

কানু চোখ মেলত। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ত সামনে ঝুঁকে থাকা সেই মুখখানি।

মাথার ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ভিজে চুলের কয়েকগাছি সুন্দর ললাটের দুপাশ দিয়ে লতিয়ে নেমেছে।

দুই ভ্রূর মাঝখানে গোলাকার টকটকে লাল সিন্দুরের টিপটি।

আর সেই দুটি চোখ।

মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে মমতা আর স্নেহ যেন উপচে উপচে পড়ছে।

সত্যি আজ বুধবার মা-মণি?

হুঁ।

আজ তাহলে আমাদের গান গাওয়া হবে না?

উহুঁ—রবিবারে—সেই রবিবার।

রবিবারে—প্রত্যেক রবিবারে মার কাছে কানু গান শিখত।

মা অর্গান বাজিয়ে গাইত—

ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা

ও মার সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইত—প্রতিবার নতুন নতুন গান।

একবার দুবার গাইবার পর মা বলত, এবারে একা তুমি গাইবে খোকন।

একা একাই গাইত ও।

মার কাছে শেখা সেই শেষ গানটা—

আলোকের পথে, প্রভু, দাও দ্বার খুলে
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,

তার পরই হঠাৎ একদিন রাত্রে কি হলো।

মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

বাবাও ডাক্তার—বাবাও সঙ্গে গেল মার।

মাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যায় ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সমস্ত বাড়িতে আলো জ্বলছে।

চাকরবাকর সকলে নিঃশব্দে আনাগোনা করছে—একটা চাপা থমথমে ভাব—একটা যেন শঙ্কার ছায়া সর্বত্র থমথম করছে।

ভৈরবদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কানু, ভৈরবদা, মাকে দেখছি না—মা কোথায়?

মার খুব অসুখ—হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে তোমার মাকে।

মা কোথায়?

নীচের হলঘরে।

ছুটে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি নীচের হলঘরে—সেখানে একটা ক্যাম্প খাটের 'পরে মা শুয়ে ছিল।

চোখ বোজা।

মা-মণি—পাশে গিয়ে চুপিচুপি ডেকেছিল কানু।

একডাকেই মা চোখ খোলে। ওর দিকে তাকায়ও—দু চোখ জলে যেন ছলছল করছে।

এমন সময় পাশের চেম্বার থেকে বাবা হলঘরে এসে ঢুকল।

একি তুমি এখানে কেন—যাও যাও উপরে যাও—শুয়ে পড়গে।

তারপরই বাবা ভৈরবকে ডাকে, ভৈরব—এই ভৈরব—

ভৈরবদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে, সাহেব—

যা কানুকে উপরে নিয়ে যা।

ভৈরবদার সঙ্গে কানু উপরে চলে আসে।

উপরের ঘরের জানলাপথেই বসে বসে দেখেছিল হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স এসে মাকে নিয়ে গেল।

সেই যে মা গেল আর ফিরে এলো না।

দিন তিনেক পরে—হলঘরে ঢুকতেই সামনে যে মার এনলার্জ ফটোটা ছিল দেখা গেল ভৈরবদা একটা টুলের 'পরে উঠে তাতে মালা দিচ্ছে।

ভৈরবদা, মার ফটোতে মালা দিচ্ছিস কেন রে?

ভৈরবদা কোন জবাব দেয় না—চোখ মুছতে মুছতে সরে যায়।

ভৈরবদা, মা আসছে না কেন—মা হাসপাতাল থেকে কবে আসবে রে?

কানু বার বার জিজ্ঞাসা করে।

ভৈরবদা কোন জবাব দেয় না।

স্কুলে গিয়ে পড়তে পড়তে ভাবে বাড়ি ফিরে গেলেই হয়ত মাকে দেখতে পাবে।
দেখবে মা আগেকার মতই হলঘরে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।
খোকন—
মা-মণি—
কিন্তু কেউ থাকে না—কারো ডাক শোনা যায় না।
মা আর ফিরে আসে না।
ভৈরবদা কিছু বলে না।
ভেবেছে কতবার বাবাকে জিজ্ঞাসা করবে।
কিন্তু মানুষটাকে চিরদিনই কেমন যেন ওর ভয় ভয় করে।
লম্বা চওড়া মানুষটা।
মাথায় ঘন কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল।
মুখের থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।
চোখে কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে পুরু লেন্সের চশমা।
গলাটা যেন কেমন ভরাট—ভারী ভারী।
ডাক্তার চক্রবর্তী—ছোট পাহাড়ী শহরের নামকরা হাক্তার, প্রচুর পসার প্রচুর নাম।
তাছাড়া বাবার সঙ্গে ত কানুর কোন সম্পর্কই ছিল না কোনদিন।
মার সঙ্গেই সম্পর্ক—
মা-মণিকেই সে জানত কেবল।
মার সঙ্গেই গল্প খেলা গান।
তবু ভেবেছে কানু বাবার ঘরে ঢুকে বাবাকে জিজ্ঞাসা করবে—মা এখনো আসছে না কেন হাসপাতাল থেকে--মা কবে আসবে -
দু'একবার রাত্রের দিকে বাবার ঘরে ঢুকবার চেষ্টাও করেছে।
কিন্তু সাহস হয়নি।
একটা আরাম চেয়ারে বাবা বসে– সামনে ছোট নীচু একটা টেবিলের 'পরে একটা বোতল আর গ্লাস।
থেকে থেকে বাবা গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে।
আর মুখটা কি গম্ভীর।

মা আর এলো না।
এক মাস দু মাস হয়ে গেল মা হাসপাতাল থেকে আর ফিরে এলো না।
ইতিমধ্যে চুপিচুপি ও দু দিন হাসপাতালে গিয়ে প্রত্যেক ঘরে ঘরে খুঁজে এসেছে—মা সেখানে নেই।
মাকে সেখানে কানু খুঁজে পায়নি।
এসে ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করেছে, মাকে ত হাসপাতালে দেখলাম না ভৈরবদা—তুই যে বলেছিলি মা এখনো হাসপাতালে আছে।
হাউহাউ করে ভৈরবদা কেঁদে ফেলে।
আর ঠিক সেই সময় পেছনে বাবা এসে দাঁড়িয়েছে ওরা কেউ জানতে পারেনি কখন।
কানু—
কানু তাড়াতাড়ি ফিরে তাকায়।
বাবা—
শোন, আমার সঙ্গে এসো।
বাবা এগিয়ে যান তার নীচের বসবার ঘরে। ভয়ে ভয়ে কানু তার পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢোকে।
বাবা যেন কেমন অন্যমনস্ক—গম্ভীর।
খোলা জানালাপথে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।
কানু চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময় ধীরে ধীরে বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন—ওর মুখের দিকে তাকালেন।

কানু—তোমার মার অসুখ হয়েছিল—

কানু চেয়ে আছে কেমন যেন বোবা অসহায় দৃষ্টিতে বাপের দিকে।

We tried our best. কিন্তু—তাকে মানে—তোমার মাকে বাঁচান গেল না।

মা—

তোমার মা নেই।

নেই—

না—তিনি স্বর্গে গেছেন আমাদের ছেড়ে।

কথাটা বলে কেমন যেন বাবা আর ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন!

আর কানু—

কানু ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল যেন পাথর।

তার মা আর নেই—

আর খোকন বলে এসে কোন দিন ডেকে আদর করবে না মা।

মা নেই।

স্বর্গে—স্বর্গে গিয়েছে মা।

মা বলত মরে গেলে মানুষ স্বর্গে যায়—মা তাহলে সত্যিই তার মরে গিয়েছে—নেই।

বাড়িভরা মার ছোট বড় ফটো।

ঘরে ঘরে দেওয়ালে দেওয়ালে—ঘুরে ঘুরে সেই সব ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় কানু।

মা-মণি—সত্যিই তুমি নেই—

চলে গেলে তুমি!

আমাকে বললে না—তুমি চলে গেলে!

তারপর একদিন—

স্কুল থেকে এসে কানু থমকে দাড়াল—হলঘরে এনলার্জ ফটোটা নেই।

কোথায় গেল মার ফটোটা—

ভৈরবদাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি ওঠে কানু—আশ্চর্য! সিঁড়িতে মার যে ফটোটা ছিল তাও নেই—

একি—মার কোন ফটোই কোথায়ও নেই!

ভৈরবদা—এই ভৈরবদা—

চীৎকার করে ডাকে কানু।

ভৈরব তাড়াতাড়ি এসে সামনে দাঁড়ায়।

ভৈরবদা—

কি?

মার ফটোগুলো একটাও দেখছি না—ফটোগুলো কোথায় গেল!

ভৈরব চুপ করে থাকে। কোন কথা বলে না।

কথা বলছিস না কেন ভৈরবদা—মার ফটোগুলো সব গেল কোথায়? এই ভৈরবদা বলনা?

ভৈরব এবারে কেঁদে ফেলে।

কাঁদছিস কেন—এই ভৈরবদা—

ভৈরব তবু কাঁদেই, কোন জবাব দেয় না।

মার ছবিগুলো কোথায় গেল বলনা?

সাহেব সব খুলে ফেলতে বলে গিয়েছে।

বাবা—

হুঁ।

বাবা মার সব ফটো খুলে ফেলতে বলেছে—কেন? বল না—এই ভৈরবদা—

তোমার নতুন মা আসছে।

নতুন মা!

হ্যাঁ।

কি বলছিস যা তা—নতুন মা আবার কে—বাবা কোথায়?

সাহেব তোমার নতুন মাকে আনতে গিয়েছে—কাল বিকালে এসে পৌঁছাবে।

হঠাৎ যেন কেমন বোবা হয়ে গিয়েছিল কানু।

মার ফটো সব খুলে ফেলা হয়েছে—নতুন মা আসছে এ বাড়িতে। বাবা নতুন মাকে আনতে গিয়েছে—।

নতুন মা!

প্রথমে মনটা খুব খারাপ লাগে—তারপর ক্রমশঃ কানুর মনটা যেন কেমন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে কি একটা বিশ্রী আক্রোশে যেন ফুঁসতে থাকে নিজের মনের মধ্যেই নিজে কানু।

খেল না—কিছু না—নিজের ঘরে গিয়ে ভিতর থেকে খিল তুলে দিয়ে শুয়ে রইল।

ভৈরব কত ডাকাডাকি করল কিন্তু দরজা খোলেনি কানু।

কানের মধ্যে কেবল একটি কথা বাজছে—নতুন মা—নতুন মা আসছে। বাবা নতুন মাকে আনতে গিয়েছে—।

না, না—কিছুতেই তা হতে পারে না।

হতে দেবে না সে।

নতুন মা এখানে আসবে না।

কিন্তু পরক্ষণেই বাবার চেহারাটা চোখের 'পরে ভেসে উঠতেই সব সাহস যেন কোথায় উবে যায়, দু চোখ ভরে জল এসে যায়।

মা—মা-মণি—কেন তুমি চলে গেলে,—কেন তুমি চলে গেলে স্বর্গে—কি হয়েছিল তোমার যে তুমি স্বর্গে চলে গেলে।

হঠাৎ মনে পড়ল পড়ার বইয়ের মধ্যে মার একটা ফটো আছে—মার অ্যালবাম থেকে সে খুলে নিয়েছিল সর্বদা কাছে রাখবে বলে মার কাছ থেকে চেয়ে।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বইটা বের করতেই ফটোটা তার মধ্যে পেল।

মা—মা-মণি, জান এ বাড়িতে নতুন মা আসছে।

আসুক—যে খুশি আসুক।

আমি আর এ বাড়িতে থাকব না।

শুনছো মা-মণি—আমি আর এখানে থাকব না।

সেই রাত্রেই—

সবাই ঘুমোচ্ছে। বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ।

কেবল সিঁড়ির আলোটা জ্বলছে।

কানু ঘর থেকে পা টিপে-টিপে বের হয়ে এলো সঙ্গে মার ফটোটা আর তার প্রিয় গুলতিটা।

এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো।

গেট দিয়ে বের হয়ে রাস্তায় এসে পড়ল।

কোথায় যাবে এখন সে—কোথায়?

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকেই যায় কানু।

স্টেশন।

দূরে লাল সিগন্যালের আলোগুলো অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে।

কানু রেল লাইনের উপরে এসে দাঁড়ায়।

হাঁটতে শুরু করে তারপর রেল লাইন ধরে।

রাত শেষ হয়—ভোর হয়।

রেল লাইনের ধারে বসে কোন স্টেশনে কিছু খেয়ে নেয়—দুটো টাকা মার সিন্দুরের কৌটো থেকে আসবার সময় নিয়ে এসেছে তারপর আবার লাইন ধরে হাঁটতে থাকে।

মধ্যে মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, একটা আক্রোশ ফুঁসছে যেন মনের মধ্যে।

টেলিগ্রাফের তারের উপর একটা পাখী বসে।

হাতের গুলতির সাহায্যে একটা নুড়ি ছোড়ে সেই পাখীটাকে নিশানা করে।

পাখীটা ঝটপট করতে করতে নীচে পড়ে যায় চেঁচাতে চেঁচাতে যন্ত্রণায়।

বানু সেদিকে তাকায়ও না।

হাঁটিতে শুরু করে আবার।

॥ ৬ ॥

আবার বোধহয় জ্বর এলো।

চোখ দুটো জ্বালা করছে—গলাটা শুকিয়ে উঠছে।

কৌশিক শয্যার উপর শুয়ে পড়ে।

এবং আশ্চর্য—

জগন্নাথ দত্তর আর টিকিটিও দেখা যায় না সত্যি সত্যিই— ভেবেছিল হয়ত একটু পরেই এসে হাজির হবে, কিন্তু এলো না।

চিরদিনই আলগা অগোছাল স্বভাব কৌশিকের—জীবনটাই যেন তার এলোমেলো বিশৃঙ্খল।

কোনমতে এখানে ওখানে জিনিসগুলো রেখে দেয়।

কেবল বুকভরা মমতা যেন কৌশিকের তার বেহালাটার উপরে আর নিত্য আপন খেয়াল খুশিমত যে সব সুর রচনা করে, পাতা ভরে স্বরলিপি লেখে সেই কাগজগুলোর উপরে।

সকালবেলা যখন হঠাৎ জগন্নাথ দত্ত এসে একটা ঝড়ো হাওয়ার মত হাজির হয়েছিল ভাড়ার তাগাদায় তার ঘরে—নতুন একটা সুর তন্ময় হয়ে সে তুলছিল।

গত দু দিন দু রাত থেকে সেই সুরটা নিয়েই যেন নেশার মত ডুবে আছে কৌশিক।

কোথায় যেন একটুখানি বাদ থেকে যাচ্ছে কি?

সামান্য একটু অমিল?

আর কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না যেন কৌশিক।

বেহালাটা আবার কাঁধে তুলে নিল কৌশিক।

নতুন করে সুরটা আবার ধরবার চেষ্টা করে।

এলোমেলো সুরটাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু পারে না, শুয়ে পড়ে বেহালা রেখে।

দুপুরের দিকে জ্বরটা একটু কম হতে কৌশিক আবার বেহালাটা তুলে নেয়—তারের বুকে ছড় টানে। সুর জাগে।

গলির মুখে বিরাট একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ঐ দিন দ্বিপ্রহরে।

কালো রংয়ের লেটেস্ট মডেলের সুপারলাকসারি বুইক গাড়ি। ঐ সরু রাস্তায় অতবড় গাড়িটা ত ঢুকবে না।

ড্রাইভার গাড়িটা তাই থামায় গলির মুখেই।

কি হলো ব্রিজ সিং?

গাড়ির আরোহিণী জিজ্ঞাসা করে, এইখানেই নাকি?

নেহি দিদিমণি—থোড়া ভিতর যানে হোগা।

চলো।

লেকেন গাড়ি এতনা ছোটা রাস্তামে ঘুষেগা নেহি দিদিমণি।

ওঃ তাহলে—

অনীতা ব্রিজ সিং ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকায়।

ম্যায়নে যাউ বাবুজীকো বোলাকে লাউ—

না, না—

অনীতা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

লেকেন দিদিমণি—

ব্রিজ সিং তুমি গাড়ি এখানেই রাখো—আমি নেমে যাচ্ছি।

ব্রিজ সিং উঠে গাড়ি থেকে নেমে সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

অনীতা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। তারপর গলির মধ্যে এগিয়ে যায়।

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর।

মাথার উপরে প্রখর রৌদ্রের তাপ।

অনীতা সে সব কিছুই ভ্রূক্ষেপ করে না।

চপল পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চলে।

পরনে একটা দামী ঢাকাই শাড়ি, সাধারণ একটা চিকনের ব্লাউজ গায়ে।

মাথার চুল লম্বা একটা বিনুনির আকারে পিঠের 'পরে ঝুলছে।

মাথার চুলে তেল না দেওয়ার দরুন একটু রুক্ষ।

দু হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি।

গলায় সরু একটা সোনার বিছেহার।

রোগা পাতলা চেহারা।

মুখখানিও লম্বা ধরনের কিন্তু অপূর্ব শ্রী মুখখানিতে যেন।

গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম।

গলি পথটা একেবারে নির্জন বললেও হয় ঐ সময়।

একটা কুকুর একটা বাড়ির রোয়াকে বসে জিভ বের করে দারুণ গ্রীষ্মে হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে।

একটা বাড়ির দোতলার ঝুল বারান্দা থেকে গোটা দুই শাড়ি ঝুলছে।

মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ছে শাড়ি দুটো।

অনীতা দুপাশের বাড়ির নম্বরগুলো চেয়ে দেখতে দেখতে এগোয় থেমে থেমে।

আট দশটা বাড়ি পার হবার পরই হঠাৎ বেহালার একটা সুর কানে গেল অনীতার।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ায় অনীতা।

চোখের মণি দুটো যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এদিকে ওদিকে তাকায় অনীতা।

ক্লান্ত দ্বিপ্রহরের নির্জনতায় বেহালার সুরটা ভেসে আসছে।

ভাল করে শুনবার চেষ্টা করে অনীতা।

বেহালার সুর কানে যেতেই বুঝতে পেরেছে অনীতা এ সুর আর কারো নয় কৌশিকেরই বেহালার সুর- এ সুর তার চেনা—অনেক দিনের অনেক চেনা।

দাঁড়িয়েছিল অনীতা—আবার এগোয়।

আরো দুটো বাড়ির পরেই দোতলা একটা পুরানো বাড়ি— সেই বাড়িরই নীচের তলার কোন একটা ঘর থেকে সুর ভেসে আসছে।

একটা সদর দরজা আছে বটে—সেটা বন্ধ।

অনীতা এদিক ওদিক তাকায়।

বেহালার সুর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ নজরে পড়ে রাস্তার উপর একটা ঘরের দরজা আধখোলা।

এগিয়ে গেল অনীতা সেই দরজাটার দিকেই এবারে।

হ্যাঁ, সেই ঘরের ভিতর থেকেই বেহালার সুর শোনা যাচ্ছে।

একটু বুঝি ইতঃস্তত করে অনীতা। তারপরই হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল একেবারে দরজার কপাট দুটো।

তার ভুল হয়নি।

এলোমেলো অগোছাল ছোট্ট ঘরটার মধ্যে একরাশ কাগজ ছড়িয়ে ভাঙা একটা চৌকির উপর বসে বেহালাটা থুতনিতে বুকের 'পরে চেপে ধরে আপনমনে বাজাচ্ছে কৌশিক।

সুরের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে কৌশিক।

অনীতা ঘরের মধ্যে ঢুকল।

কৌশিক কিন্তু সেদিকে তাকায়ও না ফিরে।

তাকাবে কি সে জানতেই পারেনি।

সুরের মধ্যে তন্ময় সে তখন।

আবিষ্ট।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মুহূর্ত অনীতা বেহালা বাজান শোনে—ওকে ডেকে ওর সুরের তন্ময়তা ভাঙাতে যেন ওর মন চায় না।

কেমন যেন একটা দ্বিধায় ইতঃস্তত করে অনীতা।

নজর পড়ে যায় একসময় হঠাৎ কৌশিকেরই।

অন্যমনস্কভাবে একসময় কৌশিক মুখ তুলে তাকাতেই ঘরের মধ্যে একেবারে দরজার গোড়ায় দণ্ডায়মান অনীতাকে দেখতে পায়।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন ব্যাপারটা সত্যিই সে বুঝতে পারেনি।

অনীতা এ সময় তার ঘরে!

এই দুপুরে!

কৌশিক চেয়েই থাকে।

কি দেখেছো অমন করে চেয়ে চেয়ে—আমিই—

অনীতা মৃদুকণ্ঠে হাসতে হাসতে বলে।

তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়।

তুমি!

হ্যাঁ আমি।

মৃদু হাসে অনীতা এবারে।

দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দেয় অনীতা তারপর বলে, উঃ কত কষ্টে যে তোমার ঠিকানাটা খুঁজে বের করেছি।

কৌশিক চেয়ে থাকে অনীতার মুখের দিকে।

॥ ৭ ॥

কি--বসতে বলবে না আমাকে?

অনীতা শুধায় এবার কৌশিকের মুখের দিকে চেয়ে।

বসবে?

তবে কি তোমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েই থাকবো নাকি!

অসহায়ের মত কৌশিক তার নিজের এলোমেলো ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় একবার।

সব এলোমেলো বিশৃঙ্খল।

রাস্তা থেকে সকালে জিনিসগুলো কোনমতে তুলেই এনেছে, কিছুই গোছান হয়নি—আর গোছাবেই বা কে।

কিন্তু ঘরটাকে সত্যি এ কি করে রেখেছো বলতো!

অনীতাই এবার চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

কৌশিক উঠে দাঁড়ায়, বোস।

অনীতা তবু বসে না।

বিছানাটাও এলোমেলো—স্বরলিপির পাতাগুলো চারিদিকে ছড়ান।

কৌশিক বোধহয় ব্যাপারটা এবারে বুঝতে পারে। কাগজগুলো তুলে কোনমতে একটু গুছিয়ে একপাশে সরিয়ে অনীতার জন্য বসবার জায়গা করে দেয়।

বোস।

অনীতা বসল।

তারপরই হঠাৎ দুজনেই চুপচাপ।

কেউ কোন কথা বলছে না।

তুমি একাই এসেছো নাকি?

হঠাৎ আবার একসময় প্রশ্ন করে অনীতাকে কৌশিক।

হুঁ।

একা?

ব্রিজ সিং এসেছে।

কৌশিক আবার চেয়ে থাকে অনীতার মুখের দিকে।

অমন করে কি দেখেছো আমার মুখের দিকে চেয়ে? অনীতা মৃদু হেসে প্রশ্ন করে।

অনীতার কথার জবাবে ম্লান হাসি হেসে কৌশিক বলে, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে ভারি ভাল লাগছে সত্যি।

সত্যি বলছো ভাল লাগছে!

অনীতা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ নীতা—কি মনে হচ্ছে জান?

কি?

আমার ছোট্ট ঘরের সব জানালাগুলো যেন একসঙ্গে খুলে গিয়েছে হঠাৎ একটা বসন্ত বাতাসের ধাক্কায়।

বিশ্বাস করি না আমি একটুও তোমার ঐসব কথা।

বিশ্বাস কর না?

না।

মৃদু হাসে কৌশিক।

আমার কথা কখনো তোমার মনেও যে পড়েনি তাও আমি জানি এ কয় মাস।

কি করে বুঝলে?

সে জানি আমি।

জানো?

হ্যাঁ—কিন্তু যাক সে সব কথা, তোমাকে বড্ড রোগা দেখাচ্ছে কৌশিক। অসুখ করেছিল বুঝি?

সে এমন কিছু না—একটু জ্বর হয়েছিল।

কৌশিক যেন প্রসঙ্গটা এড়াবার চেষ্টা করে।

একটু জ্বর হলে বুঝি এমনি কারো চেহারা হয়ে যায়। খুব অসুখ হয়েছিল না?

না, না—এই সামান্য একটু জ্বর।

সামান্য একটু জ্বর?

হুঁ।

তা—জ্বর হলো কেন?

বাঃ জ্বর হবে না মানুষের—জ্বর হয় না বুঝি মানুষের। তোমার হয় না?

কৌশিক হেসে ফেলে।

আগেও ত তোমার কয়েকবার জ্বর হয়েছে।

হয়েছে তাতে কি! আবার হাসে কৌশিক।

এখন জ্বর নেই ত?

না।

তবে চোখ দুটো অমন ছল্ ছল্ করছে কেন?

কৌশিক আবার হাসে।

দেখি।

কপালটা ছোঁবার জন্য বুঝি কৌশিকের দিকে হাত বাড়ায় অনীতা।

কৌশিক যেন ছেলেমানুষের মত মাথা দুলিয়ে বলে, না না—জ্বর ত এখন নেই, ছেড়ে গেছে—এখন ভালই আছি।

কিন্তু কৌশিকের সে কথা শোনে না অনীতা—মানে না।

কৌশিকের কপালটা স্পর্শ করে আলতোভাবে অনীতা।

একি—গা ত বেশ গরম দেখছি! অনীতা বলে।

ওরকম সবারই থাকে—তোমার বুঝি থাকে না। তাছাড়া বাইরে কি রকম রোদ—কি গরম পড়েছে।

বাইরে রোদ থাকলে বুঝি গা গরম হয়—দেখ ত আমার গা কত ঠাণ্ডা।

ওসব কথা থাক—আমার এখানকার ঠিকানা তুমি পেলে কি করে বলত? প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যই বুঝি কথাটা তাড়াতাড়ি বলে কৌশিক।

বিমলবাবু—তোমার বন্ধু—সেই যে—

বিমল!

হাঁ—যে ব্লু মুন হোটেলে অর্কেস্ট্রা বাজায়—পিয়ানো অকের্ডিয়ান।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

এতদিন ধরে কত চেষ্টা করেছি কিছুতেই পাই না, শেষে বিমলবাবুর কথা মনে পড়ায় হোটেলে তাকে ফোন করেই ত তোমার ঠিকানাটা কাল সন্ধ্যায় পেলাম। ব্রিজকে বললাম তারপর খোঁজ নিতে জায়গাটা কোথায়—কাল সে এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছে।

কৌশিক মৃদু মৃদু হাসে।

অনীতা বলে, আমি চেষ্টা করে তোমাকে খুঁজে না বের করলে হয়ত তুমি নিজে থেকে কোন দিনই আমাকে জানতে দিতে না কোথায় তুমি আছো।

তাই বুঝি? মৃদু হেসে কৌশিক বলে।

হ্যাঁ, কিন্তু সেই মেসটা ছেড়ে এখানে তুমি চলে এলে কেন বলত!

একই জায়গায় বুঝি চিরদিনই কারো থাকতে ভাল লাগে!

তাই বলে এমনি একটা ঘরে।

কেন—ঘরটাত বেশ।

বেশ বৈকি—আলো নেই হাওয়া নেই।

কে বললে? সকালে রোদ আসে। আর হওয়াও আসে রাত্রে।

হ্যাঁ—সেত দেখতেই পাচ্ছি।

তোমার দাদা এখন কোথায় নীতা?

বনয়ে।

অনেক দিন হয়ে গেল সে জার্মানীতে গিয়েছে না?

হাঁ—প্রায় দেড় বছর, তুমিও গেলে না কেন কৌশিক?

কোথায়?

ইউরোপে—যেতে ইচ্ছা করে না তোমার?

যেতে ইচ্ছা করলেই বুঝি যাওয়া যায়, কিন্তু আর তুমি দেরী করোনা কিন্তু অনী।

কেন? অনীতা কৌশিকের মুখের দিকে তাকাল।

তোমার বাবা মিঃ ব্যানার্জী জানতে পারলে খুব রাগ করবেন হয়ত—

বাবা জানবে কি করে—জানতে পারলে ত।

না না—এ উচিত নয়।

কি উচিত নয়?

যা তিনি পছন্দ করেন না তা করা উচিত নয় তোমার।

বেশ, বেশ—অত তোমাকে না ভাবলেও চলবে।

অভিমানের একটা সুর যেন অনীতার গলায় ফুটে ওঠে।

তোমার গাড়ি কোথায়? কৌশিক জিজ্ঞাসা করে।

বড় রাস্তায়।

চল তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।

ব্যস্ত হচ্ছো কেন, যাবোই ত—তারপর একটু থেমে বলে, জান কৌশিক—

কি?

এবার সামারে মুসৌরি যাচ্ছি আমরা।

যাও—মুসৌরি শুনেছি ভারি চমৎকার জায়গা—দেরাদুন থেকে মুসৌরির আলো দেখা যায়।

হঠাৎ আবার ডাকে অনীতা—কৌশিক?

কি?

নতুন সুর কি কম্পোজ করলে বল।

নতুন সুর?

হুঁ।

দুটো করেছি, কিন্তু—

কি?

তেমন ভাল হয়নি। আমার তেমন ঠিক পছন্দ হয়নি।

শোনাবে না আমাকে?

শোনাব।

কবে?

তুমি মুসৌরি থেকে ফিরে এসো—তারপর একদিন শোনাব।

হুঁ—তার মধ্যে আবার তুমি কোথায় হারিয়ে যাবে। উঃ, এই ছ মাস তোমাকে কত যে খুঁজেছি, কত তোমার কথা ভেবেছি—তারপর হঠাৎ বিমলবাবুর কথা মনে পড়ল একদিন। তারপরই একটু থেমে বলে, জান—

কি?

রোজ রেডিও প্রোগ্রাম দেখতাম—তোমার বাজনা যদি থাকে, কিন্তু—

বাজাই না ত আজকাল আর রেডিওতে।

কেন?

ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না কেন?

ওরা ত আমার খেয়ালখুশিমত বাজাতে দেয় না—তুমি ত জান ফরমায়েশী আমি বাজাতে পারি না আর ঐ একঘেয়ে সব বাঁধাধরা সুরও আমার বাজাতে ভাল লাগে না।

কেন?

তাতে চমক কোথায়—আবিষ্কারের আনন্দ কোথায়? নতুন কিছু একটা আবিষ্কারের মধ্যে যে ব্যথা যে আনন্দের স্পন্দন সেটা ত থাকে না ঐ চিরাচরিত একঘেয়েমির মধ্যে।

তারপরই একটু থেমে কৌশিক আবার বলে, তোমাকে দেখে কিন্তু সত্যিই ভাল লাগছে অনীতা।

তারপর একটু থেমে কৌশিক আবার বলে, তোমরা কবে মুসৌরি যাচ্ছো?

এখনো ঠিক হয়নি—তবে এই মাসের শেষেই ত বাবার হাইকোর্ট বন্ধ হবে তারপরই যাবো—তুমিও চলো না কৌশিক।

কোথায় মুসৌরি?

হ্যাঁ—চলনা। তুমি অন্য একটা হোটেলে উঠো—রোজ বিকেলে তোমার সঙ্গে গিয়ে আমি দেখা করব।

কৌশিক মৃদু হেসে বলে, তারপর?

তারপর দুজনে আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবো। সত্যি—ভারী মজা হয় তাহলে।

ছেলেমানুষ।

কে?

কে আবার তুমি।

আমি ছেলেমানুষ!

নয়ত কি।

হ্যাঁ—আমি ছেলেমানুষ—কত বয়স হলো আমার জান?

কত?

গত বার্থ ডে-তে আমি উনিশে পড়েছি।

সত্যি নাকি!

সত্যি নয়ত কি মিথ্যে বলছি নাকি। আচ্ছা কৌশিক—

কি?

তুমি রেকর্ডে বাজাও না কেন?

শুধু বাজনা কে শুনবে।

শোনে না বুঝি—কিন্তু আমার ত তোমার বাজনা শুনতে খুব ভাল লাগে।

জান অনী—

কি?

আমি গান লিখেছি।

গান—সত্যি!

হ্যাঁ—সে গানের সুরও দিয়েছি আমিই—তুমি বলেছিলে না গানে সুর দিই না কেন।

সত্যি—সত্যি গান লিখে সুর দিয়েছো!

হুঁ। কিন্তু—

কি?

গান কিন্তু আমি গাইতে পারি না। তাই ভাবছি আমার সুর দেওয়া গান কে গাইবে।

আমাকে শিখিয়ে দেবে সে গান তোমার, আমি গাইব।

আনন্দে যেন উথলে ওঠে কৌশিক।

বলে, গাইবে তুমি—গাইবে তোমার গলায় আমার সেই গান—আমি শুনবো!

শিখিয়ে দিও, আমি গাইবো—নিশ্চয়ই গাইবো।

হ্যাঁ, তুমি মুসৌরি থেকে ফিরে এসো তারপর শিখিয়ে দেবো তোমাকে সেই গান।

এখনই দাও না।

কৌশিক হাসে, এখনো সুরটা আমার পুরোপুরি পছন্দ হয়নি যে—আমার প্রথম গান—প্রথম সুর।

আমার এমন বিশ্রী লাগছে কৌশিক।

কেন?

মুসৌরি না গেলে এখনই তোমার গান শিখে নিতাম।

তাতে কি—ঘুরে এসে তারপর শিখো—আচ্ছা, শান্তনু চিঠি লেখে না?

লেখে।

কিন্তু আজ আর না—চল ওঠো।

কৌশিক আবার তাগিদ দেয়।

তুমি যেন আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচো।

কৌশিক হাসে।

না আমি যাবো না এখন।

মুখটা ফুলিয়ে ছোট্ট একটি মেয়ের মত যেন কথাটা বলে অনীতা।

কৌশিক বলে, ঐ জন্যই ত বলি তুমি এখনো এমন ছেলেমানুষ আছো—

আর তুমি বুঝি বুড়ো থুরথুরে হয়ে গিয়েছো?

তোমার মত ছেলেমানুষ নই, ওঠো।

উঃ, আমাকে না তাড়ানো পর্যন্ত তুমি যেন সুস্থির হতে পারছো না। বেশ এই আমি চললাম—আসবো না—আর কোন দিনও আসবো না।

অভিমানে ছেলেমানুষের মতই ঠোঁট দুটো যেন ফোলায় অনীতা।

এবং বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কোন দরকার নেই।

অনীতা দরজাটা খুলে পা বাড়ায় যাবার জন্য।

কৌশিকও পা বাড়ায়।

শরীরটা সত্যিই দুর্বল হয়েছে কৌশিকের।

কিছুদিন থেকেই জ্বর হচ্ছে—সন্ধ্যারাত্রের দিকে কেমন যেন চোখ মুখ জ্বালা করে জ্বর আসে—পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে যায় বার বার। তখন বেহালা বাজাতেও যেন ভাল লাগে না।

খোলা জানালাপথে চেয়ে থাকে ছোট্ট এক ফালি যে আকাশটা দেখা যায় সেই আকাশটুকুর

দিকে।

কখন রাত শেষ হবে।

কারণ তখন একটু একটু করে ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছাড়বে।

দিন দুই হলো সন্ধ্যার দিকে জ্বরটা আসছিল না---কিন্তু গতকাল থেকে আবার আসছে।

কৌশিক অনীতার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। মাথার উপরে রোদের তাপ বেশ প্রখর।

অনী—

কি?

শান্তনুর ঠিকানাটা আমাকে দেবে?

দোব। দাদাকে আজই তোমার কথা লিখব।

সত্যি লিখবে?

হুঁ—ব্রিজকে দিয়ে ঠিকানাটা পাঠিয়ে দেবো।

ব্রিজ সিং মনিব কন্যাকে এখনো আসতে না দেখে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, এখন তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

অনীতা গাড়ির মধ্যে উঠে বসে।

চলি।

এসো।

গাড়িটা ছেড়ে দিল।

গাড়ির জানালাপথে অনীতার মুখটা দেখা যায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

গাড়িটা মোড় নিল ডাইনে।

আর দেখা গেল না অনীতার মুখটা।

॥ ৮ ॥

কৌশিক ফিরে এলো তার ঘরে।

ঘরে ঢুকে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে ঢক্ ঢক্ করে খেল।

বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

দেওয়ালে পেরেকের সঙ্গে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেটটা হাতড়ে দেখল মাত্র বার আনা পয়সা অবশিষ্ট আছে।

এক কাপ চা আর গোটা দুই টোস্ট বড় রাস্তার ধারে জয়ন্ত কেবিন থেকে গিয়ে খেয়ে এলে মন্দ হতো না।

কিন্তু এত দুর্বল লাগছে---

বেরুতে ইচ্ছা করছে না। তাছাড়া বাইরে এমন প্রচণ্ড রোদ।

একটু বের হয়েই মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে---পা দুটো কাঁপছে।

সত্যিই বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে যেন কৌশিক।

শয্যার উপরে এসে শুয়ে পড়ল আবার।

কিন্তু শুয়ে থাকতেও ভাল লাগে না, উঠে বসে আবার কৌশিক।

আবার বেহালাটা তুলে নেয়।

এ বাড়িটা ছাড়তেই হবে---জগন্নাথ দত্ত কালই হয়ত আবার এসে হাজির হবে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে।

সম্বল ত মাত্র ঐ অবশিষ্ট বার আনা পয়সা।

অনেক দিন পরে অনীতার সঙ্গে দেখা হলো। অনীতা তাকে খুঁজে খুঁজে বের করেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা বোধহয় ভাল হলো না।

অনীতার এখানে আসা উচিত হয়নি।

অনীতার বাবা ব্যারিস্টার অচিন্ত্য ব্যানার্জী জানতে পারলে হয়ত মেয়েকে বকাবকি করবেন। তারপর যদি জানতে পারেন ব্যারিস্টার সাহেব ড্রাইভার ব্রিজ সিং এখানে তাকে নিয়ে এসেছিল তাকেও হয়ত নিষ্কৃতি দেবেন না।

শেষ দিনের কথাটা মনে পড়ে কৌশিকের।

অনীতা সেদিন অসুস্থ ছিল—ও জানত না। দু দিন থেকে তার জ্বর।

যেমন বেহালা শেখাতে যেতো কৌশিক তেমনি গিয়েছিল। ভৃত্য মধু বললে, দিদিমণি উপরে তার ঘরে শুয়ে আছে।

শুয়ে আছে কেন? কৌশিক শুধায়।

দিদিমণির জ্বর।

অনীতার জ্বর শুনেই মনটা তার কেমন করে ওঠে। বলে, দিদিমণিকে একবার দেখতে পারি?

আপনি বসুন, দিদিমণিকে খবর দিচ্ছি।

একটু পরে মধু ফিরে এলো।

বললে, চলুন দিদিমণি উপরের ঘরে আপনাকে ডাকছে।

ইতিপূর্বে কৌশিক কখনো উপরে যায়নি।

বাইরের ঘরে বসেই অনীতা কৌশিকের কাছে বেহালা বাজানো শিখত।

অচিন্ত্য ব্যানার্জীর পুত্র শান্তনু তার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। একটা জলসায় দাদার সঙ্গে গিয়ে কৌশিকের বেহালা বাজানো শুনে অনীতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

এবং যখন শোনে ঐ কৌশিক তারই দাদার এক সময় ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল—বিশেষ বন্ধু— কৌশিকের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

আলাপ করিয়ে দাও না দাদা তোমার ঐ বন্ধুর সঙ্গে।

শান্তনু বন্ধুর সঙ্গে বোন অনীতার আলাপ করিয়ে দেয়।

তারপর অনীতারই আমন্ত্রণে একদিন ওদের উডস্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে বেহালা বাজিয়ে অনীতাকে শুনিয়ে আসে।

তার কয়েকদিন পরেই শান্তনু খুঁজে খুঁজে তার বন্ধু কৌশিকের মেসে এসে তাকে বলে, অনীতাকে সে বেহালা বাজানো শেখাতে রাজী আছে কি না। অনীতার খুব শখ হয়েছে বেহালা বাজানো শিখবে।

কৌশিক হেসে বলে, বেশ ত।

কিন্তু একটা কথা ভাই, তোমাকে কিন্তু পারিশ্রমিক নিতে হবে।

কৌশিক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, ক্ষমা কর ভাই—তাহলে পারব না।

কেন পারিশ্রমিক নেবে না কেন—এটা ত তোমার প্রফেশন।

মিথ্যে নয় যেমন কথাটা একেবারে তেমনি সত্যিও নয় পুরোপুরি। তাছাড়া—

কি বল?

অভাব আছে আমার ঠিকই কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি করতে পারব না।

পারিশ্রমিক নিতে কিছুতেই স্বীকার করাতে পারেনি কৌশিককে শান্তনু।

অনীতাকে কৌশিক লেস্‌ন্ দিতে শুরু করে।

আদরিণী কন্যা অনীতা অচিন্ত্য ব্যানার্জীর।

তার শখ হয়েছে সে বেহালা শিখবে—অচিন্ত্য ব্যানার্জীও হেসে মত দিয়েছিলেন।

সপ্তাহে এক দিন বা দু দিন আসত কৌশিক।

ঐ সময়ই শান্তনু হায়ার স্টাডির জন্য জার্মানীতে চলে গেল।

কৌশিক বাইরের ঘরে বসেই অনীতাকে লেস্‌ন্ দিত, তারপর একসময় চলে যেতো।

সেদিন অনীতার ডাকে ভৃত্যের পিছনে পিছনে কৌশিক দোতলায় তার শয়নঘরে এসে ঢোকে।

বিরাট ঘর।

দামী দামী সব আসবাব।

ঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা। পুরু কার্পেট, পায়ের পাতা ডুবে যায় হাঁটতে গেলে।

বিরাট একটা পালঙ্ক।

ডানলোপিলোর শয্যা। সেই শয্যায় বালিশে হেলান দিয়ে আধবসা আধশোওয়া অবস্থায় ছিল অনীতা।

পরনে নাইটি ড্রেস।

তারে উপরে একটা দামী সিল্কের নাইট গাউন।

মাথার রুক্ষ চুল গালের দু'পাশ দিয়ে বুকের দু'পাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

এসো কৌশিক।

ইতিমধ্যে দুজনার মধ্যে গত চার মাসে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। দুজনা দুজনার অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

পরস্পর পরস্পরের কাছে আপন হয়ে গিয়েছিল।

তোমার জ্বর হয়েছে অনীতা?

হুঁ, দুদিন হ'ল, বোস।

মধু কৌশিককে ঘরে পৌঁছে দিয়েই চলে গিয়েছিল।

কৌশিক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

অত দূরে কেন—আর একটু কাছে এসে বোস—এসো না।

কৌশিক অনীতার অনুরোধে অনীতার শয্যার কাছটিতে একেবারে চেয়ারটা টেনে আনে।

খুব জ্বর?

জ্বর ছিল, এখন বোধহয় নেই।

সত্যি বলছো?

মৃদু হেসে অনীতা বলে, হুঁ—দেখো না কপাল ছুঁয়ে।

কৌশিক ঝুঁকে অনীতার কপালটা ছোঁয়।

ঈষদুষ্ণ কপাল।

অনীতা কৌশিকের ঠাণ্ডা হাতটা নিজের ঈষৎ তপ্ত হাত দিয়ে চেপে ধরে, আঃ তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা কৌশিক।

কৌশিক অনীতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে নিঃশব্দে।

আজ ত শেখা হবে না কৌশিক—তুমি একটু বাজিয়ে শোনাও না।

না—আজ থাক।

কেন?

না—বিশ্রাম নাও—আজ এবারে আমি উঠি।

উঠবে?

হ্যাঁ, রাত হলো।

তাতে কি—বোস না আর একটু—

অনীতা কৌশিকের হাতটা চেপে ধরে।

যেতে দেবে না ওকে।

বলে, এখনই তোমার যাওয়া হবে না—একা একা এত বড় বাড়িতে রোগে বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে এত বিশ্রী লাগছে—দাদাভাইটা চলে গিয়ে বাড়িটা যেন একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে।

কেন, আর কেউ নেই বাড়িতে?

কে আর থাকবে—আমরা দু ভাই বোন, বাবা আর সব চাকরবাকর আয়া।

মা তোমার অনেকদিন মারা গিয়েছেন, তাই না?

হ্যাঁ—আমি তখন মাত্র দশ বছরের। কৌশিক—

কি?

যে কয়দিন সুস্থ না হই তোমায় কিন্তু রোজ আসতে হবে এই সময় একবার করে।

রোজ?

হুঁ।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নয়—বলো আসবে—ব—

কথাটা অনীতার শেষ হলো না। অকস্মাৎ ব্যারিস্টার সাহেব অচিন্ত্য ব্যানার্জীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—অনী—

ড্যাডি—

তাড়াতাড়ি কৌশিকের হাত ছেড়ে দিয়ে অনীতা বাপের মুখের দিকে তাকায়।

জানতেও পারেনি কখন অচিন্ত্য ব্যানার্জী আদালত থেকে ফিরে ঐ ঘরে এসে প্রবেশ করেছেন।

ড্যাডি, কখন এলে?

এই ত—

মেয়ের কপাল স্পর্শ করলেন অচিন্ত্য ব্যানার্জী একবার, তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—তুমিই অনীকে ভায়োলিনের লেস্‌ন্‌ দাও না?

কৌশিক মাথা নীচু করে থাকে।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—would you please come downstairs.

কৌশিক মুখ তুলে তাকাল অচিন্ত্য ব্যানার্জীর দিকে।

এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মত কৌশিক উঠে দাঁড়ায়।

নিঃশব্দে অচিন্ত্য ব্যানার্জীকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

come along—

অচিন্ত্য ব্যানার্জী সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন।

কৌশিক তাঁকে অনুসরণ করে।

সোজা একেবারে পারলারে এসে দাঁড়ান অচিন্ত্য ব্যানার্জী। তারপর হঠাৎ কৌশিকের মুখের দিকে তাকান।

Listen young man—I must say you are a fool!

হঠাৎ ঐ ধরণের কথায় কৌশিক যেন থতমত খেয়ে ব্যারিস্টার সাহেবের মুখের দিকে তাকায়।

তুমি যে এতটা এগিয়ে গিয়েছো—অচিন্ত্য ব্যানার্জী আবার বলেন, I never dreamt of—শোন, আর কখনো যেন এ বাড়ির চৌকাঠও তুমি ডিঙ্গোবার না চেষ্টা করো ভবিষ্যতে।

তারপরই হাঁক দিলেন—বুচ্চা সিং—

দারোয়ান বুচ্চা সিং হন্তদন্ত হয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, জি সাব্‌।

দেখো ইসকো পয়ছানকে রাখো—চিনে রাখ—কোন দিন যেন আর এ বাড়িতে না ঢোকে—যাও—go—

কৌশিকের চোখ মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছিল।

সে ধীরে ধীরে দরজার দিকে পা বাড়ায়।

পিছন থেকে অচিন্ত্য ব্যানার্জীর শেষ কথাগুলো শোনা যায়, street dog

কি করে যে তারপর কৌশিক উড স্ট্রীটের সেই কয়মাসের পরিচিত বাড়িটার বিরাট গেট দিয়ে শেষ বারের মত রাস্তায় বের হয়ে অন্য রাস্তায় এসে পড়েছিল জানে না।

উদ্‌ভ্রান্ত অন্যমনস্ক—এলোমেলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় গিয়ে ট্রাম রাস্তায় পড়েছিল কৌশিক।

রাতের কলকাতা তখন নানা রঙিন আলোয় অভিসারিকা।

॥ ৯ ॥

থিয়েটারে সেদিন শো ছিল কিন্তু কৌশিক গেল না।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এবং অনেক রাত্রে মেসে ফিরে এলো। মাথাটার মধ্যে তখনো আগুন জ্বলছে।

চোখ মুখ জ্বালা করছে।

কোনমতে শয্যার 'পরে এসে শুয়ে পড়ল।

দুদিন কোথায়ও বের হলো না।

বিমল খোঁজ করতে এলো, কি রে ব্যাপার কি—থিয়েটারে যাস না কেন?

কৌশিক বললে, শরীরটা ভাল না।

হরিদাসদা তোর কথা বলছিল—কাল শো আছে—যাবি ত?

দেখি।

বিমল বিদায় নিয়ে চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে মেসের একজন এসে বললে, ফোনে কে এক ভদ্রমহিলা নাকি তাকে একটিবার ডাকছেন।

কে?

তা জানি না—বললেন বিশেষ দরকার—ভদ্রমহিলা ফোন ধরে আছেন।

নিশ্চয়ই অনীতা।

কৌশিক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

নীচে ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ফোন ধরল।

কে?

অনীতাই। অনীতার গলা শোনা গেল, কে কৌশিক, আমি অনীতা।

কৌশিক হঠাৎ চুপ করে যায়। কোন জবাব দেয় না।

কি হলো—কথা বলছো না কেন? পরের দিন আসবে বলে এলে না--

আমি কৌশিক নই।

কৌশিক নও—অনীতা পালটা প্রশ্ন করে।

না।

কৌশিক মেসে নেই?

না।

কেথায় গিয়েছে—কখন ফিরবে?

কৌশিকবাবু—আমাদের মেস ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

চলে গিয়েছে কৌশিক? কবে?

গতকাল।

হঠাৎ চলে গেল যে?

তা ত বলতে পারি না।

কোথায় গিয়েছে জানেন? তাব ঠিকানাটা—

না, আমরা জানি না তার ঠিকানা।

কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা ধরে এসেছিল কৌশিকের। সে চুপ করে যায়।

শুনছেন—শুনুন।

অনীতার মিনতি ভেসে আসে ফোনে।

কৌশিক চুপ করে থাকে।

শুনুন—শুনছেন—

কৌশিক ফোনটা নামিয়ে রাখে।

এবং তার পরের দিনই সকালে মেসটা ছেড়ে দেয় কৌশিক। অন্য একটা হোটেলে গিয়ে ওঠে এবং সেখান থেকে দিন পাঁচেক বাদে ঐ বাড়ির ঘরটা ভাড়া নিয়ে এসে হোটেল থেকে ওঠে।

একমাত্র বিমলই জানত এ বাসার ঠিকানা।

আর কেউ জানে না।

কিন্তু অনীতা তার এখানকার ঠিকানাটা জেনে ফেলেছে।

সে হয়ত আবার আসবে।

নিশ্চয়ই আসবে।

মনে হচ্ছে হয়ত এখনো অনীতা সব কথা জানে না।

এখন সে কি করবে—যেমন করেই হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বাসা তাকে ছেড়ে দিতে হবেই।

কানু ফিরে এলো হোটেলে।

ঠাকুর গোবিন্দ শুধায়, এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে কানু?

এই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

কানু যেন কেমন অন্যমনস্ক।

লোকটা গান লেখে—গানের সুর দেয়—সেও গান গাইত গলা মিলিয়ে মার সঙ্গে।

প্রতি রবিবার সকালে মা অর্গান বাজিয়ে গান গাইত— গান যখন গাইত কি ভালই না লাগত তখন মাকে।

প্রথমে দুজনে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইত তারপর একা একা ওকে গাইতে হতো সমস্ত গানটা- প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

কত গান মার কাছে সে শিখেছিল।

এই কানু—গোবিন্দ আবার ডাকে, কি ভাবছিস এত? খাবি না—খিদে পায়নি?

গোবিন্দদা—

কি?

আমাকে কিছু টাকা দেবে?

গোবিন্দ কানুর মুখে টাকার কথা শুনে যেন একটু কেমন আশ্চর্য হয়- -প্রায় আট মাস কানু হোটেলে চাকরি করছে কিন্তু কখনো ত টাকার কথা বলেনি।

এমন কি তার প্রাপ্য মাইনার কথাও বলেনি।

পালমশাই ধূর্ত লোক।

মাসের শেষে কানুকে মাইনা দিতে হবে জানত-- কিন্তু এক দিন দুদিন করে যখন কুড়িটা দিন কেটে গেল কিন্তু কানু মাইনার কথা তুলল না—সেও চুপ করে গেল।

পরের মাসেও চাইল না।

পালমশাই রীতিমত আশ্চর্য হলো যখন তার পরের মাসেও কানু তার প্রাপ্য মাইনা সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

পৃথিবীতে এক একজন মানুষ আছে যারা কারো প্রাপ্য না দিতে হলে, সে যে কোন অজুহাতেই হোক, মনে মনে একধরনের তৃপ্তি অনুভব করে।

পালমশাই সেই শ্রেণীর লোক।

কানু তার মাইনা নিজে থেকে চাইল না দেখে সেও চুপ করে গেল।

সেও কোন আর উচ্চবাচ্য করল না।

ঠাকুর গোবিন্দ কিন্তু এসব কথা জানত না।

সে জানত কানু মাসে মাসে ঠিক মাইনা পেয়ে যাচ্ছে।

পালমশাই ঠাকুরকেও কোন কথা জানায়নি।

গোবিন্দ শুধায়, টাকা—টাকা দিয়ে কি করবি?

দরকার আছে, দাও না গোবিন্দদা।

কি দরকার বল ত?

আছে—দাও না।

কত টাকা?

পঁয়তাল্লিশ টাকা।

অত টাকা আমি গরীব মানুষ কোথায় পাবো রে!

তবে কি হবে গোবিন্দদা! টাকা যে আমার চাই-ই--

কেন রে তোর এই কয় মাসের মাইনা কি করলি?

মাইনা—

হুঁ—আট মাসের মাইনা।

নেই।

সে কি রে, সব খরচ করে ফেলেছিস?

না।

তবে।

মাইনা ত আমি পাইনি!

মাইনা পাসনি—সেকি—পালমশাই তোকে মাইনা দেয়নি?

না।

তুই চাসনি?

না।

কেন?

টাকা দিয়ে আমি কি করবো? টাকা তো আমার দরকার নেই।

তবে জামা কাপড় কি দিয়ে কিনলি?

কেন, পালমশাই কিনে দিয়েছে—দাও না আমাকে পঁয়তাল্লিশটা টাকা গোবিন্দদা।

দাঁড়া আমি আসছি।

গোবিন্দ চলে গেল পালমশাইয়ের কাছে।

পালমশাই দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর একটা হুঁকায় তামাক সাজিয়ে আরাম করে টানছিল।

গোবিন্দ সামনে এসে দাঁড়াল। পালমশাই—

কিছু বলবি গোবিন্দ?

আপনি কানুর মাইনা দেননি?

কেন, মাইনার কথা ও কিছু বলছিল নাকি?

আপনি দেননি ওর মাইনা?

দেবো না কেন—ইচ্ছা করেই রেখে দিয়েছি—দিইনি—বুঝলি না—কলকাতা শহর বলে কথা, ছেলেমানুষ হাতে কাঁচা টাকা পেলে তচনচ করে ফেলবে—তাই আর কি—

ও পঁয়তাল্লিশটা টাকা চাইছিল।

পঁয়তাল্লিশ টাকা—কি হবে অত টাকা দিয়ে ওর!

বোধহয় বাড়িতে পাঠাবে।

তা আমাকে বললেই ত পারত—এখুনি চাই নাকি?

হ্যাঁ দিন।

ডাক ওকে।

গোবিন্দ কানুকে ডেকে নিয়ে এলো।

কি রে তোর টাকার দরকার তা বলিসনি কেন আমাকে?

পালমশাই যেন কত উদার। টাকা কানু এতদিন চায়নি বলেই যেন দেয়নি ভাবটা এই রকম।

পালমশাইয়ের বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল তবু কাঠের বাক্স খুলে গুনে গুনে পাওনা আশিটা টাকাই কানুর হাতে দিয়ে দিল।

ভিতরে এসে গোবিন্দ বলে, টাকা পাসনি বলবি ত—বোকা ছেলে, এই নে তোর টাকা—মাইনা আশি টাকা হয়েছে।

পঁয়তাল্লিশটা টাকা নিজের কাছে রেখে বাদবাকী টাকা গোবিন্দর হাতে তুলে দেয় কানু।

বলে, এ টাকাগুলো তোমার কাছেই থাক গোবিন্দদা, পরে যখন দরকার হবে নেবো। এখন আমাকে খেতে দাও।

সেই দিনই সন্ধ্যারাত্রে হোটেলের কাজকর্ম সেরে কানু টাকা নিয়ে বের হয়ে পড়ল।

রাস্তাটা সে ভোলেনি।

কৌশিকের বাড়ির গলিটা চিনতে তার কষ্ট হয়নি।

রাত তখন প্রায় আটটা হবে।

কৌশিকের ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

কানু এসে ভিতরে ঢুকল।

কৌশিকের আবার তখন জ্বর এসেছে—চোখ মুখ জ্বালা করছে। শয্যার উপর একটা ছেঁড়া সুজনি জড়িয়ে শুয়ে ছিল কৌশিক, পদশব্দে মুখ তুলে চোখ না খুলেই কৌশিক বলে, দত্তমশাই, আজকের রাতটা নিষ্কৃতি দিন—সকালেই আমি এ ঘর ছেড়ে চলে যাবো।

কানু তখন শয্যার পাশে এসে দাঁড়ায়, দত্তমশাই নই আমি।

কে?

আমি কানু।

কানু!

হ্যাঁ—চিনতে পারছেন না?

চোখ মেলে ভাল করে তাকাল কৌশিক, চিনতে পারে সকালের সেই ছেলেটি।

ও তুমি!

কি হয়েছে, শুয়ে আছেন যে?

আবার বোধহয় জ্বর এসেছে ভাই।

জ্বর!

হ্যাঁ—জ্বর।

কানু কৌশিকের কপালে হাত ছোঁয়াতেই যেন চমকে ওঠে।

উঃ জ্বরে যে পুড়ে যাচ্ছে গাটা।

সত্যিই ত খুব জ্বর হয়েছে আপনার।

কানুর কথা শেষ হলো না ঠিক সেই মুহূর্তে দুজন দারোয়ান নিয়ে হুড়মুড় করে জগন্নাথ দত্ত সেই ঘরের মধ্যে ঢুকল।

মাথায় একটা পটি বাঁধা।

॥ ১০ ॥

জগন্নাথ দত্ত চীৎকার করে ওঠে—ঘাড় পাকাড়কে এ কামরা সে নিকাল দো ঐ আদমীকো।

দারোয়ান দুজন বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু অকস্মাৎ লাফ দিয়ে পড়ল যেন ওদেব মাঝখানে কানু।

চেঁচিয়ে ওঠে কানু।

দুচোখে তখন তার আগুন জ্বলছে।

দাঁড়ান।

জগন্নাথ দত্ত চিনতে পারে সকালবেলার সেই ক্ষুদ্রে শয়তানটা।

ওরে সেই শয়তানটা—চীৎকার করে ওঠে জগন্নাথ দত্ত। ধর—ধর ওটাকে।

চকিতে কানু পকেট থেকে গুলতি বের করে। বলে, এক পা কেউ এগুবে ত গুলতি চালাব।

জগন্নাথ দত্ত থমকে দাঁড়ায়।

কোণঠাসা বিড়ালছানার মত কানুর চোখের মণি দুটো তখন জ্বলছে আক্রোশে আর ঘৃণায়।

কত টাকা আপনার বাড়িভাড়া বাকী?

কৌশিক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, কানু—কানু—লক্ষ্মী ভাই, শোন।

কানু কৌশিকের কথায় সাড়া দেয় না, ফিরেও তাকায় না।

বলে, বলুন কত টাকা?

কেন রে তুই দিবি নাকি? ভেংচি কেটে ওঠে যেন জগন্নাথ দত্ত।

হ্যাঁ দেবো।

সত্যি!

হ্যাঁ বলুন, কত টাকা?

তিন মাসের পনের টাকা করে ঘর ভাড়া।

তার মানে তিন পনের পঁয়তাল্লিশ টাকা?

হ্যাঁ।

কানু পকেটে বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকাব নোট বের করে জগন্নাথ দত্তর সামনে ধরে, নিন—গুণে পঁয়তাল্লিশ টাকা।

জগন্নাথ দত্ত যেন থমকে গিয়েছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় যেন কেমন বেকুব, বোবা হয়ে গিয়েছে।

নিন টাকা আপনার ধরুন।

কৌশিক উঠে বসেছে ততক্ষণে—সে ত হতভম্ব—বোবা—সেও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে

কানুর দিকে।

নিন টাকা, বের হয়ে যান এখান থেকে।

জগন্নাথ দত্ত আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে নোটগুলো নিল নিঃশব্দে।

গুণে নিন।

জগন্নাথ দত্ত গুণল—পঁয়তাল্লিশই আছে।

যান এবার।

জগন্নাথ একবার বিষদৃষ্টিতে অদূরে শয্যার 'পরে উপবিষ্ট কৌশিকের দিকে তাকিয়ে দারোয়ানদের সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় নিঃশব্দে।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

কানু!

কৌশিক ডাকে এক সময়।

বলুন।

তুমি—তুমি টাকা দিলে ভাই—কেন দিলে?

তাতে কি হয়েছে—আমার টাকা ছিল দিয়ে দিলাম—কিন্তু আপনি উঠে বসলেন কেন—আপনার খুব জ্বর হয়েছে—শোন, শুয়ে পড়ুন।

তুমি—তুমি ত আমাকে চেনো না—আগে কখনো দেখনি—বলতে বলতে কৌশিক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু টলে পড়ে যায় হঠাৎ।

ছুটে এসে তাড়াতাড়ি কানু কৌশিককে ধরে ফেলে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে—শুইয়ে দেয় কোন মতে কৌশিককে।

কয়েক দিনের বলতে গেলে অনাহার—জ্বরের দুর্বলতা সব কিছু মিলে কৌশিকের মাথাটা ঘুরে ওঠে—সে জ্ঞান হারায়।

তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে জল এনে কানু কৌশিকের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেয়।

কিন্তু জ্ঞান ফেরে না কৌশিকের।

কানু রীতিমত ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কি করবে—এখন সে কি করবে। কোন সাড়া শব্দ করছে না মানুষটা।

এ অবস্থায় কেমন করে তাকে ফেলে যাবে।

লোকটার কেউ নেই বলেই মনে হয়।

হঠাৎ মনে হয়—ওকে সুস্থ করে তুলতে হলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের প্রয়োজন।

ডাক্তার।

একজন ডাক্তার।

কানু ছুটে বের হয়ে যায়।

বড় রাস্তার মোড়ে ডাঃ সেনস্ ক্লিনিক—প্রৌঢ় ডাঃ সেন তখনো রোগী দেখছিলেন।

হুড়মুড় করে গিয়ে কানু ডাক্তারখানায় ঢোকে।

ডাক্তারবাবু—শীগ্‌গিরী একবার চলুন না—একজন জ্বরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—ধরা গলায় কানু বলে।

কে অজ্ঞান হয়েছে?

চলুন না দেখবেন। একটু শীগ্‌গিরী চলুন।

কানুর মুখের দিকে চেয়ে ডাঃ সেনের কেমন যেন মায়া হয়।

ডাক্তার বলেন, কোথায়?

এই সামনের গলিতে।

বোস—একে দেখে যাচ্ছি।

যে রোগীটিকে দেখছিলেন তাকে দেখে কালো ব্যাগটা ও স্টেথোটা নিয়ে উঠে পড়েন ডাঃ সেন।

কৌশিকের তখন আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসতে শুরু করেছে।

ডাঃ সেনকে নিয়ে এসে কানু ঘরে ঢুকল।

জড়িয়ে জড়িয়ে কৌশিক তখন বলছে, কানু, নিশ্চয়ই আগের জন্মে আমার মায়ের পেটের ভাই ছিলে তুমি কানু, একটু জল দাওনা ভাই।

কানু এক গ্লাস জল এনে কৌশিকের মুখের কাছে ধরে।

ঢকঢক করে জলটা খায় কৌশিক, আঃ— কে? আপনি কে?

এতক্ষণে ডাক্তারের দিকে কৌশিকের নজর পড়ে।

ডাক্তারবাবু আপনাকে দেখতে এসেছেন।

ডাক্তারবাবু—

হ্যাঁ—আপনার যে খুব জ্বর দাদা।

কানু—

দাদা—

তুমি সত্যিই আমার ভাই।

ডাঃ সেন বাধা দিয়ে বলেন, আপনি একটু ভাল হয়ে শোন—আপনাকে পরীক্ষা করে দেখি।

ডাঃ সেন অতঃপর অনেকক্ষণ ধরে ভাল কবে কৌশিককে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন।

ডাঃ সেনের মুখটা যেন কেমন গম্ভীর। যেন মনে হয় তিনি চিন্তিত।

তোমার নাম কানু না?

হুঁ।

চল আমার সঙ্গে ডিসপেনসারিতে।

ঔষধ দেবেন না?

দেবো—চল।

চলুন। তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে তাকিয়ে কানু বলে, দাদা, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি ডাক্তারখানা থেকে ঔষধটা নিয়ে আসি। চলুন ডাক্তারবাবু।

দুজনে রাস্তায় এসে নামল।

পাশাপাশি যেতে যেতে একসময় ডাঃ সেন বলেন—কানু?

আমাকে কিছু বলছেন?

উনি তোমার দাদা?

হুঁ।

আপন ভাই?

না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু?

কি?

দাদার অসুখটা সারবে ত?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সারবে বৈকি।

ডাঃ সেন কানুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

তারপর বলেন, তবে ওকে হাসপাতালে দিতে হবে।

হাসপাতালে!

হ্যাঁ—নচেৎ বাড়িতে এ রোগের চিকিৎসায় যে অনেক খরচ।

হাসপাতাল শুনেই কানু যেন চমকে উঠেছিল।

মনে পড়ে যায় মার কথা তার।

অসুখ হয়ে সেই যে এক রাত্রে হাসপাতালে চলে গেল আর ফিরে এলো না মা—একদিন স্বর্গে চলে গেল মা।

হাসপাতালে না গেলে হবে না ডাক্তারবাবু?

বললাম ত অনেক খরচ—ঔষধ, বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য।

সব—সব যোগাড় করব ডাক্তারবাবু—দাদা হাসপাতালে যাবে না—না না, হাসপাতালে না।

কেন বল ত?

কৌতূহলে ডাঃ সেন ছোট ছেলেটির দিকে তাকান।

হাসপাতালে গেলে কেউ বাঁচে না।

কে বলেছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি জানি আমার মাও—

তোমার মা?

তাড়াতাড়ি কানু নিজেকে সামলে নেয়। আর একটু হলেই মার কথা বের হয়ে যেত তারপর হয়ত তার সত্য পরিচয়টাও।

তোমার মাকে বুঝি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ—সেই যে মাকে একদিন মাঝ রাত্রে সাদা রংয়ের গাড়িটার মধ্যে শুইয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল আর মা ফিরে এলো না। মা স্বর্গে চলে গেল।

বলতে বলতে কানুর গলাটা কান্নায় যেন বুজে আসে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

কিন্তু সবাই কি মারা যায়—কত লোক হাসপাতালে গিয়ে ভাল হয়ে যায়—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

ডিসপেনসারিতে পৌঁছে কানু জিজ্ঞাসা করে, ঔষধের দাম কত লাগবে ডাক্তারবাবু—আপনার ফিস?

বার টাকা সব সমেত—ডাক্তার হিসবে করে বললেন।

আপনি ওষুধ তৈরী করুন আমি টাকা নিয়ে আসি—আচ্ছা—দাদা কি খাবে ডাক্তারবাবু?

দুধ বার্লি ছাড়া কিছু নয়—দু একটা বিস্কুট দিতে পার।

কানু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো হোটেলে।

রাত তখন প্রায় পৌনে নয়টা—সেদিন আবার হোটেলে বেশ খরিদ্দারের ভিড়।

ঠাকুর গোবিন্দ একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে একা একা।

কিছুদিন থেকে একটা ঝি রাখা হয়েছিল।

কানু সন্ধ্যা থেকে বে-পাত্তা, ঝি গজরগজর করছিল।

শেষ ব্যাচকে খেতে দিয়ে গোবিন্দ হাঁপ ছেড়ে একটি বিড়ি ধরিয়েছে সবেমাত্র কানু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো।

গোবিন্দদা—

এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে কানু?

সত্যি কানু এত রাত কখনো করে না।

সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই ফিরে আসে।

কাজ ছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে কানু বলে, আমাকে এখুনি বারটা টাকা দাও—না না, আর একটা টাকা বেশী দাও—এক টাকার ফল কিনে নিয়ে যাবো শিয়ালদার মোড় থেকে।

টাকা দিয়ে কি হবে আবার—এই ত সকালে এতগুলো টাকা নিলি—সত্যি কথা বল, কি করবি টাকা দিয়ে?

বলবো—তোমাকে সব বলবো গোবিন্দদা—তুমি তাড়াতাড়ি টাকাটা দাও।

না—আগে বল কেন তোর টাকার দরকার?

দাদার খুব অসুখ।

দাদা—দাদা আবার তোর এলো কোথা থেকে—তুই ত বলেছিলি কেউ তোর নেই।

না, না—একজন দাদা আছে ত।

দাদা।

হ্যাঁ।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সত্যি বলছি আমার এক দাদা আছে। খুব জ্বর তার, ডাক্তার বলেছে হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু হাসপাতালে গেলে মারা যাবে আমি জানি—তুমি তাড়াতাড়ি টাকা দাও—আর গোবিন্দদা—

কি রে?

আমাকে একটু দুধ আর বার্লি দিতে পার?

দুধ বার্লি!

হ্যাঁ—ডাক্তারবাবু দাদাকে খেতে বলেছে।

আমি তোকে পয়সা দিচ্ছি, চার পয়সার বার্লি কিনে নিয়ে আয়—হোটেলে আমাদের দুধ কোথায়—সামনে বড় রাস্তায় যে মিষ্টির দোকান আছে সেখানে দুধ পাবি—কিনে নিয়ে যা।

গোবিন্দ টাকা এনে দিল কানুকে।

কানু বার্লি কিনে নিয়ে এলো—গোবিন্দ বার্লি তৈরী করে দিল—সেই বার্লি ও দোকান থেকে একটা গ্লাসে দুধ নিয়ে ঐ সঙ্গে এক টাকার ফল কিনে কানু আবার ছুটল।

ডাক্তারখানা থেকে ঔষধ, পথ্য ও ফল নিয়ে কানু যখন কৌশিকের ওখানে এসে পৌঁছল রাত তখন সোয়া দশটা।

বাড়ির সামনে রাস্তাটা নির্জন হয়ে গিয়েছে।

শয্যার উপরে ঝিম দিয়ে পড়ে ছিল জ্বরের ঘোরে কৌশিক।

দাদা—অ দাদা—কানু ডাকে।

উঁ—

দাদা, ওষুধ এনেছি—খাও।

চোখ মেলে তাকাল কৌশিক, কে, কানু?

হ্যাঁ।

কানু, এখনো তুমি বাড়ি যাওনি ভাই!

তুমি আগে ঔষুধটা খেয়ে নাও।

একটা কাপে ঔষধ ঢেলে দেয় কানু—জল দেয়।

ওষুধটা খেয়ে নেয় কৌশিক।

এই দুধ বার্লিটুকু খেয়ে নাও।

দুধের গ্লাসটা হাতে ধরে কৌশিক কানুর মুখের দিকে তাকায়।

খাও দাদা।

হু হু করে যেন কৌশিকের দু'চোখ ভরে জল নেমে আসে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

এত স্নেহ এত ভালবাসা তার মত এক হতভাগ্যের জন্যও বিধাতা তার জীবনপাত্র ভরে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন।

কানু?

দাদা।

কেন, কেন তুমি আমার জন্য এত করছো ভাই?

খেয়ে নাও—আমি ত তোমার ছোট ভাই। ছোট ভাই বুঝি দাদার জন্য করে না—খাও।

ঢকঢক করে কৌশিক দুধ ও বার্লিটুকু খেয়ে নেয়।

এবারে শুয়ে পড়।

শুয়ে পড়ে কৌশিক।

ভেবো না তুমি দাদা—ডাক্তারবাবু বলেছেন তুমি ভাল হয়ে যাবে।

কানু?

দাদা।

এবার তুমি বাড়ি যাও ভাই—অনেক রাত হয়েছে।

এখন আমি বাড়ি যাবো না দাদা।

যাবে না!

না।

কিন্তু তোমার মা বাবা—

আমার ত কেউ নেই।

কেউ নেই! বিস্মিত কৌশিক শুধায়।

না—মাথাটা হেলিয়ে বলে কানু।

মা বাবা ভাই বোন কেউ নেই?

না।

কোথায় থাক তবে? তোমার বাড়ি কোথায়?

একটা হোটেলে কাজ করি।

হোটেলে!

কৌশিকের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

এই নয় দশ বছরের একটি ছেলে হোটেলে কাজ করে, তাছাড়া একে ত সাধারণ রাস্তার ছেলে বলে মনে হয় না।

রাস্তায় রাস্তায় যে সব ছেলেদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় ইদানীং—তারা কাদের ছেলে কি করে—কিছুই বুঝবার উপায় নেই—কৌশিক বুঝতে পারে কানু ঠিক তাদের দলে নয়।

চরিত্র ও কথা-বার্তার মধ্যে কোথায় যেন একটা মার্জিত ভাব আছে।

একটা বিশেষত্ব আছে।

গতকাল থেকে বলতে গেলে পেটে এক প্রকার কিছুই পড়েনি—এখন কানুর আনা দুধ বার্লি পেটে পড়ায় কৌশিকের শরীরটা অনেকটা সুস্থ লাগছিল।

জ্বরটাও বোধ হয় একটু একটু করে কমছে।

কানু চুপটি করে কৌশিকের শিয়রের ধারে বসেছিল।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রাত।

আপনি ঘুমান দাদা।

ঘুম আসছে না ভাই—আচ্ছা তুমি যে বলেছিলে হোটেলে কাজ কর—কোন হোটেলে কাজ কর?

শিয়ালদহের কাছে একটা ছোট হোটেলে।

এত অল্প বয়েসে হোটেলে কাজ কর—পড়াশুনা করলে না কেন?

হোটেলের কাজ করে পড়বো কখন।

কি কাজ করতে হয় তোমায় হোটেলে?

এই ডিস থালা ধোয়া—টেবিল পরিষ্কার করা—টুক্ টাক্ জিনিস বাজার থেকে আনতে হয়।

পারো ঐ সব কাজ করতে!

কেন পারবো না, অবশ্য আগে পারতাম না। আগে ত ওসব কাজ কখনো করিনি—তারপরই একটু হেসে বলে, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

কতদিন হোটেলে কাজ করছো?

অনেক দিন ত কাজ করছি।

কলকাতাতেই বুঝি তোমাদের বাড়ি?

না ত।

তবে?

আমি ত—বলতে উদ্যত হয়েও আবার যেন থেমে যায় কানু—কৌশিক বুঝতে পারে যে কারণেই হোক কানু ওসব কথা বলতে চায় না।

কৌশিক আর জিজ্ঞাসা করে না।

কানু?

বলুন।

এখন তুমি এখানে আছো হোটেলের মালিক জানতে পারলে রাগ করবে না?

কানু হেসে ফেলে।

হাসছো যে? মালিক বুঝি খুব ভালমানুষ।

না—একটুও না। ঠিক আপনার ঐ দত্তমশাইয়ের মত। কিন্তু হলে কি হবে—ভয় আছে ত।

ভয়!

হুঁ।

কিসের ভয়?

কেন আমার গুলতির—কানু আবার হাসে।

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে কৌশিকও মৃদু হেসে ফেলে। বলে, হোটেলের মালিককেও তুমি কোন দিন গুলতি দিয়ে মেরেছিলে নাকি।

না।

তবে?

ও জানে ত একটু এদিক ওদিক হলেই গুলতি চালাব।

দুজনেই হাসে।

॥ ১১॥

রাত ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছিল।

গ্রীষ্মের ছোট রাত্রি।

খোলা জানালা পথে ভোরের আবছা আলো প্রকাশ পাচ্ছে।

জ্বরটাও বোধহয় রেমিশন হয়ে গিয়েছে। কপালে ও বুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

আচ্ছা দাদা—

বল।

আপনার ঘরে অত স্বরলিপির পাতা—কি গানের স্বরলিপি দাদা?

আমি যে সব সুর তৈরী করি তারই স্বরলিপি।

আপনি সুর তৈরী করেন!

হ্যাঁ—কবি—শুনবে একটা নতুন সুর তৈরী করেছি কয়দিন ধরে।

কি সুর?

বেহালাটা দাও—বাজিয়ে শোনাই।

কানু কৌশিকের হাতে বেহালাটা তুলে দেয়। কৌশিক বেহালার তারে ছড় কেটে সুর তোলে। তারপর আপন মনে বাজিয়ে চলে।

কানু নিস্পন্দ হয়ে শোনে।

অনেকদিন আগেকার একটা ভুলে যাওয়া স্মৃতি যেন কানুর মনের মধ্যে ঝাপটা দিয়ে যায়।

মা তার মধ্যে মধ্যে অর্গান বাজিয়ে গান গাইতো।

সে অর্গানের পাশে দাঁড়িয়ে শুনত।

কি মিষ্টি ছিল মার গলার গান!

কানুর মনে হয় যেন তার মা-ই অর্গান বাজিয়ে গান গাইছে তাদের সেই পরিচিত বাড়িটার পারলারে।

কখন কৌশিকের বাজনা থেমে গিয়েছে—ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিছুই জানতে পারেনি কানু।

হঠাৎ যেন কৌশিকের ডাকে চমক ভাঙ্গে, কানু?

দাদা।

সকাল হয়ে গেল—হোটেলে যাবে না?

হ্যাঁ—যাই এবারে—আপনি কিন্তু উঠবেন না বিছানা থেকে। ডাক্তারবাবু আপনাকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন।

না উঠবো না, কিন্তু দুপুরে তুমি কি কর?

হোটেলের কাজ শেষ হয়ে গেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

হোটেলের কাজ শেষ হয়ে গেলে এখানে এসো না?

আসবো। আমি তাহলে এবারে যাই দাদা।

এসো।

কানু বের হয়ে গেল।

কৌশিক কানুর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। কি ভাল, কি মিষ্টি ছেলেটি—আহা মা বাপ এর মধ্যেই খুইয়েছে।

কৌশিকের যদি মোটামুটি নিয়মিত রোজগার থাকত ওকে হোটেলে কাজ করতে দিত না—

ওর কাছেই রেখে দিত।

প্রত্যুষের শহর—তখন একটু একটু করে জেগে উঠছে যেন।

হঠাৎ কানুর মনে পড়ল—দাদা সকালে উঠে খাবে কি—ঘর থেকেও ডাক্তার বেরুতে বারণ করে দিয়েছে।

একটা পাউরুটি আর একটু দুধ যদি রেখে আসত—তারপর না হয় সে দুপুরে হোটেল থেকে কিছু খাবার নিয়ে যেত।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলো কানু—পকেটে তখনো কিছু পয়সা অবশিষ্ট আছে।

সামনেই একটা রেস্তোরা।

দু একজন খরিদ্দার টেবিলে বসে চা পান করছে।

কানু রেস্তোরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কানু রেস্তোরায় ঢুকে একটা পাউরুটি ও এক ভাড় চা নিল—এবং আবার ফিরে চলল কৌশিকের ওখানে।

কৌশিক চোখ বুজে শয্যার উপর পড়ে ছিল—ভাবছিল কানুর কথাই। ভারী মিষ্টি ছেলেটি।

আর কি অদ্ভুত উপায়েই না তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

কোথাকার কে—কেউ নয়, দূরতম রক্তের সম্পর্কও নেই, অথচ মুহূর্তে কত আপনার করে নিল তাকে।

মনে হচ্ছে যেন দুজনে ওরা জন্ম জন্মান্তরের হৃদ্যতায় বাঁধা।

বেচারী ঐ টুকু ছেলে একটা হোটেলে চাকরি করছে—কৌশিকের যদি তেমন রোজগার থাকত কিছুতেই ওকে চাকরি করতে দিত না।

চাকরিও ভারী—একটা চাকরের কাজ।

হঠাৎ পদশব্দে চোখ খুলে তাকায় কৌশিক—কানু—হাতে তার পাউরুটি ও একটা ভাড়।

একি কানু—আবার ফিরে এলে যে!

একদম ভুলে গিয়েছিলাম দাদা—ডাক্তারবাবু আপনাকে উঠতে বারণ করেছেন অথচ আপনার ত খিদে পেতে পারে তখন খাবেন কেমন করে, আমি ত সেই আসব কোন দুপুরে—এই চাটা খেয়ে নিন—আর এই পাউরুটি রইলো।

কৌশিকের চোখে জল এসে যায়।

কোন কথাই ও বলতে পারে না। গলাটা বুজে আসে।

কানু যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছিল, কৌশিক ডাকে, কানু।

কিছু বলছিলেন, দাদা?

জামার পকেট থেকে পয়সা বের করে কৌশিক বলে, এই পয়সাটা নাও।

পয়সা—কি হবে পয়সা দিয়ে!

কাল থেকে তুমি খরচ করেছো।

বাঃ খরচ আবার কি। আপনি ঔষুধ ফল না খেলে ভাল হবেন কি করে।

আমার জন্য হয়ত যা তুমি চাকরি করে জমিয়েছিলে সব শেষ হয়ে গেল—খরচ হয়ে গেল।

আমি ত জমাইনি।

তবে এত টাকা তুমি পেলে কোথা থেকে?

কেন আমার মাইনাটা পালমশাইয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিলাম—আমার ত টাকার কথা মনেই ছিল না হঠাৎ গোবিন্দদাই ত পালমশাইকে বলতে টাকাগুলো দিয়ে দিলেন তিনি, আমি যাই দাদা—এক দাগ ঔষধ আর একটা পুরিয়া খাবেন কিন্তু মনে করে। আমি দুপুরে আসব।

কানু আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

কানু তখনো আসেনি।

আজ আর জ্বরটা আসেনি কৌশিকের তবে শরীরটা খুবই দুর্বল। মনের মধ্যে আপাতত সবচাইতে যে বড় দুশ্চিন্তাটা ছিল ঘর ভাড়ার টাকাগুলো দেওয়া কানু সে টাকাগুলো দিয়ে দেওয়ায় সে

চিন্তাটাও নেই।

কানু—কানুর কথাই কেবল মনে পড়ে কৌশিকের।

কানু দুপুরে আসবে বলেছিল এখনো এলো না কেন। কাল রাত্রে এখানে ছিল বলে হোটেলওয়ালা ওকে বকাঝকা করেনি ত।

কে জানে কেন আসছে না।

দরজার ভেজান কপাট দুটো মৃদু শব্দ করে খুলে গেল। কে—

আমি।

একি নীতা!

অনীতা হাসতে হাসতে ঘরে এসে ঢোকে।

এ সময় তুমি কি করে এলে?

একটা মজা হয়েছে—ছোট টুলটা টেনে কৌশিকের খাটের পাশে বসতে বসতে অনীতা বলে, বলতো কি?

কি করে বলবো!

অনুমান কর।

উহুঁ পারছি না।

জানি পারবে না তুমি। ড্যাডিকে হঠাৎ একটা কোর্টের ব্যাপারে দিল্লী যেতে হলো, এয়ার পোর্টে তাঁকে তুলে দিয়ে সোজা এখানে চলে এলাম। কিন্তু না বসবো না।

বসবে না?

না, আগে দাঁড়াও তোমার ঘরটা গুছিয়ে দিই—বলতে বলতে অনীতা উঠে দাঁড়ায় এবং কৌশিকের অগোছাল ঘরটা গোছাতে শুরু করে।

এলোমেলো স্বরলিপির পাতাগুলো একটা একটা করে গোছাতে শুরু করে।

মিথ্যে পণ্ডশ্রম কেন করছো নীতা?

মানে!

মানে আজকের গোছান কালই হয়ত আবার অগোছাল হয়ে যাবে।

বেশত কাল আবার এসে গুছিয়ে দিয়ে যাবো।

তারপর।

দরকার হলে আবার পরশু আসবো!

না নীতা—এমনি করে তুমি এসো না।

কেন—আমি তোমার ঘরে আসি তুমি কি চাও না?

সব কিছুই কি এ দুনিয়ায় চাওয়া যায় না চাইলেই পাওয়া যায়?

চাওয়ার মত চাইলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

শুধু কি চাইলেই হয় নীতা—চাইবার একটা অধিকার বলে বস্তু আছে—তাছাড়া—

বল থামলে কেন?

তোমার বাবা যদি জানতে পারেন কোনক্রমে, তিনি হয়ত খুব অসন্তুষ্ট হবেন।

অসন্তুষ্ট হবেন—কেন?

হবেন। ভুলে যাও কেন তোমার আমার সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান আছে—যে ব্যবধানটা তুমি বা আমি কেউই উত্তীর্ণ হতে পারবো না কোন দিন।

তুমি তাই মনে করো?

সেটাই ত স্বাভাবিক নীতা।

ও, তাই বুঝি তুমি কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ এখানে এসে অজ্ঞাতবাস শুরু করেছো! বেশ—তাই যদি তোমার ধারণা আর আসব না আমি।

রাগ করো না নীতা—তুমি জান না কিন্তু আমি জানি, উড্ স্ট্রীটের বাড়ি থেকে এই ছোট্ট গলির ছোট্ট একটা ভাড়াটে ঘরের মধ্যে এসে পা ফেলার চেষ্টা করাটাকে আর যেই ক্ষমার চোখে দেখুক উড্স্ট্রীটের বাসিন্দারা নিশ্চয়ই দেখবে না।

উড্স্ট্রীটের আর কারো কথা জানি না কৌশিক কিন্তু দাদা বা আমি—

তুমি বা শুভেন্দু ত উড্স্ট্রীটের বাসিন্দা নও।

তবে কোথাকার বাসিন্দা!

সব ঘরের বাসিন্দা তোমরা—রাজপ্রাসাদ থেকে জীর্ণ কুঁড়ে ঘর।

খুব হয়েছে—এখন ভাল যে নতুন সুরটার কথা বলছিলে সেটা একটু শোনাও ত—উঃ কতদিন তোমার বাজান শুনিনা।

তুমি বাজাও না আজকাল আর?

না।

কেন?

শেখাবে কে! গুরুইত ডুব মেরেছে।

তাই বটে—তার চাইতে তুমি একটা গান গাও—কতদিন তোমার গান শুনি না!

না—না তুমি বাজাও

না—তুমি গাইবে।

বেশ—তবে আমি গাই তুমি বাজাও।

দাও বেহালাটা।

অনীতা বেহালাটা তুলে দেয় কৌশিকের হাতে।

অনীতা গায়—কৌশিক বাজায়।

॥ ১২ ॥

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী
হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী।

অনীতা গায় আর তার সুরে সুর তোলে কৌশিকের হাতের বেহালা।

ওদের গান ও বাজনার মধ্যে কখন যে বাটিতে করে খাবার নিয়ে কানু এসে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছে ওরা জানতেও পারেনি।

গানটা কানুর জানা।

সুরটা শুনেই সে বুঝেছিল কোন গান। মার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কতদিন ঐ গানটা কানু গেয়েছে।

গেয়ে গেয়ে প্রতিটি লাইন গানের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছে কানুর।

কানু যেন ভুলে যায় কোথায় সে—গানের সুর ও কথাগুলো তাকে অনেক অনেক দূরে যেন নিয়ে যায়।

সেই সাদা বাড়িটা।

জানলা দিয়ে যার মাধবী লতা লতিয়ে উঠেছে—গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল—রঙিন সেই প্রজাপতিটা যেটা রোজ ফুলের মধুর লোভে উড়ে উড়ে বেড়াতো ফুলের ধারে ধারে—আর সেই ছোট্ট টুনটুনী পাখীটা—যেটা প্রায়ই কিচির মিচির করে ডেকে ডেকে জানিয়ে দিত তার উপস্থিতি।

জানালা দিয়ে দেখা যেতো সেই সবুজ মাঠটা—তার ওদিকে রেলের লাইন।

কেমন যেন একটা ধু ধু শূন্যতা।

অর্গানে বসে মা বাজিয়ে গাইছে—আর সে মার পাশটিতে দাঁড়িয়ে।

মার কপালে সেই গোলাকার সিন্দুরের টিপটা—শুভ্র কপালের 'পরে কয়েক গাছি চূর্ণ কুন্তল।

মার ধবধবে সাদা বাহু—সরু সরু লম্বা লম্বা আঙুলগুলো অর্গানের রিডের উপর দিয়ে যেন ছোট ছোট ঢেউয়ের মত খেলে যেতো।

কানু আপনার অজ্ঞাতেই গেয়ে ওঠে, হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী।

কানুর কণ্ঠস্বরেই দুজনে চমকে ফিরে তাকায়।

কৌশিক আনন্দে যেন উথলে ওঠে। বলে, আরে কানু তুমি গাইতে জান? এত মিষ্টি তোমার গলা!

কানু কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়েছিল।

গাও—গাও—থামলে কেন? কৌশিক বেহালার তারে আবার ছড় টেনে সুর তোলে।

কানু কিন্তু গায় না।

চুপ করে থাকে।

কানু গাও।

অনীতাই এবারে প্রশ্ন করে, কে ও কৌশিক?

ওহো তোমাদের ত পরিচয় করিয়েই দেওয়া হয়নি। এসো কানু পরিচয় করিয়ে দিই—শ্রীমান কানু—আর এ হচ্ছে অনীতা—অনী—কানু আমার ছোট ভাই।

তাই বুঝি—অনীতা বলে ওঠে, তাহলে ত আমারও ভাই হলে তুমি। আমি তোমার দিদি।

দাদা—আপনার খাবার এনেছি—খেয়ে নিন—বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কানু বলে।

আবার তুমি কষ্ট করতে গেলে কেন ভাই?

বাঃ খাবেন না আপনি—কাল ত কিছু খাননি—দুধ বার্লি—জ্বরটা আর আসেনি ত দাদা?

কানু এগিয়ে আসে—কৌশিকের গাটা দেখতে।

আরে না, না—কৌশিক বাঁধা দেয়, একদম জ্বর নেই—একেবারে ছেড়ে গিয়েছে।

অনীতা বলে, আবার কাল রাত্রে তোমার জ্বর হয়েছিল বুঝি?

না, না—সামান্য, কৌশিক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

হ্যাঁ সামান্য বৈকি, জানেন দিদি কাল দাদার এত জ্বর হয়েছিল যে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছিল ভাগ্যে ঐ সময় আমি এসে পড়েছিলাম।

তাই—তাই আজ এ ঘরে পা দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়েই মনে হয়েছিল তুমি যেন খুব অসুস্থ—এখন, এখন আর জ্বর নেই ত?

না, না—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কিন্তু কই কানু তুমি কি আমার জন্যে খাবার এনেছো দেখালে না? দাও—কি ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

মাগুর মাছের ঝোল আর রুটি—কানু বলে।

দাও, দাও।

একটা প্লেটে করে অনীতা খাবার সাজিয়ে দেয়। কৌশিক খেতে শুরু করে। খেতে খেতে এক সময় বলে, জান অনী, ইদানীং এক এক সময় যখন কিছু ভাল লাগত না—একা একা বেহালা বাজাতেও ভাল লাগত না তখন ভাবতাম ভগবান যাকে দুনিয়ায় সংসারের দিক দিয়ে নিঃস্ব করে এ সংসারে পাঠান তার মত দুর্ভাগা বুঝি আর কেউ নেই। কিন্তু আজ কানুকে পেয়ে মনে হচ্ছে কেবলই ভগবান কানুকে আমাকে পাইয়ে দেবেন বলেই বোধহয় সব বন্ধন থেকে আমায় মুক্তি দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করছিলেন।

কৌশিকের চোখে জল ভরে আসে।

কানু ঐ সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, দাদা আজ শনিবার—হোটেলে আজ খুব ভিড় হবে—এখন আমি যাই, কাল আবার আসবো।

এসো ভাই।

কানু চলে গেল।

আরো কিছুক্ষণ পরে অনীতাও বিদায় নিল। যাবার সময় বার বার করে বলে গেল, ভাল করে সুস্থ না হয়ে কিন্তু কোথায়ও বের হয়ো না।

দিন দুই পরে।

কৌশিক দুদিন বেশ ভালই আছে।

জ্বর আর আসেনি।

দুদিনই কানু সকালে বিকালে এসেছে।

দুজনে বসে কত গল্প করেছে।

সেদিন একা একা ঘরের মধ্যে বসে কৌশিক বেহালায় একটা নতুন সুর তুলছিল। নতুন একটা গান লিখেছে কাল রাত্রে—সেই গানেই সুর দিচ্ছিল।

চমৎকার একটা পরিকল্পনা তার মাথায় এসেছে কাল রাত থেকে—গানে সুর দিয়ে সেই গান কানুকে দিয়ে গাওয়াবে।

সেদিন কানুর গলার গান শুনেই বুঝেছিল কানুর গলাটি সত্যিই মিষ্টি।

হঠাৎ ঐ সময় বিমল এসে হাজির।

বিমল ডাকে, কৌশিক!

বাজনা থামিয়ে মুখ তুলে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে বিমল।

আরে বিমল যে—এসো এসো।

বিমল ছোট টুলটা টেনে নিয়ে বসে, তোমাকে এত রুগ্ন লাগছে কেন, অসুখ করেছিল নাকি?

ও কিছু না।

কোথায়ও কাজটাজ করছো?

না।

আজ একটা অর্কেষ্ট্রায় বাজাবে?

কি ব্যাপার বলত!

হরিদাসদা পাঠালেন—মিউজিক টেক আছে আজ সন্ধ্যায়— গোটা তিনেক গান টেক করা হবে, বাজাবে?

নিশ্চয়ই—কেন বাজাবো না—হাত একদম খালি—কখন যেতে হবে?

এখুনি।

চল যাচ্ছি।

কৌশিক বিমলের সঙ্গে বের হয়ে পড়ল ঘরের দরজায় তালা দিয়ে।

স্টুডিও পাড়ায় মিউজিক টেক ছিল।

হরিদাসবাবুরই সব মিউজিক হ্যাণ্ডস্।

মিউজিক টেক করে সন্ধ্যা সাড়ে নয়টা নাগাদ বাসায় ফিরে এলো কৌশিক— গোটা সত্তর টাকা মিলেছে।

এবং ঘরে ঢুকে দেখে দু'মাস আগে রেডিওতে বাজিয়েছিল তার দরুন একটা পঁচিশ টাকার চেকও এসেছে।

মনটা খুব খুশী খুশী।

আসবার পথে রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে এসেছিল এবং কানুর জন্য একটা প্যান্ট, একটা সার্ট ও এক বাক্স টফি নিয়ে এসেছিল।

গতকাল দেখেছিল কানুর সার্টটা ছিঁড়ে গিয়েছে কাঁধের কাছে।

খুশী মনে বেহালাটা নিয়ে বসল।

॥ ১৩ ॥

নতুন গানটার সুর মনের মত হয়নি এক জায়গায়—নানাভাবে বহুবার অদল বদল করেছে কিন্তু মন ভরেনি।

আজ আবার সেই গানটার সুর রচনা নিয়েই বসে।

রাত বাড়তে থাকে।

কানু ইতিমধ্যে বার দুই এসে ফিরে গিয়েছিল।

এবারে রাত দশটা নাগাদ এসে দেখে কৌশিকের ঘরে আলো জ্বলছে আর বেহালার সুর শোনা যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে দেখে কৌশিক বেহালা বাজাচ্ছে।

কানু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে যায়। ভারী ভাল লাগছে যেন সুরটা শুনতে। কানুর যেন মাকে মনে পড়ে।

মা—মা কি সুন্দর গান গাইত।

একসময় কৌশিক বেহালা থামাতেই নজরে পড়ে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে কানু—কানুর চোখে জল!

কানু—কখন এলে?

অনেকক্ষণ—তুমি কোথায় গিয়েছিলে দাদা?

একটু কাজে গিয়েছিলাম। বলতে বলতে পাশে রাখা প্যাকেটটা তুলে ওর মুখের দিকে তাকায়, শোন—কাছে এসো—এটা নাও।

কি এটা দাদা!

তোমার জন্য প্যান্ট আর সার্ট এনেছি।

কেন দাদা—আমার প্যান্ট সার্ট ত আছে।

ও তো ছিঁড়ে গিয়েছে—ওগুলো খুলে ফেলে এই নতুনগুলো পরো।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কানু দাঁড়িয়ে থাকে।

কি হলো, পর—তুমি না আমার ছোট ভাই—দাদার দেওয়া জিনিসটা পরবে না?

হ্যাঁ পরবো।

তবে পরো।

কানু নতুন সার্ট ও প্যান্ট পরে নেয়।

বাঃ চমৎকার দেখাচ্ছে—এবারে চোখ বোজ।

কেন!

বোজই না।

কানু চোখ বোজে। কৌশিক টফির বাক্সটা খুলে সেটা কানুর হাতে দেয়।

নাও চোখ খোল।

চেয়ে দেখে কানু।

চোখের মণি দুটো আনন্দে খুশীতে চকচক করে ওঠে। টফি—মা তাকে কতদিন কিনে দিয়েছে—কানুর প্রিয় জিনিস টফি।

টফি!

হুঁ।

কানু একটা টফি নিজের মুখে দিয়ে একটা কৌশিককে দেয়।

না না—ও তোমার—কৌশিক বাধা দেবার চেষ্টা করে।

উহুঁ—তোমাকে খেতে হবে—খাও।

অগত্যা কৌশিককেও টফি খেতে হয়।

সুরটা ভারী সুন্দর লাগছিল তুমি যেটা বাজাচ্ছিলে দাদা বেহালায়, কানু বলে।

তোমার ভাল লেগেছে কানু?

হুঁ।

জান নতুন গানের একটা সুর বাজাচ্ছিলাম। তোমাকে গানটা তুলে দিলে তুমি গাইতে পারবে না গানটা?

আমাকে তুমি শিখিয়ে দাও দাদা।

তবে এসো—এখনই শিখিয়ে দিই তোমায়—দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে পাশে দাঁড়ায় কানু কৌশিকের।

কৌশিক বেহালাটা কাঁধের 'পরে তুলে নেয়—সামনে গানের কাগজটা কানুর কাছে রেখে বলে, আগে আগে আমি বাজাই—তুমি শুনে নাও তারপর গাইবে।

বেহালার সুরের সঙ্গে সঙ্গে কানু গুনগুন করে সুর তোলে।

মা অর্গান বাজাত—কেবল একবার বা দুবার গানটা আগাগোড়া গাইবার পর তখন গাইতে হতো কানুকে সেই অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে।

আজো তেমনি করেই গাইতে শুরু করে কানু কৌশিকের বেহালা বাজানব সুরে গলায় সুর মিলিয়ে।

কানুর গলার সুর যেমন মিষ্টি তেমনি সুরেলা।

কৌশিক মুগ্ধ—উল্লসিত।

প্রথমবার সামান্য কিছু ভুলচুক হয়।

কৌশিক শুধরে দেয়, উহুঁ—শোন—এমনি—এমনি হবে।

কানু সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নেয়।

কৌশিক আনন্দে মাথা দুলিয়ে সায় দেয়, হ্যাঁ—ঠিক—ঠিক।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কানু গলায় সুরটা তুলে নেয়—গানটা মুখস্থ হয়ে যায়।

কৌশিক কানুকে আনন্দে উল্লাসে দু'বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে—কানু—কানু—আমাব কানু।

অনেক রাত্রে কানু বলে, এবার আমি যাবো দাদা।

এত রাত্রে!

হুঁ—সকালে উঠে অনেক কাজ করতে হয়—কাজ না করলে পালমশাই বড় খিটখিট করে আজকাল।

উৎসাহিত কৌশিক বলে, করুক—আর কিছুদিন করুক সে—তোমাকে আমি রেডিওতে নিয়ে যাবো—স্টেশন ডাইরেকটার—প্রোগ্রাম একজিকিউটর তোমার গলার গান শুনলে তোমাকে রেডিওতে চান্স দেবে। একবার রেডিও আর্টিস্ট হয়ে যেতে পারলে তোমাকে আর ঐ ছোট কাজ করতে হবে না—অনেক রোজগার করতে পারবে তুমি।

সত্যি বলছো দাদা?

কানুও কেমন নিজেও যেন উৎসাহিত বোধ করে।

হ্যাঁ—তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব—তুমি পড়াশুনা করবে আর রেডিওতে গান গাইবে—তার পর রেকর্ডেও গাইবে আমার গান আমার সুর।

খুব মজা হবে দাদা। তাহলে খুব মজা হবে!

সে রাত্রে কৌশিক কানুকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে।

আরো দিন কয়েক পরে।

কানু নতুন একটা গান গলায় তুলছে—বাজাচ্ছে কৌশিক—অনীতা এসে ঘরে ঢুকল।

ওদের দুজনার কারোরই অনীতার প্রতি নজর পড়ে না।

অনীতাও সাড়া দেয় না।

সে একপাশে দাঁড়িয়ে গান শুনতে থাকে।

হঠাৎ একসময় অনীতাও কানুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে।

দুজনাই অনীতার গলা শুনে ফিরে তাকায়।

অনীতা—তুমি!

হুঁ—থামলে কেন, বাজাও—অনীতা বলে, গানটা আমিও শিখে নিই।

কই থামলে কেন কৌশিক, বাজাও।

কৌশিক আবার শুরু করে। বেহালা কাঁধের উপরে তুলে নেয়।

কানু আর অনীতা দুজনে গায়।

কৌশিক শুধায় এক সময় গান শেষ হয়ে গেলে, কেমন লাগল অনী গান আর সুর?

চমৎকার! অনীতা বলে।

সত্যি!

হ্যাঁ।

তোমার বাবা ফিরেছেন দিল্লী থেকে?

হ্যাঁ কাল ফিরেছেন।

তারপর হঠাৎ কানুর দিকে তাকিয়ে ডাকে, কানু।

কেন দিদি?

একদিন তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে না?

আপনার বাড়ি তো আমি চিনিনা দিদি।

তোমাকে চিনতে হবে না—আমি এসে নিজে তোমাকে নিয়ে যাবো।

কানু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

কাল বাদে পরশু এই সময় আসবো—তুমি এখানে থেকো, কেমন! ঠিক আমি আসবো।

সেদিনকার মত অনীতা বিদায় নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু অনীতার আসা হয় না—তার কথামত সে পরশু আসতে পারল না।

সেদিনটা ছিল শনিবার—হাইকোর্ট বন্ধ তবু অচিন্ত্য ব্যানার্জী একটা কনসালটেশনে গিয়েছিলেন—তাঁর ফিরতে সেই সন্ধ্যা।

অনীতা বেরুতে যাবে ঐ সময় হঠাৎ ফিরে এলেন ব্যানার্জী সাহেব।

সঙ্গে তাঁর একটি সুশ্রী তরুণ।

একি— কোথায়ও বেরুচ্ছো নাকি অনী—মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ব্যানার্জী সাহেব।

হ্যাঁ ড্যাডি।

এখন নয় পরে বের হয়ো—Let me introduce—পীযুষ—পীযুষ চ্যাটার্জী—আমার বন্ধু সমরের ছেলে—বিলেত থেকে স্ট্রাকচারাল ইন্‌জিনীয়ার হয়ে এসেছে—পীযুষ, আমার মেয়ে অনীতা।

পীযুষ হাত তুলে নমস্কার জানায়, নমস্কার।

নমস্কার।

অনী—

ড্যাডি।

ও আজ পাটনা থেকে এসেছে—হোটেলে উঠেছিল—টেনে নিয়ে এলাম—ওদের অফিসের কলকাতা ব্রাঞ্চে কি কাজ আছে সেইজন্য—মাস খানেক এইখানেই থাকবে। দোতলায় পশ্চিমদিককার ঘরটা—শান্তনুর ঘরের পাশের ঘরটাতেই ওর থাকবার সব ব্যবস্থা করে দাও।

অনীতা হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

এতক্ষণ হয়ত কানু তার জন্য কৌশিকের ঘরে অপেক্ষা করছে। তাকে সে এইখানে নিয়ে আসবে বলেছিল—কথা দিয়ে এসেছিল ঠিক সে যাবে আজ।

মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় অনীতার।

কিন্তু উপায় নেই—ড্যাডির বন্ধুর ছেলে পীযুষ না কে—তাকে অভ্যর্থনা জানাতেই হবে।

ওর বোধহয় চায়ের পিপাসা পেয়েছে—আগে তুমি মধুকে বলো আমাদের চা দিতে।

পীযুষ ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ এবং হাসিখুশী।

বলিষ্ঠ লম্বা চেহারা।

কালো হলেও চোখে-মুখে অপূর্ব একটা পৌরুষের ভাব যেন। দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল। জোড়া ভ্রু।

চলুন মিঃ চ্যাটার্জী উপরে চলুন।

হ্যাঁ, চলুন।

আগে আগে অনীতা ওঠে—পশ্চাতে উঠতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে পীযুষ।

আপনি বোধহয় কোথায়ও বেরুচ্ছিলেন দরকারে—এ সময় এসে পড়ে আপনাকে বিব্রত করলাম ত—উঠতে উঠতে পীযুষ বলে।

না না—বিব্রত কি—

জরুরী কোন অ্যাপয়েন্টমেণ্ট থাকলে যান না—আমার কোন অসুবিধা হবে না, ম্যানেজ করে নেবো।

না, না—সেরকম কিছু না।

পীযুষকে বারান্দায় বসতে দিয়ে অনীতা মধুকে নিয়ে তার থাকবার ঘরটার ব্যবস্থা করতে যায়।

॥ ১৭ ॥

চা পানের পর ব্যানার্জী সাহেব আবার উঠে দাঁড়ালেন—আমি বেরুচ্ছি পীযূষ, আমি বোধহয় একেবারে ডিনার খেয়ে ফিরবো—তুমি কিন্তু কোন লজ্জা করবে না মাই বয়, এ তোমার নিজের বাড়ি! তাছাড়া অনী রইলো।

ব্যানার্জী সাহেব বের হয়ে গেলেন।

ইচ্ছা থাকলেও আর কৌশিকের ওখানে যাওয়া হলো না অনীতার।

বাড়িতে অতিথি—তাছাড়া তার সব কিছু দেখাশোনার দায়িত্ব ড্যাডি তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন।

আর ওদিকে কানু আর কৌশিক অনীতার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে।

মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টা কেটে যায়—অনীতা আসে না।

দিদি বোধহয় ভুলে গেছে দাদা—একসময় কানু বলে।

কৌশিক তখন অন্য কথা ভাবছে।

অনীতা যে কথা দিয়েও এখনও পর্যন্ত এলো না তার কারণ সে ভুলে যায়নি। অন্য কোন

বিশেষ কারণেই সে নিশ্চয়ই এলো না।

আসতে পারেনি অনীতা।

কানু ত জানে না—তাকে আসল কারণটা বলাও যায় না। সে ভাবছে তার দিদি হয়ত ভুলে বসে আছে।

অনীতার না আসার কারণটা কৌশিক যে অনুমান করতে পারে না তাও নয়। অনীতা যে ২।৩ দিন তাঁর এখানে এসেছে সেটা তার বাপ অচিন্ত্য ব্যানার্জী নিশ্চয়ই জানেন না।

তাকে না জানিয়েই সে এসেছে এখানে।

হয়ত কোনক্রমে সেটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে বা ড্রাইভারের মুখ থেকেই ব্যানার্জী সাহেব কথাটা জানতে পেরেছেন।

এবং ব্যাপারটা জানার সঙ্গে সঙ্গে যে কি ব্যাপার ঘটতে পারে তাও সহজেই অনুমেয়।

ব্যানার্জী সাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি করে মেয়েকে হয়ত বেরুতে বারণ করেননি, কৌশলে তাকে নিশ্চয়ই আটকে রেখেছেন।

ব্যানার্জী সাহেবের সেদিনকার কথাগুলো এখনো যেন কানে বাজে : Listen young man—I must say you are a fool.

চোরের মতই যেন মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল ব্যানার্জী সাহেবের সামনে কৌশিক।

ব্যানির্জী সাহেব বলে চলেন—শোন, আর কখনো যেন তুমি এ বাড়ির চৌকাঠও ডিঙ্গুবার না চেষ্টা করো ভবিষ্যতে।

তারপরই হাঁক দেন—বুচ্চা সিং—

দারোয়ান বুচ্চা সিং হন্তদন্ত হয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, জি সাব্—

দেখো ইসকো পয়ছানকে রাখ—চিনে রাখ—কোন দিন যেন আর এ বাড়িতে না ঢোকে—তারপরই কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—যাও—go—

গেটের বাইরে আসবার পর যে বুচ্চা সিং এতদিন তাকে গেট দিয়ে ঢোকবার সময়ে দিদিমণির মাস্টারজী—ছোটা-সাহেবের দোস্ত হিসাবে তাড়াতাড়ি উঠে সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়েছে সে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, বাবুজী—

কৌশিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে তাকায়।

এ বাড়িতে আর এসো না বাবুজী।

কৌশিক কোন জবাব দেয়নি—মুহূর্তকাল কেবল বোবাদৃষ্টিতে দারোয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল।

আঃ চোখ মুখটা আবার জ্বালা করছে।

আজো কি আবার জ্বর আসবে নাকি? কে জানে।

দাদা—

কানুর ডাকে ওর মুখের দিকে তাকায় কৌশিক।

কি ভাই?

আমি আজ যাই।

উঁ—যাবে,—আচ্ছা যাও—সামনের বুধবার রেডিওতে তোমার অডিশন, মনে আছে ত?

হ্যাঁ—আছে।

ঠিক একটার সময় আমরা এখান থেকে বেরুব, মনে থাকে যেন।

মনে থাকবে।

অডিশনে তুমি পাশ করবেই আমি জানি—পাশ যদি করে যাও, বিমলের বন্ধু একজন প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ আছে তাকে ধরে রেগুলার তোমার যাতে প্রোগ্রাম থাকে রেডিওতে তার চেষ্টা করা যাবে—আর তাহলে তোমার হোটেলে কাজ করতে হবে না।

আমরা দুজনে তখন একসঙ্গে এক জায়গায় থাকব, কেমন দাদা!

কানু উৎসাহের সঙ্গে বলে।

কৌশিক জবাব দেয়—হ্যাঁ—তাইত থাকব—তবে এ বাড়িতে নয়।
এখানে নয়?
না।
তবে কোথায়?
অন্য কোন বাসায়—আর তখন তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবো।
স্কুলে?
কানু প্রশ্নটা করে কৌশিকের মুখের দিকে তাকায়।
হ্যাঁ স্কুলে। তুমি লেখাপড়া করবে।
কানু কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।
মনে পড়ে যায় তার যেন হঠাৎ মার কথা--তাদের সেই মিশনারী স্কুল বাড়িটা।
অনেকখানি জায়গা নিয়ে মাঠ ও স্কুল বাড়িটা হলদে রংয়ের—পিছনের দিকে আর একটা মাঠ।
তার পরে হস্টেল—চারিদিকে প্রাচীর।
মনে পড়ে ফাদার লং—ফাদার স্মিথ—রেকটার—ওব্রায়েন।
সারি সারি ক্লাস বসত।
নীল রংয়ের স্কুলের বাসে চেপে সে প্রত্যহ স্কুলে যেত।
স্কুলে যাবার সময় মা-মণি তার কপালে একটি চুমো দিয়ে দিত।
Good boy হয়ে পড়া শোনা করবে—সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া চাই ঠিক ঠিক।
স্কুল থেকে ফিরে এসে ডাইনিং টেবিলে বসে খেতে খেতে মার সঙ্গে তার গল্প হতো।
স্কুলের গল্প।
কানু।
দাদা।
পড়াশুনা করতে তোমার ভাল লাগে না।
লাগে—হ্যাঁ দাদা আমি পড়বো।

ফিরতে সেদিন কানুর সন্ধ্যা হয়ে যায়।
রান্না ঘরে গোবিন্দ রান্না করছিল।
আর একটু পরেই সব খদ্দেররা আসতে শুরু করবে। খাওয়া শুরু হবে।
কে রে?
গোবিন্দদা আমি।
মাছের ঝোলে আলু ছাড়তে ছাড়তে গোবিন্দ বললে, কোথায় আজকাল এত যাস রে কানু?
কেন, তুমি ত জান গোবিন্দদা।
সেই তোর দাদার কাছে বুঝি?
হুঁ।
পালমশাই আজ খুব রাগারাগি করছিলেন--বলছিলেন বসে বসে এমন করে মাইনা আর খাওয়া দিতে পারবেন না—দূর করে দেবেন।
আমি নিজেই আর থাকবো না গোবিন্দদা।
থাকবি না!
না—দাদা বাসা ভাড়া করবে, সেখানে আমরা দুজনে থাকব। কানুর চোখে তখন রঙিন স্বপ্ন।
মন তার স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে।
যা, আজ ঝি আবার আসেনি—বাসনগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখ চট্‌পট্‌ করে।
কানু ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বাসন ধুতে চলে যায়--গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে কাজ করে চলে।

অডিশনে পাশ করে গেল কানু।
কানুর গলা ও গান শুনে যারা অডিশন নিতে এসেছিল তারা মুগ্ধ হয়ে যায়—প্রশংসামুখর

হয়ে ওঠে।

শীঘ্রই তাকে প্রোগ্রাম দেওয়া হবে তাও জানিয়ে দেওয়া হলো।

ঐ দিন বাসায় ফিরে এসে কৌশিক দেখে বিমল বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কৌশিক শুধায়, বিমল, কি খবর!

আধ ঘণ্টা হলো দাঁড়িয়ে আছি তোমার অপেক্ষায়।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে কৌশিক, এসো—কি খবর?

একটা নতুন হোটেল খুলেছে—সেখানে দু'বেলা বাজাতে হবে!

হোটেলে?

হ্যাঁ—ভাল মাইনে দেবে।

কত?

দেড়শ টাকা করে দেবে—আমি অর্কেডিয়ান বাজাবো, তুমি ভায়োলিন বাজাবে—রাজী কি না বল?

কি ভেবে কৌশিক বলে, বেশ রাজী—কবে থেকে কাজে যেতে হবে?

সামনের বুধবার থেকে—আজ শনিবার, সামনের বুধবার।

বেশ।

তুমি তাহলে প্রস্তুত থেকো—লাঞ্চ টাইম থেকেই বাজাবো—এগারটা নাগাদ এসে তোমায় নিয়ে যাবো। গোমেশকে মনে আছে?

গোমেশ!

হ্যাঁ—সে পিওনো বাজাবে।

খুব ভাল হবে।

বিমল বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর কৌশিক কানুকে বলে, বুধবার আমি কাজে যোগ দেবো, তুইও ঐ দিনই সন্ধ্যায় কাজ ছেড়ে এই বাড়িতে চলে আসবি।

খুব ভাল হবে দাদা, খুব মজা হবে—এই বাসাটাও ত আমরা ছেড়ে দেবো দাদা।

হ্যাঁ—ভাবছি—বিমলের অনেক জানাশোনা আছে—তাকে একটা বাসার কথা বলবো।

॥ ১৫ ॥

বুধবার বিমল আসতে কৌশিক তাকে একটা বাসার কথা বললে।

বিমল বলে, আরে আমাদের বাড়ির কাছেই মির্জাপুর স্ট্রীটে একটা ঘর খালি আছে—বাড়িওয়ালা ভদ্রলোককেও আমি চিনি—আজই তাকে বলবো।

তাহলে ত এখান থেকে খুব বেশী দূরেও নয়।

না—কাছেই।

তাহলে আজ ফিরবার সময় ঘরটা একবার দেখে আসাও যাবে—কি বল?

বেশ ত।

আর একটা কথা বিমল!

কি?

আমার হাত একেবারে খালি—কিছু অ্যাডভান্স পাইয়ে দিতে পার না?

তা বোধহয় পারা যাবে—হোটেলের প্রোপ্রাইটার মিঃ চিদাম্বরম—বুড়ো বেশ ভাল লোক বলেই ত মনে হয়—চল না বলবোখন।

হোটেল, হোটেল পরিবেশ দেখে কৌশিক খুশীই হলো।

ব্লু এনজেল হোটেলটির নাম।

ছোটখাটো এয়ারকনডিসনড্ সুন্দর ছিমছাম আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হোটেলটি—লাঞ্চ ডিনার ইভনিং টি ড্রিংক সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে।

একধারে ডায়াস—মিউজিক কনডাকট্ করবে মিঃ সুরিটা—সুরিটা বিমলের পূর্বপরিচিত।

পিওনোবাদক গোমেশ, অর্কেডিয়ান বাজিয়ে বিমল আর ভায়োলিনিস্ট কৌশিক।

আরো একজন আছে। গান গাইবে সে।

মিস্ জুলিয়ানা—অল্পবয়সী একটি অ্যাংলো গার্ল।

লাঞ্চের ভিড় একটু একটু করে জমে উঠছে তখন। নানা বয়সের পুরুষ নারীরা এসে ভিড় করতে শুরু করেছে।

সুরিটা লোকটার মিউজিক সম্পর্কে বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন মিউজিক সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে।

সেদিন লাঞ্চে যে দুটো মিউজিক বাজানো হবে তার স্বরলিপি প্রত্যেকের কাছে এগিয়ে দেয় সুরিটা।

জুলিয়ানা তখনো এসে পৌঁছায়নি।

ঘণ্টা দেড়েক বাজাবার পর দুপুরের মত ছুটি মিলল।

মিঃ চিদাম্বরমকে বিমল বলেছিল—তিনি পঞ্চাশটা টাকা অ্যাডভান্স দিলেন—কনট্রাক্ট ফর্মে ও ভাউচারে সই করে দিল কৌশিক।

ফিরবার পথে ঘরটা দেখতে গেল বিমলের সঙ্গে কৌশিক।

একতলায় হলেও ঘরটায় বেশ আলো বাতাস আছে—ভাড়া অবিশ্যি একটু বেশী—মাসে ত্রিশ টাকা।

তবে যে ঘরে কৌশিক এখন আছে তার থেকে আকারে একটু বড়।

ছোট এক ফালি বারান্দা—রান্নার ব্যবস্থা—প্যান্ট্রি সেখানেই।

পছন্দ হয়ে গেল কৌশিকের।

এক মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স দিতে হবে তাই দিয়ে দরজায় চাবি দিয়ে পরদিনই চলে আসবে বলে এলো কৌশিক।

বাসায় ফিরে এসে দেখে আর এক সুসংবাদ ওব জন্য অপেক্ষা করছে।

কানুকে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে—রেডিও থেকে চিঠি এসেছে।

এক মাসে দুটো প্রোগ্রাম—পনের মিনিট করে আধঘণ্টা প্রত্যেকবার তার পারিশ্রমিক পঁচিশ টাকা—আর কৌশিকের গান ও কম্পোজিশনের জন্য আর কুড়ি টাকা।

কৌশিকের আনন্দ যেন আর ধরে না।

ভগবান এতদিন পরে সত্যিই তাহলে মুখ তুলে চাইলেন।

তার লেখা গান—তার সুর। কল্পনা—তার স্বপ্ন।

সেই স্বপ্ন কানুর গলায় মূর্ত হয়ে উঠবে।

ইথারের বুকে ছড়িয়ে যাবে, কোটি কোটি লোক সেই গান শুনবে।

কিন্তু আজ আবার বোধহয় জ্বর এলো। সেই সঙ্গে দু'কানে ব্যথা।

আসুক জ্বর—কানুর আরো রিহার্সালের প্রয়োজন।

কটা দিন কানুকে নিয়ে একটু খাটতে হবে—অবিশ্যি কানু চমৎকার তুলে নিয়েছে গানটা—তাহলেও এখনো প্র্যাকটিসের দরকার।

কানু অন্যান্য দিন সন্ধ্যার আগেই আসে সেদিন কিন্তু এলো না।

সন্ধ্যার দিকে আবার যেতে হবে হোটেলে বাজাতে।

চোখ মুখ জ্বালা করছে—জ্বরও বেশ হয়েছে—কিন্তু বাজাতে যেতে হবেই—কনট্রাক্ট সই করে মিঃ চিদাম্বরমের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে এসেছে।

জ্বর গায়ে নিয়েই এবং কানেব মধ্যে যন্ত্রণা সত্ত্বেও বের হয়ে পড়ল কৌশিক।

একটা ট্যাক্সি করে হোটেলে গিয়ে পৌঁছাল। নিওনে হোটেলের নামটা জ্বলছে নিভছে।

মৃদু বাতির আলো ঘরের মধ্যে—যেন একটা স্বপ্নের মত পরিবেশ।

ঘরের সর্বত্র ছোট বড় ডিনারের জন্য টেবিল সব সাজান।

রাত আটটা থেকে প্রায় দশটা পর্যন্ত বাজাতে হবে।

গোমেশ বিমল সবাই তখন এসে গিয়েছে।

একমাত্র জুলিয়ানা তখনো আসেনি।

রাত আটটার কিছু পর থেকে বাজনা শুরু হলো—সঙ্গে জুলিয়ানার গান মধ্যে মধ্যে—ঐ সঙ্গে ডিনাব ও ড্রিংক চলেছে।

মৃদু কথোপকথন—চাপা হাসির টুকরো অস্পষ্ট শব্দ।

ছুরি কাঁটা চামচের মৃদু মৃদু শব্দতরঙ্গ—সুবেশ বয় ও ওয়েটারদের নিঃশব্দ চলাফিরা।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তখন কৌশিকের।

মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা।

কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে।

তবু সে বাজিয়ে যায়। বাজাতে হবেই—চাকরি নিয়েছে—অ্যাডভান্স নিয়েছে।

রাত্রের বাজনা শেষ হবার পর সেখানেই আহার দেবে—কিন্তু কৌশিক কিছুই খেল না—সে তখন আর দাঁড়াতে পারছে না।

কোনমতে একটা ট্যাক্সি করে বাসায় ফিরে এলো এবং ঘরে ঢুকে শয্যায় শুয়ে পড়ল।

অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা তখন ছিঁড়ে যাচ্ছে জ্বরও তেমনি।

দু' কানে যেন তালা লেগে গেছে—ভাল করে শুনতে পাচ্ছে না।

পরের দিন সকালের দিকে কানু যখন এলো কৌশিক জ্বরে একপ্রকার বেহুঁশ বললেও চলে—চোখ বুজে শয্যার উপর পড়ে আছে কৌশিক।

প্রথমে ভেবেছিলে কানু কৌশিক বুঝি ঘুমিয়ে—কিন্তু ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে গিয়ে চমকে ওঠে কানু।

ইস্ গা যেন একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

দাদা—দাদা করে বার দুই ডাকে।

কিন্তু কৌশিকের কোন সাড়া নেই। আরো জোরে চেঁচিয়ে ডাকে, শুধু তাই নয় গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয়, দাদা—দাদা—

কৌশিক এতক্ষণে রক্ত চোখে একবার তাকায় কিন্তু কোন কথা বলতে পারে না।

কানু রীতিমত ভয় পেয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি ছুটে কানু ডাঃ সেনের কাছে গেল।

ডাঃ সেন এলেন এবং কৌশিককে পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর করলেন।

ডাক্তারবাবু—

কি?

দাদাকে কেমন দেখলেন?

সেবারই ত তোকে বলেছিলাম দাদাকে তোর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিই—সব পরীক্ষা করিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করা দরকার।

তাহলে কি হবে ডাক্তারবাবু?

হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

হাসপাতালে ভর্তি করলে দাদা বাঁচবে না ডাক্তারবাবু।

বাঁচবে না কেন, ভাল হয়ে যাবে।

এখানে ভাল হবে না দাদা?

অনেক টাকা পয়সার দরকার—দামী দামী ঔষধ, চিকিৎসার দরকার—তুই চল আমি ঔষধ দিচ্ছি—তারপর দেখি হাসপাতালে ভর্তি করতে পারি কি না। হাসপাতালে ভর্তি ত আবার বললেই হওয়া যায় না।

কোথায় কানুরা সেদিন নতুন বাড়িতে উঠে যাবে।

পুরানো ঐ বাসাটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে—তা নয় সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল।

ডাঃ সেন ডিসপেনসারিতে গিয়ে ঔষধ ও ইনজেকশন নিয়ে এলেন।

ইনজেকশন দিলেন।

কৌশিক জ্বরের ঘোরে তখন অজ্ঞান।

ডাক্তার বলে গেলেন সকালেই হাসপাতালে ভর্তির চেষ্টা করবেন।

এক ফাঁকে গিয়ে কানু গোবিন্দর কাছ থেকে তার যা বাকী জমানো টাকা ছিল নিয়ে এলো—কিন্তু সে কটা টাকাই বা।

কৌশিকের জামার পকেটেও কিছু ছিল।

একদিনেই ঔষধপত্র কিনতে কিন্তু সব টাকা ফুরিয়ে গেল।

কৌশিক তখন অজ্ঞান।

বিকেলের দিকে বিমল এলো খোঁজ নিতে—সে ভেবেছিল ওরা নতুন বাসায় গিয়েছে কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে দরজায় তালা ঝুলছে, বুঝতে পারে—কৌশিকরা যায়নি নতুন বাসায়।

দুপুরেও যায়নি কৌশিক হোটেলে বাজাতে।

তাই পুরানো বাসাতেই খবর নিতে এলো বিমল।

কানু তখন শিয়রের ধারে বসে কৌশিকের মাথায় হাওয়া দিচ্ছে।

একি—কি ব্যাপার!

দাদার খুব জ্বর।

কখন জ্বর এলো?

জানি না—আজ সকালে এসে দেখি দাদা অজ্ঞান হয়ে আছেন।

বিমল এগিয়ে এসে কৌশিকের কপালে হাত দিল—জ্বরে গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

কৌশিক—কৌশিক।

বার দুই ডাকল বিমল কিন্তু কৌশিকের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মাথার এধারে টুলটার উপর ঔষধের শিশি দেখে বিমল জিজ্ঞাসা করে, ঔষধ কোথা থেকে এলো?

ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিলাম তিনিই ঔষধ দিয়েছেন। তারপরই একটু থেমে ডাকে, বিমলদা।

কি রে?

ডাক্তারবাবু বলছিলেন-

কি?

দাদাকে হাসপাতালে দিতে হবে।

সেইত ভাল, এখানে দেখাশোনা করবে কে। কেউত নেই।

কেন আমিত আছি। আমি দাদাকে দেখবো, দাদাকে ফেলে আমি কোথাও যাবো না, এক পাও যাবো না।

না রে কানু, তুই ছেলে মানুষ পারবি না। একটা সেন্সলেস রোগী সামলান কি চারটিখানি কথা তার চাইতে হাসপাতালেই দেওয়া ভাল—কে দেখছে কৌশিককে?

বড় রাস্তায় সেন ফার্মেসীর সেই ডাঃ সেন।

তাঁকে আমি চিনি, যাওয়ার সময় তাকে আমি দেখা করে বলে যাচ্ছি।

বিমল আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

কানু জ্বরের ঘোরে অচেতন্য কৌশিকের শিয়রের পাশটিতে বসে তার মাথায় জলপটি দিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

গলি পথ নির্জন হয়ে যায়।

সারাটা রাত কানু হোটেলে ফিরল না- অসুস্থ অজ্ঞান কৌশিকের শিয়রের ধারে জেগে বসে রইল।

কৌশিক জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে ভুল বকে চলেছে, রেডিওতে তুই গাইবি কানু—ইথারের বুকে তোর গান ছড়িয়ে যাবে—কোটি কোটি লোক সেই গান শুনবে—আমার লেখা আমার সুর দেওয়া গান—তোর গলার গান।

পরের দিন ভোর হতেই কানু আবার ডাঃ সেনের ওখানে ছুটল—ডাক্তারবাবু দাদার ত কই এখনো জ্ঞান হলো না—আর একটা ইনজেকশন দেবেন চলুন।

গিয়ে আর আমি কি করবো রে? ওর এখন লাম্বার পাংচার করা দরকার—সেই ফ্লুইড ও ব্লাড কালচার করা দরকার—পরীক্ষা করা দরকার—আমি বরং অ্যাম্বুলেন্সে একটা খবর দিচ্ছি—তারা এসে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

আপনি একবার চলুন ডাক্তারবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—আপনার বাড়িতে আমি চাকরের কাজ করে সব টাকা শোধ করবো—দাদাকে আমার আপনি ভাল করে দিন ডাক্তারবাবু।

তুই যা—আমি দেখছি।

না—আপনিও চলুন।

ডাঃ সেন অ্যাম্বুলেন্সে একটা টেলিফোন করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।
ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললেন, চল।

॥ ১৬ ॥

ডাঃ সেন ওখানে আসবার কিছু পরেই অ্যাম্বুলেন্স এলো।

স্ট্রেচারে করে ধরাধরি করে কৌশিককে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়া হলো।

কানু কান্নাকাটি করতে লাগল, ডাক্তারবাবু পায়ে পড়ি আপনার, দাদাকে হাসপাতালে পাঠাবেন না—দাদা তাহলে বাঁচবে না, আপনার দুটি পায়ে পড়ি।

ডাক্তার ধমক দিয়ে ওঠেন, থাম্—গোলমাল করিস না।

কানু দু'হাতে অজ্ঞান কৌশিককে জড়িয়ে ধরে বলে, না—দাদাকে আমি হাসপাতালে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবো না, দাদা তাহলে বাঁচবে না—না, না আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু—

ডাক্তারের ইঙ্গিতে দুজন লোক কানুকে ধরে রাখে—সে চেঁচাতে থাকে, ওগো তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও গো ছেড়ে দাও— আমার দাদাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে।

স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার পর অ্যাম্বুলেন্স যেমন ছেড়েছে কানু একজনের হাত কামড়ে দেয়—সে ছেড়ে দেয় কানুকে—কানু তখন অন্য জনের হাত থেকে এক ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দেয়।

অ্যাম্বুলেন্স চলেছে—কানুও ছোটে গাড়ির পিছনে পিছনে—পাগলের মত।

বেশী দূরে নয় হাসপাতাল।

হাসপাতালের গেট দিয়ে এসে অ্যাম্বুলেন্স ভিতরে ঢোকে— কানুও দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ঢোকে হাসপাতালে।

ইমারজেন্সীর সামনে এসে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়ায়।

হাসপাতালের কুলিরা এসে স্ট্রেচার সমেত অজ্ঞান কৌশিককে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে সোজা ভিতরে নিয়ে গেল।

কানু সঙ্গে সঙ্গে ঢুকবার চেষ্টা করে কিন্তু বাধা পায়।

এই, কে তুই? একজন অন-ডিউটি তরুণ ডাক্তার প্রশ্ন করে।

আমার দাদা—দাদাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে এসেছে হাসপাতালে এইমাত্র।

দাদা—কে তোর দাদা?

এইমাত্র যাকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। কৌশিক—কৌশিক রায়—চমৎকার বেহালা বাজায়—গান লেখে সুর দেয়—আমার দাদা—দু'দিন থেকে অজ্ঞান হয়ে আছে।

না থেমে কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলে যায় কানু।

ভিতরে যেতে পারবি না—দাঁড়া এখানে।

কেন—ভিতরে যেতে পারব না কেন? আমার দাদা।

দাঁড়া এখানে, পরীক্ষা করে এখনই ওয়ার্ডে পাঠানো হবে তখন সঙ্গে যাবি।

কানু ছলছল চোখে শুকনো মুখে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

ডাক্তার কৌশিককে পরীক্ষা করতে থাকেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে স্ট্রেচারে করে টিকিট দিয়ে কৌশিককে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কানু ওদের সঙ্গে সঙ্গে যায়।

কিন্তু ওয়ার্ডে সিস্টার ও ডাক্তার এসে বললেন, ওয়ার্ডের মধ্যে তাকে থাকতে দেওয়া হবে না—হাসপাতালের নিয়ম নেই।

দাদা তবে একা থাকবে? কানু জিজ্ঞাসা করে।

একা থাকবে কেন—আমরা ত সব সময় আছি।

দাদার যদি জ্ঞান ফিরে আসে—জল তেষ্টা পায়?

আমরা দেবো।

কিন্তু আমাকে যদি ডাকে।

বিকেলে চারটের সময় আসবি। চারটে থেকে ছটা হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ার্স—আর শোন।

কি?

কয়েকটা ঔষধ লিখে দিচ্ছি—কিনে আনবি বিকেলে। ঔষধগুলো দরকার।

হাউস সার্জন ডাক্তারটি একটা কাগজে ঔষধের নামগুলো লিখে সেটা কানুর হাতে দিলেন।

কানু বের হয়ে এলো হাসপাতাল থেকে।

বড় রাস্তার উপরেই একটা ঔষধের দোকান। কানু গিয়ে দোকানে ঢুকল।

কাউন্টারে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর হাতে ঔষধের কাগজটা দিল কানু—শুনছেন এই ঔষধগুলো দিন না।

ভদ্রলোক কাগজটা দেখে হিসাব করে বললেন, চল্লিশ টাকার মত লাগবে।

চল্লিশ টাকা!

হ্যাঁ ঐরকমই হবে।

কানুর পকেটে ত মাত্র তিন চারটি টাকা পড়ে আছে—তাছাড়া গোবিন্দদার কাছে আর তার জমানো টাকাও নেই।

টাকা আছে—ঔষধ দেবো? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন।

অত টাকা ত নেই সঙ্গে।

যাও তাহলে টাকা নিয়ে এসো। কাগজটা কানুর দিকে সরিয়ে দিয়ে অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন দোকানদার।

কানু ধীরে ধীরে ডিসপেনসারি থেকে বের হয়ে আসে।

টাকা—টাকা চাই।

চল্লিশ টাকা।

অন্যমনস্ক চিন্তিত কানু ভাবতে ভাবতে একসময় হোটেলেই আবার ফিরে এলো। পিছনের দরজা দিয়ে এসে ভিতরে ঢুকল।

গোবিন্দ ঝিকে দিয়ে মাছ কোটাচ্ছিল, কানুকে পিছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। মুখটা শুকনো—চুলগুলো রুক্ষ এলোমেলো।

কি হয়েছে রে কানু—কাল সারা রাত বুঝি ঘুমাসনি? কেমন আছে তোর দাদা?

দাদাকে ডাক্তারবাবু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তুই তাহলে এখন কি করবি—আজই কাজ ছেড়ে দিবি?

না।

আমিও তাই বলছিলাম চট্ করে কাজটা ছেড়ে দিস না। বরং পালমশাইকে বলে তোর আরো পাঁচটা টাকা মাইনা বাড়িয়ে দেবো—মনে হচ্ছে কাল বোধহয় সারারাত কিছু খাসনি— যা, রান্নাঘরে রুটি আছে—তাকে গুড় আছে—খেয়ে নে। তারপর চট্‌পট্ খাবার টেবিলগুলো মুছে ফেল।

খেতে একটুও ভাল লাগছিল না কানুর—সে টেবিল মোছার জন্য খাবার ঘরে চলে গেল।

ভিজে ঝাড়ন দিয়ে টেবিল চেয়ারগুলো মুছতে শুরু করে।

এক কোণে কাঠের বাক্সটা সামনে নিয়ে টাকা গুণছিল পালমশাই।

আড়চোখে একবার কানুর দিকে তাকাল।

নবাবপুত্তুরের নিদ্রাভঙ্গ হলো এতক্ষণে—এসব নবাবী আমার এখানে চলবে না। বুঝেছেন বাবু, টাকা আমার অত সস্তা নয়—ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো।

কানু কোন সাড়া দেয় না।

একবার শুধু আড়চোখে পালমশাইয়ের সামনে খোলা কাঠের বাক্সটার দিকে তাকায়।

দু থাক নোট।

হাতেও পালমশাইয়ের কতকগুলো নোট।

চল্লিশটা টাকার দরকার।

দাদা হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে আছে—ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন কতকগুলো ঔষধের দরকার।

পকেটে হাত দিল কানু।

ঔষধের কাগজটা পকেটেই রয়েছে। খসখস করে হাতে লাগে।

চল্লিশটা টাকা হলেই ঔষধগুলো কেনা যায়।

খাবার টেবিলের 'পরে একগাদা মাছি ভনভন করছে। কানু আবার টেবিলগুলো মুছতে শুরু করে।

একবার ভাবে কানু চাইবে পালমশাইয়ের কাছে চল্লিশটা টাকা।

কিন্তু পালমশাইয়ের মুখের দিকে চাইতে সাহসে কুলায় না।

গোবিন্দকেই একসময় বললে কানু, গোবিন্দদা—

কি রে?

দাদার কতকগুলো ঔষধ কিনতে হবে—চল্লিশটা টাকা দরকার।

তোর সব টাকাই ত নিয়ে গিয়েছিস।

নিয়েছি ত।

তবে আর কোথায় পাবো টাকা!

তোমার কাছে টাকা নেই গোবিন্দদা, দাও না।

আমার কাছে—

হ্যাঁ, মাসে মাসে তুমি আমার মাইনার টাকাগুলো নিয়ে নিও।

নারে—যা পাই তার সবটাইত মাসে মাসে দেশে পাঠিয়ে দিই—হাতে কি আমার কিছু থাকে? গোবিন্দ বলে।

তাহলে কি হবে গোবিন্দদা—দাদার ঔষধ যে কিনে নিয়ে যেতে বলেছেন ডাক্তারবাবু।

কি করবি বল কানু, আমরা যে গরীব—আমরা ভাল খেতে পাইনা—পরতে পাইনা—চিকিৎসা হয় না আমাদের।

অত কথা কানু বোঝে না আর ঐ সব কথা বুঝবার তার বয়সও নয়, কানেও বোধহয় তাই তার কথাগুলো ঢোকে না।

আর ঢুকবে কি—মনের সবটা জুড়ে রয়েছে তখন তার দাদার রুগ্ন মুখখানা—দুটো বোজা চোখ।

দাদার তাহলে চিকিৎসা হবে না।

পালমশাইয়ের কাছে বলবে? বলেই দেখা যাক না একবার।

ভয়ে ভয়ে কানু এক সময় পালমশাইয়ের সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

পালমশাই হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে তাকায়, কি চাই?

আজ্ঞে—আমার কিছু টাকার দরকার, দাদার বড় অসুখ ঔষধ কিনতে হবে।

টাকা রাস্তার খোলাম কুচি তাই না—বেরো বেরো এখান থেকে—সব মাইনা ত মিটিয়ে নিয়েছিস।

গোলমাল শুনে গোবিন্দ সামনে এসে দাঁড়ায়—কানুকে ডেকে নিয়ে যায়।

ওর কাছে টাকা চাইতে গেছিস? ও বেটা ত একটা চামার—যা কাল দুপুরে চেষ্টা করে দেখবো যদি কিছু ধার পাই কোথায়ও।

কানু আর কোন কথা বলে না।

ইতিমধ্যে খদ্দেররা আসতে শুরু করেছিল—কানু টেবিলের কাছে চলে যায়।

কানু হোটেলের কাজ করল সারাটা দিন কিন্তু অন্যমনস্ক।

হঠাৎ একসময় মনে পড়ে দিদির কথা।

সেই যে মস্ত বড় গাড়িতে করে এসেছিল দাদার কাছে—

গলা মিলিয়ে তার সঙ্গে গান গেয়েছিল, বলেছিল পরশু এসে তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলো না।

দিদি নিশ্চয়ই টাকাটা দিতে পারত।

দিদিকে বললে নিশ্চয়ই দিত—কিন্তু দিদির ঠিকানা ত সে জানে না।

কোথায় থাকে দিদি কিছুই সে জানে না।

দিদির নামও জানে না।

॥ ১৭ ॥

পকেটে যা অবশিষ্ট ছিল তা থেকেই কিছু ফল কিনে কানু বিকেল চারটে বাজবার কিছু আগেই হাসপাতালের দিকে রওনা হলো।

মনে মনে আশা করে কানু হয়ত গিয়ে দেখবে দাদার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

দাদা উঠে বসেছে—কথা বলছে। তার সঙ্গে কথা বলবে।

হয়ত ঔষধগুলোর আর দরকারই হবে না।

আশা ও উদ্বেগ আন্দোলিত মন নিয়ে একসময় কানু গিয়ে হাসপাতালে পৌঁছায়—কিন্তু নির্দিষ্ট শয্যাটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে হতাশ হলো।

কৌশিকের জ্ঞান ফেরেনি।

সে তখনো অজ্ঞান।

নাকের মধ্যে একটা রবারের টিউব লাগানো। দুটো চোখই বোজা।

অন্যান্য বেডের রোগীদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবরা সব এসেছে—রোগীদের সঙ্গে কথা বলছে। কেবল এক কোণে একটা বেডে তার দাদা চোখ বুজে পড়ে আছে।

অজ্ঞান—কোন সাড়া নেই।

ফলের ঠোঙাটা হাতে কানু দাঁড়িয়ে থাকে।

এই যে কানু, তুমি এখানে!

কে?

ফিরে তাকাল কানু। বিমলদা!

বিমলদা?

হ্যাঁ—বাসায় গিয়ে দেখলাম তালা দেওয়া, তখন ডাঃ সেনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম এই হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।

বিমলদা—

কি?

হাসপাতালের ডাক্তারবাবু কতকগুলো ঔষধ কিনে আনতে বলেছিলেন।

এনেছো?

না—এই যে কাগজটা—আমার কাছে ত টাকা নেই—একটা ঔষধের দোকানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা বললে চল্লিশ টাকা লাগবে।

চল্লিশ টাকা!

হুঁ—তুমি কিনে দাও না ঔষধটা বিমলদা?

কিন্তু অত টাকা ত আমার কাছে নেইরে—তাছাড়া মাসের শেষ।

তাহলে কি হবে বিমলদা?

তাই ত—ভাবনার কথা।

টাকাটা তুমি দিতে পার না বিমলদা? সামনের শনিবার ত রেডিওতে আমি গান গাইব—দাদা বলেছিল গান গাইবার পর আমরা টাকা পাবো—সেই টাকাগুলো তখন তোমাকে দিয়ে দেবো।

বিমল কোন কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

বিমলদা —

উঁ।

আচ্ছা বিমলদা দিদির ঠিকানাটা তুমি জান?

দিদি!

হ্যাঁ অনীতাদি—দাদার কাছে আসত বড় গাড়িতে চেপে।

বিমলের হঠাৎ মনে হয় কানু কথাটা মন্দ বলেনি।

অচিন্ত্য ব্যানার্জী ব্যারিস্টার সাহেবের মেয়ে অনীতা ব্যানার্জী।

কৌশিকের কলেজের বন্ধু শান্তনু ব্যানার্জীর বোন অনীতা। একসময় কৌশিক অনীতাকে ভায়োলিনের লেস্‌ন্ দিত।

কৌশিকের মুখ থেকেই একদিন কথায় কথায় জেনেছিল অনীতার কথাটা বিমল।

কৌশিকের কাছে অনীতা ভায়োলিনের লেস্‌ন্ নেয়।

কিন্তু তারপর হঠাৎ কেন অনীতাকে যে কৌশিক লেস্‌ন্ দেওয়া বন্ধ করেছিল তা সে জানে না।

সেও জিজ্ঞাসা করেনি।

কৌশিকও কোন কথা তাকে বলেনি। তাছাড়া বরাবরই ত কৌশিক চাপা প্রকৃতির, বেশী কথাই কারো সঙ্গে কোন দিন বলেনি। তাহলেও বিমল বুঝতে পেরেছিল যেদিন অনীতা তার কাছে কৌশিকের সংবাদের জন্য ছুটে এসেছিল—কৌশিকের প্রতি অনীতার একটা দুর্বলতা আছে।

নচেৎ নিছক কেবল একদিন যার কাছে কটা দিন ভায়োলিনের লেস্‌ন্ নিয়েছে তার সংবাদের জন্য অনীতা অমন করে এসে তাকে খুঁজে বের করে দেখা করত না।

কানু মিথ্যে বলেনি।

অনীতা হয়ত কৌশিকের অসুখের কথা শুনলে কেবল ঐ সামান্য কটা টাকা কেন হয়ত ওর চিকিৎসার আরো ভাল ব্যবস্থাও করে দিতে পারে অনায়াসেই।

অনীতার বাবা ব্যারিস্টার অচিন্ত্য ব্যানার্জী সমাজের একজন গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।

ওরা ইচ্ছা করলে কি না পারে।

অনীতাকে তুমি চেন কানু?

চিনি—খুব চিনি।

ঠিকানাটা বলে দিলে তার বাড়িতে তুমি চিনে যেতে পারবে?

বিমল জিজ্ঞাসা করে।

পারব—কানু বলে, নিশ্চয়ই পারব—দিদি কোথায় থাকে বলুন।

অচিন্ত্য ব্যানার্জীর উড্ স্ট্রীটের বাড়ির ঠিকানা বলে দিল বিমল।

সেই রাত্রেই কানু একে ওকে জিজ্ঞাসা করতে করতে উড্ স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চলল।

পীযূষ যেন এক মুহূর্তের জন্যও অনীতাকে ছাড়তে চায় না।

এবং বিশেষ করে যে সময়টা অনীতা কৌশিকের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারত সে সময়টা পীযূষ বাড়িতেই থাকে।

এবং পীযূষ যতক্ষণ বাড়িতে থাকে এমন একটা ব্যস্ততার পরিবেশ তার চারপাশে গড়ে রাখে যে অনীতাকে যেন সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।

তাছাড়া নতুন গাড়ি ডেলিভারী নিয়েছে পীযূষ—প্রতিদিনই প্রায় বিকেলের দিকে সেই গাড়িতে চেপে দুজনে বের হয়।

কলকাতা শহর ও দশ পনের মাইলের মধ্যে যত জায়গা আছে গাড়ি নিয়ে যেন চষে বেড়ায় পীযূষ।

সেদিন পীযূষের ফিরতে একটু দেরি হয়েছে।

অনীতা প্রস্তুত হয়ে আছে।

এমন সময় একটা গোলমাল তার কানে এলো—জানালা-পথে গেটের দিকে তাকায় অনীতা—দারোয়ান ও চাকরদের ভিড়।

একটা ছোট ছেলেকে ঘিরে গোলমাল।

গেটের আলোয় ভাল করে দেখতে পায় না অত দূর থেকে অনীতা।

এমন সময় একজন ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকল।

কি হয়েছে রে রাম—গেটের সামনে গোলমাল কিসের?

একটা ভিখারীর ছেলে—

ভিখারীর ছেলে!

হুঁ—সে তার দিদির সঙ্গে দেখা করতে চায়—বুচ্চা সিং আসতে দেবে না—ছেলেটা কেবলই বলছে তার দিদি নাকি এই বাড়িতে থাকে।

দিদি—মানে ছেলেটার দিদি এই বাড়িতে থাকে!

হুঁ।

ভিখারী ছেলেটার দিদি এই বাড়িতে থাকে—তার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলছে!

হ্যাঁ।

কৌতূহলী অনীতা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়—সোজা গেটের সামনে গিয়ে হাজির হয়।

দারোয়ান—

দিদিমণি?

কেয়া হ্যায়।

কানু ততক্ষণে অনীতাকে দেখে চিনতে পেরেছে—সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে—দিদি, আমি কানু!

কানু—কি ব্যাপার—ছোড় দো উসকো দারোয়ান।

দারোয়ান সরে দাঁড়ায়।

দিদি।

কি হয়েছে কানু?

দাদার খুব অসুখ।

কার, কৌশিকের?

হুঁ।

কি হয়েছে?

হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে আছে—হাসপাতালের ডাক্তার ঔষধ কিনে দিতে বলেছে—ঔষধের দাম চল্লিশ টাকা লাগবে।

চল্লিশ টাকা—

হ্যাঁ—তুমি টাকাটা দাও দিদি—আমি টাকা পাবো—পেলেই তোমাকে এসে দিয়ে যাবো।

এসো তুমি আমার সঙ্গে।

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—অনীতা কানুকে নিয়ে ভিতরে চলে যায়।

সোজা দোতলায় তার ঘরে নিয়ে যায়।

ব্যাগ থেকে পঞ্চাশটা টাকা বের করে কানুর হাতে দেয়, নাও—কোন হাসপাতালে কৌশিক আছে?

নীলরতন সরকার হাসপাতালে—কানু বলে।

চল আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, সামনাসামনি একেবারে অচিন্ত্য ব্যানার্জী ও পীযূষের সামনে পড়ে যায়।

ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড় পরা একটা দশ এগার বছরের ছেলের সঙ্গে অনীতা নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে।

বাড়িতে ঢুকতেই দারোয়ান ও ভৃত্যেরা ব্যারিস্টার সাহেবের কর্ণগোচর করেছিল ব্যাপারটা। দিদিমণি ভিক্ষুকটাকে সঙ্গে নিয়ে উপরে গিয়েছে।

অনী—

ব্যারিস্টার সাহেবের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়ায় অনীতা এবং তার পাশে ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়ায় অনীতার একেবারে গা ঘেঁষে কানু।

Who is this boy—এ ছেলেটা কে?

অনীতা যেন আড়াল করে দাঁড়ায় কানুকে। বলে, কানু!

কানু—Who is he?

ড্যাডি আমার জানাশোনা।

একটা রাস্তার ভিক্ষুকের সঙ্গে তোমার জানাশোনা হলো কি করে?

ও ভিক্ষুক নয় ড্যাডি কৌশিকবাবুর ভাই।

কৌশিক!

হ্যাঁ।

ব্যারিস্টার অচিন্ত্য ব্যানার্জী ভ্রূকুটি করে তাকাল মেয়ের মুখের দিকে।

নামটা তার জানা নয়—শোনেনি কখনো আর শুনে থাকলেও মনে করতে পারেন না যেন।

পুনরায় প্রশ্ন করেন অচিন্ত্য ব্যানার্জী, Who is কৌশিক?

মনে নেই ড্যাডি তোমার—সেই যে ভদ্রলোক দাদার বন্ধু আমাকে ভায়োলিনের লেস্‌ন্ দিতেন?

I see!

তার খুব অসুখ ড্যাডি—তিনি হাসপাতালে আছেন—অজ্ঞান হয়ে আছেন আজ দুদিন—তার ওখানেই আমি একটিবার যাচ্ছিলাম—আমার বেশী দেরি হবে না ড্যাডি—যাবো আর দেখে ফিরে আসবো—এসো কানু।

কথাগুলো বলে অনীতা কানুকে নিয়ে নেমে যাচ্ছিল হঠাৎ পিছন থেকে গম্ভীর গলায় নির্দেশ শোনা গেল—দাঁড়াও।

বাবার গলার অস্বাভাবিক গম্ভীর আওয়াজে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়ায় অনীতা।

ফিরে তাকায় বাপের মুখের দিকে।

যাবে না তুমি এখন কোথায়ও।

ড্যাডি—

যাও—উপরে যাও।

অনীতা তথাপি যেন ইতঃস্তত করে, ঐ সময় অচিন্ত্য ব্যানার্জী তীক্ষ্ণ গলায় ডাকেন, বুচ্চা সিং।

বুচ্চা সিং ইতিমধ্যে এসে দরজাপথে উঁকি দিচ্ছিল।

প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়, সাব্—

ঐ ছোকরাটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও।

দারোয়ান এগিয়ে আসছিল অনীতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, না—ওকে কারো বের করে দিতে হবে না—ও নিজেই চলে যাচ্ছে। যাও কানু।

কানু ভয়ে ভয়ে অনীতার মুখের দিকে একবার তাকাল।

যাও তুমি ভাই—এখানে আর তুমি এসো না—কথাটা বলতে গিয়ে অনীতার গলাটা অশ্রুতে যেন বুজে আসে।

কানু ধীরে ধীরে নামতে থাকে। তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা তখনো অনীতার দেওয়া নোটগুলো। হঠাৎ সেদিকে নজর পরে অচিন্ত্য ব্যানার্জীর।

ওর হাতে ঐ টাকা কিসের—চুরি করেছে নিশ্চয়ই তোমার ঘর থেকে—বলতে বলতে সামনে এগিয়ে আসেন অচিন্ত্য ব্যানার্জী।

চুরি করিনি আমি, দিদি দিয়েছে।

দিদি দিয়েছে—চোর বদমাশ—বলতে বলতে বাঘের মতই যেন একটা থাবা দিয়ে অচিন্ত্য ব্যানার্জী কানুর হাত থেকে নোটগুলো ছিনিয়ে নেন অকস্মাৎ।

ঠাস করে কানুর গালে একটা চড় বসিয়ে দেন অচিন্ত্য ব্যানার্জী।

চোর।

আমি চোর নই।

আমি—আমিই ওকে ঐ টাকা দিয়েছি ড্যাডি।

অনীতা প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সে কথায় অচিন্ত্য ব্যানার্জী কর্ণপাতও করেন না, দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, বাহার নিকাল দো এ চোট্টাকো।

দারোয়ান বুচ্চা সিং এগিয়ে আসছিল কিন্তু তার আগেই চোখের পলকে পকেট থেকে গুলতিটা বের করে একটা নুড়ি গুলতিতে চেপে ধরে সাঁ করে নুড়িটা দারোয়ানকে লক্ষ্য করে ছোড়ে।

ঠং করে গিয়ে নুড়িটা দারোয়ানের কপালে লাগে।

যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে দারোয়ান—মার ডালা—মর গেয়া।

অচিন্ত্য ব্যানার্জী চীৎকার করে ওঠেন, ধর—ধর শয়তানটাকে।

কিন্তু ততক্ষণে কানু আবার গুলতি হাতে সেটা উঁচিয়ে ধরেছে—ভৃত্যেরা কেউ আর এগুবার সাহস পায় না।

গুলতিটা ছেড়ে কানু আর ফিরেও তাকায় না—ছুটে পালায় এবং ছুটতে ছুটতেই এক প্রকার অচিন্ত্য ব্যানার্জীর উড্ স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বের হয়ে কানু একেবারে ট্রাম রাস্তায় এসে পড়ে।

সন্ধ্যারাত্রির কলকাতা শহর।

ট্রাম—বাস—ট্যাক্সী প্রাইভেট গাড়ির ও পায়ে হাঁটা মানুষের একটা চলমান স্রোত।

সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় কানু।

দিদির ওখানে টাকা চাইতে গেলে শেষ পর্যন্ত যে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে চিন্তাও করতে পারেনি কানু।

টাকাগুলো হাতে পেয়ে ভারি স্বস্তি বোধ করেছিল কানু।

দিদির দোষ নেই।

দিদি ত তাকে টাকাগুলো দিয়েছিলই।

সত্যিই দিদি খুব ভাল—কিন্তু দিদির বাবা একটুও ভাল লোক না।

॥ ১৮ ॥

সারাটা রাত অনীতা ঘুমাতে পারে না।

ছটফট করে—কেবলই শয্যায় এপাশ ওপাশ করতে থাকে।

বাবার আজকের ব্যবহার অনীতার চোখের উপর থেকে পর্দা সরে যায়।

কৌশিকের হঠাৎ পরিবর্তনের কারণটা বুঝতে পারেনি এত দিন।

আজ মনে হয় সেদিন বাবা কৌশিককে নীচে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই কিছু বলেছিলেন—সেই জন্যই সে আর এমুখো হয়নি।

অনীতার সঙ্গে আর দেখাও করেনি। তাকে এড়াবার চেষ্টা করেছে তারপর থেকেই।

আর সেই দিনও হয়ত হঠাৎ তার বাসায় তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ঐ কারণেই।

ভোর হতেই অনীতা চুপি চুপি বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।

একটা ট্যাক্সী নিয়ে সোজা হাসপাতালে গিয়ে হাজির হয় কিন্তু কৌশিক কোন ওয়ার্ডে আছে কিছুই জানে না।

জিজ্ঞাসাবাদ করে কৌশিকের খোঁজ পেতে বেশ কিছুক্ষণ সময় যায়. সময়টা আবার ভিজিটিং আওয়ারে নয়।

কিন্তু একজন তরুণ হাউস ফিজিসিয়ানকে অনুরোধ করায় সে কৌশিককে একটিবার দেখবার অনুমতি পায়।

কৌশিক শয্যার উপর চোখ বুজে পড়েছিল।

ঈস কি চেহারা হয়ে গিয়েছে কৌশিকের, অনীতার দু'চোখে জল ভরে আসে।

একটু ইতঃস্তত করে কৌশিকের কপালটা আলতো ভাবে ছোঁয়।

কৌশিক চোখ মেলে তাকায়, কে?

আমি।

কৌশিকের চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয় ব্যাপারটা যেন সে ঠিক উপলব্ধি করতে পারছে না।

চিনতে পারছো না—আমি অনীতা।

অনীতা—

হ্যাঁ— কেমন আছো?

কৌশিক যেন শুনতে পাচ্ছে না ভাল অনীতার কথাগুলো! চেয়ে থাকে অনীতার মুখের দিকে।

তারপর এক সময় কৌশিকই ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে— কার কাছে খবর পেলে?

পেয়েছি—খুব কষ্ট হচ্ছে?

কৌশিক জবাব দেয় না কোন।

অনীতা নিজেই আবার বলে, সেদিন তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম তুমি খুব অসুস্থ।

সে কথার কোন জবাব দেয় না কৌশিক। একটু পরে মৃদু গলায় অনীতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আর এখানে থেকো না—তোমার বাবা জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবেন।

জানতে পারবেন না।

নার্স এসে বললে, ওকে বেশী কথা বলাবেন না—ডাক্তারের বারণ আছে।

অনীতা আরো কিছুক্ষণ কৌশিকের শিয়রের ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, কৌশিক, এবার আমি যাই।

কৌশিক কোন জবাব দেয় না।

অনীতা ফিরে এসে আবার সেই তরুণ হাউস ফিজিসিয়ানের সঙ্গে দেখা করল ও তার হাতে একশটা টাকা দিয়ে বলল, ওর ঔষধের যা টাকা লাগবে এই টাকা থেকে কিনে দেবেন।

কিন্তু আপনি কে হন ওর?

আমি?

হ্যাঁ।

উনি আমার বিশেষ আপন জন।

কিন্তু এ ভাবে আমাদের টাকা রাখার নিয়ম নেই—আপনি বরং ভিজিটিং আওয়ারে এসে ডাক্তার যে ঔষধের কথা বলবে কিনে দিয়ে যাবেন।

কিন্তু আমি ত আসতে পারব না।

তাহলে আর কি করবো বলুন—টাকা আমি রাখতে পারব না।

টাকা দেওয়া হলো না।

অনীতা ফিরে এলো।

হাসপাতালে যখন ফিরে এলো কানু হাঁটতে হাঁটতে রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা।

ভিজিটিং আওয়ার অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাকে হাসপাতালের লোকেরা ভিতরে ঢুকতে দিল না।

ওয়ার্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কানু।

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আলো জ্বলছে।

সারাটা হাসপাতাল ক্রমে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘুমের কোলে ঢুলে পড়েছে যেন। মধ্যে মধ্যে একটা আধটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে যাচ্ছে হাসপাতালের গেট দিয়ে।

আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

চোরের মত পা টিপে টিপে কানু ওয়ার্ডের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

সারি সারি সব বেডে রোগীরা ঘুমিয়ে।

এক কোণে দুজন নার্স কি সব লিখছে বসে টেবিলে।

কানু গিয়ে কৌশিকের বেডের পাশে দাঁড়াল।

নাকে নল পরানো।

চোখ বোজা কৌশিকের।

বিড় বিড় করে এক সময় বলে কৌশিক কানু কানু—

দাদা—এই যে আমি।

ঘুমের মধ্যেই যে কানু কানু বলে ডাকছে কৌশিক তা বুঝতে পারে না কানু।

হঠাৎ ঐ সময় একজন নার্সের নজর পড়ে কানুর 'পরে তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে আসে।

এই—কে—কে তুই।

আমি—আমি কানু।

এখানে এত রাত্রে কি করছিস?

আমার দাদা—

দাদা—

হ্যাঁ—কেমন আছে আমার দাদা সিস্টার?

কে তোর দাদা?

ঐ যে—কানু হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় কৌশিককে।

কানুর—মুখের দিকে তাকিয়ে নার্সের কেমন যেন মায়া হয়।

ভাল হয়ে যাবে—ভাবছিস কেন—যা এখন বাড়ি যা।

আমি থাকি না দাদার কাছে—একটুও আপনাদের আমি বিরক্ত করব না সিস্টার।

না, না—হাসপাতালের নিয়ম নেই—তাছাড়া মেডিক্যাল অফিসার দেখলে ভীষণ রাগ করবে।

কেন—রাগ করবে কেন? ও ত আমার দাদা। আমাকে থাকতে দিন সিস্টার—আপনার দুটি পায়ে পড়ি।

এতক্ষণে দ্বিতীয় নার্সও সেখানে এসে গিয়েছে।

সে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি রে চন্দ্রা?

প্রথম নার্স চন্দ্রা তখন ব্যাপারটা খুলে বলে, বলছে ঐ ১৩নং বেডের পেসেন্ট ওর ভাই রাতটা ও এখানে থাকবে।

দ্বিতীয় নার্সটি একটু বয়স্কা। দয়ামায়া একটু বেশী।

বলে, আচ্ছা থাক না।

কিন্তু ডাক্তারবাবু দেখলে যদি রাগ করেন মায়াদি।

তাড়াতাড়ি কানু বলে, রাগ করলে আমি চলে যাবো।

চন্দ্রা তখন বলে, ঠিক আছে থাক—কিন্তু সারারাত থাকবি কি করে?

ঐ টুলটায় বসে থাকব।

ওরা আর কিছু বললে না। চলে গেল।

কানু টুলটা টেনে নিয়ে কৌশিকের বেডের শিয়রের ধারে বসল।

ঘন্টাখানেক বাদে নার্স এলো টেমপারেচার নিয়ে একটা ইনজেকশন দিতে।

ইনজেকশন দেবার পর কানু জিজ্ঞাসা করে, দাদা ভাল হয়ে যাবে ত, সিস্টার?

হ্যাঁ হ্যাঁ—ভাল হয়ে যাবে বৈকি—নার্স সান্ত্বনা দেয়।

সত্যি সত্যিই শেষ রাতের দিক থেকে জ্বর কমতে লাগল কৌশিকের। এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ফিরে আসে কৌশিকের।

কানু—কানু।

দাদা এই যে আমি।

কানু—কৌশিকের তখনও চোখ বোজা।

চোখ খোলে না—জড়িয়ে জড়িয়ে কেবল বলে, কষ্ট—বড় কষ্ট।

ভাল হয়ে যাবে তুমি দাদা—ভাল হয়ে যাবে—কানু বার বার বলতে থাকে।

সিস্টার চন্দ্রা বলে, এবারে তুমি বাড়ি যাও—আবার বিকেলে এসো—কেমন?

আপনি দেখবেন ত দাদাকে?

নিশ্চয়ই দেখব বৈকি।

কানু হোটেলে ফিরে এলো।

পালমশাইয়ের তখনও ঘুম ভাঙেনি। গোবিন্দ উঠেছে—বসে বসে এক কাপ চা নিয়ে গান করছিল ও একটা বিড়ি ধরিয়ে মধ্যে মধ্যে টানছিল।

কানু, সারাটা রাত কোথায় ছিলি রে? গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করে।

হাসপাতালে।

তোর দাদা কেমন আছে?

একটু একটু জ্ঞান হচ্ছে গোবিন্দদা—কথা বলেছে।

দেখ কানু কাল থেকে একটা কথা ভাবছিলাম।

কি গোবিন্দদা?

বালীগঞ্জে পূর্ণ দাশ রোডে এক জাগ্রত কালী আছে—শুনেছি তার কাছে যা মানত করা যায় তাই পাওয়া যায়—যা না একবার তার কাছে মানত করে আয় না।

সে রাস্তা ত আমি চিনি না গোবিন্দদা।

ট্রামে বা বাসে বালীগঞ্জ চলে যা—সেখানে লেকের কাছেই পূর্ণ দাশ রোড—ও যাকে জিজ্ঞাসা করবি বলে দেবে।

আমি তাহলে এখুনি চলে যাই গোবিন্দদা।

সারাটা রাত ত মনে হচ্ছে মুখে কিছু দিসনি—আগে কিছু খেয়ে নে তারপর যা।

গোবিন্দদা।

কি রে?

পালমশাই আমার খোঁজ করেননি?

করেছিল—বলেছি পেট খারাপ হয়েছে তাই হাসপাতালে ঔষধ আনতে গেছিস—ঔষধ খেয়ে শুয়ে আছিস। ভয় নেই—আমি যতক্ষণ আছি তোর কোন ভয় নেই—ও আমি ম্যানেজ করে নেবো।

কিছু মুখে দিয়ে কানু সেই জাগ্রত কালীর ফুল আনতে চলে গেল।

অস্নাত অভুক্ত—ঘুরে ঘুরে বেলা দুটোর পর কালী বাড়ির ঠিকানা পেল।

মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে বলতে লাগলো, মা আমার দাদাকে ভাল করে দাও। তোমার পায়ে পড়ি মা। তারপর এক সময় পুজো দিয়ে ফুল নিয়ে সোজা চলে এলো কানু হাসপাতালে—পাঁচটা নাগাদ।

এসে দেখে কৌশিকের জ্ঞান বেশ ভালভাবেই ফিরেছে—জ্বরও কমেছে কিন্তু খুব দুর্বল।

কানুকে দেখে কৌশিক ডাকে, কানু—এতক্ষণে এলি—কখন থেকে তোর আসার পথ চেয়ে আছি।।

দাঁড়াও আগে মা কালীর ফুল মাথায় ছুঁইয়ে দিই।

কানু ফুল ছুঁইয়ে দিয়ে বলে, আর ভয় নেই, তুমি ভাল হয়ে যাবে দাদা।

কৌশিক কোন জবাব দেয় না। চেয়ে আছে তখন ও কানুর মুখের দিকে।

কানু বলে, জান দাদা—খুব জাগ্রত কালী—ঐ কালীর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।

কানু, কানে আমি এত কম শুনছি কেন?

কম শুনছো!

শুনতে পায় না কৌশিক কানুর কথাটা—আপন মনেই আবার বলে, কানে কি হলো আমার শুনতে পাচ্ছি না কেন?

পাবে দাদা, আবার শুনতে পাবে। কানু আশ্বাস দেয়।

চোখ মুখ বসে গিয়েছে—মুখটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে—খুব ভাবনা হয়েছিল না রে কানু—দাদা বুঝি মরেই গেল।

দাদা। বেশ এবারে একটু জোরেই ডাকে কানু।

কানু।

সেদিন শিয়ালদার বাজার থেকে খুব ভাল কমলালেবু এনেছিলাম—খাবে—দেবো?

কৌশিক বোধ হয় শুনতে পায় না, ওর কথার কোন জবাব দেয় না।

পাশের আলমারিটার মধ্যে ফলের ঠোঙাটা ছিল, কানু সেটা বের করে তা থেকে একটা লেবু নিয়ে খুলে খুলে দেয়।

কমলা খেতে খেতে এক সময় কৌশিক আবার ডাকে, কানু।

দাদা।

তুই একটা খুব অন্যায় করেছিস। কৌশিক বলে।

অন্যায়—কি অন্যায় করেছি দাদা—ভয়ে ভয়ে কানু কৌশিকের মুখের দিকে তাকায়।

অনীতার ওখানে তুই গিয়েছিলি নিশ্চয়?

কানু মাথাটা নীচু করে—কোন জবাব দেয় না।

বুঝতে পেরেছি—তুই-ই গিয়ে খবর দিয়েছিস—আমার অসুখ—আমি হাসপাতালে আছি তাই না?

কানু একেবারে কৌশিকের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে কথা বলে।

হ্যাঁ দাদা।

তখুনি বুঝেছিলাম নচেৎ অনীতা জানল কি করে—কিন্তু তুই খুব অন্যায় করেছিস ওখানে গিয়ে।

আর কখনো যাবো না দাদা।

হ্যাঁ—যাস না।

দাদা—

কি রে?

দিদি এসেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কখন?

সকালে।

দিদি খুব ভাল তাই না দাদা?

হ্যাঁ রে খুব ভাল।

একটু হেসে কৌশিক জিজ্ঞাসা করে।

আজ কি বার রে কানু?

মঙ্গলবার।

তবে বাইশ তারিখ—ছাব্বিশ তারিখে তোর রেডিওতে গান মনে আছে?

সাতটা পনেরয় প্রোগ্রাম—আমরা ছটায় বের হয়ে পড়বো, কি বলিস?

হ্যাঁ।

কালই এখান থেকে চলে যাবো—আমাকে এসে নিয়ে যাস—কেমন?

সিস্টার ঐ সময় গ্লাসে করে ঔষধ নিয়ে আসে কৌশিককে খাওয়াতে।

কানু সিস্টারকে জিজ্ঞাসা করে, সিস্টার, কাল দাদাকে নিয়ে যেতে পারব হাসপাতাল থেকে?

না, না কি বলছো পাগলের মত—এখনো তোমার দাদার ভাল করে সুস্থ হতে অনেক দিন লাগবে।

সিস্টার চলে গেল।

কানু বলে, তুমি কিছু ভেবো না দাদা—গান দুটো আমি একটুও ভুলিনি—তোমায় যেতে হবে না—আমি একাই গিয়ে ঠিক গেয়ে আসবো।

কিন্তু তোর সঙ্গে কে বেহালা বাজাবে?

রেডিওতে কেউ বেহালা বাজানো জানে না?

তা জানে কিন্তু ব্যবস্থা আগে থাকতে না হলে—তাছাড়া তুই প্রথম দিন গাইবি।

বেহালার সঙ্গে নাই বা গাইলাম—তোমারই গান তোমারই সুর ত।

তা হয় না রে কানু তা হয় না।

কানু কৌশিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিস্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দিদিমণি

কি রে?

আমার দাদা কানে কম শুনছে কেন?

সিস্টার বলে, ভাল হয়ে যাবে।

সত্যিই ভাল হয়ে যাবে ত?

হ্যাঁ।

কানু চলে যায়।

॥ ১৯ ॥

ডাক্তার প্রতুল চক্রবর্তী ব্যারিস্টার অচিন্ত্য ব্যানার্জীর দীর্ঘ দিনের বন্ধু।

কলকাতায় এলে প্রতুল চক্রবর্তী বরাবরই অচিন্ত্য ব্যানার্জীর উড্ স্ট্রীটের বাড়িতেই ওঠেন।

এবারে প্রায় এগার মাস বাদে কলকাতায় এসেছেন ডাঃ প্রতুল চক্রবর্তী।

সন্ধ্যার দিকে দুই বন্ধুতে বসে গল্প করছিলেন।

কথায় কথায় ডাঃ চক্রবর্তীর নিরুদ্দিষ্ট একমাত্র পুত্রের কথা এসে পড়ে—সেই আলোচনাই হতে থাকে।

আর তার কোন খোঁজ পেলে না? অচিন্ত্য ব্যানার্জী এক সময় শুধান।

না—বিয়ে করে শীলাকে নিয়ে যেদিন সন্ধ্যায় ফিরে এলাম তার আগের রাত্রেই ছেলেটা যে কোথায় চলে গেল—তারপর কত খুঁজলাম—কাগজে কাগজে কত বিজ্ঞাপন দিলাম—মোটা রিওয়ার্ড ঘোষণা করলাম কিন্তু আজো কোন সন্ধান পেলাম না তার।

আমার কি মনে হয় জান প্রতুল?

কি?

তোমার দ্বিতীয়বার বিয়ের ব্যাপারটাই হয়ত—

আমারও পরে ভেবে মনে হয়েছে তোমার কথাই ঠিক, ছেলেটা ওর মাকে এত ভালবাসত

কথাটা বলতে বলতে প্রতুল চক্রবর্তী সামনে একটা বেতার জগতের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, হঠাৎ বেতার জগতের পাতায় প্রকাশিত একটা ফটোর প্রতি নজর পড়ায় হঠাৎ যেন প্রতুল চক্রবর্তী চমকে ওঠেন।

একি—এ কার ফটো!

কি—কি হলো?

দেখ—দেখ অচিন্ত্য—ঠিক আমার ছেলের ফটো বলে মনে হচ্ছে!

দেখি দেখি—অচিন্ত্য ব্যানার্জী বেতার জগৎটা টেনে নেন।

ফটোর নীচে লেখা আছে—শ্রীমান প্রবাল—এগার বছর। প্রাক্ সন্ধ্যা সাতটা পনেরয়।

অচিন্ত্য ব্যানার্জী বলেন, কিন্তু এর নাম দেখছি প্রবাল।

কিন্তু আশ্চর্য—আশ্চর্য similarity অদ্ভুত resemblance—ভাল কথা আজই ত ব্রডকাস্ট—শনিবার, তাই না?

হ্যাঁ।

চল না একবার অল-ইনডিয়া রেডিওটা ঘুরে আসি।

বেশ ত চল।

দুই বন্ধু উঠে দাঁড়াল।

কৌশিক যাই বলুক কানু রেডিওর প্রোগ্রামের দিন আদৌ যায়নি হাসপাতালে। কৌশিক অসুস্থ এখনো রীতিমত সে আসতে পারবে না—তার আসাও উচিত হবে না। তাই সে একাই চলে যায় রেডিও স্টেশনে।

কানু রেডিও অফিসে ঢুকতে যাবে একা একা হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শোনে।

কানু?

কে! ফিরে তাকায় কানু, একি দাদা!

হাতে বেহালার বাক্সটা নিয়ে সত্যিই পিছনে দাঁড়িয়ে কৌশিক।

একি! কেন দাদা তুমি হাসপাতাল থেকে চলে এলে?

সে কথার জবাব না দিয়ে কৌশিক বলে যেন আপন মনেই, প্রথম দিন গাইবি আর আমি বাজাবো না তাই কি হয়—চল।

কিন্তু দাদা তুমি যে কাঁপছো।

সত্যিই দুর্বলতায় কাঁপছিল কৌশিক তখন। কানু এসে কৌশিককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

চল ভিতরে যাই।

কানু তথাপি কিন্তু কৌশিককে ছেড়ে দেয় না—কৌশিকের হাত থেকে বেহালার বাক্সটা নিয়ে ধীরে ধীরে দুজনে লম্বা করিডর দিয়ে এগিয়ে যায় স্টুডিওর দিকে। তখন ঘড়িতে সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট।

প্রোগ্রাম সাতটা পনেরয়—সন্ধ্যা।

দুজনে নির্দিষ্ট স্টুডিওর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

বেহালাটা বাক্স থেকে বের করে সুর বেঁধে নেয় কৌশিক—কিন্তু হাত দুটো এত দুর্বল যে কাঁপছে।

কলকাতা শহর ছাড়িয়ে গাড়িটা ছুটছিল।

পীযুষ গাড়ি ড্রাইভ করছিল—পাশে বসে অনীতা।

কালই আমি পাটনায় ফিরে যাচ্ছি অনীতা—পীযূষ আড়চোখে ষ্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে অনীতার দিকে তাকিয়ে বলে।

অনীতা কোন জবাব দেয় না।

তার দু' চোখের উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টি সামনের সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রসারিত।

পীযূষ আবার বলে, ভেবেছিলাম যাবার আগে তোমার কাছ থেকে একটা জবাব পাবো।

অনীতা তথাপি চুপ। কোন কথা বলে না।

পীযূষ গাড়ি আবার শহরের দিকে ঘোরাল।

আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অনীতা?

কি?

সেদিনকার সেই ছোট ছেলেটি—

কে?

সেই যে সেদিন তোমার বাবা যাকে বাড়ি থেকে—

কানু!

ওকে তুমি অনেকদিন থেকে চেনো, তাই না?

না।

তবে?

একদিনের মাত্র আলাপ।

আর কৌশিক?

কৌশিক!

অনীতা চুপ করে থাকে।

কৌশিক কে? পীযূষ আবার প্রশ্ন করে।

অনীতা অন্যমনস্কভাবে গাড়ির ড্যাস্‌বোর্ডে ফিট্ করা রেডিওর চাবিটা ঘোরাতে থাকে—হঠাৎ শোনা যায়।

আকাশবাণী কলকাতা—এবারে আপনাদের গান গেয়ে শোনাচ্ছে শ্রীমান প্রবাল—কথা সুর ও পরিচালনা শ্রীকৌশিক রায়।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে যেন অনীতা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বাজনা বেজে ওঠে—শুধুমাত্র বেহালা।

সেই—সেই সুর সেই গান—কানু—কানু—গাইছে।

কানু!

আশ্চর্য হয়ে শুধায় পীযূষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই ছেলেটি যাকে ড্যাডি সেদিন বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।

সেই ছেলেটি রেডিওতে গায়?

পীযূষের কথা শেষ হলো না, গান শুরু হয়ে যায়।

কৌশিক বাজাচ্ছে—কানু গাইছে স্টুডিওর মধ্যে।

কৌশিক যেন মাতাল হয়ে উঠেছে।

মাথাটার মধ্যে ঝিমঝিম করছে—হাত দুটো যেন অবশ হয়ে আসতে চায়।

কিন্তু থামলে চলবে না।

কানু গাইছে—তাকে বাজাতেই হবে।

গান শেষ হয় একসময়।

দুজনে কোনমতে বের হয়ে আসে স্টুডিও থেকে। কাউন্টার থেকে টাকা নেয়।

কৌশিক তখন টলছে।

আবার বোধহয় জ্বর এলো।

চোখ মুখ জ্বালা করছে নচেৎ কেন—

বাইরে এসে একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল—কানু কৌশিককে ধরে ট্যাক্সীতে ওঠে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে, দাদা, হাসপাতালে যাবো তা?

না না—আমাদের নতুন বাসায় চল ভাই—মির্জাপুর স্ট্রীটে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার কৌশিকের নির্দেশে মির্জাপুর স্ট্রীটের দিকেই গাড়ি ছোটায়।

নতুন বাসায় পৌঁছে কোনমতে ট্যাক্সী থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দেয় ওরা—তালা খুলে ঘরের মধ্যে ঢোকে।

ঘরটা অন্ধকার।

বাল্‌ব লাগানো নেই। কৌশিক ভেবেছিল বাল্‌ব কিনে আনবে, পরের দিন তা আর ঘটে ওঠেনি।

কোনমতে কৌশিককে অন্ধকার ঘরে খাটের উপর বসিয়ে রেখে রাতের মত একটা মোমবাতি কিনে আনবার জন্য কানু ছুটে যায়।

অচিন্ত্য ব্যানার্জী ও প্রতুল চক্রবর্তী রেডিও স্টেশনে এসে যখন পৌঁছালেন কানুদের প্রোগ্রাম তখন শেষ হয়ে গিয়েছে—তারা তখন চলে গিয়েছে।

প্রতুল চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেন, তাদের ঠিকানাটা বলতে পারেন?

কৌশিক তার নতুন বাসার ঠিকানা দেয়নি, দিয়েছিল তার পুরাতন বাসার ঠিকানা।

সেই ঠিকানা নিয়েই দুজনে আবার ছোটেন।

অনীতাও পীযুষকে নিয়ে ছুটে যায় রেডিও স্টেশনে কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা যখন পৌঁছায় তার একটু আগেই কৌশিক ও কানু চলে গিয়েছে প্রোগ্রাম শেষ করে।

অনীতা একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল—কৌশিককে সে দুদিন আগেও দেখে এসেছে হাসপাতালে রীতিমত অসুস্থ—এবং ইচ্ছা থাকলেও চেষ্টা করেও সে আর হাসপাতালে কৌশিককে দেখতে যেতে পারেনি।

কিন্তু কৌশিকের বাজনা শুনে মনটা তার অস্থির হয়ে ওঠে—পীযুষকে অনুরোধ করে কৌশিকের বাসার রাস্তার দিকে গাড়ি চালাতে।

পীযুষ শুধায়, ওদিকে কেন?

কৌশিক হাসপাতালে আছে নিশ্চয়ই সেখানে চল।

পীযুষ আর কোন কথা বলে না, অনীতার নির্দেশ মত গাড়ি চালায়।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে বাসায় তালা বন্ধ।

পাশের একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে, কৌশিক কয়েকদিন হলো হাসপাতালে আছে।

অনীতা পীযুষকে এবার হাসপাতালের দিকে গাড়ি চালাতে বলে।

ওদিকে অচিন্ত্য ব্যানার্জী বন্ধু প্রতুল চক্রবর্তীকে নিয়ে রেডিও স্টেশন থেকে কৌশিকের বাসার ঠিকানা নিয়ে অনীতারা ওখান থেকে চলে যাবার একটু পরেই এসে হাজির হয়।

এবং তারাও জানতে পারে কৌশিক হাসপাতালে আছে কয়দিন থেকে—ওরা তখন আবার হাসপাতালের দিকে ছোটে।

হাসপাতালে এসে অনীতা শোনে ঐ দিনই বিকেলের দিকে কৌশিক কাউকে কিছু না জানিয়ে হাসপাতাল থেকে ডেজার্টার হয়েছে।

ওদিকে অনীতা ও পীযুষ একটু আগেই হাসপাতালে এসে কৌশিক হাসপাতাল থেকে কিছু না বলে চলে গেছে শুনে অনীতা হাসপাতাল থেকে ফিরে ওদের পাশের বাসায় গিয়ে শোনে সে বাসা কৌশিক ছেড়ে দিয়েছে। তখন অনীতা কি ভেবে পীযুষকে বলে বিমলের মেসে যেতে।

বিমল নিশ্চয়ই জানে কৌশিক কোথায়।

বিমল তখন মেসে ছিল না—মেস থেকেই ব্লু এঞ্জেলের কথা জানতে পারল অনীতা।

ছুটলো আবার তারা তখন হোটেল ব্লু এঞ্জেলে।

সেখানেই বিমলের দেখা পেল অনীতা।

বিমল ডায়াসে বাজাচ্ছিল।

পীযূষ ম্যানেজারকে বললে সে একবার বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ম্যানেজার তার ঘরে বিমলকে ডেকে পাঠাল ডায়াস থেকে।

ঘরে ঢুকে বিমল অনীতাকে দেখে বিস্মিত হয়, অনীতা দেবী—আপনি—কি ব্যাপার?

কৌশিক কোথায় জানেন বিমলবাবু?

জানি কিন্তু—

কোথায় সে?

সে ত খুব অসুস্থ—হাসপাতালে—কেন, কানু আপনার কাছে যায়নি?

কানু—হ্যাঁ।

কৌশিকের কিছু ঔষধের দরকার ছিল, কানু আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছিল কিন্তু আমার কাছে সে সময় অত টাকা ছিল না তাই কানু আপনার ঠিকানা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যায়—বিমল বলে।

সে হাসপাতালে নেই—অনীতা বলে।

হাসপাতালে নেই—তবে কোথায়?

আজ রেডিওতে তাদের প্রোগ্রাম ছিল।

কি বলছেন আপনি?

হ্যাঁ হ্যাঁ—কানু গেয়েছে— কৌশিক বাজিয়েছে।

সত্যি বলছেন!

হ্যাঁ।

তবে বোধহয় সে নতুন বাসায় গেছে।

নতুন বাসায়?

হ্যাঁ।

বিমল কৌশিকের মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসার ঠিকানাটা বলে দিল।

অনীতা আর দেরি না করে পীযূষকে নিয়ে তখনি বের হয়ে পড়ে হোটেল থেকে।

॥ ২০ ॥

কানু দৌড়ে গিয়ে পানের দোকান থেকে একটা ক্যাণ্ডল ও ম্যাচ কিনে নিয়ে এলো।

ঘর অন্ধকার। কৌশিকের বাজনা শোনা যায়। কৌশিক বেহালা বাজাচ্ছে।

দাদা, বাতি নিয়ে এসেছি— মোমবাতি দিয়ে আজকের রাতটা আমরা কাটিয়ে দিই, কাল একটা বাল্ব এনে লাগিয়ে নিলেই হবে।

কৌশিক খাটের উপর বসে বেহালা বাজিয়ে চলেছে আপন মনে—সে কোন সাড়া দেয় না।

কানু দেয়াশলাই জ্বেলে বাতিটা ধরাল।

মোমবাতির নরম আলোয় ঘরের অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

দাদা।

কৌশিকের কোন সাড়া নেই, সে আপন মনে বাজিয়েই চলেছে।

প্রজ্বলিত মোমবাতিটা খাটের উপর বসিয়ে দিল কানু।

দাদা।

বেহালাটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে কৌশিক আপন মনে বেহালা বাজিয়ে চলেছে—কোন সাড়া দেয় না।

দাদা—চীৎকার করে ডাকে কানু।

ফিরেও তাকায় না কৌশিক কানুর দিকে।

দাদা—আবার চীৎকার করে ডাকে কানু। কৌশিক বাজাচ্ছেত বাজাচ্ছেই।

দাদা—আরো জোরে চীৎকার করে ডাকে কানু।

কৌশিক বাজিয়েই চলেছে। একটি শব্দও তার কানে ঢুকছে না।

সে একেবারে বধীর হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ এক সময় কানুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে কৌশিক, কানু—সেই গানটা গা আমি বাজাই—

আর বোস এখানে তুই।

কানু এতক্ষণে বুঝতে পারে কৌশিক কিছু শুনতে পাচ্ছে না—সে দুহাতে কৌশিককে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে, দাদা।

সামনের শনিবারই আবার তোর রেডিও প্রোগ্রাম আছে মনে আছে ত—কটা দিনই বা সময়—কৌশিক বলে।

কৌশিক শুনতে পাচ্ছেনা আর কিছু, বুঝতে পারে কানু, ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ডাকে, দাদা—দাদা—তুমি কি কিছুই শুনতে পাচ্ছো না?

কানুর কথা শুনতে না পেলেও কানু যে কাঁদছে সেটা দেখতে পেয়ে কানুকে দু'হাতে জড়িয়ে পরম স্নেহে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, কাঁদছিস কেন, আমার কিছু হয়নি। কোন কষ্ট হচ্ছে না এখন আর—আমি বাজাই তুই গানটা গা।

হাত বাড়িয়ে কৌশিক বেহালাটা তুলে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে যাই বলুক কৌশিক, তার যেন আবার জ্বর এসে গিয়েছে।

কাঁপতে কাঁপতে কোনমতে বেহালাটা তুলে নেয় কৌশিক—কানুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে নে গা গানটা, ভাল করে প্র্যাকটিস্ করা দরকার—আমি বাজাই তুই গা।

কানুর এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে কৌশিকের গাটা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

সে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু দাদা, তোমার যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—তোমার জ্বর—

কৌশিকের সে কথা কানেই যায় না, সে বুঝতেও পারে না কানু কি বলছে তাকে।

কোন মতে কাঁধের 'পরে বেহালাটা রেখে থুতনী দিয়ে চেপে ধরে বেহালার তারে ছড় টানে।

সুর জাগে বেহালায়।

নে ধর—গান গা—কানুর দিকে চেয়ে বলে।

কৌশিক বাজিয়ে চলে—কানু গাইছে কি গাইছে না সে তা বুঝতে পারে না।

বাজিয়েই যায়।

কিন্তু কানু গাইতে পারে না।

তার গলা দিয়ে স্বর বের হয় না, চেষ্টা করেও গাইতে পারে না।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, পারছি না—পারছি না দাদা—আমি পারছি না।

কৌশিক বাজিয়েই চলেছে—সেত শুনতেই পাচ্ছে না কানুর কথা।

হঠাৎ বুঝি একসময় কানুর মুখের দিকে তাকিয়ে খেয়াল হয় কানু কাঁদছে—গাইছে ও না।

গা—গা কানু গা—গাইছিস না কেন?

কানু কাঁদছে তবু।

হঠাৎ কৌশিকের কি হলো ঠাস করে কানুর গালে এক চড় বসিয়ে দেয়। এত করে বলছি গাইতে তবু গাইবি না—গা শিগ্‌গিরী।

চড় খেয়ে কানু যেন হঠাৎ থতমত খেয়ে যায়।

ভেজা জল ভরা চোখে কয়েকটা মুহূর্ত কৌশিকের মুখের দিকে কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর গান ধরে—মৃদু গলায়—ঠোঁটটা তার কাঁপতে থাকে। চোখে জল।

কৌশিক বেহালাটা তুলে নেয় আবার।

আবার তারে ছড় টানে।

ইতিমধ্যে ওরা জানতেও পারে না কখন একটা গাড়ি এসে ওদের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে।

পীযূষ আর অনীতা গাড়ি থেকে নেমে ঘরে এসে ঢুকেছে।

গাড়ি থেকে নামতেই বেহালার সুর ও গান ওদের কানে গিয়েছিল।

ঘরে ঢুকে দেখে অনীতা কানু গাইছে আর পাগলের মতই যেন বাজিয়ে চলেছে কৌশিক বেহালা কোন দিকে না তাকিয়ে।

কানুই ওদের দেখতে পায়—এবং অনীতাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে অনীতাকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, দিদি—দিদি তুমি এসেছো। দাদা—দাদা কানে একদম কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

কৌশিকের নজরই পড়ে না ওদের দিকে, সে বাজিয়েই চলেছে।

চোখে মুখে কৌশিকের আলো পড়েছে—মুখটা তার লাল হয়ে উঠেছে। রুক্ষ চুলগুলো কপালের

উপরে এসে পড়েছে।

বাজনা ক্রমশঃই চড়া হচ্ছে উঁচু থেকে উঁচু পর্দায় উঠে চলেছে।

চীৎকার করে ডাকে অনীতা, কৌশিক—কৌশিক।

কানুও ডাকে চীৎকার করে, দাদা—দাদা।

কৌশিক কি পাগল হয়ে গেল—অমন করে বাজাচ্ছে কেন।

দ্রুত—আরো দ্রুত।

চীৎকার করে ওঠে কানু আবার, দাদা—দাদা।

দুহাতে জড়িয়ে ধরে কানু কৌশিককে, দাদা—দাদা।

কৌশিক টলছে তখন—বাজাতে বাজাতেই।

হঠাৎ সে টলে পড়ে গেল—হাত থেকে বেহালাটা ছিট্‌কে পড়লো।

পীযুষ ছুটে গিয়ে কৌশিককে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে।

শুইয়ে দেয় কৌশিককে শয্যার উপরে।

কানু ছুটে গিয়ে কৌশিকের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, দাদা—দাদা গো।

অচিন্ত্য ব্যানার্জী ও প্রতুল চক্রবর্তী এসে ঘরে ঢুকলেন।

কানু তখন কৌশিককে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাজাও দাদা বাজাও। আমি গাইছি—আমি গাইছি।

কিন্তু কৌশিকের আর সাড়া পাওয়া যায় না।

কানু তখনো বলছে—দেখো দাদা দেখো—শোন আমি গাইছি—আর তোমার অবাধ্য হবো না দাদা—আর অবাধ্য হবো না।

কানু গান গেয়ে ওঠে।

হঠাৎ বেহালার তারটা ছিঁড়ে গেল একটা শব্দ করে।

বৃহন্নলা

সামনের দিকে পাহাড়ী রাস্তাটা যত দূরে ড্রাইভিং সীটে বসে চোখে পড়ছে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে এবং ক্রমশঃ চড়াই উপরের দিকে চলে গিয়েছে—কুণাল জানে আবার কিছুদূর পরেই হয়ত উৎরাই ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে সামনের রাস্তাটা।

আগাগোড়াই পাহাড়ের গা দিয়ে দিয়ে যে কালো একটা সরীসৃপের মত কংক্রিটের রাস্তাটা চলে গিয়েছে আগে—আরো আগে কখনো চড়াই কখনো উৎরাই তার।

রাস্তার ডান দিকে নিরেট পাথরের দেওয়াল গড়ে তুলেছে পাহাড়ের পর পাহাড়—আর বাঁয়ে ঢালু খাদ, নীচে অনেক নীচে, তার গায়ে গায়ে জঙ্গল, গাছপালা ধূসর ঝাপসা ঝাপসা।

তারই মধ্যে পথে আসতে আসতে কুণালের নজরে পড়েছে, ছোট ছোট পাহাড়ী আদিবাসীদের ঝোপড়ি—চালা ঘর। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিল—গাড়ির অবশিষ্ট টিনে যেটুকু পেট্রোল ছিল, ট্যাংকটায় ভর্তি করেছিল। দূর থেকে স্পষ্ট নজরে পড়ে না একটা খাদের মত।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গাড়িতে চট্ করে খাদটা কারো নজরে পড়বারও কথা নয়।

প্রায় পৌনে ছয়টা নাগাদ যখন ঐ রাস্তায় গাড়ি চলাচল খুব কম—ও গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল।

প্রায় সত্তর আশি মাইল চলে এসেছে—কেবল একটা মাল বোঝাই ট্রাক তাকে পাশ কাটিয়ে উল্টো মুখে ও যেতে দেখেছে।

পশ্চাতে এখন পর্যন্ত একটা গাড়িও চোখে পড়েনি।

গাড়ির ড্যাস্ বোর্ডে গাড়ির পেট্রোল মিটারের কাঁটাটা শো করছে প্রায় শূন্যের—জিরোর দিকে। কুণাল বুঝতে পারে গাড়ির ট্যাংকে অবশিষ্ট যে পেট্রোলটুকু আছে—তাতে করে সামনের দিকে আর বেশি এখনো যাবে না।

কাজেই এবারে থামতে হবেই তাকে।

এবং গাড়িটারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বাইরের আলো প্রায় নিভে এলো, ধীরে ধীরে অন্ধকার নামবে এবার।

রাত্রে অবিশ্যি চাঁদ উঠবে—কিন্তু মধ্যরাত্রির পর।

দূর আকাশের প্রান্তের দিকে তাকাল কুণাল, অনেকক্ষণ আগেই সেখানে একটু একটু করে মেঘ জমতে দেখেছিল ও—এখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ ওর নজরে পড়লো সেই কালো মেঘের মধ্যে ক্ষণিক একটা চকিত বিদ্যুৎ চমক যেন দেখা গেল।

বৃষ্টি নামবে হয়তো—কিন্তু এখুনি নয়—হয়তো আরো কিছু পরে।

রাস্তার ঠিক একটা উৎরাইয়ের মুখে ব্রেক দিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাল কুণাল—সেকেণ্ড গিয়ারটা টেনে দিল! চাবিটা ড্যাস্ বোর্ডের সঙ্গেই ঝুলতে লাগল।

সঙ্গে একটা ছোট এ্যাটচীকেস ছিল—তার মধ্যে একটা পায়জামা, একটা সার্ট, একটা গেঞ্জী, একটা ছোট টাওয়েল—আর টুকি-টাকি কিছু জিনিস তাড়াহুড়ার মধ্যে যা ও এ্যাটাচীকেসে ভরে নিয়েছিল। আর কোমরে একটা চামড়ার বেল্টের সঙ্গে লোডেড্ পিস্তলটা গোঁজা।

অরিন্দমকে ও জিজ্ঞাসা করেছিল, গাড়িটার কি ব্যবস্থা করবো—

অরিন্দম বলেছিল, যেমন ভাল বুঝিস করিস, ডিসিসন ইজ ইওরস্।

হ্যাঁ, এবারে গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে ওকে, তাকাল গাড়িটার দিকে—একেবারে নতুন

গাড়িটা রং বদলানো এখন। কালো রংয়ের উপরে একটা ঘন ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। কালো রংয়ের উপরে ধুলো ততটা চট্ করে বোঝা যায় না।

রাস্তায় একবারও কোথায়ও গাড়িটা বিগড়ায় নি। গাড়ি নিয়ে কোন ঝামেলায় পড়তে হয় নি ওকে।

নিজের বেশভূষার দিকে একবার তাকাল ও। দামী টেরিলিনের ক্রিম রঙের প্যান্ট— গায়ে ঈষৎ নীলাভ রংয়ের স্ট্রাইপ বুসসার্ট। একটু শীত শীত করছে এখন ঠান্ডা পাহাড়ী হাওয়ায়, অক্টোবরের মাঝামাঝি হলেও। প্রস্তুত হয়ে—গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে ব্রেকটা খুলে সুইচ অন করে এ্যাকসিলেটারে সামান্য চাপ দিতেই ইঞ্জিন ঘর্ঘর শব্দ করে ওঠে এবং স্টিয়ারিংটা সামান্য ঘুরিয়ে দিতেই সোজা ঢালু পথে খাদের দিকে গড়িয়ে চলল। দেখতে দেখতে গাড়িটা ঢালু খাদের মধ্যে দ্রুত গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল। অনেক নীচে চলে যাচ্ছে গাড়িটা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে কুণাল।

হঠাৎই দপ করে একটা আগুনের হলকা জেগে ওঠে খাদের ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে। কুণাল বুঝতে পারে আগুন জ্বলে উঠলো গাড়িটায়।

দাউ দাউ করে জ্বলছে গাড়িটা নীচের অন্ধকারে খাদের মধ্যে। আর ঠিক সেই সময় পিছনের দিকে ধূসর অন্ধকার দুটো জ্বলন্ত চোখ যেন, কুণাল বুঝতে পারে হেড লাইট জ্বালিয়ে একটা গাড়ি ঐ দিকেই আসছে।

কুণাল চট্ করে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা বড় বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে।

হেড লাইটের আলো কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসছে। রাস্তার উপরে আলো পড়ছে। চোখে মুখে ঐ সময় কপালের কাছটায় বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ল। ঠান্ডা হাওয়ার একটা ঝাপটা দিল। বৃষ্টি শুরু হল।

কুণাল তখনো গাড়ির আলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

গাড়ির আলোটা ক্রমশঃ কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

বৃষ্টি আর হাওয়া।

গাড়ির নেম প্লেটের নম্বরটা কুণাল বদলায় নি—ইচ্ছা করেই বদলায় নি। শেষ পর্যন্ত যদি নাম্বার প্লেটটা কিছু অক্ষতই থেকে যায়—আগুনের ঝলকানিতে আর পড়াও যাবে না। আর পড়া গেলেও ক্ষতি নেই। এক পক্ষে পড়া গেলেই ভাল। পুলিশ গাড়িটার হদিশ করতে পারবে।

দূরের গাড়ির হেড লাইটটা হঠাৎ সামনে এসে রাস্তার উপরে ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই গাড়িটা থেমে গেল।

নিশ্চয়ই গাড়ির আরোহীর নজরে পড়েছে নীচে খাদের মধ্যে জ্বলন্ত গাড়িটা।

দু'জন লোক নামল গাড়ি থেকে—রাস্তার ধারে এগিয়ে গিয়ে ওরা অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে যেন কি দেখছে। নীচে খাদের দিকে তাকিয়ে। নিশ্চয়ই গাড়িটা দেখছে। খাদের মধ্যে নীচে তার যে গাড়িটা জ্বলছে এখন দাউ দাউ করে।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে এবারে। চেপে বৃষ্টি নামবে মনে হয়, হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমক।

লোক দুটো আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল—এগিয়ে গেল গাড়িটা সামনের দিকে চড়াইয়ের পথে। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, সোঁ সোঁ হাওয়া—

আসবার সময় দেখেছিল কুণাল বাঁ দিক দিয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে—খাদের মধ্যে দিয়ে কুণাল সেই দিকেই টর্চের আলোয় ঢালু সংকীর্ণ পথটা ধরে এগুতে লাগল।

হাতের টর্চের আলো ফেলে কুণাল সন্তর্পণে নামছে ঢালু পথ ধরে—প্রতি পদক্ষেপে পা পিছলাবার সম্ভবনা। দুপাশে ছোট বড় গাছ-গাছালি। তারই মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ একটা—পাকদন্ডী, অসমতল। অনভ্যস্ত পা দুটো মধ্যে মধ্যে টাল সামলাতে হচ্ছে কুণালকে— একবার পা স্লিপ করলে আর রক্ষা নেই।

বৃষ্টিটা বোধহয় জোর আসবে। ফোঁটাগুলো বৃষ্টির বেশ বড় বড়। হাওয়া সেই সঙ্গে এলোমেলো। যে বস্তীটা গাড়ি চালাতে চালাতে চোখে পড়েছিল সেটা কতদূরে কে জানে। কিন্তু যেমন করে হোক

সেখানে তাকে পৌঁছাতেই হবে নচেৎ এই দুর্যোগের রাত্রে মাথাটা সে বাঁচাবে কি করে।

হঠাৎ সেই সময় বৃষ্টি যেন ঝাঁপিয়ে এল।

হাঁটা দুষ্কর ওই ঢালু পথ ধরে—কেবলই পা স্লিপ করছে।

তবু টর্চের আলো ফেলে সন্তর্পণে এগুতে থাকে কুণাল।

হাঁটা প্রায় অসম্ভব। তবু এগুতে হবেই। তারপরই আচমকা অঘটনটা ঘটে গেল—সড়াৎ করে পা পিছলে পড়ে গেল—হাতের টর্চ ও এ্যাটাচীকেস দুটোই ছিটকে পড়ে গেল অন্ধকারে কোথায় কে জানে!

সর-সর করে পিছলে নামছে কুণালের ভেজা সপ্‌সপে দেহটা। ঐ সময় মাথাটা কিসে যেন কেটে গেল।

জ্ঞান হারালো কুণাল সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে।

জ্ঞান যখন ফিরে এলো—

সারা শরীরে বিষের মত ব্যথা। অসাড়—অনড়—টনটন করছে পেশী ও হাড়। অতি কষ্টে চোখ মেলল কুণাল।

বাবুজী!

কুণাল তাকাল।

একটি তরুণীর মুখ তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

কালো কষ্টি পাথরের মত রং। গোল মুখে—বড় বড় দুটো চোখ। সেই চোখের দৃষ্টি তারই মুখে নিবদ্ধ।

বাবুজী।

আমি—

কুছু ভাবিস না বাবুজী—মুরাং সর্দার হামারা বাবা তোকে হামাদের ঝোপড়িতে নিয়ে এসেছে। জংগলের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলি।

মেয়েটার মাথায় এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—মুখের দুপাশে ছোট ছোট সাপের মত নেমেছে ঝক্‌ঝকে এক পাটি দাঁত, ঠোঁটের প্রান্তে একটু যেন হাসি।

কে তুই—

রূপা। হামি রূপা, মংলুর বিটিয়া আছি বাবুজী।

কুণাল উঠে বসার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, সারা দেহে অসহ্য বিষের মত ব্যথা। নড়বার চেষ্টা করতেই টনটন ঝনঝন করে ওঠে।

এতক্ষণে টের পায় মাথায় তার একটি ফেট্টি বাঁধা। হাতে পায়ে কি সব মাখান। কোন বুনো লতা পাতা থেঁতিয়ে তার রস বের করে বোধহয় লাগিয়েছে তার ক্ষত স্থানে।

কুছু খাবি বাবুজী—খুশ লাগল তোর? খুধা পায়নি?

জল—ক্ষীণ কণ্ঠে কেবল বলল কুণাল।

জল। দাঁড়া আনছি। বলে মেয়েটি তড়িৎ পায়ে ঝোপড়ি থেকে বের হয়ে গেল। চেয়ে চেয়ে দেখে মেয়েটাকে শুয়ে শুইয়েই কুণাল। ওর সারা শরীরে যেন একটা নাচের ছন্দ। হঠাৎ, হঠাৎই মনে পড়ে যায় কুণালের একজনকে—মনীষা—

মনীষা— মনীষা আজ কেমন যেন অস্পষ্ট ঝাপসা স্মৃতি।

মনীষা চক্রবর্তী—আজ একটা জিলা শহরের ডি.এম—জিলার হর্তাকর্তা বিধাতা।

সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন কুণালের কেমন কুঁকড়ে আসে। মনটাকে গুটিয়ে নেয় কুণাল। মনে পড়ে যায় মনীষার সেই কথাগুলো।

লেখাপড়ায় ভালো অনেকেই হয় না কুণাল—অনেকেই ফাস্ট সেকেন্ড হয় না। সেটার মধ্যে কোন দৈন্য নেই।

আমাকে তুমি সাহায্য করো মনীষা, কুণাল বলেছিল। তোমাকে যদি পাশে পাই—

আমি তো তোমার পাশেই সর্বদা আছি কুণাল, মনীষা বলেছিল।

না অমন করে থাকা নয়, একান্ত ভাবে আপনার করে একেবারে আমার পাশে পাশে সব সময়ের জন্য।

সে-ভাবে আমাকে পেতে হলে—বলতে বলতে মনীষা একটু বুঝি থেমেছিল।

কি? কি বলো মণি—কথাটা বলে কুণাল মনীষার মুখের দিকে তাকাল।

আজ যা তুমি তাতে হবে না।

মণি—

হ্যাঁ। মনীষা চক্রবর্তী যাকে তার জীবনের পার্টনার বলে গ্রহণ করবে, সে যেন তার পার্টনারের পরিচয় দিতে পারে।

তোমার এ্যামবিশনটা কি? একটা বড় চাকরি, বাড়ি, গাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স। কুণাল জবাবে বলেছিল মনীষাকে সাধারণ ভাবে যা সব ছেলেই ভাবে।

না, ওসব কিছুই আমি চাই না, একজন পুরুষের ওটাই একমাত্র পরিচয় নয় আমার কাছে। তারপরও মনীষা একটু থেমে বলেছিল, কেন, কেন তুমি বুঝতে পার না, কুণাল তোমার ভালবাসার ও ব্যাক্তিত্বের মধ্যে দিয়েই আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই নিজেকে—আমি যেন মাথা উঁচু করে বলতে পারি তুমি আমার স্বামী।

তাহলে আর হলো না। কুণাল বলেছিল কতকটা যেন হতাশার ভঙ্গিতেই।

কেন হবে না, আমাকে কি তুমি ভালবাস না? সেই ভালবাসার মধ্যে দিয়েই তুমি তোমার নিজেকে প্রকাশ করতে পার না? পার না নিজেকে আমার কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে, পার না?

সত্যি কথা বলতে কি সেদিন কুণাল মনীষার একটি কথার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। তা যদি পারতো পরবর্তীকালে মনীষাকে ভুল বোঝার হয়তো কোন অবকাশই হতো না কুণালের। পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে দূরেও চলে যেত না ওরা। সেদিন যেটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে লেখাপড়ায় অত ভাল মেয়ে মনীষা তার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ থাক না কেন, যতই তার সঙ্গে মিশুক না কেন ও মনীষার বিচারে তার যোগ্য নয়, আর তাই দুজানার মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে যে ব্যবধানটাকে ডিঙ্গিয়ে যাবার, অস্বীকার করবার ওদের কারোরই ক্ষমতা নেই।

কোথায়—কোথায় যেন সেই ব্যবধানটা একটা জগদ্দল পাথরের মত দুজনার মাঝখানে আজো যেমন আছে ভবিষ্যতেও তেমনিই থেকে যাবে। কেউ ওরা কারো কাছে যেতে পারবে না।

বস্তুত সেই দিন থেকেই কুণাল মনীষার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনেছিল একটু একটু করে। তার কাছ থেকে দুরে যাওয়াই ভাল। মনীষার কথাটা আর না ভাবাই ভাল, না ভাববারই চেষ্টা করেছে প্রাণপণে কুণাল। যাকে কোন দিনই পাওয়া যাবে না তাকে। তবু কি দেখা হতো না পরস্পরের সঙ্গে। হতো কিন্তু সে দেখা সাক্ষাতের মধ্যে অন্তত কুণাল কোনই আর প্রাণের স্পন্দন যেন কোথায়ও এতটুকু অনুভব করেনি এবং মনীষার কাছ থেকে একদিন দূরে সরে যেতে যেতেই মেয়ে মানুষ জাতটারই কাছ থেকে সে দূরে সরে গিয়েছে। তারপর ক্রমশঃই তার জীবনে একটি মাত্র লক্ষ্যই হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে—টাকা, টাকা। জীবনে তার ঐ সময় এলো অরিন্দম।

অরিন্দম পোদ্দার।

একদিন এক রাত্রে পার্ক স্ট্রটের একটা হোটেলে অরিন্দমের সঙ্গে তার আলাপ আকস্মিক ভাবে। কালো ষন্ডা গুন্ডা মার্কা চেহারা অরিন্দমের, পরিধানে দামী টেবিলিনের সুট—মুখে পাইপ।

হোটেলটায় সেদিন প্রচন্ড ভিড়।

ক্রিসমাস ইভ।

কুণালের একটা টেবিলে সীট রিজার্ভ করা ছিল। সে একা একা বসে ড্রিংক করছিল। সেই সময় ছোটখাটো অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে সে উপার্জনের চেষ্টা করে, কখনো কখনো বেশ মোটা অংকের থোক টাকাও হাতে আসে। রোজগার সব সময় একরকম নয়। কখনো মুঠো ভরে যায় কখনো সামান্য কিছু তলানীর মত হয়তো হাতে আসে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তার তখন নেই বললেই হয়।

বর্ধমানে কদাচিৎ কখনো যায়—যেখানে তার চিররুগ্না মা, বাবা ও আরো একটি বোন থাকে। বোন শ্যামলী স্কুলের টিচার, বাবা পেনসন নিয়ে বাড়িতে বসে। কোন রোজগার পাতিই আর নেই। সংসারটা কোন মতে জোড়াতালি দিয়ে টিকি টিকি করে চলছে শ্যামলীর ইনকামে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেও মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠাতো মাকে। মাও সে টাকা হাত পেতে নিতেন। আর সে-টাকা কুণালের মা সংসারের মধ্যে দিতেন যদিও শ্যামলী সেটা জানত না। জানলে ওর পাঠানো

একটা টাকাও সে নিতে দিত না মাকে তার।

রূপা হাতে একটা গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

গ্লাসে কিন্তু জল নয় গরম মোষের দুধ।

গ্লাসটা হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে কুণাল বলে, এ কি জল কই—এ তো দুধ!

হ্যাঁ বাবুজী, ভৈসকা দুধ খেয়ে লে—শরীরে তাগৎ পাবি। গরম করে লিয়ে এলাম—

এতে কি তেষ্টা মেটে—একটু জল।

রূপা আবার চলে গেল—আনছি জল।

দুপুরের দিকে রূপা থালিতে করে কিছু ভাত ও শাক এবং ডাল নিয়ে এলো।

খাদ্যবস্তু দেখে কুণালের তেমন আর ক্ষুধা থাকে না।

রূপা বলে, লে খেয়ে লে বাবুজী, সাঁঝের বেলা কুঁকড়াব মাংস হবে—এখন এই খেয়ে লে—

ভাত খাবো না—কেমন যেন জ্বর জ্বর লাগছে, কুণাল বললে।

তবে থাক। খাস না এ ভাত—রূপা থালি নিয়ে চলে গেল।

বাইরে ক্রমশঃ রোদ বাড়ছে।

দূরে পাহাড়গুলো কেমন ঝাপসা ঝাপসা অস্পষ্ট লাগে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে দেওদাব ও ফার্নেব ঝোপ।

গাড়িটা অরিন্দমই জোগাড় করেছিল।

কার গাড়ি, কোথা থেকে কেমন করে অরিন্দম পোদ্দার জোগাড় করেছিল গাড়িটা, কুণাল জানে না, অরিন্দমও তাকে বলেনি। তবে অরিন্দম পোদ্দার যে গাড়িটা কারো চুরিই করেছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না কুণালের। সাদা রংয়ের ঝক্‌ঝকে নূতন এ্যামাবাসাডার গাড়িটা। নাম্বার প্লেটটা যে অরিন্দম পোদ্দার বদলে দিয়েছিল সেটাও অনুমান করেছিল কুণাল। রাস্তায় একবারের জন্যও কোন ট্রাবল দেয়নি ওকে।

কিন্তু প্ল্যানটাই একটুর জন্য কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। পূর্ব প্ল্যান মত ছোট এ্যাটাচীকেসটা হাতে, পকেটে লোডেড্ পিস্তলটা নিয়ে কুণাল ব্যাংকের মধ্যে ঢুকেছিল অরিন্দমেরই পূর্ব নির্দেশ মত।

বেলা তখন একটা মত হবে।

ব্যাংকের কাজ কর্ম ঢিলে ঢালা ভাবে চলেছে। বোধহয় টিফিন টাইম বলে। তেমন কিছু একটা ভিড়ও নেই। ক্যাশিয়ার সুখেন্দু চক্রবর্তী ওর পরিচিত—অনেক দিনের পরিচিত—কুণালের একটা ছোট একাউন্টও ঐ ব্যাঙ্কে ছিল। অরিন্দম বোধকরি সেটা জানত না, সে কেবল জানত ক্যাশিয়ার কুণালের পরিচিত।

সুখেন—কাউন্টারের সামনে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল কুণাল।

ডাকটা শুনে টাকার বান্ডিলগুলো গোছাতে গোছাতে সুখেন্দু ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল—কুণালের পিছনেই ঠিক ছিল চারু—ও আর চারু একত্রে ঢুকেছিল প্রস্তুত হয়ে ব্যাংকের মধ্যে। গেটের কাছে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল অরিন্দম।

কি ব্যাপার—কুণাল না?

হ্যাঁ, তোর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। কথাগুলো বলে কাউন্টারের ফোকর দিয়ে সুখেন কিছু বুঝে উঠবার আগেই চট করে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে কুণাল সামনে যতগুলো নোটের বান্ডিল ছিল টেনে নেয় সামনের দিকে।

সুখেন ঘটনার আকস্মিকতায় হঠাৎ যেন কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিল—কেমন যেন বোকা বনে গিয়েছিল মহূর্তের জন্য—পাশেই চারু তখন তার হাতের লোডেড পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরেছে সুখেনকে তাক করে।

অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতে কুণাল একশ টাকার নোটের অনেকগুলো বান্ডিল যতগুলো তাড়াতাড়ি পেরেছে সামনের কাউন্টার থেকে বাইরে বের করে এনেছে এবং এ্যাটাচীকেসটার মধ্যে তাড়াতাড়ি ভরে ফেলেছে।

সুখেন বোবা—

কাউন্টারের বাইরে একজন কর্মচারী টেবিলে বসে অল্প দূরে কাজ করছিল তার দৃষ্টিতে পড়ে ব্যাপারটা—সে চেঁচিয়ে ওঠে, ডাকাত ডাকাত।

সে চিৎকারে আরো কয়েকজন ব্যাংকের কর্মচারী চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। একটা সোরগোল।

সুখেনও চেঁচায় এবারে।

কুণাল ততক্ষণে হাতের এ্যাটাচীকেসটার মধ্যে কিছু বাণ্ডিল ঢুকিয়ে হাতের পিস্তলটা এলো পাথাড়ি ফায়ারিং করতে করতে ব্যাংকের বাইরে চলে যায়। গেটের সামনেই অরিন্দম গাড়ি নিয়ে ছিল—বাইরে আর একজন ওদের দলের অপেক্ষা করছিল—

দরজাটা খুলে কুণাল লাফিয়ে উঠে পড়ে গাড়িতে—অরিন্দমই গাড়িতে উঠে চটপট স্টার্ট দেয়—এ্যাকসিলারেটারে পা দিয়ে বাঁ করে বের হয়ে যায় গাড়ি নিয়ে। সামনের দিকে একটা বাসের পাশ কাটিয়ে ক্ষীপ্র কৌশলে। ওদিকে তখন চারু ধরা পড়ে গিয়েছে চেষ্টা করেও পালাতে পারে নি।

ব্যাংকের দারোয়ান তাকে দুহাতে জাপটে ধরে ফেলেছে।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম, একটু 'লু'র মত গরম হাওয়া বইছে। রাস্তা কিছুটা ফাঁকা, খানিকটা ফাঁকাই থাকে রাস্তাটা এ সময়। দু'একটা ট্যাক্সী প্রাইভেট কার এদিক ওদিক যাতায়াত করছে মধ্যে মধ্যে, দু-একটা প্রায় খালি ট্রামও, অরিন্দম ঝড়ের বেগে সেই জনশূন্যপ্রায় রাস্তা ধরে গাড়ি চালায়। পথে একটা কুকুর চাপা পড়লো, একজন পথচারীকে ধাক্কা দিল, সারকুলার রোড, শ্যামবাজারের চৌমাথা, টালা ব্রীজ, ডান পাশে টালা ট্যাঙ্ক, দু-একটা বাস ও লরী পড়ে—রীতিমত স্পীডেই গাড়ি চালায় অরিন্দম—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। দৃষ্টি তার স্থির সামনের রাস্তায়।

সিঁথির মোড়—তারপরই বাঁ-দিকে ঢুকে বরাহনগরের বাজার—আবার ডাইনে বি. টি রোড, পানিহাটি।

আরো এগিয়ে চট্ করে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন সরু মোটা রাস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে অরিন্দম। ওদিকে পুলিসের একটা জীপ ওদের গাড়িটাকে ফলো করছিল—সেটা তখন অনেক দূরে দৃষ্টির বাইরে।

সরু কাঁচা মাটির রাস্তা—দু'পাশে গাছপালা।

কাঁচা রাস্তায় গাড়িটা লাফাচ্ছে।

তবু স্পীড্ কিন্তু কমায় না অরিন্দম। পুলিসের জীপটাকে ও ভিউ মিরারে দূর থেকে ওদের ফলো করতে দেখেছিল। কাঁচা রাস্তায় প্রায় মাইলখানেক এসে বাঁ-দিকে একটা ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল অরিন্দম।

রাস্তা সেখানে আরো খারাপ, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। বরাবর চলে গিয়েছে রাস্তাটা গঙ্গার ধারে, একটা পড়ো বাগান বাড়ি, ভাঙা গেট, তার মধ্যেই ঢুকিয়ে দিল গাড়িটা অরিন্দম।

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে এতক্ষণ বসেছিল কুণাল ও আর একটি ওদেরই দলের ছেলে সুহাস।

গাড়িটা না থামিয়েই অর্থাৎ ইঞ্জিনটা চালু রেখেই অরিন্দম ওদের বললে, কুণাল, তোরা চটপট নেমে ঐ বাড়ির মধ্যে চলে যা—

বাড়িটা চেনে কুণাল, পূর্বে দু'একবার ঐ বাড়িতে এসেছে। কোন এক ধনী ব্যক্তির বাগান বাড়ি ছিল ওটা—একটু এগুলেই গঙ্গা।

দীর্ঘ দিনের অব্যবহারে বাড়িটা এখন একটা পড়ো বাড়ি, আশে পাশে ত্রিশ চল্লিশ হাতের মধ্যে কোন বসতি নেই, নির্জন জায়গাটা।

তুই নামবি না! কুণাল শুধায়।

না। গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসছি—ওখানে লতা আর গণেশ আছে—যা এগো—এ্যাটাচীকেসটা নিয়ে যা—

কুণাল অরিন্দমের নির্দেশ মত—আমি সুহাসকে নিয়ে যাচ্ছি—কথাগুলো বলে অরিন্দম গাড়িটা ব্যাক করে আবার গেট দিয়ে বের হয়ে ডাইনে বেঁকে এগুলো।

বেশ খানিকটা এগুবার পর প্রায় গঙ্গার ধারে একটা ঝোপড়ি মত—তার পিছনে একটা আমবাগান—সেই বাগানের মধ্যে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিল অরিন্দম।

রাত তখন তিনটে কি সোয়া তিনটে হবে।

চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। একটানা ঝিঁঝির ডাক ও ঝোপে ঝোপে জোনাকীর মিটিমিটি আলো। ঘুমায় নি কুণাল।

একটা আতঙ্কজনিত অস্বস্তিতে কেমন যেন কুণালের মনটা ভারি হয়ে আছে। সুহাসের ডাকে বাইরে বের হয়ে এলো কুণাল।

সুহাস। চাপা গলায় কুণাল কতকটা যেন ফিস ফিস করে বলল।

আয় আমার সঙ্গে। এ্যাটাচীকেসটা এনেছিস, সুহাস জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ—এই যে—

আয় আমার পিছনে পিছনে আয়—বেশী শব্দ করিস না—

রাত চারটে নাগাদ ওরা যে গাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সেটার রং কালো—কুচকুচে কালো রং—সবে নতুন কালো রং লাগান হয়েছে—গাড়িটার নাম্বার প্লেটটাও বদলে গিয়েছে—বিহারের নম্বর। রংয়ের গন্ধ তখনো পাওয়া যায়।

নে গাড়িতে ওঠ চটপট, সুহাস বললে।

তুই যাবি না সুহাস।

না—তুই একা চালিয়ে যা—পাটনায় কদমকুঁয়াতে অরিন্দম তোর সঙ্গে দেখা করবে, পিস্তলটা তোর লোডেড্ আছে তো?

কুণাল বললে, হ্যাঁ—

—এ্যাটাচীকেসটা আমার জীপে রেখে যা। ক্যারিয়ারে পাঁচটা পেট্রোলের সিলড্ টিন আছে—এই পঁচিশ টাকা রাখ, দরকার মত খরচা করবি। সোজা চলে যাবি পাটনা থেকে, গাড়িটা নিয়ে রাণীক্ষেত—পাটনায় না দেখা হলে রাণীক্ষেতে অরিন্দম থাকবে তোর অপেক্ষায়। কুণাল উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

পরের দিন রাত তিনটে নাগাদ কুণাল পাটনায় পৌঁছয়—কিন্তু একঘন্টা নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করেও অরিন্দমের দেখা পায় না।

আবার গাড়িতে স্টার্ট দেয় কুণাল একাই।

কাটগুদাম ছাড়াবার পরই কুণাল বুঝতে পেরেছিল পুলিশ তার পিছনে পিছনে ফলো করে আসছে—তখনই সে স্থির করে—রাণীক্ষেতে পৌঁছাবার আগেই গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে—নচেৎ পথেই ধরা পড়ে যাবে। আর সে কথা ভেবেই কুণাল স্থির করে রাণীক্ষেতে যাবার পথে—গাড়িটাকে সুবিধে মত কোন জায়গায় খাদের মধ্যে ফেলে দেবে।

বাইরে রোদ ঝিমিয়ে এসেছে।

পাহাড়ের শীর্ষে শীর্ষে অবিশ্যি এখনো সূর্যের শেষ আলো খেলা করছে। এখানে সন্ধ্যা হয় বেশ দেরীতে, অনেকক্ষণ সূর্যের আলো থাকে।

কুণাল অরিন্দমের সঙ্গে ভিড়েছিল প্রায় বছর তিনেক আগে। এতদিন এ ব্যাংক ডাকাতির আগে কুণালকে যা করতে হয়েছে—চোরাই মাল যেখানে যেমন বলেছে অরিন্দমও পৌঁছে দিয়েছে। প্রথমটায় ব্যাপারটা কুণাল বুঝতে পারে নি, যদিও তার মনে মনে একটা সন্দেহ তাকে পীড়া দিয়েছে। সে যাই হোক ঐ ধরনের মাল পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে সেদিনের দিন দুপুরে ব্যাংক ডাকাতির মত অত রিস্ক ছিল না। দলের একজন ধরা পড়ে গিয়েছে—এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে চালাতে অত দ্রুত ব্যাংক থেকে যদি না বের হয়ে আসতে পারত, চারুর মতই হয়ত ধরা পড়ে যেতো কিনা কে বলতে পারে। ব্যাংকে ঢোকার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কুণাল জানতে পারে নি কেন তারা ঐদিন ব্যাংকে যাচ্ছে।

আগে থাকতে কোনদিনই অরিন্দম দলের কাউকে তার প্ল্যানটা খুলে বলে না। একেবারে স্পটে পৌঁছে এ্যাকশনের ঠিক কয়েক মিনিট আগে বলে কি করতে হবে।

প্রথম প্রথম অরিন্দম হয়ত একটা প্যাকেট কুণালের হাতে দিয়ে বলেছে, (কোন একটা পাঁচতারা

হোটেলের) নাম করে, এটা অমুক নম্বর কামরায় এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক যাচ্ছে তার হাতে পৌঁছে দিতে হবে, ভদ্রলোক একটা খাম দেবে, সোজা খামটা নিয়ে হোটেলের বাইরে এলেই—গাড়ি ওর জন্য অপেক্ষা করবে সেই গাড়িতে করে ফ্ল্যাটে চলে আসতে হবে। দু'তিনবার ঐভাবে 'খাম' নিয়ে আসবার পর কুণাল আবিষ্কার করেছিল সেই খামের মধ্যে থাকে একগোছা কারেন্সি নোট।

কুণালের সঙ্গে পরিচয় হবার পর অরিন্দম সোজা তাকে এনে তুলেছিল ক্যামাক স্ট্রীটের একটা আটতলা ম্যানসনের তিনতলায় দু কামরাওয়ালা ফ্ল্যাটে।

অরিন্দম বলেছিল, ছোটখাটো ঐসব অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে অত ঘুরে ঘুরে কটা টাকাই বা উপায় হয় কুণালের—তার চাইতে আমার সঙ্গে কাজ কর, দেখবে, আরো অনেক বেশী উপার্জন হবে তোমার।

তা তোমার দলে কি কাজ হবে আমার—

নানা ধরণের কাজ—সে তো এক কথায় তোমাকে বোঝাতে পারবো না কুণালবাবু—

তবু—

আগে কাজে নাম, তারপর ক্রমে ক্রমে তুমি সবই বুঝতে পারবে, কাজের জন্য উপযুক্ত কমিশনও তুমি আমার কাছ থেকে পাবে— তাছাড়া—মাস মাস একটা মোটা পকেট এলাউন্স পাবে, আর একটা ফ্ল্যাট পাবে সাজান গোছান তোমার থাকবার জন্য।

লোভনীয় প্রস্তাব—সন্দেহ নেই।

কি রাজী আছো? রাজী থাক তো বলো—

দুটো দিন আমাকে ভাবতে দাও—

এতে আবার ভাবাভাবির কি আছে—তোমাকে তো আমি কোন একটা বিপদের মুখে ঠেলে দেবো না, তাছাড়া যদি কোন বিপদ আসেই আমিই তোমাকে রক্ষা করব।

তখনই মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল কাজ সম্পর্কে কুণালের—

কি ভাবছো কুণালবাবু, আরে বাবা তোমাকে ফ্ল্যাট দেবো, জীবনের সিকিউরিটি দেবো—মাসে মাসে মোটা এলাউন্স—আর কি চাও তুমি! এই নাও ধর—দুই হাজার টাকা আগাম, বলে পকেট থেকে অরিন্দম এক গোছা কারেন্সী নোট কুণালের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়েছিল।

করকরে দু'হাজার টাকার কারেন্সী নোট—

কুণাল অরিন্দমের টোপটা গিলেছিল—

চল আজই—

কোথায়—

তোমার নতুন আস্তানায়—

নতুন আস্তানায়—

হ্যাঁ, ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে—

সোজা সেদিনই কুণাল এসে উঠেছিল অরিন্দমের ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে—আটতলা ম্যানসনের তিনতলায় ফ্ল্যাট।

তারপর তিনটে মাস বসেই ছিল কুণাল—মাসে মাসে অবিশ্যি মোটা এলাউন্স এসেছে নিয়মিত তার হাতে।

তিনমাস বাদে অরিন্দম এলো এক রাত্রে।

কেমন লাগেছ এ জীবন—শুধায় অরিন্দম।

কুণাল কোন জবাব দেয় না।

শোন কাল তোমাকে একটা কাজ করতে হবে কুণালবাবু।

কি কাজ?

একটা বইয়ের প্যাকেট একজনের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, কমিশন পাবে হাজার টাকা।

কোথায়?

কালই জানতে পারবে, কাল ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় আসবে—

সামান্য একটা বইয়ের প্যাকেট পৌঁছে দিতে হবে কোন এক জায়গায় তার জন্য কমিশন হাজার টাকা।

কুণাল সত্যিই সেদিন আসল ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে নি।

প্যাকেটটা দেখতে অতি সুন্দর সাধারণ—বাদামী রংয়ের কাগজে মোড়া—একটা সোনালী ফিতে দিয়ে প্যাকেটটা বাঁধা দেখলে মনে হবে, কোন একটি প্রেজেনটেশন—একটা সাধারণ ঐ বইয়ের প্যাকেটটা।

অরিন্দমের নির্দেশ মত একটা পাঁচতারা হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে এক পাঞ্জাবী শিখ সুট পরিহিত—তারই হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল, অরিন্দম পোদ্দার তাকে যেমন বলে দিয়েছিল—অত মানুষের ভিড়ের মধ্যেও লোকটিকে দেখে তার চিনতে কষ্ট হয়নি, লোকটির পরনে ছিল কালো টেরিউলের দামী সুট—এবং কোটের বাটনহোলে গোঁজা ছিল একটি রক্ত গোলাপ।

কুণাল কোনরকম দ্বিধা করেনি, সোজা গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে অরিন্দম যেমন বলেছিল, গুড ইভনিং বলতে, তাই ও বলেছিল।

গুড্ ইভনিং—ভদ্রলোকও বলেন।

আই হ্যাভ গট্ এ মেসেজ ফর ইউ! কুণাল বললে।

মে আই হ্যাভ এ লুক!

ও সিয়োর!

তারপরই প্যাকেট ও একটি খাম বিনিময় পরস্পরের মধ্যে নিঃশব্দে হয়ে গেল।

কুণাল আর সেখানে দাঁড়য়নি, সোজা চলে এসেছিল তার বর্তমান ডেরা ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে।

কুণাল জানত না সে রাত্রে রেস্তোরাঁয় অরিন্দম পোদ্দারের সঙ্গে আলাপটা আকস্মিক নয়। পূর্ব প্ল্যান মতই অরিন্দমের।

হঠাৎই অবিশ্যি নজর পড়েছিল অরিন্দমের—কুণালের উপর।

প্রায় পৌনে ছয় ফুট লম্বা—সাহেবদের মত টকটকে গায়ের রং এবং অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করত বলে ইংরাজী বাংলা ও হিন্দীটা মোটামুটি বেশ ভালই রপ্ত করেছিল। চিরদিনই কুণাল ছিমছাম টাইপের—ছিমছামই থাকত সর্বদা। চট্পটে—হাসিখুশি—

একটা সাপ্লাইয়ের সময় অরিন্দম প্রথম দেখে কুণালকে—তারপর থেকেই বেশ কয়দিন তীক্ষ্ন নজর রাখে তার উপরে—এক ক্রিসমাস ইভে আলাপটা মোড় নেয় পার্ক স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয়।

পরে জানতে পারলেও সেদিন কিছুই জানতে পারে নি কুণাল অরিন্দম সম্পর্কে।

কথায় কথায় বলেছিল অরিন্দম পোদ্দার, তোমার মত একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ঐ ভাবে সামান্য অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করবে, আমি চাই না—কুণালবাবু—

কি করবো বল— অনেক চেষ্টা করেছিলাম একটা ভাল চাকরীর—বি.এ. পাশ করবার পর কিন্তু—

এম. এ. পড়লে না কেন?

গরীব কেরানী বাপের ছেলে আমি—এম. এ. পড়বো কোথা থেকে—তাছাড়া এ্যামবিশন তখন আমার—ভাল ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবো যেভাবেই হোক।

ওঃ! তাই বুঝি শেষ পর্যন্ত অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে লেগে গেলে।

সে সময় কেন যেন আমার মনে হত মানুষের স্ট্যাটাস বলো, পরিচিতি বলো, সোসাইটি বলো সব কিছুর পিছনে একটা ডিসেন্ট ইনকাম্ থাকা, মানে ভাল উপার্জন একান্তই প্রয়োজন। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজটা মোটামুটি ভাল এবং কমিশন ও স্যালারি বাবদ ইনকামটাও নেহাৎ খারাপ নয়, সেও একটা কথা বটে—কিছু না জোগাড় করতে পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি—তাই—

তাই ঐ কাজে লেগে গেলে।

তাছাড়া আর কি?

কিন্তু তোমার মধ্যে যে পার্টস আছে—যে এবিলিটি, পাসিবিলিটি আছে—সেটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে জীবনটাকে তোমার বরবাদ করবে কেন? না না—। ও কাজ তোমার উপযুক্ত আদৌ নয়—

কুণাল প্রত্যুত্তরে হেসেছিল।

তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে কুণালবাবু, সেইদিনই বলেছিল কথাটা কুণালকে অরিন্দম পোদ্দার।

কি কাজ।

কাজ করতে করতেই জানতে পারবে।

তবু—শুনিই না।

এখন যেমন কমিশন পাও আমার কাছেও তাই পাবে। তবে সে কমিশন অনেক বেশি। অনেক হ্যান্ডসাম্ এবং কমিশন ছাড়াও পাবে একটা মাসে মাসে এ্যালাউন্স—সে এ থাউজেন্ড পার মান্থ। অফারটা নিঃসন্দেহে লোভনীয়—কাজেই ভিড়ে গিয়েছিল কুণাল অরিন্দমের সঙ্গে।

তবু কি মনের মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল না কুণালের—ছিল, তারপরে অবিশ্যি আসল ব্যাপারটা বুঝতে খুব বেশি দেরি হয়নি কুণালের মত ছেলের।

সেও অমনি একটা প্যাকেট এয়ারপোর্টে একজন জাপানী ভদ্রলোকের হাতে পৌঁছে দেবার কথা। বি.ও.এ. সি-র জেট বিমান ছাড়ছে—রাত দশটায়। নয়টা নাগাদ এয়ারপোর্টে গিয়ে সেই জাপানী ভদ্রলোকের হাতে প্যাকেটটা দিতে হবে—বিনিময়ে একটা খাম।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তৈরি হচ্ছিল কুণাল। সামনের টেবিলের পরে প্যাকেটটা ছিল—সাধারণ একটা বাদামী কাগজে মোড়া—মনে হয় একটা বই। মোড়কের কাগজটা সেলোফেন পেপারে আঁটা।

কৌতূহল বস্তুটা মানুষের চিরন্তনী, কৌতূহল বস্তুটা আরো মনের মধ্যে চেপে বসেছিল, গতবারের ঠিক অমনি একটা প্যাকেট পৌঁছে দিয়ে একটা খাম এনে অরিন্দমের হাতে তুলে দিতে—অরিন্দম সেই খামটা খোলে, ওরই সামনে, একশ টাকার একগোছা নতুন কারেন্সী নোট।

খুব কম করেও বোধকরি বিশ হাজার টাকার নোট ছিল তাতে। সেই বান্ডিল থেকেই খান দশেক নোট বের করে কুণালকে দিয়ে অরিন্দম বলেছিল, তোমার কমিশন আজকের কাজের—

হাজার টাকা কমিশন, একটু অবাকই হয়—দিন কয়েক আগেও এমনি হাজার টাকা কমিশন দিয়েছিল অরিন্দম ওকে।

আজ আর কৌতূহলটা দমন করতে পারল না।

বাদামী রংয়ের কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলল—সত্যিই কালো লেদারের বাঁধান একটা বই—বইয়ের পাতা উল্টাতে গিয়েই ওর দৃষ্টি আটকে গেল।

বই নয় আসলে সেটা।

ছোট ছোট হীরা—বইয়ের পাতার মধ্যে ফোকর কেটে বসান, এপাতা ওপাতায় পনেরটা ছোট ছোট হীরা—দাম তার সঠিক না জানা থাকলেও কুণাল বুঝতে পারে—খুব কম করেও প্রায় একলাখ টাকা তো হবেই। সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

চোরাই হীরা পাচার।

অর্থাৎ তার সাহায্যে চোরাই মালের লেনদেন।

হঠাৎ ঐ সময় খুট করে একটা শব্দ হতেই কুণাল দরজার দিকে তাকাল।

অরিন্দম পোদ্দার।

দরজার উপরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসল সো ইউ ডিউ ইট, ভালই হলো—ব্যাপারটা তোমার কাছে তাহলে আর রহস্যও রইলো না, গোপনও রইলো না। নাও এবারে জলদি প্যাকেটটা আবার ঠিক করে ফেল—তাড়াতাড়ি তোমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে—মিঃ কুসিয়ারা তোমাকে একটা সোনার বাট দেবেন—সেটা নিয়ে চলে আসবে—নীচে আমার গাড়ি আছে, সেই গাড়ি নিয়েই যাও। কি হলো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আই অ্যাম সরি মিঃ পোদ্দার, একাজ আমার দ্বারা হবে না।

হবে না।

না।

কেন।

এত স্পষ্ট চোরাই কারবার মানে স্মাগলিং—

ডোন্ট বী এ সেন্টিমেন্টাল ফুল কুণালবাবু—নাও তৈরি হয়ে নাও চটপট, আর দেরি করো না—শান্ত গলায় কথাগুলো বললে অরিন্দম পোদ্দার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

না। এসবের মধ্যে আমি নেই মিঃ পোদ্দার—আমি আজই এ ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবো—

গলার স্বর এবারে হঠাৎ যেন বদলে গেল অরিন্দম পোদ্দারের, তাতে আজ আর হবার নয়

কুণালবাবু—একবার যখন হাত বাড়িয়েছো আর হাত গোটান চলবে না। কারণ এ কাজের এই নীতি।

আমি না করতে চাইলেও—

করতে হবে—এ কারবারের এই নিয়ম, এই নীতি বললাম তো।

মানে!

মানে অতি সহজ।

তুমি ভাবছো মিঃ পোদ্দার, যদি আমি কখনো তোমার ব্যাপারটা কারো কাছে ফাঁস করে দিই—নিশ্চিত থাকতে পারো—আমি কখনো তা করবো না।

আবার হাসল অরিন্দম পোদ্দার, বললে, সে যে তুমি করবে না—না জানলে তোমাকে কি এতখানি বিশ্বাস করতে পারতাম, তবু তোমাকে আমার চলে যেতে দেওয়া—না কখনোই তা পারবো না।

জোর করে তুমি আমাকে আটকাবে?

কেন পাগলামী করছো কুণালবাবু, তোমার শিক্ষা নীতিবোধ সততা কতটুকু তোমাকে দিয়েছে। কি পেয়েছো তুমি? সুস্থ ভাবে বাঁচবার মত কতটুকু রসদ তুমি পেয়েছো, তা ছাড়া ভেবে দেখো তুমি এতদিন যে কাজ করেছিলে—সেও তো কতকটা মিথ্যারই বেসাতি—কতকগুলো বড় বড় কথা বলে যে মালের যে মূল্য নয়—তার চাইতে বাড়িয়ে বলে সাপ্লাই দেওয়া—

সে তো এমন চোরাই কারবার নয়—

সোজা কথায় বলতে গেলে সেও তো এক ধরনের মিথ্যাচার—মাল গছানোর জন্য প্রসটিটিউশন করা।

কি বলছো?

ঠিকই বলছি—এ দুনিয়ায় আজকের দিনে সততার কোন মূল্যই নেই—সত্যের কোন দাম নেই—বড় বড় যত কারবার দেখবে কোনটাই সততার উপরে দাঁড়িয়ে নেই—

তোমার কথা বিশ্বাস করি না—

করো না।

না।

তাহলে এই তোমার শেষ সিদ্ধান্ত—

হ্যাঁ।

তাহলে আমার কথাটাও শোন—আজ তোমাকে আমার দল ছাড়তে হলে একটি মাত্র পথই তোমার সামনে আছে।

জানতে পারি কি সেটা কি?

হ্যাঁ-

কি শুনি!

তোমার আর এ জগতে বেঁচে থাকবার কোন অধিকারই থাকবে না।

কুণাল লক্ষ্য করলো অরিন্দমের হাতে ছোট্ট একটি পিস্তল। মুখে তার একটা চাপা নিষ্ঠুর হাসি ধারালো ছুরির ফলার মত।

কি করতে চাও এবারে বল কুণালবাবু।

কুণাল বুঝতে পারে মুক্তির আজ আর কোন পথই নেই তার সামনে খোলা।

যে ফাঁস একবার সে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক—জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতেই হোক গলায় পরেছে সে ফাঁস আজ রীতিমত গলায় এঁটে বসেছে তার বাকী জীবনটার মতই।

কুণালের চোখে সেদিন সত্যিই জল এসে গিয়েছিল। নিরুপায় একটা আক্রোশে ও হতাশায়।

অরিন্দম বললো, বিবেকের ঐ দংশন সকলকেই কোন না কোন সময় পেতে হয় কুণালবাবু—ওসব এক পাশে সরিয়ে রেখে যেমন করছিলে কাজ কর—উপার্জন কর—দেখবে একদিন সব সহ্য হয়ে যাবে। অর্থটা মানুষের জীবনে এখন একটা টনিক—দেখবে কাজ করতে করতে একদিন—ওসব কথা আর মনেই পড়বে না, সব কিছু ভুলে যাবে।

বলতে বলতে পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে অরিন্দম কুণালের হাত ধরে—একটা চেয়ার টেনে বসিয়ে দিল। পকেট থেকে ভ্যাট সিক্সটি নাইন-এর একটা বোতল বের করল—আলমারী থেকে দুটো গ্লাস এনে তাতে বোতল থেকে তরল পদার্থ ঢালল।

কুণাল গ্লাসটা হাতে নিল শিথিল অবশ প্রায় হাতটা বাড়িয়ে।

গ্লাসে গ্লাস ঠেকাল!

দুজনেই একসঙ্গে চুমুক দিল।

কুণাল বুঝতে তখনো পারেনি গত আট-নয় মাসে অরিন্দমের সঙ্গে থেকে থেকে কখন যেন কেমন করে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসে গিয়েছে—তাকে বদলে দিয়েছে।

শুভবুদ্ধি বা বিবেকের যে দংশনটা হঠাৎ তাকে বিচলিত করে তুলেছিল—তার মুল্যটা কখন এক সময় যে কতখানি শিথিল হয়ে গিয়েছে যেমন সে জানতে পারেনি তেমনি মনের মধ্যে কখন যেন একটা নেশাও ধরিয়ে দিয়েছিল—ঐ কয়েক মাস ধরে সহজে আসা মুঠি ভরে অর্থ—ও তার একটা এ্যাকসাইটমেন্ট বা থ্রিলও বোধকরি ছিল।

ফিরতে আর পারেনি কুণাল।

ফিরে আসা আর হয়নি তার।

বাইরের ঝিমিয়ে আসা রৌদ্রের দিকে ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কুণাল।

অনেকটা পথ আজ কুণাল চলে এসেছে—

রূপা একটা গ্লাসে গরম চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

বাবুজী—

কি! তাকাল কুণাল রূপার মুখের দিকে।

লে বাবুজী লিয়ে লে—চা আনলাম তোর জন্য—

চা—

হ্যাঁ, লে পিয়ে লে।

কুণাল হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাসটা নিল।

কুণাল জানত না—উত্তরপ্রদেশ পুলিসের একজন দুর্ধর্ষ অফিসার সুন্দরলাল মিশ্র—রেডিও ম্যাসেজ পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে তাকে অনুসরণ করতে করতে তার গাড়ির পিছনে পিছনে আসছিল।

কাঠগুদাম ছাড়াবার পর আর কুণালের গাড়িটাকে ট্রেস করতে পারেনি সুন্দরলাল। তবু সে থামেনি—এগিয়ে এসেছে, মাইল পাঁচেক আসবার পর পথের ধারের একটা চায়ের দোকানে একটা সংবাদ পেল স্থানীয় একজন লোকের কাছ থেকে।

হ্যাঁ—স্যার—একটা কালো রংয়ের গাড়ি রাণীক্ষেতের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছি—

কখন—তখন বেলা কত হবে।

তা সকাল—সাড়ে আটটা ন'টা হবে। গাড়িটা এখানে ঐ চায়ের দোকানের সামনে থেমেছিল।

থেমেছিল?

হ্যাঁ—একজন বাবু গাড়ি থেকে নেমে একটা খালি বোতলে চা ভর্তি করে নিয়ে আগের মতো গাড়ি ছেড়ে দিল।

সুন্দরলাল মনে মনে একটা হিসাব করে, বেলা তখন প্রায় পৌনে দুটো। অর্থাৎ ঘন্টা পাঁচেক আগে একটা কালো রংয়ের এ্যাম্বাসেডার ঐ পথ দিয়ে রাণীক্ষেতের দিকে গিয়েছে, গাড়িতে আরোহী ছিল মাত্র একজন।

পরনে লোকটার কি পোশাক ছিল দেখেছো?

হাঁ—সাহেব, টেরিলনের প্যান্ট ও হাওয়াই সার্ট।

গাড়ির মধ্যে আর কেউ ছিল না?

না—

সুন্দরলাল ভাবে, এ পথ যে সোজা চলে গিয়েছে—রাণীক্ষেতের দিকে, তবে কি গাড়িটা রাণীক্ষেতেই গিয়েছে!

পরের দিন সকালে কুণাল একটা মোড়ার উপরে চুপচাপ বসে ছিল। রূপা এসে সামনে দাঁড়াল, বাবুজী কাল বনের মধ্যে একটা জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছে, বলছিল হয়ত ওটা তোরই হবে।

কি?

দাঁড়া নিয়ে আসছি, রূপা চলে গেল এবং একটু পরে একটা কাদামাখা পিস্তল এনে কুণালের হাতে দিল। কুণাল চিনতে পারে তারই পিস্তলটা, যখন আছাড় খেয়ে পড়ে যায় তখন হয়ত কোমর থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল পিস্তলটা।

কিরে বাবুজী ওটা?

পিস্তল।

কি হয় ওটা দিয়ে বাবুজী?

গুলি করে।

গুলি? কেন গুলি করে বাবুজী?

দরকার হয় কোন কোন সময় গুলি করার তাই গুলি করে।

ও হাঁ বুঝলাম, গুলি করলে মানুষ মরে যায় তাই না বাবুজী?

হাঁ—

ওটা তোর?

হাঁ।

তুই কখানা গুলি করেছিস বাবুজী?

করেছি—কথাটা বলে, কুণাল রূপার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। সরল আদিবাসী মেয়েটা কুণালের মুখের দিকে কেমন যেন নির্বোধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

মানুষ মেরেছিস তুই বাবুজী?

না।

তবে!

কি তবে?

তবে গুলি ছুঁড়লি কাকে রে?

এমনিই গুলি ছোঁড়া প্র্যাক্টিস করেছি।

যদি কেউ সে সময় মরে যেতো—না—না বাবুজী তুই আর কখনো গুলি ছুঁড়িস না ও বড় খতরনাক চীজ আছে।

না ছুঁড়বো না, তারপরই একটু থেমে ডাকল রূপা।

বাবুজী।

এখান থেকে নৈনীতাল কত দূর?

নৈনীতাল ত বহুৎ দূর বাবুজী।

রাণীক্ষেত।

কাছে।

হেঁটে যাওয়া যায় না?

কেন যাবে না, যাবি তুই?

না।

তবে শুধাচ্ছিস কেন?

এমনি।

আরো পনের দিন পরে এক অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ী জংগল পথের চড়াই ভেঙ্গে ভেঙ্গে উপরের দিকে উঠছিল কুণাল, এত দিনে তার সন্ধানের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কিছুটা ঝিমিয়ে এসেছে।

এ্যাটাচীকেস থেকে কারেন্সী নোটের বাণ্ডিলগুলো বের করে একটা বোঁচকার মধ্যে পুরে নিয়েছিল—সেই বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে কোমরে পিস্তলটা, অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সন্তর্পণে উপরের দিকে উঠছিল কুণাল।

চাঁদ উঠতে আকাশে এখনো দেরি।

অন্ধকারে তাই ভাল কিছু দেখা যায় না।

টর্চটাও নেই।

থেমে থেমে পথ চলছিল কুণাল, কারণ দিনের বেলা ঐ পথটাকে ভাল করে জরীপ করে চিনে নিয়েছিল।

চলতে কষ্ট হলেও অসুবিধা হয় না কুণালের।

আদিবাসী মেয়েটা অত্যন্ত সরল ছিল।

মেয়েটা যেন দুহাতে তাকে একেবারে আগলে রেখেছিল।

কুণালকে আজ চট করে দেখলে চিনবার উপায় নেই।

এক মুখ কালো কালো দাড়ি।

মাথাভর্তি ঝাকড়া জট বাধা চুল। তার উপরে ময়লা কাপড়ের একটা পাগড়ি।

পরনে আদিবাসীদের ময়লা একটা পায়জামাও। গায়ে অনুরূপ ময়লা একটা কুর্তা। খালি পা।

প্রায় ঘন্টা দুই লাগে কুণালের সড়কের ধারে পৌঁছাতে।

কত রাত এখন হবে কে জানে।

কুণাল হাঁটতে লাগল।

ঘন্টা খানেক হাঁটার পর দূরে একটা টিমটিমে আলো ওর নজরে পড়ে।

একটা ঝোপড়ি থেকে পথের ধারে আলোটা দেখা যাচ্ছে।

আরো নজরে পড়লো কুণালের মাল বোঝাই গোটা তিনেক ট্রাক ত্রিপল দিয়ে ঢাকা একটার পিছনে একটা দাঁড়িয়ে আছে।

ঝোপড়িটা একটা পথের পাশে চায়ের দোকান, দোকানের মধ্যে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে। দোকানের সামনে একটা বেঞ্চে জনা পাঁচ সাত লোক বসে হাতে এক একটা বোতল—গলায় ঢেলে ঢেলে পান করছে। কুণাল বুঝতে পারে মাল বোঝাই দূর পাল্লার ট্রাকগুলোর ড্রাইভাররা বাকী রাতটুকু একটানা লরী চালাবার তাগত সংগ্রহ করছে কানট্রি লিকার গলায় ঢেলে।

কুণাল পাহাড়ের গা ঘেষে ঘেষে ঐ দিকে এগুতে লাগল।

অনেকটা পাহাড়ী পথে চড়াই ভেঙ্গে ভেঙ্গে কুণালের পা দুটো যেন ভেঙ্গে আসছিল। খানিকটা সময় অন্ততঃ বিশ্রাম না করে কুণালের পক্ষে আর এগোন কষ্টকর।

মাল বোঝাই লরীগুলো কোন দিকে মাল নিয়ে চলেছে কে জানে তবে লরীগুলো যে দিকে মুখ করা আছে মনে হয় ওরা বাণীক্ষেতের দিকে যাবে না। উল্টো পথে যাবে।

মদ্যপানরত এক ড্রাইভারপুঙ্গব তার চাঁছাছোলা গলায় গান ধরে—

> আংরেজীমে বোলতা হ্যায় আই লাভ ইউ
> বাংলামে বোলতা হ্যায় আমি তোমায় ভালবাসি
> পাঞ্জাবী মে—

কুণালের মাথার মধ্যে একটা মতলব দেখা দেয়, কোন মতে ঐ মাল বোঝাই একটা লরীর উপরে উঠে যদি লম্বমান হতে পারে ওরা জানতেও পারবে না। ও অনায়াসে অনেকটা পথ চলে যেতে পারে।

মতলবটা মাথায় আসা মাত্র কুণাল আর দেরি করে না—একটু কষ্ট করে শেষ লরীটার মাথায় উঠে বসল। ত্রিপলের নীচে নানা ধরনের প্যাকিং বাক্স ও বুঝতে পারে।

তারই উপরে ও কোন মতে গা ঢেলে দেয়।

কখন লরী ছেড়ে দিল ও জানে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল। গভীর ঘুমে।

কেমন ঠাণ্ডা লাগায় এক সময় ওর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

কাল রাতে কোন সময় নিশ্চয়ই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। গায়ের জামা তখনো ভেজা। বেশ শীত শীত করছে হু হু হাওয়ায়। চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে।

কত বেলা হবে কে জানে।

সোজা পীচঢালা রাস্তা চলে গিয়েছে।

দু পাশে ধু ধু মাঠ। রুক্ষ্ম পিঙ্গল।

পথের পাশে কিছু কিছু গাছ।

খাঁ খাঁ করছে নির্জন রাস্তাটা। একটা কালো রংয়ের এ্যামবাসাডার উল্টো দিকে ছুটে গেল চলন্ত লরীর পাশ কাটিয়ে। লরীটা বেশ স্পীডেই ছুটে চলেছে।

কোথায় কতদূর এলো কে জানে।

কত পথ পার হয়ে এলো বুঝবেই বা কি করে।

রূপার এতক্ষণে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

তার ঘরে ঢুকে তাকে না পেয়ে হয়ত এখনো তাকে আশে পাশে খুঁজে বেড়াচ্ছে এতক্ষণে।

ডাকছে ভাইয়া—ভাইয়া বলে।

মেয়েটা সত্যিই বড় ভাল।

দিন দশেক বাদে একদিন রূপা বলেছিল, বাবুজী একটা বাত বলবো—

কি বাত—

গোসা করবি না তো বাবুজী হামার উপরে।

না না গোসা করবো কেন, বল না কি বলবি।

বাবুজী, হামারা খুব ইচ্ছা করে—

কি ইচ্ছা করে—

না না থাক।

বল না কি ইচ্ছা করে।

তোমাকে যদি বাবুজী হামি ভাইয়া বলে ডাকি।

ভাইয়া—

হাঁ বাবুজী, হামারা এক দাদা ছিল—সে সাহাব ট্রাক চালাতো, চার সাল হয়ে গেল।

কি?

সে একটা এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, রূপার দুচোখে জল।

রূপার মুখের দিকে চেয়ে থাকে কুণাল।

বাবুজী আমার সেই ভাইয়া ঠিক তোমারই মত ছিল, তাই—

বেশ, তুমি আমাকে ভাইয়া বলেই ডেকো।

ঐ 'ভাইয়া' ডাকটা যেন কুণালের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা আনন্দের ঢেউ তুলেছিল। নিজের বোন শ্যামলী কেমন করে না জানি জানতে পেরেছিল অবিন্দমের সঙ্গে মিশবার পর থেকে সোজা পথে কুণাল টাকা রোজগার করে না। অন্ধকার চোরা পথেই তার ইদানিংকার কাজ কারবার।

সে কথাটা বোন শ্যামলী জানতে পেরেই অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে এক সন্ধ্যায় এসেছিল তার ক্যামক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। কুণাল বসে বসে তখন হুইস্কী খাচ্ছিল, কিছুক্ষণ পরে তাকে একটা প্যাকেট হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে যেতে হবে।

ডোর বেলটা ডিং ডিং করে বেজে উঠলো, বেয়ারাটি আবার বাইরে মার্কেটে মাংস আনতে গিয়েছে।

কিছুটা বেশ বিরক্ত হয়েই কুণাল উঠে দরজাটা খুলে দিল।

কিন্তু দরজা খুলে থমকে দাঁড়াল, সামনে দাঁড়িয়ে তার বোন শ্যামলী।

শ্যামলী তুই?

অনেকদিন ধরে খুঁজে খুঁজে তবে আজ এসেছি তোমার বর্তমান ডেরার সন্ধান পেয়ে।

আয়, ভিতরে আয়।

না।

আসবি না!

না, এখন দেখছি আমার যা সন্দেহ হয়েছিল তা মিথ্যা নয়।

সন্দেহ, কিসের সন্দেহ?

সৎ-স্বাভাবিক ভদ্র সন্তানের জীবনযাত্রাটা তাহলে তুমি সত্যি সত্যিই পরিত্যাগ করেছো।

কি বলছিস!

বিস্ময়ের মিথ্যা ভান আর নাই বা করলে। ছিঃ, এই জন্যই বাবা তোমাকে একদিন লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, ভুললে কি করে সত্যশরণ মুখার্জীর ছেলে তুমি, যিনি জীবনে কখনো একটা অন্যায়

করেন নি, কখনো একটা মিথ্যা কথা বলেন নি।

থাম-থাম, আর বড় বড় বুলি আওড়াস না, সত্যভাষণ, ন্যায় কি পেরেছেন ভদ্রলোক তাঁর সারাটা জীবনে—নিষ্ঠুর দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পঞ্চাশ বছর বয়েসেই বুড়িয়ে গিয়েছেন—জোর করে অন্যায় করে কর্তৃপক্ষ শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেনসন নিতে বাধ্য করলে, একমাত্র মেয়েকে একটা পাত্রের হাতে পর্যন্ত তুলে দিতে পারলেন না—এখন সেই মেয়েরই রোজগারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

বাঃ চমৎকার বুলি শিখেছে তো ময়না।

যা এখন তো দেখে গেলি সব। যা এবারে বের হয়ে যা।

যাবো না তো কি তুমি ভেবেছিলে তোমার সব পাপে সমর্থন জানাবো, কথাগুলো বলে শ্যামলী ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। অথচ ভাইবোনের মধ্যে কি অগাধ অপরিসীম ভালবাসাই না ছিল।

শ্যামলী দাদা বলতে অজ্ঞান হয়ে যেতো—আর সে, সেও কি প্রাণাধিক একটি মাত্র বোনকে—

না, আর শ্যামলীর কথা সে ভাববে না।

আবার মনে পড়লো পাহাড়ী আদিবাসী মেয়েটাকে। রূপা।—রূপা—

একটা ঝাঁকুনি লাগল শরীরে কুণালের।

লরীটা আবার চলতে শুরু করেছে। মাথার উপরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

পরের রাত্রে লরীটা লক্ষ্ণৌ থেকে কিছু দূরে থামতেই কুণাল লরী থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে।

নির্জন সড়কটার এক পাশে আখ ও ভুট্টার ফলন।

অন্যদিকে দূরে কিছু চালাঘর, অন্ধকারে ঝাপসা ঝাপসা।

সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা লরীর ঝাঁকুনি খেয়ে। একটা গাছের নীচে বসে।

আরো দিন দুই পরে বেলা দশটা নাগাদ ট্রেনটা পাটনা জংশনে এসে থামতেই কুণাল নেমে পড়ল। বেশভূষার পরিবর্তন হয়েছে কুণালের। পায়জামা ও দামী সেরোয়ানী পরিধানে।

মাথায় চিকনের কাজ করা সাদা লক্ষ্ণৌ টুপী। পায়ে নাগরা। এক মুখ দাড়ি। চোখে কালো চশমা।

কদমকুঁয়ার দিকে যেতে যেতে পথে পেট্রোল পাম্পটার সামনে দূর থেকে অরিন্দমকে দেখে ট্রাকটা থামিয়ে নেমে পড়ল।

পেট্রোল পাম্পটার কিছু দূরে একটা পান সিগ্রেটের দোকান।

সেই দোকানের সামনেই দাঁড়িয়েছিল অরিন্দম পোদ্দার।

পরনে দামী সুট, মুখে পাইপ।

অরিন্দম—পাশে গিয়ে চাপা গলায় ডাকল কুণাল।

তুই, কোথা থেকে?

কোথায় উঠেছো এখানে?

একটা হোটেলে, অরিন্দম বললে।

হোটেলের একটা কামরায় দুজনে দুটি সোফায় মুখোমুখি বসে।

সামনে জিন-লাইমের গ্লাস।

টাকাগুলো বাঁচাতে পেরেছিস তো।—অরিন্দম শুধায়।

হ্যাঁ, সঙ্গেই আছে—বলতে বলতে ছোট এ্যাটাচীকেসটা এগিয়ে দিল অরিন্দম পোদ্দারের দিকে, ঠিক ঐ সময় বাথরুমের দরজা খুলে একটি তরুণী ঘরে প্রবেশ করল।

বিস্ময়ের সঙ্গে তাকায় তরুণীর দিকে কুণাল।

অরিন্দম বললে, ও মালতী।—মালতী, আমার বন্ধু কুণাল। কুণাল মুখার্জী।

মালতীর দিকে চেয়েছিল কুণাল। কোথায় যেন দেখেছে ওকে, মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে কেমন। কিন্তু মনে পড়ে না।

অরিন্দম বললে, মালতীর অভিনয় তুই কখনো দেখিস নি কুণাল?

অভিনয়!

ও চমৎকার অভিনয় করে, অনেক নাটকে অভিনয় করেছে, একটা প্ল্যান করেছি।

মালতী ততক্ষণে অরিন্দমের পাশে একটা সোফায় বসে অরিন্দমের সিগ্রেটকেসটা থেকে একটা সিগ্রেট ধরাতে ব্যস্ত।

প্ল্যান!

হ্যাঁ, কলকাতায় একটা স্টেজ নিচ্ছি আমি। কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গিয়েছে, গদাধর মুখার্জীকে নাটকও লিখতে দিয়েছি, সামনের ১লা বৈশাখে ওপেন করা হবে।

কি নাটক?

একজন বোল্ড রাইটারের সাংঘাতিক রগরগে একটা উপন্যাসের নাট্যরূপে। মালতী নায়িকার ভূমিকায় নামবে, অবিশ্যি সহকারী পরিচালিকা হিসাবেও থাকছে আমাদের নাটকে।

মালতী সিগ্রেটটা থেকে তখন ধুমোদগীরণ করছে।

কুণাল কোন কথা বলে না। ততক্ষণে তার মনে পড়েছে দু'একটা নাটকে ও মালতীর অভিনয় দেখেছে।

কিরে কি ভাবছিস! অরিন্দম আবার প্রশ্ন করে কুণালকে।

না! কি আর ভাববো।

কুণালবাবু একটা কথা বলব—একগাল ধোঁয়া ছেড়ে সহসা ঐ সময় কথাটা বললে মালতী।

কি! বলুন—

আপনার এমন হ্যান্ডসাম চেহারা—আপনি স্টেজে আসুন না!

মানে।

বলছিলাম অভিনয় করুণ না আমাদের নাটকে।

অভিনয়ের তো কিছুই আমি জানি না।

আমি বলছি অভিনয় না জানা থাকলেও, আপনি পারবেন করতে অভিনয়।

কিসে বুঝলেন।—কুণাল মৃদু হাসে।

ও আমরা মানুষ দেখলেই বুঝতে পারি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ—নামবেন আমাদের নাটকে—চমৎকার একটা ভিলেনের রোল আছে আমাদের নাটকে। এবং প্রকৃত পক্ষে সেই নাটকের হিরো। নেমে পড়ুন, কি বলেন?

অরিন্দম ঐ সময় বললে—ঠিকই বলেছো তুমি—তোমার পাশে ওকে চমৎকার মানাবে। নেমে পড় কুণাল।

নেমে পড়বো বলছিস তবে—

হ্যাঁ—

আচ্ছা ভাই আজ তাহলে আমি উঠি—

উঠবি কি, লাঞ্চ খেয়ে যা আমাদের সঙ্গে—

না—আমাকে একবার কলকাতায় যেতে হবে—

বেশত—যাবি—এখন ট্রেন কোথায়।

জানি এখন ট্রেন নেই—একবার শহরটা ঘুরে দেখবো।

কুণাল উঠে পড়ল। ওরা বাধা দেবার আগেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নীচে হোটেলের রিসেপসন কাউন্টারের সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। রিসেপসন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একটি মহিলা ও একজন সাহেবী পোযাক পরা ৩৩। ৩৪ বৎসরের পুরুষ। চমৎকার লম্বা চওড়া চেহারা—

মনীষা—মনীষা চক্রবর্তী।

অনেক দিন পরে দেখলেও মনীষাকে চিনতে কোনই কষ্ট হয় না কুণালের।

শেষ সংবাদ যা পেয়েছিল মনীষা সম্পর্কে, মনীষা হাওড়ার ডি. এম.—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

তোমার ছুটি তো এখনো আছে মনীষা আরো চার দিন আর একটা দিন থেকে যেতে পারো না?

না শৈবাল, কাকামণিকে দেখতে এসেছিলাম, আজই ফিরে যাবো রাত্রির গাড়িতে। হাওড়ার এস্.

পিকে কাল ফোন করেছিলাম, গড়িয়াহাটার ব্যাংক রাবারিটার ব্যাপারে আরো কিছু নিউজ নাকি পাওয়া গিয়েছে।

মনে হচ্ছে গড়িয়াহাটার ব্যাংক রাবারিটার ব্যাপারে তুমি যেন একটু বেশী ইন্টারেসটেড—

গড়িয়াহাটার ব্যাংক রাবারি, কথাটা শুনেই কুণাল চমকে উঠেছিল যেন। কান দুটোকে আরো প্রখর করে কুণাল।

মনীষা বললে, ঠিক তা নয়—

তবে কি?

ইদানিংকালে অত বড় দিনের আলোয় ব্যাংক ডাকাতি যা একটা আর হয়নি। প্রায় লাখ দেড়েক টাকা লুঠ হয়েছে—তাছাড়া—

কি! দলের চারু রক্ষিত নামে যে ছেলেটি সেদিন ধরা পড়েছে—

ছেলেটির নাম চারু রক্ষিত নাকি!

হ্যাঁ। কতই বা বয়স হবে ছেলেটির, বড় জোর একুশ কি বাইশ, কি সাংঘাতিক বলত শৈবাল—

শৈবাল প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল।

মনীষা রিসেপসনিস্ট মেয়েটিকে বললে, কি রিজার্ভেশনের ব্যাপারে কিছু জানতে পারা গেল, আজ রাত্রের গাড়িতে—

আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস চক্রবর্তী—ফার্স্ট প্রায়োরিটিই আপনাকে দেবে, আপনি আপনার ঘরে যান, ফোন পেলেই আপনাকে জানাবো—

কুণাল আবার দোতলার সিঁড়ির দিকে এগুলো। অরিন্দমকে সংবাদটা দিতে হবে। চারু রক্ষিতকে অল্প কিছুদিন হল কুণাল দলে দেখছে—ছেলেটা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই তার জানা নেই।

পুলিসের অত্যাচারে যদি ছেলেটা শেষ পর্যন্ত 'এপ্রুভার' হয়—তাহলেই সর্বনাশ।

ঘরের দরজা বন্ধ।

ডোর বেলের বোতামটা টিপল কুণাল : ভিতরে আওয়াজ শোনা গেল ডিং ডিং..

একটু পরে দরজা খুলতেই একটা বাজনার উচ্চগ্রামের ঝাপটা ওর কানে এসে লাগল।

কি ব্যাপার! ফিরে এলে যে।

কথা আছে।

ঘরের মধ্যে টাইট জীন ও টাইট গেঞ্জী পরনে বাজনার তালে তালে অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গি করতে করতে নাচছে মালতী—ঐসব সেক্সি নাচ কুণালের একদম ভাল লাগে না। কুণাল চোখ ফিরিয়ে নিল।

দূরে টেবিলের পরে রক্ষিত দামী জাপানী টু ইন ওয়ান ট্রানজিস্টারে ইংরাজী বাজনার একটা টেপ বাজছে।

চারু ধরা পড়েছে জানতো, কুণাল বললে,

জানি—ভয় নেই। ওর মুখ থেকে কিছু বেরবে না।

আর ইউ সিওর।

হ্যাঁ—কেন? ও কথা কেন?

এখানকার এস. পি. কে জান কিছু?

শৈবাল সেন।

কি রকম দেখতে তাকে?

লম্বা চওড়া বেশ হ্যান্ডসাম চেহারা—কেন?

সে এই মুহূর্তে এই হোটেলেই আছে।

তাই নাকি।

কিছু আঁচ করতে পারছিস?

না।

তুমি এখন পাটনাতেই থাকবে?

ইচ্ছা আছে দিন পাঁচেক থাকবো।

এ্যাটাচীকেসটা—

তুলে রেখেছি—

শুনেছো কত ছিল—আমি শ' পাঁচেক টাকা ও থেকে নিয়েছি।

দেখেছি—

কত পেলে?

ঠিক পাঁচশ কম দেড় লাখ টাকা—তোর কমিশনটা নিবি নাকি!

না—কলকাতায় গিয়ে নেবো।

প্রয়োজন নেই টাকার?

পঁচিশ টাকার ব্যালান্স যা আছে তাতেই কুলিয়ে যাবে, আচ্ছা চলি—কথাটা বলে কুণাল আবার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের দরজাটা পুনরায় ঘরের ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল। 'লক' পড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

ডাউন দিল্লী কালকা মেলটা প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়িয়ে। রাত দশটা পনেরয় ঠিক ছাড়বার কথা।

সব ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলোতে উঁকি মেরে মেরে দেখেছে কুণাল—মনীষাকে দেখতে পায়নি কোথাও। কুণালের ফার্স্ট ক্লাসেরই টিকিট—একজন টি. টি. কে কিছু দিয়ে একটা আপার বার্থ পেয়ে গিয়েছে, সেই কামরাই ফার্স্ট ক্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল কুণাল—চোখের দৃষ্টি অনুসন্ধানরত চশমার ঈষৎ নীলাভ কাচের আড়াল থেকে। এখনো মুখের দাড়ি সে কামায় নি। পরনে চোস্ত পায়জামা ও চুড়িদার পাঞ্জাবী মাথায় সাদা চিকনের কাজ করা লক্ষ্ণৌ টুপি। দেখলে মনে হয় কোন উত্তরপ্রদেশবাসী সৌখীন যুবক।

দরজায় লাগানো নামের লিস্টটা আগেই পড়ে নিয়েছিল কুণাল।

মনীষা চক্রবর্তীর নামটা আছে অন্য এক পাঞ্জাবী মহিলা সহযাত্রিণীর নামের নীচেই—একটা লোয়ের সীট পড়েছে মনীষা চক্রবর্তীর।

ট্রেন ছাড়ার তখনো মিনিট সাতেক বাকী।

ঠিক মিনিট দুই থাকতে এলো মনীষা। কুলির মাথায় ছোট একটি সুটকেস, মনীষা কামরার মধ্যে ঢুকে গেল। কুণালও গাড়িতে উঠলো নাম কুণাল নয় পদ্মনাথ মিশ্র। যাচ্ছে পাটনা থেকে কলকাতা।

ফোর বার্থ কামরায় একটি আপার বার্থ।

তার কামরার মধ্যে দুজন পাঞ্জাবী বৃদ্ধ ভদ্রলোক—একজন দক্ষিণী প্রৌঢ় ভদ্রলোক সে।

ঘন্টি পড়লো, গার্ডের হুইসেল শোনা গেল—ট্রেন ছাড়লো।

রাত্রির অন্ধকারে ট্রেনটা ছুটে চলেছে।

গাড়ির জানালার পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে কুণাল। পাশে তার একটা ফোর বার্থ কামরা তার পরের কুপটাতে মনীষা এই গাড়িতে রয়েছে।

অনেক দিন, তা প্রায় তিন বৎসর পরে মনীষাকে দেখলো ও। মনীষা দেখতে ঠিক তেমনিই আছে। সেবারকার সেই সাক্ষাতের পর আর দেখেনি মনীষাকে কুণাল।

মনীষার পরনে একটা জামদানী শাড়ি, ফিকে সবুজ রংয়ের ম্যাচ করা গায়ে ব্লাউজটা। নিরাভরণা হাতে একটি রিস্টওয়াচ। চিরদিন দেখেছে ও সেই কলেজ লাইফ থেকে এক রাশ মাথার চুল তার এলোখোঁপা করে রাখে।

এত কাছে মনীষা তবু কত দূরে। তার চারপাশে যেন ঐ বাইরের মতই একটা অন্ধকারের আবরণ।

শিয়রের পাশে ছোট রিডিং ল্যাম্পের আলোয় একটা পেঙ্গুইন সিরিজের বই পড়ছিল কুণাল। রাত্রে গাড়িতে তার কোনদিনই ঘুম হয় না। কামরার সামান্য যাত্রীরা সবাই যে যার কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

রাত বোধকরি তখন তিনটে হবে হঠাৎ একটা গোলমাল তার কানে এলো।

তারপরই কানে এলো কে যেন চেঁচাচ্ছে—ডাকাত ডাকাত।

অন্য তিনজনেরও ঘুম ভেঙে যায়—কামরার মধ্যে ওরা। সকলেই কামরার বাইরে আসে কামরার দরজা খুলে।

চারজন সশস্ত্র, প্রত্যেকেরই মুখে মুখোশ, হাতে তাদের ভোজালী ও একটা পিস্তল একজনের

হাতের মুঠোয়—মুখোশধারী বলল, সোর মাচাইয়ে মাত—যার যা সোনা দানা টাকা পয়সা আছে খুলে দিন—কাউকে স্পর্শ করা হবে না।

মহিলারা গায়ের গহনা খুলে দিতে শুরু করে কাঁপতে কাঁপতে।

সামনের লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে কুণাল এগিয়ে গেল, হ্যান্ডস্ আপ। কেউ এক পা নড়েছো কি আমি ফায়ার করবো। লুণ্ঠনকারীর দল সকলে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

যার কাছ থেকে যা নিয়েছ সব ফেরত দাও—কুইক—নাতো আমি গুলি চালিয়ে সব কটাকে খতম করব।

যাদুমন্ত্রে যেন কাজ হলো।

সব লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরিয়ে দিল লুণ্ঠনকারীরা।

কেউ দয়া করে চেনটা টানুন গাড়ির।

গাড়ি ধীরে ধীরে থেমে গেল চেনটা টানার পরই এক সময়।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই লুণ্ঠণকারীর দল দুরদার করে অন্ধকারে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কি এক যাদুমন্ত্রে ঘটে গেল।

গার্ড সাহেব এলেন—হোয়াটস্ হ্যাপ্—চেন টেনেছে কে—কৌন অ্যালারম চেইন খি চা?

একজন ভদ্রলোক যাত্রী বললে, আমি।

তারপর গার্ড সাহেবকে আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বললেন, এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা।—ভাগ্যে ঐ ভদ্রলোক ছিলেন, উনিই আজ আমাদের বাঁচিয়েছেন—বলে কুণালকে দেখালেন।

মনীষা তখনো কুণালের মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে। চোখে কুণালের রঙিন চশমা থাকলেও তার গলার স্বরটা যেন হঠাৎ তার কানে লেগেছিল চেনা চেনা।

ঐ কণ্ঠস্বর মনীষার পরিচিত যেন।

আপনি।

বিশেষ আর কি কিছুই করিনি, সঙ্গে আমার এই টয় পিস্তলটা ছিল তারই সদ্‌ব্যবহার করেছি মাত্র।

হাসলো কুণাল।

ঐ 'বিশেষ আর কি' কথার মধ্যে ব্যবহার প্রায়শই করা যেন একটা মুদ্রাদোস ছিল কুণালের।

কত সময় কত ক্ষেপিয়েছে কুণালকে মনীষা।

আপনার নামটা।

বিশেষ আর কি, নামটা আমার শুনে কি হবে।

বাঃ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে না।

লিখে নিন তবে, বিশেষ আর কি পদ্মনাথ মিশ্র।

নাম ধাম টুকে নিয়ে গার্ড সাহেব কামরা থেকে নেমে গেলেন। একটু পরে আবার গাড়ি ছাড়লো।

যাত্রীরা যে যার নিজ নিজ কামরায় চলে গিয়েছে, কুণাল ল্যাভেটরীতে গিয়ে ঢুকেছিল ওদের এড়াবার জন্য, ওদের কৌতূহল থেকে বাঁচবার জন্য।

মিনিট পনের পরে ল্যাভেটরী থেকে বের হয়ে করিডরের মাঝামাঝি একটা খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ঝুকে পড়ে সবে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছে কুণাল, একটা টানও দেয়নি তখনো, ভাবছিল এরপরের স্টেশনেই তাকে এ গাড়ি থেমে নেমে পড়তে হবে।

পাশ থেকে চাপা নারীকণ্ঠ শোনা গেল, কুণাল—

চমকে ফিরে তাকায় কুণাল, কে? ট্রেনের চাকার অবিরাম শব্দের মধ্যেও মনীষার কণ্ঠস্বরটা ঠিকই কুণালের কানে এসেছিল।

তাহলে চিনতে ভুল হয়নি আমার—আমি, মনীষা, আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না।

কুণাল মনীষার কথার কি জবাব দেবে, আদৌ কোন জবাব দেবে কিনা ভাবছে তখনো। চেয়ে আছে চশমার ওপার থেকে মনীষার মুখের দিকেই।

কি হলো—আমার ভুল হলো নাকি। না তোমার ছদ্মবেশেও তোমাকে চিনতে পেরেছি বলে ভাবছো কথাটা স্বীকার করবে কিনা।

ভুল হচ্ছে আপনার।

ভুল হচ্ছে।

আমি কিন্তু এখনো জানি, বিশ্বাস করি আমার ভুল হয়নি। ছদ্মবেশের জন্য ধরা না দিতে চাও, দিও না। তোমার চেহারা, হাঁটা চলা, গলার স্বর—তোমাকে চিনতে কোন দিনই কষ্ট হবে না আমার—আচ্ছা আই এম সরি টু ডিসটার্ব ইউ, গুড নাইট!

মনীষা তার কামরার দিকে এগুলো। কয়েক পা গিয়েছে কুণাল ডাকল পিছন থেকে—দাঁড়াও মনীষা।

মনীষা ফিরে আসে।

তুমি আমাকে ঠিকই চিনতে পেরোছো, কুণাল বললে।

তবে!

কিন্তু কোন বিশেষ কারণেই আমার সত্য পরিচয়টা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না।

কি ব্যাপার বলতো?

যাও তুমি তোমার কামরায়—আর এখানে এত রাত্রে থেকো না।

তুমি কোন কামরায় আছো—

সামনের কামরাতেই আছি—

কি করছো আজকাল? বোঝা গেল মনীষার যাবার ইচ্ছা নেই।

বলবার মত তোমার কাছে কিছু নয়—

আমি—

জানি, তুমি বর্তমানে হাওড়ার ডি. এম—

এতদিন অবিশ্যি তাই ছিলাম। কলকাতায় ফিরে জয়েন করবো নদীয়ায়, সেখানেই ডি. এম হয়ে যাচ্ছি।

তোমার যাত্রা পথ শুভ হোক।

আর কি কিছু বলার নেই তোমার। এতদিন পরে দেখা হলো তোমার সঙ্গে—

দূর থেকে তোমাকে চিরদিন অভিনন্দন জানানো ছাড়া, আর কোনও অধিকারই নেই আমার। তার বেশী আর কিই বা বলার থাকতে পারে।

এটা কি তোমার মনের সত্যিকারের কথা—

একবিন্দু মিথ্যা বা অতিশয়োক্তি করিনি—

মনীষা হাসল। তারপর বললে, কোথায় আছো, কি করছ বলবে না।

বললামইত একটু আগে, বলবার মত নয় কিন্তু তোমার কাছে বলবার মত হলে তুমিই সবার আগে জানতে পারতে, মনীষা।

তুমি কি আমার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলছো।

না।

যেন আমার মনে হচ্ছে তাই।

মন হয়তো তোমার মিথ্যা বলেনি—

কুণাল—

প্লিজ ও নামে ডেকো না আমাকে মনীষা, যে নামটা করলে সে মানুষটা অনেকদিন আগেই মরে গিয়েছে, যে তোমার সামনে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তার নাম পদ্মনাথ মিশ্র।

কুণাল অবিশ্যি মিথ্যা বলেনি—

একমাত্র অরিন্দম পোদ্দার ছাড়া সবাই জানে তার নাম পদ্মনাথ মিশ্র। তার আসল নাম কেউ জানে না।

অরিন্দমের দলে ঢুকে—অর্থাৎ ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে সিফট্ করবার পর কেন যেন ঐ নামটাই নিয়েছিল কুণাল। পদ্মনাথ মিশ্র, ম্যানসনের সিঁড়ির নীচে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের যে সব নেম প্লেট ছিল—৩৫ নং ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হিসাবে তার নাম লেখা ছিল পদ্মনাথ মিশ্র—সাংবাদিক। যখনই

কোথায়ও বের হতো গলায় ঝোলান থাকত একটা ছোট ক্যামেরা।

ঐ ম্যানসনের বাসিন্দারা ওকে একজন সাংবাদিক বলেই জানত। ফ্রিলান্স সাংবাদিক।

অপরারেশনের সময়ও গলায় ঝোলান থাকত ক্যামেরাটা।

ব্যাংকে ডাকাতি করতে যাবার সময়ও গলায় ঝোলান ছিল ওর ক্যামেরাটা।

সে রাত্রে পাহাড়ী উৎড়াই পথ ধরে বৃষ্টির মধ্যে নামতে হঠাৎ পা পিছলে যখন পড়ে যায়—এবং গড়াতে থাকে—দ্রুত, কখন হয়তো সে সময় গলা থেকে ক্যামারাটা পড়ে গিয়েছে—ও জানতে পারে নি।

রূপাদের ওখানে যে কয়েদিন ছিল এদিকে ওদিকে ক্যামারাটার সন্ধান করেছে বন-জংগলের মধ্যে কিন্তু ক্যামারাটার কোন সন্ধান করতে পারে নি।

আগে ছিল একটা সাধারণ আলাদা ক্যামেরা—পরে ফ্ল্যাশ সমেত একটা দামী জাপানী ক্যামেরা কিনেছিল। কোন কিছু ভাল চোখে পড়লেই ছবি তুলে নিত।

কেন যেন ঐ মুহূর্তে ক্যামেরার কথাটা মনে পড়ে কুণালের।

মেল ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছিল। বোধহয় কোন স্টেশনে থামতে চলেছে ডাক গাড়িটা এবারে—ক্রমশঃ আরো শ্লথ ও মন্থর হয়ে এলো গাড়ির গতি। দূরে আলো দেখা যাচ্ছে অনেক—কোন একটা স্টেশনেই গাড়িটা থামছে, কামরার মধ্যে প্রবেশ করে নিজের ছোট এ্যাটাচীকেসটা হাতে ঝুলিয়ে বের হয়ে এল কুণাল।

এ্যাটেনডেন্ট জেগেই ছিল ঐ কম্পার্টমেন্টের—সে শুধায়, আপ ইঁয়াহি উতরেঙ্গে বাবুজী?

হাঁ—

লেকেন আপত কলকাত্তাকে যানে ওয়ালা থে—

হাঁ—থোরা কাম হ্যায় ইধার—

ট্রেনটা ততক্ষণে থেমে গিয়েছে—দরজা খুলে কুণাল ট্রেন থেকে লাফিয়ে প্ল্যাটফরমের উপর নামল।

কোন একটা জংশন স্টেশন।

শীতের রাত্রির ঐ তৃতীয় যামেও ভেন্ডারদের সোরগোল শোনা যায়। গরম চায়ে, পুরী মিঠাই-পান সিগ্রেট—সান্তারা—কেলা—

কুণাল এ্যাটাচীকেসটা হাতে ঝুলিয়ে ওয়েটিং রুমের দিকে এগোয়—ফিরে তাকালে ঐ সময় দেখতে পেতো—কামরায় কাঁচের সার্সি তুলে তাকিয়ে আছে মনীষা।

মনীষা আগেই ওকে গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে গাড়ি থেকে প্ল্যাটফরমে নামতে দেখেছিল।

একজন চেকার এগিয়ে এল কুণালের সামনে, ইওর টিকিট প্লিজ।

কুণাল পকেট থেকে টিকিটটা বের করে টি. টি.-র হাতে দিল।

পাটনা টু হাওড়া—

হ্যাঁ—

এখানে নামলেন যে!

কাল এই ট্রেনটা আগেই ধরবো—এখানে একটু কাজ আছে। কুণাল বললে।

টি.টি পেনসিল দিয়ে টিকিটটার উপরে কি লিখে যেন ওকে ফিরিয়ে দিল।

এখানে কোন ভাল হোটেল আছে জানেন?

সে রকম কোন ভাল হোটেল তো এখানে পাবেন না স্যার—মাইল দুয়েক দূরে একটা গেস্ট হাউস আছে—

এই স্টেশনে রিফ্রেশমেন্ট রুম নেই?

আছে—দেখুন দোতলার ঐ সামনের সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে যান। কিন্তু রিফ্রেশমেন্ট রুমও এখন বন্ধ—খুলবে ভোর সাড়ে চারটেয়।

থ্যাঙ্ক ইউ! কুণাল সিঁড়ির দিকে এগোয়।

প্ল্যাটফরম থেকে গাড়িটা তখন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে আবার।

একটু একটু করে চলন্ত গাড়ি থেকে প্লাটফরমটা মানুষজন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল মনীষার।

স্টেশনের আলোগুলো ঝাপসা হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মনীষা জানালা থেকে মুখটা ভিতরে টেনে নিল।

কুণাল।

মনে মনে হিসাব করে মনীষা—প্রায় দুবছর পরে দেখা হল কুণালের সঙ্গে।

আকস্মিক ট্রেনের কামরায় এভাবে কুণালের সঙ্গে দেখা হবে যেন চিন্তারও বুঝি অতীত ছিল মনীষার।

কি অদ্ভুতই এক পরিস্থিতিতেই না চলন্ত ট্রেনের কামরার মধ্যে দেখা হয়ে গেল আজ কুণালের সঙ্গে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মনীষার—কুণালের আজকের ছদ্মনামের ও ছদ্মবেশের ব্যাপারটা। ছদ্মবেশ। ছদ্মনাম—পদ্মনাথ মিশ্র।

তাছাড়া কি করে আজকাল ও, কোথায় আছে কিছুই বলল না কুণাল। একা ছদ্মবেশে ছদ্মনামে ট্রেনে উঠেছিল কেন? আত্মপরিচয় গোপনের প্রয়াসটাও তার স্পষ্ট। একটা আত্মগোপনের প্রয়াস কুণালের মধ্যে ও যেন লক্ষ্য করলো।

কেন? প্রশ্নটা ঘোরা-ফিরা করতে থাকে মনীষার মাথার মধ্যে। বেশভূষা ফার্স্টক্লাস কমপার্টমেন্টের যাত্রা দেখে তো মনে হলো বেশ ভাল ভাবেই দিন যাচ্ছে কুণালের—তথাপি তাকে কোন কথা প্রকাশ করতে দ্বিধা করলো কেন?

যাবার কথা ত কুণালের পাটনা থেকে হাওড়া তবে হঠাৎ এখানেই বা ও নেমে গেল কেন? মাঝ পথে

এর আগেরবার যেন কোথায় দেখা হয়েছিল কুণালের সঙ্গে ওর? বেশী ভাবতে হয় না মনীষার বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় মনীষার মনে পড়ে যায় সেটাও আজকের রাতের মতই ছিল এক বিচিত্র পরিস্থিতি।

কি একটা ব্যাপারে যেতে হয়েছিল ওকে ক্যামাক স্ট্রীটে।

হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা গিয়েছিল ক্যামাক স্ট্রীটে একটা ট্যাক্সীতে।

সন্ধ্যার ঘোর নেমেছে তখন চারিদিকে। পথের ও দোকানে দোকানে শোকেসে নিওন আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

মনীষা ট্যাক্সী থেকে নেমে ড্রাইভারকে ভাড়া দিল মিটার দেখে কিন্তু ড্রাইভার বলে, ওতে হবে না আরো পাঁচটাকা বেশী দিতে হবে।

কিউ!

ম্যায়নে তো আপকো পহেলেই বোলা থা পাঁচ রুপেয়া যাস্তি লাগে গা।

কাহে? ওতো জুলুম হ্যায়। নেহি মিলেগা—আগর এই ভাড়া লেনা হ্যায় তো লেলো—নেহিত হাম পুলিশকো বোলায়গা।

মেমসাব ঝামেলা মাত কীরিয়ে—দে দিযিয়ে রুপেয়া—আপকো সাথ যো বাত হুয়া মেরা—ওহি রুপেয়া।

নেহি মিলেগা।—মনীষা কঠিন গলায় বলে।

কথায় কথায় তর্কাতর্কি গোলমালে, কয়েকজন পথিক এসে ওদের সামনে ভিড় করে। চারপাশ থেকে একজন বলে ওঠে ভিড়ের মধ্যে থেকে দিয়ে দিন না ম্যাডাম আগেই যখন ও বলেছিল পাঁচটাকা বেশী দিতে হবে ওকে ভাড়ার উপরে।

না দেবো না, এ অন্যায় জুলুম জবরদস্তি।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার একটা মুখখিস্তি করে ওঠে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে লোহার মত একটা মুষ্ঠি বিদ্যুৎ গতিতে এসে পাঞ্জাবী তরুণ ড্রাইভারটির চোয়ালে পড়ল, তমিজ সে বাত করো—

পাঞ্জাবী ড্রাইভার প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও রুখে দাঁড়াল পর মুহূর্তে এবং প্রতিঘাত করবার জন্য উদ্যত হয় তার সবল হাত। ক্ষিপ্রগতিতে তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারী চালায় আবার হাত। আক্রমণকারীর এলোপাথাড়ি ঘুষিতে রণে ভঙ্গ দিতে হয় তাকে, চকিতে ট্যাক্সীতে উঠে স্টার্ট দিয়ে স্থানত্যাগ করে পাঞ্জাবী ট্যাক্সী ড্রাইভার এবং ড্রাইভারটা ট্যাক্সী চালিয়ে চলে যাবার পর এতক্ষণ মনীষার মানুষটার

প্রতি নজর পড়ে—কুণাল তুমি—

কোথায় যাবে তুমি।—কুণাল বললে।

কাছেই একটা কাজে এসেছিলাম—তুমি—

চল তোমাকে পৌঁছে দিই—

মনীষা আপত্তি জানায় নি।

বেশী দূরে নয়, কুণাল যে ফ্ল্যাট বাড়িটায় থাকে তারই দোতলায় যাবে মনীষা।

মনীষা বললে, এই ম্যানসনের দোতলায়—

ডান দিকে লিফ্‌ট আছে চলে যাও—কুণাল মনীষাকে বললে।

তুমি কোথায় থাকো?

ওই কাছাকাছিই, কুণাল বললে।

তুমি তাহলে কলকাতাতেই আছো।

হ্যাঁ।

আমি এখন মেদিনীপুরে ডি, এম—

আমি জানি।

জান তুমি।

জানি, আচ্ছা চলি—কুণাল গেটের দিকে এগোয়।

কুণাল। —পিছন থেকে ডাকল মনীষা।

কিছু বলছো?

কি করছো আজকাল—

সাধারণ বি. এ পাশ করে একজন কি আর করতে পারে।

তবু—

এই এটা ওটা করছি আর কি, কুণাল প্রশ্নটা এড়াবার জন্য বললো, কোন মতে চলে যাচ্ছে—

তোমার মা বাবা কেমন আছেন?

ভাল।

এসো না একবার মেদিনীপুরে, আমার ওখানে!

ডি. এম.-এর কোয়ার্টার আমার মত সাধারণ একজনকে ঢুকতে দেবে কেন, কুণাল বললে।

সিকিউরিটি গার্ডকে বলো—তোমার নাম—

বেশ মনে থাকবে! আচ্ছা চলি—এগিয়ে গেল কুণাল।

সেদিনও মনীষার মনে হয়েছিল কুণাল যেন কতটা ইচ্ছা করেই তাকে এড়িয়ে গেল। কেন গেল মনীষা সেদিনও যেমন বুঝতে পারে নি—আজকের ট্রেনের ব্যাপারটাও যেন তার কাছে তেমনি দুর্বোধ্য লাগল।

পরের দিন দিল্লী কালকা মেল ধরে কুণাল কলকাতায় ফিরে এলো।

সংবাদপত্রে চোখে পড়ল গত রাত্রের ট্রেনে রাহাজানীর ব্যাপারটা ছাপা হয়েছে, পদ্মনাথ মিশ্র নামে এক যুবক ট্রেনের যাত্রী ছিলেন, তিনিই ডাকাত দলকে কাবু করেন। হাওড়ার ডি. এম. মনীষা চক্রবর্তী ঐ ট্রেনে কলকাতায় ফিরছিলেন—তিনিই হাওড়ায় নেমে জি. আর পিকে সংবাদটা দেন।

হাওড়া থেকে একটা ট্যাক্সী নিয়ে কুণাল সোজা এলো তার ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে।

লিফটে করে উপরে উঠে চাবী দিয়ে দরজা খুলে দেখলে অরিন্দম বসে আছে ঘরের মধ্যে একটা সোফার পরে—হাতে ধরা তার একটা জ্বলন্ত সিগ্রেট।

আয়—তোর জনাই বসে আছি—

পাটনা থেকে কবে ফিরলে।—কুণাল শুধায়।

গত কাল প্লেনে। জরুরী কথা আছে।

কি কথা!

অ্যাকসানে যেতে হবে।

আবার ব্যাঙ্ক রবারি—

হাঁ—তবে এবারে কলকাতায় নয়, হাওড়ায়—

এ যাত্রায় আমাকে বাদ দাও অরিন্দম—

বাদ দেবো।

হ্যাঁ—বড় ক্লান্ত আমি—

তা কি হয়। খবর পেয়েছি—একটা জুটমিল থেকে আজ মাইনা ড্র করবে—তাছাড়া অন্য একটা পার্টি, মানে একটা বড় বিজনেস কনসার্ন। একটা মোটা টাকা, ক্যাশ জমা দেবে—প্রায় লাখ দেড়েক মত হবে সব মিলিয়ে—আর শোন। ঐ এ্যাটাচীকেসে পনের হাজার তোর গত বারের শেয়ারটা আছে।

ও টাকাটা আমার প্রয়োজন নেই—

সে আবার কি!

হ্যাঁ, অরিন্দম আমি আর তোমার দলে কাজ করতে পারবো না।

পাগল নাকি! হঠাৎ আবার মাথায় ভূত চাপল কেন রে!

আই হ্যাভ ডিসাইডেড!

কি হয়েছে বলত?

কি আর হবে—কিছু হয়নি! আর ব্যাঙ্ক রবারি করবো না স্থির করেছি—

তাতো হয় না কুণাল। এতদিন আমার দলে থেকে—এখন সরে দাঁড়াবার প্রশ্নই ওঠে না। শোন, পাগলামী করিস না, ঠিক সাড়ে নয়টার আমি আসবো—এখন পৌনে সাতটা—ঠিক সাড়ে নয়টায়—রেডি থাকিস। চলি আমি, অরিন্দম সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল—

দরজাটা টেনে দিয়ে গেল, 'লক' হয়ে গেল দরজায়।

লালাবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার।

ডি. সি. ডি. ডি অনল সেনের ঘরে কনফারেন্স বসেছিল।

অনল সেন ইনেসপেক্টার বিভূতি চৌধুরীকে বলছিলেন, ইদানিং গত চার মাসে যে সব ব্যাঙ্ক রবারি হয়েছে—তার পিছনে আছে একটা দুর্ধর্ষ দল—খবরটা আমি পেয়েছি—সবই সেই দলের কাজ।

কিন্তু স্যার—

দলের রিং লিডার হচ্ছে একটি ৩৩/৩৪ বৎসরের যুবক। শোন বিভূতি, যেমন করে হোক দলটাকে ধরতে হবে বিভূতি! গত মাসে গড়িয়াহাটার একটা ব্যাঙ্কে যে ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল, সেও ঐ দলেরই কাজ—সে খবরও আমি পেয়েছি।

গাড়িটার কোন ট্রেস করতে পেরেছেন স্যার?

হ্যাঁ—ইউ. পিব পুলিশ গাড়িটা রাণীক্ষেত যাবার পথে—একটা খাদের মধ্যে পোড়া ঝাঁঝরা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—আরো একটা সংবাদ সংগ্রহ করেছে ইউ.পি পুলিশ—দলের একজন আহত অবস্থায় ওখানকার এক আদিবাসী বস্তিতে কিছুদিন আত্মগোপন করেছিল। পরে এক রাত্রে সেখান থেকে পালিয়ে যায়—লোকটা নাকি বাঙালী।

বাঙালী।

হ্যাঁ—একটি বাঙালী যুবক—৩৪/৩৫ বৎসী বয়স হবে। খুব হ্যান্ডসাম নাকি দেখতে যুবকটি।

নামটা জানা যায়নি তার?

না। তবে দলটাকে খুঁজে বের করতে পারবো মনে হয়।

কেমন করে?

গড়িয়াহাটার ব্যাঙ্কে যখন ডাকাতি হয় সে সময় ব্যাঙ্কের এক কর্মচারীর কাছে একটা দামী ক্যামেরা ছিল সে দূর থেকে গোলমালের সময় একটা ফটো তুলে নিয়েছিল—সেটা আমাদের হাতে এসেছে।

তাই নাকি।

এই দেখ বিভূতি সেই ফটোর এনলার্জ কপি এটা—এই ফটো থেকে যে কোনও লোককে আইডেন্টিফাই করা সুবিধা হবে আমাদের—

আশ্চর্য একটা যোগাযোগও স্যার—

হ্যাঁ রেয়ার ইনসিডেন্ট একটা—ঐ গোলমালের মধ্যে যে ভদ্রলোক তার ক্যামেরাটা কাজে লাগিয়েছে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসাই করতে হয়। ব্যাঙ্কে ওই ছেলেটির সঙ্গে একজন কর্মচারী থাকলে এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কে ক্যামেরা ফিট করা থাকলে ভবিষ্যতে এই ধরনের ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরে ইন্‌ভেস্টিগেশনের অনেক সুবিধা হয় পুলিশের।

ফটোটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বিভূতি বললে, আপনি স্যার ঠিকই বলেছেন। কিন্তু স্যার আশ্চর্য—

কি বিভূতি!

এদের মধ্যে একজনকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন—আমার।

চেনা চেনা, কাকে বলত।

হ্যাঁ স্যার। যদিও পরনে পাঞ্জাবীর বেশ—এবং খুব সম্ভবতঃ এক মুখ ফলস্ দাড়ি ও মাথায় পাগড়ি, চোখে কালো চশমা ছদ্মবেশে—তাহলেও মনে হচ্ছে একে যেন আমি চিনি।

কার কথা বলছো বিভূতি।

এই যে ফটোর মধ্যে ডান দিকে লম্বা মত হাতে পিস্তল—

দেখেছ, কোথায় দেখেছ মনে করতে পারছো?

হ্যাঁ স্যার একটু ভেবে দেখতে দিন আমায়। কথাগুলো বলে ক্ষণকাল বিভূতি কি যেন ভাবল তারপর বললে, হ্যাঁ স্যার মনে পড়েছে ছেলেটি আমার সঙ্গে মনে হচ্ছে কলেজে পড়ত— নামকরা একজন স্পোর্টসম্যান ছিল।

নাম কি?

সম্ভবতঃ কুণাল।

দ্যাটস্ গুড।

দিন কয়েক পরে কুণালের ফটোটা সংবাদপত্রে ছাপিয়ে রিওয়ার্ড ঘোষণা করা হলো পুলিশের পক্ষ থেকে। অন্য দিকে হাওড়ার ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে তখন।

কুণালকেও যেতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত দলের সঙ্গে।

এবং যথারীতি ডাকাতদের কাউকেই পুলিশ পাকড়াও করতে পারেনি।

সংবাদপত্রের পাতায় নিজের ছবি দেখে কুণাল চমকে ওঠে। ঐ বেশেই গড়িয়াহাটার ব্যাঙ্কে সে ডাকাতি করতে গিয়েছিল মনে পড়ে যায় কথাটা তার। অরিন্দমের দৃষ্টিতেও পড়ে ছবিটা। এবং সেইদিন সন্ধ্যার দিকে অরিন্দম এলো কুণালের ফ্ল্যাটে।

কাগজে তোর ফটোটা দেখেছিস কুণাল!

দেখেছি।

কিছুদিন একেবারে এখন গা ঢাকা দিয়ে থাক। পুলিশ যেন কোন মতেই তোর কোন হদিশ না পায়। তুই বরং কিছুদিনের জন্য কলকাতা শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যা কুণাল। তুইত এককালে ভাল অভিনয় করতিস—

কুণাল অরিন্দমের কথার কোন জবাব দেয় না। ভাবছে তখন সে, মনীষার চোখেও নিশ্চয়ই পড়েছে সংবাদপত্রে তার ফটোটা। মনীষা তাকে খুব ভাল করেই চেনে।

সে যদি পুলিশকে কোন ইনফরমেশন দিয়ে থাকে ইতিমধ্যে।

গা ঢাকা তাকে দিতেই হবে কিছুদিনের জন্য, এই শহরও তাকে ছাড়তে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রূপার কথা। সেই আদিবাসীদের আস্তানা। রূপা এবং তার বাপ মংরু সর্দার।

আরো দিন দুই পরে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে উঠে বসল কুণাল।

সম্পূর্ণ অন্য বেশে। এক বৃদ্ধ তীর্থ যাত্রীর বেশ। একমুখ কাঁচা পাকা দাড়ি- পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে নাগরা, মাথায় বিরাট এক গেরুয়া পাগড়ি, কাঁধে একটা ভারী কম্বল এবং একটা ঝোলা।

লক্ষ্ণৌ থেকে গাড়ি বদল করে কাঠগুদামের গাড়িতে উঠলো।

কাঠগুদাম স্টেশনে নেমে হাঁটা পথে অগ্রসর হলো।

দু'দিন দু'রাত্রি ধরে হেঁটে হেঁটে অবশেষে এসে পৌঁছাল রাস্তার খাদের কাছে। এবং মধ্যরাত্রির

অন্ধকারে ধীরে ধীরে—উৎরাই পথে নেমে চলে।

সবে তখন ভোরের আলো ফুটেছে।

রূপা একটা লোটায় দুধ নিয়ে ঝোপড়িতে ঢুকতে যাবে দেখতে পেল, কুণাল একটা পাথরের উপর চুপচাপ বসে আছে।

রূপা। ডাকল কুণাল।

কৌন—কাছে এলো রূপা, কৌন হো তুম!

রূপা, মুঝে পয়ছান্তি নেহি বহিন—

কৌন—ভাইয়া—

হ্যাঁ—তুমহারা হিঁয়া রহেঙ্গে হাম।

সাচ—

হ্যাঁ, বিলকুল সাচ। লেকেন-এ কেয়া পিনা তুমনে।

মংরু ওখানে ছিল না—পাশের গাঁয়ে দু'দিনের জন্য গিয়েছিল। রূপা একা।

রূপা—আমি এখানে পালিয়ে এসেছি বহিন। পুলিশ আমার পিছু পিছু আসছে, আমাব খোঁজ করে বেড়াচ্ছে।

কেন, পুলিশ তোমাকে খোঁজ করছে কেন?

আমি একজন ডাকাত।

ডাকু—ভাইয়া তুম ডাকু—

হ্যাঁ রূপা? তাই কলকাতা থেকে এখানে পালিয়ে এসেছি—চার পাঁচটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারে পুলিশ আমাকে খুঁজছে—আমাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা ইনাম!

ছোড় ও ফালতু বাত ভাইয়া! আমার কাছ থেকে কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।

কিন্তু তোমার বাবা।

বাবা—জানতেই পারবে না কখনো—তুমি এখানে আছো।

যদি জানতে পারে কোনমতে—

না, পারবে না, তুমি নিশ্চিত থাক ভাইয়া—

পরের দিন সন্ধ্যায় রূপার বাপ ফিরে এলো।

চার পাঁচটা দিন সে জানতেও পারল না ঐখানে রূপার ঘরে কুণাল আত্মগোপন করে আছে। কুণাল বলেছিল রূপাকে, পুলিশ যদি কোনক্রমে খবর পায় যে সে ওখানে আছে—দলবল নিয়ে এসে তাকে ধরে—হাতে হাত কড়া কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে—তারপর তাকে ফাঁসী দেবে।

রূপা আশ্বাস দেয় কুণালকে, ভাইয়া তোর কুছ ডর নেই—কেউ জানতে পারবে না, তুই এখানে আছিস।

রূপা সেই কারণেই সদা সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখত—কুণালকে ঘরের মধ্যে রেখেছে ওটা যেন কেউ না জানতে পারে—

বেঙ্গল পুলিশ ইউ.পি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিল, তারা যেন যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে কুণালের—তার ফটোও পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তারা আরো বলেছিল। একবার কিছুদিন আগে ঐ রাণীক্ষেত যাবার সড়কের ধারে নীচের এক আদিবাসী বস্তির মধ্যে কিছুদিন আত্মগোপন করেছিল কুণাল।

সেই সংবাদ পেয়ে পুলিশের গোয়েন্দারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কুণালকে, যেখানে যত বস্তি ও ঝোপড়ি আছে।

কিন্তু সর্বতোভাবে সাবধানতা রক্ষা করেও রূপা তার বাপের চোখের দৃষ্টি এড়াতে পারল না।

রূপার বাপ দেখে ফেলল একদিন ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে সে রাণীক্ষেতে গিয়ে পুলিশের ডেরায় সংবাদটা দিয়ে এলো।

পুলিশের বড়কর্তা উত্তর প্রদেশের চন্দন সিং কুণালকে ধরবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

এক অন্ধকার রাত্রে। রূপাদের আস্তানা আর্মি পুলিশের দল ঘিরে ফেলল।

রূপা গিয়েছিল বিকেলের দিকে ঝরণার জল আনতে। তার চোখে পড়ল দুজন আর্মড পুলিশ ঘোরা ফেরা করছে।

রূপা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠে দুজন আর্মড পুলিশকে তাদের ঐ তল্লাটে ঘোরাফেরা করতে দেখে।

সে তাড়াতাড়ি ঝোপড়িতে ফিরে এসে কুণালকে সংবাদটা দিল।

ভাইয়া—

কী।

পুলিশ।

কোথায় পুলিশ—

দেখে এলাম ঝরণার জল আনতে গিয়ে দুজন বন্দুকধারী পুলিশ ঘোরাফেরা করছে।

রূপার মুখ থেকে কথাটা শুনে কুণালও ভীত হয়ে ওঠে। তবে কি পুলিশ তার এই আত্মগোপনের জায়গাটার সন্ধান পেয়েছে।

কি হবে ভাইয়া—

কুণাল হাসলো, আমাকে অত সহজে ওরা ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি ভাবছি—

কি?

ওরা এ জায়গার সন্ধানে পেল কি করে, তোমার বাবুজী—

না, না ভাইয়া বাবুজী জানবে কি করে, তুমি এখানে আছো—

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে রূপা—সর্দার জানতে পেরে গিয়েছে যে আমি এখানে আছি। আমাকে ধরিয়ে দিতে পারলে জানতো পাঁচ হাজার টাকা সরকার ইনাম দেবে।

পাঁচ হাজার টাকার জন্য বাবুজী—

পাঁচ হাজার টাকা ত কম নয় বহিন।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এমন হতেও পারে—কয়েকদিন আগে বাবুজী রাণীক্ষেত গিয়েছিল।

রাণীক্ষেত গিয়েছিল সর্দার?

হ্যাঁ ভাইয়া—তাছাড়া, কাল বাবুজীর জামাটার পকেটে অনেক নোট দেখেছি। সব শ' রূপেয়া নোট, ভাবছিলাম বাবুজী অত টাকা পেল কোথায়?

কুণালের মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। সে বুঝতে পারে সর্দারেরই কাজ।

আমার থলিটা কোথায় রূপা?

কি হবে থলিয়া দিয়ে ভাইয়া।

নিয়ে এসো থলিয়াটা।

মাচানে এক পাশে উপরে রূপা থলিয়াটা লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা এনে কুণালের হাতে দিল। থলিয়ার ভিতর থেকে পিস্তলটা বের করল কুণাল।

আয় রূপা, তোমাকে শিখিয়ে দিই গুলি ভরে কি করে—

ম্যাগাজিনে গুলি ভরে দেখিয়ে দিল কুণাল রূপাকে কেমন করে পিস্তল লোড করতে হয়। থলির মধ্যে অনেক কার্তুজ ছিল—এক মুঠো কার্তুজ থলি থেকে বার করে রূপার দিকে তাকিয়ে বললে, এগুলো রাখ রূপা।

এ দিয়ে আমি কি করবো।

দরকার হলে গুলি ভরে গুলি চালাবে।

আমি কি পারবো ভাইয়া।

কেন পারবে না, খুব পারবে। কি এমন কঠিন কাজ। গুলি চালান খুব সোজা।

সেই রাত্রেই এক দল আর্মড পুলিশ চন্দন সিংয়ের নেতৃত্বে ওদের ঝোপড়ি ঘিরে ফেলল। ব্যাপারটা রূপাই প্রথমে জানতে পারে।

ঘুমায়নি কুণাল। জেগে বসেছিল শ্রবণশক্তিকে সজাগ করে।

চেষ্টার সহ পা টিপে টিপে সতর্কভাবে রূপা ঘরের মধ্যে এলো। ডাকল, ভাইয়া—

কি।

পুলিশ ঝোপড়ি ঘিরে ফেলেছে—

জানি, শোন রূপা, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—

কি কাজ—

আমি রাস্তাঘাট এ তল্লাটে সব চিনি—অন্ধকারেও আমি চিনে চলে যেতে পারব, আমি পালাচ্ছি—

যদি তোমার কিছু বিপদ হয় ভাইয়া—

কোন বিপদ হবে না। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমি বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জানালা পথে তুমি গুলি চালাবে।

গুলি চালাবো।

হ্যাঁ—ওরা ভাববে আমিই ওদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছি—ওরাও গুলি চালাবে—আর সেই ফাঁকে আমি পালাবো।

পারবে পালিয়ে যেতে?

পারবো, এখন তুমি পারবে কিনা তাই বলো।

পারবো ভাইয়া—ঠিক পারবো—

অন্ধকারে পাহাড়ী রুক্ষ কঠিন পথ ধরে ছুটে চলে কুণাল। ছোট বড় পাথর ও বুনো কাঁটা গাছে সমাকুল পথে বার বার হোঁচট খায়।

কানে এলো তার গুলির শব্দ—কিছু দূরে একবার পরই, মুহুর্মুহু গুলি চলেছে। গুলির শব্দে জায়গাটায় যে ঝড় বয়ে চলেছে।

জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে রূপা পিস্তল থেকে গুলি বর্ষণ করে চলেছে। হঠাৎ সর্দার ঐ সময় ঘরের দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল, চিৎকার করে ওঠে সর্দার, রূপা—

কে! বাবুজী- -পিস্তল হাতে রূপা বাপের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সেই বাবুটি কই—

নেই।

নেই, কোথায় গেল! পালালো কি করে?

তাহলে তুমি—তুমিই বাবুজী—

হাঁ, বেটি অনেক টাকা ইনাম দেবে সরকার বাহাদুর—

ছিঃ ছিঃ বাবুজী—টাকার জন্য একজন আশ্রিতকে তুমি পুলিশের হাতে তুলে দিতে চলেছো!

থাম তুই—ভুল বুঝিস না—

কিন্তু আমি তা হতে দেবো না।

রূপা।

না—নেহি নেহি বাবুজী? তুমি এ ঘর থেকে চলে যাও—- নয়ত তোমাকেই আমি গুলি করবো।

রূপা। চিৎকার করে ওঠে সর্দার।

রূপা যেন আর রূপা নেই—কিন্তু এক বাঘিনী! তার দুচোখের দৃষ্টিতে আগুনের হল্কা।

সর্দারের মনে হয় এতো তার বেটি রূপা নয়—যার বাবুজী অন্ত প্রাণ—

আমার হাতে যতক্ষণ এই পিস্তল আছে—কারো সাধ্য নেই আমার ভাইয়াকে ধরে—

তুই কি পাগল হলি রূপা! ফেলে দে—পিস্তল ফেলে দে।

না, কভি নেহি।

কোন পথে পালাল বাবু?

সে চলে গিয়েছে—অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

ওদিকে ততক্ষণে ফায়ারিং করতে করতে রাইফেল হাতে আর্মড পুলিশ পাঁচ-সাতজন ঝোপড়িটাকে এসে ঘিরে ফেলেছে।

রূপা জানালা পথে আবার গুলি চালায়।

দুম্—দুম—দুড়ুম।

গুলির শব্দ কেবল।

সাহেব থাম—থাম—চিৎকার করে থামতে বলে চন্দন সিংকে সর্দার।

আমি সর্দার। চিড়িয়া পালিয়েছে—সর্দার বললে।

চন্দন সিং কয়েকজন আর্মড পুলিশকে অর্ডার দিল, ডাকাতটা পালিয়েছে—দেখ দেখ খুঁজে দেখ—কত দূর পালাবে এই অন্ধকারে পাহাড়ী পথে। হারি আপ!

সঙ্গে কুকুর ছিল ওদের—

চন্দন সিং-এর নির্দেশে সর্দার কুণালের একটা ব্যবহৃত জামা নিয়ে আসে।

কুকুরটাকে সেই জামা শোঁকাতেই ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে সামনের দিকে ছুটে যায়।

বার বার হুমড়ি খেয়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় কুণাল। কোন মতে উঠে দাঁড়ায়—তবু ছোটা যায় না।

তার কানে ভেসে আসে বাঘের মত কুকুরের ডাক!

কুণাল প্রমাদ গোণে। এবার সে ছুটতে শুরু করে। পরিশ্রমে ওর হাপরের মত বুকটা ওঠা নামা করছে, আকণ্ঠ পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে।

একটা আতঙ্কে যেন সর্বাঙ্গ ঝিম ঝিম করছে।

পা দুটো ক্রমশঃ যেন ভেঙে আসছে।

সঙ্গের সাথী পিস্তলটাও নেই—যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে কারো সঙ্গে।

যা গুলি ছিল সব ফুরিয়ে গেল রূপার—আর গুলি নেই।

আর ঠিক সেইসময় একটা গুলি এসে ওর ডান কাঁধে লাগল।

পড়ে গেল রূপা আহত হয়ে, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে—বুক পিঠ রক্তের ধারায় ভিজে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো রূপা। কিন্তু পারল না।

আবার মাটিতে পড়ে গেল।

ভারী জুতোর মচ মচ শব্দ কানে এলো রূপার।

চন্দন সিং এসে ঘরে ঢুকল।

হাতে তার গুলি ভরা পিস্তল।

পিছনে পিছনে রূপার বাবা সর্দার।

চন্দন সিং মচ মচ শব্দে রূপার সামনে এসে দাঁড়াল।

কোথায় সে লোকটা—কোন পথে পালিয়েছে?

জানি না আমি।

বল্ কোথায় সে।

জানি না। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে রূপা।

রূপা—বিটিয়া—চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সর্দার হাউ হাউ করে।

রূপার ঠোঁট দিয়ে আর কোন শব্দ বের হল না।

পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে রূপা রক্তে ভেজা মাটির পরে।

শুধু একবার অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করে রূপা—ভাইয়া।

পাগলের মতই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে তখনো কুণাল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। পিছনে শোনা যাচ্ছে কুকুরের ডাক। ডাকটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে কাছে আরো কাছে। একটা পাহাড়ী নদী ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে। কুণাল নদীর ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পারছে না। আর সে ছুটতে পারছে না। তার সব শক্তি শেষ।

কুকুরের ডাকটা কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

নদীর ঠাণ্ডা জলে মুখ ডুবিয়ে দিল কুণাল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘের মত কুকুরটা এসে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কুণালকে ধরে উত্তর প্রদেশের পুলিশ কলকাতায় পাঠিয়ে দিল। কুণাল এখন কলকাতা পুলিশের হাতে।

হাওড়ার এস. পি. কুণালকে নিয়ে এলো ডি, এম-এর বাংলোয়।

কুণালের দিকে তাকিয়ে হাওড়ার ডি. এম, মনীষা চক্রবর্তী যেন পাথর হয়ে যায়।

সারা মুখে দাড়ি।—রুক্ষ তৈলহীন জট পাকানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ধূলো কালি মাখা। পরনের পোশাক ছেঁড়া, ধুলো কাদা মাখা।

কুণাল। ডাকল মনীষা।

একে আপনি চেনেন মিস?

একদিন চিনতাম। মনীষা ডাকলো—কুণাল।

আমি কুণাল নই, পদ্মনাথ মিশ্র আমার নাম, কুণাল বললে।

কুণাল....

বললাম তো আমার নাম পদ্মনাথ মিশ্র।

কুণালকে নিয়ে চলে গিয়েছে।

মনীষা তখনো চেয়ারটার উপরে বসে।

দু'ফোঁটা অশ্রু চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

মনীষা ভাবছিল, কুণালের মত একটি যুবককে কেন ডাকাতির লাইনে যেতে হলো।

রাত আরো হয়েছে।

মনীষার তার বসবার ঘরে বসে ডাইরী লিখছিল।

কুণাল, তোমাকে আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। ডাকাত বলে সেই তোমাকে ঘৃণা করুক, আমি ঘৃণা করতে পারছি না তোমাকে। ইচ্ছা ছিল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, কেন এ পথ ধরলে তুমি!

কিন্তু পারলাম না। এ জীবনে আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি জানি না। কিন্তু তোমাকে আমি ভুলতে পারবো না।

দূর বলাকা

গ্রীষ্মের বেলাটুকু ফুরিয়ে গিয়েছে কখন!

কখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমেছে বলাকা জানতেও পারেনি।

কখন বাইরের সেই অন্ধকার একটু একটু করে ঘরের মধ্যেও এসে বিস্তৃত হয়েছে তাও জানতে পারেনি বলাকা।

ছোট বাগানের একধারে কাঠমল্লিকার ঝোপটা প্রথম দিনই এই বাড়ি দেখবার সময় নজরে পড়েছিল বলাকার—তারই গন্ধ ঘরের অন্ধকারে মধ্যে মধ্যে বাতাসে বোধহয় ছড়িয়ে পড়েছে।

কখন চোখের কোণ দুটো বলাকার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—সব ঝাপসা।

বলাকা সোফাটার উপরে এখনো তেমনিই বসে আছে।

হাতে ধরা সেই চিঠিটা।

একবার—মাত্র একবারই পড়তে গিয়েছিল চিঠিটা বলাকা—তাতেই চিঠির প্রতিটি অক্ষর বলাকার বুকের মধ্যে যেন রক্তের আখরে লেখা হয়ে গিয়েছে—বাকী জীবনের জন্যই বুঝি লেখা হয়ে গিয়েছে।

পারল? পারল রাজেশ তাকে এমন একটা চিঠি লিখতে।

একবারও কি হাতটা কাঁপল না তার।

নিশ্চয়ই কাঁপেনি। কই কোথাও ত ঐ চিঠির অক্ষরগুলোর মধ্যে একটুকু কাঁপনের চিহ্ন নেই। স্পষ্ট।

স্পষ্ট হস্তাক্ষর।

কাঁপেনি। এতটুকুও হাত কাঁপেনি রাজেশের।

কেমন করে লিখলে অমন চিঠিটা রাজেশ, কেমন করে লিখলে।

পারলে লিখতে চিঠিটা তোমার মোহরকে?

কিন্তু আর ভেবেই বা কি হবে।

চিঠিটাত কিছু আর একটা স্বপ্ন বা মিথ্যা হয়ে যাবে না!

তার জীবনের বোধহয় ঐ শেষ পত্র।

ভুলে যেতে বলেছে তাকে রাজেশ। বলাকা ভুলে যেও আমাকে।

ভুলে যাবে।

কেমন করে ভুলে যাবে রাজেশকে বলাকা।

দীর্ঘ আড়াইটা বছর ধরে বক্ষের নিভৃতে যে ভালবাসা—যে পরিচয়---যে ঘনিষ্ঠতা তাদের গড়ে উঠেছে—কেমন করে বলাকা তা ভুলে যাবে আজ?

কিন্তু ভুলতেই ত হবে।

বলাকা অন্ধকারেই একবার নড়ে চড়ে বসল সোফাটার উপরে।

হাতে ধরা চিঠিটা মৃদু একটা শব্দ তুললো।

মা—

কে? ও রতন!

ঝাপসা অন্ধকার দরজার দিকে তাকাল বলাকা।

রতন দরজার উপর দাঁড়িয়ে।

বেচারী সত্যিই যেন কেমন বোকা বনে গিয়েছিল। সেইতো চিঠিটা এনে দিয়েছিল বলাকার হাতে। চিঠিটা পাওয়ার পরই ত মা হঠাৎ কিরকম হয়ে গেল।

ঘরের আলোটা জ্বেলে দেবো মা।

আলো?

অনেকক্ষণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে মা। আলোটা জ্বেলে দিই---

বলাকা কোন জবাব দেয় না।

রতন ভাবে হয়ত বলাকার মৌনতাই তার সম্মতির লক্ষণ। সে ঘরে ঢুকে সুইচটা টিপে দিল।

আলোয় ঘরটা ভরে গেল।

রতন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ পরে শিথিল অলস দৃষ্টিতে বলাকা ঘরের চারিদিকে তাকাল।

সেই সকাল থেকে নিজে হাতে ঘরটা সাজিয়েছে সে। এই ঘরটাই তাদের শোবার ঘর হবার কথা।

নতুন কেনা দুটি সিংগল বেড।

নতুন ডানলো পিলো—নতুন চাদর—নতুন বালিশ—কটা দিন ধরে ঘুরে ঘুরে মার্কেটিং করেছে বলাকা, ঘর দোর সাজাবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন বেছে বেছে পছন্দ করে কিনেছে বলাকা।

দুটি সিংগল বেডের মধ্যে থাকে ছোট একটি টেবিল।

টেবিলের পরে জাপানী ট্রানজিসটারটা রাখা—তার পাশে একটি জাপানী ফুলের ভাস ও ছোট একটি টাইমপিস।

তার পছন্দ করে কিনে আনা জাপানী সিগারেট কেসটা · একটা দেয়াশালাই।

বাক্সটা খুললেই কেমন পিওনোর সুর বাজে।

টুং টাং টুং---ভারি মিষ্টি।

শিয়রের ধারে—ঠিক মাথার উপরে---নজর পড়ল বলাকার।

বম্বে ফটো ষ্টোর থেকে তোলা গত বছরে—রাজেশের জন্মদিনে ওদের যুগল ফটো।

রাজেশ! হাসচো তুমি।

হাসো। যত খুশি হাসো। যত পারো হাসো।

দিন দশেক আগে রাজেশ হঠাৎ ফোনে জানিয়েছিল তাকে জরুরী রেকর্ডিংয়ের জন্য হঠাৎ বোম্বাই যেতে হচ্ছে—সেখান থেকে মাদ্রাজও যেতে হবে---ফিরতে দশ পনের দিন হতে পারে।

অত্যন্ত অভিমান হয়েছিল বলাকার কিন্তু তবু যেতে দিতে হয়েছিল।

উপায় কি। কাজ---কাজই।

আবার ভেবেছিল ঠিক আছে বিয়ের আগে রাজেশের হাতের কাজগুলো সেরেই নিক। তারপর বিয়ের পর একটা মাস কিছুতেই কোথাও যেতে দিচ্ছে না তাকে বলাকা।

আজ সেই দশ দিনের দিন।

এই কয়দিনে সে নিজের খুশি মত পছন্দ মত ঘর দোর সাজিয়েছে-

সাজানো গোছানো আজই শেষ করেছে সে।

ভাবছিল আজই তার পূর্ণ বিশ্রাম।

বা দু চারদিনের মধ্যেইত রাজেশ এসে পড়বে। কিন্তু না রাজেশ এলো না---এলো তার চিঠি—শেষ চিঠি। যে চিঠিতে সে জানিয়েছে তাকে ভুলে যেতে।

একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

কে এল। রাজেশ কি?

তবে কি চিঠিটা নিছক তার একটা কৌতুক মাত্র।

উঃ কি ভয়ই দেখাতে পারে!

ছুটে গেল বলাকা জানালার ধারে।

রতন গেট খুলে দিয়েছে---কিন্তু ও কে! গেটের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় বলাকা। ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়েই—রাজেশ ত নয় --উৎপল।

উৎপল বোস—পাইলট উৎপল বোস।

বলাকা সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজেকে একটা নাড়া দিয়ে সচেতন করে নেয়।

না। উৎপলকে সে জানতে দিতে পারে না---তাদের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হলো না, কিন্তু কি করবে

এখন সে?

উৎপল এগিয়ে আসছে—

বলাকা ঘরের চারিদিকে তাকাল।

ঠিক সেই সময় রতন এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াল, মা—

কে?

আমি রতন। উৎপল বাবু এসেছেন।

বাইরের ঘরে বসা। আমি আসচি।

রতন চলে গেল।

॥ ২ ॥

উৎপল বোস।

ঐ উৎপল বোস তাকে একদিন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল।

একই প্লেনে দু'জন প্রায় ছয় মাস কাজ করেছিল।

বোম্বে টু ক্যালকাটা—ক্যালকাটা টু দিল্লী—দিল্লী টু ক্যালকাটা। উৎপল জানত না যে তারই কিছুদিন আগে বলাকার মন রাজেশের কাছে বাঁধা পড়েছে।

সেদিনটা ছিল বলাকার অফ্-ডে।

মেসে শুয়েছিল নিজের ঘরে—

ভৃত্য এসে সংবাদ দিল, উৎপল বাবু এসেছেন।

হঠাৎ তার মেসে উৎপল।

একটু যেন অবাকই হয়েছিল বলাকা। তবু তাড়াতাড়ি সাজ গোজ করে বের হয়ে এসেছিল।

মিঃ বোস যে—

আপনি আজ ফ্রি আছেন! উৎপল শুধায়।

তা আছি—

চলুন—

কোথায়?

চলুন না বাইরে একটু ঘুরে আসি!

বলাকা তখনো ব্যাপারটা অনুমান করতে পারেনি।

তাই বলেছিল, বসুন আপনি—আমি তৈরী হয়ে আসচি—

ট্যাক্সী নিয়ে একটা দুজনে চলে গিয়েছিল ময়দানে।

শীতের শেষে সবে বসন্তের শুরু—

তাহলেও বাতাসে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব রয়েছে তখনো।

নামুন—চলুন মাঠে—

কি ব্যাপার বলুন ত মিঃ দত্ত—

চলুন না—

কিন্তু—

ভয় করচে নাকি?

বাঃ ভয় করতে যাবে কেন?

তবে চলুন—

অন্ধকারে মাঠের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে উৎপল ডাকে—

মিস্ সেন—

কিছু বলবেন?

হ্যাঁ—তার পরই একটু হেসে বলেছিল, ঠিক কি ভাবে কথাটা শুরু করা উচিৎ বুঝতে পারছি না-

সেই মুহূর্তেই বলাকা ব্যাপারটা যেন অনুমান করতে পেরেছিল। একটা অজ্ঞাত ভয়ে তার বুকের ভিতরটা তখন কাঁপতে শুরু করেছে।

মিস্ সেন আপনাকে—

চলুন মিঃ বোস—ফেরা যাক—বলেই বলাকা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, কারণ সে ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে।

শুনুন—আমাকে কথাটা শেষ করতে দিন—

জানি আপনি কি বলবেন—

জানেন!

হ্যাঁ—কিন্তু তা হবার নয়—

কেন?

আমি আর একজনের কাছে বাগদত্তা।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল উৎপল বোস অতঃপর।

চলুন—ফেরা যাক—

হ্যাঁ—চলুন—

একটা লম্বা নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এসেছিল বলাকার।

তারপর অবিশ্যি অনেক দিন পরে—দিন পনের আগে উৎপল বোসকে একটা চিঠিতে তার রাজেশের সঙ্গে আসন্ন বিবাহের কথাটা জানিয়েছিল বলাকাই।

বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে কাপড়টা বদলে নিল বলাকা—

উৎপলকে জানতে দিতে ত সে পারে না ব্যাপারটা!

হাসি মুখেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

রতনকে চায়ের কথা বলে পাশের ঘরে এসে ঢুকলো হাসতে হাসতে বলাকা।

উৎপল বাবু যে—

এই যে মিস্ সেন—আসুন—উঠে দাঁড়ায় উৎপল। হাতে তার একটা প্যাকেট।

আপনার চিঠি আমি দিন পাঁচেক হলো পেয়েছি—

পেয়েছেন?

হ্যাঁ—Congratulation—কিন্তু আপনাদের বিয়ের সময় থাকতে পারচি না—

কেন?

আমাকে দিন দশেক হলো ফরেন রুটে দিয়েছে—ইন্দোনেশিয়া—হংকং—সিংগাপুর—জাপান—তাই আমার ছোট্ট Presentationটা—

বলতে বলতে হাতের প্যাকেটটা খুলে ফেললো উৎপল বোস। একটা ভেলভেটের কেস। নিশ্চয়ই কোন জুয়েলারী?

ফ্যাল ফ্যাল করে কেসটার দিকে তাকিয়ে থাকে বলাকা।

নিন—

বলাকা নীরব। পাথর—

নেবেন না?

দিন—

হাত বাড়াল বলাকা।

বোতাম টিপে বাক্সটা খুলে ফেলল উৎপল বোস—ঘরের আলোয় ঝিলমিল করে উঠলো—জড়োয়ার একটি নেকলেশ।

বলাকার চোখদুটো যেন ধাঁধিয়ে যায়।

আশ্চর্য!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ঠিক এক বছরের কিছু বেশী আগেকার একটি দিনের কথা।

ওর সেটা ছিল জন্মদিন।

ও তখন দিল্লীতে। নিজেরও মনে ছিল না সেদিন তার জন্মদিন। সন্ধ্যার কিছু পরে—ডিউটি দিয়ে ও সবে ফিরেছে দিল্লীতে কুতুবে ছোট ফ্ল্যাটটায়। কিছুদিন আগে মাত্র ঐ দু'কামরাওয়ালা ফ্ল্যাটটা ও নিয়েছে।

ওকে বেশীর ভাগ সময় তখন দিল্লীতেই হল্ট্ করতে হয় বলে এবং ওদের এয়ারলাইন্সের মেসে রাজেশের এসে দেখা করতে অসুবিধে হয় বলেই বাইরে ঐ ফ্ল্যাটটা বলাকা নিয়েছিল।

রাজেশকে কথাটা জানিয়েও দিয়েছিল এক রাত্রে বম্বেতে ট্রাংককল করে—রাজেশ তখন বম্বেতে।

এধারে এলে কিন্তু অন্য কোথাও না উঠে সোজা আমার ফ্ল্যাটেই এসে উঠবে। আমি না থাকলেও তোমার অসুবিধা হবে না।

নেপালী আয়া কাঞ্চী থাকে—সেই তোমার দেখা শোনা করবে।

রাজেশ ঠাট্টা করে বলেছিল ফোনে, যদি না আমায় চিনতে পারে—বলে নেহি সাব্—নো এ্যাডমিশন!

কিন্তু ও তা বলবে না। জবাব দিয়েছিল হাসতে হাসতে বলাকা।

বলবে না।

হ্যাঁ গো মশাই হ্যাঁ—ও তোমায় খুব ভাল করেই চেনে?

চেনে?

হ্যাঁ—আর তাছাড়া ও তোমার হিন্দি গানের একজন মস্তবড় ভক্ত তা জান? আমার ঘরে তোমার ফটোটা দেখে দেখে ও এমন ভাবে তোমায় চিনে ফেলেছে যে—উদগ্রীব হয়ে আছে—মোলাকাতের জন্য।

বল কি?

ওইত আমার মুস্কিল—

মুস্কিল?

নয়—বিশ্ব-দুনিয়ার আপনার জন তুমি—সবার প্রিয় গায়ক রাজেশ চৌধুরী সত্যি হিংসা হয়—

হিংসা! কেন গো?

হবে না! কত মেয়ে যে আমার মত তোমাকে মনে মনে মন দিয়ে বসে আছে—

মাভৈ দেবী এখন আমার কেবল তোমারই কাছে বাঁধা—

বলতে বলতে গেয়ে উঠেছিল রাজেশ ফোনেই—

ওগো হৃদয়বনের শিকারী
মিছে ভাবে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারী।
সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যেজন মরে আছে
নয়নবানের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী।।

॥ ৩ ॥

রাজেশ হঠাৎই সেদিন এসে হাজির হয়েছিল দিল্লীতে তার ফ্ল্যাটে।

কিছু জানা নেই—কোন সংবাদ নেই—

হঠাৎ ফ্ল্যাটের দরজার বেলটা বেজে উঠেছিল।

ও তখনো জামাকাপড় ছাড়েনি—সবে ফ্ল্যাটে ফিরেছে—আরাম চেয়ারটার উপর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে—

কাঞ্চী ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

কে এলো আবার এ সময়ে? কান পেতে থাকে বলাকা।

মেমসাব্ হ্যায়—

বাবুজী—হ্যাঁ হ্যাঁ-হ্যায়

রাজেশের গলার স্বর ততক্ষণে ঐ ঘরে বলাকার কর্ণকুহরে পৌঁছে গিয়েছে।

সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেছে—

রাজেশ—

কাঞ্চী বলছে, চলিয়ে বাবুজী—অন্দর চলিয়ে—মেমসাব্ আভি ডিউটিসে আয়া—

চলিয়ে—অন্দর চলিয়ে—

তুমে হামকো পয়চানা?

জরুর! আইয়ে—

রাজেশ এসে ঘরে ঢুকল।

তুমি!

রাজেশ গেয়ে ওঠে :

ওই কথা বলো সখী, বলো আর বার—
ভালোবাস মোরে তাহা বলো বার বার।

ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে রাজেশের গলা ধরে তার বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল বলাকা, বাসি-বাসি-বাসি-ভালোবাসি-ভালাবাসি।

আজ কি আমি না এসে পারি—রাজেশ বলেছিল, শুধু ভাবনা ছিল যদি দেখা না হয়—তাহলে—

এই তো ডিউটি থেকে ফিরেছি—

পরশুর আগের দিন ফোনে তোমার সঙ্গে কলকাতা থেকে রাত্রে কথা বলতে বলতে মনে মনে ঐরকমই একটা ক্যালকুলেশন করেছিলাম—হয়ত আজ সন্ধ্যায় তুমি ফ্রিই থাকবে।

আমাকে বলনি কেন যে তুমি আসবে?

দাঁড়াও—বলচি—

বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কেস বের করে রাজেশ—লাল ভেলভেটের কেস-

কি ওতে—

চোখ বোজ—

চোখ বুজবো?

হ্যাঁ—বোজ—Close your eyes—বন্ধ করো দুটি চক্ষু—

বন্ধ করলাম—এই—হাসতে হাসতে বলে বলাকা।

গলায় কি যেন হারের মত পরিয়ে দিল রাজেশ, তারপর বললে, ঐ সামনের আয়নার দিকে তাকিয়ে চোখ খোল—

চোখ মেলতেই ঝলমল করে উঠেছিল তার গলায় একটা জড়োয়ার নেকলেস—

একি এ কেন?

তোমার আজ জন্মদিন না?

জন্মদিন হ্যাঁ—সত্যিই ত—বলাকার মনে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

সারাটা রাত সেরাত্রে জেগেছিল ওরা। ও আর রাজেশ—

হঠাৎ যেন বিমূঢ় বিবশ হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য জন্মদিনের সেই সন্ধ্যাটির কথা বিদ্যুৎচমকে মনে পড়ায় বলাকা।

অতীতের মধ্যে যেন হারিয়ে গিয়েছিল—

মিস—সেন—

হ্যাঁ—

কি হলো?

নাত—কই কিছু নাত? কিন্তু—

কি?

এত দামী Present আনতে গেলেন কেন?

উৎপল মৃদু হাসে—

বসুন—দাঁড়িয়ে কেন?

রতন এসে ট্রেতে করে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

প্রায় মিনিট পনের কুড়ি ধরে হেসেছিল—গল্পও করেছিল বলাকা উৎপলের সঙ্গে তার পরে।

চলে গেল তারপর এক সময় বিদায় নিয়ে উৎপল।

বলাকা বেডরুমে এসে ঢুকল।

আবার তাকালো ঘরের চারিদিকে—

কাঠমল্লিকার উগ্র গন্ধটা বাতাসে ভাসিয়ে আনছে।

তার পরই ঘরের কোণে গিয়ে টেবিলটার সামনে বসে চিঠির প্যাড্ ও কলমটা তুলে নিয়েছিল

বলাকা—

রাজেশ—

কি লিখবে রাজেশকে সে?

লিখবার কিই বা আর আছে—

লিখবার যা ছিল সবই ত শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে?

তবু ত লিখতেই হবে।

লিখে চিঠিটা আজই ডাকে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে!

রাত কটা হলো?

সামনের টেবিলের পরে রাখা হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল বলাকা—

রাত সোয়া আটটা মাত্র।

এমন কিছু রাত হয়নি—

কি করবে এখন বলাকা? চারটে দিন—চারটে রাত ঐ বাড়ির মধ্যেই যেন ভূতের মত কাটিয়ে দিল বলাকা। তারপর অনেক ভেবে—অনেক সময় নষ্ট করে একটি লাইনের বেশী কিছুই লিখতে পারে না বলাকা।

পাঁচ দিনের দিন রাত্রে রতনকে ছুটি দিয়ে দরজায় তালা দিয়ে সেই বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছিল বলাকা।

সোজা গিয়ে একটা হোটেলে উঠেছিল রাত্রির মত।

সেখানে থেকে পরের দিন সকালেই গিয়ে এয়ার ইনডিয়া অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করে—

ছুটির তার প্রয়োজন নেই—সে আজই জয়েন করবে—

মিঃ কুলকারনীত অবাক, সেকি বিয়ের জন্য তুমি ছুটি নিয়েছিলে মিস সেন?

হ্যাঁ—মানে ওকে হঠাৎ ফরেনে একটা জরুরী কনট্রাকট্ নিয়ে যেতে হলো—তাই বিয়েটা পিছিয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

তিন মাস ছুটির এক মাসও গেল না—বলাকা আবার চাকরিতে এসে জয়েন করল।

আর চাকরি করবে না বলেই না ইস্তফা-পত্রটা পাঠাবার আগে তিন মাসের ছুটি নিয়েছিল—ইচ্ছা করলে অবিশ্যি তিন মাস পরেই চাকরিতে আবার জয়েন করতে পারত, কিন্তু তারও আর প্রয়োজন যখন রইল না—তখন কি হবে ছুটি নিয়ে!

অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটা দুর্বিসহ পাষাণভারের মত তার বুক চেপে বসেছিল—

নতুন সাজানো গোছানো রিজেন্ট পার্কের ফ্ল্যাট বাড়িটার মধ্যে মনে হচ্ছিল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আশা ছিল রাজেশ দশ পনের দিনের মধ্যেই আসবে। তবু কটা দিন যে একা একা সেই ফ্ল্যাট বাড়িটার মধ্যে কি ভাবে কেটেছে, দিন ও রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত তা বলাকাই জানে।

যেখানে ভেবেছিল মুক্তি আর আনন্দে হাসিতে গানে নতুন এক স্বর্গ রচিত হবে সেখানকার বাতাসে নিশ্বাস নিতেও যেন বলাকার কষ্ট হচ্ছিল।

তবু কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি হঠাৎ চিঠিটা পাওয়ার পর বলাকা ঐ পাঁচটা দিন।

চোখের কোণ দুটো জলে ভরে এল বম্বে এয়ারপোর্টে দূরপাল্লার ৭৪৭জেট বিমানের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে।

চাকরিতে ইস্তফা দেবে নিজেই স্থির করেছিল বলাকা!

কারণ রাজেশ তাকে কোন পরামর্শ দেয়নি—যদিও বলাকা জানত রাজেশ চাইবে না সে আর চাকরি করে।

কাজেই সে-ই নিজে থেকে মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল চাকরি ছেড়ে দেবে।

এবং মনস্থির করবার পর দিল্লী থেকে ফোনে এক রাত্রে কথাটা বলাকা জানিয়েছিল রাজেশকে।

রাজ, স্থির করে ফেলেছি—জানো।

অপর প্রান্ত থেকে রাজেশের গলা ভেসে আসে, কি স্থির করেছ?

চাকরি আর করব না।

তাই নাকি! রাজেশ শুধিয়েছিল।

প্রথমটায় কিন্তু বলাকা লক্ষ্য করেনি রাজেশের গলায় সেদিন কোন খুশির সাড়া বা অনুসন্ধিৎসা ছিল না।

হ্যাঁ—খুশি হওনি তুমি?

কি মনে হয় তোমার?

জানি তুমি খুশি হয়েছ।

তার পরই সে রাত্রে ফোনে রাজেশ যে কথাগুলো বলেছিল বলাকাকে, পরে—অনেক পরে মনে হয়েছিল সে রাত্রের কথাগুলো রাজেশের কেমন যেন বেসুরোই ছিল।

নির্বোধ সে, তাই ধরতে পারেনি।

রাজেশ পরক্ষণেই বলেছিল, পাঁচ বছরের অভ্যাস....মন কেমন করবে না তো? তাছাড়া অত তাড়াহুড়োরই বা কি ছিল।

বা, মন কেমন করবে কেন! যা করতেই হবে তা করে ফেলাই তো ভাল।

না করলেই হল।

না না,—বলাকা অতঃপর বলেছিল, একটুও মন কেমন করবে না, পাঁচ বছর ধরে কেবল আকাশে উড়ে উড়ে আজ মনে হচ্ছে সতিাই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম—এবারে মাটির বুকে নীড় রচনা।

কিন্তু ওড়ার যে একটা নেশা আছে।

তা আছে হয়ত কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দ আকাশ থেকে ঝড়ে পড়া শিশির বিন্দুগুলি—ঘাসের শীর্ষে শীর্ষে এই মাটির বুকে, তার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে—তার পরই একটু থেমে বলাকা বলেছিল।

তাছাড়া সাজাতে গোছাতে সময় চাই না—তাই কালই একটা দরখাস্ত করে দিচ্ছি—

দরখাস্ত! কিসের?

কি গো তুমি—ছুটির গো ছুটির—ছুটি চাই না, প্রথমত একটা মনের মত বাসা ঠিক করা—তোমাকেও তো বলে বলে গত দু'মাসে হার মেনেছি। তারপর বাসা একটা পেলেই ত হলো না—সেটাকে মনের মত করে সাজানো।

রাজেশ অপর প্রান্তে চুপ করেই ছিল তখন।

বলাকাই অনর্গল বকে চলেছিল, তোমার পছন্দের নমুনা তো আমার জানা আছে—নিজে আমি ঘুরে ঘুরে একটি একটি করে পছন্দ মত জিনিস কিনব—তারপর—নিজের হাতে সাজাব আমাদের ছোট নিরালা গৃহখানি—এই রাজ, শোন—? তুমি কিন্তু আমি না ডাকা পর্যন্ত নতুন বাসায় আসতে পারবে না।

রাজেশ অপর প্রান্তে চুপ।

I will give you a surprise—দেখো—তোমাকে বলতেই হবে তখন কেমন সুন্দর করে সাজিয়েছি আমাদের ঘর।

রাজেশ তখনো চুপ কিন্তু সেটা যেন বলাকার খেয়ালই হয় না।

ভাল কথা, শোন—তুমি কিন্তু এখন কিছু খরচ করতে পারবে না, all expenses mine! ঘর সাজাব আমার এই ক'বছরের চাকরির জমানো টাকায়।

তোমার বিয়ের জোড়—আমার বিয়ের বেনারসী সব আমি কিনব, কেবল তুমি দয়া করে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে টোপর মাথায় দিয়ে বসবে বুঝেছো হাঁদারাম—।

তবে একটা কথা—গোড়ের মালা—বেলের নয় জুঁইয়ের মালা তুমি কিনে আনবে। শোন—আমি কাল পরশুই তোমার নামে একটা চেক পাঠাচ্ছি—আমার কলকাতার ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুমি তুলে রাখবে—পরশু টাকাটা রেখার ওখানে নিয়ে আসবে। কেমন?

বেশ—

সেই মতই বলাকা চেক পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তারপর ছুটির দরখাস্ত পেশ করে ছুটি মঞ্জুর হয়েছে শুনেই সে ফ্লাই করে কলকাতায় চলে এসেছিল।

মনে মনে স্থির করে রেখেছিল—বরাবর যেমন কলকাতায় গিয়ে ওঠে তেমনি রেখাদের ওখানে গিয়েই উঠবে—উঠে ছিলও তাই রামধন মিত্র লেনে।

তারপর আশা করেছিল দুপুরের মধ্যেই রাজেশ আসবে—তারপর দুজনে বেরুবে তখন অন্য কোথায়ও থাকার ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু রাজেশ এল না। এল তার বন্ধু শৈবাল সেই বিকালের দিকে, টাকা নিয়ে।

বলাকা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই রাজেশের বন্ধু শৈবাল বলল, রাজেশ কাল রেকর্ডিং করতে মাদ্রাজ চলে গেছে—টাকাটা সে আমাকে আপনার হাতে পৌঁছে দিতে বলেছিল।

মাদ্রাজ গেছে! ফিরবে কবে?

বলে গেছে কিছু ঠিক নেই, গান টেপ হয়ে গেলেই ফিরবে—মনে হয় দিন দশ পনের হবে হয়ত।

হঠাৎ তাকে যেতে হল নাকি মাদ্রাজ! বলাকা শুধায়।

নাতো, মাদ্রাজে যাবার প্রোগ্রাম তো সাত দিন আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

সাত দিন আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল?

বলাকা বিস্ময়ের সঙ্গে শুধায়।

সেই রকমই তো জানি, কেন, আপনি কিছু জানতেন না?

বলালা শৈবালের প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি।

শৈবালও অতঃপর টাকাটা বলাকার হাতে তুলে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

একটা খামের মধ্যে কেবল এক তাড়া নোট—একটি চিঠি পর্যন্ত নেই—

বলাকার তখুনি তো বোঝা উচিৎ ছিল।

কেন বুঝতে পারেনি তখনও বলাকা।

কি বোকা! কি বোকা!

কেবল নিজের মধ্যে নিজে ছট্‌ফট্‌ করেছে বলাকা পাঁচ ছ'টা দিন।

তারপরই রাজেশ এল। তাও রাজেশ সংবাদটা দেয়নি। শৈবালকে ফোন করে ও জানতে পেরেছিল রাজেশ ফিরেছে।

মাদ্রাজ যাবে সে কথা সেদিন আমাকে তুমি ফোনে জানাওনি কেন?

রাজেশ মৃদু হেসে বলেছিল, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

ভুলে গিয়েছিলে?

সত্যি বিশ্বাস কর—কেমন যেন আমতা আমতা করে বলেছিল রাজেশ ফোনে।

মাস তিনেক বাদে বলাকার সঙ্গে রাজেশের দেখা সেবার—কিন্তু প্রতিবার দেখা হলে রাজেশের দিক থেকে ইতিপূর্বে বলাকা যে আনন্দের সাড়া পেত—হঠাৎ যেন বলাকার মনে হয়েছিল সেটা সে পাচ্ছে না।

একটু যেন কেমন বেসুরো.... বেসুরোই মনে হয়েছে।

কিন্তু তবু বলাকার মনে এতটুকু সন্দেহও জাগেনি।

রেখার ওখানে গিয়েই রাজেশ দেখা করেছিল—তাও তো বলাকা জানত না—জানত না যে রাজেশ মাদ্রাজ থেকে ফিরেছে।

রাজেশের বন্ধু শৈবালের বাড়িতে ফোন করেছিল সে ব্যস্ত হয়ে—রাজেশ মাদ্রাজ থেকে ফিরেছে কিনা জানবার জন্য, কারণ রাজেশ কলকাতায় এলে ইদানীং হোটেলে থাকলেও শৈবালের সঙ্গে সব সময়ই যোগাযোগ রাখত।

শৈবালই ফোন ধরেছিল, পরে রাজেশ এসে ফোন ধরে। কি ব্যাপার বল তো!

কেন?

মাদ্রাজ যাবে সে কথাটা সেদিন আমাকে ট্রাংক কলে জানাওনি যে?

ভেবেছিলাম দুটো গানের ব্যাপার দু'দিনেই মিটে যাবে--

যাক গে—আসবে কখন?

এখন একটা বিশেষ কাজ আছে—দুপুরের দিকে যাব।

আমি তিন মাসের ছুটি নিয়েছি—চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আগের ছুটি—

নিয়েছ?

বাঃ, তোমাকে তো সেদিনই বললাম ফোনে। জানো—রেখা একটা বাড়ির সন্ধান পেয়েছে রিজেন্ট পার্কে—ফ্লাটটা ছোট হলেও বলছিল ভারী চমৎকার—তুমি এলে দেখতে যাব।

তারপর দুপুরে এল রাজেশ।

দুজনে বের হল—ফ্ল্যাট দেখে পছন্দ হল—দু'মাসের ভাড়াও সঙ্গে সঙ্গে বলাকা দিয়ে দিল।

আশ্চর্য, তখনও কেন বুঝতে পারেনি বলাকা?

রাজেশের দিক থেকে নিস্পৃহতাটা কেন তার চোখে পড়ল না?

সন্ধ্যায় সিনেমা দেখল দুজনে—রাতে হোটেলে খেল—আগাগোড়াই রাজেশ কেমন যেন নিস্পৃহ ছিল—অথচ বলাকার নজরেই পড়ল না কিছু।

॥ ৫ ॥

পরের দিন ভোরের দিকে ফোন এসেছিল।

ছুটে এসে ফোন ধরেছিল বলাকা।

হ্যালো—আমি রাজেশ।

রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি? হাসতে হাসতে ফোনে বলেছিল বলাকা।

শোন, এখুনি আমাকে একবার বোম্বাই যেতে হচ্ছে—

বোম্বাই। না না, চলবে না, ক্যানসেল কর. এই ত গতকাল মাত্র মাদ্রাজ থেকে এলে—

কি করি বল—উপায় নেই।

উপায় নেই আবার কি? জানিয়ে দাও দু'দিন পরে যাবে—

বললাম তো, উপায় নেই—

যেন থমকে গেল বলাকা, একটু থেমে বলল ও, তা কবে ফিরবে?

বলতে পারছি না এখুনি—চারটে গান সুর দিয়ে টেপ করতে হবে—

তার মনে দিন সাত আট তো হবেই—

দিন পনেরও হতে পারে।

কখন প্লেন?

এখুনি বেরুচ্ছি—প্রথমে যাব বম্বে—সেখান থেকে মাদ্রাজও হয়ত যেতে হতে পারে—

বলাকার সত্যি অভিমান হয়েছিল।

মাত্র গতকাল সে ফিরেছে আবার আজই সে চলে যাচ্ছে।

বেশ—যেখানে খুশি সে যাক। বাধা দেবে না তাকে বলাকা।

ওখানে গিয়ে ফোন করবে তো?

করব—তারপরই ফোনটা রেখে দিয়েছিল রাজেশ।

তখনও যদি বুঝত বলাকা।

যদি একটুকুও অনুমান করতে পারত, পারবে কি করে।

তখন সে পাগলের মত এক মিথ্যা সুখ-স্বপ্নের ঘোরে ডুবে আছে। এবং ঐ দিনই সে যাবে তাদের নতুন ফ্লাটে সেটাকে সাজিয়ে তুলতে।

চলে গিয়েছিল বলাকা ঐ দিনই সকালে নতুন ফ্ল্যাটে—

পাশের বাড়িতে ফোন ছিল রাজেশ তা জানত, বলাকা বলে রেখেছিল ভদ্রলোককে তার ফোন এলেই তাকে জানাতে। ভদ্রলোক বলেছিলেন নিশ্চয়ই—

কিন্তু রাজেশের ফোন আসেনি—যদিও সে প্রতিদিন সকাল দশটা পর্যন্ত এবং রাত আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত রাজেশের ফোনের প্রত্যাশায় উদগ্রীব হয়ে থেকেছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যায়নি।

ফোন নয় তের দিনের দিন সন্ধ্যায় তার নতুন ফ্ল্যাটেই এল রাজেশের চিঠিটা।

গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে ঘর সাজাচ্ছিল বলাকা—ঐ সময় এল চিঠিটা—

নতুন চাকর রতন চিঠিটা তার হাতে এনে দিয়েছিল।

এ ঠিকানায় কে চিঠি দিল?

মনে মনে বেশ একটু যেন আশ্চর্যই হয় বলাকা।

খামের উপর হাতের লেখা দেখেই কিন্তু মনটা তার লাফিয়ে ওঠে।

রাজেশের চিঠি। এতদিনে বাবুর সময় হল—তাও ট্রাংকল নয় চিঠি।

ঠিক আছে—দেবে না সে চিঠির কোন উত্তর—দায় পড়েছে তার—কেন গরজ কি একা তারই।

রাজেশ যদি অতটা শক্ত হতে পারে বলাকাও কি পারে না শক্ত হতে?

খুব পারে—দেখিয়ে দেবে সে—ভেবেছে কি রাজেশ।

দেখা যাক্ বাবু কি লিখেছেন।

খামটা ছিঁড়ে চিঠির প্রথম দুটো ছত্র পড়তেই তার মাথাটা ঘুরে উঠেছিল।

এ কি! এ কি তার রাজের চিঠি—মোহর বলেও সম্বোধন নয়—বলাকা,

'অনেক ভেবে দেখলাম—আর তোমাকে Suspenseয়ে রাখা উচিৎ হবে না।

আজ বা কাল কিংবা যা একদিন বলতেই হবে তা যত তাড়াতাড়ি বলে ফেলা যায় ততই ভাল।

ভেবেছিলাম গতমাসে যখন দিল্লী থেকে ট্রাংক কল করেছিলে—সেদিনই কথাটা তোমাকে জানিয়ে দিই—কিন্তু দিই দিই করেও জানাতে পারলাম না।

তারপর কলকাতায় যখন দেখা হল—বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না।

ভেবেছিলাম মাদ্রাজ থেকে ট্রাংক কলে জানাব তাও পারলাম না—কিন্তু আর ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখা চলে না—তাই—

বলাকা—আমাদের বিয়ে হতে পারে না—তুমি আমাকে ভুলে যেও।

সঙ্গে সঙ্গে বলাকার বুকের পরে যেন একটা ভারী মুগুরের আঘাত পড়েছিল। এ-এসব কি লিখেছে রাজেশ!

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ যেন পাথরের মত বসেছিল বলাকা।

সব শূন্য।

কতক্ষণ ঐ ভাবে বসেছিল চেয়ারটার উপরে জানেও না বালাকা।

খেয়াল যখন হল বেলা গড়িয়ে গিয়েছে—শীত শেষে বসন্তের অপরাহ্নের ম্লান আলোয় বাইরেটা যেন কেমন ম্লান।

॥ ৬॥

মা।

কে! চমকে সামনের দিকে তাকিয়েছিল বলাকা।

কি হয়েছে মা? চিঠিতে কি কোন খারাপ সংবাদ এসেছে?

বলাকার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বভাবতই ঐ কথাটা মনে পড়েছিল ভৃত্য রতনের, মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাশে—রক্তহীন।

বলাকা কোন জবাব দেয় না, বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

চায়ের জল হয়ে গিয়েছে মা—রতন আবার বলে।

নামিয়ে রাখ।

চা আমি করে এনে দেব?

না—তুই যা।

রতন চলে গেল।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক—বলাকা তখনও একই ভাবে বসে।

কখন ইতিমধ্যে প্যাসেঞ্জাররা সব একে একে প্লেনে উঠে পড়েছে।

সিঁড়িটা সরানো হয়েছে—দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—জেট ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ আওয়াজ শুরু হয়েছে।

মাইকে উর্মিলা খাণ্ডেলওয়ালের গলা ভেসে এল, Passengers are requested to fasten their belts with their seats.

উর্মিলা খাণ্ডেলওয়ালের গলার স্বরেই যেন চমক ভাঙল বলাকার। সামনের দিকে তাকাল।

No smoking-এর লাল আলোর অক্ষরগুলো দৃষ্টির সামনে জ্বল জ্বল করছে।

এতক্ষণে ভিতরের যাত্রীদের মৃদু একটা গুঞ্জনও বাইরের জেট ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে তার কানে এল।

ইঞ্জিনের শব্দ আরো গভীর, আরো দ্রুত শোনা যায়।

ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে ইউরোপগামী বিরাটকায় জেট প্লেনটা।

দীর্ঘ যাত্রাপথ—বম্বে—কায়রো—রোম—ফ্রাংকফুট—লণ্ডন, তারপর—নিউইয়র্ক—দূর পাল্লার সব যাত্রী নানা দেশের নানা জাত।

চলা ক্রমশ দ্রুত হতে দ্রুততর হয়—একটা চক্র দিয়ে রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে মাটির স্পর্শ ত্যাগ করল জেট্ বিমান—বলাকা বুঝতে পারল মৃদু একটা ধাক্কায়।

ক্রমশ এবারে উঁচুতে—আরো উঁচুতে।

ত্রিশ হাজার ফুটেরও ওপরে উঠে যাবে ক্রমশ জেট বিমান।

নীচে বহু নিম্নে অন্ধকারের পটভূমিতে চোখে পড়ে বোম্বাই শহরের দীপাবলী।

পৃথিবী যেন হাজার হাজার দ্বীপ জেলে মিটিমিটি তাকাচ্ছে দূর আকাশের নিঃসীমতায় ভাসমান বিরাট্ জেট বিমানটার দিকে।

লেডিজ এণ্ড জেন্টেলমেন, এই বিমানের পাইলট ক্যাপটেন মুথুস্বামী—ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মাথুর ও এয়ার হোস্টেস আপনাদের সকলকে দূরযাত্রায় ওয়েলকাম জানাচ্ছেন। আশা করি আপনাদের সকলকে যার যার গন্তব্যস্থানে নিরাপদে আমরা পৌঁছে দিতে পারব। রাত দুটো নাগাদ আমরা কায়রো—

এয়ার হোস্টেস মিস খাণ্ডেলওয়াল সরু প্যাসেজের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে প্যাসেনজারদের মধ্যে ট্রেতে করে টফি লজেন্স ও কোল্ড ড্রিংক বিতরণ করে চলেছে।

এয়ার হোস্টেস মিস্ স্টেলা এসে ওর পাশে দাঁড়াল, মিস সেন—এবারে ড্রিংক সার্ভ করতে হবে—চলুন।

ইয়েস স্টেলা।

স্টোর রুমে একজন হোস্টেস কাচের পাত্রে পাত্রে ড্রিংক ঢালছিল।

একটা ট্রে তুলে নিল বলাকা।

দম দেওয়া একটা নির্জীব পুতুলের মতই জনে জনে ড্রিংক সার্ভ করে বলাকা।

ড্রিংক- তারও কিছু পরে সার্ভ করা হল রাতের ডিনার। সব শেষে কফি।

নিঃশব্দ গতিতে রাতের নিঃসঙ্গ আকাশপথে উড়ে চলেছে বিরাট এক মরাল যেন শ্বেত দুটি ডানা মেলে।

কত—কত নীচে পৃথিবী—ঘুমন্ত পৃথিবী মেঘের স্তরে ঢাকা পড়েছে। ক্লান্ত বলাকা একটা কুশনের উপর বসেছিল।

যাত্রীরা কেউ কেউ স্মোক করছে- -কেউ কেউ সীটের পিছনে ব্যাক রেস্টটাকে ঠেলে দিয়ে মাথায় বালিশ গুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করছে।

এয়ার কণ্ডিসন্ প্লাস প্রেসারাইজড্—তবু তার মধ্যে বলাকার সারা কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম সঞ্চারিত হয়েছে।

পাশেই রাখা হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে মুখ মোছার জন্য রুমলটা বের করতে গিয়েই একটা খামে ভরা চিঠি হাতে ঠেকল বলাকার।

চিঠি।

আবার মনের পাতায় ভেসে উঠল রাজেশের চিঠিটা।

সব ঠিক হবার পর কলকাতায় যাবার আগে দিন পঁচিশ আগে দিল্লীতে হোস্টেলের ঘরে বসেই রেখাকে চিঠিটা লিখেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর চিঠিটা পোস্ট করেনি।

অন্য কাগজের সঙ্গে বোধহয় হ্যাণ্ডব্যাগটার মধ্যেই পড়েছিল।

ভেবেছিল—চিঠি লিখে কি হবে। সে ত যাচ্ছেই কলকাতায়—সেখানেই ত রেখার সঙ্গে দেখা হবে।

মুখেই সব বলবে তাকে।

অলস হাতে ব্যাগ থেকে রাজেশের চিঠিটা বের করতে গিয়ে রেখাকে লেখা চিঠিটা বের হয়ে এল।

চিঠিটা খাম থেকে বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল---

রেখা, সত্যি ভাই, কি যে ভাল লাগছে আজ---আকাশের নিত্য উড়ন্ত মরালী আজ মাটির বুকে ঘর বাঁধতে চলেছি।

হ্যাঁ রে, তোর সৌরেশবাবুর খবর কি? দুজনে কি চিরকাল একজন লক্ষ্ণৌ কলেজে অন্যজন কলকাতার কলেজে অধ্যাপনা করেই কাটিয়ে দিবি?

বয়স চলে যাচ্ছে রে। এবার ঘর বাঁধ।

জানিস, রাজেশটা একটা হোপলেস্। এখন পর্যন্ত কলকাতা শহরে একটা ফ্ল্যাটই খুঁজে বের করতে পারল না। ও কেবল গান গাইতেই জানে---।

লিখেছি ওকে---তোমার কর্ম নয়। আমিই কলকাতা শহরে একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বের করব---তারপর হনিমুন।

কোথায় যাচ্ছি জানিস? কুলুভ্যালিতে। নিশ্চয়ই বেশ ঠাণ্ডা হবে এই সময়টা কুলুভ্যালি।

ও অনেকদিন আগে একবার বলেছিল---রাণীক্ষেত।

আমি বলেছিলাম, না---কুলুভ্যালি। কি বল, আমার চয়েসটাই ভাল না?

চিঠিটা পড়তে পড়তে বলাকার চোখের কোল দুটো কেমন যেন করে ওঠে।

কোথায় কুলুভ্যালির এক নির্জন ঘরে- -সামনে ফায়ার প্লেসের গনগনে আগুন---তার তাপে ঘরটি বোনাঞ্চিত---আর কোথায় সে উড়ে চলেছে।

প্রথমেই কায়রো---তারপর রোম---তারপর---

রাজেশ। রাজেশ চৌধুরী।

রাজেশ, এতদিনে নিশ্চয়ই তার চিঠিটার জবাব পেয়ে গিয়েছে বম্বের ঠিকানায়---যদি অবিশ্যি সেই ঠিকানায় এখনও সে থেকে থাকে। কিন্তু যা লিখবে ভেবেছিল তা লেখেনি বলাকা, মনে হয়েছিল কি হবেই বা লিখে!

পূর্ণচ্ছেদ টানবার পর আবার পুনশ্চ'র কোন মানে হয় কি?

'মুক্তি দিয়ে গেলাম তোমায় রাজেশ।' কেবল ঐ একটা লাইনই সে লিখেছে।

কিন্তু একবার ভেবেছিল লিখবে---এত বড় প্রতারণাটা কেন তুমি শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে করলে রাজেশ।

মণিকার খবর আমি আগেই পেয়েছিলাম---কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি।

মণিকাকেই যদি তোমার পছন্দ ছিল সেটা কেন আমায় বললে না।

হাসি মুখেই আমার দাবী আমি ছেড়ে দিতাম।

কেন বললে না প্রেমের দুয়ারে কাঙ্গাল হয়ে দাঁড়াবার মত বেদনা আর নেই।

তোমার দোষ নেই--- দোষ দিই না তোমাকে---

তোমার গত দুই মাসের ব্যবহারের মধ্যে যে ছাড়া ছাড়া ভাব সেটা থেকেই অবিশ্যি আমার ব্যাপারটা আঁচ করা উচিত ছিল, তবু কেন, করিনি।

ভাবচ, নিশ্চয়ই কি বোকাই না আমি। তাই না?

রাগ নয় অভিমানও নয়---লজ্জা। অপরিসীম লজ্জা।

ছি ছি ছি, এত বড় লজ্জার বোঝা কেন তুমি আমার মাথায় চাপিয়ে দিলে রাজেশ।

আমার সর্বস্ব অসংকোচে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম বলেই কি তার এত বড় নিষ্ঠুর প্রতিদান দিলে?

মণিকাকেই তুমি ভালবাস---তাকেই তুমি বিয়ে করতে চাও---কেন ক'টা মাস আগে এ কথাটা জানতে দিলে না। তবে তো নিজের দিক থেকে জানার লজ্জাটা এমনি করে আমাকে কাঙ্গালের মত বহন করতে হত না।

আকাশে উড়ছিলাম---বাকী জীবনটা আকাশেই না হয় উড়ে উড়ে কেটে যেতো।

সেখানে নিঃসঙ্গতা আছে কিন্তু মিথ্যা নেই।

তোমার কোন দোষ নেই রাজেশ, তোমার কোন দোষ নেই—ভুল আমারই।

বোকা আমি, স্বপ্ন দেখেছিলাম—এক মিথ্যা রূপকথার স্বপ্ন।

কতজনাই তো আছে আমাদের এই লাইনে—ক'জনাই বা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে কাজ ছেড়েছে। তবু এ যে এক বিচিত্র জীবন—বিচিত্র নেশা।

কেবল নিরালম্ব শূন্য আকাশপথে দিনের পর দিন রাতের পর রাত উড়ে চলা।

মিস সেন—

অ্যাঁ—চমকে উঠে বলাকা।

কি ভাবছ তখন থেকে অমন চুপচাপ বসে—কিছু খেলেও না, স্টেলা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে যেন কখন।

Not feeling hungry Stella—বলাকা বললে।

সেই সন্ধ্যা থেকেই তোমাকে যেন অন্যমস্ক দেখছি—anything wrong!

হাসল বলাকা, না না—কি হবে—I am all right!

বয় ফ্রেণ্ডের চিঠি পাওনি বুঝি—না তার সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে—

দূর—আমার কোন বয় ফ্রেণ্ডই নেই—

সত্যি?—How funny! এত বয়স হল এখনও একজন বয় ফ্রেণ্ড জোগাড় করতে পারনি। হাসতে হাসতে বলে স্টেলা।

ভাগ্যে স্টেলা তার কাহিনী জানে না—নতুন এসেছে কয়দিন মাত্র এয়ার ইণ্ডিয়ার চাকরিতে, নতুন পরিচয়!

পারলাম আর কই—বলাকা হেসে বলার চেষ্টা করল।

How sad! স্টেলা আবার নিজের কাজে চলে গেল।

বলাকা আবার চিঠিতে মন দিল।

কলকাতা ছেড়ে আসার আগে রেখাকে সে আনুপূর্বিক সবই লিখে জানাবে ভেবেছিল।

একটি মাত্র মানুষ যার কাছে সে মনের সব কথাই অসংকোচে মেলে ধরতে পারে।

রাজেশের ঐ চিঠিটা পাবার পর যে কটা দিন ঐ ফ্ল্যাটে ও ছিল কোথাও বের হয়নি—কারো সঙ্গে দেখাও করেনি।

তারপর ভেবেছিল চলে আসবার আগে দেখা করে আসবে অন্তত একবার রেখার সঙ্গে।

কিন্তু তাও পারেনি।

না তাও পারেনি—কলকাতা থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আসবার সময় রেখাকে কিছুই জানিয়ে আসেনি। নচেৎ আজ সে কি ভাবত!

বিয়ের দিনটাও রেখাকে জানায়নি বলাকা:—সে স্থির করেছিল বিয়ের আগের দিন রেখাকে গিয়ে আমন্ত্রণ জানাবে সে ও রাজেশ।

বিয়ের দিনটার কথা বলেনি।

এমনকি নতুন ফ্ল্যাটটার কথাও জানায়নি রেখাকে।

রেখা জানত বলাকা হোটেলেই উঠেছে। একটা সারপ্রাইজ দেবে ভেবেছিল রেখাকে বিয়ের—ঐ ফ্ল্যাটে ডেকে এনে।

উঃ, ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়েছেন—ভাগ্যে সে রেখাকে কিছু জানায়নি।

সংবাদটা তো আর তার কাছে আজ তাহলে চাপা থাকত না—রাজেশ আর মণিকার বিয়ের সংবাদটা কাগজে নিশ্চয়ই ছাপা হবে, আর তখনি তো রেখারও সব কিছুই গোচরীভূত হবে।

বলাকা লিখেছিল—

'আচ্ছা, রেখা, তুই ক'টা দিনের ছুটি নিয়ে কুলুভ্যালিতে আসতে পারিস না—সেখান থেকে মানালী—তাহলে ভারী মজা হয় কিন্তু।

তুই হয়তো ভাববি রাজেশ তাহলে ক্ষুণ্ণ হবে—নিশ্চিন্ত থাকিস, এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হবে না।

আসিস যদি জানাস—আমি তোকে এয়ার টিকিট পাঠিয়ে দেব।

ভাল কথা, তোর সৌরেশ বাবুটিকে যদিও আলাদা নিমন্ত্রণ জানাব—বলিস তো তাকেও কুলুভ্যালিতে আসবার জন্য বলতে পারি।

সত্যি ভাই রেখা, বিয়ের দিন তো ঠিক হয়ে গিয়েছিল আমার এক বছর আগেই।

মাসগুলো যেন কাটতেই চাইছিল না। উঃ আমার সে দিনগুলো কি ভাবে কেটেছে। যেন আর তর সইত না।

কেন এমনটা হয় বল তো? সময় এক এক সময় এত মন্থর এত বিলম্বিত মনে হয় কেন বল তো?

কথাটা ওকেও একদিন বলেছিলাম, ও কি জবাব দিয়েছিল জানিস? বলেছিল, মুখপুড়ি মেয়ে কোথায় ব্যাপারটা আমারই হওয়া উচিত না তোমার----

তা কি করব বল। অত রেখে ঢেকে আমি কিছু বলতেও পারি না---করতেও পারি না। পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ---কোন মানে হয়? না ভাই, সে আমি পারি না।

তা ছাড়া তুই তো জানিস----জীবনের সেই শুরু থেকে না পাওয়ার ঝুলিটা আমার এত বেশী ভারী হয়ে আছে যে সামান্য কিছু পেলেই মনে হয় বুঝি রাজার ঐশ্বর্য পেয়ে গেলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ভয় জাগে মনে---ঝুলিটার কোথাও কোন ছিদ্র নেই তো।

রাজেশত আমার রাজই। আমার জীবনের রাজা, জীবন-রাজ।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ কেবিনের সাংকেতিক বাজারটা কঁ কঁ করে উঠল----২৩ নম্বরের যাত্রী ডাকছে।

উঠে পড়তে হল বলাকাকে---আজ রাত্রে তারই ডিউটি।

কেবিনের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল বলাকা।

যাত্রীরা অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েছে। দু-একজন মাথার উপরের আলোতে বই পড়ছে। তাদের চোখে এখনও ঘুম নামেনি।

২৩নং সীটে উপবিষ্ট যাত্রীটির সামনে এসে দাঁড়াল ও।

একটি বাঙালী তরুণী-- রোগা পাতলা চেহারা।

রংটা কালোই---কিন্তু মুখ চোখের গড়নটি ভারি সুশ্রী, পরণে আকাশ-নীল রংয়ের দামী জর্জেট কোমর পর্যন্ত একটা ব্লু-রংয়ের কম্বলে আবৃত।

বড় মাথা ধরেছে, Could I have an aspirin tablet please!

বলাকা তখনি গিয়ে একটা এসপিরিনের বড়ি ও প্লাসটিকের গ্লাসে জল নিয়ে এল।

তরুণীটি জলের সাহয্যে বড়িটি গলাধঃকরণ করে বলল, থ্যাঙ্কস।

তারপর গ্লাসটা বলাকার হাতে ফিরেয়ে দিতে দিতে বলল, Are you a Bengali?

হ্যাঁ---বলাকা মৃদু কণ্ঠে জাবাব দিল।

আমিও বাঙালী---

বলাকা নিঃশব্দে মৃদু হাসল।

পাশের সীটটা খালিই ছিল, তরুণীটি বলাকাকে বলল, বসুন না এই সীটটায়, ঘুম আসছে না কিছুতেই---আমার নাম রঞ্জনা---রঞ্জনা মল্লিক---আমি ন্যুইয়র্ক যাব--আমার স্বামী সেখানে চাকরি করে---

এই বুঝি প্রথম যাচ্ছেন? বলাকা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ---উনি বছর খানেক আগে গেছেন। আমি যাচ্ছি---উড়ে চলেছি তবু যেন মনে হচ্ছে সময় কাটতেই চাইছে না--

বলাকা আবার নিঃশব্দে মৃদু হাসল, কিন্তু বসল না।

খালি গ্লাসটা হাতে নিয়ে চলতে চলতে বললে, Good night!

তরুণীটিও প্রত্যুত্তরে শুভরাত্রি জানাল।

॥ ৭ ॥

May I have an aspirin tablet?

এসপিরিন ট্যাবলেট একটি পেতে পারি?

আড়াই বছর আগের এক রাত্রির কথা হঠাৎ যেন বলাকার মনের মধ্যে একটা ডানা ঝাপটা দিয়ে গেল।

এয়ার হোস্টেস বলাকা এয়ার ইণ্ডিয়ার একটি প্লেনে যাত্রীদের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছিল।

ক্যালকাটা টু বম্বে---বম্বে টু দিল্লী---ক্যালকাটা বোয়িং প্লেনে, সে তখন ডিউটি দিচ্ছিল নিয়মিত কয়েক মাস ধরে।

কি যেন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সেদিন বম্বে টু ক্যালকাটা ফ্লাইটটা নির্দিষ্ট সময়ের ঘন্টা দুই পরে রাত আটটা নাগাদ টেক-অফ করেছিল।

বোয়িং ৭০৭। আশ্চর্য! কি বিচিত্র মিল।

সেটাও ছিল ২৩নং সীট, ২৩নং সীটের যাত্রী—একটা খালি ছিল, অন্য সীটটায় ছিল একজন যাত্রী।

ডিনার সার্ভ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল বলাকা---২৩নং সীটের যাত্রী মাথা নিচু করে দুহাতের মধ্যে বসেছিল।

Are you Vegetarian or non-veg--

যাত্রী তার প্রশ্নে মাথা তুলে তাকাল ওর দিকে।

চোখ দুটো লাল। সমস্ত চোখে মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট।

লোকটার বয়েস ২৭/২৮ এর মধ্যেই হবে।

এক মাথা পশমের মত রুক্ষ তৈলহীন এলোমেলো চুল।

লম্বা রোগা চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক, চোখে কালো মোটা সেলুলয়েডের ফ্রেমে চশমা।

পরণে সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবী। পাশে একটি ফোলিও ব্যাগ।

Are you feeling sick? Anything wrong with you? বলাকা জিজ্ঞেস করল।

পাশের ফোলিও ব্যাগটার প্রতি নজর পড়ল---বাংলায় লেখা---আর চৌধুরী।

বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, একটা এসপিরিন ট্যাবলেট দিতে পারেন?

এখনি এনে দিচ্ছি।

বলাকা দুটো এসপিরিন ট্যাবলেট ও প্লাস্টিকের গ্লাসে এক গ্লাস জল এনে দিয়েছিল।

বলেছিল, ডিনার করবেন না?

না। গ্লাসটা বলাকার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, রাজেশ।

বলাকা তারপর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ওর দিকে তাকাবার আর সময় পায়নি।

দমদম এয়ারপোর্টে বোয়িংটা ল্যাণ্ড করল এক সময়।

একে একে সব যাত্রীই নেমে গেল, কিন্তু রাজেশ তখনও মাথাটা সীটের সঙ্গে কাত করে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে।

বলাকা কাছে এসে দাঁড়াল, মিঃ চৌধুরী—

চোখ মেলে তাকাল রাজেশ বলাকার দিকে---চোখ দুটো তখন যেন রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠেছে।

We have reached Dum Dum Airport---নামবেন না?

—এসে গেছি—

—হ্যাঁ—

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রাজেশ, কিন্তু পারল না---টলে পড়ল।

বলাকা তাড়াতাড়ি ঝুঁকে ওকে ধরে সীটে বসাতে গিয়েই টের পেল ভদ্রলোকের তখন ধুম জ্বর।

বলল, এ কি—আপনার যে দেখছি ভীষণ জ্বর---

হ্যাঁ, বোধহয় জ্বরই হয়েছে।

উঠবেন না—উঠবেন না---বসুন আপনি, আমি দেখছি।

না না, ব্যস্ত হবেন না, আ-আমি পারব যেতে।

না, বসুন,---আমি আসছি।

বলাকাই সব ব্যবস্থা করেছিল---রাজেশকে সে রাত্রে হাসপাতালে পাঠাবার।

অ্যাম্বুলেন্সে রাজেশকে রওনা করে দেবার পর সে যখন প্লেন থেকে নেমে আসছে স্টেলা এসে ওর হাতে রবীন্দ্রনাথের একটা গীতবিতান দিল।

কোথায় পেলে এটা স্টেলা?

২৩নং সীটের নীচে পড়েছিল—বোধহয় ঐ অসুস্থ ভদ্রলোকটির।

দেখি—হাতে নিয়ে বলাকা দেখল স্টেলার কথাই ঠিক—

গীতবিতানের প্রথম পাতায় লেখা বাংলায় নাম, মুক্তার মত হরফ—রাজেশ চৌধুরী—

কোন্ রাজেশ চৌধুরী হঠাৎই মনে হয়েছিল বলাকার—বিখ্যাত সুরকার ও গায়ক রাজেশ চৌধুরী নয় তো?

তারপরই মনে পড়ল, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোকটিকে ত অনেকটা তারই মত দেখতে—রাজেশের যে ছবি ইতিপূর্বে সে কাগজে দেখেছিল তার সঙ্গে চেহারার খুবই মিল।

খানিকটা সন্দেহ ও খানিকটা দ্বিধা নিয়েই মনের মধ্যে পরের দিন বিকেলের দিকে বইটা হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ভরে হোস্টেল থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বলাকা হাসপাতালের দিকে রওনা হল।

হাসপাতালে পৌঁছে ইমারজেন্সীতে খোঁজ নিতেই জানা গেল, ১০ নং কেবিনে রাজেশ চৌধুরী আছে এবং তিনি—তার ধারণাই ঠিক—বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার রাজেশ চৌধুরীই।

তিনি এখন কেমন আছেন বলতে পারেন?

তা তো জানি না। দেখুন না গিয়ে, ইমারজেন্সী অফিসার ডাঃ গাঙ্গুলী বললেন।

দশ নম্বর কেবিনটা কোথায় পড়বে?

লিফটে করে তিনতলায় চলে যান—করিডরে ডানদিকে শেষের কেবিনটাই দশ নম্বর কেবিন।

বলাকা এগিয়ে গেল। বেলা পড়ে এসেছে তখন।

ম্লান আলোয় কলকাতা শহর যেন কেমন ধূসর।

দশ নম্বর কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইতঃস্তত করে— ঢুকবে কি ঢুকবে না। একজন নার্স বের

এই কেবিনেই তো মিঃ রাজেশ চৌধুরী আছেন! কেমন আছেন ভাল এখন?

টেম্পারেচার এখন খুব হাই—আপনি কে?

বলাকা কি জবাব দেবে হঠাৎ বুঝে উঠতে পারে না নার্সের প্রশ্নের।

সত্যিই ত কে সে রাজেশের।

কোন সম্পর্কইত নেই তার রাজেশের সঙ্গে। তবে নার্স তাকে এলাউ করবে কেন অসুস্থ রাজেশকে দেখতে।

কিন্তু এত দূর এসেও ফিরে যাবে!

তাছাড়া গত রাত থেকে রাজেশের কথাটা যেন সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

রাজেশের গান সে বহুবার শুনেছে—রেকর্ডে—রেডিওতে—রাজেশের গানের সে একজন অন্ধ ভক্ত।

ছবিও দেখেছে তার নানা পত্র পত্রিকায়।

তারই মধ্যে দিয়ে যেন দূরের হঠাৎ সেই দূরের মানুষটা যখন একেবারে কাছে এসে পড়ল এবং তার পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠলো আকর্ষণের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত কৌতূহল যেন তাকে অস্থির করে তোলে।

অতবড় একজন শিল্পী তাকে যে এত কাছে কোন দিন পেতে পাবে সে যেন ভাবতেও পারেনি কোন দিন বলাকা।

সেই কৌতূহলের আকর্ষণ মিটাবার একটা সুযোগও এসে গিয়েছিল বলাকার—রাজেশ ফেলে গিয়েছিল তার গীতবিতানটা প্লেনে। সেইটে হাতে করে সুযোগ করে নিয়েছিল বলাকা হসপিটালে যাবার।

তাই নার্সের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রথমটায় বিমূঢ় হয়ে গেলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, আমি ওর আত্মীয়া—

আত্মীয়া?

হ্যাঁ, খবর পেয়ে দেখতে এসেছি ওকে—

ওঃ!

ভিতরে যেতে পারি?

পারেন—নার্স বলেছিল, তবে বেশীক্ষণ থাকবেন না। রোগীকে ডিসটার্ভ করবেন না।

না, না—ডিসটার্ভ করবো না। দেখেই চলে আসবো। বলেছিল বলাকা।

যান—

কথাটা বলে নার্স নিজের কাজে চলে গিয়েছিল।

বলাকা তবু যেন তখুনি কেবিনের মধ্যে ঢুকতে পারে না।

কেমন যেন একটা সংকোচ বোধ করে।

কিন্তু ঐ ভাবে কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাও দৃষ্টিকটু। কেউ দেখলে কি ভাববে?

তাই ধীরে ধীরে এক সময় কেবিনের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে বলাকা।

কেবিনের মধ্যে শয্যায় শায়িত রাজেশ।

চোখ বোজা।

মুখটা যেন আরো শুকিয়ে গিয়েছে।

রাজেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার রাজেশ চৌধুরীই বটে।

আজ আর বলাকার কোন সংশয় থাকে না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় আবার বের হয়ে এসেছিল বলাকা কেবিন থেকে।

দিন চারেক বাদে ধীরে ধীরে রাজেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

এবং সে রাত্রে হাসপাতাল থেকে ফিরে হঠাৎ কি মনে হয়েছিল বলাকার—পরের দিন সকালে অফিসে ফোন করে দিন সাতেকের ছুটি নিয়েছিল।

পরে অনেক ভেবেছে হঠাৎ সে ছুটি নিতে গেল কেন!

রাজেশের সঙ্গে ত তার কোন সম্পর্কই ছিল না—ঘনিষ্ঠতা ত দূরে থাক—কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না।

তবে—হয়ত সেদিন কেবিনে শয্যায় অসুস্থ রাজেশকে শুয়ে থাকতে দেখে তার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনের মধ্যে কেমন করে উঠেছিল।

পরের দিন সন্ধ্যার ফ্লাইটে কলকাতা থেকে বোম্বাই তার ডিউটি ছিল।

তখন মনটা তার রাজেশের রোগশয্যার পাশে টানছিল। টেলিফোন করে অফিসে জানিয়ে দিয়েছিল তার শরীরটা ভাল নয়, সে ডিউটিতে যেতে পারবে না।

পরের দিনও গিয়েছিল হাসপাতালে একগোছা ফুল, কিছু ফল ও গীতবিতানটা নিয়ে। কিন্তু গিয়ে দেখল রাজেশের জ্ঞান তখনো ফেরেনি, জ্বর আগের মতই, মধ্যে মধ্যে ডিলিরিয়াম।

সেদিন আবার দুজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন কেবিনে।

বলাকার সঙ্গে ওদের আলাপ হল—রাজেশের বন্ধু শৈবাল ও তার স্ত্রী সন্ধ্যা।

অন্য ভদ্রলোকটি একজন প্রডিউসার—সেই দিনই কাগজে রাজেশের অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

বলাকা সেদিন তার পরিচয় দিয়ে বলেছিল, সেদিন কলকাতা ফেরার পথে প্লেনের মধ্যেই রাজেশ কিরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—বলাকাই ব্যবস্থা করে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

শৈবাল ও তার স্ত্রী সন্ধ্যার কাছেই বলাকা পরের দিন মোটামুটি পরিচয় পায় রাজেশ চৌধুরীর।

রাজেশের অবস্থা সেদিন উন্নতির দিকে, তার জ্বর অনেক কম, ডিলিরিয়ামটাও নেই—অন্যান্য উপসর্গগুলোও কমতে শুরু করেছে।

রাজেশের মা বাবা নেই—ছোটবেলায় বাবা গেছেন, দশ বৎসর বয়সে যায় মা।

বলতে গেলে মামা মামীর কাছেই সে মানুষ।

ছোটবেলা থেকেই তার গান বাজনার দিকে ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক।

রাজেশের গান বাজনার জন্য লেখাপড়াও তেমন হয়নি।

বি. এ. পর্যন্ত পড়েও পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত দেয়নি, ইতিমধ্যে রেকর্ডে গান গেয়ে যথেষ্ট নাম হয়েছে ওর, রেকর্ড খুব ভাল বিক্রী।

ফলে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল।

মামা অশোকবাবুর গোড়া থেকেই ব্যাপারটা পছন্দ ছিল না।

তাই নিয়ে মামার সঙ্গে কয়েকবার কথাও হয়েছে।

তুমি গান গেয়েই জীবনটা কাটাবে নাকি?

ভাবছি ঐ লাইনটাই নেব—রাজেশ জবাব দিয়েছিল।

পড়াশুনা তাহলে আর করবে না? তোমার বাবা এত বড় একজন বিখ্যাত ডক্টরেট অধ্যাপক ছিলেন, তার ছেলে হয়ে তুমি গান গেয়েই জীবন কাটাবে? লোকে বলবে কি।

লোকের বলায় কি এসে যায়—

কিন্তু আমাকে তো সব সময় কথা শুনতে হয়। নানা জনে নানা মন্তব্য করে—লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না—

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে অশোকবাবুর কণ্ঠ থেকে যেন একটা বিরক্তি ও ক্ষোভ ঝরে পড়ে।

॥ ৮ ॥

তার দু'দিন পরেই রাজেশ মামা মামীর আশ্রয় ছেড়ে একটা মেসে গিয়ে ওঠে।

সে আজ বছর আষ্টেক আগেকার কথা, রাজেশের তখন কি-ই বা আয়—রেকর্ড থেকেও তখন রয়ালটি পায় না—থোক থাক যা টাকা পায় এক একটা গান রেকর্ড করে।

কিন্তু বছর চারেকের মধ্যেই আয়ের অঙ্কটা পাঁচ সাতগুণ বৃদ্ধি পেল।

তখন সে শুধু গানই গায় না সুরকার হিসাবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

নানা ছবির কনট্রাক্ট আসতে শুরু করেছে বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে।

কয়েকদিন থেকেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল—তার উপর একবার মাদ্রাজ একবার বোম্বাই করতে হচ্ছিল।

বোম্বাইয়ে ছবির কাজ সেরে এক বন্ধু প্রডিউসারের ছবির মিউজিক টেকের জন্য কলকাতায় আসছিল পথে ঐ বিভ্রাট।

পঞ্চম দিনে বলাকার আসার একটু দেরিই হয়েছিল হাসপাতালে।

একটু আগে শৈবাল একা এসেছিল হাসপাতালে বন্ধুকে দেখতে এবং তাকে বেশ সুস্থ দেখে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে। সন্ধ্যা সেদিন আসতে পারেনি।

বলাকা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল।

কে!

কেবিনের ভিতর থেকে প্রায় ক্ষীণ গলায় রাজেশের প্রশ্ন ভেসে আসল।

বলাকা পর্দা তুলে কেবিনে ঢুকল।

হাতে তার এক গোছা রক্ত গোলাপ।

বালিশে হেলান দিয়ে আধা বসা আধা শোওয়া অবস্থায় ছিল রাজেশ, খোলা জানালা পথে আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলো ঘরের মধ্যে আসছে।

এমনিতে হয় তো বলাকাকে দেখে রাজেশ চিনতে পারত না—কিন্তু শৈবাল ঐ দিন বলাকার কথা তাকে বলেছিল, বলেছিল প্রত্যহ বলাকা তাকে দেখতে আসে। তাই অনুমানেই বুঝেছিল বলাকা সেন।

মিস্ সেন নিশ্চয়ই? রাজেশ বললে।

হ্যাঁ। স্মিত হাসি হেসে বলাকা বললে, কেমন আছেন আজ?

বলাকা ফুলের গোছাটা এগিয়ে দিল রাজেশের দিকে।

রাজেশ আগ্রহে ফুলগুলো নাকের কাছে ধরে ঘ্রাণ নিয়ে বলল আঃ কি মিষ্টি গন্ধ! কি সুন্দর লাল গোলাপ—সত্যি শৈবালের মুখে সব শুনলাম আজ। আপনি সেদিন প্লেনে আমাকে না দেখলে যে কি হত।

আমি না দেখলেও আর কেউ ব্যবস্থা একটা করতই—বলাকা বলল।

তা হয়তো হত, তবে সেটা নিছক কর্তব্য পালন ছাড়া বেশী কিছু না—মৃদু হেসে রাজেশ বলল।

আমিও তো কর্তব্যটুকুই করেছি—মৃদু হেসে বলাকা বলে।

এ ক'দিন রোজ নিয়মিত এসেছেন—খোঁজ নিয়েছেন—ব্যাপারটাকে যদি কেবল কর্তব্যই বলি

যদিও সে গণ্ডির মধ্যে পড়ে না—তাহলেও আমার অকৃতজ্ঞতার সীমা থাকবে না মিস সেন—

আজ কেমন আছেন—মাথার যন্ত্রণাটা নেই ত?

নেই, তবে একটা ভার ভার বোধ এখনো আছে—

হঠাৎ বলাকা বললে, আপনি অত্যন্ত বেশী পরিশ্রম করেন—কেবলই দৌড়াদৌড়ি করেন—মাদ্রাজ—বোম্বাই—কলকাতা—

কে বললে আপনাকে?

গোলাপের গন্ধ কেউ চাপা দিয়ে রাখতে পারে? আপনা হতেই যে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়—জানেন, প্রথমটা আমি ঠিক চিনতে পারিনি—তাছাড়া আপনাকে ভাল করে চেয়ে দেখবার মত আপনার অবস্থাও তখন ছিল না।

আপনার সে রাত্রির ঋণ জীবনে আমি শোধ করতে পারব না। রাজেশ বললে।

ঋণ বলছেন কেন! তাছাড়া নিছক কর্তব্যের খাতিরে যতটুকু করেছি তার ঢের বেশী লাভ ত আমারই হয়েছে।

লাভ হয়েছে আপনার? কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে তাকাল রাজেশ।

লাভ নয়—এত বড় একজন গায়ক সুরকারের সঙ্গে পরিচয় হল—এমন করে যে আপনার সঙ্গে কখনো পরিচয় হবে ভাবতে পেরেছি নাকি? আপনারা হচ্ছেন শিল্পী স্বপ্নলোকের মানুষ—সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

তাই নাকি!

নিশ্চয়ই, জানেন আপনার প্রায় সব গানই আমার কালেকশানে আছে—অবিশ্যি আপনার গাওয়া গানের রেকর্ডগুলো ছাড়াও আপনার সুর দেওয়া গানেরও একটা কালেকশন আমার আছে—তবে সব নয়—

রাজেশ শুনছিল বলাকার কথা।

কতদিন ডিউটি থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে রেডিওগ্রামে আপনার গাওয়া আমার প্রিয় গানগুলো চাপিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে যেন আমার সব ক্লান্তি—আমার সব অবসন্নতা কোথায় মিলিয়ে গেছে—

আপনি দেখছি আমার গানের একজন অন্ধ স্তাবক।

অন্ধ স্তাবক! সরল বালিকার মত প্রতিবাদ জানায় বলাকা, মোটেই না মশাই—You don't know Yourself আপনি জানেন না You are really superb—আপনার গান মনকে এমন এক আনন্দলোকে নিয়ে যায়—

রাজেশ মৃদু মৃদু হাসছিল ওর মুখের দিকে চেয়ে তখন।

শুনেছেন কখনো আমার মত করে আপনার নিজের গাওয়া গান?

রাজেশ হেসে বলে, আপনার মত করে যে কখনো শুনিনি তা বলতে পারি।

মোটেই না। আপনিও নিশ্চয়ই আপনার নিজের গান শুনতে ভালবাসেন—ভালবাসতেই হবে—কেউ ভাল না বেসে পারেই না—আপনার সেই গানটা—

একদিন অন্ধকারে জানি জানি
হারিয়ে যাব আমি—

কি মনে পড়ছে আপনার গানটা?

রাজেশ মৃদু হেসে বলে, আজ পর্যন্ত কত গান গেয়েছি—সব কি মনে থাকে!

থাকা উচিত—কিন্তু কেন এত তাড়াতাড়ি ঐ গান গাইলেন—গানটা শুনতে বার বার ইচ্ছা করে অথচ শুনলে এমন কান্না পায়, ঐ যা—অনেকক্ষণ এসেছি—হয়তো Visiting hours শেষ হয়ে গিয়েছে।

না, না—আপনি ব্যস্ত হবেন না—এটা Special Cabin—এখানে যতক্ষণ খুসি আপনি থাকতে পারেন—

না—আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনি এখনো সুস্থ হননি—অত্যন্ত পেল দেখাচ্ছে। আজ আমি উঠি—

কাল আবার আসবেন তো? হঠাৎ রাজেশ প্রশ্ন করে।

না। ছুটি নিয়েছিলাম কয়েকদিনের, আজ ছুটি ফুরিয়ে গেল—কাল কাজে জয়েন করতে হবে—

ও। রাজেশের গলার স্বরটা কেমন যেন ম্লান মনে হল বলাকার।

বলাকা বললে, চারদিন বাদে আমার অফ্ আছে—সেদিন আসতে পারি—অবিশ্যি তখন যদি আপনি কলকাতায় থাকেন—

কলকাতাতেই থাকতে হবে দিন কুড়ি—দুটো ছবির মিউজিক আছে।

শৈবালবাবুর ওখানে?

না—আগে এখানে আসলে অবিশ্যি শৈবালের ওখানেই বরাবর উঠেছি তবে কাল এখান থেকে ডিসচার্জ করে দিলে পার্ক স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটে থাকব—

বলাকা পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার নিয়ে নিল।

ফ্ল্যাটটা আপনার ?

না, না—আমার এক ধনী প্রডিউসারের—ফ্ল্যাটটা কিনে রেখেছে। ওর ছবিতে যখন বোম্বের আর্টিস্ট অভিনয় করতে আসে হোটেলে রাখতে হলে অনেক বেশী পড়ে তাই ঐ ফ্ল্যাটটা কিনেছে, এখন খালিই আছে—তাই আমাকে আজ সকালে বলে গেল ওখানেই থাকতে—ওরই দুটো ছবির মিউজিক দিতে হবে—

কেন—এত টাকা রোজগার করেন একটা ফ্ল্যাট কিনলেই তো পারেন—

কি হবে কিনে মিস সেন, আপনি বোধ হয় জানেন না—সংসারে আমি একা—ছোটবেলায় মা বাবাকে হারিয়েছি—তারপর—

জানি—বলাকা বলল, আপনার বন্ধু শৈবাল বাবু ও তার স্ত্রী সন্ধ্যাদেবীর মুখেই আপনার সব কথা শুনেছি—তাহলেও নিজস্ব একটা আস্তানা থাকা—

কেন—আস্তানার অভাব কি—তাছাড়া এখন তো কলকাতা—বোম্বাই—মাদ্রাজ আর সব জায়গাতেই চমৎকার হোটেল আছে—

সেদিন বলাকা জবাবে আর কিছু না বললেও পরবর্তী কালে যখন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বলাকা বলেছিল, ঘর বাঁধতে কি তোমার মন চায় না রাজ।

আমার ভাবতে ভাল লাগে মোহর—(বলাকার ডাক নাম মোহর) সব ঠাঁই মোর ঘর আছে—তাছাড়া কি জানো?

কি?

ছোটবেলা থেকে কোনদিনই বন্ধন আমার ভাল লাগে না। কোন বিশেষ একটা চৌহদ্দির মধ্যে মেপে মেপে পা ফেলা—সেই একই দরজা দিয়ে যাওয়া আর আসা—সেই একই জানালা দিয়ে আলো আর হাওয়ার প্রবেশ—বড্ড একঘেয়েমী। মনে হয়—যেন অদৃশ্য এক বন্ধনে আমাকে বেঁধে রেখেছে—

প্রত্যেক মানুষই তো তাই চায়—

চায় তা জানি—সংসারে বাঁচবার—বেঁচে থাকবার একঘেয়েমীটাকে অনায়াসেই যেন সকলে স্বীকার করে নিয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দিব্যি কাটিয়েও দেয়—তবে আমি যদি তার ব্যতিক্রম হই-ই না হয় হলাম—কি হল মুখটা অমন ভারী হয়ে গেল কেন! আচ্ছা মোহর, এমনি করেই যদি আমাদের কেটে যেত—।

তোমার যদি তাই ইচ্ছা তো তাই হবে—রাজেশের কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলাকা বলে উঠেছিল।

বাঃ তা কি করে হবে? আমার ইচ্ছাটা তোমার কাঁধে চাপিয়ে দেব কেন?

তবে কি করবে?

দুজনার ইচ্ছাই আমাদের দুজনার মেনে নিতে হবে। তারপরই একটু থেমে বলেছিল রাজেশ, আমি জানি মোহর—তোমার মনের গোপন বাসনা একটি নিরালা গৃহকোণ—তাই না?

না গো না। তোমাকে আমি কোনদিনই এমন বাঁধনে বাঁধতে চাইব না যে বাঁধনে বাঁধা পড়ে তুমি ছট্‌ফট্ করবে।

আচ্ছা এমন হয় না। বিয়ে আমরা করলাম—কিন্তু ঘর বাঁধলাম না—

ধ্যাত্ তাই আবার হয় নাকি।

কেন হবে না। ঘরের—সংসারের চিরাচরিত একঘেয়েমীর মধ্যে ধরা দেব না। যখন খুশি যেখানে খুশি দুজনার দেখা হবে—

বলাকা প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসেছিল কেবল। কোন জবাব দেয়নি।

॥ ৯ ॥

হঠাৎ চমক ভাঙল বলাকার।

স্টেলা কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

মিস্ সেন Do you like to have some coffee!

সামনের দিকে তাকাল বলাকা—

যাত্রীরা সবাই প্রায় নিদ্রায় ঢলে পড়েছে।

মধ্যরাত্রির আকাশপথে 747 জাম্বো জেট প্রচণ্ড গতিতে যে ছুটে চলেছে কায়রোর দিকে বুঝবারও উপায় নেই—কেবল জেট ইঞ্জিনের একটা মৃদু একটানা গুঞ্জন।

প্লেনের মধ্যে উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে—মৃদু রাত-আলো জ্বলছে।

বলাকা হাতঘড়ির দিকে তাকাল, রাত প্রায় দেড়টা।

রাত সোয়া দুটোয় প্লেনটার কায়রোয় পৌঁছবার কথা।

তারপর আবার রাত তিনটে পাঁচে এ উড়বে—রোমের পথে।

গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে। মন্দ হত না এক কাপ গরম কফি পেলে।

বলাকা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

স্টেলা চলে গেল।

রাজেশ কোনদিনই ঘর বাঁধতে চায়নি।

ঘর বাঁধার মধ্যে তার যেন কেমন একটা অনীহা সে অনুভব করছে।

বলাকাব জন্যই হয়তো সে রাজী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত আর তাই হয়তো অমন বাঁধন কেটে চলে গেল তাকে কিছু না জানিয়ে—কিন্তু তাই কি।

বলাকা আপন মনেই ম্লান হাসি হাসে একটু।

না—তা নয়—। তাই যদি হত তবে ব্যথাটা বোধ কবি এমন তীব্র হয়ে বাজত না তার বুকে।

মণিকা। মণিকার জন্যই সে তাকে ত্যাগ করে চলে গেল নিশ্চয়ই।

কিন্তু কথাটা তাকে খুলে বললে কি এমন ক্ষতি হত। ও নিশ্চয়ই রাজেশকে বাধা দিত না।

মণিকাই যদি তার সত্যিকাবের মনোনীতা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তার কথাটা তাকে বলায় বাধা কি ছিল।

যত দুঃখই বুকে বাজুক না কেন, সে হাসি মুখেই বলত বেশ—তাই হবে।

কিন্তু এ ছলনা, এ প্রতারণার কি এমন প্রয়োজন ছিল।

মণিকার কথা সেত জানত অনেক দিন থেকেই—

মণিকা সুন্দরী—কনভেন্টে পড়া মেয়ে—

মণিকার বাবা দিল্লীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

মণিকা রাজেশের কাছে কিছু দিন গান শিখেছিল—ধনীর দুলালীর শখ হয়েছিল গান শিখতে—পাকড়াও করেছিল রাজেশকে, সেই পরিচয়ের সূত্রপাত—তারপব যেমন হয়ে থাকে তারপর ঘনিষ্ঠতা।

মণিকার কথা জেনেছিলও বলাকা আকস্মিক ভাবেই।

কিন্তু সে অনেক পরে। তখন কি মণিকা সম্পর্কে তার মনে একটা কৌতূহল জাগেনি! হ্যাঁ জেগেছিল—কিন্তু তখন তার ও রাজেশের সম্পর্কটা এত গভীর—এত নিবিড় যে সন্দেহের কোন কালো ছায়াই তার মনের মধ্যে সেদিন ফেলতে পারেনি।

আজ এই মহূর্তে যেন সব কিছুই মনের মধ্যে ছায়াছবির মত ভেসে উঠছে।

পর পর সাতদিন ডিউটি দেবার পর বলাকার পরের দিন অফ্ ডে।

বলাকা সে সময় একটা গভর্ণমেন্ট গার্লস হস্টেলে থাকে। সকাল বেলায় সে প্রস্তুত হচ্ছিল—রাজেশের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে—

তারপর হঠাৎ মনে হল রাজেশ যেমন ব্যস্ত মানুষ—সন্ধ্যার সময় ফ্ল্যাটে থাকবে কিনা একবার জানা প্রয়োজন।

হস্টেল থেকেই ফোনে রাজেশের হাসপাতালে দেওয়া নম্বরটা দেখে ডায়েল করল বলাকা।

বেলা তখন সাড়ে আটটা হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রান্ত থেকে সাড়া এল, কে!

রাজেশ চৌধুরী আছেন?

কথা বলছি---আপনি কে?

ফোনে রাজেশের গলাটা শুনেই চিনতে পেরেছিল বলাকা। ঠিক তার বহুবার শোনা রেকর্ডের সেই গলা।

বলুন তো অমি কে! ..... চিনতে পারলেন না তো! জানি চিনতে পারবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে এবারে অন্যপ্রান্ত থেকে সাড়া এল. চিনেছি---

বলুন তো কে?

মিস সেন। তারপর? কি খবর---কেমন আছেন।

খুব ব্যস্ত নাকি।

না—না--।

বিকেলের দিকে আপনার ওখানে যেতে পারি?

নিশ্চয়ই। কখন আসবেন বলুন?

আপনি বলুন--বলাকা বলেছিল।

সন্ধ্যার পরে অসুন—আমি এখুনি স্টুডিওতে বেরুচ্ছি, রেকর্ডিং আছে—শেষ হতে হতে সেই সাড়ে পাঁচটা ছ'টা বোধ হয় হবে।

বেশ তাই যাব। সাতটা নাগাদ যাব।

বলাকার নিজেরই ভারী আশ্চর্য লেগেছিল সে রাজেশকে কেমন করে ফোন করল।

কোন সংকোচ বা কোন দ্বিধাই তার মনের মধ্যে আসেনি। যেন কতকালের চেনা রাজেশ, তার কতদিনের পরিচিত।

কিন্তু টেলিফোনে কথা বলা এক আর সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা অন্য।

দুজনে সেদিন অনেকক্ষণ কথা বলেছিল যদিও---কিন্তু সেটা হাসপাতালের কেবিন। কারো নিভৃত একান্ত গৃহকোণ নয়।

সেখানে সকলের ছিল অবারিত দ্বার---যে কেউ যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারত---কিন্তু আজ সে যাবে রাজেশের ফ্ল্যাটে। যে ফ্ল্যাটে সে একাই থাকে। নিভৃত একটি গৃহকোণ।

সময় যত ঘনিয়ে আসতে থাকে সেই নির্জনতার কথাটাই যেন তার বেশী করে মনে পড়তে থাকে।

ছুটি সারাদিনই ছুটি---কোন কাজকর্ম নেই।

হস্টেলে যারা আছে তারা সবাই কোন না কোন কাজ করে।

সকাল দশটার মধ্যেই সবাই বের হয়ে যায় প্রায়। বাদ-বাকীরা এগারটার মধ্যে চলে যায়।

এগারটার পর হস্টেলটা যেন কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। কোথায়ও কোন শব্দ নেই, সব ঘরে ঘরেই প্রায় তালা দেওয়া।

হস্টেলের ঠাকুর, চাকর ও ঝিয়ের দলও যেন তখন নিশ্চিন্ত আলস্যে গা ঢেলে দেয়।

হস্টেলের তিনতলায় একটা ঘরে বলাকা থাকে।

রাজেশের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বৈচিত্র্যের স্বাদ অনুভব করতে শুরু করেছিল ঐ কয়দিন।

একঘেয়ে আকাশপথে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল বলাকা---সেই প্লেনের এক নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে, রোজই নিত্যনতুন যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয় বটে কিন্তু তাদের সঙ্গে ক'টা কথাই বা বলাকার হত—যা-ও হত তাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

রুটিন বাঁধা একঘেয়ে এক জীবন—সংকীর্ণ এক পরিধি। তাইতেই বোধহয় ক্রমশ সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। ফলে যে সময়টা তার ডিউটি থাকত না—হস্টেলের ঘরেই তার শুয়ে বসে সময় কেটে যেত।

কিন্তু রাজেশকে কেন্দ্র করে তার সামান্য পরিচয়েই কোথায় যেন কি একটা ঘটে গিয়েছিল, যেটা বলাকা ভাল করে বুঝতে না পারলেও ক'টা দিন ধরে, বিশেষ করে ছুটির পর ডিউটি থেকে ফিরে এসে বলাকা অনুভব করতে পারছিল।

রাজেশের কথা মনে হত—তার মুখটা মনের পাতায় বারবার ভেসে উঠত, কেমন যেন আনমনা হয়ে যেত বলাকা।

আর তারই মধ্যে মনটা তার রাজেশের সঙ্গে আবার দেখা করার জন্য ও তার সঙ্গে কথা বলার জন্য যে ভিতরে ভিতরে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল সেটা যেন সে ফোন করার পর বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগল।

আবারও সঙ্গে সঙ্গে এও বলাকার মনে হয়, রাজেশ কিছু ভাবল না তো! তাকে হ্যাংলা মনে করল না তো!

মনে করছে না তো মেয়েটা কি রকম গায়ে পড়া!

আসলে বলাকা তার মনের অবস্থাটা ঠিক বিশ্লেষণ করতে পারেনি। রাজেশের গানের বরাবরই একজন ভক্ত ছিল সে।

প্রিয় গায়ক ছিল তার রাজেশ মনে মনে তাকে পূজো করেছে বিশেষ একজন রূপে, সেই রাজেশের সঙ্গেই যখন ঘটনাচক্রে তার আলাপ হয়ে গেল—সে কেবল মুগ্ধই নয়, স্বাভাবিক ভাবেই রাজেশের প্রতি আকৃষ্ট হল।

সর্বক্ষণ রাজেশের কথাই সে ভেবেছে।

ক'টা দিন রাজেশ সর্বক্ষণই যেন তার মনের মধ্যে নিভৃত এক লিপ্সায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—সেটা সে বুঝতে চায়নি, বুঝতে পারেনি।

কিন্তু তা হলেও সাক্ষাতের সময় যত নিকটবর্তী হয়ে আসতে লাগল ততই যেন রাজ্যের লজ্জা ও সংকোচ তাকে বিব্রত দ্বিধান্বিত করে তুলতে লাগল।

সমস্ত দ্বিপ্রহরটা সে সেই চিন্তাতেই আত্মমগ্ন হয়ে রইল।

রাজেশের কাছে যাবে, তার সামনা-সামনি হবে, তারপর!

তারপর সে মুখ তুলে তাকাতে পারবে তো রাজেশের দিকে!

কি কথা বলবে সে রাজেশের সঙ্গে! কেমন আছেন? শরীর ভাল তো! গান রেকর্ডিং কেমন হল!

ব্যাস্ ফুরিয়ে গেল সব কথা। আর তো কথা নেই।

আচ্ছা, সে যেমন এ ক'দিন কেবল রাজেশের কথাই চিন্তা করেছে—রাজেশের কি তেমনি তার কথা মনে হয়েছে?

পাগল সে—রাজেশের তাকে মনে রাখবার কি এমন কারণ থাকতে পারে। অতি তুচ্ছ সাধারণ একটি মেয়ে সে।

রাজেশের গুণমুগ্ধা—তার গান শুনতে পাগল, আরো এমন হয়তো কত মেয়ে তার মত আছে—রাজেশের হয়তো একটিবারও তার কথা মনে হয়নি।

কে জানে রাজেশ হয়তো তার কথা ভুলেই গিয়েছিল—আজ যেচে গায়ে পড়ে নেহাৎ সে ফোন করল বলেই হয়তো রাজেশ তাকে যাবার জন্য বলেছে।

ক্রমে দিনের আলো ফুরিয়ে এল—সন্ধ্যার আবছায়া চারিদিকে ম্লান হয়ে নেমে এল। হস্টেলের অনেকেই ফিরে এল।

হস্টেল আবার বহু কণ্ঠস্বরে মুখরিত হয়ে উঠল। এবারে তো যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

উঠে পড়ল বলাকা। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল। বাক্স খুলে শাড়ি আর পছন্দ হয় না বলাকার।

কোন্ রঙের শাড়ি সে পরবে। বেছে বেছে শেষটায় ফিকে আকাশী নীল রংয়ের একটা শাড়ি বেছে নিল বলাকা।

সাজগোজ করে বলাকা যখন বেরুল—কলকাতা শহরে তখন সন্ধ্যা—চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে।

বড় রাস্তার মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি ধরল বলাকা।

ছয়তলা ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে বলাকা ভাড়া মিটিয়ে দিল।

গেটের মাথায় সোনালী অক্ষরে লেখা 'নির্জন তারা',—বেশ নামটি।

লিফটে তিনতলায় উঠে গেল, লিফটের দু'পাশে সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশে সব ফ্ল্যাট।

বাঁদিকের ফ্ল্যাটটাই---কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। একটা পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরা রাজেশ দরজা খুলে দিল।

এই যে মিস্ সেন আসুন---আসুন---

দুজনে এসে সিটিং রুমে ঢুকল, সুন্দর ভাবে সাজানো ঘরটি।

বসুন তারপর কি খাবেন বলুন, চা---না কফি? দাঁড়িয়ে কেন, বসুন---

বলাকা বসতে বসতে বলল, আপনাকে ব্যস্ত হতে. হবে না।

ব্যস্ত কি! আমারও চায়ের পিপাসা পেয়েছে---

তবে বলুন---চা করতে।

চা করবে কে! নিজেই বানিয়ে নিই---রাজেশ কিচেনের দিকে এগুতেই বলাকা উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিল, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। বলুন সব কোথায় আছে, আমিই বানাচ্ছি চা---

না, আপনি অতিথি---আমিই বানাব চা। রাজেশ স্মিত হেসে বলল।

বাঃ অতিথি হলেই বা---আমার হাতের চা খারাপ হবে না। দেখুন না। উঠে দাঁড়াল বলাকা।

সারাটা রাস্তা ট্যাক্সিতে আসতে আসতে যে সঙ্কোচ আর দ্বিধার টানা-পোড়েনে সে অস্বস্তি বোধ করছিল ঐ চা তৈরি করবার প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে যেন সেটা সহসা বলাকার মন থেকে দূর হয়ে যায়।

কিচেনে ইলেকট্রিক আর গাস ওভেন দুই-ই ছিল, চা তৈরির সরঞ্জামও ছিল।

কিন্তু সব ছড়ানো ও এলোমেলো।

বলাকার ভারি হাসি পায়।

কি অগোছাল মানুষটারে বাবা। শিল্পী মাত্রেই বোধহয় এমনি হয়। সর্বক্ষণ স্বপ্নের জগতেই থাকে।

বলাকার পিছনে পিছনে রাজেশও কিচেনে এসে ঢুকেছিল।

রাজেশ স্মিত হাস্যে একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই বলল, একটা চাকর আমার প্রডিউসার বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আমার ভাগ্যে টিকল না। এক রাত্রি আর একটা দিন কাজ করে 'থোড়া ঘুমকে আতা হ্যায়' বলে সেই যে সে কাল সকাল ছ'টায় চলে গেছে এখনো প্রত্যাবর্তন করেনি।

---সে কি!

---মনে হচ্ছে অগস্ত্য যাত্রা।

তাহলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে?

খাওয়া তো হোটেলেই সারি। শুধু চা-টা তৈরি করে দিচ্ছিল আর ফুট-ফরমাস খাটছিল।

যান আপনি---ভিতরে গিয়ে বসুন, আমি চা তৈরি করে আনি----

সত্যি, আপনাকে চায়ের কথা বলে এমন বিব্রত করলাম মিস্ সেন। রাজেশ বিব্রত কণ্ঠে বলল।

কিছু না, আপনি ভিতরে যান ত, দেশলাইটা শুধু দিন আপনারা ।

বলাকার হাতে দেশলাইটা তুলে দিয়ে রাজেশ ভিতরে চলে গেল।

গ্যাস ওভেন জ্বালিয়ে কেতলি পরিষ্কার করে জল চাপিয়ে দিল বলাকা।

চায়ের জল যতক্ষণে হল তার মধ্যেই ক্ষিপ্রহাতে বলাকা কিচেনটা গুছিয়ে ফেলল।

ময়লা সব পরিষ্কার করে ফেলল।

॥ ১০ ॥

এক কাপ চা নিয়ে বলাকা যখন পাশের ঘরে এল, রাজেশ তখন একটা বাঁধানো লাল খাতায় গুণ গুণ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কি যেন লিখছিল।

এই নিন চা---

হয়ে গিয়েছে---কিন্তু আপনার চা কই?

আছে আনছি---ক্ষিপ্র অথচ লঘু পায়ে বলাকা কিচেনে গিয়ে ঢুকল।

এবং একটু পরেই আর একটি চায়ের কাপ হাতে ঘরে এসে ঢুকল, কই---খাননি এখানো! খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে চা!

মুখোমুখি একটা সোফায় বসতে বসতে বলাকা মৃদু হেসে বলল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে রাজেশ বলল, সত্যিই ভাল হয়েছে---

শ্রীমান বাহাদুরের হাতের তৈরি চা তো পান করেননি---তাহলে বুঝতেন দু'দিন ধরে সে আমায় কি সুধা পান করাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে দুজনার মধ্যে গল্প জমে ওঠে---ওদিকে রাতও যে কখন একসময়, ন'টা প্রায় বাজে কারোরই সেদিকে খেয়াল নেই।

হঠাৎ এক সময় কথার মাঝে বলাকা বলল, আজ গানের রেকর্ডিং কেমন হল আপনার?

শুনবেন? রাজেশ বলল, চলুন শোবার ঘরে, টেপ করে এনেছি—

দুজনে শোবার ঘরে এল, দামী পোর্টেবল জাপানী টেপ রেকর্ডার। টেপ লাগিয়ে সুইচ অন করে দিল রাজেশ।

প্রথম গানটা একটা ক্যাবারে ডান্সের সিকোয়েন্স—কেমন হয়েছে বলবেন? রাজেশ বললে।

গম্ গম্ করে উঠল মাইক বাজনার বৈচিত্র্যে---নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ।

মেয়েলী কণ্ঠের গান--খুব লাউড ও সেক্সী সুর—

প্রথম গানটা শেষ হবার পর শুরু হল রাজেশের গলাতেই একটি গান—

আপনার গলা---বলাকা বলল।

হ্যাঁ—রাজেশ বললে।

তারপর গানটা শেষ হতে বললে, বাইরের লোক বোধহয় আমিই প্রথম আপনার গানটা শুনলাম।

এই দুটো গানাই নাকি? বলাকা শুধায়।

হ্যাঁ—আর একটা টেপ করার কথা ছিল কিন্তু সময় হল না। তারপরই একটু থেমে ডাকে, মিস্ সেন—

কিছু বলচেন?

হ্যাঁ---আপনারও এখনো রাতের খাওয়া হলোনা চলুন না, দুজনে হোটেলে খেয়ে আসা যাক্।

না না, সত্যিই তো অনেক রাত হয়ে গিয়েছে---ছি ছি একে আপনার অসুস্থ শরীর তার উপরে—

এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ---তাছাড়া এমন কিছু রাত হয়নি---সাড়ে দশটার আগে আমি রাত্রে খেতে যাই না—

আপনারা শিল্পীরা বড্ড অনিয়ম করেন---অথচ আপনাদেরই বেশী প্রয়োজন নিয়ম মেনে চলা।

কেন?

কেন কি? একজন উঁচুদরের শিল্পীর কাছে মানুষের কত প্রত্যাশা তা জানেন?

খুব প্রত্যাশা বুঝি?

হ্যাঁ, কিন্তু না, আর দেরি নয়---চলুন, ওঠা যাক—

আপনি আমার সঙ্গে আজ হোটেলে খেলে কিন্তু সত্যিই আমি খুশি হতাম মিস সেন --

রাজেশের গলার স্বরে এমন মিনতি প্রকাশ পায় যে বলাকা আর না বলতে পাবে না।

বলে, বেশ চলুন।

হোটেলে সে রাত্রে আহারের পর ট্যাক্সিতে করে যখন বলাকার হস্টেলের সামনে তাকে রাজেশ নামিয়ে দিয়ে গেল রাত তখন সাড়ে এগারটা।

সমস্ত হস্টেল নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে---সব ঘরে আলো নিভে গিয়েছে।

বেল বাজাতেই দারোয়ান এসে দরজা খুলে দিল।

অনেক রাত্রে ঘুম এসেছিল বলাকার সে রাত্রে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় ভৃত্যের ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল।

দিদিমণি আপনার ফোন।

বলাকা একটু বিস্মিতই হয়। এত সকালে কে আবার তাকে ফোনে ডাকচে?

ঘরে ঘরে তখনও দরজা সবই বলতে গেলে বন্ধ—একমাত্র হস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট্ সুলতাদিব ঘরের দরজাটা খোলা।

খুব ভোরে ওঠা সুলতাদির বরাবরের অভ্যাস।

করিডর দিয়ে যেতে যেতে সুলতাদির ঘরটা পড়ে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

গুণ গুণ করে গীতার শ্লোক আওড়াচ্ছেন তিনি, বলাকা শুনতে পায়।

করিডরের শেষ প্রান্তে লবিতে ফোন।

রিসিভারটা তুলে নিল বলাকা, হ্যালো।

মিস্ সেন—সুপ্রভাত—আমি রাজেশ।

সঙ্গে সঙ্গে গলাটা চিনতে পেরেছিল বলাকা—নাম না বললেও সে চিনতে পারত। ফোনে রাজেশের গলা চিনতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নিশ্চয়ই অসময়ে? রাজেশ বলল।

না—না—কি ব্যাপার?

কি জানি কেন মনে হল আপনার সঙ্গে ফোনে একটু কথা বলি—তাই ফোন করে বসলাম। জানেন— কাল রাত্রে একটুও ঘুম হয়নি।

তাহলে আমারও হয়নি। দুজনেই তাহলে আমরা কালকের রাতটা বিনিদ্রই কাটিয়েছি—বলাকা বলল।

আপনার কথা জানি না, তবে কাল বোধহয় প্রথম আমার বিনিদ্র রজনী গেল। আপনার আজ ডিউটি আছে?

হ্যাঁ—এগারটায় ম্যাড্রাস ফ্লাইটে। সেখান থেকে দিল্লী। তারপর দিল্লী টু বম্বে—রাত দশটার পর ছুটি।

তার মানে আজ রাত্রে আপনি বম্বেতে?

সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

খুব ভাল হল। আমি ইভনিং ফ্লাইটেই বম্বে যাচ্ছি আজ।

কই, কাল তো কিছু বললেন না!

মনে ছিল না কথাটা—ভুলেই গিয়েছিলাম। ফিরে আসবার পর রাত বারটায় ট্রাংক কল এল বম্বে থেকে—remind করে দিতে মনে পড়ল। আজ তাহলে রাত্রে We can have dinner together! এবং আমি বম্বে এয়ারপোর্টেই আপনার জন্য অপেক্ষা করব—সেই কথাই তাহলে রইল। সুপ্রভাত।

বলাকাও সুপ্রভাত বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে খুশি খুশি মনে তার ঘরে ফিরে এল।

হস্টেলের অন্যান্য সকলের একজন দুজন করে ঘুম ভাঙতে শুরু হয়েছে তখন।

শয্যার উপর গা-টা ঢেলে দিল।

শিয়রের ধারে টিপয়টার উপরে ছোট ট্রানজিস্টারটা ছিল, সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল—সুইচ অন্ করতেই গান ভেসে এল—

এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।

এ কি!—রাজেশের গলা!

রাজেশের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে আকাশবাণী কলকাতা থেকে।

বলাকা ট্রানজিস্টারটা তার গালের উপর চেপে ধরে।

বার বার অস্ফুট কণ্ঠে বলতে থাকে—রাজেশ! রাজেশ—রাজেশ!

সকাল সাড়ে ন'টায় এয়ার লাইনস-এর গাড়ি এল।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে ডিউটিতে রিপোর্ট করে হঠাৎ মনে হয় বলাকার—রাজেশের তো আজ সকালে কোন প্রোগ্রাম নেই, সে হয়তো পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটেই আছে। তাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ডায়েল করে বলাকা।

একটু পরেই রাজেশের গলা শোনা গেল, হ্যালো—

আমি মিস সেন—বলাকা।

কোথা থেকে? এয়ার পোর্ট থেকে নিশ্চয়ই—যাননি এখনও?

না—এগারটা পনেরয় ফ্লাইট—এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরী। কি করছেন?

একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলাম।

সত্যি? একটু ফোনে গেয়ে শোনান না।

শোনাব আজ রাত্রে—
ঠিক তো?
হুঁ!

দিল্লী টু বম্বে ফ্লাইটটা একটু লেটই ছিল।
অ্যারাইভ্যাল ছিল রাত দশটা পঁয়ত্রিশে—পৌছল এগারটা বাজতে দু'মিনিট আগে।
একে একে প্যাসেঞ্জাররা সব বের হয়ে এল—লাউঞ্জের এক পাশে প্রবেশ পথের দিকে দৃষ্টি রেখে রাজেশ বলাকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।
সেও কলকাতা থেকে পৌঁচেছে মাত্র মিনিট কুড়ি আগে।
হোটেলে একটা ফোন করে দিয়ে দুজনার মত ডিনার রাখবার নির্দেশ দিয়ে লাউঞ্জেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বলাকার জন্য রাজেশ।
এক সময় বলাকাকে দেখা গেল—টারম্যাক দিয়ে এগিয়ে আসছে। পরনে আকাশ নীল রংয়ের কাঞ্জিপুরম শাড়ি, কাঁধে ঝোলানো সাদা ব্যাগ।
মাথার চুল চূড়ো করে খোঁপা বাঁধা।
দুজনে চোখাচোখি হতেই পরস্পর পরস্পরকে হাসিতে অভ্যর্থনা করল।
ফ্লুরোসেন্ট আলোয় সেদিন রাজেশের সত্যিই বলাকাকে অপরূপ লাগছিল।
ঐ দিনই রাত্রে সী বীচে দুজনে বালির উপরে বসে—রাজেশ এক সময় বলাকার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, লাউঞ্জের গেট দিয়ে তোমাকে—মানে আপনাকে—
সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল বলাকা, না না না—
কি না, না—
আপনি নয় আর, তুমিই বলুন—
তবে তুমিও আপনি নয় আর—বল তুমি?
আকাশে সেদিন চাঁদের আলোর যেন বন্যা বইছিল—ফেনায়িত উচ্ছ্বসিত সাগর তরঙ্গে তরঙ্গে সেই চাঁদের আলো যেন গলে গলে পড়ছিল।
শেষ বসন্তের এক রাত্রি।
পশ্চাতে আলোকিত বোম্বাই শহরের রাত্রির ছবি।
রাত্রি সাড়ে বারোটা, বোম্বাই শহরের কিছুই নয় যেন।
রাজেশ বলাকার একখানি হাত তুলে নিয়েছিল হাতে।
বলাকা বলল তারপর? কি বলছিলে বললে না? শেষ করলে না?
তোমাকে লাউঞ্জের গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে আমার কি মনে হয়েছিল জানো?
কি?
সত্যি, অপরূপা। যেন এক আকাশপরী।
খিল খিল করে হেসে ওঠে বলাকা, ও মা—সে কি?
হ্যাঁ—সত্যি। আকাশ নীল শাড়িতে সত্যিই তুমি যেন অপরূপা হয়ে আমার চোখের সামনে আবির্ভূতা হয়েছিলে—
যাক—এতদিনে তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—
নিশ্চিন্ত, মানে? রাজেশ শুধায়।
মানে এতকাল সবার মুখেই শুনে এসেছি অতি সাধারণ একটি মেয়ে আমি—
তাই বুঝি?
হুঁ! অতি সাধারণ অসংখ্য বাঙালী মেয়েদের মত একজন।
যারা বলে অতি সাধারণ তুমি, তাদের দৃষ্টি নেই। তারা দেখতে জানে না।
আঃ, আর মরলেও আমার দুঃখ নেই। অন্ততঃ জেনে যেতে পারলাম একজনের চোখেও আমি অপরূপা হয়েছিলাম জীবনের কোন এক মুহূর্তে—
কোন এক মুহূর্তে নয়—রাজেশ বলেছিল, আমার চোখে তুমি চিরদিনই অপরূপা থাকবে—
বলাকার দু'চোখের কোলে জল এসে গিয়েছিল।

তাকিয়ে ছিল সে দূর সমুদ্রের দিকে—চুপচাপ।

কোন জবাব দিতে পারেনি—

রাজেশ হাত দিয়ে তার গলাটা ধরে মুখটা তার দিকে ফেরায়।

এই—কি হল?

কিছু না তো, বলাকা মুখটা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

না। বলতেই হবে—বল!

রাজ! —সেই রাত্রেই প্রথম বলাকার মুখ থেকে ঐ আদরের সম্বোধনটি উচ্চারিত হয়েছিল।

বলাকা বলেছিল, আমি যে কিছুতেই এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

কি বিশ্বাস করতে পারছ না?

তুমি যা বলছ তা সব সত্যি—

আজো সত্যি—কালও সত্যি থাকবে—পরশু—তারপর আমরা যতদিন বেঁচে থাকব সত্যিই থাকবে—বুঝেছ—বলতে বলতে রাজেশ দু'হাতে বলাকাকে বুকের পরে টেনে নিয়েছিল।

রাজ—

বল বলাকা—কথাটা বলতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিল রাজেশ।

কি?

মুখ তুলে তাকিয়েছিল বলাকা রাজেশের দু'চোখের দিকে।

না—রাজেশ বলেছিল, ও নাম নয়—বলাকা যেন কোন দূরের অধরার ইংগীত আনে—আকাশ পথে উড়ে যায়—ধরা যায় না—ধরা দেয় না—তোমাকে আমি অন্য নামে ডাকবো—একটা খুউব মিষ্টি নামে ডাকবো।

বলাকার ভারি মজা লেগেছিল।

বলেছিল কৌতুক স্মিত হাস্যে রাজেশের মুখের দিকে তাকিয়ে—কি নামে তুমি আমায় ডাকবে রাজ? বল না!

ভাবছি কি নামে তোমায় ডাকা যায়।

রাজেশকে যেন ভারি চিন্তিত মনে হয়, বলাকা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসে।

সামনে সমুদ্র—

ঢেউয়ের আথালি পাথালি—বালু বেলার উপরে।

পিছনে আলোকিত রাতের বোম্বাই শহর।

কি হলো ভেবে পেলে।

না—

এক কাজ করবে?

কি?

বাবা মা মারা যাবার পর থেকে আমার যে একটা ডাক নাম ছিল সেটা যেন ভুলেই গিয়েছি—বলাকা বললে?

ডাক নাম?

হ্যাঁ—জানি না তোমার পছন্দ হবে কিনা—

আহা—নামটাই বল না।

মোহর।

মোহর?

হ্যাঁ—মা বাবা আমাকে ঐ নামেই ডাকত একদিন।

বা এইতো মোহর—মোহর—সুন্দর নাম। মোহর—মোহর—মোহর—হ্যাঁ আজ থেকে তুমি আমার মোহর, একান্তই আমার মোহর—

উঁ—

সাড়া দেয় রাজেশের ডাকে মোহর।

মোহর—

কি?

আবার ডাকে রাজেশ, মোহর—মোহর—

॥ ১১ ॥

হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গল বলাকার।

স্টেলার কণ্ঠস্বর মাইকে—

লেডিজ এন্ড জেনটেলমেন—উইদিন এ ফিউ মিনিটস্ উই উইল বি রিচিং—বেইরুট—

জাম্বো জেটটা নীচের দিকে নামচে ধীরে ধীরে চক্রাকারে।

ঘড়িতে ফোর্টিন সিক্সটিন আওয়ার। একটু লেট।

জেট বিমান নামচে নীচে—বেইরুট বিমানবন্দরের টার্মিন্যালের আলো দেখা যাচ্ছে জানালা পথে।

এখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলটেজ।

ধীরে ধীরে বিরাট জাম্বো জেট এক সময় রানওয়ে স্পর্শ করল। নতুন মাটি—আরবের মাটি।

স্টেলা যাত্রীদের জন্য কফি তৈরী করছে।

সেই যাত্রীটি কেমন আছে এখন কে জানে। এসপ্রিণ চেয়েছিল মাথার যন্ত্রণার জন্য।

বলাকা প্যাজেস দিয়ে সেই সীটের দিকে এগিয়ে গেল।

যাত্রীটি জেগেই ছিল, একটা পিকটোরিয়ালের পাতা উল্টাচ্ছিল। বয়স রাজেশেরই মত হবে।

রোগা—পরনে দামী গ্রে কালারের টেরি-উলেন সুট।

How are you feeling Sir now!

Fine! Thank You.

এখন কিছু খাবেন? এক কাপ কফি! বলাকা শুধায়।

না তারপরই একটু ইতস্তত করে বললে, May I have a drink !

নিশ্চয়ই! What drink you prefer Sir!

Whisky soda.

নিশ্চয়ই!

বলাকা স্টুয়ার্ডের কেবিনের দিকে চলে গেল। এবং একটু পরেই ট্রেতে করে গ্লাসে হুইস্কি আর সোডা সাইফনটা নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। তারপর যাত্রীর হাতে গ্লাসটা দিয়ে হুইস্কির সঙ্গে সোডা মিশিয়ে দিয়ে চলে গেল।

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট বাদে প্লেন আবার আকাশে উঠল।

এবার স্টপেজ সেই রোম এয়ারপোর্ট।

সেই ভদ্রলোক পর পর তিনটি পেগ নিলেন।

মনে পড়ে বলাকার, রাজেশ যে ড্রিংক করত সে জানত না। পরিচয় হবার মাস আষ্টেক পর প্রথম সে জানতে পারে রাজেশ ড্রিঙ্ক করে।

সেই রাজেশের বোম্বাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে এক রাত্রে।

বলাকার অফ ডিউটি ছিল সেদিন।

সন্ধ্যাতেই সেজে-গুজে রাজেশের ওবারলির অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হয়েছিল সে।

শীতকাল হলেও বোম্বাই শহরে শীতটা কোন দিনই তেমন বোঝা যায় না। বরং বর্ষার সময় একটু শীত শীত ভাব থাকে।

রাত আটটা বোম্বাই শহরে সবে সন্ধ্যা।

একটা ফিকে সবুজ রংয়ের সিল্কের শাড়ি পরেছিল বলাকা আর সাদা সিল্কের ব্লাউজ।

চারতলার একটা ফ্ল্যাটে তখন রাজেশ থাকত কয়েকমাস ধরে—বোম্বাইতে তখন সে অনেকগুলো ছবির কাজ করছে একসঙ্গে। ভারি ব্যস্ত।

ঘরে ঢুকেই বলাকা থমকে দাঁড়াল।

শয্যার উপরে একটা হারমোনিয়াম—চারপাশে কাগজপত্র ছড়ানো—বোধহয় সুর দিচ্ছিল কোন গানের।

পাশেই একটা টিপয়ে স্যাভাস্ রিগ্যাল স্কচ্ হুইস্কীর অর্ধসমাপ্ত বোতল—গোটা তিনেক সোডার বোতল।

একটা গ্লাসে রঙিন তরল পানীয়।

বলাকার আসার কোন কথা ছিল না।

তাছাড়া নূতন গানে সুর দেওয়ার সময় রাজেশ নিজেকে সব কিছু থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিত।

রাজ—

কে? মোহর। আরে, কার মুখ দেখে আজ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করেছিলাম—কি হল, অমন করে তাকিয়ে কেন? Oh! I see—drink করছি আমি তাই—তুমি কি জানতে না মোহর যে আমি drink করি—

দেখিনি তো!

হাতের গ্লাসটা পাশের টিপয়ে নামিয়ে রেখে উঠে গিয়ে রাজেশ বলাকার হাত ধরে এনে পাশে বসাল, বোস—

বলাকা চুপ করে আছে।

রাজেশ বলাকার গম্ভীর মুখটার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসে, রাজেশ চেয়ে চেয়ে দেখছিল—চাপা রাগে বলাকার মুখটা আরো বেশী যেন সুন্দর দেখায়।

ঘৃণা হচ্ছে নাকি?

—না ত।

—তবে হাসচো না কেন মোহর—হাসো— হাসো না—

—এইত হাসচি—

বলাকা মৃদু হাসল, খুব বেশি খাও না তো!

তা সব সময় কি মাত্রা ঠিক থাকে—বিশেষ করে যখন কোন গানে সুর দিতে হয়।—

রাজেশ দু'হাতে বলাকাকে আঁকড়ে বুকে টেনে নিল।

এই—কি হচ্ছে—ছাড় ছাড়—এখুনি হয়তো কেউ এসে পড়বে।

আসবে না। তাছাড়া এলেই বা কি!

লজ্জা করবে না? রাজেশের বুকে মুখ রেখে বলাকা বলে।

বাঃ, লজ্জা করবে কেন। আমি তো কোন দুষ্কর্ম করছি না, স্রেফ প্রেম- তাও আমারই প্রণয়িনীর সঙ্গে—

খানিকটা আদর খাবার পর—

বলাকা বলে, রাজ—এসে তোমাকে ডিসটার্ব করলাম তো!

তিলমাত্রও নয়—বরং এনে দিলে নূতন প্রেরণা। বিশ্বাস কর মোহর, যেদিন থেকে তোমায় পেয়েছি আমার সুরের জগতে যেন নূতন এক প্রেরণা এসেছে। জানো, গত মাসে যে ছবিটিতে সুর দিয়েছিলাম তার চার চারটে গান সুপারহিট করেছে—and সেটা কার ক্রেডিট্ জানো?

—কার?

-all credit yours!

বাঃ সুর দিলে তুমি আর ক্রেডিট্ হল আমার!

তুমি যে সাক্ষাৎ মূর্তিমতী সুর আমার—

রাজেশের বুকে নিজের মাথা ঘষতে ঘষতে বলাকা বলে, রাজ এত ভালবাস সত্যি তুমি আমাকে?

হায় দেবী, এতদিন পর বোধগম্য হল সে সত্যটি তোমার?

অনেক আগেই তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে তবু কেমন ভয় ভয় করে।

ভয় ভয় করে? সেকি! কেন?

আমার কথা তো সব তুমি জানো না—সেই জ্ঞান হওয়া অবধি—

কিছুই জানতে চাই না আমি কিছু না—শুধু জানি তুমি আছো— আমি আছি—

তারপর একটু থেমে রাজেশ বলে।

আমার অতীতটাও তো তুমি জানো? কিছুই তো তোমার অজানা নেই—

আমার যে কিছুই নেই—না করলাম কোন পাশ বা ভাল করে লেখাপড়া—না জানি গাইতে গান—তাই তোমার পাশে নিজেকে যখনই কল্পনা করি মনে হয় কিছুই যে আমার নেই—

আছে গো আছে—তুমিই যে আছ তোমার মধ্যে—আমার কল্পলোকের অপরূপা—বলতে বলতে

আদরে আদরে যেন ডুবিয়ে দেয় রাজেশ বলাকাকে বুকের পরে টেনে নিয়ে।

অসহায় বলাকা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয় রাজেশের বাহুর মধ্যে।

হঠাৎ ঐ সময় দরজায় নক্ পড়ে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে রাজেশের বাহুপাশ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষিপ্রহাতে বেশ বাস ঠিক করে নিয়ে বলাকাই গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়।

রাজেশের ভৃত্য জেকব।

বলাকা জেকবের পরিচিত। আগেও দেখেছে তাকে তার প্রভুর অ্যাপার্টমেন্টে।

জেকব মৃদু হাসে বলাকার দিকে চেয়ে--।

---মেম সাব।

---কেমন আছো জেকব?

---ভাল, আপ্ কেইসা হ্যায় মেমসাব---

---ভাল---

রাজেশ জেকেবের দিকে তাকিয়ে ডাকলে, জেকব্---

ইয়েস্ স্যার---

আজ রাত্রে যে দুজনার মত ডিনার চাই--

ওতো হামে মালুম হো গিয়া স্যার।

বলাকা উঠে দাঁড়ায়---

কি হলো মোহর উঠচো কেন! রাজেশ বললে।

দেখি কিচেনে যাই---

না না-- ও জেকবই আজ করবে সব।

॥ ১২ ॥

বেইরুট এয়ারপোর্ট থেকে জাম্বো জেট রোমের পথে উড়ে চলেছে।

আবার ২৩ নম্বর সীটের সংকেত নিয়ে লাল আলো জ্বলে উঠলো।

বলাকা এগিয়ে গেল---

বলাকা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই ভদ্রলোক বললেন, may I have another drink

বলাকা যেন একটু থমকে যায়।

যাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে You had already four sir---

Yes! Yes---I know---দিন আর একটা---

বলকা আর কি করে---ট্রেতে করে আর একটা ড্রিংক নিয়ে এলো।

সামনে এসে দাঁড়াতেই মৃদু আবৃত্তি কানে এলো ঃ

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি---পরে
ধীরে পাত্র লয়েছো করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বন-ভরা সরস বিম্বাধরে।

Your drink please- বলাকা মৃদু গলায় সাড়া দেয়।

হাত বাড়িয়ে দেয় যাত্রী, thanks--

আপনি কতদূর যাবেন?

বস্টন---

সেখানেই বুঝি থাকেন?

থাকবো না ভেবেছিলাম---ভেবেছিলাম বাংলাদেশেই গিয়ে থাকবো --কিন্তু শীলা এলো না-জানেন---কি বললে জানেন?

বলাকা চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে---

দীর্ঘ একটা চুমুক গ্লাসে দিয়ে, সে বললে, পার্থ তুমি আমায় ভুলে যাও---আমি---আমিও বললাম, বেশ তাই হবে---সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ণ টিকিট কেটে উঠে বসলাম প্লেনে---কেমন ঠিক করিনি?

বলাকা চুপ করে থাকে।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন,

আমার জীবনপাত্র উছলিয়া মাধুরী করেছ দান---
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।

আবারও সেই ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার।

বলাকা কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না।

ধীরে ধীরে ফিরে আসে।

ভদ্রলোক আবৃত্তি থামিয়ে আবার এক চুমুক দিলেন গ্লাসে।

ছোটবেলায় কথা মনে পড়ে বলাকার।

বাবা শ্রীকান্তবাবু ছিলেন সাধারণ এক কেরানী।

সামান্যই আয়, কিন্তু মা'র হাতের কল্যাণ স্পর্শে সংসারের অভাব বা দৈন্য কোনদিনই প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের একটি সংসার, কিন্তু ছিল সুখের সংসার। তিন বোন অলকা, তিলকা আর বলাকা।

বলাকা সবার ছোট। বি. এ. পরীক্ষা দেবার পরই দিদি অলকার বিয়ে হয়ে গেল।

বলাকা তখন বালিকা, ক্লাস টেনের ছাত্রী।

সে তখন স্বপ্ন দেখছে, এয়ার পাইলট হবে।

হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকেই সে স্বপ্ন দেখেছে নীল আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াবে।

কিন্তু স্বপ্ন তার সফল হল না, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে যখন সে কলেজে বি এস সি. পড়ছে হঠাৎ একটা ঝড় এসে যেন ওলোট পালট করে দিল।

সংসারটা তাদের যেন তছনছ হয়ে গেল অকস্মাৎ।

অলকার স্বামী সঞ্জীব তার আগের বছর মালয়েশিয়ায় চাকরি নিয়ে অলকাকে নিয়ে চলে গেছে।

তিলকা বরাবরই ছিল ভারী রুগ্ন। প্রায়ই থেকে থেকে কাসি সর্দি আর জ্বরে ভুগত।

হঠাৎ একদিন রাত্রে গলা দিয়ে রক্ত পড়তে শ্রীকান্তবাবু পরের দিন তাকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে।

জানা গেল টি. বি.।

টি. বি. তো আজকাল অনেকেরই হয়, সেরে যায়।

সেরেও যাচ্ছে চিকিৎসায়---তিলকা কিন্তু সেটা বুঝল না---সে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করল।

আর ঠিক তার সাতদিন পরে ওদের মা হার্টফেল করে মারা গেলেন।

বলাকাদের সুখের সংসারের চেহারাটা যেন হঠাৎ একদিনেই কেমন বদলে গেল।

শ্রীকান্তবাবু যেন কেমন হয়ে গেলেন।

এক মাসও গেল না তারপর—

শ্রীকান্তবাবু মাত্র সাত দিনের জ্বরে চোখ বুঝলেন।

অলকা নেই, তিলকা মারা গেছে মা বাবাও চলে গেল---বলকা একেবারে একা, ওরা তখন শ্যামবাজারে রামধন মিত্র লেনের বাসায়।

পাশের বাসায় নিরঞ্জন ও তার মা ভাগ্যে ছিল, তারাই বলাকাকে তাদের বাসায় নিয়ে যায়।

ওদের একমাত্র কাকা বালুরঘাটে উকিল---প্র্যাকটিস্ করেন, তাকে চিঠি লেখা হল, তিনি কোন জবাব না দিয়ে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দিলেন কেবল।

নিরঞ্জনের মা রত্না মাসীমা বললেন, ভদ্রলোক মোহরের এত বড় বিপদের দিনে এত নিকট আত্মীয় হয়েও চিঠির একটা জবাব পর্যন্ত দিলেন না।

বলাকা বললে, ও টাকা আমি ফেরত দেব মাসীমা। আর যেমন করে হোক একটা চাকরি খুঁজে নেব---যে ক'টা দিন চাকরি না পাই আমাকে আপনার এখানে থাকতে দেবেন তো!

নিশ্চয়ই মা, থাকবে বৈকি।

নিরঞ্জনের বোন রেখা থাকত শান্তিনিকেতনে হস্টেলে, সে মাত্র দুদিন আগে ছুটিতে বাড়ি

বলাকার বন্ধু—এবং তার চাইতে বছর খানেকের বড় রেখা।

রেখা সব শুনে বলল, তোর যতদিন খুশি থাকবি এখানে মোহর---।

না রে, বেশীদিন থাকব না, একটা চাকরি পেলেই—

চাকরি! বি. এস্-সি. পরীক্ষাটা দিবি না?

কি হবে দিয়ে? ভেবেছিলাম, বি. এস্-সি. পাশ করে এয়ার পাইলটের ট্রেনিং নেব---তা তো আর হবে না—

কিন্তু কি চাকরিই বা পাবি?

একটা কিছু কি আর জোগাড় করে নিতে পারব না!

তবু রেখা আর তার মা বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু বলাকা তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি-

কাকার প্রেরিত পঞ্চাশটি টাকা ফেরত পাঠিয়ে সে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে চাকরির সন্ধানে ফিরতে লাগল।

কিন্তু এ বাজারে চাকরি পাওয়া কি এতই সোজা।

ছ'টা মাস ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বলাকা ঠিক সেই সময় কাগজে এয়ার হোস্টেসের বিজ্ঞাপন দেখে ফটো সমেত একটা অ্যাপলিকেশন পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু তারপর প্রায় দেড় মাস গত হতে চলল—কোন জবাব এল না।

অ্যাপলিকেশনের দেড়মাস পরে বলাকা যখন আশা ছেড়েই দিয়েছে তখন হঠাৎ এল এক ইন্টারভিউ লেটার---দিল্লী অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে হবে।

হবে না জানত বলাকা, তবু মাসীমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিল্লী চলে গেল ইন্টারভিউ দিতে।

আর আশ্চর্য! চাকরিটা হয়ে গেল।

এয়ার পাইলট হতে চেয়েছিল বলাকা---হল এয়ার হোস্টেস্।

রংটা কালো হলেও সুগঠিত দেহ আর কালোর উপরে চমৎকার একটা আল্গা শ্রী আছে---চট্‌পট কথা বলতে পারে---ইংরেজী তো ভালই বলত, হিন্দিও মোটামুটি বলতে পারত তাই চাকরিটা হয়ে গেল।

বলাকার এয়ার হোস্টেস জীবন শুরু হল।

॥ ১৩ ॥

জাম্বো জেট বিমান উড়ে চলেছে রোমের দিকে।

আকাশে ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে।

অদ্ভুত একটা আলোছায়ার খেলা চলছে যেন শূন্য মার্গে। মর্ণিং টি সার্ভ করার সময় হয়ে এল।

কেবিনের মধ্যে স্টেলা চা বানাতে ব্যস্ত।

কঁ কঁ—ইলেকট্রিক বাজারটা বেজে উঠল ২৩নং সীটের।

বলাকা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল—সেই মধ্যরাত থেকে যিনি মদ্যপান করছেন।

গুডমর্ণিং—বলাকা বলল।

মর্ণিং—মাই গ্লাস ইজ এম্পটি --মে আই হ্যাভ ওয়ান মোর- -

যাত্রীর মুখের দিকে তাকাল বলাকা, কি যেন বলবার চেষ্টা করল---কিন্তু যাত্রী আবার বলল প্লিজ—

ইউ হ্যাভ অলরেডি ফাইভ পেগস্ স্যার---

প্লিজ---ওয়ান মোর।

হাতের গ্লাসটা এগিয়ে দিল পার্থ—ভয় নেই আপনার--ও চার পাঁচ পেগে আমার কিছু হবে না।

কথায় সামান্য জড়তা লক্ষ্য করে বলাকা। হাত বাড়ায় গ্লাসটা নেবার জন্য।

তিন বছর আমি এক ফোঁটা ড্রিংকও করিনি---। Promised! শীলার কাছে Promise করেছিলাম কিন্তু আজ আর তো সে বন্ধনও আমার নেই। সে আমাকে মুক্তি দিয়ে গিয়েছে---অমলের সঙ্গে সে সুখে থাক—Let them be happy! আর তাই তো আমি আবার বস্টনে পালিয়ে যাচ্ছি।

বলাকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের কথা শুনছিল।

তার পাশের সীটটা খালি—সেখানেও কোন যাত্রী নেই।

পিছনে সামনে এবং পাশের যাত্রীরা তখনো নিদ্রাভিভূত।

কিছু মনে করবেন না—Please আর একটা পেগ এনে দিন।

বলাকা আর কোন কথা বলল না শূন্য গ্লাস হাতে প্যানট্রির দিকে চলে গেল।

একবার ভাবল দেবে না, আবার কি ভেবে গ্লাসে ড্রিংক ঢেলে দিল।

গ্লাসটা তুলে নিতে নিতে যাত্রী বলল, Thanks! don't worry! মাতাল হব না আমি—

ইতিমধ্যে পাশের সীটে রক্ষিত ছোট অ্যাটাচিটায় নজর পড়ে গেল বলাকার—তার উপরে ইংরেজীতে লেখা—পি. সিনহা—

বলাকা বলল, ডোণ্ট্ মাইণ্ড বলছিলাম, সামান্য একটা ব্যাপার তার জন্য তখন থেকে আপনি একটার পর একটা গ্লাস শেষ করছেন—

সিনহা মুখ তুলে তাকাল—গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিল কিন্তু দেওয়া হল না।

সামান্য ব্যাপার কি বলচেন, I had a rude shock! কোন মেয়ে—বিশেষ বাঙলাদেশের কোন মেয়ে যে এমন করে একজনের চরম বিশ্বাসের উপরে আঘাত হানতে পারে—

হয়তো আপনার সেটা ভুল—

ভুল! হ্যাঁ, হয়তো ভুলই করেছিলাম তাকে বিশ্বাস করে—কিন্তু সে সব কথায় আর কি হবে! Past is Past. বলতে বলতে সিনহা ঠোঁটের কাছে গ্লাস তুলে নিয়ে একটা দীর্ঘ চুমুক দিল। এবং তারপর অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলাকা আর দাঁড়াল না।

বুঝতে পারল নেশার ঝোঁকে হঠাৎই হয়তো মুখ খুলেছিল ভদ্রলোক অতঃপর আর সে মুখ খুলবে না।

বলাকা ফিরে এল প্যানট্রিতে।

যাত্রীরা ততক্ষণে অনেকেই জাগতে শুরু করেছে—স্টেলা আর অন্য একটি এয়ার হোস্টেস্ মর্ণিং কফি ও চা পরিবেশন করছে।

জেট বিমান ছুটে চলেছে শূন্য আকাশ পথে রোম বিমানবন্দরের দিকে।

॥ ১৪ ॥

রাজেশও তো তার সঙ্গে প্রতারণাই করেছে।

হ্যাঁ। প্রতারণা ছাড়া আর কি।

অথচ মূর্খ সে—একবারও বুঝতে পারেনি—সন্দেহ মাত্রও করেনি—ভেবেছিল সে ভালবাসা বুঝি কোন দিন শেষ হবে না।

জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন। বন্ধনই বটে।

সে রাত্রে—রাত তখন অনেক। মধ্যগগনে চাঁদ।

সারা বোম্বাই শহর যেন নিদ্রামগ্ন। শুধু বোধ হয় জেগেছিল সমুদ্রতটে তারা দুজনে পাশাপাশি—আর জেগেছিল সম্মুখে দিক্ দিগন্ত বিস্তৃত উর্মিমুখর সাগর।

মোহর—রাজেশ তার মাথা বলাকার কোলে রেখে গা-টা ছড়িয়ে দিয়েছিল বালুকারাশির উপর।

রাজেশের মাথায় হাত বুলাচ্ছিল বলাকা।

উঁ—সাড়া দেয় বলাকা রাজেশের ডাকে।

এ রাত যদি না শেষ হত?

এবারে গাত্রোত্থান করতে হবে মশাই—খেয়াল আছে—রাত এখন কত?

কত রাত আর— এখন নিশ্চয়ই ফুরুতে বাকী আছে—

রাত দুটো—ওঠ—এই—ওঠ বলচি—

ভাগ্যে সে রাত্রে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল নচেৎ হেঁটে হেঁটেই হোটেলে ফিরতে হত দুজনকে।

সে রাত্রে কিছুতেই বলাকাকে হস্টেলে ফিরে যেতে দেয়নি রাজেশ। জোর করে ট্যাক্সিটাকে বিদায় করে দিয়েছিল রাজেশ।

ট্যাক্সিওয়ালার সামনে বলাকা রাজেশের সঙ্গে কোন তর্ক করেনি, কিন্তু ঘরে ঢুকে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, এটা কি হল?

কিসের কি হল? কথাটা বলতে বলতে রাজেশ শয়নের ব্যবস্থা করতে থাকে।

রাতটা এখানে থাকতে হবে নাকি!

সেই রকমই তো স্থির করেছি---

বুঝলাম—তা bed room তো মশাইয়ের একটাই---শয্যাও তো একটি মাত্র দেখছি।

বলাকা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল আর রাজেশ বিছানা থেকে একটা বেডকভার আর দুটো বালিশ হাতে করে উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

বলাকার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে রাজেশ বলল, কেন আমার সঙ্গে এক শয্যায় রাত্রি যাপন করতে তোমার আপত্তি আছে নাকি?

বলাকা রজেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাজেশ বিছানার উপর বসে পড়ে বলল, তাকিয়ে দেখছ কি?

তোমাকে।

রাজেশ হেসে ফেলে। হাসতে হাসতেই বলল, ভয় নাই ওরে ভয় নাই

ভরসাও নাই—

কিন্তু একদিন তো একই শয্যায় শুতেই হবে— আর সে শয্যাও হয়তো ঐ হাতেই রচিত হবে।

তা সেই দাবীটাই আজকের রাত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার মতলব নাকি।

ক্ষতি কি, যা অবশ্যম্ভাবী তাকে মেনে নিতে পারাই তো দূরদৃষ্টির লক্ষণ।

অত দূরদৃষ্টিতে আমার প্রয়োজন নেই। কাছের দৃষ্টিটুকু স্বচ্ছ থাকলেই আমার চলবে।

তবে তাই হোক দেবী, আমি পাশের ঘরে চললাম—তুমি নির্ভয়ে এ শয্যার অধিকারিণী হও— ইচ্ছা করলে মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারো।

তুমি আমাকে কি ভাবলে বল তো?

ঠিক একটি বাঙালী মেয়ে—হেসে ফেলে রাজেশ, নাঃ আর না—চললাম।

রাজেশ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

না, তুমি এখানে শোও---আমি ঐ ঘরে শোব। বলাকা বলল।

তাই কি হয়, তুমি আমার অতিথি— এবং যেহেতু তোমার সোফায় রাত্রি যাপন অভ্যাস নেই কিন্তু আমার আছে—

তাত দেখতেই পাচ্ছি— বলাকা বলল।

তাছাড়া হয়ত বিবেকের দংশনে দংশিত হবো হাসতে হাসতে জবাব দেয় রাজেশ।

বিবেক যে দেখছি সত্যিই টনটনে? বলাকা বলে।

তা এখন পর্যন্ত আছে, তবে—

তবে?

তবে সত্যি কথা বলবো

বলেই রাজেশ মৃদু গলায় গেয়ে ওঠে--

নাইবা ঘুমালে প্রিয়,
রজনী এখনো বাকি।

গান থামিয়ে রাজেশ বলল, নাঃ চললাম— গুড্ নাইট --

রাজেশ ড্রয়িংরুমের দিকে বালিশ আর চাদর বগলদাবা করে পা বাড়ায়।

বলাকা পিছন থেকে ডাকে, এই---

কি হলো?

রাজেশ বলাকার ডাকে ঘুরে দাঁড়াল।

সত্যি,---এ আমার ভাল লাগছে না----

কি ভাল লাগছে না মোহর—

রাজেশ প্রশ্ন করে।

আমি এঘরে শোবো আর তুমি সোফায় রাত কাটাবে---

এই কথা—

না, না—সত্যি—

তাহলে এসো সারাটা রাত দুজনে মুখোমুখী গল্প করেই কাটিয়ে দিই—

কাল আমার ডিউটি আছে—

তবে?

অন্য কোন ব্যবস্থা হতে পারে না।

হুঁ। হতে পারে। আরও একটা ব্যবস্থা হতে পারে অবিশ্যি—

কি বল না?

একই শয্যা আধাআধি যদি ভাগ করে নিই—কিন্তু হে নারী! অতখানি দুঃসাহসিকা কি তুমি হতে পারবে।

রাজেশ কথাটা বলে বলাকার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসে।

বলাকার মুখটা লজ্জায় মহূর্তে যেন লাল হয়ে ওঠে।

চলি—

না—

তবে—

ঠিক আছে—

কি ঠিক আছে?

তাই হোক! এই ঘরেই—

বল কি—একই শয্যায়?

জ্বালাতন করো না—আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—তাছাড়া কাল সকালে সাড়ে ছয়টার ফ্লাইটে আমার ডিউটি—

সত্যি! ভয় করবে না?

ভয় করবে কেন?

যদি রাত্রে—

আঃ কি হচ্ছে—কিন্তু এ বেশ নিয়ে কিন্তু শুতে পারবো না—আমাকে একটা শাড়ি দিতে পারো?

হো হো করে হেসে ওঠে রাজেশ।

হাসচো যে?

শাড়ি কোথায় পাব—ভুলে যাচ্ছ কেন এখনো আমি একজন রীতিমত ব্যাচিলর—তবে আমার একস্ট্রা স্লিপিং সুট আছে চলবে?

তাই দাও।

রাজেশ আলমারী থেকে একপ্রস্থ স্লিপিং সুট বের করে দিল—বলাকা সেগুলো নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

একটু পরে সাজ বদলে ফিরে এসে সোজা অন্ধকারে শয্যায় গা ঢেলে দিতে দিতে বলল, আমি শুলাম।

আলো জ্বলবে—না নিভিয়ে দেব?

নিভিয়ে দাও। বলাকা চোখে বুজল।

একটু পরে রাজেশ ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে শয্যায় তার পাশে শুয়ে পড়েছিল।

কতক্ষণ তাদের দুজনারই ঘুম আসেনি চোখে।

তারপর পরস্পরের দুই বাহু পরস্পরকে অন্ধকারের মধ্যে কাছে আরো কাছে টেনে নেয়।

ঘুম আর আসেনি কারো চোখেই—বাকী রাতটুকু শুধু কথার মালা গেঁথেছে দুজনে।

হঠাৎ মাথার মধ্যে যেন ঝিম ঝিম করে ওঠে বলাকার।

জেট বিমান রোম বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়েছে।

নামছে ধীরে ধীরে—ভোরের আবছা আলো জানালা পথে ভিতরে এসে প্রবেশ করেছে।

সকাল ছ'টা পঞ্চাশ।

এক ঘন্টা স্টপেজ রোম বিমানবন্দরে।

মিস্ সেন! এস—চা রেডি— উর্মিলা কখন যেন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

বলাকা সামনের দিকে একটা খালি সীটে বসেছিল।

চোখ দুটো জ্বালা করছিল বলাকার।

সারাটা রাত্রি একটু চোখ বোজেনি।

উর্মিলা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার চোখ দুটো খুব লাল হয়েছে—কেঁদেছ নাকি সারা রাত!

কাঁদতে যাব কোন্ দুঃখে—

বলাকা হাসতে হাসতে বললে।

কেন, প্রেমিকের বিরহে—

উর্মিলা বললে।

বলাকা হাসল।

কিন্তু তোমাদের বিয়েটা হঠাৎ পিছিয়ে গেল কেন মিস সেন?

কি করি বল—ওর একটা কাজ পড়ে গেল—

তাই বলে কাজের জন্য বিয়ে পেছিয়ে দেওয়া? না বাবা, এমনটা কখনো শুনিনি—আমি হলে কিছুতেই রাজী হতাম না। তাছাড়া কোন শুভ কাজ কখনো ফেলে রাখতে নেই। জানত, কথায় বলে, there are many a slip between cup and lips.

বলাকার চোখে জল আসে না। চোখটা জ্বালা করে।

এই তো মিথ্যার শুরু।

কিন্তু এমন করে আর কত দিন ধরে আর কত মিথ্যা সে বলতে পারবে।

সত্য তো চিরদিন চাপা থাকবে না।

এ কি করলে রাজ তুমি - এ কি করলে? একটা হাহাকার যেন বলাকার বুকের মধ্যে গুমরে উঠতে থাকে।

আমি যে আমার সর্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম নিঃসংকোচে। তার প্রতিদান তুমি এমনি করে দিলে!

॥ ১৫ ॥

সেদিন সকালে ডিউটিতে যেতে দেয়নি রাজেশ।

বলেছিল, না এখন তোমার যাওয়া হতে পারে না মোহর।

সেকি—আমার যে ডিউটি আছে সকালের ফ্লাইটে—

থাক্ গে—

থাক গে মানে! চাকরী থাকবে না—

না থাকে নাই থাকলো—

হুঁ! তারপর?

রেজিগনেশন দেবে—

তারপর?

তারপর আর কি—আমার কাছে থাকবে তুমি।

তর সইচে না বুঝি?

ওসব বুঝি না—টেলিফোন করে দাও এয়ার অফিসে যেতে পারবে না—

কি বলব?

বলবে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে—কিম্বা পেটে—

শেষ পর্যন্ত তাই করতে হয়েছিল বলাকাকে। এয়ার অফিসে ফোন করে দিয়েছিল—তার শরীর ভাল না—সে যেতে পারবে না ডিউটিতে।

পরের দিন এবং তার পরের দিনও যেতে দেয়নি রাজেশ তাকে।

তৃতীয় দিন রাত্রে বলাকা বলেছিল, মতলবটা তোমার কি বল তো! তুমি কি আমাকে কাজে আর সত্যিই যেতে দেবে না!

কি হবে আর কাজ করে। রেজিগনেশান দাও। তারপর চল কোথাও ঘুরে আসি—

না, না—সে পরে হবে—

একটা কথা ভাবছি মোহর। চল, বিয়ের ব্যাপারটা সেরেই ফেলি।

বলাকা হাসতে হাসতে বলেছিল, সব যোগাড় যন্ত্র করতে হবে না—পুরুত ডাকতে হবে না—এখানে হিন্দু পুরুত পাবে কোথায় চাইলেই—

পুরুত দিয়ে কি হবে?

ওমা! সেকি—তবে বিয়েটা হবে কি করে শুনি?

কেন হবে না, হিন্দু ল' অনুযায়ী বিয়ে করব রেজিষ্ট্রী করে।

উহুঁ। বলাকা মাথা নেড়েছে।

উহুঁ কেন?

সবাই জানবে—সবাইকে ডাকবো—সানাই বাজবে—আলো জ্বলবে তবে না বিয়ে—ও তোমার রেজিষ্ট্রী বিয়েতে আমি রাজী নই—

রাজেশ হাসতে হাসতে বলাকার গালটা টিপে দিয়ে বলেছিল, কচি খুকী—বেনারসী পরে—টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে হবে—

নিশ্চয়ই—

বেশ—বেশ—তাই হবে।

বলাকা সেদিন রাজী হয়নি।

রাজী হলে হয়তো তাদের বিয়েটা হয়ে যেত দেড় বছর আগেই। কিন্তু তাতেই বা কি হত?

তারপর আজকের মত রাজেশ যদি তাকে ছেড়ে চলে যেত! বলত, বিয়ে নাকচ করে দিতে চাই এখন—আমি মণিকাকেই ভালবাসি—

হ্যাঁ মনে পড়েছে।

মণিকাকে সেবারই সে প্রথম বম্বেতে দেখে।

তিন দিন পরে সেদিন সকালেই ডিউটিতে জয়েন করবে বলাকা—শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে—অনেক বাদ বিতণ্ডার পর।

সকালে দুজনে বসে ঘরের মধ্যে ব্রেকফাস্ট করছিল—ঐ সময় দরজায় নক।

কে এল আবার—জেকব দেখ তো কে!

রাজেশ বললে।

জেকব দরজা খুলে দিতে গেল ফ্ল্যাটের।

বাইরে মেয়েলী গলা শোনা গেল, তোমার সাহেব আছেন?

জী—আপ কিধার সে আতি?

বোল যাকে তোমরা সাবকো—মণিকা মেমসাব আয়া।

মণিকা—এস এস এই ঘরে এস—তাড়াতাড়ি সাদর আহ্বান জানায় রাজেশ ঘর থেকে উচ্চ কণ্ঠে।

মণিকা এসে ঘরে ঢুকল।

মণিকাকে বলাকা সেই প্রথম দেখল।

বলাকার চাইতে মণিকা বছর দুয়েকের ছোটই হবে।

দিল্লীতে বাপ বড় চাকুরে—একমাত্র মেয়ে তাদের মণিকা।

রোগা লম্বা—গায়ের রঙ টকটকে গৌর। মণিকা সত্যিই সুন্দরী। কনভেন্টে পড়া মেয়ে।

মণিকাও ঘরে ঢুকে বলাকাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

রাজেশ সপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এস মণিকা—তোমাদের কারো সঙ্গে কারো পরিচয় নেই—এ হচ্ছে বলাকা—আর এ মণিকা—কিছুদিন আমার কাছে গান শিখেছিল—বলতে পারো আমার এক সময়ের ছাত্রী—

মণিকা ভারী হাসিখুশি ও চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে।

সে নিজেই বলাকার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেয়।

মণিকা বলেছিল, আপনার কাজটি কিন্তু ভারী সুন্দর—কেমন আকাশপথে উড়ে উড়ে বেড়ান—

বেশীদিন ভাল লাগে না মণিকা দেবী—
কিন্তু আমার খুব ভাল লাগত—অদ্ভুত একটা থ্রিল।
বলাকা হেসেছিল।
মণিকার দিকে তাকিয়ে রাজেশ বলে, তা তুমি হঠাৎ বম্বেতে?
বাবা মা'র সঙ্গে কাশ্মীর যাচ্ছি—
তাই নাকি?
হ্যাঁ—চলুন না আপনি আমাদের সঙ্গে—ভারী মজা হবে—
তা তো সম্ভব নয় মণিকা—রাজেশ বলল, আমার হাতে এখন অনেক কাজ—
বলাকা ইতিমধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছে।
সে বললে, রাজ, এবার আমি যাব।
রাজেশ ও মণিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতঃপর বলাকা চলে গিয়েছিল।
সেদিন কেন কথাটা একবারও তার মনে হয়নি।
কেন বুঝতে পারেনি বলাকা।
কিন্তু আশ্চর্য! একবারও সে ধরণের কথা মনে হয়নি বলাকার।
রাজেশের প্রেমে সে তখন যে আকণ্ঠ ডুবে আছে।
পরে দিন পনের বাদে রাজেশের সঙ্গে দেখা হতে বলাকা শুনেছিল—
মণিকা রাজেশকে ছাড়েনি—সঙ্গে করে তাকে কাশ্মীর নিয়ে গিয়েছিল সেবারে।
তাহলে বল—You had an nice time!
বলাকা হাসতে হাসতে বলে।
একটুও ভাল লাগেনি!
রাজেশ জবাবে বলে!
ভুস্বর্গ কাশ্মীর ভাল লাগল না! সে কি গো।
লাগবে কি করে। আমার মোহর যে পাশে ছিল না।
সত্যি!
হ্যাঁ—তাই ঠিক করে রেখেছি একসঙ্গে আমরা কাশ্মীর যাব। চল না—যাবে? এখনও তো সময় শেষ হয়নি—কাশ্মীরের season শেষ হয়নি।
তখুনি যাওয়া হয়নি—তবে পূজোর পরে সেবারে যদিও সিজন নয়—দুজনে কাশ্মীর গিয়েছিল, দিন দশকের ছুটি নিয়েছিল বলাকা।
কাশ্মীরের সে স্মৃতি— সেখানকার ডাল লেকে—হাউসবোটে আটটা দিন কি আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যেই না প্রতিক্ষণ কেটেছে।
গুলমার্গ—পহেলগাঁও—সোনমার্গ— কেবলই ওরা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে।
কখনো ট্যাক্সী—কখনো শিকারায়—কখনো ঘোড়ায় চেপে—কখনো পায়ে হেঁটে হেঁটে।
হাউসবোট-ওয়ালাতো ধরেই নিয়েছিল ওরা স্বামী স্ত্রী।
পহেলগাঁওর সে রাত্রিটা হোটেলে।
কি দুর্যোগ সেদিন ভুস্বর্গ কাশ্মীরে।
সকাল থেকেই—বৃষ্টি আর বৃষ্টি—সেই সঙ্গে চাবুকের মত ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। সবাই নিষেধ করেছিল তাদের সেদিন পহেলগাঁও যেতে—কিন্তু রাজেশ কারো কথায় কান দেয়নি।
সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ ট্যাক্সী নিয়ে বের হয়েছিল ওরা।
পথে গাড়ির এ্যাক্সেল ভাঙ্গল—
সেটা সারিয়ে আবার ঘন্টা তিনেক বাদে রওনা হলো।
পহেলগাঁও পৌছল বেলা তিনটে নাগাদ। অনেক কষ্টে হোটেলে ছোট একটা সিংগল রুম পাওয়া গেল।
রাত্রে দু'জনে ফায়ার প্লেস জ্বালিয়ে এক কম্বলের মধ্যে গা ঢেকে বসে।
মাঝরাত থেকে শুরু হলো তুষারপাত।
পেঁজা তুলোর মত সাদা তুষার।
সে রাত্রের সে স্মৃতিশয্যার চার চারটে কম্বল জড়িয়েও হি হি কাঁপুনী।

মোহর—
উঁ—
খুব শীত করছে।
আর পারছি না গো---
বুকের পরে টেনে নিয়েছিল রাজেশ বলাকাকে, অন্ধকার ঘরে---
ফায়ার প্লেসের একটা রক্তিমাভা ঘরের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়েছে।
মোহর।
উঁ—

জেট প্লেনটা ফ্রাঙ্কফুট বিমানবন্দরে নামছে।
এখানেও হল্টেজ এক ঘন্টা।
যাত্রীদের সব ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে এখানে।
এর পর লণ্ডন বিমানবন্দরে। সেখানেও প্রায় দেড় ঘন্টার জন্য থামবে—
এতক্ষণে বুঝতে পারছে বলাকা মাথাটা বিশ্রী রকম ধরেছে— কপালের দু'পাশের শিরা দুটো যেন অসহ্য এক যন্ত্রণায় টন্ টন্ করছে।
আশ্চর্য---ঘুরে ফিরে কেবলই রাজেশের কথা মনে পড়েছ কেন।
কেন মিথ্যা এখনো সে রাজেশের কথা ভাবছে।
রাজেশ তো তার জীবন থেকে মুছেই গিয়েছে।
রেখাকে একটা চিঠি দিতে হবে।
কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে এল সে।
বাড়িভাড়া অবিশ্যি অ্যাডভান্স দু'মাসের দেওয়া আছে---রেখাকে লিখে দিতে হবে ফার্নিচার ও বাসনপত্রগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কি লিখবে রেখাকে সে!--
রাজেশের সঙ্গে তার বিয়ে হল না। রাজেশ মণিকাকে বিয়ে করছে---
রেখা কি চিঠি পড়ে ভাববে না---মনে মনে বলবে না---একটা গর্দভ---জানতে পারিসনি এতদিন ব্যাপারটা।
না। সে জানতে পারেনি—ছলনায় ভুলিয়ে রেখেছিল রাজেশ এতদিন তাকে।
আর ভাববেই বা কি করে বলাকা—আর তো মণিকার সঙ্গে তার কোনদিনই দেখা হয়নি---
তবে তার সঙ্গে না দেখা হলেও রাজেশের সঙ্গে মণিকার দেখা হয়েছে নিশ্চয়।
রাজেশ সযতনে তার কথা তার কাছে এড়িয়ে গিয়েছে হয়ত।
আচ্ছা—মণিকাকে একটা চিঠি লিখলে হয় না—ঐ সঙ্গে। মণিকা--Congratulations—Thousand congratulations! তোমরা সুখী হও।
হ্যাঁ লিখবে---কিন্তু মণিকার ঠিকানা তো সে জানে না! নাই বা জানল, রাজেশের ঠিকানাতেই তো সে চিঠি দিতে পারে।
এক খামেই দুজনকে চিঠি।
রাজেশ তার চিঠি পেয়ে হয়তো ভাববে---হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে বলাকা।
হয়তো সেই চিঠি নিয়ে দুজনে কত হাসাহাসিও করবে। নাঃ, মাথাটার মধ্যে বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।
প্লেন ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করল।
জানালা দিয়ে এয়ারপোর্টের টার্মিন্যাল বিলডিংটা দেখা যাচ্ছে।
রৌদ্রালোকে ট্যারম্যাকটা ঝলমল করছে যেন।
আজ হয়তো বিকেলের দিকে রাজেশ তার চিঠিটা পাবে।
রাজেশ তো এখন কলকাতাতেই আছে।

॥ ১৬ ॥

হ্যাঁ চিঠি একটা সে লিখবে—
আর চিঠি যদি নাও লিখতে পারে---অন্তত কংগ্র্যাচুলেশন জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম।

যাত্রীরা কেউ কেউ নেমে গেল—

কেউ কেউ যে যার সীটেই বসে রইলো।

রোম শহরটাকেত আর দেখতে পাবে না—তবু ঐ রোমের মাটিতে একটু নামা।

রোম—

মনে পড়লো বলাকার—মাস আষ্টেক আগে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গানের একটা দল নিয়ে রাজেশ ইউরোপ ঘুরতে এসেছিল।

দিন পনেরোর প্রোগ্রাম।

রাজেশ অনেক বার বলাকাকে বলেছিল তার সঙ্গে যেতে কিন্তু বলাকা রাজী হয়নি।

রাজেশ বলেছিল, তবে আমিও যাবো না লিখে দিই—

ছিঃ তা কি হয়, ভারত সরকার কি ভাববে?

ভাবুক যা খুশী—

শেষ পর্যন্ত বলাকাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজেশকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

টুর শেষ করতে কিন্তু সেবারে পনের দিন নয়—প্রায় দেড়মাস লেগেছিল।

পালাম এয়ারপোর্টে যেদিন রাজেশের প্লেন পৌঁছাবার কথা বলাকা সেদিন এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিল। লাউঞ্জে এসে ঢুকতেই কাস্টমসয়ের চৌহদ্দি পার হয়ে বলাকার সঙ্গে রাজেশের চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল।

দুজনারই চোখে হাসি।

ভারী চমৎকার লাগছিল রাজেশকে চমৎকার নেভিব্লু সুটটা পরে। কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্সের পর দুজনে লাউঞ্জে এসে দাঁড়াল।

কেমন হলো—নিশ্চয়ই দারুণ সাক্সেসফুল।

বলাকা কলকণ্ঠে শুধায়।

না মোহর—শেষ তিনদিনের প্রোগ্রামে আমি গাইতে পারিনি।

কেন?

কি জানি, একটু যেন কেমন ইতস্ততঃ করেই বললে, পারলাম না—

কেন পারলে না?

গলাটা—গলাটা মানে কেমন—মানে গলার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি—

আর বেশী কিছু বলেনি রাজেশ—কেমন যেন এড়িয়ে গিয়েছে।

তারপরই রাজেশ থেমে গিয়েছিল হঠাৎ। আজ সবই মনে পড়ছে।

ও নিজেও সেদিন রাজেশের কথায় কোন গুরুত্ব দেয়নি।

সেই—হ্যাঁ—মনে পড়েছে বলাকার—সেই তারপর থেকেই—বার তিনেক যা দেখা হয়েছে রাজেশের সঙ্গে ওর—রাজেশের মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে ও।

অথচ কেন বুঝতে পারেনি!

রাজেশের মধ্যে পরিবর্তনও একটা যেন সত্যিই শুরু হয়েছিল। কেন তবে বুঝতে পারেনি। কেন। সেই সর্বদা আনন্দমুখর হাসি-খুশি রাজেশ যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

সর্বদাই কেমন অন্যমনস্ক।

সর্বদাই যেন একটু গম্ভীর।

কেন বোঝেনি বলাকা। কেন বুঝতে পারিনি তখন।

রোমের এয়ারপোর্টের টার্মিন্যালটা ভোরের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে।

॥ ১৭ ॥

পালাম এয়ারপোর্ট থেকেই একটা ট্যাক্সী নেয় ওরা।

ট্যাক্সী ছাড়বার পর—

বলাকাই ডাকে, রাজ।

কি?

বলাকা। রাজেশ ওর মুখের দিকে তাকায়।

শরীরটা কি তোমার ভাল নেই?

ভাল না থাকলেই বা কি করছি বল!

না, না—মাস খানেক complete rest নাও—

উপায় নেই মোহর—

কেন উপায় নেই। খুব আছে—

না—পনের দিনের প্রোগ্রাম ছিল এক মাস লেগে গেল। একজন প্রডিউসার ত গতকাল রোমেই ট্রাংক কল করে বলেছে—তার সুটিং আটকে আছে—আউটডোর সুটিংয়ে যাবার আগে তিনটে গান তৈরী করে দিতে হবে—আউটডোরে পিকাচারাইজেশন হবে সেই গান তিনটে।

তাই বলে মানুষের শরীর খারাপ হলেও করতে হবে কাজ এ কেমন কথা বুঝি না।

এমন ত কিছু স্ট্রেনিয়াস্ ব্যাপার নয়। বসে বসে গানে সুর দেওয়া—

কি বলছো তুমি রাজ। আমি ত জানি—সুর কম্পোজ করবার সময় কি সাংঘাতিক স্ট্রেন হয় তোমার—তুমি তাদের জানিয়ে দাও এখন হবে না।

বলাকা সে সময় কুতুবের কাছে একটা দোতলায় দু'কামরা ওয়ালা ফ্ল্যাট নিয়েছিল।

সেই দিকেই ট্যাক্সী ছুটে চলে।

কুতুবের চারপাশে তখন নতুন নতুন বাড়ি একটা দুটো করে গড়ে উঠেছে।

রাজেশ দিল্লীতে এলে দেখা সাক্ষাতের অসুবিধা হয় ওদের এয়ার ইনিডয়ার হস্টেলে তাই বলাকা ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিল।

রাজেশই এক সময় প্রশ্ন করে। এদিকে কোথায় যাচ্ছ মোহর?

চলই না—

কুতুবের দিকে যাচ্ছো মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ—

আমি ভাবছিলাম হোটেলে যাবো—

আমাকেও আসতে হয়—তোমাকেও আসতে হয় যখন তখন দিল্লীতে—তাই না ঐ ফ্ল্যাটটা নিয়েছি—আমি আসলে আমি উঠবো আর তুমি এলে তুমি উঠবে—বলতে পাবলে কি করে হোটেলের কথা।

রাজেশ কোন কথা বলে না।

বলাকার মনে হয় সে যেন কেমন একটা অন্যমনস্ক।

বলাকা আবার বললে, জানো কাঞ্চী আজকাল চমৎকার রাঁধতে শিখেছে তোমার প্রিয় ডিসগুলো। আর ফ্ল্যাটটা এমন ফিট ফাট করে রেখেছে। ও দিল্লী ছেড়ে যেতে চায়না—নচেৎ কলকাতায় যখন ফ্ল্যাট বা বাড়ি নিতাম ওকে নিয়ে যেতাম।

রাজেশের দিক থেকে কোন সাড়া আসে না।

বলাকা আপন খেয়ালেই বলে চলে, তোমার ত অনেক জানা শোনা আছে কলকাতায় লেখ না একটা ছোটখাটো বাড়ি খোঁজ করতে, আমাদের বিয়ের পরে ত একটা বাড়ি দরকারই হবে—কলকাতা শহরে বাড়ি পাওয়া যা প্রবলেম। আগে থাকতে সন্ধানে না থাকলে পাওয়া যাবে না।

রাজেশ তথাপি চুপ।

আচ্ছা শৈবাল বাবুকে লিখলে হয় না একটা বাড়ির জন্য। বেশ ছোট খাটো একটা বাড়ি—একটা বেড রুম একটা সিটিং রুম—হল ঘর হলেই ভাল হয়। হল ঘরটা মনের মত সাজাব—আর একটা তোমার নিজস্ব রুম থাকবে—তোমার মিউজিক রুম—সেখানে বসে বসে তুমি সুরের সাধনা করবে—ড্রাইভার বাঁয়ে—

ট্যাক্সী ড্রাইভার নির্দেশ মত বাঁয়ে চলল।

জায়গাটা বেশ খোলা মেলা।

তিনতলা একটা বাড়ির দোতলায় দুটো পাশাপাশি ফ্ল্যাট—তারই একটা ফ্ল্যাট। ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে রাজেশকে নিয়ে বলাকা দোতলায় উঠে গেল।

কলিংবেল টিপতেই কাঞ্চী এসে দরজা খুলে দিল।

মাত্র দুটো ছোট ছোট ঘর—একটা ডাইনিং স্পেস—ছোট একটা ব্যালকনী—দক্ষিণ মুখী।

কিচেন—বাথরুম পাশাপাশি।

ভাড়া করা কিছু ফার্নিচার দিয়েই বলাকা মোটামুটি সাজিয়েছিল।

বস—কফি খাবে?

রাজেশ এতক্ষণে কথা বললে, আপত্তি কি।

কাঞ্চী—দুপাপ কফি।

কাঞ্চী কিচেনের দিকে চলে গেল।

একটা সোফায় দুজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে।

এক একবার কি মনে হয় জান রাজ?

কি?

আচ্ছা আমাদের বিয়ের পরে দিল্লীতেই থাকলে কেমন হয়।

বেশত—তোমার যদি ইচ্ছা হয় মোহর—

নো মাই ডার্লিং—আমার একার ইচ্ছায় কিছু হবে না—দুজনের ইচ্ছা যা হবে তাই—কিম্বা একা তোমার ইচ্ছা হলেও চলতে পারে—

আর তোমার?

তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

বলাকা রাজেশের হাতটা নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে তার আঙ্গুলগুলো নিয়ে নাড়া চাড়া করতে থাকে।

দিল্লীতে ঐ সময় থেকেই বেশ ঠান্ডা পড়ে।

উত্তরের জানালা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছিল। বলাকা বললে, জানালাটা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে—দাঁড়াও জানালাটা বন্ধ করে দিই।

বলাকা উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেয়।

কাঞ্চী গরম কফি নিয়ে আসে।

কফি পানের পর বলাকা বলে, যাও বাথরুমে গরম জল রাখতে বলেছি—তুমিও বোধহয় স্নান করবে?

হ্যাঁ—স্নান না করলে ঘুম হবে না। রাজেশ বললে।

ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে বলাকা বললে, দিন সাতেক তুমি রেষ্ট নাও। আমি তিন দিনের ছুটি নিয়েছি। আবার চারদিন নোব—

কিন্তু তাত হবার উপায় নেই মোহর।

কেন?

কালকের ইভনিং ফ্লাইটেই আমাকে বম্বে যেতে হবে—

কেবল করে দাও না—দুদিন পরে যাবে।

না। তা হয় না।

কেন হবে না, খুব হবে—

না মোহর, এমনিতেই আমার প্রডিউসারের ক্ষতি হয়ে গিয়েছে—ডিসেম্বরের গোড়াতেই তার ছবি রিলিজ করার কথা ছিল—জানুয়ারীর শেষে ছাড়া হবে না হয়ত—

রাজেশকে কিছুতেই আটকাতে পারেনি বলাকা।

পরের দিন ইভনিং ফ্লাইটে রাজেশ বম্বে চলে গিয়েছিল। রাজেশকে প্লেনে তুলে দিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখে বলাকা তার এক বান্ধবী—সুজাতা বাইরের ঘরে বসে আছে।

সেও এয়ার হোস্টেস্ ছিল।

বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার মাস দুই আগে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিল তারপর তার আর কোন সংবাদ জানত না বলাকা।

সুজাতাকে দেখে রীতিমত অবাকই হয় বলাকা, সুজাতা তুই। কতক্ষণ রে?

এই মিনিট পনেরো—তোর কাঞ্চী বললে, তোরা নাকি এয়ারপোর্টে গেছিস।

বসতে বসতে বলাকা বললে, হ্যাঁ—রাজ চলে গেল বম্বে—ওকে তুলে দিয়ে এলাম—দাঁড়া কফি দিতে বলি—

ব্যস্ত হোসনে—তুই বোস ত!

বোস না—আসচি—

বলাকা কিচেনে গিয়ে কাঞ্চীকে কফি দিতে বলে এলো।

তারপর খবর কি তোর বল? বলাকা শুধায়।

আগে তোর খবর বল। তোর রাজের খবর বল।

আর বলিসনে ওর কথা—খালি কাজ—কাজ আর কাজ—এই ইউরোপ টুর দিয়ে কাল ফিরল—ছুটল বম্বে—

তা তোদের বিয়েটা কবে?

দেখি সামনের মাসের শেষাশেষি—

তাড়াতাড়ি ওকাজটা সেরে ফেল ভাই।

কেনরে নিজের লেজ কেটে এখন সবার লেজ কাটবার জন্য তাড়া হুড়া লাগিয়ে দিয়েছিস—

সুজাতা হাসে।

হাসচিস যে?

হাসচি এই জন্য যে লেজ শেষ পর্যন্ত আর কাটা গেল না। ক্লিষ্ট হাসি হাসতে হাসতে সুজাতা বলে।

তার মানে।

বিয়ে হলো না।

হলো না, সে আবার কি?

কেন খবরের কাগজ পড়িসনি—

নাত—কি?

রজত বোস—সুনন্দা মহান্তীকে বিয়ে করেছে।

সেকি?

হ্যাঁ—সুজাতা আবার হাসল।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন বলাকার কণ্ঠ দিয়ে আর স্বরই বের হয় না। কেমন যেন বিস্ময়ে ও সুজাতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে, সুজাতা বললে, কেন জানিস না প্রবাদটা।

আমাকে সব খুলে বল ভাই। বলাকা বলল।

কি বলবো?

সব। রজত বোস শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে বিট্রে করলো তোকে, এতদিনের আলাপ ঘনিষ্ঠতা—

কতদিনের আর বল মাত্র তিন বছরের—

সেটা কি কম হলো?

না কম নয়—তবে শুনলাম তারও বেশী দিনের পরিচয় ছিল নাকি ওর সুনন্দা মহান্তির সঙ্গে।

আর তুই সে কথা জানতে পারিসনি!

না।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য কিছুই নয় বলাকা। ওদের মানে, পুরুষ জাতটায় মত অভিনয় মেয়েরা বোধহয় করতে পারবে না। যা হবার হয়ে গিয়াছে—ভাবতাম ও ব্যাপারটা কিন্তু—

কাঞ্চী কফি দিয়ে গেল।

নে—কফি খা।

নারে কফি চা একদম খেতে পারি না—বমি হয়ে যায়।

কবে থেকে—কফি বিশেষ করে তোর এত প্রিয়—

যেদিন থেকে শত্রুটা পেটে এসেছে—

সুজাতা।

একটা অর্ধোস্ফুট চিৎকার বের হয়ে আসে বলাকার কণ্ঠ থেকে।

হ্যাঁ—রজতের সন্তান আমার গর্ভে—

কি বলছিস তুই—

বাচ্চাটাকে আমি নষ্ট করতে পারবো না, and I have decided—

তাহলে?

যদি কেউ নেয়ত দিয়ে দেবো—আর যদি না নেয়—কি আর করবো—জেনে শুনে যে আমি বিষ করেছি পান।

সুজাতা।

কি?

রজত জানে না।

না।

জানে না?

না—তাকে বলিনি! ভেবেছিলাম বিয়ের রাত্রে বলব। নিজের সন্তানকে ত আর অস্বীকার করতে পারবে না।

এখন আছিস কোথায়?

এখানেই—দিল্লীতেই—আমার সেই আয়া জানকীকে মনে আছে তোর—তাকে নিয়েই আছি।

মা বাবার কাছে—

ছিঃ কোন মুখ নিয়ে যাবো সেখানে?

অতঃপর দুই বন্ধু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

এক সময় সুজাতা উঠে দাঁড়ায়, চলি রে—

থাক না আজ রাতটা এখানে।

বাসায় জানকীটা ভাববে আবার—

আমি বরং কাঞ্চীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

কি দরকার—

বলাকা ছাড়ল না সে রাত্রে কিছুতেই সুজাতাকে।

সুজাতার মনের দিকে তাকিয়েই সে রাত্রে বলাকা তাকে ছেড়ে দেয়নি। যেতে দেয়নি।

॥ ১৮ ॥

রাত্রে খাবার টেবিলে বসে সুজাতা বিশেষ কিছুই খেলো না।

খাদ্যবস্তু নিয়ে কেবলই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বলাকা বলল, কিরে—কিছুই যে খাচ্ছিস না।

খাচ্ছি ত।

ওর নাম খাওয়া নাকি। বলাকা বললে।

পেট ভরে গেছে রে।

কিছুই খেলি না পেট ভরে গেল।

ডিনার টেবিল থেকে উঠে আরো কিছুক্ষণ গল্প করে একসময় দু'জনে শোবার ঘরে এসে পাশাপাশি দুটো খাটে শুয়ে পড়ল।

গতরাত্রে ঐ ঘরে পাশাপাশি দুটো খাটে ও আর রাজেশ শুয়েছিল।

বলাকার কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

রাজেশের দিক থেকেও কোন সাড়াশব্দ ছিল না। খাওয়ার পর সোজা এসে শুয়ে পড়েছিল রাজেশ।

বলাকার চিরদিনের অভ্যাস খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বসে বসে পড়া—ও ভেবেছিল আজ আর পড়বে না কিছুক্ষণ গল্পই করবে রাজেশের সঙ্গে।

কিন্তু রাজেশকে সোজা গিয়ে খাটে শুয়ে পড়তে দেখে ও আর বাধা দিল না। ভাবল ও বোধহয় সত্যিই খুব ক্লান্ত তাই গিয়ে শুয়ে পড়ল।

কথাও তেমন বলছিল না রাজেশ—বলাকা ধরে নিয়েছিল সেটাও বুঝি তার ক্লান্তির জন্যই। কাপড় ছেড়ে রাত্রিবাসটা গায়ে পরে বলাকা যখন রাজেশের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল—রাজেশের দুটি

চক্ষু মুদ্রিত।

ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? বলাকা শুধায়।

কিন্তু অন্য পক্ষ থেকে কোন সাড়া আসে না।

বলাকা ভাবে, বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে।

পায়ের নীচের কম্বলটা ভাঁজ করা আছে—কি ভেবে কম্বলটা টেনে ওর বুক পর্যন্ত ঢেকে দিল বলাকা।

দিল্লীতে রাত্রের দিকে বেশ শীত পড়ে।

জানালার পর্দাটাও টেনে দিল। ঘরের আলো নিভিয়ে বলাকা শয্যায় এসে গা ঢেলে দিল।

কিন্তু ঘুম আর আসে না।

কটাই বা রাত হবে মাত্র—সাড়ে দশটা। এত তাড়াতাড়ি কি ও ঘুমায় নাকি।

কত কথাই না জমে ছিল দেড় মাসের বিরহের দিন ও রাত্রিগুলোকে ঘিরে, রাজেশও কিছু বলল না—ওরও কিছু শোনা হলো না, বলাও হলো না।

কতক্ষণ এপাশ ওপাশ করলো বলাকা—

মনে পড়ছিল বারবার সেবারে রাজেশের বন্ধুর ফ্ল্যাটের কয়েকটি রাত্রির কথা।

হাসির গল্পে—গানে গানে যে ভরিয়ে দিয়েছিল রাজেশ সে রাত্রিগুলো তার।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে বলাকার কিন্তু ঘুমাতে দেয়নি রাজেশ।

ধাক্কা দিয়েছে, এই—

উঁ—

ঘুমোচ্ছো নাকি!

উঁহু।

ঘুমাবে না কিন্তু মোহর। এই—

ঘুম আসছে যে।

আসুক—আজ শুধু জাগরণ—

তারপরই গুণগুণ করে গেয়ে উঠেছিল রাজেশ ঠিক ওর কানের পাশটিতে মুখ নিয়ে—

জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হতে ঘুম কে নিল হরি
মরি মরি—

উঃ এমন করলে পাশে কেউ একই শয্যায় ঘুমোতে পারে নাকি?

আঃ থামলে কেন গাও না—গাও না গো; ঘুম জড়ানো চোখে বলেছে বলাকা রাজেশ গেয়েছে ঃ

ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি উঠে এসো এসো।

তারপরই গেয়েছে ঃ

কী দিব তোমায় নয়নেতো অশ্রুধার,
শোকে হিয়া জ্বর জ্বর হে।।
দিয়ে যাব হে, তোমারি পদতলে
আকুল এ হৃদয়ের ভার।।

দেয়নি—কিছুতেই ঘুমতে দেয়নি রাজেশ তাকে। প্রতি রাত্রে তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ওকে জাগিয়ে রেখেছে।

আজ কত আশা ছিল—কত স্বপ্ন ছিল মনে—আজকের এই রাতটিকে ঘিরে, দুটো খাটে শয্যা পেতেছিল বলাকা। কিন্তু মনে মনে ভেবেছিল বৃথাই পৃথক শয্যা রচনা।

রাজেশ ঠিক ওকে টেনে নেবে ওর নিজের শয্যায়।

তারপর—

হঠাৎ চমক ভাঙ্গে যেন বলাকার রাজেশের মৃদু কণ্ঠস্বরে।

মোহর—

তুমি ঘুমাওনি!

না।

তখন থেকে মটকা মেরে পড়ে আছ ঘুমের ভান করে তবু—

উঠে এসে রাজেশের শয্যার উপর ওর গা ঘেঁষে নিবিড় হয়ে বসল বলাকা।

মোহর—

ঘুম আসচে না—মাথায় হাত বুলিয়ে দিই দাঁড়াও—বলাকা রাজেশের মাথার চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে বিলি করতে থাকে।

মোহর—আমার বোধহয় আর গান গাওয়া হবে না।

সে আবার কি—হঠাৎ অমন বিচিত্র অদ্ভুত এক চিন্তা মাথায় এলো কেন গো?

হঠাৎ নয়—মনে হচ্ছে—

কি মনে হচ্ছে?

গান বোধহয় আমাকে ছেড়েই দিতে হবে।

রাজেশের গলায় যেন একটা করুণ বিষণ্ণতা।

কি হয়েছে রাজ।

কিন্তু গান ছেড়ে দিলে আমি কি নিয়ে বাঁচবো বলতে পারো?

গান ছেড়ে দিতে যাবে কেন? তুমি আমার কাছে কি যেন লুকাচ্ছো রাজ।

তোমার কাছে কি কিছু লুকাতে পারি।

তবে?

কি যেন নামটা তার এক বড় গায়ক—ট্রেনে করে যেতে যেতে বুঝতে পারলেন তার শেষ সময় এসে গেছে—পরের ষ্টেশনেই ট্রেন থেকে নামলেন—ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের এক কোণে বসলেন—তারপর শুরু করলেন, গাইতে—

রাজ।

রাজেশ বলে চলে, গাইতে গাইতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন—তার প্রাণপ্রিয় সংগীত থেকে মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বটে কিন্তু সে সুরের মধ্যেই—সুরের মধ্যেই এলো শেষ মুহূর্তটি। আমিও যেন তেমনি করে যেতে পারি মোহর, ঠিক তেমনি করেই যেতে পারি—

রাজ—লক্ষ্মীটি কি হয়েছে তোমার আমায় বল।

না, না,—কিছু হয়নি— যাও শোও গিয়ে—

বলাকা তবু অনেক পিড়াপিড়ি করেছিল কিন্তু রাজেশের দিক থেকে আর কোন সাড়া পায়নি।

সুজাতার ডাকে হঠাৎ চমকে ওঠে বলাকা।

চিন্তাজাল তার ছিন্ন হয়ে যায়।

আচ্ছা, রজত ত আমাকে খোলাখুলিই বলতে পারত—

কি? বলাকা অন্ধকারেই প্রশ্নটা করে।

সে সুনন্দা মোহান্তিকে ভালবাসে—তাকেই সে চায়—সত্যি বলছি ভাই—আমি হাসতে হাসতে সরে আসতাম ওদের কাছ থেকে।

সুজাতা তুই কি কিছুই জানতে পারিস নি রে আগে?

না।

কোন রকম সন্দেহও করিসনি?

কেমন করে করবো বল? আমি যে আমার সর্বস্ব ওর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম—কেমন করে বুঝবো সেখানে আমাকে গ্রহণের মধ্যে তার প্রতারণা আছে—একজনকে দু'হাত দিয়ে যখন বুকে টেনে নিচ্ছে মনের মধ্যে তখন আর একজন জুড়ে বসে আছে—ভাববো বলতে পারিস। আর সন্দেহের কথা বলছিস—তাকে তখন সন্দেহ করলে নিজেকেই আমার নিজেকে সন্দেহ করা—নিজের কাছে বিশ্বাস হারান।

বলাকার যেন মনে হয়—অন্ধকারে একটা বেদানর্ত স্বর মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরছে।

ওদের ক্লাসে বাংলা যিনি পড়াতেন—তার মুখে একদিন একটা গল্প শুনেছিল—রামায়ণের কবি বাল্মীকীর কণ্ঠ হতে কেমন করে তমসার তীরে এক সন্ধ্যায় ব্যাধের শরাহত ক্রৌঞ্চীর আর্তনাদ শুনে

প্রথম সুসংবদ্ধ শ্লোক বের হয়ে এসেছিল আপনা হতেই—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমো শ্বাঃসতি সমা
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাত্ একমবধি কামমোহিতম্।।

সেদিন যেন মনে হয়েছিল সে কেবল কবির প্রথম শ্লোকই নয়—

তার অন্তর নিংড়ে করুণ এক কান্নার ধ্বনী যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন তমসাব তীরে তীরে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বিষাদের এক সুর ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সুজাতার কথাগুলো যেন তেমনিই এক চাপা কান্নার মত তার বুকের পাঁজরগুলো ভেঙে গুমরে গুমরে উঠছিল।

তাই বলছিলাম বলাকা, সুজাতার সে রাত্রের শেষ কথাগুলো যেন এখনো বলাকার দুকান ভরে বাজছে—

পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করিস নে—বিয়েটা তোদের ফেলে রাখিস না—যত তাড়াতাড়ি পারিস ও কাজটা চুকিয়ে ফেলিস।

বলাকা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে কি সেদিন রাত্রে হাসে নি।

তার রাজেশ অমন করবে না।

সব পুরুষই সমান নয়।

রাজেশ রজত নয়।

॥ ১৯ ॥

চমকে উঠলো যেন বলাকা, রোম এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনটা আবার আকাশে উড্ডীন হয়েছে।

জাম্বো জেট—এবারে লন্ডনের দিকে উড়ে চলেছে।

প্যানট্রিতে যাত্রীদের জন্য ব্রেকফাস্টের তোড়জোড় চলেছে।

এখুনি ব্রেকফাস্ট তৈরী হবে যাবে—

তারপরই যাত্রীদের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করতে হবে।

সারাটা রাত না ঘুমিয়ে চোখ মুখ যেন বিশ্রী জ্বালা করছে।

প্যানট্রিতে গিয়ে ঢুকল বলাকা।

দুঃখের স্মৃতি মন্থনের জন্য ত বাকী জীবনটাই পড়ে আছে।

এমনি করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত দূর পাল্লার আকাশ পথে উড়ে উড়ে বেড়াবে বলাকা আর বার বার মনে পড়বে রাজেশের কথা।

কথা টুকরো টুকরো কথা—কত কাহিনী—কত গান —কত হাসি।

দীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যে রাজেশকে ঘিরে কম ত জমে নি তার ঝুলিতে।

তারপর হয়ত একদিন সে বুড়ো হয়ে যাবে।

পাক ধরবে চুলে—একটা দুটা করে—

ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই—সে আজকের মত ডিউটি করে চলবে।

তারপর সে চাকরিও একদিন শেষ হবে।

হঠাৎ হয়ত কোন একদিন—বলা ত যায় না—এই উড়ন্ত প্লেনের মধ্যে সেই প্রথম দিনটির মত রাজেশের সঙ্গে আবার তার দেখা হয়ে যাবে।

একা নয় রাজেশ—

সঙ্গে তার স্ত্রী মণিকা, ছেলে, মেয়ে—

তাদের সামনে ট্রেতে করে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে ধরবে—your break-fast please.

রাজেশ—মণিকা—তারা হয়ত কেউ মুখ তুলে চাইবেও না—

আর চাইলেও হয়ত চিনবেও না।

আর চিনলেই বা কি?

কে এক বলাকা—কবে জীবনে তার সঙ্গে দেখা দিয়েছিল আবার কোথায় দূরে চলে গিয়েছে।

দূর বলাকা সেদিন।

উর্মিলা খন্ডেলওয়ালার গলা শোনা গেল, বলাকা ব্রেকফাস্ট ইজ রেডি—

বলাকা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

দুহাতে দুটো ট্রে তুলে নিল।

প্যাসেজটার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল ব্রেকফাস্ট সার্ভ করতে।

বেশ পরিষ্কার রৌদ্রালোক উড়ন্ত বিমানের কাচের জানালা পথে ভিতরে এসে পড়েছে।

যাত্রীরা সবই ব্রেকফাস্টের জন্য রেডি।

প্রথম দুজন যাত্রীর সামনে দুটো ট্রে নামিয়ে দিয়ে আবার চলে গেল বলাকা নতুন দুটো ট্রে আনতে প্যানট্রির মধ্যে।

সার্ভ করলো দুজনে মিলে—

তারপর ঘুরে ঘুরে টিপট ও মিল্কপট নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো টি অর কফি—

স্যার?—

না—না—তা হবে না—শৈবাল বলে ওঠে।

কিন্তু—

রাজেশকে বাধা দিয়ে শৈবাল বলে ওঠে, চেষ্টা শেষ পর্যন্ত করে যেতেই হবে—

কলকাতায় রাজেশ তখন তার নতুন ঠিকানায়—ভবানীপুরে একটা বাসাবাড়িতে।

তিনতলার দুটি ঘর নিয়ে গত পনের দিন ধরে আছে রাজেশ—কলকাতাতেই আছে কোথাও যায়নি।

যেন অজ্ঞাতবাস।

নতুন বাসার ঠিকানাটায় একমাত্র শৈবাল ছাড়া কাউকে জানায়নি। রাজেশ।

রাজেশের সব কথা বলাকা একদিন শৈবালের মুখেই শুনেছিল। শুনে বলাকার সে কি কান্না।

তখন সে বলেছিল আপনি তখুনি আমাকে একটা খবর দিলেন না কেন শৈবালবাবু?

আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল রাজেশ।

হ্যাঁ—সত্যি সত্যিই রাজেশ শৈবালকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিল। অবাক হয়ে গিয়েছিল শৈবাল তার অফিসে সেদিন দুপুরে রাজেশের ফোন পেয়ে।

শৈবাল শুধিয়েছিল, কোথা থেকে কথা বলছিস?

একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে। আজ সন্ধ্যার পর একবার আসবি? বলে বসন্ত বোস রোডের বাড়ির ঠিকানাটা বলে দিয়েছিল রাজেশ।

অফিস থেকে বেরুতে শৈবালের সেদিন একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল।

অবিশ্যি বাড়িটা খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হয়নি।

রাস্তার উপরেই চারতলা একটা বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাট।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলায় বন্ধ দরজার গায়ে কলিং বেল টিপতেই একটু পরে দরজা খুলে গেল।

॥ ২০ ॥

ঘর অন্ধকার।

কে—শৈবাল?

অন্ধকার ঘর থেকে সাড়া এলো।

হ্যাঁ, কিন্তু ঘর অন্ধকার কেন?

রাজেশ সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শৈবাল ওর দিকে তাকাল। রাজেশের পরণে পায়জামা আর পাঞ্জাবী, মাথার চুল অবিন্যস্ত।

রাজেশের মুখের দিকে তাকিয়ে শৈবাল যেন চমকে ওঠে, কি হয়েছে—অসুখ নাকি?

চল ওঘরে চল।

পাশেই শোবার ঘর—আলো জ্বেলে দুজনে ভিতরে শোবার ঘরে প্রবেশ করল।

কি ব্যাপার, তোর মোহরকে দেখছি না!

বোস না, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, রাজেশের গলার স্বর যেন কেমন ক্লান্ত অবসন্ন।

এখানে কবে এলি?

তা প্রায় একমাস হবে—

বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে? শৈবাল জিজ্ঞাসা করে।

না—

না মানে।

হলো না বিয়ে।

কি বলচিস মাথামুন্ডু।

ঠিক বলচি বিয়ে হল না! কাল একটা চিঠিতে মোহরকে সব জানিয়ে দিয়েছি। বলেছি সে যেন আমাকে ভুলে যায়।

কি আবোল-তাবোল বকছিস রাজেশ!

আবোল-তাবোল নয় রে শৈবাল। যা সত্যি তা যত তাড়াতাড়ি জানা যায় ততই মঙ্গল।

কি হয়েছে রাজেশ? তোদের ঝগড়া হয়েছে নাকি!

না রে না, মোহরের সঙ্গে কি আমার ঝগড়া হতে পারে।

তবে! আমাকে সব খুলে বল রাজেশ।

সব বলব বলেই তো আজ তোকে ডেকে এনেছি শৈবাল। তরপর একটু থেমে বলে রাজেশ, ব্যাপারটা গত দুই মাস ধরেই একটা সংশয়ের মধ্যে ছিলাম—ডাক্তাররা প্রকাশ না করলেও I suspected it—কেন যেন আমার মন বার বার বলছিল ভাল না—ভাল না।

রাজেশ, সব কথা আমায় খুলে বল, আর হেঁয়ালী করিস না।

গত পরশুই; রাজেশ বলতে থাকে Pathological report থেকে Confirmed হয়েছে— Its Cancer.

ক্যানসার! না না—

আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে শৈবাল, তুই কি বলছিস রাজেশ!

হ্যাঁ রে, আমার গলার ভোকাল কডে ক্যানসার হয়েছে। ইউরোপে থাকতেই গলাটা কেবল মধ্যে মধ্যে বসে যাচ্ছিল। সেখানে একজন গলার ডাক্তারকে গলাটা দেখাই— তিনিই প্রথমে সন্দেহ করেন মুখে যদিও প্রকাশ করেননি—তারপর একটু আবার থেমে বললে—ধীরে ধীরে রোগ ছড়িয়ে পড়বে—গলা বুজে আসবে। একদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক যে গলার গান শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত— তাদের কাছে আমি আমার গানের রেকর্ডগুলোর মধ্যে—কেবলমাত্র স্মৃতি হয়েই থাকব অতঃপর।

শৈবাল যেন পাথর হয়ে গিয়েছে, সে কেমন এক বোবা দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে রাজেশের মুখের দিকে—

কয়েক মুহূর্ত তার গলা দিয়ে কোন স্বরই বের হয় না।

ভাবতে পারিস ভগবান প্রদত্ত আমার কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত বুজে যাবে—একটু একটু করে বন্ধ হয়ে যাবে—উঃ, এর চাইতে আমার দেহের অন্য কোথাও যদি ক্যানসার হত— শৈবাল আমি শেষ হয়ে গেছি রে—

অমন করে ভেঙে পড়ছিস কেন রাজেশ—এতক্ষণ যেন কথা বলবার মত মনকে অনেক গুছিয়ে নেয় শৈবাল, এ রোগের তো আজকাল কত চিকিৎসা হচ্ছে। Deep Therapy–Chemo Therapy–Operation–

আমি বাচ্চা নই শৈবাল, আমি জানি ক্যানসার রোগ কাকে বলে।

ডাক্তার কি তোকে বলে দিয়েছে?

না—স্পষ্ট করে বলে নি—তবে আড়াল থেকে ওদের প্যাথলজিকাল রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা আমার কানে এসেছে, তাছাড়া তারা আর বলবে কি— আমি নিজেও কি বুঝতে পারছি না—আজ নয়রে ইউরোপ যাবার আগে থাকতেই মধ্যে মধ্যে গলাটা ট্রাবলস দিচ্ছিল—ক্রমশ যেন একটু একটু করে গলার স্বর আমার কেমন যেন বদলে যাচ্ছিল—হোর্স—রাফ—

আর সেইজন্যই তুই মোহরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিস!

তুই তো জানিস শৈবাল—মোহরকে আমি কতখানি ভালবাসি—সে আমার জীবনের কতখানি—তার সঙ্গে কি আমি প্রতারণা করতে পারি, না—তাছাড়া কোন্ অধিকারে তা করব, তার সারা জীবন তো এখনো পড়ে আছে—

শৈবাল কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার বন্ধুর মুখের দিকে।

রাজেশ ক্লান্ত গলায় বলতে থাকে, দুঃখ সে পাবে জানি। হয়তো ভাববে আমি তার সঙ্গে জঘন্য প্রতারণা করেছি কিন্তু একদিন সে বুঝতে পারবে—আমার মৃত্যুর পর—হ্যাঁ রে—বুঝতে পারবে রাজেশ তাকে ভালবাসত বলেই অত বড় দুঃখটা তাকে দিতে পারেনি শেষ পর্যন্ত—

কি বলেছিস তাকে? শৈবাল জিজ্ঞসা করে।

সামনা সামনি দাঁড়িয়ে বা ফোনেও কি বলতে পারতাম—পারতাম না—আমি তাকে তাই একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছি। লিখেছি আমাদের বিয়ে হতে পারে না। সে যেন আমাকে ভুলে যায়।

তাই যদি তোর মনে ছিল তবে কেন তাকে বাড়ি ভাড়া করতে দিলি? বেচারী বাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে—আগেই কেন জানিয়ে দিসনি সত্যি কথাটা—

মোহর—মোহর সহ্য করতে পারত না রে—কিন্তু তখনও বুঝিনি—ঘর বাঁধবার জন্য সে অমন করে মরীয়া হয়ে উঠেছে—শেষটায় অনন্যোপায় হয়েই—

তোর চিঠি পেয়েছে জানিস!

জানি—

কি করে জানলি?

নচেৎ সে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ছুটি না ফুরোতেই চাকরিতে ফিরে যেত না। সে জানে না—যে রাত্রে সে ইভনিং ফ্লাইটে বম্বে চলে যায়—লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে দূর থেকে তাকে আমি দেখেছি। মুখ শুকিয়ে গিয়েছে—চোখের কোল দুটো বসে গিয়েছে—জানিস, চোখ ফেটে আমার জল আসছিল—একবার মনে হয়েছিল ছুটে গিয়ে বলি—মোহর—এ আমাদের বিচ্ছেদ নয়—তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ কোনদিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না—যা করেছি তোমার মঙ্গল ভেবেই—চোখের জল ফেল না। হাসি মুখে বিদায় দাও।

শৈবাল কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। কি বলবে ভেবে পায় না।

অনেকক্ষণ পরে ডাকে রাজেশ—এখন কি করবি?

কি আর করব—শেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করব—শুধু তোর কাছে আমার অনুরোধ—আমার মৃত্যুর আগে সে যেন না জানতে পারে।

চমৎকার—বন্ধুর কাছে বন্ধুর চমৎকার দাবী।

রাজেশ এগিয়ে এসে শৈবালের হাতটা চেপে ধরে, তুই ছাড়া আজ আর আমার কে আছে বল!

পারব না—এ আমি পারব না—আমাকে ক্ষমা কর—শৈবালের গলার স্বর যেন কান্নায় জড়িয়ে আসে।

শৈবাল ভেবে দেখ—এক মোহর ছাড়া তোর চাইতে এ পৃথিবীতে আমার দ্বিতীয় আপনার জন আর কে আছে বল!

কিন্তু না—এত সহজে তুই হাল ছেড়ে দিবি—কিছুতেই তা আমি হতে দেব না। তুই ইউরোপে চলে যা—Early stage—হয়তো চিকিৎসায় সেরে উঠবি।

ভুলে যাচ্ছিস কেন—এ রোগ চিকিৎসার বাইরে—তাছাড়া দৌড়াদৌড়ি করতে আর ভাল লাগছে না রে।

ভাল না লাগলেও করতেই হবে—তোর পাসপোর্ট তো আছেই—তোকে কিছু করতে হবে না। সব ব্যবস্থা আমিই করব। দরকার হয় আমি তোর সঙ্গে যাব। তাছাড়া এখানে তোর থাকা হবে না—তুই আমার সঙ্গে চল।

একরকম জোর করেই শৈবাল রাজেশকে দিন তিনেক পরে নিয়ে গেল তার বাড়িতে।

প্রথমটায় কিছুতেই রাজেশ যেতে চাইছিল না।

রাজেশকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার পর রাত্রে স্ত্রী সন্ধ্যাকে শৈবাল সব কথা বলল।

সন্ধ্যা সব শুনে যেন বোবা হয়ে গেল।

বলল, এখন কি করবে?

ওকে যেমন করেই হোক চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠিয়ে দেব---

তাই দাও, আর আমার মনে হয় বলাকাকে চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে দাও---

কিন্তু রাজেশ তো চায় না---

না চাক, বলাকা যে রাজেশবাবুকে কতখানি ভালবাসে তা তো জানি---হয়তো বলাকা এখন ওর পাশে থাকলেও ও মনে অনেকখানি জোর পাবে---ঠিক আছে তোমাকে চিঠি দিতে হবে না---থাক, আমিই তাকে চিঠি দেব। তার ঠিকানা জানো?

কাল এয়ার অফিসে গিয়ে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

সেই রাত্রেই দীর্ঘ এক চিঠিতে সন্ধ্যা সব খুলে লিখল বলাকাকে। পরের দিন রাত্রে শৈবাল বলাকার ঠিকানা নিয়ে এল---সে নিউইয়র্ক যাচ্ছে---নিউইয়র্কের এয়ার ইনডিয়ার অফিসের ঠিকানাতেই চিঠি পাঠানো হল।

রাতে বাড়ি ফিরে শৈবাল দেখে রাজেশ হারমোনিয়াম নিয়ে নতুন গানের সুর রচনা করছে-

কি হচ্ছে এ সব? শৈবাল শুধায়?

একটা ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে কনট্রাক্ট ছিল---যাবার আগে তাদের মিউজিকটা কম্পোজ করে দিয়ে যাই---

কোন দরকার নেই এখন ওসবের, থাক ওসব---

তুই তো সব জানিস শৈবাল---যে ক'টা দিন এখন বেঁচে আছি---গলার স্বর বন্ধ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ কাজে আমায় বাধা দিস না শৈবাল।

না---ওসব তোকে এখন আমি করতে দেব না---শৈবাল খাতাপত্র ও হারমোনিয়ামটা সরিয়ে রাখল।

॥ ২১ ॥

লণ্ডন এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে আর বেশী দেরি নেই---আকাশে মেঘের স্তূপ। যেন মেঘ থরে থরে জমাট বেঁধে আছে---বোধহয় পৃথিবীতে বৃষ্টি হচ্ছে।

বৃষ্টি---বৃষ্টি। বৃষ্টিকে কি ছেলেমানুষের মতই না ভালবাসে রাজেশ।

এই তো মাস কয়েক আগেকার কথা।

দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে তখন বলাকা বম্বেতে রাজেশের ফ্ল্যাটে ছিল।

বম্বেতে তখন মনসুন শুরু হয়েছে। বৃষ্টি---বৃষ্টি আর বৃষ্টি---অবিশ্রাম বৃষ্টি।

ফ্ল্যাট থেকে কোথাও বেরুবার উপায় নেই। একটার পর একটা রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদের বর্ষাসঙ্গীত গেয়েছে রাজেশ।

কত ছায়াছবিতে রাজেশ আধুনিক গানের সুর দিয়েছে---কত আধুনিক গানের রেকর্ড তার আছে, কিন্তু তাকে গান গাইতে বললে সে রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদ ছাড়া কারো গানই গাইত না।

সে রাত্রে---বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে---কিচেনে বলাকা প্যানে খিচুড়ি চড়িয়েছে---পাশের ঘর থেকে রাজেশের গান ভেসে এল---

বধু এমন বাদলে তুমি কোথা
পড়িছে মনে মম কত কথা।

সুরের টানে রান্না ভুলে চলে এসেছিল বলাকা পাশের ঘরে।

তিনতলার ফ্ল্যাটের কাচের জানালা পথে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টিতে ঝাপসা বোম্বাই শহর---আর একটার পর একটা বর্ষার গান গেয়ে চলেছে রাজেশ।

হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল পোড়া খিচুড়ির গন্ধে---বলাকার মুখ শুকিয়ে যায়।

চোখ ছল ছল করে ওঠে।

রাজেশ খিচুড়ি খেতে চেয়েছিল।

কি হল মোহর---চোখে জল কেন?

খিচুড়িটা পুড়ে গেল---

তাতে কি হয়েছে---চল, আজ বাইরে কোন হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসব।

এই বৃষ্টিতে---

তাতেই তো মজা, বৃষ্টিতে ভিজতে কি যে ভাল লাগে—

হ্যাঁ—তারপর ঠাণ্ডা লেগে সর্দি—নিমুনিয়া হোক আর কি!

আহা, সত্যি যদি শক্ত একটা অসুখ হয়ই—তোমার ঐ দুটি পেলব কোমল হাতের সেবা পাব—আঃ—

থাক—

জানো, ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। মামা মামীর কাছে মানুষ—আপনার জন—প্রিয়জন যে কি বস্তু তার স্বাদই কখনো পাইনি—ভেবেছিলাম এমনি করেই বুঝি বাকি জীবনটা কেটে যাবে, কিন্তু ভগবান সত্যিই করুণাময়, তোমাকে এনে দিলেন—

সত্যি—কি স্নেহের কাঙালই না ছিল রাজেশ।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে।

জেট প্লেনটা ধীরে ধীরে হিথরো বিমানবন্দরে নামছে।

দিন না রাত বুঝবার উপায় নেই।

অবিশ্রাম বর্ষণে সব ঝাপসা।

মাইকে খাণ্ডেলওয়ালার গলা শোনা গেল—আমরা হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করছি—এখানে দেড় ঘন্টা হল্টেজ—

সে রাত্রে ঐ প্রবল বর্ষণের মধ্যেই দুজনে ট্যাক্সি নিয়ে শেষ পর্যন্ত হোটেলের উদ্দেশে বের হয়েছিল রাত্রে খাবার খেতে।

আগে থেকেই দুটো সীট্ রাখবার জন্য ফোন করে দেওয়া হয়েছিল একটা ভাল হোটেলে।

কাচের দরজা ঠেলে ডাইনিং হলে ঢুকতেই যেন অন্য এক রাজ্যে পদার্পণ।

কে বলবে বোম্বাই শহরটা তখন বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে।

টিমটিমে আলোয় বিরাট হলঘরটা মৃদু আলোকিত।

ঐ বৃষ্টির মধ্যেও হলে ভিড়ের অভাব নেই।

প্রায় সব টেবিলেই পুরুষ আর নারী ছোট বড় দলে বসে আছে!

চিত্রিত সব বেশভূষা ও উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন চোখে মুখে বিশেষ করে মেয়েদের বেশের সল্পতার দিকে তাকিয়ে অনেক পুরুষকেও বোধহয় চোখ ফেরাতে হয়—যদিও তারা ঐ ধরণের বেশে সেজে পুরুষের যৌন দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবার জন্যই এরা কসমোপলিটান বোম্বাই শহরের বিশেষ চিহ্নিত সমাজের এক শ্রেণী।

এরা নিজেদের সোসাইটি নিজেরাই গড়ে তোলে।

ডায়াসে এক তরুণী যৎসামান্য পরিধেয় বস্ত্রে প্রায় উলঙ্গ—

নানা যৌনাত্মক অঙ্গভঙ্গি সহকারে ক্যাবারে নৃত্য করছে—

লাউজ মিউজিক চলেছে সঙ্গে।

দুজনে ওরা ওদের জন্য রিজার্ভ করা কোণের টেবিলে গিয়ে বসল।

মোহর খিচুড়িটা পুড়ে গিয়ে ভালই হয়েছে কি বল? রাজেশ মৃদু হেসে বলল।

বলাকা কোন জবাব দেয় নি। মনটা তখনও তার ভারি হয়ে আছে।

কি হলো, এখনো খিচুড়ির শোক ভুলতে পারছো না নাকি! রাজেশ মৃদু হেসে বললে।

বলাকা কোন জবাব দেয় না।

অতঃপর মোহরের অনুমতি নিয়েই ওয়েটারকে ডেকে হুইস্কি সোডার অর্ডার দিল রাজেশ নিজের জন্য।

রাজেশের ড্রিংক তখনো শেষ হয়নি—টেবিলে খাবার তখনো সার্ভ করেনি।

হঠাৎ একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বরে বলাকা মুখ তুলে তাকায়—

হ্যালো—চৌধুরী সাব্—

দীর্ঘকায় একজন মানুষ।

বয়স চল্লিশের কিছু ঊর্ধ্বেই হবে মনে হয়।

টিপ টপ্ সুট পরণে—হাতে গ্লাস—

মিঃ খান্না—হ্যালো—গুড ইভনিং—বোস—বোস—

প্রেম খান্না পাশের একটা খালি চেয়ারে বসল।

আর চোখে তাকিয়ে বলাকার দিকে ইঙ্গিতে শুধাল—Who is she!

হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দিই—মিঃ প্রেম খান্না—এখানকার একজন অভিনেতা প্রডিউসার—আর ইনি-মিস সেন—আমার ভাবী পত্নী—

শুনে খুশি হলাম মিস সেন—হাত বাড়িয়ে দিল প্রেমজিৎ খান্না।

বলাকা হাত তুলে নমস্কার জানাল, নমস্কার—

প্রেম খান্না হাতের হুইসকির গ্লাসে এক দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলাকার দিকে তাকিয়ে বললে, মনে হচ্ছে আগে আপনাকে দেখিছি যেন—ভীষণ চেনা চেনা লাগছে—কোথায় আপনাকে দেখেছি বলুন তো?

প্লেনে দেখে থাকবে—রাজেশ মৃদু হেসে বলল, উনি এয়ার হোস্টেস্—

প্রচণ্ড হল্লোড়ে তখন ডায়াসে নাচ চলেছে লাউড অর্কেষ্টা সহযোগে।

হতে পারে, প্রেম খান্না বললে।

হতে পারে নয় মিঃ খান্না—তাই দেখেছো।

What a lovely night—প্রেম খান্না বললে, কি বৃষ্টিই হচ্ছে বাইরে।

এবারে যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে—বাহির আশ পাশ না ডুবে যায়!

ক্ষতি কি, প্রেম খান্না বললে, ডুবুক, ডুবে যাক—তারপরই হঠাৎ একসময় প্রেম খান্না বললে, চল চৌধুরী সাব্—

কোথায়?

প্রেম খান্না বললে, ওঁকে নিয়ে আমার কুটীরে চল—এখানে এই হট্টগোল—জরুর হিঁয়া তুমে আচ্ছা নেই লাগতা—চালিয়ে মিস সেন—

প্রেম খান্না কিছুতেই ছাড়ল না—

ওদের দুজনকে হোটেল থেকে তার বিরাট লাকসারী কারে করে তার সান্তাক্রুজের নবনির্মিত বাড়িতে নিয়ে এল।

ঐশ্বর্য ও রুচির ছড়াছড়ি সারা বাড়িতে।

ঘরে ঘরে দামী শৌখীন সব আসবাবপত্র।

দোতলায় কাচ ঘেরা টেরেসে এসে ওরা বসল।

বাইরে তখনো প্রচণ্ড বৃষ্টি চলেছে।

সে রাত্রে প্রচণ্ড ড্রিংক করেছিল রাজেশ।

বলাকা বাধা দিয়েও দিতে পারেনি।

ক্ষোভে আক্রোশে রুদ্ধবিষ সর্পের মত কেবল সে নিজের মধ্যে নিজে ফুঁসছিল।

চোখের বার বার ইঙ্গিত করে নিষেধ করা সত্ত্বেও রাজেশকে থামাতে পারেনি।

রাত প্রায় তিনটের সময় ওদের প্রেম খান্নার ড্রাইভার এসে রাজেশের ফ্ল্যাটে পৌছে দিয়ে গিয়েছিল।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই বলাকা তার সুটকেস গোছাতে শুরু করেছিল।

কি হল মোহর, এখন আবার সুটকেস গোছাতে বসলে যে!

আমি এক্ষুনি এই মুহূর্তে চলে যাব—গম্ভীর গলায় বলাকা বলল।

চলে যাবে! সে কি! কোথায়?

এয়ার অফিসে—

এই রাত্রে এই বৃষ্টির মধ্যে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে মোহর—

তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই—এই আমাদের শেষ রাত্রি—

মোহার—রাগ করেছ—কিন্তু কি করব বল—এ লাইনে থাকতে হলে—

জালা জালা মদ গিলতে হবে, তাই না! ঠিক আছে, থাক তুমি তোমার লাইন নিয়ে—আমাকে মুক্তি দাও—

রাজেশ এগিয়ে এসে বলাকার হাত চেপে ধরে, শোন মোহর, লক্ষ্মীটি—

না—ছাড়—

আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে—কথা দিচ্ছি আর কখনো এক পেগের বেশী মদ খাব না—লক্ষ্মী সোনা—এবারটির মত আমাকে তুমি মাপ কর—

এ কথা তুমি আগেও একবার বলেছিলে—
এবারে প্রতিজ্ঞা করছি—আর একটা সুযোগ দাও আমায়—
আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর—

ঝগড়া মিটে গিয়েছিল।
রাজেশ বলাকার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল।
হঠাৎ বলাকার খেয়াল হল সব যাত্রী আর ক্রু প্লেন থেকে নেমে গিয়েছে—সে একা বসে আছে একটা সীটে।
বাইরে আবার বৃষ্টি হচ্ছে।
এখন হয়তো মণিকার পাল্লায় গিয়ে পড়েছে—আর কি রাজেশের প্রতিজ্ঞা মনে আছে, না মনে থাকবে।
মদ্যপানের যে কি বিষক্রিয়া বলাকা তা জানে—তার এক মেশোমশাই অত্যধিক মদ্যপানের ফলে সিরোসিস লিভার—এসাইটিস হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যান।
শেষে একটা মাস মেসোমশাই নার্সিং হোমে ছিলেন, উঃ সে কি কষ্ট, মোহর মধ্যে মধ্যে তার বাবার সঙ্গে মেসোমশাইকে নার্সিং হোমে দেখতে গিয়েছে।
নিঃশ্বাস নিতে পারেন না, পেটটা জয়ঢাকের মতো ফুলে উঠেছে। নিজের মনেই বলে বলাকা—
রাজ—লক্ষ্মীটি—তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলো না—বেশী মদ খেয়ো না। অকালে অমন সোনার প্রাণটা নষ্ট কর না। তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে। আমার গা ছুঁয়ে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে রাজ।

॥ ২২ ॥

আটদিন পরে বম্বে ফিরে এসে চিঠিটা বলাকা পেল।
কে আবার তাকে চিঠি লিখল!
খামের উপরও অচেনা হস্তাক্ষর।
ভেবেছিল বুঝি রাজেশের চিঠি। না, তার হাতের লেখা নয়।
তাছাড়া রাজেশ তাকে চিঠি লিখতে যাবেই বা কেন। হাতব্যাগের মধ্যে চিঠিটা রেখে দিল বলাকা।
দুটো দিন তার ছুটি।
দুপুরে আহারাদির পর বিশ্রামের সময় ব্যাগ থেকে খামটা বের করল বলাকা।
খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল।
বলাকা দেবী,
আগেই জানাই—আমি সন্ধ্যা।
রাজেশ আপনাকে কি লিখেছে জানি না—জানবার আমার প্রয়োজনও নেই—তবে রাজেশই বলেছিল সে বিয়ের কথা ভেঙে দিয়ে নাকি আপনাকে চিঠি দিয়েছে।
রাজেশ খুব অসুস্থ—ওর চিঠিতে অন্যরকম কিছু মনে করবেন না। ও আপনাকে ভোলেনি—ভুলতে কোন দিনই পারবে না—তাছাড়া এসময় রাজেশের পাশে একমাত্র আপনারই উপস্থিতির প্রয়োজন তাই জানাচ্ছি—এই চিঠি পাওয়া মাত্রই চলে আসবেন কলকাতায়।
আমাদের ঠিকানা তো আপনি জানেন—আমার সঙ্গেই এসে দেখা করবেন।
ইতি—সন্ধ্যা।
বলাকা শয্যা থেকে লাফিয়ে ওঠে—রাজ—তার রাজ অসুস্থ—
মাথার মধ্যে সমস্ত কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায় বলাকার।
কি হয়েছে রাজের—কি অসুখ—তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বের হয়ে যায় বলাকা সোজা এয়ারপোর্টের দিকে।
হাত ঘড়ির দিকে তাকাল বলাকা, এখনো হয়তো সম্ভব, পঁচিশ মিনিট আছে বাকী কলকাতাগামী প্লেনটা ছাড়বার।
বম্বে টু ক্যালক্যাটা ইভনিং ফ্লাইটটা যে করেই হোক তাকে ধরতে হবে।
এয়ার পোর্টে যখন পৌছায় প্লেন ছাড়তে তখন মাত্র বার মিনিট আছে—

প্যাসেঞ্জাররা সবাই প্লেনে উঠবার জন্য টার্মাক দিয়ে এগিয়ে চলেছে—

ছুটতে ছুটতে গিয়ে অফিসারের সঙ্গে দেখা করল বলাকা, বলল, আমি ইভনিং ফাইটে কলকাতা যেতে চাই।

কিন্তু পরশু আপনার জেটে যে ডিউটি আছে—

তার আগেই আমি ফিরে আসব।

ছুটতে ছুটতেই প্রায় গিয়ে প্লেনে উঠে পড়ল বলাকা।

বম্বে টু ক্যালকাটা—সারাটা পথ প্লেনের মধ্যে অসহ্য এক উদ্বেগে যেন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে বলাকা।

কি হল রাজের—কি অসুখ।

সন্ধ্যা কিছুই খুলে লেখেনি কেবল লিখেছে—রাজেশের খুব অসুখ। অন্য সব কথা যেন ভুলে গেছে বলাকা—কেবল রাজেশের কথাই ভাবে।

রাত পৌনে আটটায় দমদম এয়ারপোর্টে নেমে এয়ার লাইনস-এর গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে সোজা একটা ট্যাক্সি নিয়েই বলাকা বের হয়ে পড়ে।

শৈবালের ওখানে এসে পৌঁছাল রাত তখন সাড়ে নয়টা।

শৈবাল বাড়ি ছিল না—ছিল তার স্ত্রী সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা একটা কার্ডিগ্যান বুনছিল—ঝড়ের মত বলাকাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, এই যে বলাকা—

সন্ধ্যাদি—রাজেশের কি হয়েছে—কেমন আছে সে! উৎকণ্ঠায় বলাকা যেন ভেঙে পড়ে।

আমার চিঠি পেয়েছ?

হ্যাঁ—আজই বম্বেতে ফিরে চিঠি পেয়েছি—শৈবালবাবু কোথায়?

উনি রাজেশবাবুর ওখানেই গিয়েছেন—

রাজেশের কি হয়েছে? পুনরায় প্রশ্ন করে বলাকা।

সন্ধ্যা একটা ঢোক গিলে বলল, খুব অসুস্থ তিনি এইটুকুই জানি—

রাজেশ কোথায় আছে?

ভবানীপুরে তার বাসায়—

ভবানীপুরে।

হ্যাঁ সেখানেই ত সে আছে।

কবে থেকে?

তা প্রায় দিন পনের হবে—

আমি যাব সেখানে—আমাকে তার ঠিকানাটা বলুন সন্ধ্যাদি—

উনি হয়তো এখুনি এসে পড়বেন—একটু বোস না—

না—আমাকে তার ঠিকানাটা বলুন সন্ধ্যাদি। অনুনয়ে যেন ভেঙে পড়ে বলাকার কণ্ঠস্বর—

মনে হয় এখুনি বুঝি কান্নায় ভেঙে পড়বে বলাকা।

সন্ধ্যা রাজেশের বসন্ত বোস রোডের বাড়ির ঠিকানাটা বলে দেয়।

বলাকা আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না—বাইরে বেরিয়ে আবার একটা ট্যাক্সি নেয়।

কি হয়েছে তার রাজের!

সন্ধ্যাদি বলল না কেন! অসুখ যদি সে রকম সিরিয়াস হয় তো সে হাসপাতালে না গিয়ে বাড়িতে আছে কেন?

তাহলে সে বোম্বাইয়ে ছিল না, এখানেই ছিল, তাহলে তার চিঠিটাও হয়ত পায়নি।

ছিঃ ছিঃ রাজেশ অসুস্থ আর সে কিনা—

যেন আর ভাবতে পারে না বলাকা।

নানা দুশ্চিন্তায় বলাকা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে চলন্ত ট্যাক্সির মধ্যে।

রাত সাড়ে দশটায় রাজেশের ভাবানীপুরের বাসার নম্বরটা খুঁজে বের করল বলাকা।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

সন্ধ্যাদি বলেছেন তিনতলায় থাকে রাজেশ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল বলাকা।

পা দুটো যেন আর চলে না। ভেঙে আসছে পা দুটো বলাকার।

বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্ করছে তার।

কম্পিত হাতে বেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজা খুলে গেল—একজন বৃদ্ধ, কে!

এখানে রাজেশ চৌধুরী থাকেন?

হ্যাঁ—আপনি—

ভিতরে ঘর থেকে কানে আসে বলাকার একটা গানের কলি—

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না।
আমার সাধের পাখি যারে নয়নে নয়নে রাখি
তারই স্বপনে রয়েছি ভোর, আমার স্বপন ভাঙায়ো না।

থমকে দাঁড়াল বলাকা।

রাজেশের গলায় গান—রাজেশই গাইছে গান।

বলাকা আর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা যে ঘর থেকে গান ভেসে আসছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরে রাত-বাতি জ্বলছে।

বিছানায় বালিশের উপর হেলান দিয়ে রাজেশ আধা শোওয়া আধা বসার ভঙ্গি।

সেই স্বল্প আলোতেও বলাকার চোখে পড়ে রাজেশের মাথার চুল রুক্ষ—এলোমেলো।

ভঙ্গিটা যেন বড় ক্লান্ত।

সামনেই টেবিলের 'পরে টেপরেকর্ডার চলেছে' টেপ রেকর্ডেরই গান।

বলাকার দু'চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

॥ ২৩ ॥

আরো দু'পা এগিয়ে যায়—শয্যার কাছে, মৃদু গলায় ডাকে, রাজ—

কে! চমকে ফিরে মাথা তুলে তাকায় রাজেশ।

তারপরই টেপ রেকর্ডরটা থামিয়ে দিয়ে বেড সুইচ টিপে ঘরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বালিয়ে দিল।

দুজনা দুজনের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে—

মোহর—

রাজ।—

কিন্তু ততক্ষণে রাজেশ নিজেকে সামলে নিয়েছে।

বলে, তুমি—তুমি কেন এলে—চিঠি কি পাওনি—

পেয়েছি—আরো দু' পা এগিয়ে আসে বলাকা—একেবারে রাজেশের শয্যার পাশটিতে।

রাজ—

কেন এলে তুমি মোহর, কেন এলে!

কেন এলাম।

অতবড় দুঃখ দিয়ে, আঘাত দিয়ে চিঠি দিলাম—তবু তুমি এলে।

হ্যাঁ—এলাম। আরো কাছে এগিয়ে এলো বলাকা।

বলাকার দুচোখ জলে ঝাপসা।

কিন্তু মোহর।

বল, থামলে কেন, চিঠিতেও যদি বলা শেষ না হয়ে থাকে সব শেষ করো। পারবো সব আমি শুনতে পারবো—সব সহ্য করবে তোমার মোহর।

না না—তুমি—তুমি জানো না মোহর—কি অসুখ আমার হয়েছে—তুমি যাও—ফিরে যাও—

না—বলাকা রাজেশের আরো কাছে সরে এলো।

মোহর—তুমি জানো না, আমার—

যত কঠিন অসুখই হোক না তোমার আমি তোমাকে ভাল করে তুলব।

পারবে না—পারবে না—তাইতো তোমাকে আমি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম।

কেমন করে পেরেছিলে অমন নিষ্ঠুরের মত চিঠি লিখতে—

বলাকার গলা কান্নায় বুজে আসে, দু'চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসে।

মোহর অবুঝ হয়ো না শোন—তোমার চোখের জল সইতে পারব না বলেই যে তোমাকে চিঠি

দিয়েছিলাম—

না-না-না—

শোন মোহর লক্ষ্মীটি!

কিছু শুনতে চাই না আমি। কিছু শুনতে চায় না—

লক্ষ্মীটি শোন, অবুঝ হয়ো না, কেন তুমি আমার জন্য তোমার জীবনটা নষ্ট করবে।

তা হয় না—হতে পারে না—

আমাকে তুমি ভুলে—

কথা শেষ করতে দিল না বলাকা। মুখ চেপে ধরল।

কেন তুমি আমাকে সত্যি কথাটা জানতে দাওনি—কেন সত্য গোপন করে গেছ? আমার যদি আজ অসুখ হত, পারতে তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিতে?

তুমি জানো না মোহর—জানো না কি হয়েছে আমার। গলায় আমার ক্যানসার হয়েছে—

না, না—একটা আর্ত অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে যেন বলাকা

হ্যাঁ মোহর—ভোকাল কর্ডে। কারসিনোমা—ওর তো কোন চিকিৎসাই নেই—একটু একটু করে গলার স্বর আমার বুজে আসবে—তারপর একদিন সব বন্ধ হয়ে যাবে—

না, না—তোমাকে আমি ভাল করে তুলব—

এ রোগ যে ভাল হবার নয় মোহর—

না না, চল—আমরা ইউরোপ—ভিয়েনায় গিয়ে চিকিৎসা করাব—

কি হবে মিথ্যে আর টানা পোড়েন করে মোহর—My one foot is already on the grave।

ওগো—না,না বলো না—ও কথা বলো না—কান্নায় ভেঙে পড়ে বলাকা রাজেশের বুকের ওপর।

ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

কেঁদো না মোহর, কেঁদো না—

নিষ্ঠুর—তুমি নিষ্ঠুর—বলাকা কাঁদতে লাগল।

দিন চারেক ছুটোছুটি করে বলাকাই সব ব্যবস্থা করে ফেলল দুজনের ইউরোপ যাবার—

সন্ধ্যে ৭-৫০ মিঃ দমদম এয়ারপোর্ট ছাড়ল ইউরোপগামী প্লেন। আজ আর বলাকা এয়ার হোস্টেস নয়—রাজেশের অ্যাটেনডেন্ট হয়ে চলেছে বলাকা।

বালিশে রাজেশের মাথাটা ঠিক করে দিতে দিতে বলাকা বলল, এবারে ঘুমোও লক্ষ্মীটি—

ক্লান্ত রাজেশ চোখ বুজল।

হাজার হাজার ফুট উঁচু দিয়ে জেট্ প্লেন উড়ে চলেছে নিঃসীম আকাশ পথে।

বলাকা একটা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসল।

সন্ধ্যাদি ও শৈবাল বাবু।

আশীর্বাদ করুন যেন রাজকে আমি সুস্থ করে ফিরিয়ে আনতে পারি। ও ছাড়া যে এ দুনিয়ায় আর আমার কেউ নেই। ভাগ্যে আপনি আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন—

এয়ার হোস্টেস্ মিস্ ত্রিবেদী এসে বলল, রাজেশ বাবু তোমায় ডাকছেন—

তাড়াতাড়ি উঠে গেল বলাকা।

ডাকছিলে!

হ্যাঁ। আমরা কি সোজা ভিয়েনায় যাব।

না—আগে লণ্ডন তারপর ভিয়েনা—

মোহর—

বল!

তোমার হাতটা একটু ছোঁব।

বলাকা তার হাতটা বাড়িয়ে দিল।

রাজেশ বলাকার হাতটা চেপে ধরল।

নদীর নামটি মধুমতি

নীলকণ্ঠ পাখীটা আজ আর এলো না।

অনেকক্ষণ বসে থেকেও নদীর ধারে রেজাক পাখীটাকে আজ দেখতে পেল না। আর কি পাখীটা আজ আসবে, বোধ হয় আসবে না।

গাঁয়ে আসার পর থেকে প্রতিদিন এই সময়ে নদীর ধারের এই জায়গাটিতে এলেই পাড়ে হেলে পড়া হিজল গাছটার ডালে যে নীলকণ্ঠ পাখীটাকে বসে থাকতে দেখতো আজ সেই পাখীটাকে এখনো দেখতে পেল না রেজাক।

বিকেলের রোদ পড়ে এসেছে।

মধুমতীর ঘোলাটে জলের বুকে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ক্রমশঃ ঘন হয়ে নামছে। মৃদু মৃদু বাতাসে হিজল গাছের ছোট ছোট ডাল আর পাতাগুলো নড়ছে। কিন্তু যে ডালটার উপরে কয়দিন থেকেই দেখেছে সে নীলকণ্ঠ পাখীটাকে এসে বসতে— বেড়াতে এসে দেখে সে ডালটা আজ শূন্য।

পাখীটা আজ আর এলো না।

ভারী সুন্দর পাখীটাকে দেখতে।

পাখীটাকে দেখতে ভারী ভাল লাগত রেজাকের। বারে বারেই চেয়ে চেয়ে দেখতো পাখীটাকে। ডালটার উপরে চুপটি করে বসে আছে পাখীটা।

কলেজ খোলা।

আব্বাজানের অসুখের সংবাদ পেয়েই দেশের বাড়িতে গাঁয়ে এসেছিল কটা দিনের জন্য। দিন তিনেক হলো আব্বাজান একটু ভাল হয়েছে। বাইরে এসে বসছে চেয়ারটায়—ফসল কাটার ব্যাপার নিয়ে জনমজুরদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলছে কাল থেকে, তাই ঠিক করেছে রেজাক ফিরে যাবে।

ভাবছিল দুদিন থেকেই এবারে ফিরে যেতে হবে নচেৎ কলেজে পার্সেনটেজ থাকবে না—কিন্তু দিন ঠিক করেনি। হঠাৎ পরশু এলো শামসুলের চিঠিটা ঢাকা থেকে। সেই চিঠিটা পাওয়ার পরই স্থির করছে ও কালই যাবে

বলেও দিয়েছে আম্মা আর আব্বাজানকে।

শামসুলের চিঠিটা দশই মার্চের লেখা।

চিঠি ত নয় ওর প্রতিটি ছত্রে যেন একটা সংকেত বহন করে এনেছে। প্রতিটি হরফ যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিংগ।

ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু মুজিবর সাহেব সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাকি জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

ঢাকায়-কুমিল্লায় চট্টগ্রামে-ফেণীতে-মৈমনসিংয়ে সর্বত্র চলেছে এখন সম্পূর্ণ অসহযোগ।

পাকিস্তানের জংগী প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান যে নতুন দিন ধার্য করেছে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তা বঙ্গবন্ধু নাকচ করে দিয়েছেন।

জাতীয় পরিষদে ওঁরা বসেবেন না। বসতে পারেন না— সংখ্যালঘিষ্ঠ ভুট্টোর প্ররোচনায় সংখ্যাগরিষ্ট আওয়ামী লীগের কোন পরামর্শ না নিয়েই তাদের ঐ ভাবে নতুন দিন ঘোষণার ব্যাপারটা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠকে অস্বীকার করাই নয়—অপমান।

তাই বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন দৃপ্তকণ্ঠে, তাঁদের ছয় দফা দাবী মেনে নিতে ত হবেই সেইসঙ্গে আরো নতুন দাবী ও দেশ থেকে মার্শাল-ল তুলে নিতে হবে অবিলম্বে, তার আগে কোন আলোচনাই হতে পারে না।

আর তারই প্রতিবাদে আজ শুরু হয়েছে ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় অসহযোগ আন্দোলন—নন-

কো-অপারেশন। সরকারী বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠান—আদালত—স্কুল কলেজে—ডাকঘর—ব্যাঙ্ক সব নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শামসুল লিখেছে, এখানে একটিবার না এলে তুই বুঝবি না রেজাক—একটিবার আয়। এসে দেখ সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ বঙ্গবন্ধু মুজিব সাহেবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেমন করে।

দেখবি তাদের কি দুর্জয় সাহস ও মরণপণ প্রতিজ্ঞা। হয় দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ ও নিপীড়নের অবসান—নয় মৃত্যু।

হয় আমরা যা চাই তাই দাও—মেনে নাও আমাদের সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর দাবী, না হয় আমরাও প্রস্তুত—আমরাও জানি কেমন করে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়—অত্যাচারের শৃংখলকে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিতে হয়।

আরো লিখছে শামসুল।

পূর্ব পাকিস্তান আর নয়—আজ শুধু বাংলাদেশ—সাড়ে সাত-কোটি বাঙালীর বাংলাদেশ। সোনার বাংলা।

সবার মুখে ঐ এক নাম—জয় বাংলা।

জয় বাংলা।

রিকশাওয়ালা পর্যন্ত। একজন রিকশাওয়ালার সঙ্গে, পথ চলতে চলতে দেখা হলে বলে, জয় বাংলা।

সোনার বাংলা আমরা তোমায় ভালবাসি।

কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, ওগো আমাদের সোনার বাংলা—জয় বাংলা।

মহাসাগরের বুকে যেন বন্যা এসেছে রে।

একটিবার ঢাকা শহরে না এলে তুই বুঝবি না।

সবাই যেন পাগল হয়ে উঠেছে।

সবার বুকের মধ্যেই জ্বলছে আগুন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাহেব শুনলাম আসবেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে। তা আসুন তিনি—আমাদের দাবী তাঁকে মানতেই হবে।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-কাইয়ুমের ধারণা পাকিস্তানকে আমরা ভেঙ্গে টুকরো করতে চাই। তার অখণ্ডতা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চাই—

নির্বোধ। নির্বোধ—

সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা তারা তা কেন চাইবে। তারা কেবল চায় শোষণ বন্ধ হোক।

আমাদের শ্রম আর সম্পদকে বছরের পর বছর লুঠে নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে আর ধর্মের জিগির তুলে—ধর্মের আফিং খাইয়ে আমাদের চিরদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখবে আমরা তা আর হতে দেবো না।

না, না—কিছুতেই না।

আমরা সবাই প্রস্তুত।

আমাদের ছাত্র লীগ নেতা সিরাজুল আলম এবং তার সহযোগী ছাত্র নেতারাই—আজ যে গণ আন্দোলন আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে, তার রূপ ও কর্মপন্থা গত ১লা মার্চ এক ইস্তাহারে খসড়া রচনা করেছিল।

তারপর ৩রা মার্চ পলটনে ছাত্র লীগের সভায় সেটা ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেই সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন।

ইস্তাহারটি আজ একটি ঐতিহাসিক দলিল।

আমরা জানি যদি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মত পথ ধরে চলি—মনোবল যদি আমাদের অটুট থাকে—জানি যা থাকবেও—আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

বাংলা ও বাঙালীর জয় হবেই।

আর তার প্রস্তুতি তুই দেখতে পারবি আজ এখানে এলেই।

শামসুলের চিঠিটা যেন শুধুমাত্র একটা চিঠিই নয়—এক নয়া ফরামন। নয়া জমানার নয়া ফরমান।

সর্বত্র আজ কালো পতাকা উড়ছে—

আর সোনার বাংলার নতুন পতাকা।

রেজাক মনে মনে তাই স্থির করেছে কালই চলে যাবে এখান থেকে খুলনায়। সেখান থেকে ঢাকায়।

যেতেই হবে ঢাকায়।

শহীদের খুনে লাল যার মাটি—তীর্থের সেরা তীর্থ—নতুন দিনের মদিনা—সে ত কেবল একটি ঢাকা নামের শহর নয়—

কিন্তু আম্মা আব্বাজান ওঁরা সবাই বেঁকে বসেছেন।

বলছেন, না এই হট্টগোলের মধ্যে শহরে যাবার দরকার নেই।

বলবেনই ত। রেডিওতে প্রত্যহ যে সংবাদ শোনা যাচ্ছে— তার মধ্যেই ত রয়েছে, যে আগুন আজ সারাটা দেশ জুড়ে জ্বলে উঠতে চলেছে তারই প্রস্তুতির খবর।

তবুও রেজাক তার বন্ধু শামসুলের চিঠিটার কথা কাউকে বলেনি, কেবল বলেছে, কলেজ কামাই হচ্ছে কাজেই এবার ফিরে যেতে হবে। তবু এখনো তাঁরা রাজী হননি—

শামসুল আরো লিখেছে ঃ

জানিস রেজাক, আমরা বুজতে পারিনি ওরা ঐ পাঠানরা পাঞ্জাবীরা আমাদের দাবী মেনে নেবে না।

কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

ওরা যে ভাল করেই জানে মেনে নিলে যে ওদের সব গেল।

দীর্ঘ তেইশটা বছর ধরে যে আমাদের সোনার বাংলাকে শোষণ করে করে সম্পদ আর ঐশ্বর্যের স্বাদ পেয়েছে সেটা যে আমদের আজকের দাবী মেনে নিলে বন্ধ হয়ে যাবে।

॥ ২ ॥

মুজিব সাহেব যে তাই স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, শোষণ আর চলবে না। আমাদের সম্পদের অধিকারী আমরাই।

খুদকুড়ো দিয়ে আর আমাদের ভুলিয়ে রাখা চলবে না।

অনেক হারিয়েছি আমরা—অনেক খুইয়েছি—আর নয়।

এবার একটা বোঝাপড়া।

আর আমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে ধর্মের কতকগুলো অন্তঃসারশূন্য বুলি আওড়ে—পাকিস্তানে আমরা সব ভাই-ভাই—আমাদের ধর্ম এক— স্বার্থ এক— শুনিয়ে শুনিয়ে আর আমাদের চোখে ঘানির বলদের চোখের ঠুলির মত মিথ্যে ঠুলি পরিয়ে সাতকোটি বাঙালীকে তাদের দেশের সম্পদকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে দেবো না।—

মুজিব সাহেবের কঠিন প্রতিজ্ঞা।

কাজেই বুঝতে পারছিস—আগুন জ্বলবে।

পাঞ্জাবী খানেরা এ দাবী আমাদের মেনে নেবে না এবং বেয়োনেটের মুখে আমাদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করবে।

আমরাও সবাই প্রস্তুত হচ্ছি তাই ঘরে ঘরে। প্রতিটি ঘর আজ আমাদের এক একটি প্রতিরোধ দুর্গ—দুর্ভেদ্য।

ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

বার বার চিঠিটা পড়েছে রেজাক আর বারবারই কে যেন তার কানে কানে ডাক শুনিয়েছে তাকে, আয়—আয় সোনার বাংলার সন্তান।

ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে চলে আয় মুক্তাঙ্গনে। যুদ্ধ-ভূমিতে।

কাউকে শামসুলের চিঠির কথা বলতে না পারলেও রেজাক একজনকে কি বলেনি।

সবার কাছে চেপে গেলেও চিঠিটার কথা তার কাছে কি চেপে রাখতে পেরেছে! না পারেনি।

হ্যাঁ বলেছে বৈকি একজনকে—চুপি চুপি তাকে চিঠিটা পড়েও শুনিয়েছে—কাজলকে।

কাজল ত তার চাইতে বয়েসে বেশী ছোট নয়—

মাত্র দুই বছরের ছোট—

কাজল এখানকার গার্লস স্কুলের ছাত্রী। এবারে পরীক্ষা দিয়েছে।

সে চিঠিটা শুনে বলেছে, কি করবে তুমি এখন রেজাক। যাবে নাকি শহরে?

নিশ্চয়ই—

যাবে?

যেতে ত হবেই—

হ্যাঁ পালাতে তাকে হবে, বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলেই।

কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক রেজাক—সতের বছরের নওজোয়ান রেজাক, কাউকে কিছু না জানিয়েই চলে যাবে।

মা বাপের একমাত্র সন্তান সে।

অলি মিঞা মাঝি বলেছিল, এই ত আইলে এর মধ্যেই চলি যাবা। ক্যান, থাকবা না দুদিন?

কি করি চাচা—সত্যি কথাটা অলি মিঞাকে বলেনি সে। বলেছে, কলেজে পড়াশুনা পুরোদমে হতিছে, না গেলি ক্ষতি হবে—

কিন্তু হক্কলে যে কইতাছিল—

কি!

স্কুল-কলেজ নাকি বেবাক বন্ধ—মুজিব সাহেব নাকি দেশ জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেছেন—ঢাকা শহরে গোলমাল—

তা একটু আধটু গোলমাল ত হবেই—

নদীর ধারে একটা গাব গাছের গুঁড়ির উপর বসে বসে সেইসব কথা ভাবছিল রেজাক।

কাল ভোরেই সে চলে যাচ্ছে গ্রাম থেকে। কিন্তু কাজল এখনো এলো না কেন।

কাজলেরও আসবার কথা।

আরো এসেছিল নীলকণ্ঠ পাখীটাকে শেষবারের মত একটিবার গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার আগে দেখে যাবার জন্য আজ।

কিন্তু আজ নীলকণ্ঠ পাখীটাকে দেখতেই পেল না। কাজলও বোধ হয় এলো না।

রোজ আসে কিন্তু আজ এলো না কেন কে জানে—।

রেজাক—

কে?

চমকে ফিরে তাকাল রেজাক।

কখন পিছনে তার কাজল এসে দাঁড়িয়েছে! ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ধূসর ছায়াও চারিদিকে যেন একটা আবছা কুয়াশার মত ছড়িয়ে পড়েছে।

কাজল তুমি।

তোমাদের বাড়ি গিয়েলাম—শোনলাম তুমি সেই কখন বাহির হইছো—মনে মনে ভাবলাম কোথায় আর তুমি যাবা, তুমি ঠিক আসছো তোমার সেই নীলকণ্ঠ পাখীর সন্ধানে গাঙ্গের ধারে, তাই—

বেশ করছোস। ভাবতেছিলাম—

কি ভাবতাছিলে?

তুমি যদি না আস ত ফিরব যখন তর সাথে দেখা করে যাবো।

তারপরই একটু থেমে বলে, জানস—

কি?

নীলকণ্ঠ পাখীটা আজ আসে নাইরে কাজল।

হয়ত অন্য কোন গাছের ডালে বসে আছে—কাজল মৃদু হেসে বললে।

না--সে বোধহয় উড়ে গেছে—আর আসবে না।

কাজল মৃদু হাসলো, কেমন করে জানলে?

কাজলের হাসিটি সত্যি ভারী সুন্দর লাগে রেজাকের।

হাসলে গালে কেমন ছোট্ট দুটি টোল খেয়ে যায়।

জানি জানি—ও আর আসবে না।

কি যে বল?

কই ঠিকই। দেখবি ওরে আর দেখতি পাবি না।
চল। বাড়ি যাবা না। কাজল বলে।
যাবো। বস না একটু—
না। মায়ে খোঁজবো—
কাজল।
কি?
আর বোধ হয় আমাগো দেখা হইবো না।
ক্যান! কাজল প্রশ্নটা করে রেজাকের মুখের দিকে তাকাল।
কি জানি মন কয়—তারপর একটু থেমে বলে, আমার একটা কথা রাখবে কাজল?
কি?
সেই গানটা একবার গাইবে?
কোন্ গানটা!
সেই যে—আমার সোনার বাংলা—

চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার আরো যেন ঘনিয়ে আসছে, নদীর জল ঝাপসা—ভাল করে চোখে পড়ে না।

কেবল সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মধুমতীর একটানা কল কল শব্দ কানে ভেসে আসে মধুর এক সুরের মত।

দূরে একটা নৌকা চলেছে। তার আলোটা দেখা যায়।

নদীর ধারে বাঁশ ঝাঁড়ের সরু চিকন পাতায় পাতায় কি এক বিচিত্র সিপ্ সিপ্ শব্দ।

কাজল গেয়ে ওঠে ঃ

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

রেজাকও ওর সঙ্গে গলা মেলায়,

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি মধুর হাসি॥

হঠাৎ এ সময় রেজাক ও কাজল দুজনেই চমকে ওঠে একটা ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে।

ওরা গান থামিয়ে দেখে সামনের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যার ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকারে সেই নীলকণ্ঠ পাখীটা হিজলের ডালে এসে বসেছে। কখন সেই ডেকে উঠেছে।

ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকারে এ ওর মুখের দিকে তাকাল গান থামিয়ে ক্ষণেকের জন্য। দুজনেরই মুখে হাসি।

রেজাক বলে ওঠে, এসেছে এসেছে ঐ দেখ কাজল।

হ্যাঁ সত্যিই ত। কাজল ঝাপসা আলোয় চেয়ে দেখে সত্যিই ত এসেছে সেই নীলকণ্ঠ পাখীটা।

কি শোভা, কী ছায়া, গো, কি স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীল কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি।

॥ ৩॥

রাত তখনো শেষ হয়নি।

তখনো ঝুপসি ঝুপসি শেষ রাতের অন্ধকার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

আসন্ন রাত্রি শেষের ইঙ্গিত আকাশে বাতাসে।

রেজাক উঠে বসল শয্যার উপরে।

এখুনি বেরুতে হবে।

অলি মিঞা এখুনি তার জেলে ডিঙ্গি নিয়ে নদীতে মাছ মারতে বেরুবে।

সে বলেছে, ঠিক আছে করতা তুমি আইয়ো ঠিক ভোরের বেলায় মেল্লাদের ঘাটে। তোমারে নাওয়ে তুইলা নিব। তোমারে গাঙ্গ পার করে মাছ মারতি যাবো।

রাতের বেলাতেই আবশ্যকীয় জামা কাপড়গুলো একটা ছোট সুটকেশে ভরে রেখেছিল, আর তার আব্বাজানের দোনলা বন্দুকটা দক্ষিণের পোতার ঘর থেকে চুরি করে এনে বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।

ওদের গাঁয়ের আওয়ামী লীগের তোফাজ্জল মিঞা যিনি এবারে প্রাদেশিক এসেম্বলিতে মনোনিত হয়েছেন তিনি বলে দিয়েছেন—যে যা পার হাতিয়ার সংগ্রহ করে শহরে চলে যাবে। বন্দুক ছোরা টাঙ্গি লাঠি— যে যা পার।

যুদ্ধ একটা অনিবার্য।

শত্রুর মোকাবিলা করতেই হবে।

বন্দুকটা কাপড়ে জড়িয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে চোরের মত নিঃশব্দ গতিতে পা টিপে টিপে দোতলার ঘর থেকে বের হয়ে এলো রেজাক—হাতে সুটকেশটা।

মনে মনে বাড়ির দোতলার ঘরে যেখানে আম্মা ও আব্বাজান ঘুমিয়ে আছে সেই দিকে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে বললে, ক্ষমা করো, আম্মা-আব্বাজান—তোমাদের একমাত্র সন্তান আমি—জানি তোমাদের বুকে খুব দুঃখ পৌঁছাবে কিন্তু আমার দেশজননী সে আমায় ডাক দিয়েছে—আমার অনাথিনী বাংলা মা—আম্মা দোয়া কর।

দু চোখ ভরে জল এসে গিয়েছিল, সে জল দু হাতে মুছে ফেলে হনহন করে হেঁটে চলে রেজাক।

নিকারিপাড়া, কামারপাড়া পার হয়ে সোজা গাঙ্গের ঘাটের দিকে এগিয়ে চলে।

আনসার পার্টি অফিসের পিছনের ঘাটেই অলি মিঞা তার নাও নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করবে বলে দিয়েছে।

সরু পায়ে চলা মেঠো রাস্তা—দু পাশে গাব-আম-জাম নারকেল সুপারির গাছ।

গ্রামের এখনো ঘুম ভাঙ্গেনি।

শহরের জাগরণের কলরোল এখনো গাঁয়ে এসে পৌঁছায়নি। এরা—গ্রামবাসীরা এখনো নিশ্চিন্ত।

গাছে গাছে ঘুমভাঙ্গা পাখীর বিচিত্র কলকাকলী আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়।

গ্রীষ্মকাল এখনো আসেনি গ্রামে।

মার্চ মাসের শেষাশেষি।

গাঙ্গের ঘাটের কাছাকাছি আসতেই কানে এলো অলি মিঞার গানের সুর।

গুরু আমায় পুষতে দিল ছয়টা পাখী।

ভারী মিষ্টি গলাটা মাঝির।

আরো দ্রুত পা চালায় রেজাক।

গাঙ্গের ঘাটে পৌঁছে দেখে প্রথম ভোরের ঝাপসা আলোয় পাড় ঘেঁসে অলি মিঞার ছোট্ট নাওটা ঢেওয়ের দোলায় দুলছে।

চাচা—

কেডা—রেজাক আলে—

হঁ চাচা।

তাড়াতাড়ি উইঠা পড়ো নায়ে—সময় যায়—

এই যে আই—

খানিকটা জল ভেঙ্গে রেজাক নাওয়ের উপর উঠে বসল।

হাতের বৈঠা দিয়ে পাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে অলি মিঞা নাও গাঙ্গের জলে ভাসিয়ে দিল।

বৈঠা দিয়ে জল টানতে টানতে অলি মিঞা শুধায়, যাতিছ আবার আসবা কবে?

রেজাক অলি মিঞার প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

সামনে প্রসারিত তার আশৈশবের চেনা নদী মধুমতী। কলকল ছলছল একটানা চলেছে বয়ে। মাঝে মাঝে জলের বুকে ঘূর্ণি।

ঘূর্ণি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলেছে অলি মিঞা। পাকা মাঝি—বয়স অনেক হলো, তা প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু এখনও শরীরের বাঁধুনি কি!

কি হবে কও ত রেজাক? অলি মিঞা প্রশ্ন করে বৈঠা টানাতে টানতেই এক সময়।

কিসে কি হবে চাচা?

আমাগো মুজিব সাহেব মন্ত্রী হইবো? হলে কিন্তু বড় ভাল হয়—

সারা দেশের লোক মুজিব সাহেবের পিছনে জান ত!

তা আর জানি না।

একটা কিছু ফয়সলা হবেই—

দেখো। হইলেই হয়। ওনাগো ঐ পশ্চিমি খানগো বিশ্বাস নাই। এত দিনের রাজাপাট—

রেজাক একটু আশ্চর্যই হয়।

দেশের মন আজ কোন্ দিকে ছুটেছে, সামান্য এক অশিক্ষিত মাঝি সেও আজ বুঝতে পেরেছে পিণ্ডিশাহীর লোকেরা কি ভাবে সারা বাংলা দেশটাকে শোষণ করে ঝাঁঝড়া করে দিচ্ছে—কিভাবে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

মনে মনে বলতে থাকে রেজাক—হবে—হবে—সুনিশ্চিত জয় তাদের হবে।

কাল রাত্রে রেডিওতে শুনেছে যদিও বঙ্গবন্ধু মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বৈঠক ও আলোচনা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি—তাহলেও আওয়ামি লীগের পাণ্ডারা হতাশ হয়নি এখনো।

কাল পঁচিশে মার্চ বোধহয় ইয়াহিয়া খান একটা বেতারভাষণ দেবে।

মেনে তাকে নিতেই হবে মুজিব সাহেবের ছয় দফা দাবি।

আর তা যদি না নেয় ত—

তারাও জানে তাদের জবাব দিতে।

বাংলা—সোনার বাংলাকে তারা হারাতে পারে না।

রেজাক আবছা আলো-আঁধারে গাঙ্গের স্রোতের দিকে অন্যমনে চেয়ে থাকে।

কি ভাবতিছো রেজাক?

কিছু না চাচা।

রেজাক জানত না ঐ সময় ভোর রাত্রির আবছা আলোছায়ায় ঘোর ঘোর আবছায়ার মধ্যে বড় বকুল গাছটার নীচে গাঙ্গের পাড়ে কাজল এসে দাঁড়িয়েছিল, গাঙ্গের দিকে চেয়ে ছিল নির্নিমেষে।

আসতে একটু তার দেরি হয়ে গিয়েছিল। ঘুমাব না ঘুমাব না করেও কখন যেন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল ভোরের দিকটায়।

যশোর টাউনের অবস্থা এখন কি কে জানে! মিথ্যেই হয়ত সে ভয় করছে—দুশ্চিন্তা করছে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

রেজাকের নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটবে না। অক্ষত দেহে একদিন আবার সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে গাঁয়ে। গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে। প্রতিবারই যেমন যায় আবার ফিরে আসে—তেমনিই আসবে ফিরে।

॥ ৪॥

যশোর শহরে পা দিয়েই কিন্তু রেজাকের ভুল ভেঙ্গে গেল।

ছাব্বিশে মার্চ সকাল।

রেডিওতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের মতই। চাঁটগা বন্দরের শ্রমিকরা নাকি করাচী থেকে আগত যুদ্ধ জাহাজ থেকে মাল খালাস করতে অস্বীকার করায় পশ্চিম-পাকিস্থানী পাঞ্জাবী খান ও বেলুচ সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে গতকাল তাদের উপর।

মুজিব সাহেবের ছয় দফার চার দফা ইয়াহিয়া খান মেনে নিয়েছে এবং ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে

একদিকে মুজিব সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া চলেছে ঢাকা শহরে—ওদিকে চট্টগ্রামে পঞ্চান্ন জনেরও বেশী বাঙালী পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সৈন্যদের গুলিতে নিহত ও দুই শতাধিকেরও বেশী আহত।

আজ সর্বত্র হরতাল।

হরতালের ডাক দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

যশোর শহরের সর্বত্র দারুণ উত্তেজনা। সর্বত্র কানাকানি—আলোচনা আর আলোচনা। যশোর শহরে পা দিয়েই দেখতে পেল রেজাক।

সরকারী ভবন, আদালত-স্কুল-কলেজ-অফিস এবং প্রতি ঘরে ঘরে উড়ছে কালো পতাকা পত্‌পত্‌ করো—পাঞ্জাবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একাত্ম জেহাদ ঘোষণা।

অসহযোগের প্রতীক কালো পতাকা।

এমন কি ট্যাক্সী রিক্‌শা ও সাইকেলের উপরও উড়ছে কালো পতাকা। যে দিকে চোখ পড়ে কেবল কালো পতাকা আর কালো পতাকা।

পথে পথে হকাররা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইত্তেফাক কাগজ বিক্রি করছে—

55 Killed in E. Pakistan Bangla Desh firing. Dockers refuse to unload arms. Call of Hartal.

মুজিব সাহেব—বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক হরতালের ডাক দিয়েছেন।

ছয় জাহাজ ভর্তি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য চাঁটগা ও খুলনার চালনা বন্দরে এসে নেমে তারা পূর্ব-পাকিস্তানের তিন তিনটি বিশেষ সৈন্যঘাঁটি ক্যানটনমেণ্টের দিকে মার্চ করে চলেছে।

গতকাল নাকি পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশবাসী চাঁটগার বন্দরকে প্রায় ঘিরে ফেলেছিল। তীক্ষ্ণ সোচ্চার প্রতিবাদে তারা দুদিন আগে করাচী থেকে আগত M/s Swat-এর থেকে কোন যুদ্ধোপকরণ নামাতে দেবে না।

রাতের অন্ধকারে চাঁটগা বন্দর এলাকায় তীব্র যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

মৃত তিন শতেরও অধিক পাঞ্জাবী বন্দররক্ষী সৈন্যদের গুলিতে।

সোদপুরেও অনুরূপ একটি খণ্ড যুদ্ধে বিশ জনের অধিক মারা গিয়েছে, শতাধিকের বেশী আহত।

চাঁটগায়ে সৈন্যরা মেশিনগান চালিয়ে বহুলোককে মেরে ফেলেছে।

চলছিল সরকারের সঙ্গে গত কয় সপ্তাহ ধরেই পূর্ণ অসহযোগ। —সরকারী প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্কুল-কলেজ সব মুজিব ভাইয়ের নির্দেশে বন্ধ হয়েছিল।

সমস্ত প্রকার সরকারী কর দেওয়াও বন্ধ হয়েছিল। আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান ঢাকায়—সবাই ভাবছিল একটা আপসে মীমাংসা হয়ত হবে—তার মধ্যে একি সংবাদ।

॥ ৫ ॥

যশোর টাউনেই থাকে রেজাকের এক সহপাঠী। নাম সীতাংশু।

সীতাংশুদের পরিবার পাকিস্তান হওয়ার পরও পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে যায়নি।

লক্ষ লক্ষ লোক চলে গিয়েছে পাকিস্তান হবার পর থেকে। কেউ অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে, কেউ বা ভয়ে আতঙ্কে জীবনের তাগিদে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিয়েছে।

কতজনে হয়ত সর্বস্ব হারিয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় নিরুপায় হয়ে ছুটে চলে গিয়েছে—কোনমতে পরিবার-পরিজন নিয়ে পশ্চিম বাংলায় একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আশায়।

কেউ কেউ সম্পত্তি বিষয়আশয় যা কিছু ছিল বিক্রি করেছে, না হয় পশ্চিম বাংলার সঙ্গে অদলবদল করে নিয়েছে।

সীতাংশুর বাবা অচিন্ত্যবাবু কিন্তু যাননি, বলেছেন, মরতে হয় নিজের সাতপুরুষের মাতৃভূমিতেই মরব—

ঢাকা শহরের নামকরা এড্‌ভোকেট—প্রচুর পসার ও প্রতিপত্তি। তাঁদেরও আদি বাড়ি ও দেশ যশোর জেলাতেই—এবং টাউনের ওপরেই।

যশোরে আদি বসতবাটি ছাড়াও ঢাকা শহরে নতুন বাড়ি করেছিলেন।

সীতাংশুর মা মমতাময়ী মধ্যে মধ্যে ঢাকায় যেতেন বটে তবে বেশীরভাগ সময়ই যশোরের বাড়িতে থাকতেন।

বড় ছেলে সীতাংশু ঢাকাতেই কলেজে পড়ে।

সীতাংশুদের বাড়িতে গেলে একটা খবরও পাওয়া যাবে এবং ঢাকা শহরের কি অবস্থা বর্তমানে তাও জানা যাবে।

কদিন ধরে গ্রামে বসে ত কোন খববই পাচ্ছিল না তেমন—

মমতাময়ী তাঁর ছেলে সীতাংশুর ক্লাসফ্রেণ্ড রেজাক চৌধুরীকে ভাল করেই চেনেন।

রেজাক তাঁকে মাসীমা বলে ডাকে।

মমতাময়ী রেজাককে দেখে শঙ্কিত হয়ে বললেন, এ সময় তুমি দেশ থেকে এলে কেন রেজাক?

রেজাক আসল কথাটা বলে না, বললে না যে ঢাকা থেকে শামসুলের চিঠি পাবার পব সে আব স্থির থাকতে পারেনি।

মিথ্যা বললে, সে আবার ঐ দিনই গাঁয়ে ফিরে যাবে।

ও জানে সত্য বললে মমতাময়ী তাকে কিছুতেই ঢাকায় যেতে দিতেন না।

সকাল তখন ৯টা ৯ মিনিট—

রেজাক ভিতরের বারান্দায় বসে চা পান করছিল।

সীতাশুর ছোট বোন শ্রীলতা চেঁচিয়ে উঠলো, মা মা শোন রেডিওতে কি বলছে।

তার হাতে একটা দামী ট্র্যানজিসটার।

মমতাময়ী ছুটে এলেন কি—কি বলছে রে—

গতকাল থেকে ঢাকা স্টেশন কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তাতেই যশোরের সকলে অনুমান করতে পেরেছিল ঢাকা শহরে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে- যে কারণে রেডিও স্টেশনও হযত স্তব্ধ, মূক।

পাঁচ হাজাব কিলোসাইকেলসে—অজ্ঞাত পরিচিত এক স্থান থেকে সকলের বহুপরিচিত একটি উদাত্ত কঠিন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আমি মুজিব বলছি—

বিশ্বের জনগণ কান পেতে শুনুন—বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে ঢাকায় পিলখানা ও রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ পুলিস-বাহিনীর ওপর পাক সশস্ত্রবাহিনী আকস্মিক আক্রমণ চালায়।

বহু নিরস্ত্র লোক নিহত—ঢাকা শহরে এবং ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ ও পুলিসের সঙ্গে পাক পাঞ্জাবী ও বেলুচ বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণ শত্রুর সঙ্গে বীরের মত লড়াই করছে।

বাংলাদেশের কোণায় কোণায় শত্রুব বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আল্লাহ আপনাদের দোয়া দিন, শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন। জয় বাংলা।

কেবল তাই নয়—সাত কোটি মানুষের কথা বঙ্গবন্ধু মুজিব বলেছেন—বলেছেন বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন।

পূর্ববঙ্গে জঙ্গী দাপট।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই।

সারা দেশে সান্ধ্য আইনের অন্ধকার- -কার্ফু।

একদিকে আধুনিক অস্ত্রধারী পাঞ্জাবী ও বেলুচ সৈন্য—মেশিনগান-মর্টার-ট্যাংক-কামান—অন্য দিকে হাজার হাজার নিরস্ত্র জনগণ ও তাদের পাশে পাশে আঞ্চলিক রাইফেলস্ ও পুলিস বাহিনী।

রেজাক ছটফট করতে থাকে ভিতরে ভিতরে—

সেও ত একজন বাঙ্গালী—সাত কোটি স্বাধীনতাকামীর অতি নগণ্য হলেও একজন। একজন শত্রুসৈন্যকেও ত সে খতম করতে পারে—তারও সঙ্গে ত রয়েছে কাপড়ে জড়ানো তার বাবার চুরি করে আনা দোনলা বন্দুকটা ও পকেটভর্তি টোটা।

রেজাক কাউকে কিছু না জানিয়ে তখুনি বের হয়ে পড়ল।

মাসীমা বললেন, এখন আবার কোথায় বেরুচ্ছ রেজাক—

একটু ঘুরে আসি মাসীমা।

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না।

সুটকেশটা ও কাপড়ে জড়ানো দোনলা বন্দুকটা নিয়ে বের হয়ে পড়ল—বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে।

যশোর থেকে খুলনায় বাস যায়।

বাসে উঠে বসল। বাস ছেড়ে দেয়।

বাসের যাত্রীদের মধ্যেও নানা ধরনের কথাবার্তা—উত্তেজনার আগুন যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে তাদের কথাবার্তায়। সবার মুখেই একটা মানুষের কথা।

বেলা দশটা নাগাদ খুলনায় পৌঁছে গেল রেজাক।

সর্বত্র কালো পতাকা ও বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা উড়ছে চোখে পড়ে।

সবুজ জমিন—তার মধ্যে সোনালী বাংলাদেশ—সেই দেশের মধ্যে উঠছে রক্তরাঙ্গা নতুন সূর্য।

পূর্ব পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশের ইঙ্গিত।

সিরাজগঞ্জ ঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়লো এক সময়।

যমুনায় অসংখ্য ছোট বড় নাও। প্রতিটি নাওয়েই চোখ পড়ে রেজাকের—পাশাপাশি দুটি পতাকা বাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে।

সবুজ-সোনা লাল আর কালো।

সর্বত্র যেন সংখ্যাতীত মানুষের বুকে জেগেছে এক নবচেতনা। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সবার চোখে মুখে যেন এক আশ্চর্য প্রত্যয়।

রাত তখন কত হবে আর—সন্ধ্যা রাত।

কোনমতে একটা বেবী ট্যাক্সী যোগাড় করে রেজাক ঢাকায় গিয়ে পৌঁছাল।

॥ ৬ ॥

পথে পথে খানা-খোদল—বড় বড় গাছ কেটে পথ জুড়ে ব্যারিকেড় সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু একি!

ঢাকা শহরের মুখে পৌঁছোবার আগেই কানে এলো অবিশ্রান্ত দুমদাম আওয়াজ—কামানের গোলার আওয়াজ—মেশিনগানের ট্যাবা-রা টট্‌-টট্‌ শব্দ—

থেকে থেকে রাতের কালো আকাশ রকেটের নীল আলোয় ঝলসে যাচ্ছে।

একি ব্যাপার—

তবে কি যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে!

রাস্তায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—কেবল মধ্যে মধ্যে মিলিটারী ট্রাকের হেডলাইটের আলো ঝলসে উঠছে।

থমকে দাঁড়ায় রেজাক প্রথমটায়—কি করবে—কোথায় যাবে এখন ভেবে পায় না।

বন্ধু শামসুলের বাড়ি এখন পৌঁছবে কি করে! যেমন করেই হোক পৌঁছতেই হবে সিদ্ধেশ্বরী রোডে।

এখানে ওখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। রাতের আকাশ লাল রক্তবর্ণ।

যত দূর দৃষ্টি চলে অন্ধকারে জনপ্রাণীহীন রাস্তা—মনে হয় যেন কোন ভয়াবহ এক কবরখানার মধ্যে পথ ভুলে এসে সে ঢুকে পড়েছে।

কিন্তু কবরের স্তব্ধতা নেই—থেকে থেকে বোমা ফাটা আর গোলাগুলির আওয়াজ সেই স্তব্ধতাকে যেন বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।

রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলো অন্ধকার—কোথায়ও কোন একটি আলোর শিখা পর্যন্ত নেই।

মহাপ্রলয়ের পরে যে অন্ধকার নেমে এসেছিল সারা পৃথিবী জুড়ে এখানেও যেন সেই অন্ধকার।

রাস্তায় চারদিকে বড় বড় ড্রাম, বড় বড় গাছের গুঁড়ি—ব্যারিকেড।

হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে কোনমতে এগিয়ে চলে রেজাক। অন্ধকার ঝলসে গেল তীব্র একটা আলোর ঝাপটায়—সেই সঙ্গে ইঞ্জিনের শব্দ—নিশ্চয় কোন গাড়ি আসছে।

তাড়াতাড়ি একটা বাড়ির দেয়ালের আড়ালে ছুটে গিয়ে আত্মগোপন করল রেজাক। হ্যাঁ তার অনুমান মিথ্যা নয়—

বিরাট বিরাট দুটো মিলিটারী ট্রাক রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল—ট্রাকবোঝাই সৈন্য—তাদের হাতে হাতে বেয়নেট উঁচান রাইফেল।

তবে কি যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে?

ট্রাক দুটো চলে যাবার পর একটা জীপও চলে গেল। আবার এক ঝাঁক মেসিনগানের গুলির শব্দ শোনা গেল—ট্যারারা টট্ টট্ টট্ ....

আবার কিছুক্ষণ পরে রাস্তা স্তব্ধ হয়ে গেল—না, বেশীক্ষণের জন্য নয়, আবার তীব্র হেড্‌লাইটের আলো ফেলে সৈন্যভর্তি ট্রাক চলে গেল।

আবার গুলির শব্দ।

অন্ধকারের মধ্যেই হোঁচট খেতে খেতে রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ শামসুলের বাড়ি খুঁজে তার বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রেজাক।

কিন্তু এখন কি করে ভিতরে প্রবেশ করবে।

ঘুট্‌ঘুট্টি অন্ধকার—চারিদিকে একটা কবরের স্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ। শামসুলের বাড়িটাও অন্ধকার।

রেজাকের মনে পড়ল হঠাৎ, বাড়ির পিছন দিকে একটা বাগান আছে—বাগানের সীমানা প্রাচীর টপকে ত সে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

তাই করতে হবে। কারণ যদি কোন সৈন্যের চোখে পড়ে যায় সে তাকে সঙ্গে সঙ্গে যমালয়ে পাঠাবে।

যুদ্ধ যে একটা বেধেছে বুঝতে আর কষ্ট হয় না রেজাকের।

তাছাড়া গুলি খেয়ে মরা তার চলবে না। বাঁচতে হবে।

কোনমতে পা টিপে টিপে অন্ধকারে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল রেজাক। উঁচু প্রাচীর নয়—জিমনাস্টিক-করা ছেলে রেজাক।

কোনমতে প্রাচীরের কিনারাটা হাত বাড়িয়ে ধরে জিমনাস্টিকের কায়দায় ব্যালেন্সের সাহায্যে প্রাচীরের ওপর উঠে বাগানের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রেজাক।

দরজার দিকে এগুচ্ছে—হঠাৎ এক ঝলক তীব্র টর্চের আলো এসে তার চোখে-মুখে পড়ে তার দৃষ্টি যেন মুহূর্তের জন্য ধাঁধিয়ে দেয়।

দাঁড়াও, কে! দূর থেকে একটা চ্যালেঞ্জের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রেজাকের কানে।

আরে এ যে চেনা কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ কণ্ঠস্বর তার পরিচিত।

শামসুলের কণ্ঠস্বর।

চেঁচিয়ে জবাব দিল রেজাক, শামসুল—আমি রেজাক। রেজাক চৌধুরী—

আলো নিভে গেল।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ হলো।

একটা ছায়ামূর্তি অন্ধকারে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

রেজাক—

হ্যাঁ, শামসুল ভাই—

Quick! শীগ্‌গিরী ভিতরে চলে আয়। শামসুল এগিয়ে এসে রেজাকের হাতটা চেপে ধরল, তারপর যেন এক প্রকার তাকে টানতে টানতে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

অন্ধকার ভিতরেও।

টর্চের আলোর সাহায্যেই শামসুলের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে রেজাক।

বাড়িটা অদ্ভুত স্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে বাইরের প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ।

বাইরে বোধ হয় খুব কাছেই কোথায়ও কামান দাগান হলো—থরথর করে শামসুলদের বাড়িটা কেঁপে উঠলো—কাচের জানালার সার্শীগুলো ঝনঝন করে উঠলো।

ফিসফিস করে এগুতে এগুতেই রেজাক বলে, মনে হচ্ছে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে।

আস্তে—কথা বলিস না। আয় আমার সঙ্গে—

ওরা সোজা সিঁড়ি বেয়ে ছাতে এলো। ছাতের চারপাশে বুকপ্রমাণ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

অন্ধকার রাত—

পশ্চিম দিককার আকাশটা রক্তাভ।

দেখছিস ঢাকা শহর পুড়ছে—শামসুল বললে।

দেখছি ত—কখন থেকে এমনটা হলো—সকালে যশোর থেকে বের হয়েছি কিছুই শুনিনি---

কাল রাত থেকে সারাটা শহর জুড়ে ইয়াহিয়ার আর্মি তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে--

ইয়াহিয়া কোথায়?

সে ত কালই রাত্রে চোরের মত প্লেনে চেপে পিণ্ডি পালিয়েছে—

ভুট্টো?

সেও পালিয়েছে—

তবে যে শোনা গিয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে—মার্শাল-ল তুলে নেওয়া হবে---বঙ্গবন্ধুর দাবি ওরা মোটামুটি মেনে নিয়েছে। রেজাক বললে।

সব একটা eye wash মাত্র—তলে তলে ওরা মিলিটারী লেলিয়ে দেবে ঠিক করেই রেখেছিল—ওরা ওই সব ভুয়ো কথা চালাচ্ছিল বাইরে আর ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছিল—ভাবতে পারবি রেজাক কি ferocious, কি হিংস্র ওরা। ঠিক জিরো আওয়ারে আমাদের attack করেছে—unarmed—unprepared একটা জাতকে ওরা বোমা আর মেসিনগান দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ—

বঙ্গবন্ধুর খবর কি?

জানি না—

বেঁচে আছেন ত? Arrested হননি ত?

তাও জানি না, কারণ এখানকার বেতার স্টেশন নিষ্ক্রিয় কাল রাত থেকে—বুঝতে পারিনি রে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কেউ করতে পারে—

॥ ৭ ॥

কিছুই তোরা বুঝতে পারিসনি? শুধায় রেজাক।

না—রাত দশটা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরি ইত্তেফাক অফিস থেকে--দেখলাম রাস্তা একেবারে ফাঁকা—লোকজন কেউ নেই—কেবল চোখে পড়লো কতকগুলো সৈন্যভর্তি মিলিটারী ট্রাক—শহরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে—

তারপর—

ফিরে এসে খেয়েদেয়ে ভাবলাম শোবো—শুয়েও পড়েছিলাম কিন্তু ঘুম এলো না---হঠাৎ কানে এলো দুমদাম আওয়াজ—ফায়ারিংয়ের শব্দ। রাবেয়া—আমার ছোটবোন, ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, দাদা—শীগগিরী বাইরে এসো।

কি ব্যাপার—বের হয়ে শুধালাম।

শুনতে পাচ্ছো না—ফায়ারিংয়ের শব্দ—সারা শহর মিলিটারীতে ছেয়ে গিয়েছে—

মিলিটারী কুপ! বললে রেজাক।

তাই মনে হয়েছিল প্রথমটায়—ভেবেছিলাম ইয়াহিয়া বোধহয় গ্রেপ্তার হয়েছে। ছুটে এলাম ছাতে—সবাই তখন ছাতে এসে জড়ো হয়েছে। ক্রমাগত ফায়ারিংয়ের আওয়াজ—আকাশ আগুনের আভায় লালে লাল।

নীচে রাস্তায় ট্রাকের শব্দ—পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি—প্রথমে একটা জীপ—তার পিছনে তিন ট্রাক বোঝাই একটার পিছনে একটা রাইফেল, স্টেনগান, এল, এম, জি সজ্জিত সৈন্য রাস্তা দিয়ে চলেছে।

ছুটে গেলাম নীচে। পর পর কয় বন্ধু—সিরাজুল, হামিদ, রোশনকে ফোন করলাম। তারা বললে, সব জায়গায়ই এই অবস্থা। ধানমণ্ডি চকবাজার তেজগাঁ সর্বত্র মিলিটারীতে ছেয়ে ফেলেছে—সর্বত্র প্রচণ্ড গোলাগুলি চলেছে—সারাটা রাত তাণ্ডব চললো।

শামসুল বলতে লাগলো, কি বলবো রেজাক—চুপিচুপি সকলের অজ্ঞাতে নীচের ঘরে আর না থাকতে পেরে ছাতে উঠে এলাম। ভোরের আলো তখন আকাশে ফুটি ফুটি করছে---সেই আবছা আলো ছায়ায় কি দেখলাম জানিস—

কি?

একটা কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণধূম পাক খেয়ে খেয়ে আকাশে উঠছে। বুঝতে বাকী রইলো না—সারা রাত যে আগুন জ্বলেছে এ তারই শেষ চিহ্ন। যে আগুন ওরা সারাটা রাত ধরে জ্বালিয়েছে তা এখনো জ্বলছে।

গোলাগুলির শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে। আবছা আলো-ছায়ায় আমাদের বাম পাশের বাড়িটা—মজহরদের বাড়ি তার পাশের গলির মুখে নজরে পড়ল কয়েকজন মানুষ। ওরা বোধহয় আর বাড়ির মধ্যে থাকতে পারেনি। বের হয়ে পড়েছে। কারো পরনে লুঙ্গি—কারো প্যান্ট--কেউবা পাজামা পরা—

আবার চারদিক কাঁপিয়ে গোলাগুলির শব্দ ছড়িয়ে পড়লো--বুঝলাম যুদ্ধ চলেছে—চারপাশে—উত্তর-পূর্ব দিকে মগবাজার এলাকায়—দক্ষিণে পুরানো পল্টন—সেদিক থেকেও শব্দ আসছে ভেসে গোলাগুলির। ঐ সময় নজরে পড়লো—

কি?

আমাদের পাড়ার কয়েকটি তরুণ, হাতে তাদের দোনলা একনলা বন্দুক রাইফেল—ছুটতে ছুটতে চলে গেল দক্ষিণ দিকে।

শামসুলের কথা শেষ হলো না—প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনা গেল। নীচের দিকে চেয়ে দেখি গোটা দুই ট্যাংক রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছে আর এলোপাতাড়ি চারপাশে গুলি চালাতে চালাতে চলেছে ঐ সঙ্গে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

রাত প্রায় দুটো হবে—

কখন রেবেকা ছাতে উঠে এসেছিল জানি না।

ভাইজান—

তার গলা শুনে দুজনেই আমরা ফিরে তাকালাম। শুধু রেবেকাই নয় তার পাশে ছায়ামূর্তির মত অন্ধকারে আরো যেন কে একজন দাঁড়িয়ে।

কে?

আমি রাজীব—

কি খবর রাজীব ভাই?

এখুনি বেরুতে হবে—আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে প্রায়—

আমি ত সন্ধ্যা রাত থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছি—চল নীচে চল—

সকলে নীচে দোতলায় শামসুলের ঘরে এসে ঢুকলাম।

রেবেকা—

ভাইজান—রেবেকা সাড়া দিল।

মোমবাতিটা জ্বালা—

একটু পরেই মোমবাতির নরম ভীরু আলোয় ঘরটা যেন কাঁপতে লাগল।

সেই কাঁপা কাঁপা আলোয় রেজাকের নজরে পড়ল পরিচিত ঘরটা—

কতদিন এই ঘরে দুই বন্ধুতে মিলে আড্ডা দিয়েছে।

একপাশে দামী একটা খাটে শয্যা বিছানো—নিভাঁজ শয্যা—বোঝা যায় কেউ সে শয্যা স্পর্শও করেনি।

অন্য পাশে বইয়ের আলমারিটা ও পড়াশুনো করবার টেবিল। বই খাতাপত্র ছড়ানো টেবিলের ওপরে।

শামসুলের পরনে ছিল লুঙ্গি। চটপট সে লুঙ্গি বদলে প্যাণ্ট ও হাফ সার্ট পরে নিল।

ঘরের আলমারির পাশ থেকে ওর বাবার দোনলা বন্দুকটা হাতে তুলে নিল, পকেট ভর্তি করে নিল টোটা।

রেবেকা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার ভাইজান শামসুলের মুখের দিকে। মুখে একটি কথা নেই।

রেজাকের দৃষ্টি রেবেকার কচি-কচি মুখের দিকে। পনের বছরের কিশোরী রেবেকা। কাজলের চাইতে হয়ত এক আধ বছরের ছোটই হবে।

কেন যে রেবেকাকে দেখলেই রেজাকের কাজলকে মনে পড়ে যায়। দুজনার চেহারার মধ্যে

ফারাক আছে—চরিত্রেও অনেক ফারাক। তবু একজনকে দেখলে অন্যজনকে মনে পড়ে।

কাজল কালো শ্যামলা—রোগাটে পাতলা দেহের গঠন। আর রেবেকা গৌরবর্ণা—বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

কিন্তু আশ্চর্য মিল যেন ওদের দুজনার চোখে মুখে—চোখের চাউনিতে- মুখের হাসিতে ও কথা বলার ভঙ্গিতে।

কাজল শান্ত স্নিগ্ধ—কথা খুব কম বলে। রেবেকা চটপটে, মুখের ওপর কথা শুনিয়ে দিতে ওস্তাদ—চঞ্চল—অস্থির।

একটু দাঁড়া রাজীব—আব্বাজানকে বলে আসি—শামসুল বের হয়ে গেল।

রাজীব এতক্ষণে যেন রেজাকের মুখের দিকে তাকাল, তুমি ঢাকায় কবে আইলা রেজাক ভাই?

আজ রাত্রেই এসেছি—

আসলা কি কইরা—

কি করে যে এসেছি তা আর নাই শুনলে রাজীব ভাই—আসতে আসতে অনেক কিছুই চোখে পড়েছে। কিন্তু—

রেজাকের কথা শেষ হলো না—ঘরে এসে ঢুকলেন শামসুলের বাবা—শহরের নামকরা এডভোকেট আলী সাহেব। বয়েস হয়েছে—ষাটের কাছাকাছি।

মাথার সামনের দিকটায় টাক—রগের দুপাশের চুলে পাক ধরেছে।

আওয়ামি লীগের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক—বঙ্গবন্ধুর কথা তাঁর কাছে যেন কোরানের বয়াৎ।

পরনে লুঙ্গি—গায়ে একটা নেটের গেঞ্জি।

চোখে দামী সোনার ফ্রেমের চশমা।

কাঁচা পাকা নূর দাড়ি।

আলি সাহেব জানেন, রেজাক তাঁর ছেলে শামসুলের বন্ধু।

রেজাক বলে, সেলামালেকুম চাচা সাহেব—

আলেকুম সেলাম।

॥ ৮ ॥

আলী সাহেব রেজাকের দিক থেকে ফিরে ছেলের দিকে তাকালেন, শামসুল—

আব্বাজান—

পাশের ঘর থেকে, আলী সাহেব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, তোমাদের সব কথাই কানে এসেছে। দেখছি যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুতও হয়েছো।

কথাগুলো বলতে বলতে যেন একটু থামলেন—মনে হলো তাঁর গলাটা যেন ধরে আসছে- যাবে বৈকি নিশ্চয়ই যাবে তুমি—তুমি আমার একমাত্র বেটা হলেও তোমাকে আমি বাধা দেবো না। কুখ্যাত ইয়াহিয়ার পাঠান সৈন্যদের মুকাবিলা আজ তোমাদেরই ত—যত বাংলা দেশের তাজা তরুণ আছে তাদেরই ত করতে হবে। তোমার মা কিছুই জানে না- -

মা—শামসুল কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল তার আব্বাজানের মুখের দিকে চেয়ে।

কাল সারাটা রাত বেচারী আতঙ্কে ঘুমাতে পারেনি। তাই তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি—ঘুমোক। জেগে থাকলে সেও হয়ত তোমাকে আজ দোয়া জানাত—অনেক—অনেক টোটা নিও সঙ্গে—শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত—সংবিৎ না হারানো পর্যন্ত ঐ দস্যুদের দুশমনির মুকাবিলা করবে—

আশ্চর্য হয়ে শুনছিল আলী সাহেবের কথাগুলো রেজাক।

শামসুল হীরের টুকরো ছেলে—যেমন দেখতে, তেমনি লেখাপড়া খেলাধূলায় একেবারে চৌকস - সেই একমাত্র ছেলেকে মরণযুদ্ধে যাবার জন্য আলী সাহেব উৎসাহ দিচ্ছেন।

রণাঙ্গনে পাঠাচ্ছেন—যেখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু ওৎ পেতে আছে।

হয়ত আর সে ফিরেই আসবে না।

জমানাটা এত দ্রুত বদলে গেল কি করে?

বঙ্গবন্ধু কি জাদু জানেন—না কোন মন্ত্র পড়ে আজকের জমানাটাকে একেবারে নতুন করে গড়ে দিয়েছেন।

আমি তাহলে চলি বাপজান।

এসো বেটা—।

রেজাক ততক্ষণে কাপড়ে জড়ানো দোনলা বন্দুকটা খুলে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

রেজাক ভাই—শামসুল বলে।

আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।

কিন্তু—

কেন, আমি কি বাংলদেশের ছেলে নই—বাংলাদেশ কি আমার নয়—চল চল—আর দেরি নয়—

হ্যাঁ—চল—তোমাদের পিছনের বাগানের দরজা দিয়ে বের করে দিয়ে আসি—আলি সাহেব বললেন।

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে তিনজনে নীচে নেমে এলো—পিছনে পিছনে এলেন আলী সাহেব।

ক্ষণে ক্ষণে আকাশ বাতাস যেন কেঁপে উঠছে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে। উত্তর ও পশ্চিমের আকাশ লালে লাল।

গতকাল মধ্যরাত্রি থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে—এখনো চলেছে যুদ্ধ—সারা শহরে কার্ফু।

দরজা খুলে দিলেন নিজেই আলী সাহেব—

একে একে ওরা দরজা পথে বের হয়ে গেল—দেখতে দেখতে তিনটি ছায়ামূর্তি যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রেবেকাও ওদের পিছনে পিছনে এসেছিল।

শূন্য অন্ধকার গলিপথটার দিকে কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আলী সাহেব প্রস্তরমূর্তির মত।

রেবেকা ডাকল মৃদু কণ্ঠে, আব্বাজান—

হ্যাঁ—চল বেটি—

ভাইজানকে তুমি কেন যেতে দিলে আব্বাজান? রেবেকার গলায় কান্নার সুর।

বাড়ির মধ্যে ধরে রাখলেই কি ওকে বাঁচাতে পারতাম বেটি। শুনিসনি কি আজ দুপুরে রেডিওতে কি বলেছে—লড়াই চলেছে সর্বত্র কাল থেকে—এই ঢাকা শহরে, সিলেটে, কুমিল্লায়, চট্টগ্রামে—গ্রামে গঞ্জে বন্দরে শহরে সর্বত্র চলেছে ইয়াহিয়ার পাঞ্জাবী হানাদারদের সঙ্গে আমাদের লড়াই। আজ—আজ কি ঘরে বসে থাকার সময়- না না—মরতে হয় ত দশজন হানাদারকে ও শেষ করে মরুক।

রেবেকা চুপ করে থাকে—কোন জবাব দেয় না।

কারণ সে ত শুনেছে বঙ্গবন্ধুর কথা, আমরা কুকুর বিড়ালের মত মরব না, বাংলা মায়ের যোগ্য সন্তান হিসাবে শত্রুর মোকাবিলা করব। আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী স্বাধীন।

আব্বাজান—

বেটি—

মুজিব সাহেবকে নাকি ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছে—

আমি ত শুনেছি মুজিব ভাই নিজে ধরা দিয়েছেন—ধরে নিয়ে যায়নি। বদিরুদ্দিন দুপুরে এসেছিল, তাই বলে গেল।

সত্যি—তোমার বিশ্বাস হয় কথাটা?

জানি না বেটি সত্য কি মিথ্যে। তবে তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেও বাংলাদেশের লাখো লাখো মানুষের বুকে যে স্বাধীনতার আগুন তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সে আগুন ওরা নেভাবে কেমন করে? নিভবে না বেটি, নিভবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত সে আগুন আমাদের সকলের বুকে জ্বলবে।

শেষের দিকে প্রৌঢ় আলী সাহেবের কণ্ঠস্বরটা যেন অদ্ভুত এক আবেগে কাঁপতে থাকে।

চল আব্বাজান—ঘরে চল—

কাঁপছিলেন আলী সাহেব—

রেবেকা তার আব্বাজানের হাতটা ধরে অন্ধকারে অন্দরের দিকে এগিয়ে চললো।

বাইরে তখনো সমানে গোলাগুলির শব্দ।

ঢাকা শহরের আকাশটা ঘোর রক্তবর্ণ।

দোতলার রাস্তার দিকের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আলী সাহেব।

দুটো পাল্লা ঈষৎ ফাঁক করা—একেবারে বন্ধ নয়।

মধ্যে মধ্যে ফিফটিন হানড্রেড ওয়েট ও থ্রিটনার মিলিটারী ট্রাকের ভারী চাকার ঘর্ঘর শব্দ ভেসে আসে নীচের রাস্তা থেকে।

শামসুলের মা হঠাৎ ঘুমের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠলেন, শামসুল—

বাইরে মেসিনগানের ট্যারারা-টট্-টট্ শব্দ—

কামানের গোলা ফাটার একটা প্রচণ্ড শব্দ মেসিনগানের শব্দকে যেন ছাপিয়ে গেল।

বাড়ির জানালাগুলো থরথর করে কেঁপে উঠলো সেই প্রচণ্ড শব্দে।

ছুটে এলেন স্ত্রীর শয্যার পাশে আলী সাহেব, কি—কি হলো নুরুন্নেশা—

শামসুল—শামসুলকে ডাক। সে কোথায়?

কেন—তাকে দিয়ে কি হবে—

শুনচো না বাইরে কি গোলাগুলি চলছে—আমি যাই—

বেগমসাহেবের কথা শেষ হলো না—হঠাৎ পর পর কয়েকটা গুলি এসে ওদের দোতলার বন্ধ জানালার কাঁচটার উপর যেন আছড়ে পড়ল।

রেবেকা ছুটে আসে ঘরের মধ্যে।

চেঁচিয়ে ওঠে, বাতি নিবিয়ে দিন আব্বাজান—বাতি নিবিয়ে দিন—সৈন্যরা সব বাড়ি বাড়ি লক্ষ্য করে মেসিনগানের গুলি চালাচ্ছে—

গতকাল থেকে ইলেকট্রিক বাতি কেউ জ্বালায়নি—এক একটা করে ঘরে ঘরে মোমবাতি জ্বালান হয়েছিল রাত্রে—রেবেকাই ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল।

মুহূর্তে ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেল।

জানালা ও বাড়ির গায়ে তখন বৃষ্টির ছাটের মত গুলি এসে পড়ছে বাইরে থেকে।

অবিশ্রাম যেন সজোরে বৃষ্টির ছাটের মত মেসিনগানের গুলি বাড়িটাকে বুঝি একেবারে ঝাঁজরা করে দেবে।

প্রথমটায় আলী সাহেব বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন—হঠাৎ রেবেকার চিৎকারে যেন পুনরায় তাঁর সংবিৎ ফিরে এলো, আব্বাজান—চলো—চলো, শীগগিরী আমরা নীচে যাই—

রেবেকার কথাটা শেষ হলো না, একটা প্রচণ্ড শব্দে এবারে গোলা এসে পড়লো পাশের জানালাটার উপর—

কাঠের জানলার কপাট ও ভিতরে কাঁচের সার্সী ঝনঝন শব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেন একটা আগুনের গোলা এসে ঘরটার মধ্যে আছড়ে পড়ল।

থরথর করে বাড়িটা কেঁপে উঠলো।

তবু আলী সাহেব শেষ চেষ্টা করলেন ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য—

এক হাতে রেবেকার একটা হাত অন্য হাতে থরথর কম্পিত স্ত্রীর একটা হাত ধরে—কিন্তু পারলেন না—নুরুন্নেশার পৃষ্ঠদেশে একটা মেসিনগানের গুলি বোধ হয় তাঁকে বিদ্ধ করলো।

একটা দীর্ণ চিৎকার করে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন নুরুন্নেশা।

পর পর আরো দুটো গোলা এসে ঘরের মধ্যে ঐ মুহূর্তে পড়লো। ঘরের আসবাবপত্র দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো।

নুরুন্নেশা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন—ঘরের সেই প্রজ্বলন্ত আলোয় দেখতে পেলেন আলী সাহেব।

খুনে তাঁর পরিধেয় বসনটা লাল হয়ে গিয়েছে।

তখনো আলী সাহেব বুঝতে পারেননি তাঁর স্ত্রীর প্রাণ আর নেই—সে মৃতা।

সেই রক্তাপ্লুত অসাড় দেহটা অবলীলাক্রমে বুকের উপর তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

রেবেকা পিছনে পিছনে গেল।

নীচের তলায় সদর দরজাটার উপর তখন বাইরে থেকে প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে মুহূর্মুহূ।

সিঁড়ি দিয়ে আর নীচে নামা হলো না।

নীচের সদর দরজাটা ভেঙে ফেলেছে ততক্ষণে একদল ক্ষিপ্ত হায়নার মত রক্তলোভী পাঞ্জাবী খান সেনা।

সামনে যাকে পাচ্ছে গুলি করে হত্যা করছে।

মুহূর্মুহূ গুলির শব্দ আর মানুষের অন্তিম মুহূর্তের আর্তচিৎকার।

নীচের চাকরবাকরদের বোধ হয় ওরা হত্যা করছে এক নিষ্ঠুর পৈশাচিক লালসায়।

ওরা আবার ঘুরে এসে দুখানা ঘরের পরে শামসুলের ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়লো।

রেবেকা দরজায় খিল তুলে দিল।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার—দৃষ্টি বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে।

ভারী এ্যমুনেশন বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেক জোড়া একসঙ্গে উঠে আসছে—যেন এক জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের মত উপরের দিকে সিঁড়ি বেয়ে।

মাটিতে শুইয়ে দিয়েছেন আলী সাহেব নুরুন্নেশার দেহটা। অন্ধকারে আদরিণী কন্যাকে বুকের উপর জাপটে ধরেছেন।

হায় আল্লা—হায় খোদা—দয়া করো মেহেরবান, বুকের মধ্যে ঐ কথাগুলোই উচ্চারিত হতে লাগলো নিরুপায় হাতাশায় বার বার।

আর একটা বন্দুকও নেই যার দ্বারা তিনি অন্তত কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারেন।

একটি মাত্র বন্দুক, যা একটু আগে নিয়ে বাইরে চলে গেছে তার ছেলে শামসুল।

মাটিতে পায়ের সামনে শায়িত স্ত্রীর প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা।

বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরা রেবেকা—একমাত্র তরুণী কন্যা তাঁর। চারিদিক থেকে কেবল অবিশ্রাম গোলাগুলির আওয়াজ।

॥ ৯ ॥

অন্ধকারের শেষ হলো—

মড় মড় শব্দে দরজাটা ভেঙে পড়লো আলী সাহেবের চোখের সামনে—এক ঝলক টর্চের তীব্র আলো ওদের উপরে এসে পড়লো।

হা হা করে গোটা দশেক পাঠান সৈন্য পৈশাচিক উল্লাসে হেসে উঠলো।

সামনেই দাঁড়িয়ে একজন অফিসার সঙ্গের সৈন্যদের নির্দেশ দিল উর্দুতে সুইচটা খুঁজে ঘরের বিজলী বাতিটা জ্বালাতে।

দরজার পাশেই ছিল বিজলী বাতির সুইচ—খুট করে একটা শব্দ তারপরই ঘরটা বিজলী বাতির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো।

পাশের ঘরে তখন একদল পাঠান সৈন্য সিন্দুক বাক্স পেঁটরা ভেঙে লুঠ করছে সব।

আট দশজন পাঠান সৈন্য।

সামনে একজন অফিসার।

এক মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে উর্দুতে কি যেন নির্দেশ দিল অফিসার কয়জন সৈনিককে, ওরা এসে যেন একদল নেকড়ের মতই ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ছিনিয়ে নিল রেবেকাকে আলী সাহেবের বুক থেকে।

চিৎকার করে উঠলেন আলী সাহেব পাগলের মতই—না না—ওকে নিও না—আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে যাও তোমরা ওকে নিয়ো না। দোয়া কর—।

রেবেকার দীর্ণ চিৎকার শোনা যায় ঘরের বাইরে থেকে—আব্বাজান—আব্বাজান—

আলী সাহেব ঘর থেকে ছুটে বেরুবার চেষ্টা করলেন পাগলের মত, কিন্তু তার আগেই একটা গুলি এসে ওঁর তলপেট বিদ্ধ করলো।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন আলী সাহেব।

জ্ঞান হারালেন সঙ্গে সঙ্গে।

রেবেকাকে ও সেই সঙ্গে আলী সাহেবের ঘরের সিন্দুক ভেঙে বহু নগদ টাকা গহনা প্রভৃতি নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সারা ভারত ও সেই সঙ্গে সারা বিশ্ববাসী ভারতের রেডিও মারফত জানতে পারল পূর্ববঙ্গে পৈশাচিক জঙ্গী দাপটের কথা।

আর সেই সঙ্গে জানতে পারল পূর্ব প্রান্তে জন্ম নিয়েছে এক নতুন রাষ্ট্র যার নাম বাংলাদেশ।

ঘরে ঘরে উড়ছে সেখানে এক নতুন নিশান।

তার আগের রাত্রে চোরের মত পালিয়ে গিয়ে ঢাকা থেকে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের রাত্রে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেছে : বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী।

সে বলেছে : শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাকে অপমান করেছেন। শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর অনুগামীরা রাষ্ট্রদ্রোহী—পাকিস্তানের শত্রু। তাঁরা পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলতে চান।

ক্ষমার অযোগ্য তাঁদের অপরাধ—অতএব তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে।

দেশের সর্বত্র সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ এক ফরমানের দ্বারা নিষিদ্ধ কর হলো ঐ সঙ্গে।

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামি লীগের উপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হলো।

পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া মাত্র সে জনগণের হাতে কার্যকরী ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নতুন করে ব্যবস্থা নেবে।

আরো সংবাদ—বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইয়াহিয়ার পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনী রাত্রের অন্ধকারে নৃশংস ভাবে গোলাগুলি চালিয়ে ঢাকা শহরে হাজারো হাজারো নিরস্ত্র জনগণকে—বৃদ্ধ-যুবা-শিশু-নারীদের নির্বিচারে হত্যা করেছে—গৃহ ভস্মীভূত ও লুণ্ঠন করেছে—নারীদের ধর্ষণ করেছে।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সৈন্যবাহিনী ও পুলিসদের সঙ্গে পাঞ্জাবী সৈন্যদের লড়াই চলেছে।

তারাও বিশ্বাসঘাতক—পাকিস্তানের শত্রু—তাদেরও নিশ্চিহ্ন করে দিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ খান বাহিনী।

পুলিসের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ ও নবগঠিত বাঙালী রেজিমেণ্ট যোগ দিয়েছে—তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খান বাহিনীকে প্রতিরোধ করছে।

উভয় পক্ষের খবরে প্রকাশ হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে।

সমস্ত সংবাদের আদান-প্রদান বন্ধ।

নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতারকেন্দ্র।

ঢাকায় হাতাহাতি যুদ্ধ চলেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সংবাদে প্রকাশ উত্তরে রংপুর আর সৈদপুর—দক্ষিণে খুলনা আর যশোহর—পূর্বে কুমিল্লা সব মুক্ত— সব আজাদ বাহিনীর করায়ত্ত।

ইয়াহিয়াশাহী জলে নৌবহর টেনে এনেছে।

গোলা পড়ছে চট্টগ্রামে।

বাহুবল বনাম মনোবলের বিচিত্র এক যুদ্ধ।

এক দিকে সুশিক্ষিত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত খান বাহিনী—সঙ্গে দুনিয়ার সব সেরা দেশের অতি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র—মারণ যন্ত্র—রাশিয়ার টাইগার ট্যাংক, মারকিন স্যাবারজেট্ বিমান, পিকিংয়ের দেওয়া হালকা হাতিয়ার।

অন্য দিকে শুধু প্রতিজ্ঞা—বাঁচার প্রতিজ্ঞা।

সদ্যোজাত বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করবার জন্য ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চট্টগ্রাম কুমিল্লা থেকে, উত্তরে রংপুর থেকে মুক্তিফৌজ ঢাকার দিকে এগুচ্ছে।

নতুন নতুন ব্রিগেডের সব নামকরণ মুক্তিফৌজদের—সূর্য সেন ব্রিগেড, বাঘা যতীন ব্রিগেড।

বাংলাদেশ আজ রক্তস্নান করছে চিরমুক্তির জন্য।

শহীদস্তম্ভ ধূলিশায়ী—

ইউনিভারসিটি—ইকবাল হল ক্ষতবিক্ষত।

বহু নামজাদা দেশবিশ্রুত জ্ঞানীগুণী অধ্যাপক বর্বরদের হাতে চরম নিষ্ঠুর ভাবে নিহত।

ভয়াবহ রক্ততাণ্ডব চারিদিকে।

শ্যামসুলদের দল, দলপতি ক্যাপটেন রফিকের নির্দেশে ঢাকার নারায়ণগঞ্জ এলাকায় পরের দিন সকালে পিছিয়ে আসে—অনেকক্ষণ ধরে ঢাকার নবাবপুর রোড ও জনসন রোডের পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাতহাতি লড়াই করে।

মেরেছে ওরা অনেক খান সৈনিককে—

সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও দলের অনেক নিহত। সিরাজুল, বদিরুদ্দিন, আখতার, জয়নুল সব কলেজের ছাত্র।

রেজাকের বাঁ হাতটা কবজির কাছে সামান্য আহত।

নারায়ণগঞ্জ শেষ পর্যন্ত শামসুল রেজাকরা করায়ত্ত রাখতে পারল না। ওরা চট্টগ্রামের পথে এগিয়ে চলল।

রেজাকের মনে পড়ছে চট্টলার কবি নবীন সেনের সেই কবিতার কয়টি লাইন ঃ

মা, মা, মা, কতদিন পরে
ডাকিলাম ও মা, পরাণ ভরে
শৈলকিরীটিনী, সাগরকুন্তলা
সুরতমালিনী, হেরিলাম তোরে।

এদিকে রেজাকদের কানে নানা গুজব আসছে তাদের প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে।

কেউ বলছে বঙ্গবন্ধু এখন কাগমারীতে এবং অন্যান্য আওয়ামি লীগ নেতারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আত্মগোপন করেছেন।

যুদ্ধ আর যুদ্ধের খবর।

দূর গ্রামে বসেও কাজলদের কানে যুদ্ধের খবর আসে। যদিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন খবর বাইরে যেতে পারছে না—একমাত্র সূত্র পাক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত পাক বেতারকেন্দ্র সগৌরবে বার বার ঘোষণা করছে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে তারা দমন করেছে।

তারা পাক সৈন্যদের হাতে পর্যুদস্ত।

কিন্তু তার পাশে আরো একটি বেতারকেন্দ্র থেকে অন্য খবর ভেসে আসছে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র।

অনেক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর খবর তারা দিচ্ছে।

তারা বলছে, মিথ্যা—সব ভুয়ো—পাক মিলিটারী কর্তাদের সব মিথ্যা ভাষণ। জেনারেল টিক্কা খান ঢাকার নতুন মার্শাল এ্যাডমিনিসট্রেটার—যাকে কয়েকদিন আগেও ঢাকার প্রধান বিচারপতি শপথ দেওয়ার ব্যাপারে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন—সে সদম্ভে ঘোষণা করছে—সব ঠিক হ্যায়।

বিলকুল সব পরিস্থিতি স্বাভাবিক—আর তার ফাঁকে ফাঁকেই মার্শাল এ্যাডমিনিসট্রেটারের নতুন নতুন এলান ঘোষিত হচ্ছে পাক বেতারকেন্দ্র থেকে।

বলা হচ্ছে সর্বত্র কার্ফু—সান্ধ্য আইন চলেছে।

উল্টোপাল্টা সব কথা।

সারা দেশের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মনে।

।। ১০ ।।

আগুন জ্বলছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে।

সৈন্যদের অকথ্য পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী—লুণ্ঠন হত্যা ও নির্বিচারে নারীধর্ষণ চলেছে সর্বত্র।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ছাড়াও ভারত থেকে আকাশবাণী সংবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রত্যহ।

কাজলের বুকটার মধ্যে কাঁপে।

কি হলো রেজাকের কে জানে।

কাজলের বাবা হরিপদ চক্রবর্তী গ্রামের একজন বর্ধিষ্ণু হিন্দু গৃহস্থ। বাজারে তাঁর তখনো মস্ত বড় দোকান। বিরাট মুনাফা হয় সেখান থেকে।

সাতচল্লিশ সনে ও তারপর কয়েক বছর ধরে দেশ বিভাগের ফলে শতকরা আশিজনেরও অধিক ওই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে ভারতে।

চক্রবর্তী মশাই কিন্তু যান নি।

তিন ছেলে ও ঐ এক মেয়ে কাজল।

ছেলেরা তিনজনেই ভারতে—তারা অনেক আগেই চলে গিয়েছে।

বাপকে তারা অনেক বলেছে, অনেক বুঝিয়েছে চলে যাবার জন্য সব বিক্রি করে দিয়ে ভারতে কিন্তু ছেলেদের কোন কথা—কোন যুক্তিতেই কান দেননি চক্রবর্তী মশাই।

বলেছেন, না—আমি যাতি পারব না। তোমরা যাতি হয় যাও—

বড় ছেলে অমিয় বলেছিল, বুঝতে পারছেন না বাবা—এ দেশ আর হিন্দুর পক্ষে নিরাপদ নয়—

চক্রবর্তী মশাই গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে তামাক সেবন করেছিলেন—সর্বকনিষ্ঠা সন্তান কাজল তখনো জন্মায় নি।

তিনটি ছেলে তাঁর—অমিয়, নিমাই আর কুমুদ—

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তোমরা যাও—তোমাদের সমস্ত জীবন সামনে রয়েছে পড়ে—আর আমার জীবন ত অর্ধেক কেটেই গিয়েছে—বাকী কটা দিন জীবনের এই পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে কোথায়ও যাবার আর আমার ইচ্ছা নেই—

কিন্তু বাবা—আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না—

হয়ত বুঝতে পারচি না অমিয় তবে এটা বুঝতে পারচি—এখানকার এতদিনকার গড়ে তোলা সব কিছু ভেঙে দিয়ে অন্য এক জায়গায় গিয়ে নতুন করে আবার সব কিছু গড়ে তোলবার মত বয়েস আর আমার নেই।

আপনার না থাকলেও আমরা ত আছি—

তোমরা আছো ঠিকই—কিন্তু কারো গলগ্রহ হতে আমি চাই না—

এ আপনি কি বলছেন বাবা। আপনি কেন আমাদের গলগ্রহ হবেন—আপনি আমাদের মাথার উপর থাকবেন।

তোমাদের দুই ভাইকে মানুষ করে দিয়েছি—আর এক ভাইকে মানুষ করে দিতে পারলেই আমার ছুটি—তোমাদের সংসারে আর আমাকে টেনো না।

তারপরই অন্য কথা পেড়েছিলেন চক্রবর্তী মশাই, কবে কলকাতায় যাবে?

পরশু।

পার ত ওখানে একটা জমি কিনে বাড়ি করে নিও—টাকা কড়ির প্রয়োজন হলে আমাকে লিখলেই আমি পাঠাবো।

অমিয় বুঝতে পেরেছিল দেশ ভিটা ত্যাগ করে কলকাতায় যেতে তার বাবাকে কিছুতেই সম্মত করান যাবে না।

চিরকালই তিনি একগুঁয়ে এবং অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির।

অত্যন্ত প্রখর তাঁর আত্ম-সম্মানবোধ—মনে মনে তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা—নচেৎ বিত্তশালী বাপের একমাত্র পুত্র হয়ে এবং এম, এ, পাস করা সত্ত্বেও বাপের ব্যবসাতেই মন দিতেন না।

চক্রবর্তী মশাইয়ের বাপও হয়ত মনে মনে তাই চেয়েছিলেন—তাই খুশীই হয়েছিলেন তাঁর ছেলে শহরে না গিয়ে গ্রামেই তাঁর ব্যবসাটা আঁকড়ে পড়ে থাকতে দেখে।

অমিয় মাকে গিয়ে ধরেছিল শেষ পর্যন্ত।

ক্যত্যায়নী দেবীর মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়েছিল কিন্তু স্বামীর মনোভাব জেনেই চুপ করে ছিলেন।

ছেলের পীড়াপীড়িতে বললেন, দেখি একবার ওকে বলে—

রাত্রে কথাটা তুললেন স্বামীর কাছে কাত্যায়নী।

কয়েকটা মুহূর্তে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চক্রবর্তী মশাই বলেছিলেন, তুমিও ঐ কথা বলচো বড় বৌ?

অমিয় ত মিথ্যা বলচে না—হিন্দু পাড়ার সবাই ত একে একে চলে গেল—আমরা দুচার ঘর ছাড়া—

যাক। সবাই চলে যাক—তুমি ইচ্ছা করলে তুমিও তোমার ছেলেদের সঙ্গে চলে যেতে পার কিন্তু আমি যাবো না।

তারপরই একটু থেমে বলেছিলেন, মৃত্যুর বাড়া ত গাল নেই। আর মৃত্যু ত একদিন সকলেরই হবে—তখন এই খানেই না হয় মরলাম। এই মধুমতীর তীরেই দেহটা আমার ভস্মীভূত হবে। চিরকাল—সেই জন্ম থেকে যে মধুমতী নদীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ করেছি শেষ তৃষ্ণাও আমার সেই জলেই নিবারিত হবে।

কাত্যায়নী যেন নির্বাক বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

শহর অঞ্চলের মেয়ে তিনি—শহরেই জীবনের সতেরটা বছর কেটেছিল—সতের বছর বয়েস কিই-বা এমন বয়েস।

সেই সতের বছর বয়েসেই এই গাঁয়ে চক্রবর্তী বাড়ির বধূ হয়ে একমাথা ঘোমটা টেনে এই গাঁয়ের মাটিতে এসে পা দিয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে খুলনা—সেখান থেকে স্টীমারে টোনা হয়ে নৌকাতে করে শ্বশুরের ভিটাতে এসে পা ফেলেছিলেন।

অগ্রহায়ণের শেষ তখন।

ধান কাটা তখনো শুরু হয় নি। বিলের জলও শুকোয়নি একেবারে, সবে জলে টান ধরেছে।

পাকা সোনার মত ধান গুচ্ছে গুচ্ছে বাতাসে হেলছে দুলছে। যে দিকে চোখ পড়ে, আদিগন্ত ধানের ক্ষেত।

পাকা ধানের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী সেই ধানক্ষেতের উপরে উড়ে উড়ে এসে বসছে।

খাল বিলের জলে টান ধরেছে—

বিলের ঘাট থেকে তাই কাঁচা মাটির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্বামীর পিছনে পিছনে এসেছিলেন।

প্রথম প্রথম শহরের মেয়ে তাঁর কান্না পেত।

শ্বশুরের ভিটায় বিরাট পাকা বাড়ি।

এককালে, নাকি খড়ের চালা ও টিনের চালা সব ছিল। পরে শ্যামাপদ চক্রবর্তী হরিপদ চক্রবর্তীর বাবার প্রথম জীবনেই কাঁচা বাড়ি পাকা দালান কোঠা হয়।

গাঁয়ে প্রথম দালান কোঠা, তাই গাঁয়ের লোক বলতো দালান বাড়ি।

দোতলার উপরে চিলেকোঠার জানালা থেকে দৃষ্টি মেলে ধরলে দেখা যেত—ঐ ঘন গাব বেতঝোপ ও আম-কাঁঠালের বন পার হয়ে দূরে গেরুয়া রংয়ের একটি চাদর বিছান যেন—

স্বামী বলেছিলেন, ঐ আমাদের মধুমতী—একদিন তোমাকে নিয়ে যাবো—কি মিষ্টি জল ঐ মধুমতীর—

সেই প্রথম যৌবনের স্বপ্ন যেন নেমে এসেছিল কাত্যায়নীর চোখের উপরে।

স্বামী যে তাঁর এই দেশ আর ঐ মধুমতী নদীকে কত ভালবাসেন তা কি তিনি জানেন না!

স্বামী তখন বলচেন, ঐ মধুমতী নদী—ঐ চারিদিকে সবুজ গাছপালা—কত অজস্র ফুল—আপনি ফোটে আপনি ঝরে—চাঁপা—গন্ধরাজ—বেল—জুঁই—অপরাজিতা—সন্ধ্যামালতী—ঘেঁটু—মুচকুন্দ—স্থলপদ্ম—শাপলা—কুমুদ—কলমী—

মাথার উপরে ঐ অনন্ত উদার নীল আকাশ—ঐ কাঁচা মাটির পথ—ঠাণ্ডা নরম—পা ফেলতেও যে মাটিতে ভাল লাগে।

বৈশাখে আমের মুকুল—জ্যৈষ্ঠে নাজনা ফুল—বকফুল—গাব ফুল—না, না—এসব ছেড়ে আমি কোথায়ও যেতে পারব না।

প্রথম যৌবনে যজমানী করে একটা ছোট্ট মনিহারী দোকান করে বাবা একদিন তারই টাকায় পৈতৃক ভিটার উপরে আমাদের এই বিরাট বাড়ি তৈরি করেছিলেন—পুরুষ পুরুষানুক্রমে আমরা এখানে বসবাস করব বলেই ত—ওরা তোমার ছেলেরা না হয় না বুঝলো তুমিও কি বুঝবে না বড় বৌ—

কাত্যায়নী দেবীর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বলেছিলেন, আর বলবো না কখনো তোমাকে এ দেশ ছেড়ে যেতে—তুমি আমায় ক্ষমা করো।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চক্রবর্তী বলেছিলেন, ওদের আমি আটকাবো না। ওরা শহরে মানুষ—এ গাঁয়ের সঙ্গে ওদের কতটুকু বা সম্পর্ক। ওরা যেখানে যেতে চায় যাক। সুখে থাক—এ দেশ ছেড়ে গেলে আমি বাঁচবো না।

॥ ১১ ॥

যান নি চক্রবর্তী—দেশ ভিটা ছেড়ে যান নি।

দেশের ভিটাতেই থেকে গিয়েছিলেন।

ছেলেরা সব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর খুবই একা একা লাগত।

অতবড় বাড়িটা যেন মনে হতো একটা শূন্য দৈত্যপুরী।

তারপর একদিন কাজল জন্মালো।

কাজলের কান্না প্রথম সাড়া জাগালো শূন্য বাড়িটার মধ্যে।

ক্রমে সে হাঁটতে শিখলো—দৌড়তে শিখলো—বাড়িটা যেন আবার ভরে উঠলো।

তারপরে কম ঝড়-ঝাপটা আসেনি মাথার উপরে চক্রবর্তীর।

মুসলমানের রাজত্বে বাস করা ভিন জাতের হয়ে ভিন্ন ধর্মের হয়ে অন্য এক রাষ্ট্রের সকলের মন যুগিয়ে বাঁচার চেষ্টা যে কি অপমানের চেষ্টা—চক্রবর্তীকে তা মধ্যে মধ্যে নির্মমভাবেই বুঝতে হয়েছে।

তবু—তবু তিনি মত বদলাননি।

দেশের ভিটে কামড়েই পড়ে থেকেছেন। .

তারপর ক্রমশঃ দীর্ঘ ষোল বছরের এক ইতিহাস।

কাজল ইতিমধ্যে ষোড়শী হয়েছে। তার শ্যামল চিকন দেহে যৌবনের তুলির টানে টানে সে চক্রবর্তীর চোখের সামনেই অপরূপা হয়ে উঠেছে।

স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে—মেয়ের আরো পড়বার ইচ্ছা—কলেজে পড়বে।

চক্রবর্তী মনে মনে স্থির করেছেন। ফরিদপুর কলেজে মেয়েকে পড়তে পাঠাবেন।

যদিও ছেলেরা লিখেছিল, কাজলকে এবারে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন—চক্রবর্তী রাজী হননি। কাজলও রাজী হয়নি।

সেও দেশকে ভালবেসে ফেলেছে যেন কখন সমস্ত মন দিয়ে। অবিশ্যি চক্রবর্তী সেটা জানতে পারেননি—জানতে পারেননি আরো একটা কথা।

কাজল আর রেজাকের সৌহার্দ্যের—প্রীতির—ভালবাসার গোপন কাহিনী।

খান চারেক বাড়ির পরেই মুয়াজ্জাম চৌধুরীর বাড়ি। তাঁরই একমাত্র ছেলে রেজাক চৌধুরী।

রেজাক কাজলের চাইতে বছর তিনেকের বড়।

মুয়াজ্জাম চৌধুরী—কলকাতা শহরে তাঁর একটা ছোট্টখাটো ব্যবসা ছিল এবং ছোটোখাটো একটা বাড়িও ছিল পার্ক সার্কাস এলাকায়।

দেশ বিভাগের বছর দুই পরই ভারতের এক হিন্দু অবস্থাপন্ন গৃহীর সঙ্গে সম্পত্তি ও বাড়িঘরের বদলাবদলি করে ঐ গাঁয়ে এসে বসবাস শুরু করলেন।

এখানে এসে গঞ্জের হাটে চালের ব্যবসা শুরু করেন। দেখতে দেখতে তাঁর সেই ব্যবসা ফেঁপে ফুলে উঠলো।

আজ তিনি ঐ তল্লাটের একজন সম্পন্ন—রীতিমত ধনী গৃহস্থ।

সঙ্গে এসেছিল তাঁর স্ত্রী জাহানারা ও একমাত্র শিশুপুত্র রেজাক।

লোকটি শান্ত চরিত্রের ও ধীর স্থির উদার প্রকৃতির। সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব—কারো সঙ্গেই বড় একটা ঝগড়াঝাটি নেই। শিক্ষিতও—বি. এ. পাস।

চক্রবর্তীর সঙ্গে চৌধুরীর রীতিমত একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সেই সম্পর্কের দরুণই কাজল যেত রেজাকদের বাড়ি ও রেজাকও যেত কাজলদের বাড়ি।

দুজনে একসঙ্গে মেলামেশা—খেলাধূলা করত।

বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্কটা ভালবাসায় রূপান্তরিত যে হয়েছে সেটা দুবাড়ির কর্তারা কেউই জানতে পারেননি।

তাঁদের যেন সেদিকে কোন নজরই ছিল না।

রেজাক গ্রামের স্কুল থেকে পাস করে শহরের কলেজে পড়তে গেল। মধ্যে মধ্যে ছুটিছাটায় আসতো, দেখা হতো—নয়তো নিয়মিত দুজনার মধ্যে পত্রের দেওয়া নেওয়াও হতো।

ব্যাপারটা প্রথম সন্দেহ জাগায় কাত্যায়নী দেবীর মনে।

মেয়ের ভাবগতিক দেখে মায়ের মনে বুঝি কেমন একটা সন্দেহ জাগে।

এক গ্রীষ্মের ছুটিতে রেজাক বাড়িতে এসেছে—রেজাক বলে দিয়েছিল আগের দিন দুপুরে নদীর ধারে যেতে—সঙ্গে কাসুন্দি দিয়ে ঝলসানো বেত ফল নিয়ে।

বাড়ির পিছনের ছোট পুকুরটার ধারে অনেক বেত গাছ। বাড়ির নমঃশূদ্র ভৃত্য কালার সাহায্যে বেত ফল সংগ্রহ করে একটা এলুমিনিয়ামের বাটিতে কাসুন্দি দিয়ে সেই বেতফল জারিয়ে আঁচলের নীচে বাটিটা লুকিয়ে—মা ঘুমবার পর কাজল বেরুতে যাবে পিছন থেকে ডাক এলো, এই ভর দুপুরে কোথায় বেরুচ্ছিস?

কাজল উঠানে পা ফেলেছিল থমকে দাঁড়াল।

মা শয্যা থেকে উঠে ইতিমধ্যে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন।

কাজল চুপ।

বলি যাচ্ছিস কোথায় এই ভর দুপুরে?

মিথ্যা কাজল জীবনে কখনো বলেনি।

মিথ্যাকে সে ঘৃণা করে অন্তর দিয়ে—তবু কেন যেন সত্য কথাটা মার সামনে দাঁড়িয়ে আজ প্রকাশ করতে পারে না।

কিরে জবাব দিচ্ছিস না কেন? যাচ্ছিস কোথায়? আঁচলের তলায় কি নিয়েছিস?

কাসুন্দিমাখা বেত ফল—কাজল বলে।

তা যাওয়া হচ্ছিল কোথায়?

নদীর ধারে—

এই চাঁদিফাটা রোদ্দুরে গাঙের ধারে?

রেজাক যেতে বলেছে—

ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কাত্যায়নী দেবী মেয়ের মুখের দিকে।

কিছুদিন থেকেই যে সন্দেহটা তাঁর মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল কাজল আর রেজাককে ঘিরে সেটা যে মিথ্যা নয় সেটাই যেন সহসা কেমন তাঁর সামনে প্রকট হয়ে ওঠে।

কিন্তু মনের ভাব তিনি মেয়ের কাছে প্রকাশ করলেন না—কারণ তিনি জানতেন যদিও এমনিতে অত্যন্ত ধীর শান্ত কাজলের স্বভাব তথাপি তার চরিত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা সুদৃঢ় আত্মসচেতনতা আছে। এবং নিজে যেটা ভাল বুঝবে তা থেকে তাকে একচুল সড়ানোও কারো পক্ষে সম্ভব নয়—সেখানে সে নিষ্ঠুর অনমনীয়।

তাই অন্য পথে গেলেন কাত্যায়নী।

রেজাক সম্পর্কে কোন কথা না বলে কেবল বললেন, না। এই দুপুরে কোথায়ও যেতে হবে না বাড়ি থেকে। ঘরে যাও।

কেন?

মেয়ে প্রশ্নটা করে সোজাসুজি মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

তা দিয়ে দরকার কি? বলচি যেতে হবে না। যাবে না—

না। তোমাকে বলতে হবে—কেন যেতে পারবো না। রেজাকের কাছে যাচ্ছি বলে?

আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রশ্নটা একেবারে মুখোমুখি—

কাত্যায়নী দেবীরও ধৈর্য্য যেন কেমন ভেঙ্গে যায়। তিনি রুক্ষস্বরে জবাব দেন, হ্যাঁ তাই—

কেন রেজাক কি করলো?

কি আবার করবে।

তবে?

যা বলচি তাই শোন। ঘরে যাও—

না। রেজাকের কাছে কেন যেতে পারবো না বলতে হবে তোমাকে।

ভুলে যাস না খুকী—তোর বয়েস হয়েছে—বয়েসের মেয়ে তুই—

তাতে কি হয়েছে—

তাতে অনেক কিছু হয়—

রেজাকের সঙ্গে ত সেই ছোটবেলা থেকেই মিশছি—কখনো ত বারণ করনি তার সঙ্গে মিশতে বা তার কাছে যেতে—

তখন তুমি ছোট ছিলে—

ছোটবেলায় মিশতে পারলাম আর আজ বড় হয়েছি বলে মিশতে পারবো না!

খুকী তর্ক করিস নে—যা বলচি শোন। ঘরে যা—

না আমি যাবো—তাকে কথা দিয়েছি আমি—সে আমার জন্য গাঙের ধারে অপেক্ষা করবে—

কাত্যায়নী আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না—এগিয়ে এসে মেয়ের লম্বা খোলা চুলের গোছা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, বারণ করচি তবু যাবি—অসভ্য মেয়ে কোথাকার! আদরে আদরে একেবারে মাথায় উঠেছো না!

॥ ১২ ॥

ঝাঁকুনীর চোটে হাতের কাসুন্দি দিয়ে মাখা বেত ফলের বাটিটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল অসতর্কভাবে ছিটকে।

বেত ফলগুলো পায়ের কাছে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

সেই দিকে তাকিয়ে প্রবল এক ঝটকা দিয়ে মার হাতের মুঠো থেকে চুল ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল কাজল।

কাত্যায়নী দেবী ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে যেন কি ভাবলেন তারপর সোজা উপরে চলে গেলেন স্বামীর ঘরে।

চক্রবর্তী তাঁর শয়নঘরে একটা চৌকির উপর বসে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাভঙ্গের পর গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে তামুক সেবন করছিলেন।

স্ত্রীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। কাত্যায়নীর মুখটা লাল।

থমথম করছে।

মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখো—এখুনি। যত তাড়াতাড়ি পার।

চক্রবর্তী হেসে ফেললেন—

হাসচো যে?

হাসচি—মেয়ের বিয়ের জন্য হঠাৎ ক্ষেপে উঠলে কেন?

সর্বনাশ একটা না ঘটাতে চাও ত যা বলচি তাই করো।

ব্যস্ততা কি—মেয়েটা আরো পড়াশুনা করতে চায়—হবে হবে—

থাম ত—থামিয়ে দিলেন স্বামীকে কাত্যায়নী দেবী একটা ঝংকার দিয়ে যেন, পড়াশুনা করতে চায়—আর পড়াশুনার দরকার নেই যথেষ্ট হয়েছে—

তা হঠাৎ এমন কি হলো যে জন্য—

কি হতে আর বাকি আছে বলতে পারো।

আহা তাইত জিজ্ঞাসা করচি হলোটা কি?

তুমি কি অন্ধ? কিছুই কি দেখতে পাও না—

এমন কিছু ত চোখে পড়েনি যে জন্য হঠাৎ—

ঐ মুসলমান ছেলেটা—

কার কথা বলচো?

কেন চৌধুরী সাহেবের ছেলে রেজাক—

রেজাক আবার কি করলো?

তোমাকে কি করে বোঝাব বল ত! বয়েসের মেয়ে বয়েসের ছেলে—এত মেলামিশা—

সে ত ওরা সেই ছোটবেলা থেকেই মেলামিশা করে আসছে। তাছাড়া রেজাক ছেলেটা সত্যিই ভাল—যেমন ভদ্র তেমনি বিনীত—স্কলারশিপ নিয়ে কলেজে পড়ছে—

তবে আর কি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে মুসলমানের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দাও—

বিয়ের কথা আবার এর মধ্যে আসছে কোথা থেকে—

আসছে বলেই বলচি—গরীবের কথা ত বাসী হলে মিষ্টি লাগে—যখন একদিন ঐ রেজাক ওকে নিয়ে পালাবে তখন বুঝবে—

ছিঃ ছিঃ কি যে বল—রেজাক তেমন ছেলেই নয়।

থাম ত তুমি। যা বোঝ না—ভাল ছেলে—ওদের জাতকে চিনতে আর আমার বাকী নেই—

না, না—রেজাক সে ধরনের মোটেই নয়। হলেই বা মুসলমান।

ভট্টচার্যি ঠাকুরের বয়েসের মেয়ে কল্যাণীকে সেবারে কিভাবে ঘর থেকে মাঝরাত্রে টেনে বের করে নিয়ে গেল ভুলে গিয়েছো।

না বৌ। ভুলিনি—তবু রেজাক—না—ওকে আমি ঐ দলে ফেলতে পারি না। যাক তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না—কাজলকে আমি বুঝিয়ে বলবোখন।

আসল কথা কাত্যায়নী বাইরের জগতের বিশেষ করে নয়া পূর্ব বাংলার কোন খবর না রাখলেও

চক্রবর্তী রাখতেন।

তিনি জানতেন—সংবাদও রাখতেন গাঁয়ের মধ্যে বাস করেই গত চৌদ্দ-পনের বছরে কি দ্রুত অভাবিত একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে বাংলা দেশের জনগণের মধ্যে।

বাংলাদেশের বিশেষ করে তরুণ শিক্ষিত ও ছাত্র মুসলমানদের চরিত্রে ও ভাবনা-চিন্তায়—দৃষ্টিভঙ্গিতে।

ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলায় যখন স্বাধীনতার পর কেবল দলাদলি গদির লড়াই—শক্তির খেয়োখেয়ি চলেছে—দেশের তরুণ সম্প্রদায়টাই যখন এক চরম বিশৃঙ্খলার পথে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে সেই সময় এই পূর্ব বাংলার তরুণ সমাজে ধীরে ধীরে ঘটেছে এক অচিন্তনীয় বিপ্লব।

সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে এসেছে আজ এক নবচেতনার সাড়া।

দেশ বিভাগ হলো।

পাকিস্তান সৃষ্টি হলো।

একথা ঠিক পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে এদেশের সমস্ত মুসলমান জনসাধারণের মনে প্রবল এক অন্ধ ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধ জেগে উঠেছিল।

কিন্তু ঐ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণী মুসলমান জাতির অধিকাংশ এতকাল ধরে হিন্দু ও পশ্চিমী মুসলমানদের কাছ থেকে যে অবহেলা ও অস্বীকৃতি পেয়ে এসেছে—অর্থনীতির যে পীড়ন ভোগ করে এসেছে সেটা যেন ঐ অঞ্চল পাকিস্তানের আওতায় স্বাধীনতা পাওয়ার পর সেই অর্থনীতির পীড়ন ও অবহেলা থেকে মুক্তি পেতে শুরু করে।

একথা ঠিক—মানুষ সামাজিক জীব—কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা তার রক্তেও যেমন নেই তেমনি তার স্বাভাবিক ধর্মও নয়—ওটা এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষীর চক্রান্তের অবশ্যম্ভাবী ফল।

কাজেই দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলার অনুন্নত ও অশিক্ষিত অগণিত মানুষ দেশ বিভাগের পরে সুযোগ সুবিধা লাভ করে ক্রমশঃ পায়ে পায়ে তারা এক নতুন পাওয়ার স্বাদ পেয়েছে।

এবং যার ফলে তাদের মধ্যে যেমন একটা পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করছিল—তেমনি আজকের দিনে একদল তরুণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা অংশ ধীরে ধীরে ক্রমশঃ গত কয়েকটা বছর ধরে বিশেষ করে যেন এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

ধর্মান্ধতার বদলে তারা ক্রমশঃ ফিরে পেয়েছে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোয় নতুন এক মনুষ্যত্ববোধকে।

ক্রমশঃ সেই নবচেতনাই তাদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সামাজিক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছে।

বুঝতে শিখেছে ক্রমশঃ ধর্মসম্পৃক্ত রাজনীতি কেবল অবাস্তব অনাধুনিক ও প্রতিক্রিয়াশীল এবং তার ফলাফল একান্তই বিষময়।

আর সেটা এসেছে ঐ প্রদেশের ঐ অঞ্চলের সবার ভাষা—মাতৃভাষা, বাংলা ভাষার প্রতি সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে।

যার ফলে সারা বাংলা দেশ জুড়ে এক একবার রক্তের বন্যা বহে গিয়েছে।

তবু তারা জাতীয় ভাষা বলে শাসক চক্রান্তে উর্দু ভাষাকে স্বীকার করে নেয়নি।

জোর গলায় বলে উঠেছে, বাংলা ভাষাই আমাদের মাতৃভাষা—আমাদের একমাত্র ভাষা—এর অদলবদল চলবে না এবং ঐ বাংলা ভাষাই শিখিয়েছে আজ ওদের ওরা বাঙ্গালী—মুসলমান নয়—পাকিস্তানী নয়—ওরা বাঙ্গালী—বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী।

রেজাকের সেই পরিচয়টা চক্রবর্তী তার সঙ্গে কথায় বার্তায় পেয়েছেন।

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন—ভেবেছেন—অন্ধ ধর্মচেতনা ও সাম্প্রদায়িকতাকে ওরা কেমন করে জয় করলো।

।। ১৩ ।।

রাত্রে সন্ধ্যা-আহ্নিকের পর মেয়েকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন চক্রবর্তী।

কাত্যায়নী তখন রন্ধনশালায় রন্ধনে ব্যাপৃত।

কাজল এসে বাপের সামনে দাঁড়াল।

ডেকেছিলে বাবা—

আয় মা—এইখানে বোস।

চক্রবর্তী সাগ্রহে মেয়েকে টেনে, হাত ধরে পাশে বসালেন।

বেশী বয়সের সন্তান বলে মেয়েকে বরাবরই অত্যাধিক স্নেহ করেছেন যেমন, তেমনি প্রশ্রয়ও দিয়েছেন চক্রবর্তী।

অত্যন্ত বুদ্ধিমতী কাজল বুঝতে পেরেছিল কেন বাবা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই সে কোন কথা না বলে বাপের মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

বললে কি বলবে বল!

মা যা বলেন তোর ভালর জন্যেই বলেন মা—মার কথা শুনতে হয়—

তুমিও কি তাই বলতে চাও বাবা?

কি?

রেজাকের সঙ্গে আমি আর মিশব না।

তুমি এখন বড় হয়েছো মা—

তাতে কি?

কি জান মা—আমাদের ধর্ম—আমাদের জাত আলাদা—

ধর্ম আর জাত ও তো মিথ্যা বাবা। ও তো অর্থহীন একটা মানুষের মনগড়া সংস্কার মাত্র।

মেয়ের মুখে অমন কথা কখনো শোনেননি চক্রবর্তী তাই বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে।

অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলেন কেবল, কি বলচিস মা?

ঠিকই বলচি। হিন্দু আর মুসলমান সেটা কি কারো গায়ে ছাপ মারা থাকে না লেখা থাকে?

না—তা কি থাকে তবে—

কি তবে? বল—কেন তবে মিশব না ওর সঙ্গে?

এ যে হয় না মা—এ যে হতে পারে না।

হয় না। হতে পারে না। ও কথা তোমাদের আমি মানি না বাবা।

কাজল—

হ্যাঁ বাবা তুমি যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো রেজাকের সঙ্গে মেলামেশা করা আমার অন্যায়—বাবা আমি আর মিশবো না। কিন্তু—

চক্রবর্তী জবাব দিতে পারেন না মেয়ের প্রশ্নের—বুঝতে পারেন তাঁদের অজ্ঞাতেই ব্যাপারটা অনেকখানি গড়িয়ে গিয়েছে। তাছাড়া মেয়েকে তাঁর তিনি ভাল করেই চেনেন।

জোরজবদস্তি করে কোন লাভ হবে না।

তাতে করে হয়ত হিতে বিপরীত ফলই হবে।

তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, রেজাককে একবার বলবি—আমার সঙ্গে কাল বা পরশু দেখা করতে—

সে ত কালই চলে যাচ্ছে—

কোথায়?

এখনো ত তার কলেজ বন্ধ হয়নি—কি কাজে দুদিনের জন্য এসেছিল কালই চলে যাচ্ছে।

আবার কবে আসবে?

গ্রীষ্মের ছুটিতে সেই মে মাসে—

চক্রবর্তী আর কোন কথা বললেন না।

আর বলবেনই বা কি।

মেয়ে আজ যে প্রশ্ন তার সামনে তুলেছে সত্যিই কি তার জবাব তিনি দিতে পারেন।

তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে যায়।

কাজল আরো কিছুক্ষণ বাপের পাশে বসে থেকে এক সময় বললে, তোমার কাছেই আমি কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় শিখেছি বাবা—তোমাদের সময় কি ছিল জানি না—আজ যা দেখচি সেটা যার বিচারে যদি অন্যায় হয়—আমার বিচার বলতে একটা বস্তু আছে।

তা আছে বৈকি মা।

তবে তুমি জেনো তোমার কাজল এমন কিছু করবে না যাতে করে তোমার মাথা হেঁট হয়—আবার অন্যায়কেও মাথা পেতে স্বীকার করে নেব না।

রেজাকের সঙ্গে আর দেখা করা হয়নি চক্রবর্তীর। চক্রবর্তী ভাবছিলেন, হঠাৎ এলো দেশে ইলেকশন।

ইলেকশনের পরে আওয়ামি লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে দেশের জনসাধারণেব মনোনয়ন লাভ করল।

দেশের জনসাধারণ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে লাগলো এতদিনে বুঝি সুদিন এলো—সুদীর্ঘ তেইশ বছরের ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে তারা বুঝি মুক্তি পাবে।

ইয়াহিয়া এসেছিল ঢাকায়।

বঙ্গবন্ধু মুজিবরকে বলে গেছে—আপনিই হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী—মোবারক।

পাকিস্তানের জাতীয় অধিবেশনের তারিখও ঘোষিত হলো কিন্তু হঠাৎ তা আবার ভেস্তে গেল।

সব পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে গেল।

ভুট্টোর চক্রান্তে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতারে ঘোষণা করলো—পিপলস্ পার্টি ও আওয়ামি লীগের সমঝোতার জন্য আলাপ আলোচনার দরকার—বর্তমান মতবিরোধ দুই দলের মধ্যে ও সংকট এড়াবার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হোক।

তাই হলো।

৩রা মার্চ নয়—২৫শে মার্চ নির্দিষ্ট হলো অধিবেশনের তারিখ।

জনগণ ক্ষেপে উঠলো।

বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন অসহযোগ আন্দোলন।

অসহযোগিতা—সর্বস্তরে অসহযোগিতা সরকারের সঙ্গে—অফিস আদালত কাছারী স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল।

কর দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

উড়লো সর্বত্র কালো পতাকা।

সারা দেশ জুড়ে সে এক অপূর্ব জাগরণের উন্মাদনা।

মুজিব বললেন, দেশের শহীদের রক্তে যে পথের ধূলো রাঙা হয়ে গিয়েছে সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমি কোন মতেই পরিষদে বসতে অক্ষম।

তার প্রস্তাব, মার্শাল-ল তুলে নিতে হবে—মিলিটারীরা যে হত্যা করেছে তার তদন্ত করে দোষীকে শাস্তি দিতে হবে।

ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে—

মিলিটারীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তারপর গণপরিষদে বসবার কথা চিন্তা করতে পারি তার আগে নয়।

সেই সঙ্গে আমাদের ছয় দফা দাবিং মেনে নিতে হবে।

ঐ সময়ই রেজাক তার মার অসুখের সংবাদ পেয়ে দিন চারেকের জন্য গ্রামে এসেছিল কিন্তু হঠাৎ যেমন এসেছিল তেমনি হঠাৎই আবার চলে গেল।

তারপরই ত আগুন জ্বলে উঠলো পূর্ব বাংলার সর্বত্র।

দাউদাউ করে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠলো আগুন।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলায় নতুন করে করেছে সন্ত্রাসের সৃষ্টি।

সেনাবাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে ২৩শে ও ২৪শে মার্চ বাংলা দেশের কয়েকটি জায়গায় একশ দশ জনেরও বেশী নিহত হলো।

নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু সারা বাংলায় ২৭শে মার্চ শনিবার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

কিন্তু সে ২৭শে মার্চ আসার আগেই ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রের অধকারে ইয়াহিয়ার নির্দেশে টিক্কা খানের আদেশে পাঞ্জাবী সৈন্যরা অসহায় ঘুমন্ত শহরবাসীর উপর রাইফেল—মেশিনগান—কামান ও ট্যাংক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

॥ ১৪ ॥

বন্যা এলো। আর সেই বন্যার ঢেউ মধুমতীর শান্ত তীরেও এসে আছড়ে পড়ল।

পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়ালখাঁ সব যেন আথালি-পাথালি করতে শুরু করে দিল।

হত্যা—লুণ্ঠন—অগ্নিসংযোগই শুধু নয় সেই সঙ্গে নির্বিচারে নারীধর্ষণও চালাচ্ছে পিশাচ উন্মত্ত খান সেনারা।

জঙ্গী সরকার পাকিস্তানের যেন এক পাল নেকড়ে ছেড়ে দিয়েছে অসহায় নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর।

পাকিস্তান রেডিও অবিশ্যি অন্য সুর ধরেছে—তারা চিৎকার করে বলছে দেশদ্রোহী আওয়ামি লীগের বর্বর অত্যাচারের হাত থেকে নিরীহ জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্যই নিরুপায় টিক্কা খান মিলিটারী নামাতে বাধ্য হয়েছে।

দুষ্কৃতকারীদের তারা দমন করছে—দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

কিন্তু ভারতের বেতার আকাশবাণী দিচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত সংবাদ। ঘরে বসে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গ্রামবাসী শুনছে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই সংবাদ।

Genocide—গণহত্যা—না—অগণন হত্যা। বাংলা দেশের সন্তান হত্যা।

রক্তের বন্যা বহে যাচ্ছে সারা পূর্ব বাংলায়।

মুক্তিফৌজও নাকি ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে।

উত্তরে রংপুর আর সঈদপুর। ওই দেশের দক্ষিণে খুলনা আব যশোর।

আরো পূবে কুমিল্লা সব মুক্ত। সব আজাদী বাহিনীর করায়ত্ত।

ইয়াহিয়াশাহী জলে নৌবহর ডেকে এনেছে। গোলা পড়ছে চট্টগ্রামে—মুজিবর রহমান সাহেব সার্বভৌম স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করেছেন।

সদ্যজাত প্রজাতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য পাকিস্তানী স্থল ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে নৌবাহিনীও যোগ দিয়েছে।

কামান ট্যাংক বোমারু বিমান—যুদ্ধজাহাজ—পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বিপুল আয়োজন।

আরো সংবাদ এলো : মুক্তিযোদ্ধাদের দমনের জন্য পাকিস্তান আর্মী ছত্রী সৈন্য নামাতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই প্রায় ৩ লক্ষ নিহত।

সংবাদে প্রকাশ বঙ্গবন্ধু ভবন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

ঢাকার ধানমুণ্ডি এলাকায় তাঁর বাসভবনটিও নাকি ভস্মীভূত।

পঁচাত্তরজন স্বেচ্ছাসেবক বাড়িটি পাহারা দিচ্ছিল, মেসিনগানের গুলিতে তাদের শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

কাত্যায়নী দেবীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

তিনি এসে স্বামীকে বলেন, কি হবে গো?

কি আবার হবে ১৩ই চৈত্র তারিখটি আমাদের বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। মনে পড়ে তোমার বৌ—ঐ আর এক ১৩ই চৈত্রই বৃটিশ এই ভারতের মাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার সময় রেজাকের বাবা চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো চক্রবর্তীর।

তার বসবার ঘরে তখন অনেকেই জমায়েৎ হয়েছেন গ্রামের।

গ্রামের সব মুরুব্বী—সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থনকারী।

চৌধুরী সাহেব বললেন, আসুন—আসুন চক্রবর্তী মশাই—

কি রকম বুঝছেন চৌধুরী সাহেব? ফরাশের এক প্রান্তে বসতে বসতে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন চক্রবর্তী।

এতদিনে বুঝতে পারছি চক্রবর্তী মশাই—এদেশ সত্যি সত্যিই আজ স্বাধীন হতে চলেছে—

কিছু ভাববেন না চক্রবর্তী মশাই। বড় যজ্ঞ না হলে বড় প্রাপ্তি হয় না আপনারাই ত বলেন।

যে ভাবে লাখো লাখো লোক মরছে—চক্রবর্তী বলবার চেষ্টা করেন।

মরছে—আরো মরবে—আরো হয়ত অনেক অনেক প্রাণ দিতে হবে তবে হয়ত ইনশাল্লার দোয়া হবে—

কিন্তু এরা কি পারবে। কি আছে এদের—না আছে অস্ত্র—না আছে ট্যাংক—না বিমান না যুদ্ধজাহাজ—কিছুই যে এদের নেই।

নাই বা থাকল অস্ত্র-ট্যাংক-কামান বিমান—ওদের একটা জিনিস যা আছে—অফুরন্ত প্রাণশক্তি—মুক্তির দুর্জয় মরণপণ—দেখবেন তাই আনবে একদিন জয়—বাংলার জয় হবেই। স্বাধীন বাংলা বেতার কি বলছে শুনছেন না।

কি বলছে?

পরাস্ত বিপর্যস্ত পাক হানাদার বাহিনী এখন মরিয়া হয়ে বাংলা দেশের সর্বত্র জলে স্থলে শূন্যে আমাদের মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে।

পাক বাহিনী এখন দিশেহারা হয়ে প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট।

ঢাকার কাছে জয়দেবপুরের অস্ত্র-কারখানা এখন আমাদের দখলে। ময়মনসিং জেলা পুরোপুরি, রংপুর-দিনাজপুর-রাজসাহীর অধিকাংশ—ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম শহর এলাকার বাইরে সর্বত্র—যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জিলার পশ্চিমবঙ্গ-সীমান্তবর্তী এলাকা সব আমাদের দখলে—

মুসলীম লীগের একজন জয়নাব মির্ধা যে এক পাশে বসে বসে গভীর আগ্রহে ওদের কথা এতক্ষণ শুনছিল বললে, তা চৌধুরী সাহেবের মনেও পড়ে না।

বেশ কিছুদিন পরে কিন্তু আবার ঢাকা ঘুরলো ইয়াহিয়ার আর্মীর অগ্রগতি শুরু হলো।

পাক বাহিনীর মুহুর্মুহুঃ বিমান আক্রমণে ছয় ডিভিশন সৈন্যের মুখোমুখি না দাঁড়াতে পেরে মুক্তিফৌজ ক্রমশঃ পিছু হটতে শুরু করতে লাগল।

—পাক হানাদাররা দুপাশের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে—মেসিনগানের গুলি চালিয়ে নির্বিচারে যুবা-বৃদ্ধা নারী-বালক-শিশুকে হত্যা করতে লাগল তখন বুঝতে পেরেছিলেন চৌধুরী সাহেব—কারা ঐ পাক হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করছে।

ঐ সব মুসলিম লীগের চরেরা।

বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের দল।

কিন্তু সে তো আরো পরের কথা।

সারা গ্রাম জুড়ে কিন্তু একটা আতঙ্কের থমথমানি।

কি হয়! কখন কি হয় ----

দুদিন গোটা দুই পাক বোমারু বিমান গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে গেল—মৃত্যুবাজের মত গর্জন তুলে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ঘোষণা করল, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি—বাংলা দেশের নতুন জাতীয় সংগীত।

কিছু আগে শোনা যেত ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে—

> পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে
> আলোকে আলোকময়
> জয় জয় জয় জয়
> জয় বাংলার জয়।

আরো বিশদ খবর আসতে লাগলো গ্রামের মানুষের কাছে—মধুমতী নদীর শান্ত জলে ঘেরা পূর্ব বাংলার ছোট গ্রামখানিতে।

২৫শে মার্চ নাকি ইয়াহিয়া টিক্কা খানের বিশেষ পরিকল্পিত অভিযানটি শুরু হয় হঠাৎ মধ্যরাত্রিতে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে কামান আর গোলাগুলির আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গা ঢাকার মানুষ বাড়ির ছাতে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভীত ফ্যাকাশে মুখে দেখছে খান সেনাদের নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ।

সেদিন নাকি রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্তও ঢাকার অবস্থা ছিল স্বাভাবিক।

জিন্নাহ্ এ্যাভেনু ও নিউ মার্কেটে রোজকার মতই লোকজন নির্ভয়ে চলাচল করেছে।

আর করবেই বা না কেন?

ইয়াহিয়া ভুট্টো প্রভৃতির সঙ্গে তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ লীগের মাতব্বর ব্যক্তিদের সঙ্গে একটা মীমাংসার আলোচনা চলেছে প্রেসিডেন্ট ভবনে দফায় দফায়।

প্রেসিডেন্ট ওদের নাকি মেনেও নিয়েছে—রেডিও থেকে থেকে গেয়ে উঠছে : পূবের আকাশে

সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময়—জয় জয় জয় জয় বাংলার জয়।

কেমন করে ওরা সন্দেহ করবে জঙ্গী সরকারের ও সবই ছলাকলা—তলে তলে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে—জাহাজভর্তি সৈন্য—কামান গোলা বারুদ চট্টলার বন্দরে পৌছে গিয়েছে তাদের জঙ্গী শাসকচক্র কায়েমী করতে।

তাই তারা ছিল নির্ভাবনায়—নিশ্চিত।

পাক সৈন্যরা প্রথমেই অবরোধ করে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তেজগাঁ বিমানবন্দর। বিমানবন্দরটি সৈন্যরা ঘিরে ফেলে। শুধু সৈন্য নয় সঙ্গে ৩৭ এম, এম, গান লাগানো সব আরমারড্ কার—

তারপর একে একে নিঃশব্দে সবার অজ্ঞাতে তারা দখল করে নিল ঢাকা বেতারকেন্দ্র—ঢাকা টেলিভিশন—

কয়েকদিন আগে উড্ডীন বাংলা দেশের পতাকা টেনে নামিয়ে এনে ঐ সব কেন্দ্র থেকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে দিয়ে ভারী এমুনিশন বুটের তলায় মাড়িয়ে নতুন করে আবার উড়িয়ে দিল পাকিস্তানী পতাকা।

তারপর শুরু হলো—মার্চ।

একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে—একদল হাই কোর্টের ধার দিয়ে—কার্জন হলের দুই পাশ দিয়ে—

হাজার হাজার বুটের আওয়াজ—

সদর্প আওয়াজ—

এগিয়ে চললো কার্জন হলের দুই পাশ বরাবর—

চললো এগিয়ে—

॥ ১৫ ॥

কিন্তু তখনো ওরা জানে না জনাতোও পারেনি—ওদের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদটা আওয়ামী লীগের অফিসে পৌছে গিয়েছে।

অবিশ্যি ঐ দিন সকালেই ডি. আই, জি. বঙ্গবন্ধুকে গোপনে সাবধান করে দিয়েছিল, ব্যাপার স্যাপার আদৌ ভাল মনে লয় না শেখ সাহেব—ঘন ঘন জেনারেল-ব্রিগেডিয়ার-কর্নেলদের প্রেসিডেন্ট ভবনে ডাক পড়ছে—মনে লয় ওরা একটা সাংঘাতিক কিছু করবো—

দলের অন্যান্য নেতারা শেখ সাহেবকে বার বার বলতে লাগলেন, ভাইসাব আপনি অন্য কোথায়ও চলে যান—

বঙ্গবন্ধু বললেন, তোমরা কি ক্ষেপেছো—তোমরা কি পাগল হলে—আমি যদি আত্মগোপন করি ত ওরা রক্তবন্যা বহিয়ে দেবে—

কিন্তু আমরা আপনাকে হারাতে পারবো না—আপনার প্রাণের দাম লক্ষ প্রাণের চাইতেও বেশী —

না—বঙ্গবন্ধু বলে ওঠেন, এক মুজিব গেলে আর এক মুজিব আসবে। দলপতির তোমাদের অভাব হবে না—এ সময় আমি ওদের ছেড়ে যেতে পারি না—তারপর একটু থেমে বললেন, এ স্বাধীনতার সংগ্রাম যতদিন না আমাদের সোনার বাংলা স্বাধীন হয় থামবে না ঠিক জেনো অনির্বাণ জ্বলবে এ দীপশিখা—কারো সাধ্য নেই তা নির্বাপিত করে—

খান হানাদাররা সে রাত্রে কিন্তু কিছুটা এগিয়েই বাধা পেল। রাস্তায় রাস্তায় ইতিমধ্যেই অসংখ্য ব্যারিকেড্ তৈরী করা হয়েছে।

ইকবাল হল থেকে ছাত্ররা অগ্রগামী সৈন্যদের লক্ষ করে হাতবোমা ছুঁড়লো।

শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে অন্য পক্ষ থেকে ৩০৩ রাইফেলের গুলিবর্ষণ—ব্রেনগান ও এল. এম. জি. থেকে বৃষ্টির ধারার মত গুলি এসে চারপাশে পড়তে লাগলো।

মুহুর্মুহুঃ গর্জন—আকাশ বাতাস মাটি কাঁপতে লাগল।

ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী মেসিনগানের গুলিতে তচনচ হয়ে গেল।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ছাদ দিয়েই লাফিয়ে সৈন্যরা ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়লো—

ছাত্ররা তখন ছাদ থেকে জানালা থেকে ৩০৩ রাইফেল ও বারো বোরের বন্দুকে প্রতিরোধ করবার

চেষ্টা করে ওদের।

নীচের রাস্তায় তখন ঘরঘর শব্দে ট্যাংক এসে গেছে ব্যারিকেড সরাতে—৭৫ এম মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কতক্ষণ যুঝতে পারে ঐ প্রচণ্ড খান হানাদারদের আক্রমণ সামান্য কয়টি ছাত্র।

প্রচণ্ড গোলা আর মেসিনগানের বর্ষার ধারার মত গুলি আসছে—সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে ছাত্রদের নির্বিচারে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করছে।

মদমত্ত খানরা যেন মৃত্যুতাণ্ডবে মেতে উঠেছে তখন।

ওদিকে একদল খান হানাদার এগিয়ে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে শহীদ মিনার ও মেডিকেল কলেজের দিকে।

বর্বর খান হানাদারদের বুলেটের আঘাতে ভেঙ্গে চুর চুর হলো শহীদ মিনারের সুন্দর লাল কাঁচের আর্চগুলো—যেন ফোঁটায় ফোঁটায় জমাটবাঁধা রক্ত ছিটকে ছড়িয়ে পড়লো মিনার চত্বরের চারিদিকে।

শহীদ রফিক—শহীদ বরকত-সালামের রক্তাক্ত হৃদয় আবার বুঝি নতুন করে সে রাত্রে গুলিবিদ্ধ হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন বিলডিং জ্বলছে দাউদাউ করে—সে আগুনের আভায় আকাশ লালে লাল।

উড়ে গেছে গুলির আঘাতে আঘাতে বিভিন্ন সংগ্রামের জন্ম হয়েছিল একদা যে মধুর ক্যানটিনে সেই ক্যানটিন।

ট্যাংক গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

কেবল ছাত্রদেরই না—বহু-খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকদেরও নিষ্কৃতি ছিল না, হানাদারেরা নির্বিচারে করেছে হত্যা আর হত্যা।

সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে মেসিনগানের গুলিতে নারকীয় হত্যালীলা—

রক্ত আর রক্ত—গর্জন আর আগুন।

একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ওদের সেদিন পূর্ব পাকিস্তানে ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ ও পুলিস বাহিনী। সে রাত্রে ওদের বিরুদ্ধে মরণপণে লড়েছে—

তারাও যে বাঙ্গালী—তারাও যে বাংলাকে ভালবাসে—সোনার বাংলা যে তাদেরও সোনার বাংলা।

লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে।

ঢাকা শহরে সে যেন এক ভয়াবহ বিভীষিকার রাত্রি কালো ডানা মেলে মৃত্যু শকুনের মত নেমে এসেছে।

ধর্মের জিগীর তুলে একদিন যারা মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই বলে জীন্নাহর চাঁদ তারা পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল—যারা একদিন নদী মেখলা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বুঝিয়েছিল ভারতের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই—থাকতে পারে না। ওরা আমাদের পথের কাঁটা।

যারা একদিন হিন্দি আর উর্দু ভাষা পথে আউড়ে আউড়ে তাদের বুঝিয়েছিল, উলোক তুমাহারা হামারা—সব মুসলমানকো দুষমন।

যারা একদিন বলেছিল, ওরা পুতুল পূজা করে—ওরা কাফের।

খোদা তাল্লাহ ওদের কাফের বলে নির্দেশ করেছেন।

যারা বুঝিয়েছিল ওরা এতকাল তোমাদের, আমাদের শুধু শোষণই করেছে—ওরা আমাদের দুষমন—তোমরা আর আমরাই মুসলিম ভাই ভাই—আমাদের ধর্ম এক—এক সূত্রে বাঁধা 'আমরা', তারাই—সে রাত্রে ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে বেয়নেট চালিয়েছিল।

রাইফেল থেকে গুলি বর্ষণ করেছিল।

ভাই হয়ে ভাইয়ের রক্তে ঢাকার পথের ধূলো রাঙিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তারা সেদিন বোঝে নি—রক্তের নেশা বড় নির্মম নেশা।

তার মূল্য শোধের পরিমাণ বড় ভয়ানক।

তাদের ঐ নেশায় আজ যাদের প'রে তারা গুলি চালাচ্ছে, কামান দাগছে তাদের মধ্যেও একদিন সেই মারাত্মক নেশা সংক্রামিত হতে পারে।

পাগলা ঘোড়ার মত সে আগুনে কেবল তাদেরই পোড়াবে না—সে আগুন একদিন যারা আগুন লাগাচ্ছে তাদেরও পিছু পিছু ধাওয়া করে আসতে পারে।

আর যারা সেদিন পুড়েছিল—নির্যাতিত হয়েছিল—

তারাও বুঝতে পারেনি—ঐ দাবানলকে ঠেকাতে গিয়ে, তারা যে হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছে, সে হাতিয়ারের নেশাও বড় কম নেশা নয়।

কারণ একদিন আগুন নিভে যাবে, যুদ্ধ—রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থেমে যাবে—তখন কিন্তু হাতের অস্ত্র ফেলা সহজ হবে না।

অস্ত্রের একটা আলাদা নেশা আছে।

সে কেবল অন্যের বুকেই ছুটে গিয়ে গুলি বিদ্ধ করে না—

সময় সময় সে গুলি ফিরে এসে নিজের বুকেও বিদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু সেদিনকার সে যুদ্ধ কি কেবল একটা দিকই সূচনা করেছিল।

যে প্রেরণাতে তারা সেদিন দলে দলে প্রাণ দিয়েছিল তার কি কেবল একটা দিকই ছিল।

হয়ত না।

কয়েক লক্ষ প্রাণ বলি দিলেই কোন জাতির ভাগ্যাকাশে মুক্তিসূর্যের উদয় হয় না।

তার জন্য আরো অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়।

দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে যে পলিমাটি একটু একটু করে জমে উঠছিল সবার অলক্ষ্যে সে পলিমাটিকে সরিয়ে আবার নতুন স্রোত বহান অত সহজ নয়।

আবর্ত—অনেক ঘোলা আবর্তে যখন পলিমাটি সরতে শুরু করতে দেখা দেবে অনেক জঞ্জাল তখন তার চার পাশে ঘুরে ঘুরে সেই স্রোতকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করবে এবং ধ্বংসের সেই রাত্রে যারা বন্দুক বেয়নেট উঁচিয়ে তেড়ে এসেছিল হাজার হাজার নিরস্ত্র নাগরিককে সায়েস্তা করার জন্য তারাও ভাবেনি তাদের হাতের ঐ বন্দুকেই শেষ কথা নয়।

গোলা ফেলে—বোমা ফেলে সহর ধ্বংস করা যায়, লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা যায় এক বৃহৎ হত্যাযজ্ঞে—কিন্তু যজ্ঞের সেইটে শেষ কথা নয়, তার পরও আছে।

সে হচ্ছে ইতিহাস।

যার রচনা চলে পাতার পর পাতায় নিভৃতে এক অলক্ষ্য কালিতে।

॥ ১৬ ॥

কাজলের বুকটার মধ্যে যেন কাঁপে।

রেডিও মারফত সব সংবাদই ত সে প্রত্যহ পাচ্ছে।

রেজাকের কথা মনে হয় বার বার—সে এখন কোথায়।

ঢাকায় সে গিয়েছে নিশ্চয়ই—কিন্তু সে সেখানে পৌছবার আগেই ত জানতে পেরেছে সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে।

ঢাকায় কি শেষ পর্যন্ত সে পৌছতে পেরেছিল—আবার মনে হয়—না যদি পৌছতে পেরে থাকেও কোথায় যেতে পারে?

এলোমেলো নানান ভাবনা মনটাকে তার এলোমেলো ভাবে পীড়িত করে তোলে।

কাজলের গাঙের ধারটা বড় প্রিয় ছিল—এখানে এলে ইদানীং সে বিকেল হলেই গাঙের ধারে চলে আসত।

একা একাই দুপুরের প্রখর রৌদ্রে চলে আসে কাজল গাঙের ধারে।

গাঙের পাড়টা কত ভেঙেছে গত দু তিন বছরে।

কেবলই ভাঙ্গছে আর ভাঙ্গছে!

রেজাক বলতো, এই প্রকৃতির নিয়ম কাজল। নদীর এক পাড় ভাঙে অন্য পাড় গড়ে।

ওপারের নতুন জাগা চরের অনেকখানি দখল নিয়েছেন রেজাকের বাবা চৌধুরী সাহেব। সামনের বছর থেকে বোধহয় ঐ চরে ধান রোয়া হবে।

কাজল তার বাবার মুখে শুনেছে মধুমতী নদী নাকি আরো প্রশস্ত ছিল—তখন সকাল সন্ধ্যায় বোয়ালমারীর বিরাট ষ্টীমারটা যাতায়াত করত যাত্রী নিয়ে।

অনেক দূর পর্যন্ত গাঁয়ের ভিতরে ষ্টীমারের ভোঁ শোনা যেত।

চর মসলন্দপুর ছিল এ গ্রামের আগের স্টেশন। ষ্টীমারটা ছাড়ত নাকি খুলনা থেকে।

ক্রমশঃ নদী একটু একটু করে মজে এলো।

বড় ষ্টীমার আর এখন নিয়মিত যাতায়াত করতে পারে না—

শেষে এলো একদিন ষ্টীম লঞ্চ।

তখনো ওপার পর্যন্ত রেল লাইনের পত্তন হয় নি।

রেল লাইন কালুখালী আর ভাটিয়া পাড়ার মাঝখানে বসেছে অনেক পরে।

রেল হবার পর যাতায়াতের অনেক সুবিধা হয়ে গিয়েছে।

না'য়ে গাঙ পার হয়ে ট্রেন ধরলে ভোর নাগাদ শিয়ালদায় পৌছে যাওয়া যায় কালুখালীতে ট্রেন বদল করে।

বড়দার সঙ্গে কাজল বার দুই গিয়েছে।

এবারও বড়দা বলেছিল, পাশ করলে তাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতার কলেজে ভর্তি করে দেবে। কিন্তু বাবা রাজী হননি—

আসলে কিন্তু ওই বাবাকে বলেছিল, বাবা আমি কালকাতার কলেজে পড়তে যাবো না।

কেন রে?

চক্রবর্তী শুধিয়েছিলেন।

না। তুমি বড়দাকে বলো আমি ঢাকা কলেজেই পড়বো।

বাবা বলেছিলেন, তাই যদি চাস মা, ত তাই হবে। তবে ঢাকা যাওয়ারইবা দরকার কি, ফরিদপুর বা যশোর কলেজেই পড়িস—

কাজল শুনেছিল ওর বাবা এক সময় কিছুদিন ফরিদপুর কলেজেই পড়েছিলেন তারপর যান কলকাতায় কলেজে পড়তে।

মধুমতীর ঘোলাটে জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে কাজলের কত কথাই না মনে পড়ে।

হিজল গাছটার তলায় বসলে দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্র গ্রীষ্মের তাপ যেন গায়েই লাগে না।

নদী থেকে একটা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে মুখে এসে লাগে।

নীলকণ্ঠ পাখীটা এখনো রোজ আসে।

কাজলের শব্দ ও শুনতে পায়নি। পায় না ওরা শুনতে।

গাঙের বুকে হেলে পড়া হিজল গাছটার ডালে চুপটি করে বসে থাকে—

দ্বিপ্রহরের প্রখর আলোয় ওর গায়ের বিচিত্র বর্ণের পালকগুলো যেন রামধনু রঙের মত জ্বলতে থাকে। নদীর স্রোতে প্রখর আলো ঝিলমিল করে।

মধ্যে মধ্যে দূরের বাঁশবনের ভিতর থেকে সর-সর-সর কেমন একটা শব্দ শোনা যায়—

রেজাক বলেছিল গিয়েই চিঠি দেবে—

হয়ত চিঠি দিয়েছে—কিংবা হয়ত চিঠি দেবার সময়ই পায়নি।

আর দিলেই বা কি হতো—সে চিঠি কি আর তার হাতে পৌছতো—আজ কয়দিন থেকে ত এ গাঁয়ের ডাকখানা থেকে কোন চিঠিপত্র বিলিই হচ্ছে না।

কাজল একটা যদি চিঠি পেত রেজাকের—সে এখন কোথায় আছে—

আশ্চর্য—বাড়িতে আর তার ও রেজাকের ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনাই আজ কয়দিন ধরে হচ্ছে না—তাদের কথা যেন ওরা ভুলেই গিয়েছে—

কেবল যুদ্ধের কথা—আর যুদ্ধের আলোচনা।

শুধু তাদের বাড়িতেই বা কেন, গাঁয়ের সর্বত্রই ঐ একই আলোচনা।

আর যেন কোন প্রসঙ্গই নেই কারো আলোচনা করবার।

যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

আচ্ছা কাজলও কি যেতে পারে না যুদ্ধে?

খবর পাওয়া যাচ্ছে অনেক তরুণীই নাকি বাংলা দেশের এই স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তারা যে কেবল নির্যাতিতই হচ্ছে তাই নয়, তারা প্রয়োজনে বন্দুক কামানের বদলে সড়কি—কাটারি ধরছে।

খতম করো—খতম করো।

গতকাল থেকে আর একটা নতুন খবর পাওয়া যাচ্ছে কলকাতার বেতারে।

ঢাকা-কুমিল্লা-ফেনী-আখাউড়া ত বটেই দিনাজপুর-যশোর-রাজশাহী থেকেও অনেকে সর্বস্ব খুইয়ে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ভারত সীমান্তের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করেছে।

বহু বাংলাদেশের লোক আজ ভারতের শরণার্থী।

তবে তাদের মধ্যে, শরণার্থীদের মধ্যে মুসলমানদের চাইতে নাকি হিন্দুই বেশী।

গতকাল আরো একটা সংবাদ কলকাতার আকাশবাণী থেকে শুনতে পাওয়া গিয়েছে এখানে—

দিনাজপুর শহর, ঢাকার লালবাগ যেমন মুক্ত, তেমনি শ্রীহট্টের পতনও নাকি আসন্ন হানাদারদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে।

মস্কো থেকে সোভিয়েৎ পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগরনী ইয়াহিয়ার কাছে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন নাকি বাংলা দেশে রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড বন্ধের জন্য।

আরও একটা দুঃসংবাদ এল।

বঙ্গবন্ধু পাক বাহিনীর হাতে বন্দী—তারাই জানিয়েছে—তাই শেখ মুজিবুর রহমান সহ আওয়ামি লীগের অন্যান্য নেতার নিরাপত্তার ব্যাপারে ক্রেমলিন বিশেষ উদ্বিগ্ন।

সোভিয়েৎ প্রেসিডেন্ট তাঁর আবেদনে সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখও নাকি করেছেন।

সোভিয়েৎ কূটনৈতিক ইতিহাসে—বাবা বলছিলেন গতকাল রেডিও সংবাদ শোনার পর—এ ধরনের কোন আবেদনের নজির নাকি নেই।

কেবল কি তাই —

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নাকি নয়াদিল্লীর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন, ভারতের সীমান্তের ওপারে পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে, তাতে ভারতের পক্ষে নীরব দর্শক থাকা সম্ভব নয়—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

শ্রীমতী গান্ধী আরো বলেছেন, ভারত কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কখনও নাক গলায়নি। সেই সঙ্গে বিশ্বের কোন অংশে উৎপীড়ন বা অন্যায় ঘটলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতেও ভারত কোনদিন কার্পণ্য করেনি।

বোধহয় পাক সরকার যা বলছে অনবরত—সব স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

এখন পূর্ব বাংলায়—স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে।

রাস্তায় রাস্তায় ঢাকার দোকানপাট হাটবাজার সব খুলেছে—চলছে—মানুষজন আগের মতই রাস্তায় যাওয়া আসা করছে—

তারই প্রতিবাদে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, বাংলা দেশে যা ঘটছে, তা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

দুদিক থেকে দুই বেতার মারফত দু ধরনের খবর আসছে।

একদিক থেকে শোনা যাচ্ছে খুন জখম লুঠপাট—ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের বেপরোয়া জঘন্যতম কুকীর্তির সংবাদ।

অন্য দিকে শোনা যাচ্ছে—সব ঠিক হ্যায়—সব স্বাভাবিক।

কাজল বুঝতে পারছে মা দুদিন ধরে ঐ সব সংবাদ শুনে শুনে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

বাবাকে বলেছেন, কি হবে গো—

বাবা বলেছেন, কিছু ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কাজল বুঝতে পারে বাবা তার মাকে যতই আশ্বাস দিন গলার স্বরটা যেন তাঁর কেমন মিয়োনো—ঝিমোনো।

এমন কি রেজাকের বাবা চৌধুরী জ্যেঠার গলার স্বরটাও যেন কেমন ক্লান্ত—অবসন্ন শোনায় আজকাল।

যুদ্ধের খবরে রেজাকের কথা ভেবেই কি? একমাত্র পুত্র রেজাকের মঙ্গল চিন্তাতেই কি চৌধুরী জ্যেঠা বিচলিত হয়ে পড়েছেন?

রোদ ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে—নদীর বুকে হিজল গাছের ছায়াটা ক্রমশঃ দীর্ঘ হচ্ছে।

রাত্রে ঘুম আসে না কাজলের।

আজও শয্যায় শুয়ে ছটফট করছিল।

বাইরে গাবগাছের ডালে অন্ধকারে সেই তক্ষকটা ডেকে উঠলো।

উঃ কি নিঃশব্দ রাত!

আর কি শ্বাসরোধকারী অন্ধকার।

কোন বাড়িতে আলো জ্বালা হয় না আজকাল—

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নির্দেশ।

বলা যায় না কিছু যেভাবে সর্বত্র বাংলা দেশে পাক বোমারু বিমান নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে চলেছে—হয়ত তাদের গ্রামও রেহাই পাবে না।

তাই গ্রামের পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট নরুল সাহেব নির্দেশ জারি করেছেন, খবরদার আলো জ্বালাবা না কেউ রাত্রে—

খাকি ক্যানেস্তারা কেটে খানিকটা জানালার মত করা হয়েছে তারই মধ্যে হ্যারিকেন বাতি রাখা হয়।

এবারে এ গাঁয়ে ইলেকট্রিক্ আসার কথা ছিল—আর এলো না।

হঠাৎ মার চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বর কানে এলো কাজলের।

মা বাবাকে বলছেন, চলো আমরা চলে যাই এখান থেকে—

কোথায় যাবে—

কেন ছেলেরা সব কলকাতায় আছে সেখানে!

পাগল হলে!

একবার ঐ বয়সের মেয়েটার কথা ভেবেছো—যে ভাবে সব পাঞ্জাবী সৈন্যরা—সর্বত্র শুনতে পাচ্ছি বয়েসের মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করছে—মা বললেন।

যাবো বললেই ত আর যাওয়া হয় না বৌ—

কেন—চলে যাবো—

পথে কি সৈন্যবাহিনী পড়বে না। তখন—

ওকে একটা বোরখা পরিয়ে নিয়ে যাবো।

হিন্দু-মুসলমানের মেয়ে কাউকেই ওই বর্বর পাঞ্জাবীগুলো রেহাই দিচ্ছে না শোন নি।

তবে কি হবে?

মধুসূদনকে ডাকো—

তখন ছেলেরা কত বলেছিলো এখান থেকে চলে যাবার জন্যে, তুমি কিছুতেই গেলে না।

তখন কি জানি বৌ এমনটা হবে—কোথায় ভেবেছি বঙ্গবন্ধু এবারে প্রধানমন্ত্রী হবেন—আর আমাদের এমনি করে অসহায়ের মত বন্দীজীবন যাপন করতে হবে না—দুই বাংলার মধ্যে আবার যাতায়াত সহজ স্বাভাবিক হবে—উঃ কি বিশ্বাসঘাতকতা—

কাজল কথাগুলো শুনতে শুনতে তার বালিশের তলায় রাখা ধারালো ছোরাটার মোষের শিংয়ের বাঁটটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে।

গত বছর জন্মদিনে রেজাক ছোরাটা ওকে উপহার দিয়ে বলেছিল, সব সময় ত আমি তোমার পাশে থাকি না, থাকতে পারবোও না হয়ত। কাজল—এটা রাখো—অতি পরিচিত জনও হয়ত কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কিন্তু এটা জেনো কোনদিন করবে না।

অন্ধকারে কাজলের চোখের মণি দুটো জ্বলতে থাকে।

॥ ১৭ ॥

ঢাকায় থাকতে পারেনি শেষ পর্যন্ত রেজাক ও শামসুলরা।

উন্মত্ত পাঞ্জাবী সেনারা তখন যেন ঢাকা শহরে তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণ—আগুন আর মৃত্যু।

ধ্বংস আর ধ্বংস।

ওদের দল পিছু হটতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যে।

বিরাট এক সাঁজোয়া বাহিনীর সঙ্গে কি নিয়ে যুদ্ধ করবে।

সম্বলের মধ্যে ছিল রাইফেল আর গোলাগুলি।

ওরা চলে আসে কোন মতে পিছু হটতে হটতে চট্টগ্রামে।

চট্টগ্রাম শহরে তখন যুদ্ধজাহাজ 'বাবর' ও 'জাহাঙ্গীর' থেকে অবিশ্রাম গোলাবৃষ্টি হচ্ছে।

তুমুল লড়াই চলেছে পাক সেনাদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের।

গোলার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে সাগরবন্দর শহর চট্টলার মাটি, সেই সঙ্গে থেকে থেকে মেসিনগান আর মর্টারের অগ্ন্যুদগার।

যত মুক্তিফৌজের বেষ্টনী দৃঢ়তর হচ্ছে তত দলে দলে যুদ্ধজাহাজ থেকে নামছে খান সৈন্যরা।

কত লোক যে নিরীহ অসহায় গোলাগুলির মুখে প্রাণ দিয়েছে ও দিচ্ছে তার সংখ্যা বুঝি গণনাতীত।

ওরা সংবাদ পেলো চট্টগ্রামে পৌঁছেই—মুক্তিফৌজকে মদত দিচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা খণ্ডজাতি।

তারাও ওদের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে।

কেবল মেসিনগান আর কামানের গোলাই নয় পাক সেনারা বোমারু বিমানের সাহায্যে বাংলাদেশের সর্বত্র বোমা বর্ষণ করে চলেছে।

নেপাম বোমা ফেলে সব আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট-দিনাজপুর-কুমিল্লা-রাজশাহী-যশোর জুড়ে বিরাট এক রণাঙ্গন।

ওদের দলের নতুন নাম হল মুক্তিফৌজ।

রাস্তা—রেল লাইন বিধ্বস্ত করেছে মুক্তিফৌজ, যাতে করে পাক হানাদার বাহিনী যাতায়াত না করতে পারে সহজে এক যুদ্ধ সেকটার থেকে অন্য যুদ্ধ সেকটারে।

জঙ্গী বাহিনী তবু মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

যশোর আজ বোমারু বিমান ও কামান মর্টারের গোলাবর্ষণে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে হানাদার বাহিনী ও পশ্চিমা পাকিস্তানী নগরবাসীদের লুঠপাট।

অগ্নিসংযোগ—নারীধর্ষণ ও হত্যা।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই সব নিষ্প্রদীপ, অন্ধকারে চারিদিকে ঢেকে যায়।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়, কেউ আলো জ্বালাবেন না—শহর ছেড়ে কেউ গ্রামে পালিয়ে যাবেন না।

আপনার পাশে পাশেই রয়েছে শত্রু পাক বাহিনীর সব গুপ্তচর। মিরজাফরের দল সব তৎপর হয়ে উঠেছে।

মুক্তিফৌজের সৈনিকদের মত পোশাক পরে ছদ্মবেশী গুপ্তচরেরা সব সংবাদ সংগ্রহের আশায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাদের দেখতে পেলেই খতম করুন।

কথা বললেই বুঝতে পারবেন তাদের সঙ্গে তারা শত্রু না মিত্র।

উত্তর খণ্ডের খবর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, রেল শহর পার্বতীপুর ও বগুড়ায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে।

সেই সঙ্গে আরো খবর—প্রাণভয়ে ভীত আরো সব নিরীহ সহরবাসী পালাচ্ছে সব কিছু ফেলে রেখে ভারত সীমান্তের দিকে।

সেদিন এক বিশেষ খবর :—

সন্ধ্যায় রেজাকদের বাহিনী আকাশবাণীর এক সংবাদে জানতে পারল দিল্লী পাকিস্তান হাই কমিশনারের কার্যালয়ের দুই পাক কূটনীতিক— সেকেণ্ড সেক্রেটারী বাঙ্গালী কে. এম. শাহাবুদ্দিন ও অ্যাটাশে আমজাদুল হক বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনার গণহত্যার প্রতিবাদে ইসলামাবাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন।

ভারত সরকার তাঁদের আবেদনও মঞ্জুর করেছেন।

চট্টগ্রাম থেকে একদল যাত্রী—রাষ্ট্রসংঘের অফিসার সহ সতেরটি বিদেশী রাষ্ট্রের মোট একশত উনিশজন ক্লান-ম্যাকনেয়ার জাহাজে চেপে কলকাতার বন্দরে পৌঁছে গিয়েছেন।

পাশে পাশে চলেছে পাক বেতারে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা।

কিন্তু কে কান দেবে তাদের প্রোপাগাণ্ডায়, কেউ সে বেতার শোনে না।

সবাই শোনে আকাশবাণী, বি. বি. সি.—অস্ট্রেলিয়া এ ভয়েস অব আমেরিকার বেতার সংবাদ।

রাত্রি গভীর।

সহরের পশ্চিমাঞ্চলে একটা বাড়ির মধ্যে মুক্তিফৌজের জরুরী বৈঠক বসেছে—দলনেতা মেজর হবিবুল্লা—

মেজর হবিবুল্লা ডাকলেন, আমজাদ হোসেন—

ইয়েস স্যার—

আজ রাত্রেই তোমরা ছয়জন কুমিল্লার দিকে রওনা হয়ে যাও—শফিউ,. ইমদাদ, রোশন, কল্যাণ সাহা, শাহাবুদ্দীন, শামসুল ও রেজাক—তোমাদের হাতে যে ম্যাপ ও প্ল্যান দেওয়া হবে—সেই মত চিহ্নিত—রেলপথের কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম মৈমনসিং যোগাযোগকারী রেল সেতুগুলো ধ্বংস করে ফেলবে। তোমাদের দলনেতা হিসাবে থাকবে লেঃ শাহাবুদ্দীন—

ঘরের এক কোণে এক খালি বড় বিস্কুটের টিনের মধ্যে টিমটিম করে জ্বলছে একটা আলো—

ঘরে মধ্যে আবছা আলো আঁধারী।

কারো মুখই ভাল করে স্পষ্ট দেখা যায় না।

কিন্তু প্রত্যেকেরই চোখের প্রতি দৃষ্টি পড়লে বোঝা যায় প্রত্যেকটি চোখ যেন জ্বলছে কঠিন প্রতিজ্ঞায়।

হয় স্বাধীনতা—নয় মৃত্যু।

শাহাবুদ্দিন ঢাকা কলেজ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ব্যায়ামপুষ্ট দেহ।

শহাবুদ্দীন বলে, ও. কে. স্যার—আর কোন নির্দেশ আছে আমাদের ওপরে? কাজ শেষ হলে আমরা কি করবো—What would be our next programme? কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করবো?

You know লেঃ শাহাবুদ্দীন আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা transmitter ও radio apparatus-এর অভাবে তেমন ভাল নেই। বলতে গেলে কোন সেক্টারের সঙ্গেই কোন সেকটারের যোগাযোগ বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না—কাজ হয়ে গেলেই তাই নিকটস্থ মুক্তিফৌজের কামাণ্ডো হেডকোয়ার্টারের কামাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করার—তা যদি না সম্ভব হয় ত অবস্থা বুঝে কাজ করবে—

O. K. স্যার। আমরা রওনা হবো কখন?

তোমরা রাত সোয়া নটায় বের হয়ে পড়বে—তোমাদের আর্মস ও এ্যামিনিশনস্ চেক আপ করে নাও। Go—get ready.

অন্ধকার রাত—

বন্দরের ওদিকে কোথায় যেন আগুন জ্বলছে। আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে।

পাহাড়তলির রেল স্টেশনের পাশ দিয়ে ছয়টি মৃত্যুপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণ এগিয়ে চলেছে।

কাঁধে রাইফেল—কোমরে এমুনিশন বেল্ট—এবং একটা ঝোলায় হাতবোমা—ডিনামাইট—ফিউজ ও লোহার আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

আজ ওদের সারাদিন সামান্য এক টুকরো করে পাউরুটি ও পানি ছাড়া কোন আহার্যই জোটেনি।

বন্দর শহরের দোকানপাট বাজারহাট সব বন্ধ।

বেচাকেনা কোথায়ও নেই।

তবু ওরা দৃঢ় সংকল্পে চলেছে এগিয়ে—হয় স্বাধীনতা বাংলার, নয় মৃত্যু।

রেজাকের মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল এক বার আব্বাজান ও আম্মার মুখ দুটো—আর তারই পাশে পাশে যেন থেকে থেকে উকি দিচ্ছিল আর একখানি মুখ।

কাজল।

আব্বাজান ও আম্মাকে বলে সে আসতে পারেনি কিন্তু কাজলকে সে সবই বলেছিল।

যুদ্ধ যদি বাধেই ত সে—নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই হয় ত এমনও হতে পারে—যুদ্ধে সে জড়িয়ে পড়বে।

আরো বলেছিল রেজাক, কাজল, যুদ্ধ সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত হবেই—কারণ যে যাই বলুক আমি এ দেশের ঐ জঙ্গী শাসকদের বিশ্বাস করি না আদৌ—

সেদিনও—বিদায়ের ঠিক আগের দিন বিকালে মধুমতীর সেই নদীর ধারে হিজল গাছটার পাশে

বসে ছিল দুজনে পাশাপাশি।

কাজল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি বিশ্বাস কর না যে ওরা বঙ্গবন্ধুর হাতে এ দেশের শাসনভার তুলে দেবেন?

না। করি না। ডিকটেটারশিপের মোহ বড় সাংঘাতিক মোহ। বাইরে থেকে প্রচণ্ড আঘাত না খাওয়া পর্যন্ত সে মোহ কাটে না, তাই হয়েছিল আগের দুজন জংগী প্রেসিডেন্টেরও, নচেৎ—ইসকান্দার মির্জাও যেত না—আয়ুবও যেত না। আঘাত খেয়েই তারা সিংহাসন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। ইয়াহিয়াও এত সহজে নিজের সিংহাসন থেকে নেমে আসবে না। তাকেও আঘাত হেনে ঐ সিংহাসন থেকে টেনে নামাতে হবে—আর তখুনি সে নামবে।

পাকিস্তানের সত্যিই দুর্ভাগ্য নচেৎ দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর তারা তাজমহল গড়ার স্বপ্ন দেখে। তাইত এই দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানের জন্ম থেকে সেই একই খেলার বার বার পুনরাবৃত্তি চলেছে। লিয়াকৎ আলী, মহম্মদ আলী, নাজিমুদ্দীন, ইস্কান্দার মির্জা থেকে আয়ুব, তারই উত্তরসূরী আজকের ইয়াহিয়া—

তবে যে বঙ্গবন্ধুকে ইয়াহিয়া বলে গেল, বঙ্গবন্ধুই আমাদের পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী।

বুঝতে পারলে না—ওটা একটা মিথ্যা স্তোক মাত্র, কিম্বা তার মনের মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে—যে জন্য সে ঐ অজুহাতে সময়-ক্ষেপ করছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে সে ত কোন মতে হাত মিলাবে না বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। প্রচণ্ড ক্ষমতা বিলাসী সে,—তার ঐ ইলেকশন হলো কেন!—ও ভেবেছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা কোন দলই পাবে না অতএব তার সিংহাসনও কায়েম থাকবে। কিন্তু তার স্বপ্নের অতীত সব ঘটে গেল। আওয়ামী লীগ গরিষ্ঠতা অর্জন করে বসল। এখনও সামনে হাত—

অন্ধকারে একটা হোঁচট খায় রেজাক।

পাশেই ছিল শফিউল, সে বলে ওঠে চাপা গলায়, কি হলো রেজাক—

না। কিছু না পায়ের নীচে বোধ হয় একটা গর্ত ছিল রেজাক বলে।

সাবধানে চলো।

রেজাক ততক্ষণে আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ছিঃ ছিঃ।

কিন্তু কি অন্ধকার।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় প্লেটুন কম্যানডার লেঃ শাহাবুদ্দীনের নির্দেশ শোনা গেল, কম্পানী হল্ট্। আমরা এসে গিয়েছি।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে অন্ধকারে।

নির্জন জায়গাটা।

শাহাবুদ্দীন বললে, ঐ যে সামনে ব্রিজটা চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রেলপথের মধ্যে সব চাইতে বড় ও ইমপর্টেন্ট ব্রিজ ওটাই ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে, রোশন—

ইয়েস—

তুমি আর রেজাক যাও ডিনামাইট লাগিয়ে ফিউজে আগুন দিয়ে চটপট চলে আসবে।

ইয়েস।

Go ahead! বাকী সবাই নজর রেখো চারিদিকে—

দুজনে চলে এগিয়ে।

নিঃস্তব্ধ চারিদিকে। অন্ধকারে জোড়া রেল লাইন চকচক করছে।

পাশের জঙ্গল থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক কানে ভেসে আসে।

ডিনামাইট ব্রিজের নীচে প্লেস করতে ঘন্টা খানেক লাগে। রোশন ইনজিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র কারিগরী বিদ্যায় সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

ব্রিজের কোথায় ডিনামাইট বসিয়ে ব্রিজটা ধ্বংস করা যাবে সে জানত।

রেজাক ফিসফিস করে বলে ঐ সময় রোশন—

কি?

একটা বোধহয় ট্রেন আসছে গুম্ গুম্ শব্দ একটা শোনা যাচ্ছে।

রোশন কান পেতে শুনে বলে, মনে হচ্ছে তাই কিন্তু ট্রেন এখানে এসে পৌঁছাবার আগেই ব্রিজের

একাংশ উড়ে যাবে বলতে বলতে রোশন পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে কাঠি জ্বালাল।

অন্ধকারে দেয়াশালাইয়ের অগ্রভাগে আলোর বিন্দু থিরথির করে কাঁপছে মৃদু মৃদু বাতাসে।

আলোর বিন্দু নয় অনিবার্য ধ্বংসের স্ফুলিঙ্গ।

হ্যাঁ ভুল নেই কোন একটা ট্রেনই আসছে।

রোশন quick সলতেয় আগুন দাও।

শব্দটা ক্রমশঃ দূর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রোশন সলতেয় আগুন দিয়ে দিল, সলতে পুড়তে থাকে, চিড়বিড় চিড়বিড় একটা শব্দ ওঠে।

কিন্তু না, গুম গুম শব্দটা কোন ট্রেনের শব্দ না।

আকাশপথে উড়ন্ত সেবারজেটের আওয়াজ। গঁ গঁ গুমগুম—

ওরা উপরের দিকে তাকায়।

ভুলে যায় দুজনেই ডিনামাইটের সলতেতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দুজনের মধ্যে ব্যবধান হাত দশেক।

সহসা প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনা গেল তার সঙ্গে মিশিয়ে গেল একটা দীর্ঘ শেষ আর্ত মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার—

ব্রিজের একটা অংশ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে প্রচণ্ড শব্দে চারিদিকে তার ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়েছে। তারই একটা লোহার টুকরো এসে রোশনের মাথায় ছিটকে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করে দেয়—সে পিছনে হটে আসবার সময় পায়নি।

ছুটে গেল রেজাক রোশনের পাশে।

রুধিরাপ্লুত ভীষণভাবে আহত রোশনের তখন শেষ অবস্থা।

রোশন!

রোশন সাড়া দিতে পারে না কেবল অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায়।

অন্ধকারে ভাল করে চোখেও পড়ে না কিছু।

তবু আন্দাজে মাটিতে বসে পড়ল রেজাক।

ইতিমধ্যে দলের অন্যান্যরাও চলে এসেছে সেখানে। কম্যানডারের হাতের টর্চের আলোয় ব্যাপারটা চোখে পড়ল।

রোশনের মাথাটা একেবারে খেতলে গিয়েছে।

তাকে আর চিনবারও উপায় নেই।

ক্ষীণ গোঁ গোঁ শব্দটা থেমে গিয়েছে তখন, দেহটাও শেষ যন্ত্রণায় বার কয়েক আক্ষেপ করে স্থির হয়ে গেল।

কারো মুখেই কোন কথা নেই।

॥ ১৯ ॥

সবাই যেন বোবা বেদনায় মূক।

কম্যানডার, রোশনের ইন্তেকাল হয়েছে—দলের একজন বললে।

হ্যাঁ। শাহাবুদ্দীন বললে, শহীদের রক্তে লাল হলো মাটি। জয় বাংলা।

ওর মৃতদেহটার কি ব্যবস্থা হবে? রেজাক শুধায়।

কবর দিতে হবে চল ভাই সব দেহটা ঐ পাশের জঙ্গলে বয়ে নিয়ে চল।

কবর দিয়ে রোশনকে মাটি চাপা দিতে দিতে রাত পুইয়ে এলো।

ভোরের আকাশে আবছা আবছা আলোর আভাস তখন।

গাছে গাছে পাখী ডাকছে।

বাংলাদেশের পাখী আজো ওরা ডাকে।

চিরদিন ডাকবে অমনি করে।

দাঁড়ালে চলবে না।

বিশ্রামের সময় নেই ভাই we must proceed. কম্যানডারের আদেশ শোনা গেল।

রেজাকের দুচোখের কোলে জল।

একটু আগেও যে তাদের সঙ্গের সাথী ছিল কত আশা কত স্বপ্ন ছিল বুক ভরে, সব কিছুর যেন পরিসমাপ্তি ঘটে গেল।

দেশের আর একটি মূল্যবান জীবন, আর একটি মৃত্যু-প্রতিজ্ঞার শিখা নির্বাপিত হয়ে গেল।

কিন্তু সত্যিই কি নিভে গেল, না—না—ঐ শিখা নিভবার নয়—চিরদিন জ্বলবে ঐ শিখা।

ক্লান্ত পায়ে ওরা আবার অগ্রসর হয়।

লেঃ শাহাবুদ্দীন পাকিস্তান রাইফেলসের একজন সৈনিক।

তার পিছনে পিছনে ওরা এগিয়ে চলে রেল লাইনের পাশে পাশে।

চট্টগ্রাম মুক্তিফৌজের নির্দেশ মত কাজ করে রেল সেতু ও সড়ক সেতু দুইটিই নষ্ট করে ওরা তখন ফেণীতে।

ওখানে এসে ওরা সংবাদ পেল দুটি বোমাবর্ষী পাক বিমানকে মুক্তিফৌজরা গুলি করে মাটিতে নামিয়েছে।

বিমান দুটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

পাক বাহিনী নির্বিচারে রংপুর শ্রীহট্ট বগুড়া যশোর কুমিল্লায় বোমাবর্ষণ করে চলেছে মরিয়া হয়ে।

কুমিল্লা ও শ্রীহট্টে যেন আগুন জ্বলছে।

জায়গায় জায়গায় মুক্তিফৌজের বেষ্টনীর দ্বারা পাক হানাদার বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বোমারু বিমানগুলো আশেপাশে ঐ সব জায়গায় বোমাবর্ষণ করে সব জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে যাতে করে হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীরা বেষ্টনী ভেঙ্গে বের হয়ে আসতে পারে।

মুক্তিফৌজও পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে।

কখনো কখনো বাধ্য হয়ে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে পিছু হটে যাচ্ছে।

মুক্তি ফৌজ বলতে সঠিক ভাবে বা সুশৃঙ্খল ভাবে গঠিত কোন ফৌজ নয়।

কোন একদল সেনানী নয়।

যারা কোন কমাণ্ডার বা সেনাপতির নির্দেশে সুশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ বা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে হানাদার পাক সেনাদের বিরুদ্ধে।

এখানে ওখানে—চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী-মৈমনসিং, আখাউড়া, রংপুর, পার্বতীপুর, সর্বত্র ছোট ছোট দল সব প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তাদের মধ্যে একজন দক্ষ সেনানায়কের যেমন অভাব তেমনি অভাব প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র গোলাবারুদের।

যেন সব ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের দল। বেশীর ভাগই।

তবে কারো কারো হাতে কিছু বন্দুক রাইফেল মেসিনগান—,যা তারা অতর্কিত পাক হানাদারদের সুযোগ সুবিধা মত আক্রমণ করে তাদের খতম করে পেয়েছে বা ছিনিয়ে নিতে পেরেছে—সেই সব হাতিয়ার।

কাজেই যুদ্ধ না বলে বলা উচিত প্রতিরোধ।

বনে জঙ্গলে—গ্রামে গ্রামে—তারা সব ছড়িয়ে রয়েছে—পাক হানাদারদের দেখলেই সুযোগ সুবিধা মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক সৈন্যদের উপর।

কখনো তাদের মারে—আবার পাক সেনারা দলে ভারি থাকলে নিজেরাও মরে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাও এক দলের সঙ্গে অন্য দলের নেই—

যোগাযোগ রাখার চেষ্টাও বোধ হয় তারা করে না।

ঐ দলগুলোর সাথে সাথে কিছু সমাজ বিরোধীও মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে—সুযোগ সুবিধা পেলেই তারা লুঠ পাট করে সরে পড়ে।

কখনো কখনো একদল অন্য দলের সঙ্গে মিশেও যায়।

কোনদিন যাদের হাতে বন্দুক ছিল না—কোনদিন যারা সৈনিক জীবনের শিক্ষা পায় নি—তারা যুদ্ধ চালাবেই বা কি করে।

তারা প্রকৃত গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলবেই বা কি করে।

তাছাড়া সবার মনেই কিন্তু দেশ প্রেমের বন্যা বহে যাচ্ছিল না রেজাকদের দলের মত, তাই যা চলেছিল একটা পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলতা।

আর তারই মধ্যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা—বিচিত্র এক নেশায় যেন মেতে উঠেছিল।

ভুট্টো—ইয়াহিয়া—মুজিবরের যখন লোক দেখান আলোচনা চলেছিল ঢাকায়—হাজার পাক সৈন্যদের সিভিলিয়ান ড্রেসে প্লেনে করে সিলোন হয়ে পূর্ববাংলায় আমদানী করা হয়েছিল—পাছে সিলোন সরকার সৈন্য দেখলে আপত্তি জানান তাই ঐ কারচুপি।

তাদের মধ্যে অনেকেই জানত—তারা হিন্দুস্থানের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করতে আসছে পূর্ব-পাকিস্তানে।

ক্রমশঃ তারা বুঝতে পারল কাদের সঙ্গে যুদ্ধ।

তবু তারা সুশিক্ষিত সৈন্য—তাদের কাছে military order is order ! কাজেই যুদ্ধ তাদের করতেই হবে।

কিন্তু কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

প্রতিপক্ষ কে! কারা!

প্রথম প্রথম তারা সামনে এলোও—পরে যখন তারা আত্মগোপন করে নিকট থেকে চোরা গোপ্তা চলাতে লাগল—ওরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

তার উপর নিয়মিত খাদ্য সববরাহ নেই, এখানে ওখানে সব ব্রিজ রেল লাইন—প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়—এবং নেই কোন কঠিন অনুশাসন।

ফলে ক্রমশঃ তারা যুদ্ধের বদলে শুরু করে দিল লুণ্ঠন আর অকথ্য নৃশংস অত্যাচার।

যার যা খুশি—তাই তারা করতে শুরু করে দিল।

এবং তাদের কাজ হলো—শহরে শহরে বাড়িতে বাড়িতে লুণ্ঠন, অগ্নিদাহন, হত্যা আর নারী ধর্ষণ।

দশ থেকে চল্লিশ বছরের কোন নারীকেই তারা বাদ দেয় না।

কোথাও কুমারী মেয়ের সন্ধান পেলে জোর করে ধরে নিয়ে যায় তাদের আড্ডায়—বাংকারে।

আর তাদের মদত দিতে লাগল একদল পূর্ব পাকিস্তানেরই লোক।

তারা সংবাদ সংগ্রহ করে আনাত—সেই সংবাদ অনুযায়ী প্রোগ্রাম স্থির হতো।

তাদের হাতে বন্দুকও দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম প্রথম হয়ত তারা পাক সেনাদের নেক নজরে থাকবার জন্য তাদের মদতই দিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাদেরও অত্যাচার শুরু হলো।

এবং অনেক ক্ষেত্রে পাক অত্যাচারের চাইতেও বেশী।

এত জানা কথাই, প্রখর রবির চাইতে রবিতপ্ত বালুর তাপ বেশী।

॥ ২০ ॥

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সত্যিকারের যে সব তরুণ দুঃসাহসীর দল তারা দেখলো এই ভাবে চলতে পারে না।

ঐ ভাবে ঠিক ঠিক প্রতিরোধই গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়।

কেবল পাক সেনাদের হাতে প্রাণই যাচ্ছে অহেতুক।

কিছু কিছু সত্যিকারের মুক্তি সৈনিকেরা তখন দল গড়ায় মন দিল।

এখানে ওখানে ছোট ছোট দল গড়ে উঠতে লাগল।

পাক সেনাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্র-গোলা-বারুদ-মর্টারও ছিনিয়ে নিতে লাগল।

এবার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মিলিটারী ট্রেনিংয়ের।

যুদ্ধের ট্রেনিং।

কেমন করে বন্দুক চালাতে হয়, কেমন করে শত্রুকে পরাস্ত করতে হয় সামান্য হাতিয়ার সম্বল করে, তারই দ্রুত ট্রেনিং দেওয়া শুরু হলো। ভারতের মাটিতে বর্ডারের আশ পাশে নিভৃতে সংগোপনে।

রেজাকদের বাহিনীতে আরো অনেকে এসে যোগ দিয়েছে ইতিমধ্যে।

মেজর সিদ্দিকী ওদের কম্যাণ্ডার।

মেজর সিদ্দিকীর বয়েস আর কতই বা হবে। পাকিস্তান রাইফেলসের একজন ক্যাপটেন ছিল।

রোগা—লম্বা চেহারা।

দলে আরো দুচার জন আছে পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর সৈনিক—দলের বাকী সব জীবনে যুদ্ধ করা দূরে থাক কখনো হাতে রাইফেল বা বন্দুকও ধরেনি। কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাদের।

দ্রুত তাদের মিলিটারী ট্রেনিং দিয়ে হাতে হাতিয়ার তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বেশির ভাগই কলেজ ও স্কুলের ছাত্র।

দুদিন আগেও নিয়মিত যারা কলেজ স্কুলের ছাত্র ছিল—পড়াশুনা কলেজ-স্কুল নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকত তারা এক একজন সৈনিক।

মৃত্যুপণে দীক্ষিত।

হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু।

হানাদার বাহিনীকে আজ তারা সোনার বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করবেই।

দলপতির নির্দেশে তারা তখন শ্রীহট্ট থেকে তামবিলের পথে খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে পাক হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

তামবিল ও শ্রীহট্টের মধ্যে মাত্র ৩২ মাইলের ব্যবধান।

পথে পড়ল শ্রীপুরের চা বাগিচা।

বিরাট চা বাগিচা—বহু টাকার চা প্রতি বৎসর ওখান থেকে বিদেশে চালান যায়—অনেক ফরেন কারেন্সী পাকিস্তানের তহবিলে জমা হয়।

চা বাগিচার বাঙ্গালী শ্রমিকেরা পাঞ্জাবী মালিক ক্যাপটেন রশিদের উপর নজর রেখেছিল—চা বাগানের সব কাজ বন্ধ।

কোন কর্মীই কাজে আসে না।

পথের দুপাশে শস্যক্ষেত্র—প্রচুর শস্য ফলেছে এবারে।

রেজাকরা দলে ছিল জনা দশেক।

সহসা একটা গাড়ির শব্দ কানে আসে ওদের—ওরা তাড়াতাড়ি পথের ধারে ঘন গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাইফেল শক্ত মুঠিতে ধরে পথের দিকে চেয়ে থাকে।

একটা জীপ—জনা দুই লোক জীপে—

কিন্তু ওকি জীপের সামনে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। তবে হানাদার বাহিনীর জীব নয়—মুক্তিফৌজের জীপ।

জীপ চালকের পাশে যে বসেছিল তার হাতে মেসিনগান।

ওরা এগিয়ে এসে পথের সামনে দাঁড়াল। জীপটা থেমে গেল।

জয় বাংলা—ওরা চেঁচিয়ে ওঠে।

জয় বাংলা—প্রত্যুত্তর এলো।

মেসিনগান ধরে যিনি বসেছিলেন তিনিও একজন প্রাক্তন পাকিস্তান রাইফেলসের লোক, মনসুর আলী।

তিনিও আসছিলেন তামবিলের দিক থেকে—শ্রীহট্টের দিক থেকে।

মেজর সিদ্দিকী শুধালেন, আমরা পরশু শ্রীহট্ট ছেড়েছি—ওখানকার এখন খবর কি?

খবর খুব খারাপ। গোটা শ্রীহট্টই প্রায় এখন হানাদার বাহিনীর কবজায়।

শালুটিকর বিমানবন্দরের মধ্যে যে সব হানাদাররা ঘেরাও হয়েছিল তাদের অবস্থা কি?

শ্রীহট্ট শহরের পতনের পর থেকেই তারা আবার বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে এসে তৎপরতা শুরু করেছে—মনসুর আলী বললেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, ওদের বিমানবাহিনীর বিরাট একটা পরিবহন বিমান বন্দরে গতকাল সন্ধ্যায় এসে নেমেছে—তাতে ছিল গোলাবারুদ আর খাবার, হানাদার বাহিনীদের জন্য—

সাজ্জাদ হোসেন বলে ওঠে, উঃ আমাদের যদি গোটা দুই বিমান আর কিছু এন্টি-এয়ারক্রাফট্ গান আজ থাকত— দেখাতাম ওদের মজা।

সাজ্জাদের বয়েসর ষোল সতের বেশী নয়, সবে ওষ্ঠের উপর গোঁফের কালো দাগ দেখা দিয়েছে।

পাতলা দোহারা চেহারা—টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ।

মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। চোখে সোনার চশমা।

টানা টানা দুটি চোখ যেন কোন দক্ষ শিল্পীর আঁকা।

মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র।

মনসুর আলী বললেন, তবু আমরা জিতব—আজ না হয় কাল—কাল না নয় পরশু—এক বছর দুই বছর বা দশ বছর—কতকাল ওরা আমাদের প্রতিরোধ করতে পারবে। প্রত্যহ জেনেছি ওদের ঐ বিরাট বাহিনীকে ধ্বংসযজ্ঞে নিযুক্ত রাখতে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ক্রমশঃ যে তহবিল ওদের শূন্য হয়ে আসছে কি দিয়ে ওরা তা ভরাট করবে?

সিদ্দিকী বললেন, ওরা আমেরিকার—চীনের কাছে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে জানেন?

জানি, মনসুর আলী বললেন, পাবেও হয়ত চীন ও আমেরিকার কাছে—কিন্তু মুষ্টি-ভিক্ষা দোরে দোরে মেগে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কতদিন পারবে? টাকা শোধ করবে কি দিয়ে—পূর্ববাংলার চা—পাট, চামড়া বিদেশে চালান করে যে টাকা আমাদের বঞ্চিত করে ওরা এতকাল অর্জন করে এসেছে সে পথ আজ বন্ধ। They are on the verge of collapse-ব্যাংক্রাপ্টসি ওদের নিতে হবেই—দেউলিয়া ওদের হতে হবেই—ওদের যত আস্ফালন আর হম্বিতম্বি সবই ত আমাদের সোনা বাংলাকে শোষণ করে—

কথা বলতে বলতেই সহসা বৃষ্টি নামল।

সকলে চেঁচিয়ে ওঠে আনন্দে, বৃষ্টি। বৃষ্টি।—বৃষ্টি।

মনসুন—বর্ষা এবারে আগে বলেই মনে হচ্ছে—সিদ্দিকী বললেন।

মনসুর আলী বললেন, তা যদি হয় ত আমাদেরই সুবিধা। বাছাধনেরা বাংলাদেশের বৃষ্টি জানেন না ত—জল জল আর জল—

সাজ্জাদ বলে, ওদের আমরা ভাতে মারব—পানিতে মারব। ঘরে ঘরে আমরা দুর্গ গড়ে তুলব—

সকলে কথা বলতে বলতে আবার অগ্রসর হয় একত্রে।

সেইদিন সন্ধ্যায়ই ওদের দল এক দল টহলদারী হানাদার বাহিনীকে আক্রমণ করল—

ওরা দুটো সাঁজোয়া গাড়িতে গোলাগুলি রসদ নিয়ে শ্রীহট্টের দিকে এগুচ্ছিল—সেখানকার বাহিনীদের সাহায্যে।

দুই দলে যুদ্ধ বেধে গেল।

দুই পক্ষের অবিশ্রাম গোলাগুলি।

মনসুর আলী চেঁচিয়ে ওঠেন হঠাৎ চাপা গলায়, সাজ্জাদ সাজ্জাদ are you mad ওভাবে এগুচ্ছো কেন lie down–lie down এখুনি একটা গুলি এসে লাগবে যে—

সত্যিই অবিশ্রাম গুলি চলেছে তখন।

কিন্তু সাজ্জাদ মনসুর আলীর ডাকে কোন সাড়া দেয় না—বুকে হেঁটে আবছা অন্ধকারে সে এগিয়ে চলেছে পথের দিকে।

বুকে ধরা তার একটা মাইন—

সাজ্জাদ—সাজ্জাদ—

Don't call me back–don't try to stop me–তোমরা জান না ক্যাপটেন ওরা আমার মাকে বাবাকে ঢাকায় হত্যা করেছে। আমার দু বোনকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করেছে। একজন আজ বদ্ধ পাগল।

সাজ্জাদ কথাগুলো বলতে বলতে উল্কার বেগে যেন আবছা আলো আঁধারে ছুটে বের হয়ে গেল।

তার কিছুক্ষণ পরেই একটা কর্ণবিদারী প্রচণ্ড শব্দে চারিদিকের আকাশ-বাতাস মাটি যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো।

মনে হলো বুঝি কানে তালা লেগে গেছে সবার।

ওদের সঙ্গে দুটো মাইন ছিল—একটা সাজ্জাদের কাছে অন্যটা রফিকউলের কাছে।

সামনের ট্রাকভর্তি হানাদার বাহিনী—জনা পনের—সঙ্গে তাদের মেসিনগান ও গোলা-বারুদ—সব উড়ে গেল যেন একসঙ্গে।

পিছনের ট্রাকটায় আরো জনা কুড়ি ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল—তারা সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে প্রাণভয়ে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

আরো আধ ঘন্টা পরে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে।

বিষণ্ণ ক্লান্ত আলো। সেই আলোয় ওরা সকলে ভূশায়িত রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন সাজ্জাদের দেহটার সামনে নতশিরে দাঁড়িয়ে।

সাজ্জাদ প্রাণ দিয়েছে। সেই সঙ্গে জনা পনের খান হানদারদের খতম করেছে।

কিন্তু ওদের হাতে এসেছে প্রচুর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র—গোলাগুলি—আর রসদ।

কিন্তু সৈনিকের জন্য—মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ত অশ্রু নয়।

তাদের অশ্রুমোচনের অবসর বিলাস কোথায়।

Duty–কঠিন কর্তব্য আর কর্তব্য।

রেজাকও ওদের পাশে দাঁড়িয়েছিল—

তার মনে পড়লো মাত্র কিছুক্ষণ আগেও সাজ্জাদ ওর পাশাপাশি চলতে চলতে বিদ্রোহী কবির সেই কবিতাটি অস্ফুট কণ্ঠে আবৃত্তি করছিল।

মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

কবিতার চরণগুলো যেন এখনো তার দু'কান ভরে বাজছে।

সাজ্জাদের দেহ কবরস্থ করে—যে সব অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ হানাদরদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল এবার সেই সব নিয়ে আর হাঁটাপথে নয় ওরা সব সেই হানাদার বাহিনীর ফিপটিন হানড্রেডওয়েট ট্রাকটার উপর উঠে বসল।

মনসুর আলী নিজেই স্টীয়ারিংয়ে বসলেন।

সুইচ অন করতেই ইঞ্জিন গর্জে উঠলো।

ট্রাকটা এগিয়ে চললো ওদের গন্তব্য পথে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে তখন পূর্বাশার প্রান্তে আলোর সারা।

সূর্য উঠছে।

।। ২১ ।।

আতঙ্ক আর আতঙ্ক।

শহর থেকে দূরদূরান্তে গ্রামে গ্রামে মানুষের মনে এক ভয়াবহ আতঙ্কের ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছে।

মধুমতী নদীর ধারে কাজলদের গ্রামটিও বাদ যায়নি।

বিশেষ করে হিন্দুদের মনে আরো বেশী আতঙ্ক। কারণ তারা খবর পেয়েছে কাল যে আতঙ্কিত যে সব বাংলার মানুষ ভারত সীমান্তের দিকে দব কিছু পিছনে ফেলে ছুটে চলেছে তাদের মধ্যে শতকরা পঁচাশীজনই হিন্দু।

আর বাকী সব বুদ্ধিজীবি মুসলমানরা।

ডাক্তার ইনজিনীয়ার প্রফেসার উকিল ব্যারিস্টার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী—যারা বাংলাদেশের আশা, আওয়ামী লীগের প্রধান সমর্থক—যারা সত্যি সত্যিই বুঝতে পেরেছিল গত তেইশ বছরের নির্মম শোষণের যন্ত্রটা তারাই।

তারাই যারা ঐ মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা।

তারাই যাদের হানাদার বাহিনী বেছে বেছে খুঁজে খুঁজে নির্মমভাবে হত্যা করে সমস্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নির্মূল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চাষীভূষা, কুমোর-কামার শ্রমিকেরা নয়—তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

কাত্যায়নী দেবীর মুখে আহারে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই।

বেছে বেছে নাকি বয়েসের মেয়েদের দানবগুলো তাদের ক্যাম্পে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। উঃ মাগো!

তাঁর বুকেও যে পাথর চেপে রয়েছে—ঐ আবাগী হতচ্ছাড়ি মেয়েটা।

চক্রবর্তীকে অস্থির করে তুলেছেন কাত্যায়নী দেবী, হ্যাঁগো তুমি কি গো! এখনো চুপচাপ স্থির হয়ে বসে আছো!

করবটা কি? চক্রবর্তী নীরস কণ্ঠে বলেন।

করবটা কি মানে! যেমন করে হোক চল এখান থেকে পালিয়ে যাই। ঐ আবাগীর দিকে যখনই চোখ পড়ে বুক যে আমার ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।

ব্যস্ত হচ্ছো কেন বৌ! গ্রামে ত এখনো তারা হামলা করেনি।

থাম ত তুমি! আজ শহরের ঘরে ঘরে করছে কাল গ্রামের ঘরে ঘরে শুরু করবে।

না, না—

না, ওদের আমি বিশ্বাস করি না। আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না। তুমি যাবে কিনা বল। কাত্যায়নী কান্না শুরু করে দিলেন।

দেখি—

দেখি নয় যাবে কিনা বল, নচেৎ ওকে বিষ খাইয়ে আমি গলায় দড়ি দেবো নির্ঘাত, এ তোমায় শেষ বলে রাখলাম।

চক্রবর্তী সত্যি কি করবেন বুঝতে পারেন না।

সন্ধ্যাবেলা তখন চৌধুরী সাহেবের বাইরের ঘরে বসে সকলে আকাশবাণীর সংবাদ শুনছে গোল হয়ে।

আসুন, আসুন চক্রবর্তী মশাই। শুনুন বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো আজ আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিব নগরে।

সত্যি নাকি?

তয় আর কই কি? শোনেন বঙ্গবন্ধু আমাগো রাষ্ট্রপতি, জনাব তাজুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খোন্দকার মুস্তাক সাহেব, উপরাষ্ট্রপতি জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব কামারুজ্জামান, জনাব মনসুর আলী মন্ত্রী।

উত্তেজিত চৌধুরী সাহেব বলতে লাগলেন, একদিন এক আম্রকাননে প্রায় দুই শতাধিক বছর আগে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিল। আজ আবার এক আম্রকাননে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়লো। শপথ নিলেন ওঁরা।

আরো অনেক আলোচনা হলো যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে। একে একে সকলে বিদায় নিলেন।

তখন চক্রবর্তী বললেন, একটা কথা ছিল চৌধুরী ভাই—

কি চক্রবর্তী মশাই?

কাজলের মা ত আর গাঁয়ে থাকতে চায় না।

কেন? কি কন তিনি?

চারিদিক থেকে পাঞ্জাবী সৈন্যরা সব বয়সের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আহা সে ত শহরে। গ্রাম ত এখনও—

সে ত আমি বুঝি চৌধুরী সাহেব কিন্তু কাজলের মায়েরে বুঝাই কেমনে। ও কেবলই বলে চল আমরা চলে যাই। শহর থেকে গ্রামে আসতে একদিন ওদের বাধাডা কি!

না, না আপনি তারে বোঝ দেন।

শুনবে না কথা। ভাবছি তাই।

কি?

চলে যাবো।

এই ডামাডোলের মধ্যি যাবেন?

উপায় কি বলেন!

তবে আর কি বলবো।

আপনি সব ব্যবস্থা করে দেন।

তা নয় দিলাম কিন্তু রেল সড়ক ত সব শুনি বিপর্যস্ত। সব উপড়ে ফেলেছে। ট্রেন চলাচল বন্ধ।

পায়ে হেঁটেই যাবো। তারপর—

কি?

কোন মুক্তিফৌজের সাহায্য যদি পাই যেমন করে হোক যশোর ত পৌছতে পারব। সেখান থেকে—

যশোরে ত আগুন জ্বলছে এখন।

কেন যশোর ত মুক্তিফৌজের হাতেই ছিল।

এখন আর নেই, গত দশই এপ্রিল পাকিস্তানী ফৌজ যশোর দুর্গ থেকে বের হয়ে সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে এগোয়—কামান মেসিনগান মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালায়। দুখানা জঙ্গী বিমান মাথার উপর ছাতার মত ওদের মদৎ দেয়।

কিন্তু মুক্তিফৌজ।

তারা প্রবল বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। তার পাল্টা জবাবে পাক হানাদাররা গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ঝিকরগাছা পর্যন্ত কামান দেগেছে, দূরপাল্লার সব কামান। কামান ও বিমানের সাহায্যে তারা বনগাঁ সীমান্তের কাছাকাছি পর্যন্ত নাকি এগিয়ে গিয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। গুলি করে হত্যা করছে গ্রামবাসীদের। লুঠ করেছে। ঘরের মেয়েদের চরম সর্বনাশ করেছে। এ অবস্থায় সেদিকে যাবেন।

এত লোক যখন শুনছি যাচ্ছে, আমরা কি আর পারব না আর নিয়তি যদি থাকেই মৃত্যু না হয় মরবো।

আমার মনডা কিন্তু সায় দেয় না চক্রবর্তী মশাই। বরং গ্রামই এখন তবু কিছুটা নিরাপদ। আপনি বুঝিয়ে বলেন তারে।

দেখি—চক্রবর্তী উঠলেন।

কিন্তু কাত্যায়নী দেবীর সেই এক কথা।

সব শোনার পরও তিনি যাবেনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কাজলের সর্বনাশ তিনি কিছুতেই ঘটতে দিতে পারেন না।

বাধ্য হয়ে চক্রবর্তীকে শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থাই করতে হলো।

কাল বাদে পরশু তাঁরা যাত্রা করবেন।

কাজল কিন্তু কথাটা শুনে বেঁকে বসল।

না, সে যাবে না।

কাত্যায়নী দেবীর বিস্ময়ের যেন অন্ত নেই। বলেন, কি বলিস তুই খুকী, যাবি না মানে?

না। যাবো না।

না গেলে সেই দানবরা যখন তোর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে।

টেনে নিয়ে গেলেই হলো। জানি না আমি আত্মরক্ষা করতে, আসুক না একবার আমার কাছে, দেখবো তখন কে কত বড় দানব।

বোবা বিস্ময়ে কাত্যায়নী চেয়ে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে। হতচ্ছাড়ীর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি! শেষ পর্যন্ত বলে কি ও।

কিন্তু কাত্যয়নী দেবী আর কোন জবাব দেন না মেয়ের কথার।

গজগজ করতে করতে আপনমনেই নিজের কাজে চলে যান।

তারপর যাওয়ার আগে দুটো দিনও কাজল বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করেনি ঐ ব্যাপারে।

কাত্যায়নীও ভাবছেন ও বুঝি একটা কথার পিঠেই কথা।

তিনি যাত্রার ব্যাপারে গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

অনিশ্চিত পথযাত্রা।

পথে পথে অসংখ্য বিপদ ও বিপত্তি—চক্রবর্তীর মন কেন যেন বলছিল এই যাওয়াই তাঁর এখান থেকে শেষ যাওয়া। আর হয়ত কোন দিনই ফিরতে পারবেন না।

শত বিপদেও এতকাল কারো কথায় কোন কান না দিয়ে যে মাটি আঁকড়ে পড়েছিলেন আজ

তাঁকে সেই দেশের মাটি চিরদিনের মতই ছেড়ে যেতে হবে।

ঐ মেয়েটার জন্যই যেতে হবে তাঁকে।

কাত্যায়নী টুকটাক অনেক কিছুই পোটলা পুটলি বেঁধে গুছিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু চক্রবর্তী বললেন, তুমি কি পাগল হলে বৌ—এত সব গোছগাছ করছো নিয়ে যাবে কি করে! ট্রেন নেই—স্টীমার নেই—তারপর পথের কোথায় হানদার ওত পেতে বসে আছে—

তাই বলে একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোও নেবে'

কিছু না—নিলেও সব লুঠপাঠ করে নেবে।

শেষ পর্যন্ত সামান্য একটা সুটকেস—নগদ টাকাকড়ি যা ছিল তাই কোমরের গেঁজে বেঁধে—গোটা দুই পুঁটলি নিয়ে—রাত্রির অন্ধকারে নাওয়ে উঠে বসলেন চক্রবর্তী স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে।

মাঝি আলি মিঞা বলে, আপনেও চললেন গাঁ ছাড়ি করতা।

কি করি ভাই—সাহস হচ্ছে না আর থাকতে—

চৌধুরী সাহেব গাঁয়ের ঘাট পর্যন্ত ওদের বিদায় দিতে এসেছিলেন—

তাঁর চোখে জল।

চক্রবর্তী ও কাত্যায়নী দেবীর চোখেও জল।

কেবল জল ছিল না কাজলের চোখে।

সে যেন কেবল স্তব্ধ একেবারে পাথর।

ট্রেন নেই অতএব খুলনার ঘাট পর্যন্তই আলি মিঞা ওদের নাওয়ে করে পৌঁছে দেবে সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছেন চৌধুরী সাহেব।

খুলনা কিংবা যশোরে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়ত হাঁটা পথেই পাড়ি দেওয়া যাবে।

পালে হাওয়া লেগেছে—

তরতর করে নাও বহে চলেছে।

চক্রবর্তী ও কাত্যায়নী দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। এত চিন্তা ভাবনাতেও বুঝি মানুষের ঘুম আসে।

জেগে ছিল কাজল।

এক সময় ধীরে ধীরে অন্ধকারে নৌকার ছইয়ের মধ্যে উঠে বসল কাজল।

শাড়ির আঁচলটা কোমরে বেশ করে জড়িয়ে নিল—তারপর নিঃশব্দে নৌকা থেকে জলে নেমে গেল।

অন্ধকার।

ঘুরঘুটি অন্ধকার।

জল আর জল।

মধুমতী বহে চলেছে একটানা।

সাঁতরাতে শুরু করল কাজল তীর লক্ষ্য করে। কতদূর আর নাও এসেছে—তীরে উঠতে পারলে একবার সে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছতেই পারবে।

সন্তরণপটু কাজল—সাঁতরে চলে।

নাও উল্টো মুখে চলে যায়।

হালে বসে আলি মিঞার চোখেও তখন ঘুমের ঢুলুনি নেমেছে রাত্রির নদীর ঠাণ্ডা বাতাসে।

দরজার গায়ে ধাক্কার শব্দে চৌধুরী সাহেবের ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

কেডা—

আবার ধাক্কা পড়লো মৃদু দরজার গায়ে।

কেডা? কথা কথিছো না ক্যান?

ঘুম চোখে উঠে চৌধুরী সাহেব দরজা খুলে দিয়ে চমকে যান, কেডা—

জেঠা—আমি—

কেডা—কাজল বেটি?

কাজল ঘরের মধ্যে চৌধুরী সাহেবের পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে ততক্ষণে।

ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর এক কোণে শেজবাতিটা জ্বলছিল—আলোটা কমানো ছিল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে চৌধুরী সাহেব বাড়ির সলতেটা উস্কে দিতেই অনুজ্জ্বল ঘর ভরে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে তাঁর কাজল।

পরনের শাড়িটা তখনো ভেজা।

ভিজা চুলের কয়েকটা গুচ্ছ বুকের পরে এসে লোটাচ্ছে।

বিস্ময়ে যেন চৌধুরী সাহেব হতভম্ব।

কাজল বেটি—তুমি—একি সব জামাকাপড় ভেজা—

জেঠা আমি যাবো না।

যাবা না। ক্যান—

না। তাই নৌকা থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে সাঁতরে পালিয়ে এসেছি—কাজলের চোখে জল—গলার স্বর বুজে আসে।

বলে, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না জেঠা—আমি আপনার কাছে থাকবো।

আমার কাছে থাকবা। কিন্তু—

মা বাবাকে আমি অনেক বলেছি তারা শুনলো না। এ গাঁ ছেড়ে আমি কোথায়ও যাতি পারব না।—

বলতে বলতে কাজল সহসা চৌধুরী সাহেবের বিশাল বক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাইত—তাইত—ওরে চুপ কর বেটি—চুপ কর—নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছে থাকবা—

চৌধুরী সাহেব চেঁচিয়ে ডাকলেন স্ত্রীকে—

ও রেজকের মা—আস দেখি এদিকে।

রেজাকের মা ঘরে এসে ঢুকলেন।

একি কাজল—তুই কোথা থেকে বেটি!

সে সব পরে শুন, আগে ওর কাপড়ডা বদলে শুকনো একটা দাও—যাও যাও নিয়ে যাও।

আয় বেটি।

॥ ২২ ॥

যুদ্ধের গতি ক্রমশঃ মোড় নিচ্ছে।

হানাদার বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দখলকরা শহরগুলো একে একে মুক্তিফৌজের হাত থেকে খসে পড়তে থাকে।

যাবেই ত।

কি আছে ওদের! একদিকে আধুনিক অস্ত্র—কামান-ট্যাংক-যুদ্ধজাহাজ-বোমারু বিমান, তিন ডিভিশন রণকুশলী সৈন্য, অন্যদিকে যুদ্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সামান্য অস্ত্রসম্বল স্বাধীনতাকামী মুক্তিফৌজ।

হানাদার বাহিনী বড় বড় শহরে ক্যান্টনমেন্টগুলো দখল করে চারিদিকে আক্রমণ চালাতে থাকে।

গোলাগুলি, বোমাবর্ষণ, আগুন দেওয়া, লুঠতরাজ। মুক্তিফৌজ পিছু হটতে থাকে।

কখনো একটা শহর পাক হানাদার বাহিনী অধিকার করে, কখনো আবার মুক্তিফৌজ।

সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন বেতারে পৃথিবীর সাংবাদিক কূটনৈতিক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের আহ্বান জানিয়েছেন, বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলগুলি দেখে যাবার জন্য।

আর বলেছেন, আমাদের অস্ত্র দিন, আমাদের সাহায্য করুন।

ময়মনসিং থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে।

চুয়াডাঙ্গায় বোমাবর্ষণ হচ্ছে সর্বক্ষণ। মুক্তিফৌজ প্রচণ্ড প্রতিরোধ দিচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাক ফৌজ শ্রীহট্ট বিমানক্ষেত্র মুক্তিফৌজ অকেজো করে দিয়েছে।

ঢাকার আকাশে শকুন উড়ছে অসংখ্য।

পাকিস্তান এখন এক গোরস্থান, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন বলেছেন।

সব চাইতে চমকপ্রদ সংবাদ ঃ কলকাতার পাক দূতাবাস পিণ্ডির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

পাক ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব এম্ হোসেন আলী এবং অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসাররা স্বাধীন সার্বভৌম এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ এবং তার নবগঠিত সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন।

দেবে দেবে সবাই একে একে ঐ পতাকা উড়িয়ে দেবে।

গাঙ্গের ধারে সেই হিজল গাছটির নীচে এসে বসে কাজল ঐ কলনাদিনী মধুমতীর দিকে চেয়ে থাকে সারাটা দ্বিপ্রহর বিকেল।

বিকেলের রৌদ্র যতক্ষণ না ঝিমিয়ে আসে, হিজল গাছের ছায়াটা নদীর বুকে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, ও বসে থাকে।

আর বসে থাকে সেই নীলকণ্ঠ পাখীটা।

দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কাজল পা টিপে টিপে বের হয়ে আসে বাড়ি থেকে পথে। তারপর সোজা চলে আসে গাঙ্গের ধারটিতে।

কাজল ফিরে এসে তাঁর বাড়িতে ওঠায় চৌধুরী সাহেব পরের দিন বড় বিব্রত বোধ করেছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা কাজল আর তাঁরা মুসলমান।

ওর থাকা খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে। গ্রামে এক সহায়সম্বলহীনা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের বিধবা আছেন। চৌধুরী সাহেব ভেবেছিলেন তাঁরই ওখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু কথাটা শুনে কাজল বলে উঠেছিল, না, না জেঠী তা হবে না।

কিন্তু মা, আমাদের ঘরে -

কেন। জেঠির হাতের রান্না কি আমি এর আগে খাইনি।

তা সত্যি। কাজল রেজাকের মার হাতের রান্না অনেক দিনই খেয়েছে। কিন্তু কাত্যায়নী বা চক্রবর্তী কেউ কখনো তা জানতে পারেন নি।

কিন্তু বেটি, তবু চৌধুরী সাহেব বলেন, তোমার বাবা শুনলে কি মনে করবেন। তোমার না হয় অল্প বয়স বুদ্ধি বিবেচনা এখনো তেমন হয় নি, কিন্তু আমার ত বয়েস হয়েছে আমি জেনে শুনে—

কাজল হাসতে হাসতে বলেছিল, কিন্তু আমি ত জাত মানি না জেঠা—

কোন জাত মান না—

ঐ হিন্দু মুসলমান—আমরা সবাই একই দেশের এক জাতি—বাঙ্গালী।

কথাটা কাজলের নয়—কথাটা রেজাকের।

রেজাকই ওকে ঐ কথা শিখিয়েছে—বলেছিল—কাজীর সেই গানটা জান কাজল।

কোন্ গানটা? কাজল শুধিয়েছিল।

রেজাক গেয়ে উঠেছিল ঃ

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াৎ খেলছো জুয়া—
ছুঁলেই তোর জাত যাবে—
জাত ছেলের হাতের নয়কো মোওয়া।

চৌধুরী সাহেব কাজলের কথার আর প্রতিবাদ জানাতে পারেন নি।

হাসতে হাসতে বলেছিলেন—বেশ বেটি তাই হোক তবে—

কাজলই যেন সমস্ত কিছুর মীমাংসা করে দিয়েছিল।

কিন্তু কাত্যায়নীর আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হলো। তাদের শান্ত গাঁয়েও হানাদার বাহিনী গোলাগুলি একদিন অতর্কিতে এসে পড়তে শুরু করল। তাদের গ্রাম ত্যাগের দিন পনেরর মধ্যেই

খানেরা গানবোটে করে মধুমতী নদীর দু'পাশের গ্রামগুলোতে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ ও মেসিনগা চালাতে চালাতে বরিশাল শহরের দিকে এগুতে থাকে।

গ্রামে গ্রামে হাহাকার পড়ে যায়—প্রাণভয়ে ছুটাছুটি পড়ে যায় গ্রামবাসীদের।

পাক হানাদার বাহিনী মধুমতীর দুই তীরের গ্রামগুলোকে বোমা মেরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বং করে দিতে দিতে এগিয়ে চলে।

নদীর ধারে যাদের বসবাস ছিল তাদের বেশির ভাগ ঘরবাড়িই জ্বলে খাক হয়ে যায়।

চৌধুরী সাহেবের মুখ শুকিয়ে যায়—বর্বররা শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের উপরও কামান দাগতে শুরু করল

শুধু মধুমতী নদীর দু'পাড়ই নয়—চৌধুরী সাহেব জানতে পারেন আকাশবাণী কলকাতার সংবা থেকে—শ্রীহট্ট ও আখাউড়ার মধ্যে যে কুশিয়ারা নদী এবং শেরপুরের ফেরিঘাটের দুই জায়গা মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র, সেখানেও মুক্তিফৌজের সঙ্গে বর্বর হানাদার বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে—

বরিশালে ওরা ঢুকে পড়েছে—ঐ গানবোটগুলোর সাহায্যেই—বরিশাল যদিও এখনো মুক্তিফৌজদে হাতে তবে বেশী দিন রাখতে পারবে না হয়ত।

চালনা বন্দরের অবস্থাও তাই—খুলনা শহরও হানাদার বাহিনী মুক্তিফৌজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

অনন্যোপায় মুক্তিফৌজের যোদ্ধারা এখন গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে।

জানতেন চৌধুরী সাহেব এ হতে বাধ্য।

একে ওদের—মুক্তিফৌজের যোদ্ধাদের সত্যিকারের কোন রণকৌশল জানা নেই—যুদ্ধ করবার মত তেমন কোন আধুনিক হাতিয়ার নেই—বোমারু বিমান নেই—যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন সুষ্ঠ নয়—মাথার উপরে অনেকেরই তাদের পরিচালনা করবার তেমন যোগ্য সেনাপতি বা কম্যানডার নেই—পারবে কেন ওরা আধুনিক সব অস্ত্রে সজ্জিত রণকুশলী পাক বাহিনীর সঙ্গে।

দুর্জয় সাহস এক বস্তু কিন্তু রাইফেল বা কামানের গুলিগোলার মুকাবিলা করা অন্য বস্তু।

দেশপ্রেম এক বস্তু—কিন্তু কঠোর বাস্তব যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত শক্ত মাটি পায়ের নীচে অন্য এক বস্তু।

কাজল বলে, কি হবে জেঠা? তবে কি আমরা পারব না।

চৌধুরী সাহেব বলেন, কে বললে পারব না বেটি—নিশ্চয়ই পারব। আজ আমাদের পিছু হটে আসতে হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কতকাল ওরা লড়বে—ওদের সৈন্যরা সব মাইনা পাওয়া গোলাম সৈন্য মাত্র—হুকুমের তাঁবেদার।

আর আমাদের সৈন্যরা কারো তাঁবেদার নয়—কারো কাছ থেকে মাহিনা নিয়ে যুদ্ধ করছে না—করছে বুকভরা দেশপ্রীতিতে—নিজের নিজের জন্মভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য—দীর্ঘ তেইশ বছরের ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে সোনার বাংলাকে মুক্ত করবার জন্য।

কত হাজার সৈন্য ওদের আছে। আমরা সাড়ে সাত কোটি সৈনিক—কতগুলো ক্যান্টনমেন্ট ওদের আছে—আমাদের প্রতিটি ঘরে ঘরে দুর্গ আজ।

জয় আমাদের সুনিশ্চিত মা—ঐ চেংগীস খানের তাঁবেদার হানাদার বাহিনীর মনোবল একদিন ভেঙ্গে পড়বেই, যেমন করে হিটলারের সৈন্যবাহিনীর পড়েছিল আর তার পরাজয় হয়েছিল। দু'মাস

চার মাস এক বছর দুই বছর একদিন আমাদের জয় হবেই।

কাজল ভাবে ঠিকই ত জয় তাদের হবেই।

একদা যাদের বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা জয় করেছিল সেই বাঙ্গালীরা আবার জয়ী হয়ে এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে।

রেজাক একদিন ফিরে আসবেই জয়মাল্য গলায় দুলিয়ে।

রেজাক বলে গিয়েছে সে আসবে।

দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ, আজ সিরাজগঞ্জ-মাদারিপুর-মৌলভীবাজার খান সেনার দখলে।

খান সেনারা শ্রীহট্ট থেকে আখউড়ার পথে মৌলভীবাজারে এসে ঢুকে পড়েছে।

পাঁচ দিন ধরে প্রচণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজ সাতাশ কিলোমিটার দূরে শ্রীমঙ্গলে সরে গিয়েছে।

ঘাঁটি গেড়েছে সাতগাঁও পার্বত্য অঞ্চলে।

॥ ২৩ ॥

রেজাকদের গেরিলাবাহিনী তখন ঐ পার্বত্য অঞ্চলেই তাদের গোপন ঘাঁটি গেড়েছে।

চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল—তারই মধ্যে তারা আত্মগোপন করে আছে—

গভীর রাত।

ঘন অন্ধকারে চারিদিক কালো।

মাথার উপরে আকাশ চোখে পড়ে না—

রেজাককে আজ চিনবারও উপায় নেই। ছিন্ন মলিন বেশবাস—রুক্ষ মাথার কেশ—মুখভর্তি দাড়ি।

রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে চোখ দুটো লাল যেন জবাফুলের মত।

মেসিনগানের একটা গোপন ঘাঁটি আগলে অতন্দ্র প্রহরায় জেগে রয়েছে রেজাক, শামসুদ্দীন, রফিউল, সিদ্দিকী—

দলের অনেকেই মারা গেছে।

শামসুলও মারা গিয়েছে।

সামনে দেখা যায় নিচে মৌলভীবাজার থেকে হবিগঞ্জ শহরে যাবার সড়কটি—সাতগাঁও পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে।

এ তিমির রাত্রির শেষ হবে।

এত রক্তদান এত প্রাণদান নিষ্ফল হবে না—হতে পারে না।

হঠাৎ ওদের চোখে পড়ল—হানাদার বাহিনীর একটা প্লেটুন রাতের অন্ধকারে সড়ক ধরে চলেছে—

গোটা তিনেক ট্রাক পর পর—

বোধহয় ওরা হবিগঞ্জ শহরের দিকেই চলেছে—

Fire–

দলপতির নির্দেশ শোনা গেল। চাপা গলায়।

সঙ্গে সঙ্গে ওদের মেসিনগান গর্জে উঠলো, ট্যারারা—টক—টক—

পাল্টা গোলাগুলি হানাদার বাহিনীও চালায়—

সহসা একটা মেসিনগানের গুলি এসে রেজাকের পেটে বিদ্ধ হলো—যন্ত্রণায় রক্তাক্ত ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে চেপে ধরে শুয়ে পড়লো রেজাক—

অন্ধকারে ভাল করে সব দেখা যায় না।

ক্যাঃ সিদ্দিকী শুধান, কি হলো রেজাক—

Nothing—you carry on Captain-

চোখের উপরে আরো অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে যেন রেজাকের তখন।

মনে পড়ছে সবার মুখ—

যুদ্ধ চলেছে—

পরের দিন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে সংবাদ শোনা যায়—

কলকাতার মধ্যেই কোন এক স্থান থেকে স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র খবর ছড়ায়।

সাতগাঁওর পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে মৌলভীবাজার থেকে হবিগঞ্জ যাবার যে সড়কটি সেখানে গত রাত্রে মুক্তিফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে হানাদার বাহিনী পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা টাকভর্তি গোলাগুলি রাইফেল মেসিনগান ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

গান শোনা যায় ঃ

আমার মন ভোলান চোখ জুড়ানো
কি অপরূপ মরি মরি।
সোনার বাংলা আমার, ধাত্রী আমার।
রূপ দেখি তোর নয়ন ভরি।
ফাগুনে তোর কৃষ্ণচূড়ায়
আগুন মাখা আদুল গায়ে
বোশেখের তোর বাঁশের বাঁশী
ক্লান্তি রাখে গাছের ছায়ে।
তোর মেঘে মেদুর আষাঢ় নামে
সাতনরী হার গলায় পরি।
কাজলও সঙ্গে সঙ্গে গায়।
নতুন গান নতুন সুর বাংলা দেশের।

শাওনের তোর নদীর বুকে
মুরশিদী গায় নায়ের মাঝি।
সবুজ ক্ষেতে দোলায় আসি
আলো ছায়ার ফুলের সাজি।
তোর অঘ্রাণে ধান সোনামুখী
গন্ধে ভুবন উতল করি-

চরম পত্রে—শোনা যায়—সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন নাভিশ্বাস উঠেছে। সারা বিশ্ব আজ বুঝে নিয়েছে তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা। ধনভাণ্ডার আজ তার শেষ হয়ে এসেছে। তাই তার অনুচররা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আমেরিকা লণ্ডনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ জননেতা মৌলনা ভাসানী বলেছেন—কোন আপোষ নয়—বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কোন আপোষ নয়—কোন মীমাংসাই নয় —মীমাংসা একমাত্র তারা এ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবে—

সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালী স্বপ্ন দেখছে এক শোষণমুক্ত শস্যশ্যামলা নদীমেখলা পরিবৃত সোনার বাংলার।

সার্বভৌম স্বাধীন সোনার বাংলার।

মধুমতীর শান্ত জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাজলও সেই সোনার বাংলারই স্বপ্ন দেখে একটি

বাঙ্গালী মেয়ে।

পৌষ প্রহরের অঙ্গনে তোর
দোয়েল শ্যামার নাচানাচি;
তোর কাজলমাখা ধূলোর বুকে
নিত্য আমি বাঁচি মরি।
আবার শোনা যায়।
সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা
সোনার চেয়েও খাঁটি;
ও আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি।।

।। ২৪ ।।

এমনি করে কতদিন চলতো কে জানে।

পূর্ব পাকিস্তানের একদল সর্বস্বপণ সংগ্রামী কেবল হয়ত যুদ্ধই করে চলত—এক এক করে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ত।

আর খান সেনারা—

তারাও ভাবত এমনি করেই বুঝি চলে যাবে—চলবে—

কিন্তু ভারত অস্থির হয়ে উঠে ক্রমশঃ

বাস্তুহারারা তখনো বন্যার মত এসে ঢুকছে ভারতের মাটিতে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রীও চুপ করে বসে নেই—ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর দেশে দেশে বলে বেড়াচ্ছে এ চলতে পারে না, ভারত এই ভাবে উদ্বাস্তুদের নিয়ে জর্জরিত হতে পারে না, এর একটা ব্যব করো ত—ব্যবস্থা করো ত—কিন্তু তখনো বধির স্বর। আগা মহম্মদ ইয়াহিয়াও বুঝতে পেরেছি এবার শেষ কামড় না বসাতে পারলে—তার নিজের সিংহাসনও টলটলায়মান। তাকেও তার পূর্বসু ইসাকন্দার মির্জা আয়ুবের মত পশ্চাতে পদাঘাত খেয়ে সরে দাঁড়াতে হবে—সেই একই ইতিহাসে হবে পুনরাবৃত্তি।

হাতে তার মাত্র একটি তুরুপের তাস—বঙ্গবন্ধু তার করায়ত্ত।

কিন্তু তাতে করে কি সামলান যাবে?

ইন্দিরা গান্ধী তখন বলতে শুরু করেছেন—তোমরা কেউ যদি না কিছু করো—চোখে আঙ্গুল- কানে আঙ্গুল দিয়ে বসে থাক ত আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে—ভারত দুর্বল নয়

তাই ঠিক ঐ সময় দ্বিতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট খুলে দিল পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানেও হয়ে গেল য় শুরু ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ খোলাখুলি ভাবেই।

রাত্রে আকাশবাণী দিল্লী থেকে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হলো : The wanton a provoked agressions of Pakistan, Pakistan, has launched a full scale war agair us & this war in Bangla Desh has become a war in India. We have no oth option but to put the country on war footing.

যা ছিল মেঘের আড়ালে ইয়াহিয়ার দুর্বুদ্ধিতা তাকে সূর্যালোকের মত স্পষ্ট করে তুলল।

পশ্চিমবাংলায় ব্ল্যাক আউট।

সীমান্তের সৈন্যদের উপর নির্দেশ জারী হলো, march on.

তারপর মাত্র বার দিন।

ভারতের দুর্ধর্ষ সেনানীদের হাতে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অপরাজেয় সৈন্য বাহিনী ন যারা, সেই পাকিস্তানী সেনারা আজ মার খেয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে মেহেরপুর ঝিনাইদা, লালমনিরাহাট শ্রীহট্ট থেকে পাক সেনারা ঊর্দ্ধশ্ব